# তপোভূমি নর্মদা

## সমাপ্ত খণ্ড

## দক্ষিণতট

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

# তপোভূমি নর্মদা

## সমাপ্ত খণ্ড

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

***Publisher :***
Ananda Mohan Ghosal, Debhuti Ghosal
41, Danesh Shaik Lane, Howrah
E-mail: tapobhumi.narmada.10@gmail.com
Website : www.ananda-tapobhuminarmada.blogspot.com
[f] : https://www.facebook.com / pages / tapobhuminarmada / 454528151310191
[t] : www.twitter.com / tapobhuminarmada30

**First Published : Dol Purnima, 1416**



**মুল্য - ২৬০.০০ টাকা** (এখন হিন্দি সংস্করণও পাওয়া যাচ্ছে)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১) সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা - ৭০০ ০০৬
২) আদি নাথ ব্রাদর্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৩) দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৪) দেজ পাবলিসিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৫) বলাকা বুক স্টল, হিন্দুস্কুল মেন গেট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৬) পাত্রজ পাবলিকেশন, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৭) সায়ন বুক স্টল, ১৫ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৮) মলয় প্রকাশনী, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, ৪৮ পি.ডি.এস. কর্ণার, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯
৯) বুক সাপ্লাই এজেন্সি, ৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
১০) স্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই (অতীন),
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রকঃ টাইপোগ্রাফিক আর্টস
৫৪/১বি, পটুয়াতলা লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

# —ঃ গ্রন্থসূচী ঃ—

# —ঃ লেখক পরিচিতি ঃ—

লেখক ঃ শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী।

জন্ম ঃ ১৯২৮ সালের ৫ই মার্চ দোল-পূর্ণিমার দিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াড়া নামক গ্রাম।

পিতা ঃ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় শশিভূষণ ঘোষাল।

মাতা ঃ স্বর্গীয়া প্রভাবতী দেবী।

**শিক্ষা** ঃ মাধপুর স্কুল হতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ; পরে মেদিনীপুর বি.এইচ ইনস্টিটিউট হতে মাট্রিকে জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ধীরে ধীরে লেখকের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। মেদিনীপুর কলেজ হতে প্রথম বিভাগে আই.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কোলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ হতে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতৃ আদেশে বেদাধ্যয়ন ও 'ভারতকে জান' এই আদেশ শিরোধার্য করে কৈলাস, মানস-সরোবর, শতপন্থ, কেদারবদ্রীসহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে চারবার পরিভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগ। সংসার ত্যাগ। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নর্মদা পরিক্রমা শুরু।

**গ্রন্থ** ঃ দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে নর্মদা পরিক্রমান্তে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম গ্রন্থ আলোক-তীর্থ। ধর্মজীবনের সমস্ত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পাপ এবং অবতারবেশী পরভোজী 'ঠাকুরে'রা আজ সারা দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মের নামে আসর জাঁকিয়ে লুণ্ঠন ও শোষণের যে নিরঙ্কুশ বাণিজ্য চালাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে এক বিস্ময়কর বিদ্রোহ। ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় গ্রন্থ আলোক-বন্দনা। আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থের প্রত্যুত্তর, বেদের বিভিন্ন ভাষ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ শাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় নির্ণয় এই গ্রন্থের প্রধান সম্পদ। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেখানে প্রতি মঙ্গলবার বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বর্ত্তমানে তা অবলুপ্ত। ১৯৮০ সালে তৃতীয় গ্রন্থ 'পিতরৌ', একাধারে মাতৃগীতা ও পিতৃগীতা যার মন্ত্রবাণী —

স্রষ্টা আছেন শুনি
তাঁরে চোখে দেখিনি
মাতাপিতা নিত্য প্রকট
তাঁদেরই নমি।

চতুর্থ গ্রন্থ সিরিজ 'তপোভূমি নর্মদা' (১-৮ম)। ঋষি পিতার শেষ আদেশানুসারে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ (নর্মদার সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গমস্থল) পর্যন্ত উভয়তট নগ্নপদে পরিক্রমাকালে যেখানে যা দেখেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। এই গ্রন্থে রয়েছে উচ্চকোটির সাধু মহাত্মাদের সাধনপথ, শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যের পথঘাট ও আরও সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

মৃত্যু ঃ ১৯৮৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টায় পিতৃপক্ষের মহামহাক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে লেখক শিবতনু প্রাপ্ত হন।

## —ঃঃ পিতৃস্তুতি ঃঃ—

বাবাগো!

আর যে পারি না সহিতে তোমার বিরহ।

পেয়ে হারায়েছি তাইতো আমার

জাগে ব্যথা আজ অসহ।

পূজি নাই বাক তোমার চরণ,

স্নেহময় ডাক শুনিনা এখন,

কত কথা আজ উঁকি মারে মনে।

কত সুখস্মৃতি সাধ অগনন।

তোমাকে পূজিতে আসা ধরণীতে

নাই পূজিয়া তোমা আজ

দেবতা চরণে পূজা অর্পনে

জাগে মনে বড় লাজ।

জানি পিতঃ, তুমি হারাবার নয়

তোমারই তো আমি, আমি তোমাময়,

দেখেছি বাহিরে, (তব) হৃদি-মন্দিরে

দেখা দাও, পূজা লও।

তোমার স্নেহের

শৈলেন

# চিরন্তন

১। লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা, হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞা অহং পিতুঃ॥

চন্দ্র তাঁর রূপ পরিহার করতে পারে, হিমালয় পারে তুষার ত্যাগ করতে, সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে গড়াতে পারে কিন্তু তবুও আমরা পক্ষে পিতৃসত্য লঙ্ঘন করা সম্ভব নয় অর্থাৎ যে কোন মূল্যে পিতৃসত্য পালনই আমার লক্ষ্য।

২। তোমরা তো পাথর কে? — এই জিজ্ঞাসা নিয়ে পূজা কর না। আসলে তোমরা পূজা কর পাথরেতে। রাস্তা দিয়ে পাথরের মূর্তি বা প্রতিমা যায়, ছেলেরা প্রণাম করে আর বলে ঠাকুর যাচ্ছে। তোমরা মনে মনে জান — মূর্তি, তাই আবাহন প্রাণ প্রতিষ্ঠার অভিনয় কর।

৩। মন চঞ্চল — কারণ সে অখণ্ড আনন্দের প্রয়াসী। সে অখণ্ড আনন্দের স্বাদ জানে — পাচ্ছে না, তাই বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটছে। চঞ্চলতা মনের স্বভাব নয়। স্থৈর্যই তার স্বভাব। চাঞ্চল্যটা তার সাময়িক ব্যায়াম মাত্র।

৪। একথা ধ্রুব সত্য যে ধর্মের ঝুটা নামাবলী গায় দিয়ে যারা অন্যায় অবিচারকে ঢেকে রাখে, ধর্মের মর্মকে নিজেদের জীবনগত আচরণে ফুটিয়ে তোলে না তারাই প্রকৃত ভ্রষ্ট এবং পতিত। বাঘ উপবাস করলেও পশু মেরে পারণ করে। তেমনি দুর্জন ধর্ম কার্যে ব্যয় করলেও পরের রক্ত শোষণ করে তা পূরণ করে।

৫। এ 'আমির' আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক্
চৈতন্যের শুভজ্যোতিঃ করুক প্রকাশ
ধ্যানে — আরও দৃঢ়তর ধ্যানে।
প্রজ্ঞা, প্রেমে, স্বরূপ প্রকাশে, — বোধির বোধনে।।

৬। যে না পারে নরপূজা করিতে সাধন,
দেবতার পূজা তার শুধু অকারণ।
চিন্ময় স্বরূপে তুমি চিনিলে না যাঁরে,
মৃন্ময় মূর্তিতে বৃথা খুঁজিছ ঈশ্বরে।।

# তপোভূমি নর্মদা

## ওঁ

## ।। হর নর্মদে হর।।

শব্দকে অনুসরণ করে সঙ্গীদের সঙ্গে কোন মতে পা দুটো টেনে টেনে হাঁটছি। খুব শীঘ্রই পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। বনের মধ্যস্থলে যেন আবছা গোধুলি। অনেকক্ষণ ধরে ঐ কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে হাঁটলাম কিন্তু শব্দের নাগাল পেলাম না। বনের নানা প্রান্ত থেকে নানা বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। বাবাকে স্মরণ করে রেবামন্ত্র জপ করতে করতে এগিয়ে চলেছি দক্ষিণতট ধরে অমরকণ্টকের পথে। এখন শুধু পথ চলা আর পথ চলা। চারিদিকে ঘনঘোর জঙ্গল। এই নির্জন অরণ্যে মা নর্মদার জলধারার গর্জন একটা তানের সৃষ্টি করেছে। নর্মদার বিচিত্র গতিপথের দুদিকেই দেখছি সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত স্তরে স্তরে উঠেছে শৈলশ্রেণীর পিছনে শৈলশ্রেণী। এই নির্জন অরণ্যে ময়ূরের কেকা, নানা পাখীর কলকাকলি, উপরের নীলাকাশ, আশেপাশের বিশাল বনস্পতি শ্রেণী, আমলকী, মহুয়া বাঁশঝাড়, পাহাড়ের অনাবৃত অংশ, গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকা কাঁটা লতা, বটগাছের লম্বমান মোটা মোটা ঝুরি থাকে থাকে নেমে শূণ্যে ঝুলছে, তাতে বনের বিচিত্র শোভা ফুটে উঠছে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল। স্তব্ধ মৌন বনস্পতির মত ধ্যান সমাহিত। ভাবছি, মহামুনি মার্কণ্ডেয় সত্যিই বলেছেন — রুদ্রদেহাদ্ভবো সরিদ্‌বরা নর্মদা স্থাবর জঙ্গম অখিল প্রাণীর উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নয়নভরে উপভোগ করার সময় আমাদের নেই। আমাদের সম্মোহিতের মত টেনে নিয়ে চলেছে মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসা সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর। কখনও সেই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে নর্মদার তট থেকে। কখনও বা মনে হচ্ছে সেই কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র বনাঞ্চলে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ হরানন্দজী বলে উঠলেন — এই কণ্ঠস্বরকে আমি চিনতে পেরেছি। এই কণ্ঠস্বর হল সর্বাত্ম দৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা সোমানন্দজীর। যিনি অহর্নিশ আমাদের সকল অবস্থা সমভাবে লক্ষ্য করে চলেছেন। কিন্তু বারেকের জন্যও হায়, তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ছে না। কিন্তু আমরা যে তাঁর দৃষ্টিপথে আছি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

পাহাড় বেয়ে দুটো ঝাঁকড়া বটগাছের ঝুরি ধরে ধরে কিছুটা সমতল অঞ্চলে উঠে আসতেই দেখলাম হরানন্দজীর কথাই সত্য। রহস্যের ঘনীভূত বিগ্রহ সোমানন্দজী সেই একই শতচ্ছিন্ন পোষাকে। ঝাঁপড়, ঝাঁপড় চুলের ছোট ছোট জটা দুলাতে দুলাতে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছেন। আমরা সকলেই আনন্দে আত্মহারা। সকলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমি দৌড়াতে লাগলাম তাঁকে ধরবার জন্য। কিন্তু পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখি অগ্রগামী সাধু ক্রমশঃ গাছপালা ও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। মনটা খুব দমে গেল। ভেসে এল খিলখিল হাসির শব্দ। এই অবস্থাতেই আমি ক্ষণিকের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল চোখের জল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম তাঁর স্বর গানের সুরে ভেসে আসছে—

গগনে জাগিল মহাকাল।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু ! গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু!
আঁধারে পথ-হারা ভকত কেঁদে সারা,
আকাশে শূল হানি, শোনাও কৃপাবাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী, প্রসীদ শম্ভু।'

আমরা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঝোলা ও গাঁঠরী নিয়ে নতুন উদ্যমে আমরা হাঁটতে লাগলাম। সেখান থেকে প্রায়

সাত-আট মাইল হাঁটার পরেই দূর থেকে একটি মন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরের কাছাকাছি কয়েকটি পাকা বাড়ী, একটু দূরে আরও কিছু বাড়ীঘর দেখতে পেলাম। বেলা প্রায় দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম মন্দিরে। মন্দিরের পুরোহিত আমাদের পূজার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি মন্ত্র পাঠ করছেন —

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব দেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥
সর্ব যজ্ঞ-স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব তীর্থাবলোকায় করুণা-সাগরায় চ॥
পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাঙ্ঘ্রয়ে।
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে সদা॥
নমস্তে জীবনাধিক্যদর্শিনে সুখহেতবে।
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ॥
সদাপরাধক্ষমিণে সুখদায় সুখয়ে চ।
দুর্লভং মনুষ্যমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ

পূজা সাঙ্গ হলে পুরোহিতজী বললেন — এই ঘাট হল বিখ্যাত পিতৃ-তীর্থ বা ব্রহ্মা তীর্থ। এই তীর্থ ঋষি দুর্বাসা তাঁর পিতার আজ্ঞানুসারে স্থাপন করেন। ঋষি এরগুও এখানে তপস্যা করেছিলেন। পিতৃতীর্থ হিসাবে এই স্থানের বিশেষ মর্যাদা।

আমি পুরোহিতজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — ঘাটমেঁ এতনা কাফি ভীড় কেঁও?

— অমাবস্যা কে লিয়ে। ব্রহ্মা তীর্থমেঁ স্নান তর্পণাদিকে লিয়ে আয়ে। আশ্বিন মাহিনামে ইধর পঞ্চাশ হাজার আদমী আয়ে থে, সমুচা আদমী মহালয়াকী পার্বন শ্রাদ্ধ কিয়ে থে।

সাথীরা ইতিমধ্যে জলে নেমে স্নান করতে আরম্ভ করেছেন। আমিও জলে নেমে স্নান করেই তর্পণ করলাম প্রাণভরে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করলাম — তর্পণের কোন উপাচার আমার কাছে নেই। আমার চোখের জল এবং এই নর্মদার এক অঞ্জলি পুণ্যবারি ছাড়া আর কিছুই নিবেদন করার নাই।

কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলাম ঘাট থেকে। আমারই তর্পণাদি সেরে আসতে একটু দেরী হল। এরপর পুরোহিতজী আমাদের কাছে এসে হাতজোড় করে বললেন — আপনারা কী ওঁকারেশ্বর থেকে আসছেন?

হরানন্দজী সহ সকলে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই তিনি বললেন — আজ সকালেই দু'জন সাধু এসে মন্দিরের পিছনের কুটীরে আশ্রয় নিয়েছেন। একজন যুবক, অপরজন অর্ধোন্মাদ। অর্ধোন্মাদ সাধু হেঁয়ালিতে কথা বললেও যাবার আগে বললেন — ওঁকারেশ্বর থেকে একদল পরিক্রমাবাসী এলে তাদের যেন ঐ ঝোপড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাই আমি আপনাদেরকে ঝোপড়ায় নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছি।

আমরা অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে কুটীরে এসে দেখি রঞ্জন বসে আছে। রঞ্জন আমাদের দেখে 'হর নর্মদে' বলে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে আমরা সবাই কাঁদলাম। কারো মুখে কোন কথা সরছে না।

সবাইকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে হরানন্দজী বললেন — এ কয়দিনেই দেখছি তোমার চেহারার বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে রঞ্জন বলে উঠলেন — মা নর্মদাই আমার একমাত্র নিয়তি। গুরুকৃপায় আমার জীবনে ব্রহ্মবিদ্যার রাজপথ খুলে গেছে। আমি নিত্য সেই পথে বিচরণ করি।

মরণে ছিল না ভয়, জীবনে ছিল না সুখ
তোমারে দেখিনি যবে হে মনোমোহন।
এখন জীবন মোর যত দীর্ঘ হোক্ না কো
মনে হয় অতি অল্প, — সুখের স্বপন।

আমি বললাম — প্রেমিক গুরুর কৃপায় প্রীতম-প্রিয়তমের দরশ-পরশ পেলে তার ভেতর বাহির আলো

হয়ে ওঠে —সব কিছু দিব্য আনন্দে ভরে ওঠে। এক মুসলীম সাধক তাঁর সাচ্চা গুরুর কাছে দীক্ষা পেয়ে — দীক্ষাতে তিনি কি লাভ করেছিলেন — তা অনবদ্য ভক্তি স্নিগ্ধ ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন —

'হমনে দর্ পর্দা তুঝে শমশ্‌জবী দেখ্ লিয়া,
অব ন কর পর্দা তু, এ পর্দা নশী দেখ লিয়া,
তেরে দীদার কী থী, মুঝকো তমন্না মো তুঝে।
লোগ দেখেঙ্গে ওহাঁ, হমনে য়েহি দেখ্ লিয়া।
হম্ নজর বাজোঁ মে তু, ছিপ ন মকা জানে জঁহা
তু জাঁহা জাকে ছিপা, হমনে ওঁহী দেখ লিয়া।।'

অর্থাৎ 'তোমায় দেখলুম আমি পর্দার মধ্যে — কোটি প্রকাশমান সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি! আমায় আর পর্দা করো না, পর্দার মধ্যে যিনি বসে রয়েছেন তাঁকে আমি দেখে নিয়েছি, তোমাকে দেখবার ইচ্ছা ছিল কী প্রবল! লোকেরা তোমাকে ওখানে দেখবে, আমি দেখে নিলুম এখানেই। আমার মত নজরবাজের কাছে লুকাতেই পারোনি কোন জায়গায় — যে জায়গায় তুমি গিয়ে লুকিয়ে আছ — আমি সেখানেই তোমায় দেখে নিয়েছি। — দেখে নিয়েছি।'

শিষ্যের মধ্যে যে চৈতন্যশক্তি Latent ছিল, গুরু তা potent করে দেন। সদ্‌গুরু শিষ্যের মধ্যে atomic change এনে দেন। তার সমস্ত system-এ Astral এবং causal plane-এ ঘটে চৈতন্যময় পরিবর্তন। রুদ্ধমুখ গোমুখীর প্রবাহ খুলে যায়, হয় বোধির বোধন, মরু সাহারায় আসে প্রাণগঙ্গার প্লাবন।

'ভিখা ভূখা কোঈ নেহি সবকো মাহিঁ লাল
গিরণা গাঁটরি ন কখুলনে জানে তায়সে কাঙ্গাল।' (ভিখাজী)

কেউ ভিখারি থাকার কথা নয়, 'ভূখা থাকার কথা নয় — সকলের মধ্যেই সেই 'রক্তরাগমণি' আছেন, কেবল তালা খুলতে জানা নেই বলেই কাঙ্গাল। দীক্ষালাভে এই বদ্ধ তালা খুলে যায়, 'রক্তরাগমণি'র দর্শন মেলে।

সাচ্চাগুরুর কাছে যে ভাগ্যবানের দীক্ষালাভের সুযোগ ঘটে — সেই আস্বাদন করে এই নিগূঢ় তত্ত্ব।

এরপর আমরা মহাত্মা রামদাসজী প্রদত্ত ঘি জবজবে চাপাটি দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সারলাম। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা রঞ্জনের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলাম। হরানন্দজী রঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে বললেন — এ জীবনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে কিনা তা বলতে পারছি না। তাই যাবার আগে তোমার মধুর কণ্ঠে একটা গান শুনে যেতে চাই।

রঞ্জন হাসতে হাসতে একতারাটি টেনে নিয়ে গান আরম্ভ করলেন —

কোথা আছে রে, দীন দরদী সাঁই!
পিতৃদেবের ধেয়ান ধরো
খবর পাবে ভাই।
চক্ষু আঁধার ভুলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই।
বসে নিগম ঠাঁই।
অহরহ দেখতে তারে
চেনতে নারো ভুলের ঘোরে
পিতার মাঝে পরমপিতা
চিনতে জানা চাই।

গান শেষ করে একতারাটি মাথায় ঠেকিয়ে রঞ্জন অঝোরে কেঁদে চলেছে। শুধু রঞ্জনই নয়, তার এই গান শুনে আমাদের সকলেরই চোখে জল। ধীরে ধীরে সকলে দাঁড়িয়ে রঞ্জনকে আলিঙ্গন করে মন্দিরে প্রণাম করে, আবার 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা শুরু করলাম। নর্মদা ক্রমেই ক্ষীণকায়া হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।

উপত্যকা অঞ্চল দিয়ে কাঁকুরে পথে হাঁটছি বটে কিন্তু ক্রমে যেন অরণ্যের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। এই কয়দিন যেমন ঘন বসতির মধ্যে ছিলাম, এখন লোকের বসতি যেন ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। দূরে দূরে দু'একটা পল্লী চোখে পড়ছে। প্রায় প্রতি মাইল দূরে দূরে ছোট ছোট জঙ্গল পড়ছে পথে। জঙ্গলের পাশেই চাষযোগ্য জমি। মাঠে মাঠে রবি শস্যের চাষ হচ্ছে, কোথাও কোথাও বিরাট বিরাট আকারের তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি মহিষের গাড়ীতে করে চাষীরা তাদের ঘরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে যে ছোট ছোট বনগুলি অতিক্রম করছি, সেইসব বনে শাল, তেঁতুল, শিরীষ, বেলগাছই বেশী। প্রায় চার ঘন্টা হেঁটে সপ্তমাতৃকা তীর্থে এসে পৌঁছলাম। আমাদের পথে ভালভাবে সূর্যরশ্মি বন ভেদ করে প্রবেশ করতে পারছে না বটে কিন্তু নর্মদার জল রৌদ্রে ঝলমল করছে। উভয় তটের দিকে তাকিয়ে কখন নীলাভ কখনও সবুজ গাছপালার সমারোহ এবং তার বর্ণাঢ্য শোভা দেখে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম — কী সুন্দর! পুরোহিতজী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — সুন্দর নয়, বলুন ভয়ঙ্কর। আমি জিজ্ঞাস করলাম — কেন? পুরোহিতজী বললেন — জানবেন, ঝাড়ি পথে যেখানে সেখানে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে। কোন্ মুহূর্তে কী ঘটবে তা কেউ বলতে পারবে না। আমরা বাইরে বসে নানারকম গল্প করতে লাগলাম। বিকাল পাঁচটা নাগাদ পুরোহিতজী সবাইকে নর্মদা স্পর্শ করে এসে সপ্তমাতৃকার আরতি দেখার আহ্বান জানালেন। মন্দির উত্তরাভিমুখী। মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছেন — ভৈখনাথ, কৌমারী এবং মাহেশ্বরী। পশ্চিমে বারাহী, চামুণ্ডা আর গণেশ মূর্ত্তি। দক্ষিণদিকে রয়েছে — ব্রহ্মাণি, বৈষ্ণবী এবং ইন্দ্রাণী।

পুরোহিতজীর কথা অনুসারে নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। পুরোহিতজী সান্ধ্য আরতি শুরু করলেন। প্রায় এক ঘন্টা ধরে তিনি আরতি করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন — কোন অবস্থাতেই মন্দিরের দরজা যেন রাত্রে না খুলি। গরম লাগলেও না। মন্দিরের উপরদিকে চারটা জানলা আছে ঐখান দিয়েই হাওয়া আসবে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মন্দিরের দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ হয়েছে দেখে এক মিনিটও অপেক্ষা করলেন না। দ্রুতপদে তিনি 'হর নর্মদে' ধ্বনি তুলে নিজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের কর্ণগোচর হতে থাকল।

সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় জপাদি সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। মন্দিরের ভিতর একটা মিষ্ট গন্ধ সবসময়েই বিরাজ করছে। গভীর রাতে আমার ঘুম ভাঙল। জঙ্গলের দিক থেকে কত রকম বড়-ছোট বন্য জন্তুর ডাক ভেসে আসছে। বনের মধ্যে একটানা সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আরও সব বিচিত্র শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে কানে। রহস্যময় বন্য প্রকৃতি যেন জেগে উঠেছে। উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম তারায় ভরা আকাশের দিকে। প্রদীপগুলি নিবু নিবু। সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রস্রাবের বেগে বাইরে যেতে ইচ্ছা হল। উঠে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম প্রেমানন্দও জেগেছে। পা টিপে টিপে কাছে এসে সেও বাইরে যাবার ইঙ্গিত করল। কারো যাতে ঘুম না ভাঙ্গে তাই সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এলাম। আকাশে জ্বলজ্বল করছে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও পশ্চিম আকাশে এক ফালি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। হোমের সৌরভ ভেসে আসছে। আমি ও প্রেমানন্দ নর্মদাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম মন্দিরে। মণ্ডপ গৃহের মধ্যে ঢুকে যে যার আসনে শুয়ে পড়লাম। এবার আমাদের যখন ঘুম ভাঙল তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সূর্যকরোজ্জ্বল সুপ্রভাতে আমরা সপ্তমাতৃকা মন্দির এবং নর্মদাকে প্রণাম করে যে যার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে আবার চলার পথ ধরলাম।

নর্মদার তীরে তীরে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মাইলখানিক এগিয়ে যাওয়ার পরেই আমরা বায়ফল নামক একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে নর্মদার ঘাট খুব সুন্দর ও মজবুত করে বাঁধানো। ঘাটের কাছেই গাছপালায় ঘেরা একটি শিবমন্দির চোখে পড়ল। ঘাটে সকলে ঝোলা গাঁঠরী রেখে নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে, আমাদের ঝোলা, গাঁঠরী ঘাটেই পড়ে থাকল, মন্দির সংলগ্ন বাগানের ফুল দু একটা করে হাতে নিয়ে, কমণ্ডলুতে জল ভরে পূর্বদৃষ্ট সেই শিবমন্দিরে প্রবেশ করে যখন দরজার সামনে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করছি, তখন একজন ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তিনি এসে বম্ বম্ হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরের দরজা খুললেন। প্রায় এক ফুট পরিমিত একটি সুন্দর কালো কুচ্‌কুচে শিবলিঙ্গ মন্দিরের মধ্যে শোভা পাচ্ছেন। শিবলিঙ্গ হতে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে একটি বড় তামার ঝারি। 'আপনারা পরিক্রমাবাসী', আপনাদেরই আগে পূজা করার অধিকার। এই ঝারিতে জল ঢেলে পূজা করুন — এই বলেই

তিনি চন্দন ঘষতে বসে গেলেন। সাতজনের জল ঢালতে ঢালতে তিনি চন্দন কতকটা ঘষে ফেললেন. আমরা সেই চন্দন ও ফুল বাবার মাথায় অর্ঘ্য স্বরূপ দিলাম।

মন্দিরে ক্রমশঃ পূজার্থীরা আসতে আরম্ভ করেছেন। মহাদেবকে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে পুরোহিতজীকে ধন্যবাদ দিয়ে নর্মদাতটে পূর্বমুখে হাঁটতে লাগলাম। তখন দশটা। এরপর একে একে পুনা সংগম, বলবাড়া গ্রাম, ছোটা তবা গ্রাম অতিক্রম করে, বলভী গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। পাহাড় অঞ্চলের বিচিত্র সব গাছ দেখতে দেখতে দ্রুতবেগে আমরা হেঁটে চলেছি। এখন দূরে দূরে চাষযোগ্য আবাদী জমি এবং লোকজনের বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছে না। নর্মদার দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখলাম, নর্মদা আবার বাঁক নিয়ে বয়ে চলেছেন। আমাদের পথঃ ক্রমশঃ উচ্চতর হতে নিচু স্তরে নেমে গেছে। হঠাৎ দেখি আমাদের সামনের পথ অবরুদ্ধ। বড় বড় বাঁশ দিয়ে গেট তৈরী করা হয়েছে। গেটের গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা — সংরক্ষিত বনাঞ্চল। জেলা - নিমাড়। সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বনাঞ্চলে প্রবেশের জন্য বন আধিকারিকের অনুমতি প্রয়োজন। গেটের পিছনেই পুলিশ চৌকী। এদিকে দেখছি, শাল তেণ্ডু এবং খয়ের গাছেই বেশী। ঝড়্ঝড়্ শব্দে গোটা তিনেক বুনো শিয়াল দৌড়ে গেল একটা বড়সড় আকারের খরগোসকে তাড়া করে। আমাদের হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিশ চৌকীর দু জন পুলিশ এগিয়ে এসে আমাদের 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে প্রশ্ন করল — আপলোগ্ পরিক্রমাবাসী বা! তব আপলোগোকে লিয়ে অনুমতিকা জরুরৎ নেহি। আপলোগ্ ইধারসে যা সকতে হো, বলেই গেটটা খুলে দিল। আমাদের কথোপকথনের মাঝখানে আর একজন এগিয়ে এসে জানাল — বলকেশ্বর ঘাট ইহাঁসে নয় মীল হ্যায়। বলকেশ্বর ঘাট জানেকা দো মার্গ হ্যায়। এক মার্গ এহী নর্মদাকে কিনারে কিনারে জাতে হ্যায়। এহী মার্গমেঁ অন্নকষ্ঠ, ক্রূর শ্বাপদকা ভয়, পথর ঔর ঝাড়ী পার করনা পড়তী হ্যায়। দুসরী মার্গ পাঁচশ ফুট উঁচু পাহাড়িয়া ঔর ঘন জঙ্গলকা হ্যায়। তিন রাত্রি নর্মদাজীকা প্রত্যক্ষ দর্শন নহী হোতা। পরিক্রমাবাসীয়োঁনে নর্মদা জল আপনে সাথমে লেকর চলতে হ্যায়। জো আপলোগোকা মর্জি। অব যাত্রা করনা ঠিক নহী হ্যায়। সাম হোনেমেঁ দের নহী হ্যায়। আপলোগ্ আজ রাত্রিকে লিয়ে ইধর ঠার সকতে হ্যায়।

এই বলে তারা আমাদেরকে একটি কুটীরের সামনে এনে দরজা খুলে দিল। আমরা ঘরে ঢুকে যে যার মত করে আসন বিছালাম। আমি হরানন্দজীকে বললাম — কোন পথ দিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। হরানন্দজী কিছু বলার আগে প্রেমানন্দ বলে উঠল — মাকে চোখে চোখে রেখেই যাত্রা করব। 'জো রচিয়া সোই হোগা'। অর্থাৎ ঈশ্বর যা ঘটাবেন তাই ঘটবে।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম — ভাল রাস্তা, পাকা রাস্তার জন্য নর্মদা তট ছেড়ে যাব না। মুণ্ডমহারণ্য, ওঁকারের ঝাড়ি, লাখড়াকোটের ও সীতাবনের মহাজঙ্গল এবং মহা ভয়ঙ্কর শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করে এসেছি। কাজেই সুখকর পথের লোভে আমি নর্মদা মাতার কোল ছেড়ে অন্য পথে পা বাড়াবনা।

বাইরে বেরিয়ে দেখি পুলিশ চৌকির ঘড়িতে ৪টা বেজেছে। সূর্য তখন পাটে, অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিমাভাতে নর্মদার ধারাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কালো জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

একজন পুলিশ আমাদের ঘরে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেল। ৫টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠল নানা পাখীর কলকাকলিতে। অর্থাৎ পাখীরা যে যার ঘরে ফিরে আসছে। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে এসে জপে বসলাম। হরানন্দজী বললেন — কাল খুবই লম্বা সফর। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাক বলেই তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও শুয়ে পড়লাম।

আমাদের যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখি চৌকীর ঘড়িতে সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে। তড়িঘড়ি নিজেদের কম্বল, গাঁঠরী বেঁধে রেখে প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদায় গেলাম স্নান করতে। আকাশে তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। পুলিশ চৌকীর লোকজনকে সুক্রিয়া জানিয়ে হর হর বম্ মহাদেও, হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললাম নর্মদার ধারে ধারে। এই ঝাড়ি পথ প্রস্তর এবং কঙ্করময়। পথের চারিদিকে শাল অর্জুন বিল্ববৃক্ষ ত আছেই, তাছাড়াও আছে তিন্দুক, পাটল শমী, পুন্নশে, নারকেল ও খাদির গাছ। একই ঝাড়ি পথ। পথ বলতে কিছু নাই। উঁচু নীচু পাথর ডিঙিয়ে লাঠির সাহায্যে হেঁটে চলেছি। মাইলের পর মাইল কোথাও কোন লোকবসতি নাই। মাইলের পর মাইল কেবল গহন গভীর অরণ্য। নয়নলোভন প্রকৃতির মাঝে নীরবেই হাঁটতে লাগলাম, নীরবে না হেঁটে কোন উপায়ও ছিল না। পথের মধ্যে এত নুড়ি পাথর যে একটু অসতর্ক হলেই ঠোক্কর খাবার সম্ভাবনা পদে

পদে। পথের উপর কোথাও কোথাও আবার কাঁটা ঝোঁপ। লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে। আমরা আবার চড়াই এর পথে উঠছি, কোন পথরেখা নাই বললেই চলে। কেবল দেখছি, দুধারে নিবিড় বনানী, অজস্র রকমের মোটা মোটা লতা আর বনের ফুল। বন-প্রকৃতি এখানে লীলাময়ী, আপন সৌন্দর্য্যে আত্মহারা। একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়লাম। আমাদের চলার পথের উভয়দিকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত জায়গা বেশ ফাঁকা মনে হল। বনের গাছপালা হঠাৎ যেন প্ল্যান করে যুক্তি করে এই একটা জায়গা ফাঁকা রেখে সারি সারি থমকে দাঁড়িয়েছে। আন্দাজ করলাম ন'টা সাড়ে ন'টা বাজে। চড়াই-উৎরাই করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রামের প্রয়োজনে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে বসলাম।

আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফাঁকা প্রান্তের শেষে এক ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, যেখানে দিনের আলো আদৌ দেখা যাচ্ছে না। পথ ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার। আমাদের সঙ্গে কোন আলো বা টর্চ নেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পাকদণ্ডী বেয়ে হাঁটতে লাগলাম। যেন এক অন্ধকারময় প্রেতপুরীতে আমরা ঢুকে পড়েছি। কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। যতই এগোচ্ছি, তত জঙ্গলকে আরও ভয়ঙ্করভাবে ঘন মনে হচ্ছে। বড় বড় গাছের ডালপালা লতাপাতা যেন পাকদণ্ডীর পথকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে, পাকদণ্ডী যেন শেষ হতেই চায় না। প্রায় এইভাবে যে কতক্ষণ হেঁটেছি তা নির্ণয় করা কঠিন। গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে নর্মদাকে দেখা যাচ্ছে। নর্মদাকে দেখতে পেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ এল। এইভাবে আরো কিছুক্ষণ চলার পর পাকদণ্ডী শেষ হল। অন্ধকার হতে এসে পৌঁচেছি আলোতে। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের খর উত্তাপ গায়ে লাগছে। মনে এল স্বস্তি। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। গরমের জন্য নানা লতা-গুল্মে পাথরের চাঙড়গুলো ঢাকা থাকলেও, লতাপাতাগুলি শুকিয়ে গেছে। হরানন্দজী আস্ফালন করতে লাগলেন — এরকম পথ জানলে কি আসতুম! মাথায় থাকুন মা নর্মদা!

একটি সেগুন বনের জটলা পেরোতেই একটি বেলগাছের তলায় একটি পাথরের শিবমন্দির দেখতে পেলাম। মন্দিরের শিবলিঙ্গটি দেখে আমি স্তম্ভিত। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ। কচ্চিৎ কদাচিৎ পরিক্রমাবাসীরা এপথে এলে পূজা করেন। কোন গৃহীর পক্ষে এখানে এসে নিত্যপূজা করা সম্ভব নয়। হয়ত সূক্ষ্ম লোকাচার কোন দেবতা বা মহাপুরুষ সূক্ষ্ম দেহধারণ করে পূজা করে থাকেন। নতুবা এই মহাদেব অপূজিত অবস্থাতেই পড়ে থাকেন বলে মনে হয়। তবুও লিঙ্গের জেল্লা চেয়ে দেখার মত। ঝকমক করছেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্ত্রপাঠ করে শিবলিঙ্গের মাথায় কমণ্ডলু হতে নর্মদার জল ঢাললাম। মন্দিরের বাইরে দেখি মন্দিরের পাশেই একটি বড় বটগাছ। বটের ঝুরি মন্দিরকে চারধার দিয়ে ঘিরে রেখেছে। মন্দিরের পাথরে পুরু শেওলা, বটগাছের শিকড় মন্দির গাত্র ভেদ করে দেওয়ালের ভিতর ও বাইরে চারিয়ে গেছে। মন্দির গৃহের বাইরে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের বড় বড় সাইজ করা পাথর দেখে অনুমান করলাম, কোনকালে হয়ত বিশাল শিবমন্দির ছিল। মণ্ডপ, ভোগগৃহ, নাটমন্দির ইত্যাদি ছিল। শিবের ঘর বলে যেটি দেখতে পাচ্ছি, এইটা হয়ত ছিল সেই বিরাট শিবমন্দিরের গর্ভগৃহ। এইটুকুই শুধু টিকে আছে, আর সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। মন্দিরের দরজাও নেই। বৃষ্টি হলে এ ঘরে জল ঢোকে, দেওয়াল বেয়ে জলও পড়ে। মহানন্দস্বামী বললেন — আজ আর না এগোনই ভালো। পরিক্রমা পথে কয়দিন বেশ ভাল আহার জুটলেও আজ আমাদের কমণ্ডলুর জল খেয়েই কাটাতে হবে। মা নর্মদাকে দেখা গেলেও মা আমাদের থেকে বেশ দূরে আছেন। আর পথও বেশ জঙ্গলাকীর্ণ। প্রত্যেকে বটগাছের ছাওয়ায় বিশ্রাম করতে বসলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মুক্ত আকাশের তলায় নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি এতগুলি প্রাণী। এই নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়ে যখন দুর্গম মহারণ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, তখন একবার দুবার নয়, বহুবারই অভাবনীয় রূপে আমি রক্ষা পেয়েছি। তার ফলে নিজ গুরু ও ইষ্টে আমার অচলা ভক্তি জন্মেছে। তাই এই নির্জন বনে আমার মনে কোন ভয় আসছে না। অন্ধকারে কেউ কাউকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তবুও অনুমান করলাম, সকলেই নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপে নিরত আছেন। রাত্রি প্রায় ন'টা সাড়ে ন'টা হবে। জপ সেরে উঠে হরানন্দজী বলে উঠলেন — এত অন্ধকারের মধ্যে কাছেই জঙ্গল থাকলেও শিবমন্দির থাকায় বুকে ভরসা জেগেছে। উনিই আমাদের প্রহরী। নিশ্চিন্তে রাত্রে ঘুমাতে পারবো। আমরা তো মা নর্মদার কোলেই আছি। এই বলে 'জয় গুরু, হর নর্মদে' বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন। একে একে সকলের সঙ্গে আমিও শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে

ভাবতে লাগলাম, নর্মদার উত্তরতটে করপাত্রীজীর কাছে শুনে এসেছি শিব ও নর্মদার মধ্যে কোন ভেদ নাই। নর্মদার পূজা করলেই শিবের পূজা হয়। নিরাকার পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের নীরাকার রূপ হলেন নর্মদা। এই অভেদ দৃষ্টি ও অদ্বৈত বোধই সাধনার চরম অনুভূতি সন্দেহ নাই। আমি করপাত্রীজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৫টা নাগাদ সবাই উঠে পড়েছি। আমাদের জিনিষপত্রও বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেছে। আমরা প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলাম। দিনের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। মহাদেবকে প্রণাম করে সাতটা নাগাদ হর হর বম্ মহাদেও, হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা শুরু করলাম। আকাশে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সূর্যদেবকে দেখা যাচ্ছে। আমরা ঝাড়িপথে হেঁটে যাচ্ছি। রাস্তার দুপাশে গাছপালার আধিক্য বেশী। তবে পথের উপর বড় বড় পাথরের আধিক্য কম। হাঁটতে বেশী কষ্ট হচ্ছে না। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমরা কিন্তু ক্রমশঃ একটু একটু করে আরও ঘন জঙ্গলপথে প্রবেশ করছি বলে মনে হচ্ছে। পার্বত্যপথ ক্রমেই কঠিন হতে কঠিনতর হচ্ছে। বড় বড় শাল, সালাই, কেঁদ, হরিতকী গাছের সংখ্যা আমাদের সংকীর্ণ চলার পথকে ক্রমশঃই ঢেকে ফেলছে বলে মনে হল। এইরকম পথে প্রায় তিনঘন্টা হেঁটে নর্মদার মূল ধারার কাছে চলে এলাম। পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখলাম নর্মদার কিনারে কিনারে ঘনঘোর জঙ্গল চলে গেছে মাইলের পর মাইল ব্যেপে। মনে হচ্ছে জঙ্গলের এই অংশ মুণ্ডমহারণ্যের দুর্গমতম এবং ভয়ঙ্করতম অংশ। নর্মদাকে কাছে পেয়ে আমরা নর্মদাতে স্নান করতে নামলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে ধড়াচূড়া পরে আমাদের যাত্রা শুরু হল। হরানন্দজী হাসতে হাসতে বললেন — এই ভয়ঙ্কর ঝাড়ি অতিক্রম না করা পর্যন্ত আমাদেরকে নর্মদার জল খেয়েই জীবন ধারণ করতে হবে।

কভি দুধ ছানা কভি শক্করপানা।
পুরী লাড্ডু কভি চানা চিবানা॥

এটাই হল পরিক্রমাবাসীদের জীবন। পরিক্রমাবাসীরা এইরকম জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় বলেই নর্মদা পরিক্রমার মত দুশ্চর কঠিন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে। যতই এগোতে লাগলাম ততই জঙ্গলের পর জঙ্গল। দুদিনে এতটা পথ অতিক্রম করে এসেছি, মাঝে মাঝে দু'একটা চিতল হরিণ, বন্য বরাহ, খরগোশ ছাড়া অন্য বন্যজন্তুও চোখে পড়ছে না। ওঁকারের ঝাড়ি দেখে এসেছি, সীতামায়ীর বনও ভয়ঙ্কর, শূলপাণির ঝাড়িও ভয়ঙ্করতম কিন্তু কোথাও এইরকম ঘনঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হয়নি। এখানকার পায়ের নীচের পার্বত্যপথ বড়ই কর্কশ। পায়ে মাঝে মাঝে সূঁচ ফোটার মত করে বিঁধছে। আমাদের একমাত্র ভরসা মা নর্মদা সর্বদাই আমাদের চোখে চোখে রয়েছেন।

কতক্ষণ পরে মনে হল জঙ্গল তুলনামূলকভাবে কিঞ্চিৎ পাতলা হয়েছে। কারণ সূর্যের কিরণ কোথাও গাছপালা ভেদ করে ক্ষীণ রশ্মির আকারে এসে পড়ছে। একটু একটু করে আমরা সূর্যালোকের মধ্যে এসে পড়লাম। সূর্যকে দেখতে পেলাম মাথার উপর। আঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ! এ হচ্ছে অন্ধকার হতে আলোয় ফেরার আনন্দ। মধ্যাহ্ন সূর্যের খরতাপকে এতই মধুর লাগছে যে আমরা সবাই উৎফুল্ল হয়ে তা সর্বাঙ্গ দিয়ে লেহন করছি। এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি কেন বৈদিক ঋষিরা সূর্য বন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন — 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম কেন শতকরা ৯৯ জন পরিক্রমাবাসী এই ঝাড়িপথ পরিত্যাগ করে পাহাড়ের উপর দিয়ে দুই দিনের পথ তিনদিনে অতিক্রম করেন। আমরা পূর্বদৃষ্ট সেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম।

এই সময় প্রেমানন্দ বললেন — সামনে নর্মদার জলের মধ্যে অতি প্রাচীন যে শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে, মনে হয়, ওরই নাম বলকেশ্বর শিবমন্দির। মহারাজা বলী এই বলকেশ্বর শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন।

সবাই ঝোলা কম্বল নিয়ে উঠে পড়লাম। শিবমন্দিরটি নর্মদার তট হতে প্রায় চল্লিশ হাত দূরে। কিন্তু পা ফেলতে গিয়ে দেখি ব্যথার জন্য পা ফেলতে পারছি না। সকলেরই একই অবস্থা। নর্মদা কিনার হতে অতিকষ্টে আবার সেই কঠিন পার্বত্যপথে ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে চড়াই এর পথে উঠতে লাগলাম। এখানটায় জঙ্গল তুলনায় কিছুটা পাতলা। আমরা পরস্পরকে ধরে মন্দিরে উঠে গেলাম। মন্দিরের চূড়া কবেই ভেঙে পড়েছে। কিন্তু দরজাটা নূতন ও শক্তপোক্ত। মন্দির হতে কিছুটা দূরে দেখলাম পড়ন্ত বিকালের নরম রোদে

একপাল চিতল হরিণ, বার্কিং ডিয়ার ও বাইসন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর হাজার একটা পাখি। তার মধ্যে সাদাকালো ডোরাকাটা লম্বা লেজের এক ধরণের পাখী আমাদের মন কেড়ে নিল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাখীর লেজ নাচানো দেখছিলাম।

বিকাল তখন সাড়ে তিনটা চারটে হবে। হঠাৎ নজর গেল মন্দিরের বাঁদিকে প্রায় দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁশুটে রঙা ঘাসের মধ্যে সোনালী চমক। আমি সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলকে নিয়ে মন্দিরের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। শিবমন্দিরের বাঁদিকের জানলা খুলে দেখি ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। বুক ঢিপঢিপ করছে।

হরানন্দজী ফিস্‌ফিস্ করে বললেন — চিতা! দেখুন একটা নয় একসঙ্গে চারটে। মা এবং প্রায় সাবালক তিনটি শাবক। ঘাসের মধ্যে গা ডুবিয়ে সর্তক ভঙ্গীতে এগোচ্ছে শিকারের সন্ধানে। শাবকগুলি একইভাবে মাকে অনুসরণ করছে। এবার একটা বড় পাথরের উপর এসে উঠে দাঁড়াল মা চিতা বাচ্চাগুলিও মায়ের গা ঘেঁসে পাথরের উপর উঠে দাঁড়াল। সোনালী চামড়ার উপর কালো বুটি। তার সবল পেশীতে ফুটে উঠছে যেন নৃত্যের সুষমা। চিতাগুলির দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে মনে হল চিতার লক্ষ্য চিতল হরিণ। কিন্তু না! মা চিতা হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে গা-ঢাকা দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোতে আরম্ভ করল বাইসনগুলির দিকে। মনে হয় হরিণের গতি ও চিতার গতি ঘন্টায় ৫০ মাইল হলেও হরিণ একটানা দৌড়তে পারে কিন্তু চিতার অতক্ষণ দৌড়বার ক্ষমতা নাই। পাছে শিকার ফস্কে যায় তাই সুচতুর চিতা লক্ষ্য পরিবর্তন করে ঘাসের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোতে আরম্ভ করেছে। চিতা এগিয়ে চলেছে সন্তর্পণে। হঠাৎ চিতাটি লাফিয়ে গিয়ে পড়ল বাইসনদের মধ্যে। যে বাইসনটা লক্ষ্য করে চিতা ছুটছে, সেই পালাচ্ছে প্রাণভয়ে। মনে হচ্ছে চিতাটি বাতাসে ভর করে উড়ে যাচ্ছে। মাটি স্পর্শ করছে না তার পা। হঠাৎ বাইসনটি তার শিং বাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু চিতাটি তার বেগ সামলাতে না পেরে কিছুটা এগিয়ে গেল। তারপর চিতাটি ফিরে আসতেই আমরা দেখলাম এক লোমহর্ষক বাইসন ও চিতার লড়াই। দুজনেই রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ বাইসনটি তার সরু সূচালো শিঙটা ঢুকিয়ে দিল চিতার পেটে। কিন্তু তাতেও সে থামবে না। বীভৎস! বীভৎস! এ দৃশ্য! আস্তে আস্তে থেমে এল এই অসম লড়াই। তারপর দেখলাম দুজনেই দুদিকে ছিটকে পড়ল। বাইসনটা কয়েকবার উঠবার চেষ্টা করল। কয়েকবার ঘড়ঘড়ে আওয়াজে ডেকে উঠল। কিন্তু চিতার দেহ নিথর, নিষ্পন্দ। তারপর সব চুপচাপ। এবার যে পাথরের উপর বাচ্চা চিতাগুলি দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখি তারাও উধাও। আমাদের হাঁফ ছাড়ল। আমরা সবাই ঘেমে নেয়ে গেছি। শরীর, হাত, পা সবই অবশ। ঘটনার বীভৎসতা ও প্রচণ্ডতা আমাদের বিহ্বল করে তুলেছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। জল খাওয়ার জন্য কমণ্ডলুর দিকে যেতে গিয়ে পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণ পরে কতকটা সামলে নিয়ে কমণ্ডলুর সমস্ত জলটাই ঢকঢক করে গিলে ফেললাম। যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। আমার সঙ্গীদের কোন সাড়া পাচ্ছি না। সকলের অবস্থা তথৈবচ। সবাইকে কমণ্ডলুর জল পান করালাম। কিছুক্ষণ পরে হরানন্দজী কাঁপা কাঁপা গলায় রব তুললেন — হর নর্মদে, হর নর্মদে, হর নর্মদে।

আজ আর জপে মন নেই। কোনক্রমে নিজেদের গাঁঠরী খুলে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি বাড়ছে। গভীর রাত্রে অরণ্যের ভাষা মুখর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই নানা শব্দ কানে ভেসে আসতে থাকল। রাত্রিচর কোন পাখীর ডাক শুনতে পেলাম। মিষ্টি সুর। আশ্চর্য, সারাদিন দেহেমনে এত পরিশ্রম হয়েছে কিন্তু ঘুম আসছে না কেন? চোখ খোলা রেখেই আমি ধ্যানে ডুববার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন একটা সুরেলা ধ্বনি বা তান গমকে গমকে যেন ঊর্ধ্বের দিকে উঠে যাচ্ছে। একটা অস্বাভাবিক আনন্দ আমাকে পেয়ে বসল।

সকালে জেগে উঠলাম। মন্দিরের বারান্দায় বসে বসে দেখলাম ভুবন প্রকাশক উদিত হচ্ছেন, সাতপুরার শীর্ষদেশে; তাঁর রশ্মিছটার আলোয় আলোয় সব কিছুকে ফুটিয়ে তুলছেন, প্রকাশ করছেন। দূরে চিতা ও বাইসনের দেহকে ঘিরে ধরেছে শকুনির দল।

প্রায় ৮টা নাগাদ যাত্রা শুরু করলাম। প্রায় আরো দু মাইল হাঁটার পর উৎরাই-এর মুখে এসে পৌঁছলাম। সাবধানে পা ফেলে ফেলে নামতে লাগলাম ঢালুতে। একটু অসাবধান হলে গড়িয়ে পড়তে হবে খাদের মুখে। বনের প্রকৃতি ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর কিন্তু বড় বড় বনস্পতির আর দেখা মিলছে না।

প্রায় আধঘন্টা উৎরাই-এর পথে হাঁটার পরে আমরা মোটামুটি সমতল প্রান্তরে নেমে এলাম। সামনেই মা নর্মদাকে দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ দুর্গম বনপথে হাঁটছিলাম তখন ডানদিকেই তাঁর জলধারা দেখতে পাচ্ছিলাম। এখন সামনে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখছি নর্মদা বন পাহাড় ভেদ করে বক্রযান গতিতে সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ অঞ্চলে দেখছি, পাহাড় ফাটিয়ে তার খাঁজে খাঁজে বহু চাষযোগ্য জমি বের করা হয়েছে, তাতে চাষবাস হচ্ছে কোন কোন জমিতে গম জোয়ার ভুট্টার গাছ দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আমরা নর্মদার কিনারে এসে পৌঁছল্যম নর্মদার পবিত্রধারাকে স্পর্শ ও প্রণাম করে আমরা পূর্বদিকে বাঁক নিতেই দূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম, শিবমন্দিরটি পাথরের তৈরী, পোতার উপর একটা বড় হলঘর। হলটা দেখলেই বুঝা যায় বেশ পুরাতন দরজা জানলাও নেই। থাকলেও তা খসে পড়ে জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা আমাদের ঝোলা গাঁঠরী একস্থানে রেখে সবাই মিলে ঘাটে স্নান তর্পণাদি করতে বসলাম। আজ আমরা তিনদিন অভুক্ত। নর্মদার জল ছাড়া কিছুই জোটে নি। তা বলে আমাদের ক্ষিদেও নেই, শরীরে ক্লান্তিও নেই। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, বিচার করতে লাগলাম — এই পরিক্রমাপথে পরিক্রমাবাসীদের তপ জপ ও বিভিন্ন সাধুসঙ্গ ও নূতন নূতন জ্ঞানলাভ ছাড়াও যে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে পড়ে স্বতঃই যে শম দম ত্যাগ তিতিক্ষা হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্রতিপদে যে ঈশ্বর নির্ভরতা বাড়ছে, সঙ্কটকালে যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি, নিজেকে একান্ত অসহায় ভাবছি, তখন যেভাবে আচম্বিতে অভাবনীয়ভাবে রক্ষা পাচ্ছি, হঠাৎ হঠাৎ যেভাবে দরদী সঙ্গী ও সাথীরা জুটে যাচ্ছেন তাতে স্পষ্টতই মনে হচ্ছে কেউ যেন আড়ালে থেকে রক্ষা করছেন। কেবলই মনে হচ্ছে নর্মদা মাতা রক্ষা করছেন, নর্মদেশ্বর শিব রক্ষা করছেন। এই শরণাগতির ভাবটাই এই পরিক্রমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

বেলা তখন প্রায় একটা। এমন সময় পূর্বদিকের জঙ্গল হতে শিঙা ডম্বরু এবং শঙ্খের তূর্যনিনাদ ভেসে এল। গৈরিক পতাকা হাতে নিয়ে একদল সন্ন্যাসী আসছেন এই পথে। বোধহয় পরিক্রমাবাসীর দল। বহুলোকের মিলিত কণ্ঠে 'হর নর্মদে' ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছে। প্রায় ত্রিশজনের দল এসে পৌঁছলেন এই শিবমন্দিরে। তাঁরা মহাদেবকে প্রণাম করে নর্মদার ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি কর্পূর জ্বালিয়ে আরতি করলেন মন্ত্র পাঠ করতে করতে। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অপরাপর সন্ন্যাসীরা গাইলেন —

নিরাশকস্যাপি ন তাবদুৎসহে নর্মদা! হাতুং তব পাদপঙ্কজম
রুষা নিরস্তোহপি শিশুস্তনন্ধয়ঃ ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি। হর নর্মদে হর।

হে নর্মদা! তুমি তাড়িয়ে দিলেও তোমার পাদপদ্ম ত্যাগ করতে মন চায় না। কারণ, মাতা রোষ বশতঃ স্তন্যপায়ী শিশুকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেও সে কখনও মায়ের চরণ ত্যাগ করে না।

আরতির শেষে তাঁরা সবাই তাঁদের নির্দিষ্ট ছাউনীর ভিতর গিয়ে ঢুকলেন। ব্রহ্মচারীরা কাঠ সংগ্রহ করে উনুন জ্বালিয়ে রুটি তৈরী করতে লাগলেন। আমরা আগন্তুক সন্ন্যাসীদের পূজার জন্য মন্দির ছেড়ে দিয়ে ঘাটে এসে বসলাম। এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী আমাদের কাছে বিনীত কণ্ঠে বললেন — গুরুদেব আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, সারাদিন হেঁটে এসে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নতুবা তিনি নিজে আসতেন। আমরা ব্রহ্মচারীজির সঙ্গে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম —

— আপনার গুরুদেবের নাম কী? আপনারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?

— আমাদের গুরুদেবের নাম রঙ্গনাথাচার্য মহারাজ। আমরা রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীযামুনমুনি দক্ষিণ ভারতে শ্রীসম্প্রদায়ের তথা রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

আমরা ব্রহ্মচারীটির সঙ্গে গিয়ে ছাউনীতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, যে বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু নর্মদাতটে কর্পূর জ্বালিয়ে আরতি করছিলেন তিনি একটি কার্পেট আসনে উপবিষ্ট। পিছনেই রয়েছে একটি বড় তৈলচিত্র। তাতে লেখা শ্রীযামুনমুনি। বৃদ্ধ সাধুর সামনে প্রায় ১০ জন সাধু সমকায়শিরোগ্রীব অবস্থায় উপবিষ্ট। নমো নারায়ণায় শব্দে আমাদের সঙ্গে অভিবাদন প্রত্যাভিবাদনের পর হরানন্দজী বললেন — আমরা কাশীর কামরূপ মঠের দণ্ডী সন্ন্যাসী। আমাদের গুরুদেব ভোলানন্দ তীর্থ মহারাজের আদেশে নর্মদা পরিক্রমা করছি। আর শৈলেন্দ্রনারায়ণজী উত্তরতট পরিক্রমান্তে দক্ষিণতট পরিক্রমা করতে করতে দক্ষিণতটে কোটিনারের কোটেশ্বর তীর্থে যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন আমাদের দেখা হয়, সেই থেকে একসঙ্গেই আছি। ইনি এঁর পিতাঠাকুরের

আদেশেই তাঁর দেহান্তের পর জলেহরি পরিক্রমার শপথ নিয়ে পরিক্রমা করছেন। কাল সকালেই আমরা যাত্রা করব। রঙ্গনাথাচার্যজী আমাদের তাঁর সামনের ফরাসে বসার অনুরোধ করলেন। যে ব্রহ্মচারী ডেকে এনেছিলেন তাকে কিছু ইঙ্গিত করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ভোজন পরিবেশন করা হল। রুটি, দুধ এবং এক ধরণের সুমিষ্ট ফল। খুবই তৃপ্তির সঙ্গে ভোজনের পর আমরা বিশ্রামস্থলে ফিরে এলাম। আসার সময় সাধুজী আমাদের সন্ধ্যাবেলায় তাঁর ছাউনীতে আবার আসার অনুরোধ জানালেন।

সন্ধ্যার মুখে বেশ কয়েকটি গ্যাস বাতি জ্বেলে বনভূমিকে আলোকিত করা হল। কয়েকজন ব্রহ্মচারী ত্রিশূল ও লাঠি হাতে ছাউনী পাহারা দিতে লাগল। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে সান্ধ্যক্রিয়ায় বসলাম। সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হতে দেখলাম আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য সকালের সেই ব্রহ্মচারী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা তাঁর সঙ্গেই সাধুজীর ছাউনীতে এলাম। বৃদ্ধ সাধু কর্পূরদানিতে কর্পূর নিয়ে আরতি করতে করতে বলছেন —

তবামৃতস্যন্দিনি পাদপঙ্কজে নিবেদিতাত্মা কথমন্যদিচ্ছতি ?
স্থিতেঽরবিন্দে মকরন্দ নির্ভরে মধুব্রতো ন ক্ষুরকং হি বীক্ষতে॥

তোমার অমৃতস্রাবী পাদপদ্মে যাঁর মন একবার সন্নিবিষ্ট হয়েছে তিনি কি আর অন্য কিছু ইচ্ছা করেন? কারণ মধুকর মধুপূর্ণ পদ্ম ফেলে কবে তিলফুলের দিকে চেয়ে দেখেছে।

তদহংত্বদৃতে ন নাথবান্ মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ ন চ।
বিধি নির্মিতমেতদণ্বয়ম্ ভগবন্ পালয় মাস্ম জীহপঃ॥

তুমি ভিন্ন কেউ আমার প্রভু হতে পারবে না। আমি ভিন্ন কেউ তোমার দয়ার পাত্র হবে না। এটা বিধি নির্দিষ্ট। এ বিধান তুমি নাও। পরিত্যাগ করো না।

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততোদয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥

নাথ! আমার বিজ্ঞাপন শ্রবণ করুন, মিথ্যা বলছি না। যদি তুমি আমার প্রতি সদয় না হও, তাহলে এরকম দয়ার পাত্র আর কোথাও পাবে না।

ননু প্রপন্ন সকৃদেবনাথ তবাহমীতি চ যাজমানঃ।
তবানুকম্প্যঃ স্মর তৎপ্রতিজ্ঞাং মদেকবর্জ্জং কিমিদং ব্রত তে॥

শরণাগত ব্যক্তি একবার মাত্র 'আমি তোমার' বলে প্রার্থনা করলে সে তোমার দয়াপাত্র হবে — এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর এবং বল — ইহা কি আশা ভিন্ন অন্য সকলের প্রতি খাটবে — এইরকম ব্রত তুমি করছ?

অভূতপূর্বং মম ভাবি কিংবা সর্বং সহে মে সহজং হি দুঃখম।
কিন্তু ত্বদগ্রে শরণাগতানাম্ পরা ভবো নাথ ন তেঽনুরূপঃ॥

যদি কোন অভূতপূর্ব দুঃখ এসে উপস্থিত হয়, সহ্য করব। কেননা দুঃখ আমার চিরসহায়। কিন্তু আশ্রিত সম্মুখে বিফল হলে তা তোমার অনুরূপ হবে না।

স্তব পাঠ শেষ হল। বৃদ্ধ সাধুর দু'চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সাধুর চোখের দৃষ্টি ক্রমেই অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এ দৃষ্টি আমি চিনি। তাই সকলে জাপটে ধরে ফরাসের উপর বসিয়ে দিলাম। দু' তিন মিনিট পরে তিনি ধাতস্থ হলেন।

সবাই আমরা চুপচাপ বসে আছি। সাহস করে জিজ্ঞাসাই করে বসলাম — আপ্‌কা ইহ্ শরীরকা উমর ক্যাতনা হুয়া জী?

—'শ সাল উমর হোগা। ম্যায় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হুঁ।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — যামুনমুনির নাম আমি পূর্বে শুনি নি। আপনি দয়া করে আপনাদের শ্রীসম্প্রদায় ও যামুনমুনির সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।

রঙ্গনাথাচার্যজী — শ্রীসম্প্রদায় ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অতি সুপ্রাচীন। স্মরণাতীতকাল হতে এই মত সম্প্রদায়বদ্ধ অবস্থায় আর্যাবর্তে বিরাজমান ছিল। ব্রহ্মসূত্র রচিত হবার পূর্বেও এই মত ঋষি সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত ছিল। তারপর আর্যাবর্ত হতে এই সম্প্রদায়ের এক শাখা দাক্ষিণাত্যে যান এবং এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বাপর

যুগের প্রারম্ভে তামিল ভাষায় *আলোয়ারগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমত মূলক বহু ভক্তিগাথা রচনা করেছিলেন। তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হলেন পোইহে আলোয়ার বা সারযোগী। ইনি কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের অবতার বলে প্রসিদ্ধ।

এঁর পরবর্তী আলোয়ারগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন শঠারি, যিনি ৩১০২ খৃঃ পূর্বাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি নীচকুলে জাত হলেও ভক্তিপ্রভাবে সকলের পূজ্য হয়েছিলেন। শঠারি প্রণীত প্রবন্ধগুলি শঠারি সূক্ত বা তামিল-বেদ নামে প্রসিদ্ধ। নাথমুনি, যামুনাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ গুরুমুখে এঁর প্রবন্ধগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন বলে অতি প্রাচীনকাল হতেই এই তামিল বেদ শ্রীসম্প্রদায়ে সমাদৃত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শব্দের অর্থ নির্ণয় করলে দেখা যায় বিশিষ্ট অর্থে চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম। আর দ্বৈত অর্থে ভেদ, অদ্বৈত অর্থে অভেদ বা একত্ব। বাদ অর্থে সিদ্ধান্ত। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত কথাটির অর্থ চেতনাচেতন বিভাগ বিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বনিরূপক সিদ্ধান্ত। কারো কারো মতে ব্রহ্ম দু'প্রকারের — স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট। এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এই মতে চেতনাচেতন পদার্থ নিয়ে ব্রহ্মের শরীর আর সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা বা আত্মা হলেন ব্রহ্ম। শরীর কখনও শরীরী আত্মা হতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত হতে পারে না এবং শরীর ও শরীরীর একত্ব ব্যবহারই লোকপ্রসিদ্ধ, সুতরাং চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্বনিরূপণ কখনই অসঙ্গত হতে পারে না। বৃক্ষের যেমন স্বরূপতঃ একত্ব সত্ত্বেও — শাখা প্রশাখাদি অংশের স্বগতঃ ভেদ আছে, অথচ ঐ সকল অংশভেদ নিয়ে যেমন বৃক্ষের একত্ব সিদ্ধ হয়, তেমনই জীব জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হলেও এতৎসমষ্টি বিশিষ্ট পরমপুরুষ ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে।

আমার দৃঢ় ধারণা আর্যাবর্তে প্রাচীনকালে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও বর্তমান ছিল। কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধগণের প্রভাবে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রাচীন ভাষ্যাদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বৌধওন, উপবর্ষ, ভারুচি, কপর্দী, ভর্তৃহরি, ভর্তৃপ্রপঞ্চ, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারদের নাম শোনা গেলেও এই সমস্ত ভাষ্য ও বৃত্তি আর দেখা যায় না। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের শ্রীসম্প্রদায় নামক যে শাখা দাক্ষিণাত্যে যান, সেই সম্প্রদায় কখনও লোপ পায় নি এবং আমাদের এই সম্প্রদায়ই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারা ও সাধন প্রণালী অব্যাহতভাবে রক্ষা করে চলেছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র। পুরাণ এবং মহাভারতে পাঞ্চরাত্র মতবাদের ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল যে পাঞ্চরাত্র তা খণ্ডন করলেও, শঙ্করের সমসাময়িক ভাস্কর তাঁর বেদান্ত-ভাষ্যে পাঞ্চরাত্র মতবাদের সমর্থন করেছেন।

আচার্য গৌড়পাদ যেমন অদ্বৈতবাদের আদিগুরু অর্থাৎ তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন তার বিস্তৃতিসাধন করেছেন আচার্য শঙ্কর তেমনি যামুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যে যে ধারা প্রপঞ্চিত করেছেন তা আচার্য্য রামানুজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পরিপুষ্ট করে ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্য বা শ্রীভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এই সম্প্রদায়ে প্রথমে গৃহস্থাশ্রমের পর বা বানপ্রস্থাশ্রমের পর ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রথা প্রচলিত ছিল। আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধ ধর্মকে স্তব্ধীভূত করার জন্য একদণ্ড সন্ন্যাস প্রথা চালু করেন। একদণ্ড সন্ন্যাসে যেরূপ উপবীত ও পূর্বাশ্রমের নাম পরিত্যাগ করে তেমনি আমাদের ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসে তা নেই। আমাদের পূর্বাশ্রমের নাম থাকে এবং যতদিন পরমহংস পদবী প্রাপ্তি না ঘটে ততোদিন যজ্ঞোপবীতও রাখবার রীতি প্রচলিত আছে।

ভক্তিবাদের স্তম্ভস্বরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য যামুনাচার্যের জীবনাচার্যের জীবন কাহিনী বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই-এর এক বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ৯৫৩ খৃঃ আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের মতে ইনি শ্রীনারায়ণের সিংহাসনের অংশাবতার। আচার্য নাথমুনি ছিলেন তাঁর পিতামহ। দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গনাথের কৃপাধন্য যামুনাচার্যের পিতার নাম ঈশ্বরমুনি। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী। তাঁর গুরু ছিলেন ভাষ্যাচার্য। ঈশ্বরদত্ত

* আলোয়ার— তামিল ভাষায় 'আল' শব্দের অর্থ শান ও 'ওয়ার' শব্দের অর্থ কর্তা; সুতরাং আলোয়ার শব্দের অর্থ শাসনকর্তা।

প্রাতিভায় মাত্র বারো বৎসর বয়সে তিনি শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

সেই সময় দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যরাজ্যের সভা আলো করেছিলেন পণ্ডিত শিরোমণি বিদ্বজ্জন কোলাহল। সারা দেশে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌রা প্রায় সকলেই তাঁর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। একদিন ভাষ্যাচার্যের অনুপস্থিতকালে পণ্ডিত শিরোমণির এক শিষ্য যামুনাচার্যের সামনে তাঁর গুরুর সম্বন্ধে অপমানসূচক মন্তব্য করলে বালক যামুনাচার্য পণ্ডিত শিরোমণিকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। গুরু ফিরে এসে সব শুনে হাহাকার করে ওঠেন কারণ তিনিও কোলাহলকে গুরুর মতন শ্রদ্ধা করেন। তিনি যামুনাচার্যকে নানাভাবে বুঝিয়ে কোলাহলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বলেন। কিন্তু যামুনাচার্য অনড়। তিনি কিছুতেই তাঁর গুরুর অপমান সহ্য করতে পারবেন না। তিনি গুরুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। গুরু ভাষ্যাচার্য যামুনাচার্যকে আশীর্বাদ করলেন বটে কিন্তু মনে মনে ভাবলেন একমাত্র দৈবী কৃপাই যামুনাচার্যকে রক্ষা করবে।

পণ্ডিত শিরোমণি বিদ্বজ্জন কোলাহলকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছে এক বারো বৎসরের বালক — এই সংবাদ দাবানলের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যামুনাচার্যের পরাজয় শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। কারণ বালক যামুনাচার্য কোলাহলের সামনেই মূর্চ্ছা যাবেন। যথাসময়ে পাণ্ড্যরাজের সভাপতিত্বে তর্ক সভা শুরু হল। রাজসভায় তিল ধারণের স্থান নেই। সকলেই অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান।

যামুনাচার্যকে দেখে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের মুখে চোখে ঝরে পড়ে তাচ্ছিল্য। কোলাহল জিজ্ঞাসা করেন — আল্‌ওয়ান্দারা? এই বালক আমাকে জয় করতে চায়। একে অপরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে চান। কিন্তু কেউই কম যান না। সারা সভা স্তম্ভিত, হতচকিত। এমন সময় যামুনাচার্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন — আমি আচার্য কোলাহলকে তিনটি প্রশ্ন করতে চাই —

১. আপনার মাতা বন্ধ্যা নন, খণ্ডন করুন।

২. পাণ্ড্যরাজ মহাধর্মশীল নন, খণ্ডন করুন।

৩. মহারাণী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী — এ মত খণ্ডন করুন।

আচার্য কোলাহল এই উদ্ভট প্রশ্নে বিভ্রান্ত। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। রাজসভায় শুরু হয় গুঞ্জন। যামুনাচার্য বলতে শুরু করেন

দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বতং নিয়োগগার্থং পশ্যন্তো ধর্মতস্তয়োঃ।। (মনু ৯।৬১)

মনু বলছেন, এক পুত্র অপুত্রের মধ্যে গণ্য এজন্য দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করা প্রয়োজন। মেধাতিথিও তাঁর ভাষ্যে বলছেন — অপুত্রঃ এক পুত্র ইতি শিষ্ঠ প্রবাদাৎ। অর্থাৎ আচার্য কোলাহলের মা একমাত্র পুত্রের জননী তাই তিনি বন্ধ্যা। যেমন কূট প্রশ্ন, তেমনি কৌশল পূর্ণ খণ্ডন।

যামুনাচার্যের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেন কলিতে ধর্ম একপাদ, অর্ধম ত্রিপাদ।

সর্বতো ধর্ম ষড়ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্মাদপি ষড়ভাগ্যে ভবতস্য হ্যরক্ষত। (মনু ৮।৩০৪)

রাজা কর্তৃক রক্ষিত প্রজারা যে সকল ধর্ম কর্ম করে, রাজা তার এক ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হন এবং রাজা যাদের রক্ষা করেন না তারা যে অধর্ম করে তার ষড়ভাগ রাজা প্রাপ্ত হন। কাজেই রাজা যতই সুশাসক হোন না কেন, প্রজাদের পাপের প্রাবল্যহেতু অধিক পাপ বহন করতে হয়, এই দৃষ্টিতে পাণ্ড্যরাজ মহাধর্মশীল নন।

অতঃপর যামুনাচার্য তাঁর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেন —

সেহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্ক সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবত।। (মনু ৭।৭)

রাজা যখন অগ্নিও বটেন, সূর্যও বটেন, চন্দ্র, কুবের ইন্দ্রও বটেন, তাহলে মহারাণী কেবল যে রাজারই পাণিগৃহীতা তা বলি কেমন করে?

বালক যামুনাচার্যের পাণ্ডিত্য ও শাণিত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে সবাই চমৎকৃত। সকলেই হৃদয়ঙ্গম করলেন শাস্ত্র ব্যাখ্যা, কূটবুদ্ধি ও চাতুর্যে তিনি অপরাজেয়। চারিদিকে ধ্বনিত হতে থাকে বালক পণ্ডিত যামুনের জয়ধ্বনি। বৌদ্ধ ও শঙ্কর যুগের পর শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী আচার্যরূপে যামুনাচর্যের আবির্ভাব ঘটে।

পাণ্ড্যরাজ বালক যামুনকে দান করলেন রাজ্যের অর্ধাংশ। এই রাজ্য লাভ করে এর শাসনকার্যেও যামুন অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন। রাজকার্যে ব্যাপৃত নবীন পণ্ডিত উপনীত হন যৌবনে, ভুলে যান তাঁর তপোনিষ্ঠ, সাত্ত্বিকী আচারের কথা। ইতিমধ্যে পিতা ঈশ্বরমুনি গত হয়েছেন। ক্রমে পিতামহ নাথমুনিরও মহাপ্রয়াণ আসন্ন কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নাথমুনি তাঁর প্রিয় শিষ্য রামমিশ্র বা মানাক্কাল নম্বিকে আদেশ দেন — যে করেই হোক ঈশ্বর প্রেরিত মহাসাধক রাজা যামুনকে রাজ্যপাঠের গণ্ডী থেকে বের করে তাকে চিনিয়ে দিতে হবে তার স্বরূপ। তার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে, একমাত্র তুমিই পারবে। তাকে নিয়ে আসতে হবে শ্রীরঙ্গনাথের চরণতলে।

নম্বি গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে এসে উপস্থিত হয় যামুনের রাজধানীতে। রাজা যামুন সাদরে আপ্যায়ন করেন শ্রীরঙ্গমের সাধককে। কিন্তু নম্বির সঙ্গে কথা বলার সময় নেই রাজার। এইভাবে কিছুকাল কাটলে, নম্বি জানতে পারেন রাজার সৈন্যদলকে পুনর্গঠনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। নম্বি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি নিভৃতে রাজাকে জানান — তাঁর পিতামহ আচার্য নাথমুনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর দৈবী কৃপায় বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে সেই বিশাল সম্পত্তির দায়িত্বভার আপনাকে দিয়ে যেতে চান। তাই তিনি তা আপনার হাতে সম্পত্তি অর্পণের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে সঙ্গে করে শ্রীরঙ্গমে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু শর্ত একটাই। আপনাকে গোপনে ও ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে একা যেতে হবে।'

একদিন গভীর রাত্রে রাজা নম্বির সঙ্গে গোপনে ত্যাগ করলেন রাজপ্রাসাদ, পদব্রজে যাত্রা করলেন পূণ্যভূমি শ্রীরঙ্গমের দিকে। সপ্তম দিনে উভয়েই পৌঁছে গেলেন শ্রীরঙ্গমে। কাবেরীতে স্নান তর্পণ সেরে নম্বি যামুনকে উপস্থিত করলেন শ্রীরঙ্গনাথজীর বিগ্রহ সম্মুখে। বললেন — ইনি হলেন আপনার দাদু নাথমুনির গুপ্ত ভাণ্ডার। আমি আপনার কাছে এবং গুরুর কাছে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা আজ রক্ষিত হল।

কিন্তু বিগ্রহ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এক অনাস্বাদিত পূর্বে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল রাজা যামুনের শিরা ধমনীতে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নতজানু হয়ে রঙ্গনাথজীর জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি দর্শন করতে করতে তিনি হলেন মূর্ছিত। যখন তাঁর মূর্ছা ভাঙল তখন তিনি অন্য মানুষ। প্রভু রঙ্গনাথের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি স্তব করতে লাগলেন —

নিমজ্জিতোহনন্ত ভবার্ণবান্তঃ চিরায় মে কুলমিবাসি লব্ধঃ
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীং অনুত্তমং পাত্রামিদং দয়ায়াঃ॥

অনন্ত সংসার সাগরে বহুকাল ধরে ডুবতে ডুবতে অবশেষে কুলস্বরূপ তোমাকে পেয়েছি। তুমিও এক্ষণে অত্যুৎকৃষ্ট দয়ার পাত্র পেয়েছ?

অপরাধ সহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে
অগতিং শরণাগতং হরে, কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু।

আমি সহস্র অপরাধের অনুষ্ঠাতা, ভীষণ ভবসমুদ্রে পতিত। নিরুপায় হয়ে আমি তোমারই চরণাশ্রিত হতে চাই।

সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তিনি নিলেন সন্ন্যাস। তাঁর যাত্রা শুরু হল প্রেম, ভক্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তির পথে। শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজায় মন, প্রাণ সমর্পণ করলেন সাধক যামুন। যামুন ভক্তিপথে আগমনের অতি অল্পকালের মধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রীসম্প্রদায়ে নূতন জীবনের সঞ্চার করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ভক্তিস্নিগ্ধ মহাপুরুষের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা দাক্ষিণাত্যে। পিতামহ নাথমুনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যে দার্শনিকতার প্রবর্তন করেন, সাধক যামুনাচার্য তার ভিত্তিকে করলেন সুদৃঢ়।

যামুনাচার্যের মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই ব্রহ্মসূত্রের সম্মত। তাঁর মতে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ নয়, কিন্তু জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতৃস্বভাব আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ হলেও আত্মার বদ্ধ ও মোক্ষ আছে। আত্মা সবিশেষ, আত্মা অহম্ শব্দের বাচ্য। আত্মা সংবেদী বা বেত্তা। জ্ঞান সেই আত্মার ধর্ম। জ্ঞান শক্তিরও সবিশেষ ও আপেক্ষিক। নির্বিশেষ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানও নির্বিশেষ হতে পারে না। এই আত্মা আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে দ্বিবিধ। সর্বভূতান্তর্যামী আত্মাই সমস্ত ব্যষ্টি-জীবাত্মার আশ্রয় ও পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই পুরুষোত্তম, যিনি জীব হতে শ্রেষ্ঠ।

সাধারণতঃ জীব বদ্ধস্বভাব, অণুচৈতন্য ঈশ্বর হতে নিত্য পৃথক। জীব অংশ, ঈশ্বর অংশী। জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। ঈশ্বর হলেন সত্যসংকল্প নিঃসীম সুখসাগর। জীব হল শোক-দুঃখার্ত। তবে এই জীব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির দ্বারা তাঁর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করে। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে কিন্তু কখনই ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব হতে পারে না। বৃহত্ব হেতুই ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলা হয়।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বললে ব্রহ্ম হতে অন্য বস্তুর সদ্ভাব নিবারিত হয় না। বরং ব্রহ্মের সদৃশ বা বিসদৃশ অন্য কেউ নেই এটাই বোঝা যায়। এই জগৎ তাঁর কলামাত্র বিভূতি। যেমন চোল রাজা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বললে বোঝা যায় তার তুল্য অন্য কোন রাজাই নেই। পরন্তু চোল রাজার ভৃত্য পুত্র কলত্রের নিষেধ হয় না, সেরূপ ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বললেও সুর, নর, অসুর, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির নিষেধ হয় না। অনন্তকোটি জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, ব্রহ্মই কলা দ্বারা স্বেচ্ছায় জগদকারে পরিণত হয়েছেন, জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম জগতের আত্মা, আত্মা ও শরীর অভিন্ন, জগৎ ও তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মে জীবত্মা জগতে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নেই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে।

যামুনাচার্যের মতে চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম এই তিনটি মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান। চিৎ হল জীব, অচিৎ হল জগৎ ও পুরুষোত্তম হল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সবিশেষ, সগুণ, অশেষ কল্যাণগুণের নিলয় ও সর্বনিয়ন্তা। জীব তাঁর দাস। তত্ত্বমসি বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা নয়। তৎ পদ শুদ্ধ  জীবত্ব ও ত্বং পদ অশুদ্ধ জীবত্ব-বাচক। তাই এই পদত্বয় জীবপর তাদাত্ম্যৎগোচর।

বস্তুতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তা একত্ব নয়। পরন্তু জীব চিরকালই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অধীন পদার্থ এবং একমাত্র ভগবদ্ ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, কিন্তু মায়া ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই মায়ার হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। অজ্ঞান বা মায়া এক পদার্থ নয়। জ্ঞানের অভাবের নাম অজ্ঞান, তা জীবগত ; কিন্তু মায়া আসলে ভগবানের শক্তি।

যামুনাচার্যের গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রধান হল — সিদ্ধিত্রয়ম। গৌড়বাদের মাণ্ডুক্যকারিকা স্বাধ্যায় করলে যেমন আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায় বুঝতে অসুবিধা হয় না তেমনি যামুনাচার্যের এই গ্রন্থ স্বাধ্যায় করলে আচার্য্য রামানুজের গ্রন্থাবলীর মর্মকথা সহজে উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল স্তোত্ররত্নম, আগম প্রমাণ্যম   ও গীতার্থ সংগ্রহ।

রঙ্গনাথাচার্যের গুরু বন্দনা শেষ হল। তিনি তাঁর ঝোলা থেকে বইগুলি বের করে আমাকে দিলেন। হাতজোড় করে বললেন — কাল আপলোগ্ নাহী যা সকতে। হমলোগ্ বিহানমেঁ দণ্ডী সন্ন্যাসীওঁকো ভিক্ষা দেঙ্গে।

আমরা তাঁকে নমো নারায়ণায় জানিয়ে ফিরে এলাম আমাদের বিশ্রামস্থলে। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মনে হল কোথাও হয়ত বৃষ্টি হয়েছে। তাই ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

শ্রীযামুনাচার্যের জীবন কথা স্মরণ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমরা মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা নর্মদাকে দর্শন করে প্রণাম করলাম। রঙ্গনাথজীর অনুরোধে আজ আমাদের এই মন্দিরেই কাটাতে হবে। সকলেই একে একে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে গেলাম। স্নান সেরে এসে শিবলিঙ্গের পূজাতে রত হলাম। পূজা শেষ হতে আমি তণ্ডিকৃত শিবসহস্রনাম পাঠ করতে শুরু করলাম। বেলা এগারটা নাগাদ আমাদের প্রাত্যহিক কাজ সমাপ্ত হল। আমি ডায়েরী খুলে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করলাম।

রঙ্গনাথজীর দিকটায় খুবই হৈ রৈ পড়ে গেছে। রান্নার আয়োজন বোধহয় সমাপ্ত। আমরা দেখে আশ্চর্য হলাম হাঁড়ি, তাবা, চাটু, বেলনী, বড় বড় আটার বস্তা, ঘি এর টিন। কী নেই রঙ্গনাথজীর সঙ্গে।

বেলা একটা নাগাদ রঙ্গনাথজী দুজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন — রান্নার কাজ শেষ। আপনারা ভিক্ষা গ্রহণ করবেন চলুন। আমরা রঙ্গনাথজীর সঙ্গেই তাঁর ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেলাম। বেলা দু'টা নাগাদ ভিক্ষা গ্রহণ পর্ব শেষ হল। ভিক্ষার উপাদান পুরী, লাড্ডু এবং এক ধরনের টকটক স্বাদের সবজী। খেতে ভালই লাগল। ভয়ংকর জঙ্গলখণ্ডে এই যথেষ্ট।

ভিক্ষা গ্রহণের পর আমরা মন্দিরে ফিরে এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। বিকাল চারটা

নাগাদ রঙ্গনাথজী মন্দিরে এসে আমাদের কাছে বসলেন। বলতে শুরু করলেন — আমার ছাত্রজীবন কেটেছে কাশীতে। তাই আমি তামিল ও ইংরাজী ছাড়া হিন্দি ভাল বলতে ও পড়তে পারি। আমার সঙ্গী দুজন ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কেউই হিন্দি জানে না। হরানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন — আপনাদের কামরূপ মঠ ও আপনাদের গুরুদেব ভোলানন্দ তীর্থ মহারাজকে চাক্ষুস দর্শন করার সৌভাগ্য আমার বহুবার ঘটেছে। তাঁর জীবনের যে ঘটনা আমার জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল তা বলছি শুনুন —

কামরূপ মঠে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন। তাঁর নাম স্বামী কেবলানন্দ। কন্দর্পকান্তি দেহ, শালপ্রাংশু মহাভুজ, বয়স ৩০/৩২ এর বেশী হবে না। সব সময় ধ্যানানন্দে বিভোর থাকতেন। রাত্রি তিনটায় স্বামীজীর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে, বেলা ১২টা, ১টার সময় মাধুকরী করতে যাওয়া ছাড়া তিনি গুম্ফার বাইরে বেরুতেন না। ব্রহ্মচারী মহেশ চৈতন্য নামে মঠের একজন ব্রহ্মচারী একবার স্বামীজীর কাছে এস অভিযোগ করলো — 'স্বামীজী, কেবলানন্দজী মাধুকরী করতে বেরিয়ে নারদ ঘাটের এক শেঠানীর বাড়ীতে গিয়ে রোজ মাধুকরী করে। খোঁজ নিয়েছি ঐ বাড়ীতে ৪৫/৪৬ উমরকা এক বিধবা শেঠানী থাকে আর কেউ থাকে না। হমারা ডর হ্যায়, ইসমে মঠকা কৌঈ বদনামী না হো'। এইখানে বলে রাখা ভাল, আপনাদের মঠের অনুগত ব্রহ্মচারীরা মঠে থাকে না। তারা সাধারণতঃ মঠের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কোন চতুষ্পাঠীতে থাকে, ছত্রে খাওয়া দাওয়া করে। মহেশ চৈতন্যের এই অভিযোগ শুনে স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে কেবলানন্দজীকে উপরে ডেকে পাঠালেন। মহেশ চৈতন্যের অভিযোগ সত্য কিনা জিজ্ঞেস করলেন। কেবলানন্দজী অবিচল কণ্ঠে বললেন — সিকায়ৎ সচ্ হ্যায়। উনোনে হমারা বড়া বহিন হ্যায়। স্বামীজী ছোটবেলা আমি মা বাপকে হারিয়েছি। ঐ বহিনজীই আমাকে মানুষ করেছিল। আমি সংসার ত্যাগের পর বহিনজীও কাশীতে এসে বাস করছেন, জপ পূজার মধ্যেই সময় কাটান। আমি যে কাশীতে থাকি তা তিনি জানতেন না। আজও জানেন না আমি এই মঠে আপনার চরণাশ্রয়ে থাকি। একদিন মাধুকরী করতে গিয়ে হঠাৎ বিশ্বনাথের গলিতে দেখা হয়ে যায়। তিনি বিশ্বনাথের পূজা করে ফিরছিলেন। ভীষণ কান্নাকাটি করেন। রাস্তার মধ্যেই তাঁর মূর্চ্ছা হয়ে গেছলো। তিনি সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর বলেন — তোকে কোথাও না কোথাও তো মাধুকরী করতেই হয়। তুই আমার কাছে মাধুকরী করবি। এই বলে গঙ্গাজল আর বিশ্বনাথের নির্মাল্য নিয়ে আমাকে শপথ করিয়ে নেন। স্বামীজী আমি অপরাধী, মায়া মমতার ডোর আমার মধ্যে সুপ্ত ছিল। আমার গোস্তাকী হয়েছে, আপনাকে সব নিবেদন করা উচিত ছিল। মহেশ চৈতন্যকে সঙ্গে দিয়ে স্বামীজী আর এক ব্রহ্মচারীকে সব বৃত্তান্তের খোঁজ নিতে পাঠালেন। সেই ব্রহ্মচারী সব খোঁজ নিয়ে এসে স্বামীজীকে বললেন, কেবলানন্দজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বামীজী কেবলানন্দজীকে বললেন — ভগবন্! কলিতে এই জন্য সন্ন্যাস ধর্মকে বড় কঠিনতম ব্রত বলে। বিরজা হোমের সময় বাইরের জগৎ আর তার হাতছানি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শকেও যেমন ন্যাস করতে হয় তেমনি অন্তরজগতের যোগজ শক্তি বিভূতি ইত্যাদিকেও ন্যাস করতে হয়। পূর্বাশ্রমকে ভুলতে হয়, এমনভাবে ভুলতে হয় যে তা যেন নিথর রহস্যে ঢাকা পড়ে যায়। নিজেকে মৃতজ্ঞানে সন্ন্যাসী নিজেরই শ্রাদ্ধ করেন গৈরিক বস্ত্র গ্রহণের পূর্বে। এটা তো অনুমান করলে চলবে না, সত্যিই সেই রকম জীবন্ত বোধটি হওয়া চাই। এই মঠের আচার্যরা এইভাবে কঠোরতম তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনের দ্বারা পবিত্রতম সন্ন্যাসধর্মের জ্যোতিকে জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। আমার মত অপদার্থ এর আগে কেউ এই মহান্ মঠে বসেনি। কিন্তু আমার বল বুদ্ধি ভরসা তো তোমরা। তোমাদের মুখ চেয়েই সেই ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ আচার্যদের ব্রত পালনের ভার নিয়েছি। তোমরা যদি সাহায্য না কর, সহায়তা না কর তাহলে সন্ন্যাসধর্ম কি করে থাকবে ভগবান? তুমিই বলে দাও বাছা, তোমার ঐ কাজ সন্ন্যাস ধর্মের অনুকূল কিনা? আমি তো মুখ্যু সুখ্যু মানুষ বাবা।

কেবলানন্দজী দণ্ড কমণ্ডলু এবং তাঁর গৈরিক উত্তরীয়খানি স্বামীজীর পদতলে রেখে বললেন — এই শরীরের পাতিত্য দোষ ঘটেছে প্রভু! পূর্বাশ্রমের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ রাখা কোন সন্ন্যাসীর উচিত নয়। আমি সন্ন্যাস ধর্মের অমর্যাদা করেছি। তাই ভাবছি — এখন উত্তরায়ণ চলছে, আগামীকাল সকাল ৮টায় এই অশুদ্ধ দেহটা ফেলে দেব। উপস্থিত সকলেই হতচকিত। কিন্তু আপনাদের গুরুদেব নির্বিকার।

ভোলানন্দজী ধীর স্থির ভাবে তখনই কামরূপ মঠের স্বীকৃত ৫ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে পরদিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে এক সাধুকে পাঠালেন। আর এরপরই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ব্রহ্মচারী মহেশকে **মঠ** ছেড়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

এই অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সারারাত্রি দু চোখের পাতা এক করতে পারি নি। কেবলই ভাবছি একজন সাধু কিভাবে এই স্থূলদেহ অবলীলায় পরিত্যাগ করবেন!

ভোর চারটায় কামরূপ মঠে এসে উপস্থিত হলাম। একে একে এলেন পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ — গোপীনাথ কবিরাজ, মঙ্গলদেব শাস্ত্রী, পণ্ডিত তারাকিশোর, ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু এবং ছোটে বামাচরণ।

দেখি কেবলানন্দজী নিজে হোমকুণ্ড সাজাচ্ছেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণের জন্য পাঁচটি আসন পাতা আছে। কেবলানন্দজী তাঁদের নমঃ নারায়ণায় জানিয়ে আসন গ্রহণের অনুরোধ জানালেন।

যথাসময়ে যথালগ্নে শুরু হল বিরজা হোম। পাঁচজনে একত্রে উচ্চারণ করতে লাগলেন অগ্নি প্রজ্বলনের মন্ত্র —

ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদ হুতাশনং সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্।

তারপর তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল —

১. অয়মগ্নি সর্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্য অগ্নেঃ সর্বাণি ভূতাণি মধু। যশ্চায়মস্মিন্ অগ্নৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ। যশ্চামধ্যাত্মম্ বাঙ্ময়ঃ তোজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ। অয়মেব সঃ — যোহয়মাত্মা ইদং ব্রহ্ম ইদং অমৃতমিদং সর্বং স্বাহা।
২. অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।
৩. ওঁ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্। বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধি অস্মৎ জুহুবোনং এনঃ।
৪. ওঁ প্রাণাপান ব্যানোদান সমানা মে শুধ্যন্তাম্ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।
৫. ওঁ ত্বকচর্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জা স্নায়োবোঅস্থীনি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরত্বং বিরজা বিপাপমা ভূয়াসং স্বাহা।
৬. ওঁ পৃথিব্যাপোস্তেজো বায়ুরাকাশাঃ মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপমা ভূয়াসং স্বাহা।
৭. ওঁ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপমা ভূয়াসং স্বাহা।
৮. ওঁ আত্মমে শুধ্যতাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপমা ভূয়াসং স্বাহা।
৯. ওঁ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবীং ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং য পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মানে স্বাহা।
১০. ওঁ যঃ আকাশে তিষ্ঠন আকাশ দন্তরো, যমাকাশো ন বেদ, যস্যাকাশঃ শরীরঃ, য আকাশমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

কেবলানন্দজী ধ্যানস্থ — নিথর নিস্পন্দ দেহ।

হরি ওঁ তৎসৎ, হরি ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ করতে করতে ভোলানন্দজী নেমে এলেন। কেবলানন্দজীর মাথায় দণ্ড স্পর্শ করে বলতে লাগলেন — ওঁ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ, তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম বদ্ধ পদ্মাসনে ঋজু আয়তদেহে উন্নত মেরুদণ্ডে উপবিষ্ট সিদ্ধতাপস কেবলানন্দজীর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে একটি উজ্জ্বল শিখা উর্ধাকাশে গিয়ে মিলিয়ে গেল। হোমকুণ্ডের সামনে পড়ে রইল 'পাতিত্য দোষে দুষ্ট' কেবলানন্দজীর অশুদ্ধ দেহ!

আপনারা এই ঘটনার কথা জানেন কিনা জানি না। এখানে পৌঁছানোর পরই যখন শুনেছি আপনারা কামরূপ মঠের দণ্ডী সন্ন্যাসী, ভোলানন্দ তীর্থজী আপনাদের গুরু, তখনই আপনাদের ভিক্ষাদানের লোভ সংবরণ করতে পারি নি।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। রঙ্গনাথজীর এক শিষ্য মন্দিরে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেছেন। রঙ্গনাথজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমাদের 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে ফিরে গেলেন তাঁর ছাউনীতে। তাঁকে বিদায় জানাতে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আজও গ্যাসবাতি জ্বেলে বনভূমিকে আলোকিত করা হয়েছে।

আমরা মন্দিরে ফিরে এসে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন ৬টা-সাড়ে ৬টা হবে। হরানন্দজী বললেন — চলুন, সবাই নর্মদাতে স্নান সেরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি। স্নান সেরে সকলে শিবের মাথায় জল ঢাললাম। প্রেমানন্দ আজ বন থেকে কিছু বুনোফুল নিয়ে

এসেছেন : শিবকে স্নান করানোর পরই সেই বুনোফুল শিবের মাথায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। পূজা সেরে আমরা যে যার বিছানা ঝোলা প্রভৃতি গুছিয়ে বাঁধতে লেগে গেলাম। সবে মাত্র আমাদের ঝোলা গাঁঠরী বাঁধা শেষ হয়েছে, এমন সময় রঙ্গনাথজী আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। সদ্য স্নান করে এসেছেন নর্মদায়। মহাদেবানন্দ স্তোত্র পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। আমরাও তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে লাগলাম —

ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ মহাং স্তথা
ভীমে শানাবিতি যদ্ভি ধানাষ্টক মিদম্।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরিত দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়াযাস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যেহস্মি ভবতে।

হে দেব, 'ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম ও ঈশান' এই যে তোমার আটটি নাম এদের প্রত্যেকটির অর্থ প্রকাশের জন্য বেদও সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট। আমি কায়মনোবাক্যে সেই আনন্দস্বরূপ ও অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ তোমাকে নমস্কার জানাই।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জ্বলং সিন্ধুপাত্রং সুর তরুরব শাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্বকালং তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।

নীল পর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসীপাত্র হয়, পারিজাত বৃক্ষের শাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি লিখবার পাত্র হয় আর এই সমস্ত বস্তু নিয়ে সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে লিখতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর তোমার গুণসমূহের ইয়ত্তা পাওয়া যাবে না।

তিনি আমাদের নর্মদার ঘাটে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে প্রণাম করতে বললেন মা নর্মদাকে। সকলের মাথায় জল ছিটিয়ে দিয়ে আওয়াজ তুললেন — হর নর্মদে হর। এরপর তিনি সকলকে জড়িয়ে ধরে নমঃ নারায়ণায় বলে বিদায় জানাতে জানাতে যখন আমার কাছে এলেন তখন রঙ্গনাথজীকে প্রণাম করে আমি বললাম — আশীর্বাদ করুন যাতে আমার ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি। তিনি জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় চুমু খেলেন। আমরা এগিয়ে চললাম 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে পূর্বদিকে। আর পিছনদিকে তাকালাম না। আমরা ক্রমে ঢুকে যেতে থাকলাম ঘন অরণ্যের মধ্যে। প্রস্তরময় রাস্তায় আমাদের হাঁটতে যে কষ্ট হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। মা নর্মদাকে প্রণাম জানিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে জলধারার গতিপথ অনুসরণ করে উৎরাই-এর পথে নামতে লাগলাম। একটি পাহাড়ী নদী মা নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। হঠাৎ দেখি কয়েকজন পাহাড়ী লোক ডালপালা কেটে নিয়ে আমাদের পথেই আসছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম — এই স্থানের নাম মাচক সংগম। আরও সাত মাইল পরে পড়বে অজনাল সংগম।

মা নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। পার্বত্য সমতল অঞ্চল। রাস্তার দুধারেই অশ্বত্থ ও বটগাছের সার। এই বট ও অশ্বত্থ গাছের সারির ভিতর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর পেলাম আমলকী গাছের সারি। নর্মদার এই পথ বেশ মনোরম। ঝলমলে রৌদ্রে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে নর্মদাকে। ঘন্টা দেড়েক হেঁটে প্রায় সাতমাইল পথ অতিক্রম করে প্রায় দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম একটি জনবসতিপূর্ণ মহল্লাতে। পথ চলতি লোককে জিজ্ঞাসা করতে তারা জানাল — 'ইহ্ মহল্লেকা নাম হৈ, জোগাকিলা ঘাট। ইহাঁ কিসী সময় এক যোগী মহাত্মানে তপ করকে ইপ্সিত ফল পায়া থা, তবসে ইসকা নাম জোগাকিলা। আউর ছয় মীল চলনেসে মিলেগা উচান-ঘাট।

তাদের নির্দেশিত পথে আমরা বেলা একটার মধ্যে উচান ঘাটে পৌঁছে গেলাম। বিশাল মন্দির। মন্দিরের নিচ দিয়ে নর্মদা স্থির ও শান্তভাবে বয়ে চলেছেন। একটু দূরেই সাতপুরা পর্বতের চূড়া দেখা যাচ্ছে, নর্মদার বিস্তার এখানে বেশ কম। বড়ই শান্ত গম্ভীর স্থান। তপস্যার অনুকুল। মন্দির থেকে নর্মদার ঘাট পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্থানটি বড় বড় পাথর দিয়ে খুব মজবুত করে বাঁধানো।

আমরা একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বসলাম। স্থানটি যেমন মনোরম, তেমনি ভয়প্রদও। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা ও নর্মদার কুলুকুলু তাল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার সুযোগ পেলাম না, একদল বন্য কুকুরের বিকট ডাক শুনে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশ কিছুটা দূর থেকেই কুকুরগুলি চিৎকার করছে, তাই একটুখানি দাঁড়িয়েই মন্থর গতিতে এগোতে লাগলাম। ক্রমশই কুকুরের চিৎকার থেমে গেল। প্রেমানন্দ বললেন — হিংস্র

জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। কোথাও হয়ত ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে, কাজেই এ পথ থেকে একটু বেঁকে গেলেই ভাল। আমরা মূল পথ থেকে একটু বেঁকে সকলেই ভয়ে ভয়ে রেবা, রেবা, হর নর্মদে, হর নর্মদে জপ করতে করতে হাঁটছি। এইভাবে প্রায় আধ ঘন্টাটাক হাঁটার পর সকলের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। সকলে কণ্ঠ মিলিয়ে 'জয় নর্মদা মাতাজীকী জয়' বলে জয়ধ্বনি দিলাম।

পথে হাঁটতে হাঁটতে হরানন্দজী বললেন — স্বয়ং মহাদেব নর্মদার তটে তটে পরিক্রমা করে নিজেকে প্রকট করেছেন যত্রতত্র। তারফলে এখানে অজস্র তীর্থ গড়ে উঠেছে। মহাদেব নিজে পরিক্রমা করে পরিক্রমার মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। তাই পরিক্রমাবাসীরা যুগ যুগ ধরে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। সরিদ্বরা নর্মদা আদ্যন্ত শিবতীর্থ। তিনি শিবময়ী।

কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — ঋদ্ধনাথ তীর্থ ক্যাতনা দূর্ বা? তিনি উত্তর দিলেন — 'উহ ত হণ্ডিয়া গ্রামকে পশ্চিমমেঁ হৈ। মন্দির দ্বাদশ কলসসে সুশোভিত হ্যায়। আভি ঔর এক মাইল যানে পড়েগা। লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুততালে হেঁটে বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা বারো কলসযুক্ত ঋদ্ধনাথ মন্দিরে এসে পৌঁছলাম।

আমি বললাম — নর্মদার এপারে এই দক্ষিণতটে হণ্ডিয়া এবং ঐ উত্তরতটে নেমাবর। দুই স্থানই নর্মদার নাভিস্থল। এই দুই স্থানই অমরকন্টক হতে রেবাসঙ্গমের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ঋদ্ধনাথ ও সিদ্ধনাথ — এই দুই স্থানই কুবেরের শিব তপস্যার সিদ্ধক্ষেত্র। আমি উত্তরতট পরিক্রমাকালে সিদ্ধনাথ দর্শন করে এসেছি। এই স্থানে তপস্যা করলে শিব সর্বাভীষ্ট প্রদান করেন।

আমি মহানন্দস্বামীকে অনুরোধ করলাম — আপনি আমাদের কুবেরের গল্প শোনাতে থাকুন। পাহাড়ের উপর দেখছি কেবল মেহরীন গাছের ভীড়। মহানন্দস্বামী কুবের সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন — দেবী রুদ্রাণীকে হিমালয়ে দৈবাৎ দেখতে পান কুবের। রুদ্রাণীকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কুবেরের দক্ষিণ চক্ষু ও বাম চক্ষু গলে গিয়ে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। ফলে কুবেরের নাম হয় এক পিঙ্গল। এঁর তিনটি পা ও আটটি দাঁত ছিল। পুরাণে আছে কুবেরের পিতার নাম বিশ্রবামুনি এবং মায়ের নাম দেববর্ণিনী। বিশ্রবার পুত্র বলে এঁর অপর নাম বৈশ্রবণ। উগ্র তপস্যাবলে ব্রহ্মার বরে কুবের অমরত্ব লাভ করেন এবং যক্ষদের রাজা হন। ব্রহ্মা তাঁকে পুষ্পক রথ দান করেছিলেন। এই রথের এমনই বৈশিষ্ট্য যে কুবেরের স্মরণ মাত্রই পুষ্পক রথ তাঁর কাছে উপস্থিত হত এবং সংকল্পিত স্থানে পৌঁছে দিত।

বিশ্রবামুনি তাঁর পুত্র কুবেরের বাসস্থানের জন্য লঙ্কাপুরী নির্দিষ্ট করে দিলেও কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কুবেরের কাছ হতে স্বর্ণলঙ্কা ও পুষ্পকরথ জয় করে নেন। মনের দুঃখে কুবের নর্মদার উত্তরতটস্থ নেমাবরে সিদ্ধনাথের স্থানে এসে ষড়ক্ষরী শিববীজ জপ করতে থাকেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, নীল, কুন্দ, মুকুন্দ, খর্ব প্রভৃতি মহামূল্য মণিমাণিক্যের সঙ্গে পুষ্পকরথ এবং অলকাপুরী দান করেন। রাবণ পুনরায় তা কেড়ে নিলে মহাদেবের প্রত্যাদেশে কুবের নর্মদার দক্ষিণতটে অর্থাৎ এইপারে হণ্ডিয়াতে ঋদ্ধনাথের স্থানে বসে তপস্যা করেন এবং পুনরায় সেই নবনিধি এবং অলকাপুরী ফিরে পান। শিব তপস্যার বলে কুবের উত্তর দিগন্তের দিকপালত্ব এং ধনাধ্যক্ষতা লাভ করেন। কুবেরের দুই পুত্রের নাম নল-কুবের ও মনিগ্রীব, কন্যার নাম মীনাক্ষী। বেদে কুবেরের কথা আছে কিনা আমার জানা নেই।

আমি বললাম — বেদে কুবের শব্দ পরমেশ্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুবি আচ্ছাদনে এই ধাতু হতে কুবের শব্দ নিষ্পন্ন। যঃ সর্বং কুবতি স্বব্যাপ্ত্যাচ্ছদয়তি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ। অর্থাৎ যিনি স্বীয় ব্যপ্তির দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন সেই পরমেশ্বরের নাম কুবের।

প্রচণ্ড গরম ও পথশ্রমে আমরা সবাই হাঁসফাঁস করতে করতে নর্মদায় নামলাম। নর্মদার স্নিগ্ধ জলে শরীর কিছুটা ঠাণ্ডা হল। মন্দিরে পৌঁছে দেখি পুরোহিতজী আরতির আয়োজন করছেন। মন্দিরে খুব ধীর লয়ে আরতির বাজনা বাজছে। পুরোহিতজী ঋদ্ধনাথের সামনেই আমাদের বসার আসন পেতে দিলেন। মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে ঘি-এর প্রদীপ, দরজার দুই কোণে জ্বলছিল দুটি মোমবাতি। মন্দিরে বহু ভক্তের ভীড়। তাতে দেখলাম প্রায় দু ফুট উঁচু শিবলিঙ্গের সামনের দিকটা কালো এবং যোনীপীঠের দিকটা সাদা। জ্যামিতিক মাপে সাদা ও কালো অংশ প্রায় সমান সমান। ঋদ্ধনাথের লিঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি বিষ্ণু চিহ্ন বিদ্যমান।

হরানন্দজী বলে উঠলেন — ঐটি বৈষ্ণবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ সর্বৈশ্বর্য প্রদান করেন। তাই রাজ্যভ্রষ্ট কুবের এঁর তপস্যা ও অর্চনা করে পুনরায় অলকাপুরী লাভ করতে এবং ধনাধিপতি হতে পেরেছিলেন।

আমি বললাম — সবচেয়ে আশ্চর্য হল উত্তরতটের সিদ্ধনাথ এবং দক্ষিণতটের ঋদ্ধনাথ রূপে প্রায় একইরকম। আপনারা উত্তরতট পরিক্রমা করলে তা বুঝতে পারতেন। দেখুন! উত্তরতটের মত এখানকার মন্দিরের দেওয়াল গাত্রেও সংস্কৃতে ক্ষোদিত আছে কুবেরের তপশ্চর্চার ফল ঃ—

সিদ্ধিরষ্টবিধা। তাসু ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্ত-নিবৃত্তয়ে প্রমোদ-মুদিত-মোদমানাখ্যাঃ তিস্রো যোগজাঃ সিদ্ধয়ো মুখ্যাঃ। তাসাং মুখ্যানাম্ উপলব্ধৌ সৌকর্যসাধনার্থং আশ্রয়নীয়াঃ অন্যাঃ পঞ্চ সিদ্ধয়ো গৌণাঃ।

বিহন্যমানস্য অপ্রতিরোধস্য দুঃখস্য ত্রিবিধত্বাৎ যোগশাস্ত্রে সিদ্ধেঃ ত্রিবিধাঃ প্রক্রমা উপদিষ্টা বর্তন্তে। তে চানুভূতি সব্যপেক্ষাঃ। এতৎত্রয়লাভার্থং যে পঞ্চপ্রকারা উপায়ত্বেন অবলম্বিতাঃ তেষু বেদাদিশাস্ত্রস্য অধ্যয়নগত স্থূলবিষয়স্য পরিচয় এব তার-নাম্নী প্রথমা সিদ্ধিঃ। শব্দস্য অধ্যয়নাধ্যাপনয়োঃ কার্যবিশেষতয়া তস্য জ্ঞানারম্ভকতয়া চ কার্যে কারণোপচারেণ দ্বিতীয়া শব্দ-সিদ্ধিঃ সুতার-নাম্না অভিধীয়তে। শব্দজনিতে জ্ঞানে সমারদ্ধে সতি প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণাপনায়-নিগমন-দ্বারেণ অধীত-বিষয়ান মনসা পরীক্ষ্য সংশয় নিরাকরণং তারতার-নাম্নী তৃতীয়া সিদ্ধিঃ। সংশয়াত্মক-বিষয়াণাং সিদ্ধান্তে মনসা নিশ্চিতেহপি অন্যস্য সমর্থনং বিনা ন তত্রাস্থা ভবতীতি সুহৃৎ-প্রাপ্তিরূপা যা সিদ্ধিশ্চতুর্থী রম্যকমুচ্যতে। মীমাংসিতং বস্তুতত্ত্বম্ আয়ত্তীকর্ত্তুং চিত্তশুদ্ধিরাবশ্যকী, সা চা বৈরাগ্যেন বিনা নোপপদ্যতে, বৈরাগ্যম্ আনন্দশ্চেত্যুভয়মেব দানেন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ইতি — হোতোর্দানবিষয়িণী সিদ্ধিঃ সদা প্রমুদিতেতি কথ্যতে।

যদি কোহপি মন্যতে তপস্যাদিমার্গেণ অণিমা-লঘিমাদৈশ্বর্যং যয়া লভ্যতে সৈব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা সিদ্ধিঃ, অতএব পূর্বোক্তাঃ সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধিরূপেণ ন গণনীয়া ইতি তর্হি ব্রমো যৎ, অধ্যয়ন-শাস্ত্রজ্ঞান-সুহৃৎপ্রাপ্তি-দানাদিকং বিহায় তপস্যা আচর্যতে চেৎ সা ন প্রকৃত-মোক্ষদায়িনী ভবতি। যতঃ তত্ত্বনিশ্চয়ব্যতিরিক্তা সিদ্ধিঃ ন প্রকৃতা-মোক্ষোপযোগিনী সিদ্ধির্বক্তুং ন শক্যতে। সা হি সিদ্ধেরাভাসমাত্রম্। এতা যা সিদ্ধয়স্তাসাং বিরুদ্ধা অসিদ্ধিঃ। — কুবের

অর্থাৎ, সিদ্ধি অষ্টবিধ। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য প্রমোদ মুদিত ও মোদমান নামক তিনটি যোগজ সিদ্ধিই মুখ্য। আর তা লাভের সুবিধার জন্য অন্য যে পাঁচটিকে উপায়স্বরূপ আশ্রয় করা সেগুলি গৌণ।

বিহন্যমান দুঃখ ত্রিবিধ বলে যোগশাস্ত্রে সিদ্ধির তিনটি প্রক্রম উপদিষ্ট হয়েছে। তা অনুভূতিসাপেক্ষ। ঐ তিনটি পাবার জন্য যে পাঁচটি উপায়রূপে গৃহীত হয়, তার মধ্যে বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যয়নগত স্থূল বিষয় পরিচয়ই তার নামক প্রথমা সিদ্ধি। শব্দ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্যবিশেষ বলে এবং তা জ্ঞানের আরম্ভক বলে কার্যে কারণের উপচারপূর্বক দ্বিতীয়া শব্দ সিদ্ধিকে সুতার নামে অভিহিত করা হয়েছে। শব্দজনিত জ্ঞান আরব্ধ হলে প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ, উপনয় ও নিগমাদি ন্যায়ের দ্বারা অধীত বিষয়গুলি মনে মনে পরীক্ষা করে সংশয় নিরাকরণ করাই তারতার নামক তৃতীয়া সিদ্ধি। সংশায়াত্মক বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত মনে মনে স্থিরীকৃত হলেও অপরের সমর্থন ব্যতীত স্বসিদ্ধান্তে আস্থা হয় না। এইজন্য সুহৃৎ-প্রাপ্তি-রূপ (সদ্গুরু লাভ এবং সহপাঠী ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে বিচারের সুযোগ লাভ) চতুর্থী সিদ্ধিকে রম্যকে বলা হয়। বস্তুতত্ত্ব মীমাংসিত হলে তা আয়ত্ত করার জন্য চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। বৈরাগ্য ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং দানে কথঞ্চিৎ বৈরাগ্য ও আনন্দ উভয়ই অধিকৃত হয় বলে, দান বিষয়ক যে সিদ্ধি তার নাম সদা প্রমুদিত।

যদি কেউ মনে করেন, তপস্যাদি দ্বারা অণিমা লঘিমাদি যে ঐশ্বর্য লাভ হয়, সেগুলিই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সিদ্ধি, অতএব পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সিদ্ধিরূপে গণ্য হতে পারে না, তাহলে বলবো যে অধ্যয়ন, শাস্ত্রজ্ঞান, মনন, সুহৃৎ-প্রাপ্তি ও দানাদি ব্যতীত তপস্যা আচরিত হলে তাতে প্রকৃত মোক্ষদায়িনী সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না, কারণ তত্ত্বনিশ্চয়ব্যতিরিক্ত সিদ্ধিকে কখন প্রকৃত সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী সিদ্ধি বলা যায় না। ঐগুলি (যে বিভূতিলাভে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না) কেবল সিদ্ধির আভাস মাত্র। কাজেই যা পূর্বোক্ত যোগজ সিদ্ধির বিরোধী, তা অসিদ্ধি।

আমার আজকে সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ছে দিওয়ানাজীর কথা। যাঁর সঙ্গে আমি বৈষ্ণবতীর্থ সিদ্ধনাথ

মন্দিরে এসে পৌঁছেছিলাম। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সমাধিবান যোগী। নর্মদা পরিক্রমাকালে এরকম প্রেমিক সাধুর দর্শন আমি পাই নি। দিওয়ানাজী দিওয়ানাই বটে। ভগবানের নামে পাগল। তিনি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি বলতেন — প্রভুর নাম করতে ভালবাসি, নর্মদাতটে ঘুরে ঘুরে আমি তাঁরই নামগান করি। যে কোন পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলে, চলতে চলতে সে পায়, পেতে পেতে সে চলে। যার অবিকল প্রতিধ্বনি পাই রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি' তে —

যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া
পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া।

খালি গলায় তাঁর সুরের লহর যে কোন শুষ্ক প্রাণকেও সরস করে তুলত। এই বৃদ্ধ সাধুর বৃদ্ধ বয়সের কণ্ঠস্বরে এমন একটা স্বতঃস্ফুর্ত আবেগ এবং আর্তি জড়িয়ে থাকত, মনে হত এ যেন তাঁর প্রাণের গান। প্রাণের কান্না অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে যেন প্রীতম্ প্রিয়তমের চরণতলে।

দিওয়ানা সাধু কথায় কথায় গান ধরতেন, ভাবের ঘোরে পথের মধ্যেই নাচতে থাকতেন এবং নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ঢলে পড়তেন। গানেই এঁর বিশ্রাম, গানেই এঁর পূজা, ভজন গানই এঁর সাধনা। আজকাল গান করতে করতে বা গান শুনতে শুনতে অনেক সাধুবেশী ধূর্তকে হাত পা খিঁচে বা অভয়বাণী দেবার ভঙ্গীতে (যার অন্য নাম বরাভয় মুদ্রা) উপর দিকে হাত তুলে সমাধির ঢং করতে দেখা যায় আর এইরকম তথাকথিত 'দশাপ্রাপ্ত' বা 'ভাবস্থ' সাধু মহাশয়ের ভক্তরা তাঁকে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে অবতার বানিয়ে প্রচারের ডঙ্কা বাজাতে থাকেন। কিন্তু দিওয়ানাজীর সমাধি ছিল সমভাবে অধিষ্ঠান। তখন ধ্যেয় ধ্যাতা ধ্যান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন — এই ত্রিপুটের লয় ঘটত। আত্মসাক্ষাৎকার ঘটত। তাঁর দেহে কোন স্পন্দন থাকত না, নাসাভ্যন্তরচারিণো বায়ু, নাসিকার বাইরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্তব্ধ, হৃদপিণ্ডও স্তব্ধ, উর্ধদৃষ্টি, দেহটি নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির। তাঁর চোখে মুখে নাকে কপালে হাসির ভাব, আনন্দ ও জ্যোতি যেন উছলে পড়ছে। তাঁর শরীরের লালিমা ছিল দেখার মত। কেউ কোন সাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তাঁর উত্তর ছিল — প্রীতম কো পিয়ারা করো। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। সর্বদাই তিনি নিত্যযুক্ত অর্থাৎ — যিনি অহরহ অবাধে সর্বত্র সকল বস্তুর মধ্যে নিজ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। সর্বত্র একম্ এর অনুভব যার কাছে জলভাতের মতই সহজ ও স্বাভাবিক। — এই অবস্থায় থাকতেন। অতি উচ্চকোটির এই মহাত্মা অহর্নিশ ভগবৎ প্রেমে মত্ত। তাঁর সান্নিধ্যেই আনন্দ বেদনার একসঙ্গে অনুভূতি আমাদের জীবনে প্রথম ঘটে।

দেওয়ানাজীর হায়না তাড়নার একটি গল্প বললেই বুঝতে পারবেন তিনি কত বড় সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। উত্তরতট পরিক্রমাকালে আমি, যোগনাথজী ও দিওয়ানাজী নীলকণ্ঠ শিবমন্দির থেকে ককেড়া সংগমের পথে যাত্রা করি। বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ যোগনাথজী চিৎকার করে উঠলেন — হায়না, হায়না। কতদূর থেকে যে তারা আমাদের অনুসরণ করে আসছে জানতে পারিনি। যখন নজর পড়ল, তখন বড়জোর বিশ হাত দূরে। হায়না দুটির লোলুপ হিংস্র দৃষ্টি, লকলকে জিহ্বা, চোখগুলো যেন জ্বলছে। যোগনাথজী সামনে, আমি মাঝখানে, পিছনে দিওয়ানাজী। যোগনাথজীর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দিওয়ানাজী তড়িৎগতিতে আমাদের দুজনকে পিছনে ঠেলে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এইভাবে প্রায় মিনিট খানিক দাঁড়াবার পর আক্রমণোদ্যত হায়না দুটির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — সাধুলোগোঁকা উপর হামলা করনেবালা হে ডাঙ্গো (হায়না) মহারাজ, আপ্ দোনো বুড়বক হ্যায়। আপ্ জানতা নেহি রেবা তটমেঁ

ভূতানি রেবা ভুবনানি রেবা স্ত্রিয়ঃ পশবঃ নরাশ্চাপি রেবা।
যৎ যৎ দৃশ্যতে খলু সৈব রেবা রেবাস্বরূপাদ্ অপরং ন কিঞ্চিৎ।

মন্ত্রটি বলে তিনি পুনরায় হায়নাদের উদ্দেশে প্রণাম করা মাত্রই হায়না দুটো দৌড়ে বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর দিওয়ানাজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — দেখ্যা যোগনাথজীকা যোগবল? যোগীলোগ্ যোগকা প্রতাপসে হাজারোঁ শেরকো ভি হঠা দে সকতা হৈ। ম্যায় ত কাঙাল দিওয়ানা হুঁ। সিরিফ্ প্রণাম শিখা হ্যায়, ডাঙ্গো কো প্রণাম কিয়া।

কথা বলতে বলতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। মন্দির প্রায় ফাঁকা। পুরোহিতজী হাতজোড় করে আমাদেরকে

তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য বিনতি জানালেন। তিনি আমাদেরকে মন্দির থেকে একটু দূরে একটি বড় বাড়ীর একতলার ঘরে নিয়ে এসে তুললেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। রাত্রে ঘরে প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা করে দিয়ে পুরোহিতজী ফিরে গেলেন। বললেন — কাল্ সকালে কথা হবে। আমরা যে যার শয্যায় বসে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করার পর শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি পুরোহিতজী আমাদের ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছেন। আমরা উঠেছি দেখে বললেন — আপলোগ্ নাহা লিজিয়ে। শিবজীকা আরতি আভি শুরু হোগা। আমরা তাড়াতাড়ি গাঁঠরী বেঁধে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সেরে এসে মন্দিরে ঢুকলাম। শিবলিঙ্গের মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢালা শেষ হতেই পুরোহিতজী আরতি শুরু করলেন। শিবের মাথায় বেলপাতা চাপিয়ে প্রণাম করে মন আনন্দে ভরে গেল। আরতির শেষে মন্দিরের শিব এবং নর্মদাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম পথে। পুরোহিতজী আমাদের খেতে দিলেন গরম দুধ এবং সঙ্গে দিলেন রুটি ও ফল।

খাওয়া শেষে নর্মদার ঘাটে নেমে চোখ মুখ ধুয়ে কমণ্ডলুতে জল ভরে উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম একপাল নীল গাই আমাদের যাত্রাপথের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল। পুনরায় কাঁধে গাঁঠরী তুলে নিলাম।

পথ এখানে লাল ধূলায় ভর্তি। পথের দু'পাশেও লাল কাঁকর। কিছু কিছু শালগাছ, ঘোড়কে নিম, আমলকী এবং তেঁতুলগাছের জটলা চোখে পড়ছে। আমরা সতত রেবা-মন্ত্র জপ করতে করতে ঝাড়ি পথে হেঁটে চলেছি। এদিকটায় দেখছি ছোট ছোট জঙ্গলের আধিক্য বেশী। সেই জঙ্গলের ধার দিয়েই স্বচ্ছ সলিলা নর্মদা প্রবলবেগে বয়ে চলেছে। পথে বড় বড় কাঁকর। বেলা দশটা নাগাদ পৌঁছলাম বাকুল সংগমে। এখানে খরস্রোতা নর্মদার সঙ্গে সঙ্গম হয়েছে পাহাড়ী নদী বাকুল-এর। পথের মধ্যে আর একটা বেশ ঘন বন পেলাম। খুব উঁচু উঁচু শাল, আমলকী, পেয়ারা এবং খদির গাছ পরিক্রমাবাসীদের পথের দুধারেই ঘন সন্নিবিষ্ট। প্রায় তিন ঘন্টা হেঁটে আমরা গোয়দ ঘাট নামক একটি মহল্লায় পৌঁছলাম। জঙ্গল পেরিয়ে সমতল অঞ্চল। এখানে একটি পাথরের শিবমন্দির আছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হতে দেখলাম শিখাসূত্রধারী একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আমাদের দেখে মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। তিনি বললেন — পুরোহিতজী পূজা করকে আপনা কোঠি মে চলা গিয়া। হাম ইহাঁসে দু'ঘন্টাকে পথ ছিপানের ঘাটমে হামারা এক বিমার আত্মীয়কা পাশ যায়েঙ্গে। যাত্রাকে পূর্বে হাম শিবজীকে আশীর্বাদ মাগনে আয়ে থা। আপলোগ যায়েঙ্গা তো আপলোগোঁকা সাথ যায়েঙ্গে। খ্যার, একেলা যানে পড়েগা।

সকলে এই শিবমন্দিরেই রাত্রিবাসের সংকল্প করেছিলাম কিন্তু একজন পথ-প্রদর্শক পাওয়ায় আমরা আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়াই মনস্থ করলাম। তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে নর্মদা স্পর্শ করে শিবজীকে দর্শন ও প্রণাম সেরে নিলাম। ঋদ্ধনাথ মন্দিরের পুরোহিতজী প্রদত্ত রুটি ও ফল সঙ্গেই আছে। এখানে বসেই আমরা খুব তৃপ্তি সহকারে রুটি ও ফল গ্রহণ করলাম। আহার বিশ্রাম দুইই হল। বেলা প্রায় দুটা নাগাদ এখান থেকে পুনরায় হাঁটতে লাগলাম। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ জানালেন — আজ পৌর্ণমাসী হ্যায়। চলনেসে কোঈ দিক্কৎ নেহি।

আমরা হর নর্মদে হর ধ্বনি দিতে দিতে হাঁটতে লাগলাম নর্মদার তট ধরে। পথে পড়ল জলোদা ঘাট। সঙ্গী ব্রাহ্মণ জানালেন — 'ইহাঁ হরিহরেশ্বরকা মন্দির হ্যায়। ঘাটপর শ্রী রতিরাম বাবা কী সমাধি হ্যায়। মহাত্মা রতিরামজী বড়ে মহাত্মা থে। উনোনে ১৬শ শতাব্দী কা প্রারম্ভ মেঁ ইহাঁ নিবাস করতে থে।

কিন্তু গুরু পরম্পরা শুনেছি তিনি বলতেন, 'যোগী ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানীই বা কে, প্রকৃত ভক্তই বা কে?' অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার যোগীর পক্ষেই সম্ভব এবং সাক্ষাৎকারই জ্ঞান; আর জ্ঞেয়ের স্বতঃই ভক্তিতে, প্রেমে পরিণত। যেহেতু যোগীর লভ্য উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ভূমিসকল এই যোগিরাজাধিরাজের আয়ত্তে ছিল, সেইজন্য তাঁকে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ যোগী নয়, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ভক্তও বলা যেতে পারে। যোগমার্গের কঠোরতা, জ্ঞানমার্গের শুষ্কতা ও ভক্তিমার্গের অশ্রুপাতপ্রবণ বিরহ তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন নিত্যযুক্ত। তাই তাঁর জ্ঞানে ও আস্বাদনে মুহূর্তকালের জন্যও বিচ্ছেদ ছিল না।

মহাত্মা রতিরামজীর সমাধিতে প্রণাম জানিয়ে আমরা নীরবে এগিয়ে চললাম। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ চলেছেন আগে আগে। হয়ত দূরের মহল্লা থেকে বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে খোল, করতাল ও ঢোলকের শব্দ।

প্রায় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম ছিপানের ঘাটে। ঘাটে বিরাট শিবমন্দির। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ বললেন — ঔর এক মহর্ষি ইধার তপ কিয়া থা। উনকা নাম থা মহর্ষি ছান্দড়। ম্যায় উনকা বারেমেঁ জ্যাদা কুছ নহী

জানতা। দেখিয়ে, নর্মদাজীকে দোনোঁ তরফকা গ্রামকা নাম হ্যায় ছিপানর। উত্তরতটকা ছিপানর গ্রামসে ভোপাল রাজ্য সমাপ্ত হোতা হ্যায় ঔর ইন্দোর রাজ্য আরম্ভ হোতা হ্যায়। মন্দিরে রাত্রিবাস করব জেনে ব্রাহ্মণ আমাদের নমো নারায়ণায় জানিয়ে আত্মীয়ের বাড়ী গেলেন। একটু দূরেই মহল্লা। মন্দিরে ঢুকে দেখলাম এক বিরাট শিবলিঙ্গ। আমরা সাষ্টাঙ্গে সবাই প্রণাম নিবেদন করে মন্দিরেই আসন পাতলাম, মন্দিরের দরজা নেই। নর্মদার বুকে জ্যোৎস্নার ঢেউ জেগেছে। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। পূর্ণচন্দ্রের কিরণে চতুর্দিকে স্নিগ্ধ জ্যোতির প্লাবন! অপরূপ দৃশ্য। মন্দিরে একটি বড় ঘি-এর প্রদীপ জ্বলছে।

সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় ঘুম আসতে দেরী হল না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মন্দিরের জাগরণী ঘন্টাধ্বনিতে ঘুম ভাঙল। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন মন্দিরে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে সামনা সামনি সঙ্গীদের কাউকে দেখতে পেলাম না। বুঝলাম তারা শৌচাদি ও স্নান পর্ব সারার জন্য নর্মদার ঘাটে গেছেন।

একটু বেলার দিকে আমাদের পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। জানালেন — যে বিমার আত্মীয়কে দেখার জন্য কাল এসেছিলেন সে এখন অনেক সুস্থ। কবিরাজ মশাই ঔষধ দিয়েছেন। ভয়ের কোন কারণ নেই। একটু থেমে তিনি অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলতে লাগলেন — আমাদের কতকগুলি প্রশ্ন আছে যদি ইচ্ছা হয় তো উত্তর দেবেন।

হরানন্দজী — বেশক্ পুছ সাকতে হো। উত্তর দেনেকা লায়েক হোগা ত জরুর উত্তর মিলেগা।

এরপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি উত্তর দিতে লাগলাম।

প্রথম প্রশ্ন — কবচ মাদুলী দ্বারা লোক রোগমুক্ত হয়। মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ করে। অন্যের ক্ষতি করা কী যায়?

উত্তর — স্তবকবচমালায় যে কবচের উল্লেখ আছে, কিংবা পুরোহিত এবং জ্যোতিষীরা যে সব কবচ মাদুলী দেন তা নিষ্ফল। কিন্তু দ্রব্যগুণ আছেই। বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ করে যদি কোন বেদপারঙ্গম ব্যক্তি মাদুলী বা কবচের মাধ্যমে বেদে যে সমস্ত ভেষজের উল্লেখ আছে, সেগুলি দেন তবে তা ফলপ্রদ। বেদবিৎ ব্রাহ্মণ দুর্লভ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন — বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কাজে পুরোহিত ব্যবহার না করলে কি হবে?

উত্তর — বিবাহ হিন্দু সংস্কৃতির এক মহত্তম ব্যবস্থা। মুসলমান, খৃষ্টান বা পৃথিবীর তাবৎ অন্যান্য জাতির ব্যবস্থার মত হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতি কোন Contract নয় — Court বা তালাকের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা ছিন্ন করা যায় না। তমঃ থেকে জ্যোতির পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে ও অসত্য থেকে সত্যের পথে চর্য্যায় পতি পত্নী উভয়ে প্রাত্যহিক জীবনচর্য্যায় পরস্পরকে বহন করে নিয়ে চলবে এ তারই অখণ্ডনীয় প্রতিশ্রুতি। এর সঙ্গে জন্মান্তরীণ কর্মবন্ধনের প্রশ্নও জড়িত থাকে। বিবাহকালে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তার অর্থ শতকরা নিরানব্বই ভাগ পুরোহিত জানেন না; তারা ত তোতাপাখীর মত বুলি আওড়ায় আর পাত্র পাত্রী, বহুলোকের মধ্যে আড়ষ্ট চিত্তে সেগুলি আবৃত্তি করে মাত্র। অর্থবোধ হয় না, কাজেই বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীরা বিবাহের মন্ত্রগুলি পড়ে অর্থবোধ করে এবং তা অনুধ্যান করে তাহলে বুঝতে পারবে, হিন্দুর বিবাহ — উপনিষদোক্ত 'মধু-সাধনার' ব্যবহারিক প্রয়োগ কৌশল মাত্র। চৈতন্যদেব যে রাগানুগা ভক্তিধর্মের প্রবক্তা, হিন্দুর বিবাহ সেই রাগানুগা সাধন। প্রভেদ এই যে, এই পদ্ধতি রাধাকৃষ্ণের জয়মূর্ত্তির মধ্যে কল্পিত প্রেম বা মিলনের জৃম্ভণ ক্রিয়া নয়। হিন্দুর বিবাহ দুটি জীবন্ত হৃদয়ের পারস্পরিক মিলনমন্ত্র —

যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।

কাজেই কোন Via-Media দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

যে ভাবে আমাদের দেশে শ্রাদ্ধকার্য চলে তা নিরর্থক। বেদ-উপনিষদে এর কোন ভিত্তি নাই। গরুড়-পুরাণ রচনাকারী কায়েমী স্বার্থপরায়ণ স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদের এটি অপকীর্ত্তি মাত্র। শ্রাদ্ধের মূল কথা — শ্রদ্ধা। জীবন্ত ঈশ্বর ও ঈশ্বরী পিতা মাতার মহাপ্রয়াণের পর অন্ততঃ দশদিন যাবৎ ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে মাতাপিতার পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান এবং তাঁদের ভালবাসা, দয়া এবং মমতার কথা স্মরণ মনন করাই শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য। কলার খোলে অর্দ্ধসিদ্ধ পিণ্ড বা তিল এবং আতপচাল ফেলে দেওয়া, তাঁদেরকে প্রেত বলে সম্বোধন করা, মাতাপিতার

পুণ্যস্মৃতির প্রতি চরম অবমাননা। পুরোহিতরা তাই করায় এবং আপামর জনসাধারণ মূর্খের মত সংস্কারবশে তা করে থাকে। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী স্থানে মাতাপিতার জ্যোর্তিময় মূর্ত্তি কল্পনা এবং প্রার্থনা বিদেহীর ঊর্দ্ধগতিতে সাহায্য করে।

তৃতীয় প্রশ্ন — শুধু কি গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান করলে পিতামাতা উদ্ধার হন?

উত্তর — শুধু গয়াতে পিণ্ডদান নিরর্থক। শোষণ এবং লুন্ঠনকারী পাণ্ডা পুরোহিতদের ঊর্বর মস্তিষ্কেই গয়াসুরের জন্ম। গরুড় পুরাণ এর উৎস। 'গয়' কথাটি উপনিষদে আছে। এর অর্থ প্রাণ। অসুর শব্দটির অর্থ আপনাদের পুরাণকার বর্ণিত কোন দৈত্য দানা নয়। 'অসু' শব্দের অর্থ 'প্রাণ', 'র' বর্ণটি অস্ত্যর্থে। কাজেই এর আধ্যত্মিক অর্থ হল, দ্বিদলপদ্মে প্রাণচৈতন্যের ক্ষেত্রে বিগতদেহী যে স্বরূপতঃ দেহবিনির্মুক্ত আত্মচৈতন্যস্বরূপ, সেই ভাবের উদ্দীপন এবং মনন ঊর্দ্ধগতির সহায়ক।

চতুর্থ প্রশ্ন — ওঝার মন্ত্র দ্বারা সাপে কাটা রোগীকে আরোগ্য করা যায় কি?

উত্তর — ওঝার মন্ত্রে সাপে কাটা রোগী আরোগ্য হয় না। কিন্তু তারা যে জলসার এবং অন্যান্য জড়িবুটি প্রভৃতির প্রয়োগে নানাবিধ আনুষঙ্গিক ক্রিয়া করে; তা অনেক সময় ফলপ্রদ হয়। কারণ — পুরুষানুক্রমে বহু চিকিৎসা পদ্ধতি এইভাবেই আমাদের দেশে চলে আসছে। অবশ্যই মহাপুরুষদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁদের ইচ্ছাই প্রধান।

পঞ্চম প্রশ্ন — চোর ধরার জন্য গ্রাম দেশে ক্ষুর চালনা, বাটী চালনা প্রভৃতি প্রচলন কি সত্য?

উত্তর — চোর ধরবার জন্য আমাদের দেশে ক্ষুর চালনা, বা বাটি চালানো যে সব ক্রিয়া করা হয়, তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোজবাজি এবং ফাঁকি থাকে। কিন্তু বৈদিক যুগেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অপরাধীর মনে ভীতির সৃষ্টি এই Psychological reaction ছাড়া এখন আর এতে কোন কাজ হয় না। কিন্তু অথর্ববেদে এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে, যেগুলি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সংযোগে ক্ষুর বা বাটিতে স্পর্শ করলেই তার মধ্যে সাময়িকভাবে artificial magnetisation হয় এবং তা নড়তে থাকে। প্রয়োগকারী তার সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক জ্ঞান এবং তীক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রভাবে সমবেত জনতার মধ্যে প্রকৃত অপরাধীর মুখচ্ছবি দেখে তা অনুমান করতে পারতেন এবং তদনুযায়ী ক্ষুর বা বাটি সেদিকে চালিত করতেন। পূর্বেই বলেছি, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ দুর্লভ। কাজেই বর্ত্তমান গ্রাম্য ওঝারা ঐ সব প্রক্রিয়ার নামে, যা করে তা একটা যাদুশক্তিরই বিক্রিয়া মাত্র।

ষষ্ঠ প্রশ্ন — বাণ মারলে লোক অতি অল্প সময়েই রক্তবমি করতে করতে মারা যায় এটা কি সত্য?

উত্তর —'বাণ' মারলে লোক মারা যান না। 'বাণ' প্রয়োগ মিথ্যাবাজী মাত্র। তবে বাণ প্রয়োগের নামে কোন দুর্বৃত্ত যদি গুপ্তভাবে কোন বিষ প্রয়োগ করে, তার ফল ফলবে এতো সবারই জানা কথা।

সপ্তম প্রশ্ন — গ্রামে শোনা যায় কোন কোন বাড়ীতে ভূত প্রেতের ঢিল ছোঁড়ার কথা। এটা কি?

উত্তর — নিতান্ত ভীরু, ক্লীব এবং নির্বোধরাই ভূতে বিশ্বাস করে। ভূত মানে — অতীত। যা গত হয়েছে তাই 'ভূত'। গতায়ু ব্যক্তির পক্ষে ঢিল ছোঁড়া সম্ভব নয়। এর মূলেও দুষ্টলোকের কারসাজি।

অষ্টম প্রশ্ন — ইহজীবনের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ইহজীবনেই ভুগতে হবে না পরজন্মে।

উত্তর — ইহজীবনের সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি ইহজীবন এবং পরজীবন দুই কালেই ভোগ করতে হবে। যেগুলি উৎকট পাপাচার — যেমন মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া, শিশু হত্যা এবং সর্ববিধ হিংসা এবং ঈর্ষার ফল অবশ্যই এ জন্মে ভুগতে হয়। বাকী সব কর্মই তা সু বা কু যাই হোক না কেন, তা চিত্তে — অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের খাতায় প্রতিমুহূর্তে record করা থাকে। পরজীবনে তার ভোগ অবশ্যম্ভাবী। 'ন ভুঙ্‌ক্তে ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি'॥ Universal law of nature এমনি এখানে সবকিছুই ঘুরে ফিরে আসে — ভোগ করতে হয়। প্রতি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। এতো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। এই বর্ণানুসারী ফল অনুযায়ী কোন শিশুর গাছতলায় জন্ম হয়, কোনটি বা প্রাসাদে জন্মে। যে পূর্ব্ব জন্মে কৃপণ ছিল, অনাচারী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা মাতাপিতার সেবা করে না, গাছতলায় জন্ম তাদের বিধিলিপি। আবার মুক্তপুরুষও গাছতলায় জন্মান। এরও কারণ মাতাপিতার সেবার প্রত্যবায়। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে সন্ন্যাসীরা বিরজা হোম করে, মাতাপিতা জীবিত থাকলেও মাতাপিতার শ্রাদ্ধ করে থাকে। মাতাপিতা এমনি পরমগুরু যে শাস্ত্রানুমোদিত ঐ ক্রিয়া দ্বারা

সে অপরাধ করে। তার ফলে তার ব্রহ্মসাযুজ্য হয় না। তীব্র সাধনকালে ব্রহ্মসামীপ্যরূপ, ব্রহ্ম সালোক্য প্রভৃতি অবান্তর মুক্তিফল তার করতলগত হলেও তাকে পুনরায় জগৎচক্রে ফিরে আসতে হয় এবং সেই জন্মে তৎকালীন মাতাপিতার সেবা করে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করতে হয় এই সময় উচ্চকোটির খোকারাও গাছতলায় জন্মাতে পারেন। যাঁরা পূর্বজন্মে অনেক দান ধ্যান করেন বা সাধনাকালে বিভূতির মোহে বিভ্রান্ত হন তাঁরাই ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। 'তপসে রাজ, রাজসে যোনি, যোনিসে ফিন নরক'। কাজেই প্রাসাদে জন্ম খুব একটা সৌভাগ্যের কথা নয়।

নবম প্রশ্ন — গ্রামে লোক বলে খাওয়ার সময় কোন ব্যক্তি নজর দিলে তাতে ক্ষতি হয়।

উত্তর — খাওয়ার সময় কেউ নজর দিলে ক্ষতি হয় — এটি অমোঘ সত্য! দৃষ্টির দ্বারা মানুষ খাদ্যবস্তু লেহন করে। দৃষ্টিপথে যে রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তার দ্বারা খাদ্যবস্তু দূষিত হয়। লোভী এবং তমোগুণীর দৃষ্টি বিষময়। আপনার খাদ্যসম্ভার দেখে অনেকবার অবচেতন মনে লিপ্সা, ক্ষোভ এবং জুগুপ্সার ভাব স্বতঃই উপজিত হতে পারে — কাজেই কারও সামনে খাওয়া উচিত নয়। এতে খাদ্যের শুচিতা বজায় থাকে না। পাঁচজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ভোজ, Dinner Table এবং হোটেল সংস্কৃতি পাশ্চাত্য অপশিক্ষার ফল। এদিক দিয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। তবে মা বাবা এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা এইসব একান্ত প্রিয়জনের মধ্যে একত্র ভোজনে কোন দোষ নাই। মা বাবার চোখের সামনে বসে খেলে নিতান্ত তুচ্ছ খাদ্যও পুষ্টিকর হয়।

দশম প্রশ্ন — প্রাণায়াম করলে আয়ু বাড়ে?

উত্তর — প্রাণায়ামে আয়ু বাড়ে কিন্তু প্রাণায়াম বলতে আপনি বা ভারতবর্ষের তাবৎ লোক যা বুঝে থাকেন সে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা আয়ু বাড়ে না। বরং রোগবৃদ্ধি হয়, স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। মানুষের শরীর কামারশালার ভস্ত্রা নয়। কাজেই রেচক পূরক কুম্ভকের নামে শ্বাস প্রশ্বাসের কসরৎকে প্রাণায়াম বলে না। 'প্রাণায়াম' শব্দটির অর্থ, প্রাণের অয়মন বা বিস্তার। বেদ এবং পাণিনি মতে প্রকৃত প্রাণায়াম হল 'বিচ্ছর্দনাভ্যাম্' এ একরকমের বমন ক্রিয়া — উদ্বৃত্ত কফ-বায়ুপিণ্ডের বমন, তমোগুণের বমন, বিষয়লিপ্সার বমন, কামনার বমন এবং যুগপৎ ব্রাহ্মীস্থিতি। এ গুপ্ত পদ্ধতি গুরুমুখগম্য।

একাদশ প্রশ্ন — অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করলে ক্ষতি হয়?

উত্তর — অশ্লেষা মঘা বা যে কোন নক্ষত্রে যাত্রা করলে ক্ষতি হয় না, পঞ্জিকাকারদের মতে — 'মঘায়াং মরণং ভবেৎ' — কিন্তু ভাস্করাচার্য্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ্ ব্রহ্মগুপ্ত এবং তিলক প্রভৃতির মতে 'মঘা' পরম পুণ্যবতী নক্ষত্র।

দ্বাদশ প্রশ্ন — মালা তিলক পৈতার ব্যবহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর — মালা, তিলক সম্প্রদায়ের ভেদচিহ্ন মাত্র কিন্তু পৈতার ব্যবহার কেবলমাত্র জাতিগত চিহ্নের প্রতীক নয়। পৈতা একটী সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক। পৈতার মূলে ছিল স্ব স্ব গোত্রাধিপতি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের আদর্শ এবং সত্যানুসারণের মহৎ মহৎ সঙ্কল্প। সংসারকেই ব্রহ্মাঙ্গণে পরিণত করবো। ব্যবহারিক জীবনের জীবনজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে অহরহ ব্রহ্মের প্রকাশ দেখব, এই মহতী ইচ্ছাই ব্রাহ্মণদের পৈতা ধারণে প্রচোদিত করে। এই ভাবে ব্রহ্ম অনুধ্যানের দ্বারাই মানুষ স্বস্বরূপে উপনীত বা উপবীত হয়ে থাকে। উপনীত এবং উপবীত — দুটো শব্দই সমার্থক। উপনীত হতে পারলে তবেই উপবীত ধারণের সার্থকতা। পৈতা গ্রহণ কালে প্রতিটি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে এই মহৎ আদর্শ গ্রহণ করতে হয়। প্রতিদিন গায়ত্রী জপকালে সেই আদর্শেরই স্মরণ-মনন। আদর্শ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কাজেই পৈতার সার্থকতা আছে।

আমার কথা শেষ হতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের প্রণাম পূর্বক বহুৎ 'সুক্রিয়া' জানিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় ৫ মিনিট যেতে না যেতেই ভোজন সামগ্রী নিয়ে দুজন লোকসহ পুরোহিতজী উপস্থিত হলেন। পুরী ও লাড্ডু সহযোগে আমাদের ভিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হল। বেলা তখন প্রায় আড়াইটা বা তিনটা হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর পুরোহিতজী বললেন — আপনারা ঘন্টাখানিক জিরিয়ে নিন। আমার লোক এই মন্দিরের বাইরে থাকবে। কাউকে এদিকে আসতে দেবে না। পুরোহিতজী বিদায় নিতেই আমরা মন্দিরের ভিতর শিবলিঙ্গকে ঘিরে নিজেদের আসন পাতলাম।

আমার দিকে চেয়ে হরানন্দজী বললেন — আমি মহর্ষি ছান্দড়ের নাম শুনিনি। আপনার এঁর সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?

— আমরা বাৎস্য গোত্রীয় রাঢ়শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা সবাই মহর্ষি ছান্দড়ের সন্তান। তিনিই আমাদের আদিপুরুষ বলা চলে।

— আমাদের আদিপুরুষরা কবে ও কিভাবে বাংলায় আসেন?

— প্রায় দু'শত বৎসর ধরে বিদেশী রাজত্বের ফলে বাংলার সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জ্ঞানের ধারা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূতরা বিস্মৃত প্রায় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার ভিত্তির উপর নূতন সমাজ ও জাতি গড়ে তোলেন। কালের প্রবল স্রোতে ধর্ম ও সমাজে যে সমস্ত পরিবর্তন দৃঢ় হয়েছিল তা স্বীকার করে নিয়েই তাঁরা প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বাংলাদেশের প্রাণে নূতন জীবন সঞ্চার করেছিলেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ও তার পরে প্রচলিত কুলগ্রন্থগুলিতে আমাদের আদিপুরুষদের আনয়ন কর্তা আদিশূরের কথা থাকলেও, আদিশূরের প্রকৃত ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাঁর সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রবাদও প্রচলিত ছিল না। আদিশূরের কথা উপকথায় এবং সাধারণ মানুষের মুখে মুখে নানা কাল্পনিক ঘটনা যুক্ত হয়ে এর বহু রূপান্তর ঘটেছে। তবু আমি যেটুকু জানি সেটুকুই বলছি।

রাজতরঙ্গিনী হতে জানা যায় জয়াদিত্য পঞ্চগৌড় জয় করে তাঁর জামাতা শূরবংশীয় পরাক্রান্ত রাজা জয়ন্তকে ৭৩২ খৃঃ অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ের সিংহাসনে বসান। তিনিই আদিশূর উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহনের পর বেশ কয়েকটি বছর তিনি কাটান যুদ্ধ বিগ্রহ করে। তারপর একে একে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, কামরূপ, গৌরাষ্ট্রসহ আরো কয়েকটি রাজ্যকে পদানত করে এক শক্তিশালী রাজাতে পরিণত হন।

৭৪৬ খৃঃ কুল পুরোহিতের পরামর্শে রাজা আদিশূর তাঁর পুত্রের মঙ্গল কামনায় এক বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু তিনি বাংলায় কোন বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্ধান পেলেন না। কারণ সেই সময়ে রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সপ্তশতীরাই (যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ সপ্তশতী নামক জনপদে বাস করেন) প্রধান। বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকার মতে এই সপ্তশতীরা ছিলেন বেদ-বিধান বঞ্চিত। কুলাচারী আভিচারিক ক্রিয়ায় চতুর এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নকার্যে পটু। রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতীদের সম্বন্ধে কুলাচার্য নুলো পঞ্চানন লিখেছেন —

সাতশতী দ্বিজগণে পটু শূদ্রের যাজনে
নাহি যাতে বেদ অধিষ্ঠান।
বিধিসিদ্ধি ক্রিয়াদায় শূদ্রেও যে গোত্র পায়
যে যার চরণে লয় স্থান।

কাজেই এই জাতীয় ব্রাহ্মণ দিয়ে যে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন সম্ভব নয় বুঝে রাজা আদিশূর পড়লেন চিন্তায়। রাজা বিশিষ্ট বণিক ও তাঁর প্রিয়পাত্র সনক আঢ্যের শরণাপন্ন হলেন। অবশেষে রাণী চন্দ্রমুখীর পরামর্শে রাজা আদিশূর বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্ধানে সনক আঢ্যকে পাঠালেন কনৌজের রাজা বীরসিংহের কাছে। বীরসিংহ ছিলেন আদিশূরের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয়। তিনি আদিশূরের সম্মান রাখলেন। সনক আঢ্যের সঙ্গে পাঠালেন পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে। আনুমানিক ৭৫৩ - ৭৫৬ খৃঃ আদিশূর কর্তৃক পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কাণ্যকুব্জ হতে গৌড়ে আনীত হন। লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়', পার্বতীশঙ্কর চৌধুরীর 'আদিশূর ও বল্লালসেন' এবং বাচস্পতি ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধে লিখেছেন — পঞ্চ ব্রাহ্মণগণকে বর্ম, চর্ম, ধনুর্বাণধারীবেশে আসতে দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আদিশূর তাঁদের অভ্যর্থনা না জানিয়ে অন্তঃপুরে চলে যান। এতে ব্রাহ্মণগণ ক্ষুব্ধ না হয়ে তাঁদের আশীর্বাদী দুর্বাক্ষত মল্লকাষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করেন। শুকনো কাঠ তখনই মঞ্জরিত (জীবিত) হয়। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনায় আদিশূর ব্রাহ্মণগণের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

মহা ধুমধামে যজ্ঞ সম্পন্ন হল। ব্রাহ্মণরা ফিরে গেলেন দেশে। কিন্তু তাঁরা জানতেও পারলেন না কতটা যশ ছড়িয়ে এলেন গৌড়ে। মহা মহা পণ্ডিতদের যজ্ঞকর্মে মুগ্ধ রাজা আদিশূরের চিন্তায় ঝিলিক দেখা দিল যে এই সমস্ত পণ্ডিতদের গৌড়ে রাখলে গৌড়ের সম্মান বর্ধিত হবে। তিনি ফের সনক আঢ্যকে পাঠালেন বীরসিংহের কাছে

যাতে ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণ সপরিবারে এসে গৌড়ে বসবাস করেন। তিনি তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাইলেন। বীরসিংহ এবারেও আদিশূরকে হতাশ করলেন না। সেই পাঁচ ব্রাহ্মণ সপরিবারে গৌড়ে ফিরে এলেন।

কিন্তু এই পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কবে এদেশে এসেছিলেন সেই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত বর্তমান।

১) কুলার্ণবের মতে ৮৫৪ শকে — বেদবাণাহিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।

২) বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ও বাচস্পতির মতে ৬৫৪ শকে

৩) ভট্ট গ্রন্থ মতে ৯৯৪ শকে —

শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা
অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদমুক্তা তদা
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিশে
শহর শলর ত্যজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে।

৪) কায়স্থ কৌস্তুভের মতে ৩৮০ বাংলা সনে (৮১৪ শকে)

৫) দত্ত বংশমালার মতে ৮০৪ শকে — গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্ট শতাব্দকে।

৬) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃঃ অর্থাৎ ৮৮৬ শকে।

৭) সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে ৯৯৪ সংবতে অর্থাৎ ৮৬৪ শকে।

৮) আমার মতে ৭৫৩ — ৭৫৫ খৃঃ মধ্যে জ্বলদর্চিমান অগ্নিতুল্য বেদজ্ঞ আমাদের পূর্বপুরুষগণ কনৌজ (কোলাঞ্চ) হতে বাংলাতে পদার্পন করেন। বেদগানে সমগ্র গৌড়দেশ মুখর হয়ে ওঠে। কারণ বল্লাল সেন 'দানসাগর' রচনা করেছিলেন ১০৯১ শকে অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি বাংলায় যখন কৌলীন্য প্রথা চালু করেন তখন কনৌজগত ব্রাহ্মণদের ৮ম হতে ১৫শ পুরুষ গত হয়ে গেছে।

হরানন্দজী — যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসেছিলেন তাঁরা কী কী নামে পরিচিত ছিলেন?

প্রাচীন কুলাচার্য হরি মিশ্রের মতে এঁদের নাম ছিল ক্ষিতীশ (শাণ্ডিল্য), মেধাতিথি (ভরদ্বাজ), বীতরাগ (কাশ্যপ), সুধানিধি (বালস্য) ও সৌভরি (সাবর্ণ)। বাচস্পতির মতে কবি ভট্টনারায়ণ (শাণ্ডিল্য), দক্ষ (কাশ্যপ), ছান্দড় (বাৎস্য), হর্ষ (ভরদ্বাজ), বেদগর্ভ (সাবর্ণ)। বরেন্দ্র কুলাচার্যের মতে নারায়ণ (শাণ্ডিল্য) জম্বুত্বের গ্রাম থেকে, ধরাধর (বাৎস্য) তাড়িত গ্রাম থেকে, সুষেণ (কাশ্যপ) কোলাঞ্চ হতে, গৌতম (ভরদ্বাজ) ঔড়ম্বর গ্রাম হতে, পরাশর (সাবর্ন) মদগ্রাম হতে গৌড়েশ্বরের সভায় আসেন।

কিন্তু এড়ু মিশ্র, দেবীবর মহেশ প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্যগণের বর্ণনা হরিমিশ্রের উল্লেখিত নাম ও বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল আছে। তবে এঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আদিশূর এইসব কনৌজাগত পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের কামঠী বা কামকোটি, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম এবং বটগ্রাম — এই পাঁচখানা গ্রাম দান করেছিলেন। একমাত্র কামঠী ছাড়া বাকী ৪টি গ্রামের সন্ধান জানা গেছে ঃ-

ব্রহ্মপুরী — বর্তমান নাম ব্রহ্মপুর। মালদহ হতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে। ভাগীরথীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২৪°৫৩'৫৫" উঃ এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°৮'৪৫" পূঃ।

হরিকোটি — বর্তমান নাম হরিপুর। ভাগীরথীপুরের (মালদহ শহরের ২ ক্রোশ পশ্চিমে) ১/২ ক্রোশ পশ্চিমে এবং কালিন্দী নদীর দক্ষিণে বিদ্যমান। অক্ষাংশ ২৫°৩' উঃ ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮°৬'৪৫" পূঃ।

কঙ্কগ্রাম — বর্তমান নাম কাঁকড়ী। রাজশাহী জেলা ও গঙ্গার ১১/২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২৪°৩৮'৪৫"উঃ এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২' পূঃ।

বটগ্রাম — বর্তমান নাম বটরিয়া বা বটোড়ি। মালদহ জেলার গঙ্গার তটে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২৪°৪৬'৪৫"উঃ ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১৩'৫৫" পূঃ।

সে সময় ঐ পঞ্চ ব্রহ্মণের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না। পরে জয়ন্ত আদিশূরের পুত্র ভূশুর মগধাধিপতি ধর্মপালের নিকট রাজ্য হারালে ভূশুর এসে রাঢ় দেশে পুণ্ড্র নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন, যা ছিল হুগলী জেলার পাণ্ডয়া বা পেঁড়ো। ঐ সময় ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে পুত্ররা এসে রাঢ়দেশে বাস করলেন, তাঁরা সকলে 'রাঢ়ীয়' নামে পরিচিত হলেন এবং যাঁরা এলেন না পূর্ব নিবাস বরেন্দ্রভূমে থেকে গেলেন তাঁরা বারেন্দ্র নামে অভিহিত হলেন।

এই সময়ে শাণ্ডিল্য গোত্রে দামোদর, কাশ্যপ গোত্রে কৃপানিধি বা সুষেণ, ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতম, বাৎস্য গোত্রে ধরাধর এবং সাবর্ন গোত্রে রত্নগর্ভ বরেন্দ্রভূমে থেকে যাওয়ায় বারেন্দ্র হলেন আর শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ, বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ রাঢ়দেশে আসায় রাঢ়ী নামে অভিহিত হলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিশ্রামের পর 'উঠব, উঠব' করছি এমন সময় পুরোহিতজী এসে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বসতে বসতে বললেন — পরিক্রমাবাসীদেরকে যেমন মা নর্মদাকে সর্বদা চোখে চোখে রেখে পরিক্রমা করতে হয়, তেমনি মাও তাঁর পরিক্রমাবাসী সন্তানকে প্রতি মুহূর্তে চোখে চোখে রাখেন। মা নর্মদার তটে তটে বহু ঋষি ও মহাযোগীর সর্বসিদ্ধির সুযোগ করে দেন স্বয়ং মা নর্মদা। আশা করি আপনারা তা পদে পদে অনুভব করেছেন। এরপরই পুরোহিতজী আরতির আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। সূর্য পাটে বসেছেন। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে।

নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরে গিয়ে দেখি গ্রামের বহুলোক এসেছেন আরতি দেখতে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর সঙ্গীরাও এসেছেন আরতি দেখতে। আমরাও আরতি দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। মন্দিরে সমাগত ভক্তরা শিঙা ডম্বরু ও ঢোলক বাজাতে লাগলেন। ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে চারদিক সুরভিত হয়ে উঠছে। পুরোহিতজীকে দেখলাম নাচতে নাচতে ভাবাবেশে আরতি করছেন। তিনি গাইছেন —

তবৈশ্চর্যং যত্নাদ্‌যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল — মনলস্কন্ধবপুষঃ
ততো ভক্তি শ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি।

হে গিরিশ, (অনন্ত জ্যোতির্লিঙ্গরূপ) তেজঃপুঞ্জ মূর্তি তোমার ঐশ্বর্যকে সযত্নে পরিমাপ করতে ব্রহ্মা বিষ্ণু, ঊর্ধ ও অধোদিকে গমন করেও অসমর্থ হলেও তাঁরা ভক্তি ভরে স্তুতি করতে থাকলে (উক্ত ঐশ্বর্য) তাঁদের নিকট স্বয়ং প্রকটিত হয়েছিল; সুতরাং তোমার সেবা ফলবতী হবে না কেন?

আরতি শেষ হল। সকলে মহাদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠে দেখি মন্দিরের ভাব গম্ভীর পরিবেশে মহাদেব আরও স্তব্ধ ও গম্ভীরতর রূপ ধারণ করেছে, পুরোহিতজী মন্দিরের দরজা টেনে দিয়ে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপগৃহে এলেন। আমরা যে যার আসন বিছিয়ে বসলাম। পুরোহিতজীও আমাদের কাছে বললেন — আমার নাম শিরোহরি শর্মা। বয়স ষাট। পিতাশ্রী গত হবার মাত্র ১৮ বছর বয়স থেকে আমি এই মহাদেবের সেবায় রত। আমি আপনাদের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ। সারাজীবন বৈদিক সংস্কার তথা হিন্দু সংস্কারের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা পোষণ করলেও শাস্ত্রানুমোদিত পন্থায় যোগাভ্যাসের সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ নেই। তাই আজ আপনাদের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন জানতে কোন সংকোচ বোধ করছি না। দয়া করে কী বলবেন ঈশ্বর সম্বন্ধে বৈদান্তিকদের বক্তব্য কী? তাঁর স্বরূপ লক্ষণই বা কী?

আমি — আপনি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর (Sensitive) প্রশ্ন করেছেন — ঈশ্বর কে এবং কি? এটি যথোচিতভাবে আলোচনা করতে গেলে ভক্ত হৃদয় ব্যথায় টনটন্ করে উঠবে। ভক্তদের 'মানিত' ঈশ্বর এবং জ্ঞানীদের 'জানিত' ঈশ্বরে দুস্তর প্রভেদ।

কালী, শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি যে সব কল্পিত ঈশ্বরের প্রাদুর্ভাব বর্তমানকালে যত্র তত্র দেখা যায়, বলা বাহুল্য, দর্শনশাস্ত্রে ঐ সব স্বরূপ কোথাও আম্নাত হয় নি। পাতঞ্জল যোগদর্শনে 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ' (১/২৪) বলে একটি সূত্র আছে বটে কিন্তু সে ঈশ্বরঃ ভক্তদের বহু আলোচিত ও পূজিত ঈশ্বর নন।

সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন সরাসরি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুদ্ধদেবও সারাজীবন ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। অনেকে এ যুগে 'ঈশ্বরকে দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি — এই যেমন তোকে স্পর্শ করছি, তেমনিভাবে তাঁকেও স্পর্শ করা যায়, তোর যেমন হাত-পা বিশিষ্ট অবয়ব আছে, তেমনি ঈশ্বরেরও আছে' — ইত্যাদি বলে বিহ্বল ও বিস্মিত ভক্তের বাহবা কুড়িয়েছেন বটে কিন্তু সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বুদ্ধদেবকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করেও ঈশ্বর সম্বন্ধে এবম্বিধ রোচক, মনোহারী এবং পুষ্পিত কোন ইতিবাচক উত্তর কেউ আদায় করতে পারেন নি। বারদীর বিখ্যাত যোগীশ্বর শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী 'সিদ্ধজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, একবার ঢাকার কয়েকজন বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মচারীকে প্রশ্ন

করেন —'ঈশ্বরের স্বরূপ কি?' তদুত্তরে ব্রহ্মচারী উত্তর দেন —'ঈশ্বর নামক কোন পদার্থের সহিত এ পর্যন্ত আমার পরিচয় হয় নাই, ইহার পর যদি সেই বস্তুর অস্তিত্ব দেখিতে পাই, তবে তোমাদিগকে বলিতে পারিব।' লেখক এই ঘটনার উল্লেখ করে পরিশেষে মন্তব্য করেছেন — 'জগতের পতি কেহ নাই বন্ধুগণ। তোমরা না বুঝিয়া জগতের সৃষ্টিকর্তা, পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কারদাতা, সুখ দুঃখের নিয়ন্তা ন্যায়বান্ রাজার মত জগতের একজন পতি কল্পনা করতঃ সেই কল্পিত জগৎপতিকে ঈশ্বর বলিতেছ। ইহাতে কি তোমাদের রহিল, যাহা নাই তাহাকে ঈশ্বর মানিলে কি নাস্তিকতা হয় না।'

এই প্রসঙ্গে বেদব্যাস রচিত বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সাঁইত্রিশ নম্বর সূত্রটি স্মরণীয় — 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' অর্থাৎ জগতের একজন পতি আছেন, এ কথার সামঞ্জস্য হয় না।

এই সূত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলেছেন — 'কেবলং নিমিত্তকারণমীশ্বর ইত্যাদি পক্ষো বেদান্তবিহিতব্রহ্মৈকত্ব — প্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেনাত্র প্রতিষিধ্যতে।' ভাবার্থ এই, যদি নিমিত্ত কারণকেই ঈশ্বর ভাবা হয়, তাহলে উপাদান কারণ বাদ থাকে এবং সেই বাদ থাকা উপাদান রচিত জগৎও বাদ থেকে যায়। সুতরাং জগৎ ঈশ্বর হতে পৃথক হয়ে পড়ে। বেদান্তের বিধান এই যে এক ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই। এখানে জগৎই দ্বিতীয় হচ্ছে। এই দ্বৈতবাদ বেদান্ত জ্ঞানের পরিপন্থী। এ জন্য সূত্রাকার ব্যাস এখানে জগৎ হতে ভিন্ন জগৎপতির কল্পনাকে খণ্ডন করতে বাধ্য হয়েছেন।

উপসংহারে শঙ্করাচার্য একথাও বলেছেন — 'এবমন্যাস্বপি বেদবাহ্যাসু ঈশ্বরকল্পনাসু যথাসম্ভবমসাঞ্জস্যত্বস্য যোজয়িতব্যম্' — অর্থাৎ কেবল উপস্থিত স্থলে নয়, অন্য যত প্রকার বেদবাহ্য কেবল নিমিত্তকারণ স্বরূপ ঈশ্বর কল্পিত হবে তৎসমুদয়ের প্রতি অসামঞ্জস্য দেখা আবশ্যক।

নির্গলিতার্থ এই যে, কুম্ভকার যেমন ঘট শরা কলসী প্রভৃতি প্রস্তুত করে সেই সকল মৃদভাণ্ডের পতি হয়, ভাবরসাপ্লুত ভক্তগণ মনে করেন কেউ একজন তেমনিভাবে জগৎ সৃষ্টি করে তার পতি বা ঈশ্বর হয়ে বসেছেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, কুম্ভকার নিজে ঘট শরা কলসী প্রভৃতি হতে পারে না, ঐ সব বস্তু হতে তার একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা থাকে। কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ মৃত্তিকা। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র মতে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন সত্তাই নাই। তিনিই জগতের উপাদান কারণ। বিশেষত্ব এই যে এই জগদুপাদানের এমন শক্তি আছে, যার দ্বারা তিনি নিজেই ভাণ্ডরূপে পরিণত হয়ে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রহ্মকে একাধারে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বলে মনে করা হয়। জ্ঞানসিদ্ধি হলে বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যাখ্যা থেকে ভক্তের কল্পিত ঈশ্বর এবং জ্ঞানীর উপলব্ধ ব্রহ্মের পার্থক্য আশা করি অনুমান করতে পারছেন।

এই তত্ত্ব আর একটু স্পষ্ট ও সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় — যেমন বৃক্ষসমষ্টির নাম বন, তরুলতা সমষ্টির নাম উদ্যান, তেমনি জীবচৈতন্য সমষ্টির নাম ঈশ্বরচৈতন্য। যখন চৈতন্য একদেহাভিমানী তখন জীব, যখন সর্বদেহাভিমানী তখন ঈশ্বর। বৃক্ষগুলিকে পৃথক করলে যেমন বনের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি জীবচৈতন্যের অতিরিক্ত ঈশ্বরাখ্য কোন স্বতন্ত্র চৈতন্যের অস্তিত্ব নাই। যেমন একই সাপ কখনও কুণ্ডলীকৃত কখনও ফণাধারী এবং লম্বমান অবস্থাতে থাকে, সেইরকম একই চৈতন্য নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্য, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরচৈতন্য এবং জীবচৈতন্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এখন বনের বৃক্ষগুলি যদি বনকেই তাদের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা বলে ভাবে এবং তারস্বরে চীৎকার করতে থাকে 'হে বন! দেখা দাও, দেখা দাও' তাহলে তা কি একটা হাস্যকর বিড়ম্বনা নয়? কারণ কে কাকে উত্তর দেবে? বৃক্ষ ভিন্ন বনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? আপনি যদি 'কোথায় হে শিরোহরি! শিরোহরি কোন্ ঘরে? আপনি নিজেই যে শিরোহরি, আবার নিজেকে অন্যত্র কোথায় খুঁজে বেড়াবেন? অনাদ্যন্তকাল ঐভাবে খোঁজ করলেও পাবেন? পাবেন না। বেদ-বেদান্তও দ্বৈতজ্ঞানে কোন কল্পিত ঈশ্বরের (Personal God) উপাসনার কথা বলেন নি। বেদের উপদেশ — তত্ত্বমসি — তৎ (ব্রহ্ম) ত্বম্ (জীব) অসি (হও)। অহং ব্রহ্মাস্মি। এষত আত্মা সর্বান্তরঃ, এষত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ। আত্মাই সকলের অন্তরে, এই আত্মাই অন্তর্যামী ও অমৃত। জীবভাব ক্ষরভাবের অবসান ঘটিয়ে অখণ্ড অক্ষর অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই নিঃশ্রেয়সলাভ।

এই হল বেদ-বেদান্তের মূলতত্ত্ব। অদ্বৈততত্ত্বের উপাসকদের এইটাই মুখ্য সাধ্য-সাধনতত্ত্ব। কিন্তু অদ্বৈতবাদী

ছাড়া আমাদের দেশে অন্যান্য বাদীর কি কোন অভাব আছে? দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, সৎকার্যবাদ[১], অসৎকার্যবাদ[২], প্রতিবিম্ববাদ[৩], অবচ্ছেদবাদ[৪] এবং আভাসবাদ[৫] প্রভৃতি বহু মতবাদই বর্তমান, প্রত্যেক বাদীরাই ঈশ্বর ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা, এই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিসংবাদেরও ঘাটতি নাই। সেই সব বিসংবাদের বিবরণে আমাদের প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থগুলি মুখর। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাঁর লক্ষণ কি? ঈশ্বর নামধেয় কোন পুরুষ জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ামক কিনা? চরম তত্ত্ব কোন্‌টি — ঈশ্বর না ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ আছে কি না? — ইত্যাদি নানা বিষয়ে আবহমান কাল ধরে পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ নানারকম বিপ্রতিপত্তি (সংশয় প্রকাশ ও বিরুদ্ধ যুক্তি উত্থাপন) করে আসছেন। বিদ্যারণ্য মুনি কৃত 'পঞ্চদশী' পড়লে ঐ রকম অনেক বিপ্রতিপত্তির বিবরণ পাবেন।

পাতঞ্জলের অনুবর্তী যোগাচার্যদের বিবেচনায় চৈতন্যের সন্নিধানে চেতনবৎ প্রবৃত্ত্যা প্রকৃতির নিয়ামক যিনি তিনিই ঈশ্বর, তিনি সকল জীব হতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সুখ দুঃখ ধর্ম অধর্ম সৎক্রিয়া বা ক্রিয়া এবং তজ্জাতীয় সংস্কারের দ্বারা অসংপৃষ্ট পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর পদবাচ্য। তিনি অসঙ্গানন্দ চেতনস্বরূপ হলেও তাঁর নিয়ন্তৃত্ব না স্বীকার করলে বন্ধ মোক্ষাদি ব্যবস্থার অনিয়ম হয়।

যাঁরা হিরণ্যগর্ভের উপাসক প্রাণেশ্বরবাদী, তাঁরা বলেন যদি ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানাদি গুণ স্বীকার করা হয় তবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনাদিকাল ধরে চলতে থাকুক এ কথা মানতে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। কাজেই লিঙ্গশরীরের সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভই প্রকৃত ঈশ্বরপদবাচ্য। স্থূল শরীর ছাড়া কেবল লিঙ্গশরীরের উপলব্ধি হয় না। অতএব স্থূল শরীর সমষ্টি অভিমানী সর্বত্র মস্তকাদি বিশিষ্ট বিরাটকে বিশ্বরূপ উপাসকরা ঈশ্বর বলেন। তাঁরা এই শ্রুতি প্রমাণ দেন যে, তিনি 'সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ইত্যাদি।

অন্য উপাসকেরা ঐ বক্তব্য মানতে চান না। তাঁরা বলেন, যদি অনেক হস্তপদবিশিষ্ট হলেই তাকে ঈশ্বর বলতে হয় তবে শতপদবিশিষ্ট কীটকেও ঈশ্বর বলতে হয়। তার চেয়ে বরং চতুরানন ব্রহ্মাকেই ঈশ্বররূপে অঙ্গীকার করা ভাল। কারণ তিনি ছাড়া প্রজাসৃজন সামর্থ্য আর কারও নাই।

যাঁরা ভক্ত নামে প্রচারিত, সেই ভক্তকুলের মতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে উৎপন্ন, সুতরাং তিনি

---

১। **সৎকার্যবাদ** — সাংখ্য দার্শনিকগণ সৎকার্যবাদী। তাঁদের মতে, কার্যবর্গ উৎপত্তির পূর্বেই কারণ শরীরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। অভিনব কার্যের উৎপত্তি হয় না, যে কার্য সূক্ষ্মবীজরূপে কারণের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাই কর্তার ক্রিয়ার দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। কুম্ভকার যে ঘট প্রস্তুত করে, তন্তুবায় যে বস্ত্র উৎপাদন করে, ঐ ঘট ও বস্ত্র উৎপত্তির পূর্বেই তাদের কারণ মাটি ও সূতার মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করছে বুঝতে হবে। অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতি বস্তুর কোনকালে উৎপত্তি হয় না, হবে না। সদ্‌বস্তুরই উৎপত্তি হয়ে থাকে।

২। **অসৎকার্যবাদ** — ন্যায় বৈশেষিকগণ অসৎকার্যবাদী। তাঁরা সৎকার্যবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন, যা সৎ তা চিরদিনই আছে ও থাকবে, তার আবার উৎপত্তি কি? যদি উৎপত্তিই হবে, তবে উৎপন্ন বস্তু আবার সৎ হবে কি ভাবে? 'জায়মানং কথমজম্‌'? উৎপন্ন বস্তু সৎ হতে পারে না। কাজেই যা উৎপন্ন হয়েছে বা হয় তা অসৎ। কর্তা কুম্ভকার ও তন্তুবায়ের কর্মনৈপুণ্য ও অধ্যাবসায়ের ফলেই ঘট বস্ত্র প্রভৃতি অভিনব কার্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সেগুলি মাটি ও সূতার মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল, এ ধারণা সত্য নয়।

৩। **প্রতিবিম্ববাদ** — মণ্ডন মিশ্র 'ব্রহ্মসিদ্ধি' নামক গ্রন্থে এই মতের আলোচনা করেছেন। জীব ব্রহ্মেরই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। সূর্য যেমন বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিফলিত হয়, ব্রহ্মাও সেইরূপ অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে থাকেন। এই প্রতিবিম্বই জীব। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব বস্তুতঃ অভিন্ন। এই মত অদ্বৈতবেদান্তে 'প্রতিবিম্ববাদ' নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য শঙ্করের মতে, ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত সুতরাং জীবভাব ও জীবের সংসারলীলা প্রভৃতি সমস্তই অজ্ঞানের খেলা। পরব্রহ্মের ঈশ্বরভাবও যেমন মায়িক, জীবভাবও সেইরকম মায়িক।

৪। **অবচ্ছেদবাদ** — অবচ্ছেদের অর্থ আবেষ্টনী। কোন কোন বৈদান্তিকের মতে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নয়, জীব অখণ্ড ব্রহ্মের অখণ্ড অভিব্যক্তি। তাঁদের মতে জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। অনন্ত অখণ্ড মহাব্যোম যেমন ঘটাদি অবচ্ছেদ বা আবেষ্টনীর মধ্যে ঘটাকাশ বলে অভিহিত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, জীব সংজ্ঞা লাভ করে। সংক্ষেপে এই হল অবচ্ছেদবাদের মর্মকথা।

৫। **আভাসবাদ** — আচার্য সুরেশ্বরের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন নয়, বিভিন্ন। প্রতিবিম্ব বিম্বের ছায়া বা আভাস। মুখের ছায়া মুখ হতে ভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মের ছায়া বা আভাস জীব, ব্রহ্ম হতে ভিন্ন। ছায়া সত্য নয়, মিথ্যা। অতএব প্রতিবিম্বও সত্য নয়, মিথ্যা সমষ্টি মায়ার আভাস ঈশ্বর, ব্যষ্টি বিদ্যার আভাস জীব। মোটামুটি এই হল আভাসবাদের সারকথা। এই মতে জীবভাবে মিথ্যাত্ব নিবন্ধন জীবভাবের বাধ-সাধন না করে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদ সাধন সম্ভব নয়।

ঈশ্বর নন। যেহেতু বিষ্ণু ব্রহ্মারও জনক সেই হেতু বিষ্ণুকেই ঈশ্বর বলে স্বীকার করাই বিধেয়।

শৈবরা একথা মানতে চান না। তাঁরা বলেন শিবের পদতল অন্বেষণ করতে গিয়ে বিষ্ণু তাঁর পার নির্ণয় করতে পারেন নি। তাহলে বিষ্ণুকে কিভাবে ঈশ্বর বলে স্বীকার করা যায়? শিবই ঈশ্বর।

গাণপত্যরা আবার শৈবদের আর এক কাঠি উপরে। তাঁর বলেন, পুরত্রয় সাধনের জন্য এবং ত্রিপুরাসুরকে বধের সময় শিবও সর্ববিঘ্নাপহারী গণপতির পূজা করেছিলেন, কাজেই শিব কখনই ঈশ্বর হতে পারেন না, গণপতিই ঈশ্বর।

কৃষ্ণভক্তদের সুর আর চড়া। অদ্যাপি যত অবতার তথা নূতন নূতন ঈশ্বরের পরিকল্পনা উপাসকদের মাথায় এসেছে, তাঁরা তাঁদের সবাইকে নস্যাৎ করে ডঙ্কানাদ করেছন — 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। অন্যান্য সকলেই তাঁর তুলনায় এক আনা, দু' আনা, চার আনা, বড় জোর বার আনা ঈশ্বর মাত্র, একমাত্র কৃষ্ণই ষোল আনা ঈশ্বর, পূর্ণ ভগবান। তার মধ্যে আবার 'আরাধ্যাঃ ব্রজেশতনয়ঃ তদ্ধামং বৃন্দাবনং' — বৃন্দাবন লীলার মধ্যেই কৃষ্ণরূপ ঈশ্বরের ষোল আনা ঈশ্বরত্বের স্ফূর্তি ঘটেছে। ভক্তকূল স্ব স্ব ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের জন্য বহুবিধ মন্ত্র অর্থবাদ এবং কল্পও রচনা করে চলেছেন অবিরাম ধারায়।*

এ ত গেল ভক্তদের কথা, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের কথা। পক্ষান্তরে, যাঁরা ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব সরাসরি অস্বীকার করেন তাঁদের বক্তব্য হল — ঈশ্বররূপ কোন পুরুষ বিশেষ নাই, তাঁর অস্তিত্ব বা জগতের কারণরূপে অধিষ্ঠানের প্রমাণ সিদ্ধ নয়। চার্বাকের অনুগামী লোকায়তপন্থী নাস্তিক, জৈন ও বৌদ্ধদের কথা না হয় বাদই দিলাম, আদিবিদ্বান্ মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের মতে, পুরুষের সন্নিধান বশতঃ চেতোমান অচেতন প্রকৃতিই পুরুষের (জীবের) ভোগ মোক্ষ নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়ে জগদাকারে পরিণত হয়। যেমন অচেতন দুগ্ধের ব্যাপার সন্তানের পুষ্টির নিমিত্ত হয়, সেইরকম জড়প্রকৃতির ব্যাপার সমূহ পুরুষের নিমিত্তই সংঘটিত হয়। এর জন্য কোন ঈশ্বরকে জগতের অধিষ্ঠানরূপে স্বীকার করার আবশ্যকতা নাই।

ওদিকে পূর্বমীমাংসাদর্শনের সূত্রকার জৈমিনি বলছেন, বিগ্রহবান্ পুরুষবিশেষরূপে কোন ঈশ্বর নাই, জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ, মন্ত্রময়ী বেদবাণীই যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা ঈশ্বর প্রভৃতি ভাবপ্রাপ্তির হেতু।

এইভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন কত যে মত আছে তার ইয়ত্তা নাই। **উদয়নাচার্য কুসুমাঞ্জলিতে সে সকলের একটি সুন্দর চিত্রকল্প বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আপনার কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তার কিছুটা উদ্ধৃত করছি। উদয়নাচার্য বলছেন, 'শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবঃ' ইতি ঔপনিষদাঃ, 'আদিবিদ্বান্ সিদ্ধঃ' ইতি কপিলাঃ, 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ নির্মাণকায়ং অধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রদ্যোতকঃ অনুগ্রাহকশ্চ' ইতি পাতঞ্জলাঃ, 'লোকবেদবিরুদ্ধৈঃ অপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চ' ইতি মহাপশুপতাঃ, 'শিবঃ' ইতি শৈবাঃ, 'পুরুষোত্তমঃ' ইতি বৈষ্ণবাঃ, 'পিতামহঃ' ইতি পৌরাণিকাঃ, 'যজ্ঞপুরুষঃ' ইতি যাজ্ঞিকাঃ, 'নিরাবরণঃ' ইতি দিগম্বরাঃ, 'উপাস্যত্বেন দেশিতঃ' ইতি মীমাংসকাঃ', 'যাবদুক্তোপপন্নঃ' ইতি নৈয়ায়িকা, 'লোকব্যবহারসিদ্ধঃ' ইতি চার্বাকাঃ, কিং বহুনা, কারবোঽপি যং বিশ্বকর্মেত্যুপাসতে— অর্থাৎ বেদান্তীর মতে ঈশ্বর অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ, সাংখ্যমতে আদিবিদ্বান্ অণিমাদি সিদ্ধিযুক্ত কপিল, পাতঞ্জল মতে ক্লেশাদি সম্পর্ক রহিত শ্রুতিসম্প্রদায়ের উপদেশক ও অনুগ্রহকারক

---

* 'আলোক তীর্থ' এবং 'আলোক বন্দনা'তে এই সব ঈশ্বরের অনেক পরিচয় আমি লিপিবদ্ধ করেছি।

** উদয়নাচার্য — নব্যন্যায়ের উদ্ভাবয়িতা। আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দী। অনেকের মতে তিনি ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের শিষ্য। উদয়নাচার্যকে কেউ কেউ মিথিলাবাসী আবার কেউ কেউ বাঙ্গালী বলে দাবী করে থাকেন। আমার মতে তিনি বাঙালী ছিলেন না। কারণ তাঁর সমসাময়িক প্রকরণপঞ্চিকা প্রণেতা বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত শালিখনাথ মিশ্র বৈদিক স্বরোচ্চারণ করে মনুসংহিতা পাঠ করতেন বলে উদয়নাচার্য বিদ্রূপ করে বলেছিলেন -'বাঙালীরা বেদপাঠে অনভিজ্ঞ'। স্বয়ং বাঙালী হলে সমগ্র বাঙালী জাতি সম্বন্ধে এইরকম কঠোর মন্তব্য করতে তিনি নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হতেন। ন্যায়কন্দলীকার বাঙালী মনীষী শ্রীধরাচার্য ছিলেন সর্বাংশে উদয়নাচার্যের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালী সম্বন্ধে উদয়নাচার্যের অসূয়া ও উষ্মার হয়ত সেটাও একটা কারণ। যাইহোক, নৈয়ায়িক হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। চিন্তামণিকারাদি পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল সূক্ষ্ম বিচার বিন্যাস করেছেন, উদয়নাচার্যই যে সে সকল চিন্তাধারার প্রবর্তক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈয়ায়িক হলেও তিনি ছিলেন পরম ঈশ্বরভক্ত। প্রগাঢ় ভগবদ্‌ভক্তিবশতঃ তিনি সৌগত চার্বাকাদি সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করে গেছেন। এমন কি, ঈশ্বর সম্বন্ধে কর্মমীমাংসক ভট্টপাদ কুমারিলাদি যে যে স্থলে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন তাও খণ্ডন করতে উদয়নাচার্য পশ্চাৎপদ হন নি। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, তাৎপর্যপরিশুদ্ধি এবং আত্মবিবেকাদি গ্রন্থ তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছে।

পুরুষবিশেষ, মহাপাশুপত মতে লৌকিক ও বৈদিক বিরুদ্ধধর্মযুক্ত হয়েও নির্লিপ্ত জগদ্‌কর্তা, শৈবমতে শিব অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যের অতীত, বৈষ্ণবমতে পুরুষোত্তম (শ্রীকৃষ্ণ অথবা বিষ্ণু), পৌরাণিক মতে পিতামহ ব্রহ্মা, যাজ্ঞিকের মতে যজ্ঞপুরুষ, দিগম্বর মতে নিরাবরণ অর্থাৎ অজ্ঞান, অদৃষ্ট ও দোষাদিরহিত, মীমাংসক মতে উপাস্যভাবে কল্পিত মন্ত্রাদি, নৈয়ায়িক মতে — প্রমাণ দ্বারা যতদূর সম্ভব ধর্মযুক্ত, চার্বাক মতে লোকব্যবহার সিদ্ধ রাজা প্রভৃতি। অধিক বলার প্রয়োজন নাই, শিল্পীগণও তাঁকে বিশ্বকর্মা বলে উপাসনা করে থাকেন ইত্যাদি

ঈশ্বর বিশ্বাসী দার্শনিকদের মধ্যে কেউ ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণ বলেন, কেউ বলেন উপাদান কারণ, আবার কারও মতে ঈশ্বর একাধারে নিমিত্তকারণও বটেন, উপাদান কারণও বটেন। একটু বিচার করলেই বুঝা যায় ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক যুক্তিগুলির অধিকাংশেরই মূলে রয়েছে বিশ্বাস। নিজেদের বিশ্বাসকে প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সকলেই শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বাণী বচনের দোহাই দেন। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মতবাদের কথা থাক, আমি কেবল যুগযুগ ধরে দার্শনিকগণ কিভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ ক্রমে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্ব স্ব মতের অনুকূলে কত যে ক্ষুরধার যুক্তিবিন্যাস এবং অকাট্য তর্ক-শৈলীর বিস্তার করেছেন তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে মানুষী প্রতিভা (Human Intellect) কতখানি যে তুঙ্গে উঠতে পারে, ঐ সব যুক্তিতর্কগুলি তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

প্রথমেই ন্যায়দর্শনের কথাই ধরা যাক্। ন্যায়মতে অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে তাঁদের প্রথম অনুমানের স্বরূপ্ হল — 'অঙ্কুরাদিরূপং কার্যং কর্তৃজন্যং, কার্যত্বাৎ, ঘটবৎ' — অর্থাৎ ঘটরূপ কার্যের মূলে যেমন একজন কর্তা থাকে, তেমনি অঙ্কুরাদিরূপে কার্য্য কোন কর্তা দ্বারা উৎপন্ন (জন্য)। এঁরা বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব নয় কেন না ঈশ্বর অরূপ ও নিরাকার হওয়ায় চাক্ষুষ জ্ঞানের অবিষয়। সুতরাং অনুমান ও শাস্ত্রপ্রমাণ ভিন্ন তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই। অনেক সময় দৃষ্ট পদার্থের সাধর্ম অবলম্বন করে অদৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান জন্মে থাকে, সুতরাং কার্যের জ্ঞান দ্বারা কারণের অনুমান কোন কষ্ট কল্পনা নয়; যেমন, ঘট দেখে কুলালের (কুম্ভকারে) জ্ঞান হয়, অবিচ্ছিন্ন ধূম রেখা দেখে পর্বতে অগ্নি আছে এরূপ অনুমান সম্ভব হয়, সহসা একটি নদীকে কানায় কানায় জলপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখলে যেমন বৃষ্টিপাতের অনুমান হয়, এও ঠিক সেই রকম। ঐ সকল অনুমান যেমন মিথ্যা নয় তেমনি জগৎরূপ কার্য দেখে ঈশ্বররূপ কারণের যে বোধ জন্মে তাও মিথ্যা নয়। নিমিত্তকারণ কুম্ভকারের অভাবে যেমন ঘট উৎপন্ন হয় না তেমনি ঈশ্বররূপ কারণের অভাবে জগতের উৎপত্তি কদাপি সম্ভব নয়।

প্রতিপক্ষ অঙ্কুরাদির দৃষ্টান্ত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধক, এ কথা মানতে প্রস্তুত নন। তাঁরা এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, অরণ্য এবং পর্বতে কুশ তৃণাদি পদার্থ কারণ ছাড়া স্বতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে। কাজেই বিনা কারণে কার্য উৎপন্ন হবে না এমন কোন অব্যভিচারিত নিয়ম নাই। বরং বিনা কারণে কার্য স্বয়ং উৎপন্ন হয়, এটি অঙ্কুরাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রতিপন্ন হল। এইভাবে কার্যের উৎপত্তিতে কারণের অনুমান সংপ্রতিপক্ষদোষে দূষিত হওয়ায় ঐরূপ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। তাঁরা আরও বলেন, কেবল কুম্ভকারই ঘট উৎপত্তির কারণ নয়, কুম্ভকার ছাড়াও মৃত্তিকা, দণ্ড ও চক্রাদিকেও কারণ রূপে গণ্য করা উচিত। কুম্ভকার মৃত্তিকা দণ্ড চক্রাদি বহু কারণের সদ্ভাবেই ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তি, একটি মাত্র কারণ হতে নানাবিধ কার্যের (বিচিত্র সৃষ্টির) উৎপত্তি হয়েছে এমন দেখা যায় না। বিশ্বাসীরা এর উত্তরে বলেন, জগৎরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোন এক চেতনরূপ নিমিত্তকারণ আছে এবং উক্ত চেতনরূপ কারণই ঈশ্বর শব্দের অভিধেয়। এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের কেউ একজন চেতনরূপ নিয়ামক না থাকলে এই রকম সুবিন্যস্তরূপে জগতের রচনা সম্ভব হত না, জগতে শৃঙ্খলা থাকত না, সমস্ত কাজের মধ্যে অনিয়ম দেখা দিত এবং বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থারও উচ্ছেদ ঘটত। কাজেই নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বর বর্তমান।

ন্যায়-বৈশেষিক এবং সাংখ্যদর্শন নিত্য পরমাণু ও প্রধানকে বিশ্বের উপাদান কারণ বলে মনে করেন। এই বিষয়ে তাঁদের যুক্তি, ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হতে পারেন না, কারণ ঈশ্বর চেতন ও শুদ্ধ কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ। সাধারণতঃ যেটি যার প্রকৃতি হয়, সেটি তার সমলক্ষণ হয়। ঈশ্বর জগতের প্রকৃতি (মূল

উপাদান) হলে জগৎও তাহলে ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত হত। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে, জগৎ কার্যের ব্রহ্মের গুণের কোন অনুবর্তন নাই তখন নিত্য পরমাণু বা প্রধানকে বিশ্বের উপাদান বলাই সঙ্গত, ঈশ্বরকে নয়। এই রকম অনেক যুক্তি দেখিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক ও পাতঞ্জল ঈশ্বরের উপাদানতা প্রতিষেধ করে ঈশ্বরকে কেবল বিশ্বের নিমিত্তকারণ বলেন আর সাংখ্যেরা তাও অস্বীকার করে ঈশ্বরের পৃথক তত্ত্বরূপ অস্তিত্ব নিষেধ করে প্রকৃতি পুরুষের সন্নিধানে চেতনবৎ প্রকৃতির পরিণামকেই বিশ্বের হেতু বলে অভিহিত করে থাকেন। তাদের প্রধান যুক্তি এই যে, তন্তুনাভ একাকীই সূত্র সৃজন করে, কারও সহায়তা অপেক্ষা করে না, উক্ত তন্তুনাভের যেমন চেতন অংশ সূত্রের নিমিত্ত কারণ তথা তন্তুনাভের পার্থিব শরীর সূত্রের উপাদান কারণ সেই রকম ঈশ্বরও জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই। আর সমুদ্র যেমন জল রূপে এক, ফেণা ও বুদ্বুদাদি রূপে অনেক অথবা বৃক্ষ যেমন বৃক্ষত্বরূপে এক তথা শাখা পল্লবাদি রূপে অনেক, অথবা সর্প যেমন সর্পত্ব রূপে এক এবং বলয় কুণ্ডলাদিরূপে অনেক সেই রকম ব্রহ্মাও এক ও অনেকরূপ অর্থাৎ অপরিণাম অবস্থায় এক, পরিণামী অবস্থায় অনেক।

বিবর্তকারণবাদী বৈদান্তিকরা আবার উপরোক্ত মতও গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা এই বলে আপত্তি করেন যে, তন্তুনাভ সমুদ্রাদি পদার্থ সকল সাবয়ব হওয়ায় তাদের পরিণাম এক অনেকাদি ভাব সম্ভব হয় কিন্তু নিরাবয়ব ঈশ্বরে ঐ সমস্ত পরিণামাদি অসম্ভব। ঈশ্বরকে অতএব একাধারে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ বলাই সঙ্গত। স্বপ্নে যেমন নিদ্রাদোষহেতু স্বপ্নদ্রষ্টাপুরুষ একাকীই স্বপ্নময় জগৎ সৃজন করে, দর্শন করে, সেই রকম ঈশ্বররূপী চেতনপুরুষও স্বীয় মায়াবলে একাকী জগৎ সৃষ্টির উভয়বিধ কারণ অর্থাৎ তাঁর চেতন অংশ নিমিত্ত-কারণ এবং তাঁর আশ্রিত মায়াদোষ রূপ জড়াংশ (অজ্ঞান) জগতের উপাদান কারণ।

উল্লিখিত সকল পক্ষের বিরুদ্ধে বেদবাহ্য আধুনিক মতাবলম্বীগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেন, তিনি সর্বশক্তিমান্ হওয়ায় জগৎ রচনার জন্য তাঁর কোন উপাদানেরই আবশ্যক হয় না অর্থাৎ বিনা উপাদানে কারণ কূট সংগ্রহ ব্যতীতই বিশ্বসৃষ্টি তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কুম্ভকারের যেমন মৃত্তিকা দণ্ড চক্র প্রভৃতি বহুবিধ উপকরণ ঘটনির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয়, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সেই রকম প্রয়োজন হয় না, তা মনে করলে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান্, সেইজন্য বাহ্যসাধন সংগ্রহ ছাড়াই অর্থাৎ নিত্য পরমাণু প্রধান বা মায়া প্রভৃতি উপাদান বিনাই তিনি স্বমহিমাবলে একাকী কেবল নিজের সংকল্পমাত্রেই অভাব হতেই এই ভাবরূপ জগৎ রচনা করতে সমর্থ। দেখা যায়, বিনা কারণে কোন কার্য উৎপন্ন হয় না, নির্দিষ্ট কারণের সদ্ভাবেই কার্য জন্মলাভ করে আর যেহেতু কার্যমাত্রই সাবয়ব হওয়ায় অনিত্য এবং এই জগৎও সাবয়ব হওয়ায় অনিত্য সেইজন্য জগতের উৎপত্তি বিষয়ে কোন মহান্ চেতন-পুরুষ রূপ কারণের ঈশ্বরতা অবশ্যই স্বীকার্য।

ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে দার্শনিকগণ আরও অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁদের কারও কারও বক্তব্য — জগতে কেবল জড় ও চেতন এই দুই তত্ত্বই প্রসিদ্ধ, এই দুই তত্ত্ব হতে অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ অপ্রসিদ্ধ ও অলীক। অতএব এই লোকদৃষ্ট পদার্থানুসারে অদৃশ্য কারণাদির অস্তিত্ব বা স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে চেতন ও জড় এই দুই এর মধ্যে কোন একটিকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলতে হবে, নতুবা প্রসিদ্ধির বহির্ভূত হওয়ায় কল্পনা অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে অলীক বলে গণ্য হবে। আবার উক্ত দুই তত্ত্বের নিয়ম এই যে, জড় বিনা কেবল চেতন আর চেতন বিনা কেবল জড়ের উপলব্ধি হয় না। চেতন ও জড়ের এই যে সহোপলব্ধির (একত্র সহাবস্থান) নিয়ম, এই নিয়ম উপায়-উপেয় মূলক হওয়ায় তার দ্বারা জড় ও চেতন এই দুই এর সংযোগেই প্রবৃত্তির হেতুতা সিদ্ধ হয়, অন্য রূপে নয়। প্রদর্শিত কারণে যুক্তি ও অনুভব বলে ঈশ্বরে স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে তাঁকে 'চিৎ-জড়-বিশিষ্ট' বলতে হবে, না হয় 'কেবল জড়' বলতে হবে অথবা 'কেবল চেতন' বলতে হবে, এ ছাড়া আর কোন চতুর্থ তত্ত্ব ঈশ্বরের স্বরূপ বলে কল্পনা করলে প্রমাণাভাবে উক্ত কল্পনা অবিশ্বাস্য হবে। কিন্তু বিচার করলেই ধরা পড়বে উক্ত তিনের মধ্যে কোন একটা ঈশ্বরের স্বরূপ বলে সিদ্ধ হয় না। কারণ ঈশ্বরকে কেবল জড় বললে ঈশ্বরের স্বরূপ ইট কাঠ পাথরের মত জড় বলে মানতে হবে, বলা বাহুল্য এ মত কোন বাদীরই স্বীকার্য নয়। এদিকে ঈশ্বরকে কেবল চৈতন্যস্বরূপ বললে চৈতন্যের প্রবৃত্তি সংকল্প আদি বৃত্তি অসম্ভব হওয়ায় সৃষ্টিই অসম্ভব হবে। কেননা প্রবৃত্তি আদি ধর্ম চিৎ-জড় বিশিষ্টেই সম্ভব। কেবল চেতনে নয়।

কেবল চেতনে ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতির সত্ত্ব ধর্মের অভাবে জগৎ রচনার জন্য প্রবৃত্তি আদি সর্বথা অনুপপন্ন (অসংগত, যুক্তি ও বিচার বিরুদ্ধ)। আবার চিৎ-জড়-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষকেও ঈশ্বর বলা যেতে পারে না কারণ চিৎ-জড়-বিশিষ্ট যে সকল বস্তু তা দেহাভিমানী অন্যান্য জীবের মত বিকারী হওয়ায় অনিত্যই হবে, নিত্য নয়। সুতরাং এতাদৃশ বস্তুর ঈশ্বরতা বাধিত।

পাতঞ্জলপন্থীরা যে বলেন ঈশ্বর অসঙ্গ উদাসীন অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য হলেও পুরুষবিশেষ হেতু তাঁর নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করা যায়, প্রতিপক্ষের মতে তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ, যার বিকার নাই, বিনাশ নাই, চিরকালই যে একভাবে থাকে, তাকেই কূটস্থ নিত্য বলে। অতএব ঈশ্বরকে জগৎ রূপ বিকারের অধিষ্ঠাতৃ বললে তাঁর একভাবে চিরকাল থাকা কথাটি অলীক হয়ে পড়ে, তাঁর অসঙ্গত্ব, উদাসীনতা, শুদ্ধত্ব ও পূর্ণত্বাদি লক্ষণগুলিও ব্যাহত হয়, ফলে ঈশ্বরত্বই নস্যাৎ হয়ে যায়।

আমি আগেই বলেছি ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রে কিভাবে ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা খণ্ডন করেছেন, সাংখ্যদর্শনের মতামত সম্বন্ধেও কিছুটা আভাস দিয়েছি। সাংখ্যদর্শনের অন্তর্গত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর ৫৬ ও ৫৭ কারিকা তে আছে —

(ক) ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদি-বিশেষ-ভূত-পর্যন্তঃ।
প্রতি পুরুষ বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ।। (সাংখ্যকারিকা, ৫৬)

— নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি হলে যেমন সেই কার্যে পুনর্বার প্রবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করে; যে পুরুষ মুক্ত হয় তার নিমিত্ত আর সৃষ্টি করে না।

(খ) বৎস-বিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষ বিমোক্ষ-নমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।। (ঐ, ৫৭)

— বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যে প্রকার অচেতন দুগ্ধের ব্যাপার হয়, তদ্রূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রধানের ব্যাপার হয়ে থাকে।

এর থেকেই জানা যায়, তাঁদের মতে স্বার্থেই হোক পরার্থেই হোক ঈশ্বরে জগৎ সৃজন বিষয়ক প্রবৃত্তি অসম্ভব এবং সেই হেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বও অসিদ্ধ।

সাংখ্যকার বলেন, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন এ কথা বলা যায় না কারণ ঈশ্বর বিশেষ জ্ঞানী, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি অথবা পরের দুঃখ দূর করার জন্যই সাধারণতঃ কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। জগৎ সৃষ্টি করে ঈশ্বরের স্বার্থসিদ্ধি হয় এ কথা বললে ঈশ্বরকে স্বার্থপর এবং তাঁর কোন কোন বিষয়ের অভাব আছে এ কথা মানতে হয়। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি কিভাবে সর্বেশ্বর হবেন? জীবগণের দুঃখমোচনের জন্য ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এ কথাও বলা যায় না কারণ সৃষ্টির পূর্বে দুঃখ থাকে না, দুঃখ ছিল না। জীবের দুঃখ বিধান করে সেই দুঃখ মোচন করা অপেক্ষা সৃষ্টি ত না করাই ভাল ছিল। কথায় আছে — 'প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দুরাৎ স্পর্শনং বরং'।

যদি বলা হয় জীব যে যার নিজ নিজ কর্মফলে দুঃখভোগ করছে, ঈশ্বর কেবল কর্মফলপ্রদাতা, তাহলে কর্মসৃষ্টির বিষয়ে জীবের স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকার করতে হয়। জীব কর্মসৃষ্টির ব্যাপারে স্বাধীন আর অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে ঈশ্বরাধীন এ কথা কি যুক্তিসহ? সৃষ্টির দিকে তাকালেই দেখা যায় সৃষ্টি জুড়ে সুখী দুঃখী ভোগী ত্যাগী লোভী স্বার্থপর পরার্থপর বিদ্বান মূর্খ ধনী নির্ধনের মেলা. চারিদিকে বিষমতা বিড়ম্বনা। এই সমস্ত বিষম কার্যের নিমিত্ত কারণ যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁর মধ্যে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য (নির্দয়তা) পক্ষপাত এবং ভেদদৃষ্টির বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার্য। সৃষ্টির পূর্বে যে সময় অবিভাগ ছিল, সে সময় সৃষ্টির কোন প্রযোজক কর্ম ছিল না, সৃষ্টির পরে শরীরাদির বিভাগ হলে কর্ম হয়। কাজেই বিভাগের পূর্বে কর্ম না থাকায় অবশ্যই সমান সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে এত বৈষম্যাদি দোষ দেখা যায় কেন? যদি ধরা হয়, জীবগণের কর্ম ও ঈশ্বরের প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তক ভাব অনাদি অর্থাৎ তার কোন আদি নাই প্রাথম্য নাই, পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারে পর পর তিনি উত্তমাধম সৃষ্টি করে চলেছেন, এই রকম প্রবাহ নিত্যকাল ধরে চলে আসছে, তাহলে ঈশ্বর অন্ধপরম্পরা নামক দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বেন। সত্য সত্যই যদি ঈশ্বরবাদীর বিশ্বাস অনুযায়ী করুণাময় ন্যায়বান্ ও সর্বশক্তিমান্ হন, তাহলে কি তিনি কারুণ্য ও সর্বশক্তিত্বস্বভাববশে জীবের কর্মাপেক্ষা রহিত হয়ে এই বিষয় সৃষ্টিকে নিবারণ করতে বা সকল জীবকে একই সময়ে সুখী করতে পারতেন না? ন্যায়ের অনুরোধে ঈশ্বর এই বিষম সৃষ্টি রচনা

করতে বাধ্য হয়েছেন এ কথা বললেও দোষের পরিহার হয় না। কারণ কর্মানুষ্ঠানের পর তবেই ত ন্যায় অন্যায়ের বিচার সংগত হতে পারে, সৃষ্টির পূর্বে অবিভাগ অবস্থায় নিশ্চয়ই নয়।

তাছাড়া একদিকে বলা হচ্ছে জীব কর্মসাপেক্ষ অন্যদিকে বলা হচ্ছে ঈশ্বর করুণাময় — এ সব উক্তি বিরোধযুক্ত। করুণাময় ও ন্যায়বান্, এ দুটি শব্দও পরস্পরবিরোধী। ন্যায়বান দোষগুণানুসারে নিক্তির ওজনে দণ্ড ও পুরস্কার দেন, সে সময় করুণা করার সুযোগ কোথায়?

কর্ম উপাসনা ও যোগাঙ্গাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা ধীরে ধীরে সুসংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে জীব পরিণামে যাতে শাশ্বত সুখের অধিকারী হতে পারে এইজন্যই ঈশ্বর সৃষ্টির বিষম ভাব সৃষ্টি করেছেন এ কথা বললেও দোষ হতে পরিত্রাণ নাই। কারণ প্রথম হতেই উপযুক্ত গুণের অধিকারী করে জীবসৃষ্টি কি ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব কার্য ছিল? হ্যাঁ, না, যা বলবেন উভয়পক্ষেই দোষ আছে। 'হ্যাঁ' অর্থাৎ ঈশ্বরপক্ষে অসম্ভব কাজ বলে ঈশ্বরের সর্বশক্তিত্বাদি ধর্ম বাধিত হবে। 'না' বললে বৈষম্যাদি দোষ হতে মুক্তিলাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে! যদি বলেন, ঈশ্বর সমস্ত কর্ম স্বসৃষ্ট নিয়মের অধীন, জীবের সংশোধনের জন্যই নিয়মের সৃষ্টি, একই সময়ে এক সঙ্গে সকল প্রাণীকে সুখী করতে গেলে নিয়মভঙ্গ হয়। প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষ বলেন, উক্ত নিয়মও ঈশ্বর সৃষ্ট, নিয়ম বিধানের সময়ে সাম্য অভিপ্রেত হলে একই ছাঁচে জীব সৃষ্টি করা যেত, কেউ সুখী কেউ দুঃখী এরূপ বিষমতার স্থল তাহলে থাকত না। যদি বলা হয় বিষমতা সৃষ্টির অঙ্গ, তার মধ্যে কল্যাণের জীবই নিহিত থাকে, বিষমতা না থাকলে একে অন্যের পরিপূরক হত না, জগতে শৃঙ্খলা থাকত না, তদবস্থায় সর্বদা সর্বত্র ঘোর অনর্থ দেখা দিত। অতএব সৃষ্টিতে যে বিষমতা তা প্রকৃতপক্ষে দোষ নয়, বরঞ্চ তা সৃষ্টির ভূষণ। এ কথা বললেও নিস্তার নাই, কারণ বিষমতার অভাবে সৃষ্টিতে ঘোর অনর্থ ঘটবে এ বিষয়ে কি কোথাও কোন নির্দিষ্ট নিয়ামক হেতু আছে? নাই। বাস্তব সত্য এই যে যেখানে বৈষম্য সেখানেই অনর্থ। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন উত্তমাধম অবস্থা এবং সুখ দুঃখের বিচিত্রতাই বরং যাবতীয় অনর্থের নিদর্শন। প্রত্যেক জীবের সমান সুখাবস্থা থাকলে সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটবে এবং এই বিশৃঙ্খলার দ্বারা ঘোর অনর্থ দেখা দিবে এ কথা সর্বথা অনুপপন্ন।

যদি বলা হয় পারিপার্শ্বিক সংসর্গ ঘটিত নিয়মের বৈচিত্র্য তথা বংশগত লক্ষণাদি অনুবর্তনের বৈলক্ষণ্য জীবগণের সুখ দুঃখের বৈষম্যের হেতু, এ বিষয়ে ঈশ্বর সম্পূর্ণ উদাসীন। এই রকম কথা বললে সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বরের দক্ষতা সম্বন্ধে সংশয় দেখা দেবে, তাদৃশ অবিচক্ষণ ঈশ্বর অনীশ্বর মধ্যেই পরিগণিত হবেন।

বাদী পক্ষে অনেকে বলেন নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি বশে কেবল খেলার ছলে নাকি ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এ কথাও যুক্তিযুক্ত নয় কারণ প্রয়োজন ব্যতীত কোন কর্মই অনুষ্ঠিত হয় না — প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে। অবশ্য বুদ্ধিদোষবশতঃ উন্মত্তচেতনকে বিনা প্রয়োজনে কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়; তাই দেখে কেউ যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রবৃত্তিকে তৎ তুল্য বলতে ইচ্ছা করেন তবে ঈশ্বরের প্রবৃত্তিকে বাতুলোচিত বলে মানতে হবে এবং মানলে সৃষ্টি কোন উন্মত্তের কার্য বলে স্বীকার করতে হয়। অনেক সময় অবোধ বালকের প্রবৃত্তিতেও প্রয়োজনাভাব দেখা যায়, কেউ যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রবৃত্তিকে তদনুরূপ বলতে চান তাহলে ঈশ্বরের অজ্ঞতা দোষ আছে স্বীকার করতে হয়। কেবল লীলার বশে তাঁর সৃষ্টি প্রবৃত্তি জাগে এ কথাও বিচারসহ নয় কারণ লীলার মূলেও থাকে প্রয়োজন, সে প্রয়োজন হল — উল্লাস। ফলকথা, উল্লিখিত, সকল পক্ষে সৃষ্টিতে বিষম নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষের কোনরূপ প্রতিকার সম্ভব না হওয়ায় ঐ সকল দোষের কারণে এ কথা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, যদি এই সৃষ্টির কোন কর্তা থাকেন তাহলে ঐ কর্তা হয় কোন নিকৃষ্ট নির্দয় খেয়ালী পুরুষ নতুবা বাতুল বা বালকোচিত বুদ্ধিদোষে দূষিত কোন অজ্ঞ। এই রকম ঈশ্বর কি রকম ঈশ্বর? নির্বিকার, শুদ্ধ, পূর্ণ কূটস্থ লক্ষণে লক্ষিত পুরুষ অভিহিত ঈশ্বরে কি এইসব দোষ সম্ভব? সম্ভব নয় বলে ঈশ্বরের অস্তিত্বই যখন অসিদ্ধ হয়ে পড়ছে তখন তাঁর বিষয়ে জগতের নিমিত্তকারণতার কল্পনা দূরাবস্থিত।

বস্তুতঃ এই সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে নানা শঙ্কা বর্তমান। সৃষ্টি বিষয়ে কেউ বলেন ভূতাদি পদার্থ স্বয়ংসিদ্ধ, কেউ বলেন কার্য, কেউ বলেন সত্য, কেউ বলেন মিথ্যা, কারও মতে স্থির পদার্থ, কারও মতে ক্ষণিক, কেউ বলেন ভূত চার, কেউ বলেন পাঁচ, কেউ বলেন ভূতগণের উৎপত্তির হেতু প্রধান, কারও মতে পরমাণু, কারও মতে মায়া, কারও মতে শূণ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত বিরুদ্ধবাদ আছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই সকল শঙ্কাই উত্থাপন করা চলে। ঈশ্বরের পক্ষ যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা তর্কে কূল না পেলে বলে বসেন — বুদ্ধি দ্বারা

এই সৃষ্টি রহস্য এবং স্রষ্টার মহিমা বুঝা যায় না। এক বিন্দু রেতঃ দ্বারা এই দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল কিভাবে উৎপন্ন হয় এবং কি জন্যই বা তাতে চৈতন্য আগত হয়? অবিশ্বাসীর দল এর কি জবাব দিবেন? ঠিক কথা। অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু বাদী অর্থাৎ বিশ্বাসীর দলকে যদি পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, রেতঃ ও রোতোমধ্যস্থ চৈতন্যের ঐ স্বভাব যদি স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে রেতের ব্যর্থতা দেখা যায় কেন? ঘটদৃষ্টে কুম্ভকারের কারণতার যে অনুমান তা যেমন স্থূল পদার্থের মধ্যেও স্থূল বিশেষে সঙ্গত দেখা যায়, সার্বত্রিক নয় তা অঙ্গীকার করতে হচ্ছে। এইভাবে সাধারণ সামান্য ভৌতিক পদার্থের ক্ষেত্রেও অনুমানের উপযোগীতা যখন সব সময় নিশ্চিত নয়, তখন নিতান্ত অসাধারণ, অসামান্য, ইন্দ্রিয়াদি বহির্ভূত, পরোক্ষ, নীরূপ, নিরবয়ব ও সর্বকারণের কারণ বাদী পরিকল্পিত ঈশ্বর বিষয়ক অনুমান যে সর্বাংশে ব্যর্থ, তা বলাই বাহুল্য।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। ঈশ্বরকে নির্বিকার বলা হয়। নির্বিকার বললে তাঁকে সর্ববিক্রিয়াশূণ্য বলে স্বীকার করা উচিত। সর্বক্রিয়ারহিত বললে সৃষ্টি কার্য স্বতঃই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর যদি তাঁকে ক্রিয়াবিশিষ্ট ধরা হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় বিকারভাব প্রাপ্তিবশতঃ তাঁর ঈশ্বরভাব লুপ্ত হওয়ায় তিনি অন্তবান পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হতে বাধ্য। এইভাবে তাঁর জগৎ কর্তৃত্ব বাধিত হওয়ায় তাঁর অস্তিত্বও বাধিত হয়।

ঈশ্বর অবিকৃত কিনা ক্রিয়াহীন অর্থাৎ কূটস্থ স্বভাববান্ পদার্থে ক্রিয়ার কল্পনা সর্বথা অসম্ভব। সাধারণতঃ কর্তার ব্যাপার দ্বারা করণে ব্যাপার হলে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, স্বয়ং ক্রিয়ারহিত হয়ে নির্বিকার ক্রিয়াবিহীন ব্যক্তি অপরের পরিচালক হতে পারে না। ঈশ্বরকে সৃষ্টির কর্তা বললে, পূর্বেই বলেছি তাঁর অন্তবত্তা স্বীকার করতে হয়, সেক্ষেত্রে তিনি সাদি হন। যা সাদি ও অনিত্য তা কর্তা জন্য হয় অর্থাৎ তার অন্য কোন কর্তা আছে স্রষ্টা আছে স্বীকার করতে হয় কারণ তা না করলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটবে। আত্মাশ্রয় দোষের স্বরূপ এই — নিজের কর্তা নিজে হওয়া যায় না। নিজেই ক্রিয়ার কর্তা আর নিজেই ক্রিয়ার কর্ম বা ফল এরকম অসম্ভব ঘটনা কখন ঘটে না। যেমন কুম্ভকার ক্রিয়ার কর্তা, ঘট কর্ম, কর্তা ও কর্ম সদাই ভিন্ন হয়, এক হয় না। এরই নাম 'আত্মাশ্রয়' অর্থাৎ কর্তা ও কর্মকে এক বললে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে। কার্যের নাম কর্ম, কার্যের বিরোধীর নাম দোষ আত্মাশ্রম কার্যের বিরোধী, সুতরাং দোষ। আত্মাশ্রয় দোষের পরিহারের জন্য যদি ঈশ্বরের অন্য কর্তা স্বীকার করা হয়, তবে সে অন্যকেও প্রথম কর্তার ন্যায় কর্তা জন্যই বলতে হবে, তারও কর্তা প্রথম কর্তার ন্যায় তা হতে ভিন্নই হবে। প্রথম যে ঈশ্বর তাকে আপনার কর্তা আপনি বললে আত্মাশ্রয় দোষ হবে, আর দ্বিতীয়ের কর্তা অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হবে। উভয়েতে উভয়ের পরস্পর অপেক্ষাকে 'অন্যোন্যাশ্রয় দোষ' বলে। অন্যোন্যাশ্রয়ে একের সিদ্ধি বিনা অন্যের সিদ্ধি হয় না।

ঐ দোষ নিবারণের জন্য যদি তৃতীয় কর্তা অঙ্গীকার করা হয়, তবে তৃতীয়ের কর্তা দ্বিতীয় বললে অন্যোন্যাশ্রয় হবে আর প্রথম বললে চক্রিকাদোষ হবে। চক্রিকাদোষে সকলের পরস্পর অপেক্ষা থাকে অর্থাৎ যেমন চক্রের মণ্ডলাকারে আবর্তন ঘটে তেমনি প্রথম কর্তা দ্বিতীয় জন্য, দ্বিতীয় কর্তা তৃতীয় জন্য, তৃতীয় প্রথম জন্য, প্রথম পুনরায় দ্বিতীয় জন্য ইত্যাদি প্রকারে কারণ-কার্যভাব নিয়ত ঘুরপাক খেতে থাকবে। 'চক্রিকাদোষ' ঘটলে কিছুই সিদ্ধ হয় না, সকলে সকলের উপর পরস্পর নির্ভর করায় সকলই অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই চক্রিকা দোষ পরিহার করার জন্য তখন অন্য এক চতুর্থ কর্তাকে অঙ্গীকার করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কারণ, যেমন কুলালের (কুম্ভকারের) কর্তা কুলাল নিজে নয়, তার পিতাই তার কর্তা (স্রষ্টা), সেই রকম প্রথম ঈশ্বর নিজেই নিজের কর্তা নন, কিন্তু অন্য আর একজন ঈশ্বর তাঁর কর্তা। আর যেমন কুলালের পিতা আপন পুত্র হতে উৎপন্ন হতে পারে না অন্য পিতা হতে উৎপন্ন, সেইরকম দ্বিতীয় কর্তা প্রথম কর্তা অর্থাৎ অন্য কর্তা দ্বারা উৎপন্ন। এইভাবে কুলালের পিতামহ যেমন কুলাল ও কুলালের পিতার জন্য নয় (... দ্বারা জন্মলাভ করে নি) কিন্তু চতুর্থ যে কুলালের প্রপিতামহ তার দ্বারা জন্য অর্থাৎ সৃষ্ট, সেই রকম তৃতীয় কর্তাও প্রথম ও দ্বিতীয় কর্তা জন্য নয় কিন্তু চতুর্থ কর্তা জন্য। এইভাবে বর্ণিত প্রক্রম অনুসারে উক্ত চতুর্থ কর্তা অঙ্গীকৃত হলে তারও উৎপাদক ও জন্মদাতা হিসাবে পঞ্চম কর্তা অঙ্গীকার করতে হবে, করলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। অস্থির অব্যবস্থিত নিয়মহীন ধারার নাম — অনবস্থা (উপপাদ্য ও উপপাদকের অর্থাৎ যা প্রমাণ করতে হবে এবং যা প্রমাণের সহায় এতদুভয়ের অনবরত উল্লেখ হেতু তর্কদোষবিশেষ)। কর্তার ধারা স্বীকার করলে কোন্ কর্তা জগতের কারণ তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন একককে জগতের কর্তা

বললে বিনিগমনাবিরহ দোষ হবে। কেননা কোন একককে জগতের কর্তা বলা যুক্তিবিরুদ্ধ, যুক্তির অভাবের নাম 'বিনিগমনাবিরহ'। ধারার বিশ্রান্তি স্বীকার করলে যে কর্তাতে ধারার অন্তঃ স্বীকৃত হবে, তাঁকে জগতের কর্তা বললে পূর্ব সমস্ত কর্তা নিষ্ফল হওয়ায় প্রাগ্লোপ দোষ ঘটবে। পূর্বের (পূর্বপূর্ব কর্তা সকলের) অভাবের নাম 'প্রাগ্লোপ'। এই রীতি অনুযায়ী ঈশ্বর দেশ কাল বস্তু হতে ভিন্ন ও বিভক্ত এবং সেই কারণে পরিচ্ছেদ্য হওয়ায়, তাঁর উৎপত্তি অঙ্গীকার করতে হবে, করলে আত্মা প্রসঙ্গে যে ছয়টি দোষের কথা উল্লেখ করলাম সেগুলি ছাড়া আরো শতবিধ দোষ দেখা দেবে।

অনেকের অবিচলিত বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর একাকী বিনা উপাদানেই কেবল সংকল্পমাত্রেই স্বমহিমায় এই ভাব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যাঁরা এই মতের পরিপোষক তাঁদের প্রধান সিদ্ধান্ত — 'সৃষ্টির পূর্বে একাকী, দ্বিতীয়রহিত, সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর রূপী কোন পুরুষ ছিলেন'। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করলে বাদীদের বাঞ্ছিত ঈশ্বরসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু স্বীকার করলে উক্ত বাক্যে ঈশ্বরের সঙ্গে দেশকালেরও সহাবস্থিতি অঙ্গীকার করতে তাঁরা বাধ্য। কারণ 'সৃষ্টির পূর্বে' এই বাক্যে পূর্ব শব্দটি কালের বাচক এবং 'ছিলেন' এই শব্দটি বিদ্যমানতা বুঝায় বলে কাল সহ দেশেরও সূচক। হেতু এই যে, কালের অভাবে পূর্বোত্তর ভাব তথা দেশের অভাবে বস্তুর বিদ্যমানতা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং ঈশ্বরকে সর্ব জগতের কর্তা বলতে গেলে দেশকালকেও ঈশ্বরের সমসাময়িক ধরতে হয়, অন্ততঃ তা ঈশ্বরোৎপন্ন নয় এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, অন্যথা ঈশ্বরের অস্তিত্বই অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ দেশ কাল নাই অথচ ঈশ্বর আছেন সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এ সব কথা তাহলে উপপন্ন (প্রমাণিত) হবে না, যেহেতু দেশকালের সঙ্গেই বস্তুর বা অস্তিত্ব উপলব্ধিগোচর হয়, নচেৎ নয়। দেশকালের এই সমসাময়িকত্ব নিবন্ধন ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, একাকীত্ব, দ্বিত্বাদিভাবরহিত্যে প্রভৃতি স্পষ্টতঃই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সৃষ্টির পূর্বে দেশকালও ছিল, ঈশ্বরও ছিলেন একথা সত্য হলে তিনি একাকী ছিলেন দ্বিতীয় রহিত অবস্থায় ছিলেন এ সব কথা মিথ্যা হয়। যদি বলা হয়, দেশ, কাল ও ঈশ্বর এই তিনের সমষ্টিকে ঈশ্বর বলে অর্থাৎ তিনই এক বস্তু, বাদীর এই বক্তব্যও যুক্তিসহ নয় কারণ ঈশ্বর চেতনপুরুষ তথা দেশ ও কাল জড়, এইরূপে লক্ষণে পরস্পর ভেদ থাকায় উক্ত তিনের একরূপতা এবং অভেদ কল্পনা অসম্ভব। বাদী যদি বলেন চৈতন্যরূপ ঈশ্বরের দেশকাল শরীর হওয়ায় চিৎজড় বিশিষ্টরূপে ঐ তিনটি একই বস্তু, এক কথা বললে বিকারাদি দোষের প্রাপ্তি অনিবার্য হওয়ায় সেক্ষেত্রেও ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লুপ্ত হবে। যদি বলা হল, সর্বশক্তিমত্তা প্রভাবে ঈশ্বর অভাব হতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এ কথাও বিচারে দাঁড়াবে না। যার কোন বিশেষ নাই, ভেদ নাই, নির্দিষ্টতা নাই, যা শশশৃঙ্গাদির মত নিঃস্বরূপ ও নিঃস্বভাব, তাদৃশ অভাবকে কার্য্যোৎপত্তির উপাদান বলে স্বীকার করলে খ-পুষ্প এবং বন্ধ্যাপুত্রাদি হতেও কার্যোৎপত্তি সম্ভব হত এবং সেক্ষেত্রে ঈশ্বর অভাব হতেই কার্যোৎপন্ন করেছেন। (অর্থাৎ এই স্থূল জগৎ সৃষ্টি করেছন), এ কথা বলা সংগত হত! কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে নিরুপাখ্য (অসৎ পদার্থ) বা নির্বিশেষ অভাব কারও উৎপাদক নয়। অভাবত্বের কোন প্রকার বিশেষ (কণাদের মতে বিশেষ এক পদার্থ) স্বীকার করলে প্রকারান্তরে তা ভাবই হয়ে দাঁড়ায়।

অভাব হতে ভাবের জন্ম হলে নিশ্চিত সমস্ত ভাব অভাবান্বিত হত। কিন্তু কোন বস্তুতে অভাবের অন্বয় (অনুবর্তন, যেমন ঘটে মৃত্তিকার অনুবর্তন হয় সেইরূপ) দেখা যায় না। অথচ একথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে কার্যের মধ্যে কারণের স্বরূপের ছাপ পড়ে অর্থাৎ কার্যের মধ্যে কারণের সমূহভাব সূক্ষ্মভাবে অভিব্যক্ত হয়। মৃত্তিকাময় ঘট প্রভৃতিতে বস্তুত্বরহিত শশশৃঙ্গাদির মত অভাবের অন্বয় এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কেন না, অসৎ পদার্থ করা যায় না এবং সেইজন্য তা হতে কার্যোৎপত্তিও সম্ভব নয়। কার্য ও কারণে নিয়ত সম্বন্ধ থাকা চাই, নতুবা সকল বস্তুতে সকল বস্তুরই উৎপত্তি সম্ভব হতে পারত। এখানে কেউ যদি এরকম বলেন যে, কার্যবর্গমাত্রেই অসৎ প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল, এই আছে এই নাই, অদ্য আছে পরদিনে নাই, আত্মলাভের পূর্বেও ছিল এরূপও প্রতীতি নাই, অতএব কার্যবর্গের অসৎ উৎপাদনতা অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় অভাব হতে কার্যোৎপত্তির কল্পনা অযোগ্য কল্পনা নয়। বেদান্ত মতেও সৃষ্টির উপাদান মায়া, 'মা' শব্দে 'না', 'য়া' শব্দে 'ইহা' অর্থাৎ 'ইহা নাই — এই দৃশ্য নাই', সংক্ষেপে — যা (য়া) নাই (মা=না)। কাজেই বাদী সংগতভাবেই বলতে পারেন যে, মায়া শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারাও ত অসৎরূপ অভাবের উপাদানতা স্বীকার করা হয়েছে।

একথার প্রত্যুত্তরে উত্তরপক্ষ হিসাবে বলা যায় — যদিও বেদান্তমতে কার্যবর্গ অনিত্য, তথাপি প্রত্যেক

কার্যে স্বীয় কারণের নিয়ত সম্বন্ধ দ্বারা অন্বয় বা অনুবর্তন হওয়ায় ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে অভাবান্বিত বস্তু নয়; কারণ বিদ্যমান (সত্তাবিশিষ্ট) দুটি পদার্থেরই সম্বন্ধ হয়, বিদ্যমান সত্তার সঙ্গে অবিদ্যমান অসত্তার সম্বন্ধ সম্ভব নয়। সুতরাং বেদান্তমতে মায়ার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে বস্তুরহিত শূন্যতা নয়, তা জ্ঞাননিবর্তনীয় প্রতীতি সমসত্তাবিশিষ্ট সদসৎবিলক্ষণ ভাবরূপ পদার্থ হওয়ায় তার দ্বারা বাদীর পক্ষ সমর্থিত হতে পারে না। অতএব যেমন অগ্নির স্বভাব দাহের নিজস্ব রূপে — নিজের ক্রিয়া হয় না কিন্তু কাষ্ঠাদিযোগে দাহের যে ক্রিয়া হয় — তা আপন স্বরূপ হতে ভিন্ন কাষ্ঠাদি বস্তুতে হয়, সেইরকম ঈশ্বরের নিজের স্বরূপে নিজের ক্রিয়া সম্ভব হয় না — আপন স্বরূপ হতে ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতে ক্রিয়ার প্রকাশ সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ক্রিয়াপ্রকাশের স্থূল উপকরণাদির উপপত্তি সৃষ্টির পূর্বে না থাকায় 'ঈশ্বরের সংকল্পমাত্র' তথা অসত্তারূপ অভাব হতে ভাবরূপ সৃষ্টির কল্পনা কি ভাবে সম্ভব হবে?

পক্ষান্তরে, উল্লিখিত দোষ সকল উদ্ভাসিত হতে দেখে যদি ঈশ্বরের চিৎ জড়স্বরূপতা অঙ্গীকার করা হয় তবে জিজ্ঞাস্য — ঐ রূপ ঈশ্বরের স্বরূপে যে জড়াংশ তা কি মায়া? প্রধান? না — পরমাণু? কোনটি সৃষ্টির উপাদান? প্রমাণাভাবে ঐ তিনটি ছাড়া অন্য কোন চতুর্থ পদার্থকে উপাদান বলতে পারা যায় না। ঐ তিনের মধ্যে যেটির উপাদানতা স্বীকৃত হবে তার দ্বারা স্বমতভঙ্গদোষ হবে অর্থাৎ কোন ভাবপদার্থের উপাদানতা স্বীকৃত হলে বাদী পরিকল্পিত অভাব হতে জগৎ সৃষ্টির যে সিদ্ধান্ত তা আপনা হতেই ভঙ্গ হবে। অন্য আপত্তি এই যে, ঈশ্বরের চিৎ-জড়স্বরূপতা স্বীকার করলে অস্মাদির মত (বিকারশীল জীবের মত) অনীশ্বরত্ব দোষ হতে ঈশ্বরের উদ্ধার লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এইরকম অগণ্য দোষ থাকায় একাকী ঈশ্বর অভাব হতে জগৎরূপ ভাবের সৃষ্টি করেছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসার ও অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

ভাল, উপরোক্ত সমূহ দোষ আমরা উপেক্ষা করলাম এবং তর্কের খাতিরে নয়ত ধরেই নিলাম যে সৃষ্টি রচনা বিষয়ে বিনা উপাদানে কেবল স্বীয় সংকল্প বলেই ঈশ্বরের সৃষ্টি সামর্থ্য রয়েছে, তবু এই সিদ্ধান্তেও যে অন্য প্রকারের দোষ জন্মে তার কি উপায়? দু' একটি দৃষ্টান্ত দিই — যেমন কোন্ ন্যায়ে ঈশ্বর অনাদি নাস্তিত্বাশ্রিত অভাবরূপী বস্তুত্ব রহিত পদার্থ সকলকে ভোক্তৃভোগ্যরূপে সৃষ্টি করে জীবগণকে নিদারুণ সংসার-সাগরে নিক্ষেপ করলেন? জীবের নাস্তিত্ব অবস্থা সুখ দুঃখের অভাবে, বর্তমান যন্ত্রণাময় অবস্থার চেয়ে কি সহস্রগুণে ভাল ছিল না? জীব অবস্থায় পরিণত করে ঈশ্বর প্রাণীদের এমন কি ইষ্টসাধন করলেন? দরিদ্র হতে রাজাধিরাজ, কৃমিকীট হতে দৈবদৈত্যে, উত্তমাধম যাবতীয় প্রাণীকেই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়। সকলেই রোগ-শোক-মোহ-জরা-মরণাদি দুঃখে নিত্য জর্জরিত। অতএব অত্যন্ত বিমল বিরজ বিশোক অদুঃখদ অবস্থার পরিবর্তে জীবের ভোগভূমি এই দুঃখময় সংসারের সৃষ্টি দ্বারা দয়াময় ভগবান কি ক্রূরতা ও নির্দয়তার পরিচয় দিলেন না? অনধিকার অধিকার স্থাপনের অতি যন্ত্রণাময় নিয়ম সৃষ্টি করে জীবকে এইভাবে উৎপীড়ন করা কি ধর্মের কাজ? এই রকম হৃদয়হীন ব্যবস্থা অতি পাপিষ্ঠ ধর্মাদিবুদ্ধিবর্জিত পুরুষ বিশেষের ধর্ম হতে পারে, শ্রেষ্ঠগুণের আধার ঈশ্বর নামধেয় পুরুষের পক্ষে কি এটি উচিত কাজ হয়েছে? একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর নিজের দুঃসহ 'একাকীত্বের' জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই কি ঐ রকম খেলা খেলছেন? না — বলদর্পী স্বৈরাচারী রাজা যেমন অধীনস্থ লোকদের নিজ শাসনাধিকারে রাখেন সেই রকম ঈশ্বরও কি 'সর্বশক্তিমান্' বলেই জীবের ভাগ্য যখন যা ইচ্ছা তাই করে চলেছেন? জগতে এত বৈষম্যই বা কেন? জীবের হিত করাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তাহলে ত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যেও জীবকুলকে নিক্ষেপ করতে পারতেন! ভূমিকম্প উল্কাপাত ঝড় তুফান আধিব্যাধি প্রভৃতি আকস্মিক দৈব উৎপাতে যে সহস্র সহস্র প্রাণী প্রতিনিয়ত গচ্ছন্তি যমমন্দিরং — ঈশ্বর যথার্থ দরদী ও কৃপাসিন্ধু হলে সে সকলের নিশ্চয়ই প্রতিকার করতে পারতেন। এ সব দেখে শুনে বিচার করে কারণস্বরূপ বা উপাদানকারণস্বরূপ কোন দয়াময় সুখনিধান ঈশ্বরের কল্পনা করা যায় কি ?

পূর্বপক্ষের অন্য আপত্তি এই যে, ঈশ্বরের জগতে অধিষ্ঠান না থাকলে অর্থাৎ জগতের মূলে কোন প্রতিষ্ঠাতা না থাকলে 'ঘোর অনিয়ম হত, কোন শৃঙ্খলা থাকত না।' এর সহজ জবাব এই, ঈশ্বর ছাড়াই মাত্র জীবের অধিষ্ঠানবশতঃ যখন অচেতন প্রকৃতির নিয়ামক স্বভাবের কোন অন্যথা ভাব ঘটে না, তখন ঈশ্বরের অধিষ্ঠানত্বের আবশ্যক কি ? চুম্বক পাথরের সন্নিধানে যে রকম লৌহের প্রবৃত্তি অর্থাৎ লৌহে ক্রিয়ার সঞ্চার হয়, সেই রকম জীবসম্বন্ধ বশতঃ অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি রূপ ব্যাপারেও কোন অনিয়ম হওয়া সম্ভব নয়।

চেতনের মত অচেতন বস্তুরও ধর্মই এই যে, সে আপন স্বভাব ত্যাগ করে না অর্থাৎ যেমন চেতন বস্তু নিজের চৈতন্য স্বভাব (জ্ঞান-জ্ঞাতাদি) ত্যাগ করে না, তেমনি জীবের অধিষ্ঠান বশতঃ চেতনবৎ অচেতন প্রকৃতির যে নিয়ামক স্বভাব, তারও অন্যথাভাব হয় না। প্রকৃতির ধর্ম এবং অধিষ্ঠাতা — এ দুটি শব্দের তাৎপর্য বুঝলে ঐ তত্ত্বটি আরও পরিস্ফুট হবে। প্রকৃতির ধর্ম চার প্রকার — (১) সাংসিদ্ধিকী, ২) স্বাভাবিকী, ৩) সহজা, ৪) অকৃত।

সিদ্ধযোগীদের অনিমাদি ঐশ্বর্যের প্রাপ্তিরূপ যে প্রকৃতি — যার ভূতভবিষ্যতাদি কোন কালেই অন্যথাভাব হয় না, তাকে 'সাংসিদ্ধিকী' বলে। স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতির যে ধর্ম অর্থাৎ অগ্নির উষ্ণতা, বায়ুর শুষ্কতা প্রভৃতি স্বভাবের নাম 'স্বাভাবিকী'। প্রকৃতির স্বাভাবিকী গুণ দেশান্তরে বা কালান্তরে ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। এই রকম স্ব স্বরূপস্থিত প্রকৃতির যে ধর্ম — যেমন আকাশে পক্ষী প্রভৃতির যে গমনাদি ধর্ম বা স্বভাব — তাকে বলা হয় 'সহজা'। অন্যান্য যে সকল প্রকৃতি, যা কোন নিমিত্তবশতও আকৃত বা অরচিত হয়েও আপন স্বভাবেই কার্যোন্মুখ হয় এবং সর্বদাই স্ব স্বভাবে স্থিত থাকে — যেমন জলের নিম্নদেশে গমন বা পতনাদি স্বভাব তথা ঘটের ঘটত্ব স্বভাব, পটের পটত্ব স্বভাব — এইরকম এইরকম যে সকল প্রকৃতি, যা কখনও আপন স্বভাব পরিত্যাগ করে না, দার্শনিকরা তার পারিভাষিক নাম দিয়েছেন 'অকৃত'।

অচেতন প্রকৃতির ঐ সমস্ত নিয়ামক স্বভাবধর্মের বিচারেই যখন দেখা যাচ্ছে ঐ গুলির কোন অবস্থাতেই অন্যথাভাব সম্ভব নয়, ফলে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলারও অবকাশ নাই তখন অধিষ্ঠাতৃরূপ জীবচেতনের সন্নিধান সত্ত্বেও জগতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটবে, এ কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? অধিষ্ঠাতা শব্দের অর্থই এই — 'অধিষ্ঠাতৃত্বং পরম্পরয়া চৈতন্যসম্পাদকত্বং' — পরম্পরা সম্বন্ধে অপরের যে চৈতন্য সম্পাদন করে অর্থাৎ যার সন্নিধানে জড়েরও কার্য হয় তাকে অধিষ্ঠাতা বলে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবাত্মায় চৈতন্য থাকে, পরম্পরা সম্বন্ধে থাকে শরীরাদিতে। এইভাবে জীবের অধিষ্ঠান প্রকৃতিতে থাকায়, প্রকৃতির নিয়ামক স্বভাবের অবৈপরীত্য ধর্ম অনায়াসে উপপন্ন (প্রমাণিত) হয়।

এখানে বাদী বলতে পারেন — পরিচ্ছিন্ন জীবের প্রকৃতির স্বরূপ বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায় জীব বিশ্বব্যাপক প্রকৃতির অধিষ্ঠান করতে সমর্থ নয়। অতএব নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপাভিজ্ঞ কোন সর্বজ্ঞ পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

বিচার করলেই ধরা পড়বে বাদীর এই যুক্তিও অসিদ্ধ। দেখা যায় লৌহের উপর যখন চুম্বক পাথর ক্রিয়া করে ঐ চুম্বক পাথর লৌহের স্বরূপ জানে না তবুও তাতে উভয়ের উপর উভয়ের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার কোন ব্যত্যয় ঘটে না, যখন অচেতন চুম্বক পাথরের সন্ধানে অচেতন লৌহেরই ক্রিয়ার কোন অন্যথাভাব হয় না, তখন চেতনরূপী জীবের সন্নিধানে অধিষ্ঠেয় অচেতন প্রকৃতির যে অন্যথাভাব ঘটবে এ কি সম্ভব? আরও একটি কথা। যেহেতু স্বভাব অপরিহার্য সেইজন্য একমাত্র আত্মনাশ ছাড়া এমন কোন কারণ থাকতে পারে না যার দ্বারা স্বভাবের পরিবর্তন, বৈলক্ষণ্য বা বৈপরীত্য সংঘটিত হতে পারে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করলে এ কথা অনায়াসে প্রতিপন্ন হবে যে, স্বপ্নে জীবাশ্রিত অজ্ঞান দ্বারা যে সমস্ত পদার্থ ভাসমান হয় তাতেও জাগ্রতের ন্যায় সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা যথাবৎ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থে জীবাভাস পদার্থাভ্যাস উভয়েই সমানভাবে জাগ্রতের ন্যায় শৃঙ্খলা মর্যাদা নিয়ম ধর্মাধর্ম ব্যবস্থা ইত্যাদি সকলই অক্ষুণ্ণভাবে প্রতীত হয়। স্বপ্নের নিয়মের সঙ্গে জাগ্রতের নিয়মের অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। অতএব স্বপ্নে যখন জীব অজ্ঞ ও অজ্ঞানাবৃত হলেও কখন কারও জিজ্ঞাসা জাগে না যে, কোন্ মহান্ পুরুষ এসে স্বাপ্নিক সৃষ্টিকে নিয়মবদ্ধ করলেন, কেই বা মর্যাদা স্থাপন করলেন, তখন জাগ্রৎ অবস্থাতে যাতে উক্ত শৃঙ্খলাদি ভঙ্গ না হয়, তার জন্য কোন্ মহান্ পুরুষের অধিষ্ঠান আবশ্যক — নিমিত্তকারণ বাদীর এই আক্ষেপকে সম্পূর্ণ নিরর্থক ও অসংগতই বলতে হবে।

বাদীপক্ষ আর একটি কথা প্রায়শঃ বলে থাকেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব শাস্ত্রপ্রামণসিদ্ধ ও লোকের বিশ্বাসসিদ্ধ। বাদীর এই দুই আপত্তিও অসার। প্রথমতঃ শাস্ত্রের কথাই ধরা যাক্। ষট্ নাস্তিকদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ মতের মাধ্যমিক, যোগাচার সৌত্রান্ত্রিক, বৈভাষিক এবং জৈন ও চার্বাক দর্শনে ঈশ্বরের অঙ্গীকার নাই। ষট্ আস্তিকদর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও পূর্বমীমাংসা মতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ। এদিকে বৈদান্তিকদের বৃহত্তর অংশ ঈশ্বরকে মায়াকল্পিত বলে থাকেন। 'মায়াকল্পিত' ও 'নাই' — এ দুটি শব্দ তুল্যার্থক। কাজেই বৈদান্তিকের দৃষ্টিতেও

তথাকথিত ঈশ্বরের ধারণা তথৈবচ। কেবল ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়। অতএব দ্বাদশ দর্শনের মধ্যে কেবল তিনটি (ন্যায় ও বৈশেষিক এই দুই দর্শনকে এক বলে গণ্য করলে বাস্তবিক পক্ষে মাত্র দুইটি) দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে; অপর নয়টি (অথবা দশটি) দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ঘোরতর সন্দেহ। সত্য বটে, প্রাচীন ও অর্বাচীন পুরাণাদিতে এবং মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বহু সাড়ম্বর চমকপ্রদ বর্ণনা আছে কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার, গাম্ভীর্য ও গৌরবের তুলনায় ঐ সব গ্রন্থ হতমান। এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলার যে, ঈশ্বরের নাস্তিত্ব-সমর্থক শাস্ত্রের তুলনায় ঈশ্বরবাদ-পক্ষ সিন্ধুজলে বিন্দুর মত দৃষ্টির অগোচর হয়ে 'নাই' — প্রায় হয়ে গেছে। অতএব ঈশ্বর 'শাস্ত্রসিদ্ধ' বলার চেয়ে শাস্ত্র-অসিদ্ধ বললেই সঙ্গত হয়। ভক্তদের তবুও এতে হতাশ হওয়ার কারণ নাই। দার্শনিকরা যাই বলুন, তাঁদের (ভক্তদের) বাঞ্ছিত পুরাণ বর্ণিত ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন, চিরকাল ধরেই তিনি থাকবেন তাঁদের মানস-মন্দিরে। মোহবিজৃম্ভিত অন্ধবিশ্বাস যে তাঁর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। 'এই বটবৃক্ষে ভূত আছে' — এইরকম কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করে সংস্কারাচ্ছন্ন ভীরু যেমন সত্য সত্যই বটবৃক্ষে ভূত দেখে তেমনি ভক্তকুলও যাবৎ অজ্ঞান তাবৎ কাল ধরেই তাঁদের মনঃকল্পিত ঈশ্বরকে দর্শন করতে থাকবেন। তার দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞানসিদ্ধি ত দূর-অস্ত, ঋষি প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের বিচারে 'অন্ধস্য বান্ধলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে' এই পরিণামই বরং অপরিহার্য।

কুশাগ্রধী দার্শনিকদের ঐ শাণিত বুদ্ধিভেদ্য তর্ক ও বিস্তৃত বিচার বিন্যাস সত্ত্বেও ভক্ত ও বিশ্বাসীর দল এই বলে নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন যে, সত্যের যথার্থ সাক্ষাৎকার তর্কের দ্বারা সম্ভব হয় না। একজন বুদ্ধিমান তার্কিক তাঁর প্রতিভাবলে যে তর্কের অবতারণা করেন অন্য কোন অধিকতর তর্ক-বিশারদ তা খণ্ডন করতে পারেন আবার তৃতীয় কোন বিচারমল্ল দ্বিতীয় জনের যুক্তিজালও ছিন্নভিন্ন করতে সমর্থ হন। সুতরাং তর্কের শেষ কোথায়? এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্য — 'নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া'। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রে (২/১/১১) 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তর্ক যে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় তা প্রতিপাদন করে গেছেন। কিন্তু এই আচার্য শঙ্করই আবার অন্যত্র তর্ক ও বিচারকেই দর্শনশাস্ত্রের প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন, দর্শনশাস্ত্রে নাম দিয়েছেন —'ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র', 'মননশাস্ত্র'। মননকে আত্মদর্শনের কারণ এবং অবশ্য অনুষ্ঠিতব্য যোগাঙ্গ বলে পুনঃপুনঃ নির্দেশ করেছেন। শ্রুতিরও অনুশাসন আছে — 'তর্কেন অনুসন্ধত্তে' অর্থাৎ তর্কের দ্বারা সেই নিঃশ্রেয়স্ তত্ত্বকে অনুসন্ধান করবে। আপাতদৃষ্টিতে শ্রুতি ও শঙ্কর বাক্যকে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। তর্কের উদ্দেশ্যে, গতি ও প্রকৃতি বিচার করলেই এর সমাধান পাওয়া যায়। কেউ সত্যজিজ্ঞাসু হয়ে তর্ক করে। কেউ জিগীষার বশে নানা রকম ছল ও অসৎ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করবার জন্যই কূট তর্কজাল বিস্তার করে। আবার কেউ বা তর্কের জন্যই তর্কের কোলাহল সৃষ্টি করে, প্রতিপক্ষের যুক্তিতে সারবত্তা থাকলেও দম্ভ বশতঃ তা মানতে চান না। তর্করহস্য নৈয়ায়িকগণ তর্কের স্বরূপ বুঝাবার জন্য ক) তর্ক (খ) বাদ (গ) জল্প (ঘ) বিতণ্ডা — এই চারটি পরিভাষার প্রয়োগ করেছেন। যে বিচার পদ্ধতির মূলে সত্য জিজ্ঞাসা তার নাম — তর্ক। কিন্তু শেষোক্ত তিনটি ধারার মধ্যে সত্যজিজ্ঞাসা না থাকায় সেগুলি শুষ্ক তর্ক বা অসৎ তর্কের মধ্যে পরিগণিত। শ্রুতি ও আচার্যের উপদেশে ভারতীয় দর্শনে আমরা যেখানে যেখানে তর্কের নিন্দা শুনতে পাই তা ঐ অসৎ তর্ক, শুষ্ক তর্ক অর্থাৎ বাদ জল্প ও বিতণ্ডা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। নতুবা মননশাস্ত্রের প্রাণই তর্ক, সাধ্য-সাধনতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপটি তর্কের দ্বারাই বোধগম্য হয়। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন রহস্যটি জ্ঞানের সাহায্যেও ভাল করে না জেনে চিনে সত্যজিজ্ঞাসু সাধনপথে কি ভাবে পদক্ষেপ করবেন? তর্কের মাধ্যমে যুক্তি পরিণদ্ধ শাতন-পাতনের দ্বারাই তো তত্ত্বের নির্ণয়, পরিগ্রহ (বিশেষভাবে গ্রহণ বা স্বীকার), পরিচিন্তন ও পরিজ্ঞান (সম্যক্ জ্ঞান বা পরিচয়) লাভ সম্ভব হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে সার্বভৌম সত্যের সাক্ষাৎকার সর্বাংশে তর্কলভ্য নয়, সত্য অপ্রতর্ক্য, সাধনালভ্য। তর্কের মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়া থাকে, সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটে বোধের সাহায্যে বোধির ভূমিতে। কিন্তু তর্ক বিজ্ঞানের সরণী বেয়েই বোধির রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। তর্ক-বিচ্ছুরিত জ্ঞানের আলোই বিবর্তিত হয় সংবিদ ও বোধির আলোতে। তাই সত্যপথের পথিক দার্শনিকদের কাছে তর্ক পরম আদরণীয় পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করেই ঋষি ও দার্শনিকগণ তাঁদের জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত সর্বতোমুখ সত্যের সার্বিক স্বরূপ বিচার করেই নির্দ্বিধায়

ঘোষণা করতে পেরেছেন যে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ও প্রচারিত পুরাণ বর্ণিত ঈশ্বর 'সম্পূর্ণভাবে মনঃকল্পিত'। যোগীশ্বর লোকনাথ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর অনুভবী শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতে শুনেছি সেই প্রাচীন ঋষিদেরই কণ্ঠস্বর — 'জগতের পতি কেহ নাই বন্ধুগণ! তোমরা না বুঝিয়া জগতের সৃষ্টিকর্তা, পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কার দাতা, সুখদুঃখের নিয়ন্তা ন্যায়বান রাজার মত জগতের একজন পতি কল্পনা করতঃ সেই কল্পিত জগৎপতিকে ঈশ্বর বলিতেছ। ইহাতে কি তোমাদের যথার্থ ঈশ্বর মানা হইল? যাহা ঈশ্বর তাহা ত পড়িয়া রহিল, যাহা নাই তাহাকে ঈশ্বর মানিলে কি নাস্তিকতা হয় না?'

অতঃ কিম? অতএব কি ? অতঃপর কে ? স্বাভাবিক ভাবে পর্যাকুল প্রশ্ন জাগবে — সেই 'যাহা ঈশ্বরের' স্বরূপটি কি ? কাকে জানলে এই মৃত্যুসাগর হতে উত্তীর্ণ হয়ে জীব অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে? চারি বেদের চারটি মহাবাক্যের মধ্যেই তার সর্বোত্তম শাশ্বত উত্তর আছে। সাক্ষাৎকৃতধর্মা আপ্তকাম বৈদিক ঋষিগণ সমস্বরে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন — 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। জীব স্বরূপতঃ নিত্যমুক্তবুদ্ধ-স্বভাব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। মহাচেতন সমুত্থানে সেই বুদ্ধত্বের জাগরণেই মুক্তি। ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যমুখে জ্ঞান-গুরু আচার্য শঙ্করের চেৎবাণী — এক এব পরমেশ্বরঃ কুটস্থনিত্যো বিজ্ঞান ধাতুর বিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিভাব্যতে, নান্যো বিজ্ঞানধাতুরস্তীতি (১/৩/১৯)॥ অর্থাৎ পরমেশ্বর এক, কূটস্থ নিত্যবিজ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু অবিদ্যা ও মায়া দ্বারা তিনি মায়াবীর ন্যায় প্রতিভাত হন — ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বিজ্ঞান বা তত্ত্ব নাই।

'যাহা ঈশ্বর' শব্দে ঐ পরম বিজ্ঞান-তত্ত্বই উদ্দিষ্ট। বেদ-বেদান্ত বলেছেন — অভীঃ। জীব! তুমি দীনহীনভাবে রহিত হয়ে মনের খেদ পরিত্যাগ কর, নিজের স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হও। তুমি শুদ্ধ, ব্রহ্ম, অজ ও দৃশ্যের প্রকাশক — স্বাশ্রিত অজ্ঞানদ্বারা তুমিই জগতের স্রষ্টা ও সংহারকর্তা এবং নিজে অবিনাশী। তুমি দেবের দেব ও সর্বসুখরাশি, মায়ার দ্বারা জীব ঈশ্বর ও জগৎরূপে তুমিই অবভাসিত হচ্ছ। তুমি অন্তর্বাহ্য চিন্মাত্রস্বরূপ। অস্তিভাতি প্রিয় রূপে তুমি প্রপঞ্চে ব্যাপ্ত — এই রহস্য জেনে কৃতকৃত্য হও।

হে আত্মবিস্মৃত জীব। কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয় — জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ, জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ। রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির নাশ হলে জ্ঞানের উদয় হয়, রাজস বৃত্তি (কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি) এবং তামস বৃত্তি (মোহ আলস্য তন্দ্রাদি) জ্ঞানের বিরোধী। এদের নাশ ব্যতীত জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব নয়। অতএব এই দুই বৃত্তির নিরোধ তথা বিবেক, বৈরাগ্য, সমাধি, ষট্‌সম্পত্তি মুমুক্ষতা এই চারটি জ্ঞানের সাধন জিজ্ঞাসু অপেক্ষিত। এই সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে বিবেক প্রধান, যেহেতু বিবেক দ্বারাই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় সুতরাং সর্বপ্রথম বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

সংসার মৃগতৃষ্ণিকার মত মিথ্যা, আত্মাই সত্য, আত্মার অনুসন্ধানকেই বিবেক বলে। বিবেক দ্বারাই বৈরাগ্যাদি অন্য সাধন সহজে আয়ত্ত হয়। দেহাদি সংঘাত তথা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব মায়ার কার্য আর এইরূপ জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব ভাবও মায়া-কল্পিত, সুতরাং এই দুই-ই মিথ্যা। কিন্তু এই সকলের অধিষ্ঠান রূপ ব্রহ্ম সত্য এবং ব্রহ্মাই তুমি। জীবের জীবত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, বন্ধ, মোক্ষ, সংসার, কর্মফল ইত্যাদি ভাবনা ও ধারণার মূলেও অনির্বাচ্য মায়ার প্রভাব বিদ্যমান। দৃষ্টির সামনে এবং মনের প্রেক্ষাপটে যা কিছু ভাসছে সেই সমস্তকে স্বপ্ন ও মায়িক জেনে নিজেকে নিত্যযুক্ত, একরস, চিৎস্বরূপ বিবেচনা কর।

অনাদিকাল হতে এই সৃষ্টি চলে আসছে, ভবিষ্যতের অনাদিকাল অবধি এইভাবে অবস্থান করবে, অনন্ত জীব মুক্ত হয়েছে, অনন্ত এখনও বদ্ধ আছে — এই রকম যাবতীয় ভাব মনের স্পন্দনমাত্র, এ সমস্তই তোমার চিদাকাশে অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত। যখন তুমি নিজের স্বরূপ জানতে সমর্থ হবে তখন তুমি নিজেই নিজের জন্মাদিবর্জিত পারমার্থিক ভাব বুঝে প্রপঞ্চের অত্যন্তাভাবের অধিষ্ঠানরূপ বলে নিজেকে জানতে পারবে —

অনাদি মায়য়া সুপ্তো সদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।<br>
অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

অনাদি মায়ায় নিদ্রিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, মায়ানিদ্রা ত্যাগ করে, তখনই জন্মাদি অবস্থারহিত আত্মা দ্বৈতভাব অনুভব করে।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।<br>
ন মুমুক্ষ র্ন বৈ ইত্যেষা পরমার্থতা॥

বাস্তবিক পক্ষে প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধ (সংসারী জীব) নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই, মুক্তও নাই — একমাত্র সর্বত্র সমকালে, সমভাবে সমরসে এক অখণ্ড আমি আত্মা বিদ্যমান — এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রকৃত পরমার্থ।' অলমিতি।

আমাদের কথা শেষ হতেই পুরোহিতজী এক মিনিটও অপেক্ষা করলেন না। দ্রুতপদে নিজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। রাত্রি ১০টা বেজে গেছে।

সকলেই শুয়ে পড়ার পরেই আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। কাক কোকিল এবং মোরগের ডাকে খুবই ভোরে জেগে উঠলাম। মনে হয় ৫টা বেজেছে। বাইরে বেশ অন্ধকার। তখনও সূর্যোদয় হয় নি। আমরা যে যার বিছানায় বসে জপে মনোনিবেশ করলাম। যখন আমাদের জপ শেষ হল তখন পূব আকাশে আস্তে আস্তে আলোর আভাষ জেগে উঠছে। সকলে প্রাতঃকৃত্য সেরে সকাল সাতটায় মা নর্মদাকে প্রণাম করে যাত্রা করলাম। প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর গোদা নামক একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে ডাকঘর, পাঠশালা, ও অন্নসত্র আছে। সকালের স্নিগ্ধ আবহাওয়া খুব ভালই লাগছে। এখানেই গংজাল নামক নদীর সঙ্গে নর্মদার সঙ্গম হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারী মনোরম। গংজাল নদী হোসেঙ্গাবাদ জেলার হরদা নামক স্থানে উৎপত্তি লাভ করে সিবনী তহশীলের মধ্য দিয়ে গোদা গ্রামে নর্মদায় মিলিত হয়েছে। গংজাল উত্তাল বেগে এসে নর্মদায় আছড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, সংখ্যাতীত ভারী জিনিষ দুড়দাড় শব্দ করে নর্মদায় পড়ছে। অনেকগুলি ভারী পাথর যেন ঘুরপাক খেয়ে উপরের দিকে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে আবার গড়িয়ে পড়ছে নর্মদার জলে। দেখতে পেলাম লতা-পাতা, বৃক্ষ, জটা, চাঁদ অঙ্কিত ভারী সুন্দর সুন্দর পাথর নর্মদার জলে ভাসছে আর ডুবছে। জলের স্রোতে কিছু কিছু আবার পশ্চিম সমুদ্রগামিনী নর্মদাগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কয়েকটি সুদৃশ্য পাথরের টুকরো জল থেকে ঠিকরে আমাদের আশেপাশে এসে পড়ল। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি পাথর কুড়িয়ে নিলাম। দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম পাথরের উৎক্ষেপ ও নর্তনলীলা। অকল্পনীয় এই দৃশ্য আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম। এমন সময় পিছন থেকে কেউ গম্ভীর গলায় বলছেন শুনতে পেলাম — ওহ্ হ্যায় শাহজুরী পাথর। নর্মদামায়ীকী প্রভাবসে গংজালকা পাত্থর এসা রূপ লেতে হ্যায়। হামলোগ্ ইস্ পাত্থরকো শিবজী মানকর পূজন করতে হ্যায়। এই দুই নদীর সংগমস্থলেই গংজালেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। শান্ত সৌম্য চেহারার লোকটি জানাল স্কন্দপুরাণ পড়ে আমার গুরুজী এই শিবের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, এই তীর্থ হল বিখ্যাত শৈব গাংপলিভেদ সংগম তীর্থ। প্রাচীনকালে কন্যাপুর নামক এক রাজ্যের রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন হরিকেশ। তিনি ছিলেন সোমবংশদ্ভুতো। তাঁর পুত্রের নাম দেবানী। তিনি অসাধারণ রূপবান, বীর ও ধার্মিক ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় দেবানীর রাজত্বকালে কন্যাপুর রাজ্যের প্রজারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে এতই তৃপ্ত ছিল যে কন্যাপুরকে কুবেরের অলকাপুরীর সমকক্ষ বলে মনে করা হত। একবার এ হেন রাজা সূর্যগ্রহণের সময় এক লক্ষ গরু, বিশ সহস্র হেরী (অশ্ব) ব্রাহ্মণদের দানের জন্য এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু সেই যজ্ঞাগ্নিতে এক লক্ষ গাভী, বিশ সহস্র অশ্ব সহ উপস্থিত বিশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভস্মীভূত হয়ে যান। এতে রাজা নিজেকে গো-ব্রাহ্মণ হত্যাকারী মনে করে পরিবার সহিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে যান। কিন্তু প্রজাদের অনুরোধে তিনি সেই সংকল্প ত্যাগ করেন। বশিষ্ঠ, জামদগ্নি, ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরা তাঁকে প্রয়াগ, কাশী, হরিদ্বার, গঙ্গাসাগর সংগমে গিয়ে ব্রাহ্মণ হত্যা দূরীভূত করতে গায়ত্রী জপ, ব্রাহ্মণদের স্বর্ণমুদ্রা দান ও হোম করতে বলেন। কিন্তু রাজার তাতে পাপ দূরীভূত হয় নি। এর কিছুকাল পরে রাজা নর্মদা তীরের এই তীর্থে আসেন এবং সংগমে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাপ দূরীভূত হয়। রাজা দেবানী এই গংজালেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এই মহাদেবের স্থানে স্নান, দান ও পূজা করলে মানুষের পাপ দূরীভূত হয়। মন্দিরের দরজা খুলে গংজালেশ্বরকে দর্শন করে তাঁর মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢেলে প্রণাম করলাম। মন্দিরের পাশ দিয়ে জলের ধারা প্রচণ্ড শব্দে কলকল করে বয়ে চলেছে। নর্মদা পরিপূর্ণ জলসম্ভার নিয়ে প্রবল গতিতে বয়ে চলেছেন।

আমরা তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করার পর পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পরিক্রমার রাস্তায় উঠে এলাম। আবার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে হাঁটতে লাগলাম দ্রুত। নর্মদার ধারে ধারে রাস্তা। পথ ভালই। দু'চারটি করে পল্লীবাসীরও সাক্ষাৎ মিলছে। প্রায় ঘন্টাখানিক হাঁটার পর একজন গ্রামবাসী, মনে হয় বাঞ্জারা গোষ্ঠীর লোক আমাদের

চিনিয়ে দিল শুণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমরা মন্দিরে পৌঁছে প্রণাম করলাম মহাদেবকে। স্বর্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পুষ্প, চন্দন ও বিল্বপত্রে আচ্ছাদিত।

—'আপনারা পরিক্রমাবাসী! আপনাদের আমি পূজা করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি' এ কথা শুনে আমরা পিছন ফিরে দেখি এক প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাম্রপাত্রে চন্দন ঘসে এবং মন্দিরের পাশের বেলগাছ থেকে বেলপাতা পেড়ে এবং এক ঘড়া নর্মদার জল আমাদের জন্য নিয়ে এলেন। আমাদের পূজা শেষ হতেই পুরোহিত মশাই শোনাতে লাগলেন — এই মহাদেবের নাম শুণ্ডীশ্বর। এই স্থান পূর্বকালে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন এই অঞ্চল মিলাডিয়া মহল্লা নামে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মিলাডিয়া গ্রামের বাইরে এই মন্দির। একবার মিলাডিয়াবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণের আগমন ঘটেছিল। সেই সময় লীলাধর পরম কৌতুকী মহাদেব গলিত কুষ্ঠরোগী এক শুঁড়ির বেশ ধারণ করে সেই শ্রাদ্ধবাসরে এসে উপস্থিত হয়ে খাদ্য ভিক্ষা করেন। দ্বিজান সুকৃপণনূদেব কুষ্ঠীভূত্বা যথাচ হ। সেই সময় তাঁর রক্তগন্ধানুলিপ্ত দেহ হতে বুদবুদাকারে স্রাব ক্ষরণ হচ্ছিল, মক্ষিকা ও কৃমিকূলে দেহ আকুল হয়েছিল, তাঁর দুশ্চর্মা দুর্নখ ও দুর্গন্ধময় দেহ পদে পদে টলে পড়ছিল।

স্রবৎ বুদবুদগাত্রস্তু মক্ষিকাকৃমিসংব-তঃ।<br>দুশ্চর্মা দুর্মুখো গন্ধী প্রস্খলংশ্চ পদে পদে।।

তাঁর এই জঘন্য রোগ দেখে সমবেত অভ্যাগতরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে তাঁকে দূর দূর করতে থাকেন। স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্তাও তাঁকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন। সেই ক্ষুধার্ত গলিত কুষ্ঠী তখন ক্ষুণ্ণ হয়ে এখানে এই বনে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় এসে বসলেন। ওদিকে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধান্তে ভোজন করতে বসে দেখেন তাঁদের খাদ্যবস্তু থক্‌থকে দুর্গন্ধযুক্ত কৃমিতে ভরে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব খাদ্য ফেলে দিয়ে রন্ধনশালা হতে তাজা খাদ্য আনিয়ে ব্রাহ্মণরা আচমন করে খেতে আরম্ভ করতেই সেই সব স্বাদিষ্ট গরম গরম আহার্য বস্তুও দলা পাকানো, 'কীড়ে-হি-কীড়ে ভরে পড়ে হৈ'। তখন ব্রাহ্মণরা বুঝলেন, গলিত কুষ্ঠী শুঁড়ি বেশে যে অতিথি এসেছিলেন, তাঁর অপমান করাতেই প্রতিফল ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁরা সকলে মিলে সেই অতিথিকে খুঁজতে বের হলেন। পূর্বেই বলেছি তখন এখানে বন ছিল। বনের অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে তাঁকে বসে থাকতে দেখে, সকলে মিলে তাঁকে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে ভোজন করিয়ে আপ্যায়িত করলেন। ভোজনান্তে সেই গলিত কুষ্ঠরোগী তাঁদেরকে বললেন — দেখো! জো ভূখা অভ্যাগত আপনে যহাঁ আজায় উসে ভোজন দেনেমেঁ বিলম্ব নহীঁ করনা চাহিয়ে। যহী সারাতিসার উপদেশ হ্যায়। আরও একটি ঘটনা এখানে প্রচলিত আছে। সেটি হল —

একবার গ্রামে সকলে মিলে বনভোজনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে নিজেরা খেতে বসে গেলেন। সেখান থেকে বেশ কিছুদূরে অশ্বত্থ গাছের তলায় সেই গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শুঁড়িকে বসে থাকতে দেখেও তাঁকে কিছু খাদ্য দেওয়ার কথা, তাঁদের মনে এল না। পরিপাটি খাদ্য মুখে তুলতে গিয়ে তাঁরা দেখল, তাঁদের খাদ্য বড় বড় দুর্গন্ধময় পোকাতে ভরে গেছে। তাঁদের চৈতন্যোদয় হল। গ্রামের শ্রাদ্ধবাসরের সে পূর্বোক্ত ঘটনা তাঁদের স্মরণে আসতেই কিছু খাদ্য নিয়ে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় শশব্যস্তে গিয়ে দেখল, সেখানে সেই কুষ্ঠী শুণ্ডী নাই। পরিবর্তে তাঁরা অবাক হয়ে দেখল মাটি ভেদ করে এক অপূর্ব সুন্দর স্বর্ণাভকান্তি শিবলিঙ্গ উদ্‌গত হচ্ছেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলাডিয়া গ্রাম হতে ভক্ত নরনারীরা সকলে ছুটে এসে খুব ঘটা করে এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। ইনি শুণ্ডীশ্বর মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ হলেন। শুণ্ডী শব্দের অর্থ শুঁড়ী, যারা মদ্য বিক্রয় করে। কিন্তু শুণ্ডী শব্দের যৌগিক অর্থ গজ বা হাতী। গজ লক্ষ্মীর বাহন, খুবই শুভকরী। ইনি আবির্ভূত হওয়ার পর সমনী গ্রাম ধনৈশ্বর্যে ফুলে ফেঁপে উঠল। মিলাডিয়া গ্রামকে মধ্যপ্রদেশবাসীরা লক্ষপতির গ্রাম বলে। এখানে কেউ গরীব নাই। শুণ্ডীশ্বর মহাদেবকে শুণ্ডিকেশ্বর নামেও অভিহিত করা হয়। শুণ্ডিক + ঈশ্বর। শুণ্ড শব্দের অর্থ স্ত্রীলিঙ্গে অপ্ প্রত্যয় করলে শুণ্ডিক্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শুণ্ডিক্ শব্দের অর্থ আলজিভ বা আলজিহ্বা। শুণ্ডিক্ শব্দের দ্বারা এখানে একটি গুহ্য যোগক্রিয়া খেচরী মুদ্রার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। খেচরী মুদ্রার আন্তর ক্রিয়ায় জিহ্বাকে আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্তে প্রবিষ্ট করিয়ে সহস্রার মণ্ডলে গিয়ে জিহ্বাগ্র দিয়ে ঠোক্কর মারতে হয়। যোগী

চিনিয়ে দিল শুণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমরা মন্দিরে পৌঁছে প্রণাম করলাম মহাদেবকে। স্বর্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পুষ্প, চন্দন ও বিল্বপত্রে আচ্ছাদিত।

—'আপনারা পরিক্রমাবাসী! আপনাদের আমি পূজা করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি' এ কথা শুনে আমরা পিছন ফিরে দেখি এক প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাম্রপাত্রে চন্দন ঘসে এবং মন্দিরের পাশের বেলগাছ থেকে বেলপাতা পেড়ে এবং এক ঘড়া নর্মদার জল আমাদের জন্য নিয়ে এলেন। আমাদের পূজা শেষ হতেই পুরোহিত মশাই শোনাতে লাগলেন — এই মহাদেবের নাম শুণ্ডীশ্বর। এই স্থান পূর্বকালে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন এই অঞ্চল মিলাড়িয়া মহল্লা নামে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মিলাড়িয়া গ্রামের বাইরে এই মন্দির। একবার মিলাড়িয়াবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণের আগমন ঘটেছিল। সেই সময় লীলাধর পরম কৌতুকী মহাদেব গলিত কুষ্ঠরোগী এক শুঁড়ির বেশ ধারণ করে সেই শ্রাদ্ধবাসরে এসে উপস্থিত হয়ে খাদ্য ভিক্ষা করেন। দ্বিজান সুকৃপণনৃদেব কুষ্ঠীভূত্বা যথাচ হ। সেই সময় তাঁর রক্তগন্ধানুলিপ্ত দেহ হতে বুদবুদাকারে স্রাব ক্ষরণ হচ্ছিল, মক্ষিকা ও কৃমিকূলে দেহ আকুল হয়েছিল, তাঁর দুশ্চর্মা দুর্নখ ও দুর্গন্ধময় দেহ পদে পদে টলে পড়ছিল।

স্রবৎ বুদবুদগাত্রস্তু মক্ষিকাকৃমিসংব-তঃ।
দুশ্চর্মা দুর্মুখো গন্ধী প্রস্খলংশ্চ পদে পদে॥

তাঁর এই জঘন্য রোগ দেখে সমবেত অভ্যাগতরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে তাঁকে দূর দূর করতে থাকেন। স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্তাও তাঁকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন। সেই ক্ষুধার্ত গলিত কুষ্ঠী তখন ক্ষুণ্ণ হয়ে এখানে এই বনে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় এসে বসলেন। ওদিকে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধান্তে ভোজন করতে বসে দেখেন তাঁদের খাদ্যবস্তু থকথকে দুর্গন্ধযুক্ত কৃমিতে ভরে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব খাদ্য ফেলে দিয়ে রন্ধনশালা হতে তাজা খাদ্য আনিয়ে ব্রাহ্মণরা আচমন করে খেতে আরম্ভ করতেই সেই সব স্বাদিষ্ট গরম গরম আহার্য বস্তুও দলা পাকানো, 'কীড়ে-হি-কীড়ে ভরে পড়ে হৈ'। তখন ব্রাহ্মণরা বুঝলেন, গলিত কুষ্ঠী শুঁড়ি বেশে যে অতিথি এসেছিলেন, তাঁর অপমান করাতেই প্রতিফল ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁরা সকলে মিলে সেই অতিথিকে খুঁজতে বের হলেন। পূর্বেই বলেছি তখন এখানে বন ছিল। বনের অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে তাঁকে বসে থাকতে দেখে, সকলে মিলে তাঁকে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে ভোজন করিয়ে আপ্যায়িত করলেন। ভোজনান্তে সেই গলিত কুষ্ঠরোগী তাঁদেরকে বললেন — দেখো! জো ভূখা অভ্যাগত আপ্‌নে য়হাঁ আজায় উসে ভোজন দেনেমেঁ বিলম্ব নহীঁ করনা চাহিয়ে। য়হী সারাতিসার উপদেশ হ্যায়। আরও একটি ঘটনা এখানে প্রচলিত আছে। সেটি হল —

একবার গ্রামে সকলে মিলে বনভোজনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে নিজেরা খেতে বসে গেলেন। সেখান থেকে বেশ কিছুদূরে অশ্বত্থ গাছের তলায় সেই গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শুঁড়িকে বসে থাকতে দেখেও তাঁকে কিছু খাদ্য দেওয়ার কথা, তাঁদের মনে এল না। পরিপাটি খাদ্য মুখে তুলতে গিয়ে তাঁরা দেখল, তাঁদের খাদ্য বড় বড় দুর্গন্ধময় পোকাতে ভরে গেছে। তাঁদের চৈতন্যোদয় হল। গ্রামের শ্রাদ্ধবাসরের সে পূর্বোক্ত ঘটনা তাঁদের স্মরণে আসতেই কিছু খাদ্য নিয়ে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় শশব্যস্তে গিয়ে দেখল, সেখানে সেই কুষ্ঠী শুণ্ডী নাই। পরিবর্তে তাঁরা অবাক হয়ে দেখল মাটি ভেদ করে এক অপূর্ব সুন্দর স্বর্ণাভকান্তি শিবলিঙ্গ উদ্‌গত হচ্ছেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলাড়িয়া গ্রাম হতে ভক্ত নরনারীরা সকলে ছুটে এসে খুব ঘটা করে এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। ইনি শুণ্ডীশ্বর মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ হলেন। শুণ্ডী শব্দের অর্থ শুঁড়ী, যারা মদ্য বিক্রয় করে। কিন্তু শুণ্ডী শব্দের যৌগিক অর্থ গজ বা হাতী। গজ লক্ষ্মীর বাহন, খুবই শুভকরী। ইনি আবির্ভূত হওয়ার পর সমনী গ্রাম ধনৈশ্বর্যে ফুলে ফেঁপে উঠল। মিলাড়িয়া গ্রামকে মধ্যপ্রদেশবাসীরা লক্ষপতির গ্রাম বলে। এখানে কেউ গরীব নাই। শুণ্ডীশ্বর মহাদেবকে শুণ্ডিকেশ্বর নামেও অভিহিত করা হয়। শুণ্ডিক + ঈশ্বর। শুণ্ড শব্দের অর্থ স্ত্রীলিঙ্গে অপ্ প্রত্যয় করলে শুণ্ডিক্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শুণ্ডিক্ শব্দের অর্থ আলজিভ বা আলজিহ্বা। শুণ্ডিক্ শব্দের দ্বারা এখানে একটি গুহ্য যোগক্রিয়া খেচরী মুদ্রার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। খেচরী মুদ্রার আন্তর ক্রিয়ায় জিহ্বাকে আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্তে প্রবিষ্ট করিয়ে সহস্রার মণ্ডলে গিয়ে জিহ্বাগ্র দিয়ে ঠোক্কর মারতে হয়। যোগী

সমাজে তাই খেচরী মুদ্রা 'ঠোক্করের ক্রিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই শুণ্ডিশ্বর বা শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খেচরী ক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে মহাদেবের স্নান ও পূজা করার বিধি প্রচলিত।

যাঁরা বারবার চেষ্টা করেও বহুদিনে খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত করতে পারেন না, তাঁরা এখানে এসে তিনদিন চেষ্টা করলেই তাঁদের জিহ্বা অল্পায়াসেই আলজিভের ঊর্ধ্বস্থিত গর্তপথে সহস্রার মণ্ডলে প্রবেশ করে। এইজন্য প্রতি বৎসর কিছু না কিছু যোগী এখানে খেচরীসিদ্ধ হতে আসেন। খেচরীসিদ্ধ বলতে 'খ-তত্ত্বে' অর্থাৎ আকাশতত্ত্বে বা শিবতত্ত্বে বিচরণ করা। এই দেখুন আমার খেচরী ক্রিয়া। এই বলে তিনি হাঁ করে জিহ্বাকে প্রলম্বিত করে ধীরে ধীরে আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্তে প্রবেশ করিয়ে আমাদেরকে খেচরী মুদ্রা দেখালেন। তিনি পরে আমাদেরকে খেচরী মুদ্রা বিশদভাবে বুঝাতে গিয়ে বললেন —

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।<br>
লম্বিকোর্ধ্বেষু গর্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহাম॥

অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি রসনাকে বিপরীতগামিনী করে লম্বিকা অর্থাৎ আলজিহ্বার ঊর্দ্ধস্থিত গর্ত তালুকুহরে প্রবেশ করিয়ে জিহ্বাকে স্থিরতর রেখে ধ্যান করতে থাকবেন, তাতে যমভয় বিদূরিত হয় —

সাধনাৎ খেচরীমুদ্রা রসনোর্ধ্বগতা যদা।<br>
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাৎ হিত্বা সাধারণ ক্রিয়াম্॥

অর্থাৎ খেচরী মুদ্রা সাধনা দ্বারা জিহ্বাকে বিপরীতগামিনী করতঃ তালুমধ্যে প্রবেশ করিয়ে কপালকুহরে ঊর্ধ্বগত করে রাখতে হয়। এই গুহ্য যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান যখন ভালভাবে আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন অন্যান্য সাধারণ ক্রিয়া এবং পূজানুষ্ঠান ত্যাগ করে জিহ্বাকে কপালকুহরে স্থির রাখতে হয়। তাতেই সাধকের শিবদর্শন ঘটে। চাই কি — সাধক নিজেই শিবস্বরূপ হয়ে যান। সাধকের তখন সতত জাগ্রত অবস্থাতেও অন্তর্লক্ষ্য বহিঃদৃষ্টি জন্মে।

হরানন্দজী তাঁর কথা শুনে বললেন — প্রাচীন যোগী সমাজে এই গুহ্যাতিগুহ্য খেচরী মুদ্রার নাম বহু প্রচলিত। আমি শুনেছি, খেচরী অভ্যাস করতে হলে জিহ্বাকে নাকি দোহন ও ছেদন করতে হয়?

পুরোহিতজী বললেন — হ্যাঁ, হ্যাঁ যোগশাস্ত্রে আছে —

'জিহ্বাধো নাড়ীং সংচ্ছিন্নাং রসনাং চালয়েৎ সদা।<br>
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ।<br>
এবং নিত্যং সমাভ্যাসাৎ লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ।<br>
যাবদ্‌গচ্ছেৎ ভ্রূবোর্মধ্যে তদা গচ্ছতি খেচরী॥

জিহ্বার নিম্নভাগে যে সব শিরা সংলগ্ন আছে, তা ছেদন করে সর্বদা রসনার নিচে রসনার অগ্রভাগকে চালনা করবে এবং জিহ্বাকে নিত্য নবনীত দ্বারা দোহনপূর্ব লৌহ নির্মিত একপ্রকার সূক্ষ্মযন্ত্র অভাবে জিবছোলা দ্বারা তাকে ঘর্ষণ করতে হবে। প্রতিদিন এই প্রকারে অভ্যাস করতে করতে জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘ হয়ে পড়বে। যখন দেখা যাবে ঐ জিহ্বা ভ্রূমধ্যস্থান স্পর্শ করছে তখন ঐ জিহ্বাকে তালুর মাঝখানে দিয়ে ঊর্ধ্বদিকে কপালকুহরে প্রবেশ করিয়ে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখতে হবে। যখন অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে, তখন বুঝতে হবে, খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত হয়ে গেল। যোগশাস্ত্রে এসব বর্ণনা থাকলেও এই শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত করার জন্য বেচারা জিহ্বাকে টেনে হিঁচড়ে কোন ছেদন দোহন কর্ষণ মার্জনাদির বিড়ম্বনা বা অত্যাচার সহ্য করতে হয় না। শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের কৃপায় জিহ্বাকে কেবল সাধ্যমত বিপরীতগামী করে ঋষি মেধাতিথি দৃষ্ট ঋগ্বেদের এই সকল মন্ত্রমালা উচ্চারণ করতে হয়। এই মন্ত্ররাজির অপর নাম 'বিশ্বমিৎ সবনং'। এই মন্ত্রগুলি জপ করতে করতেই খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। যখন জিহ্বাগ্র সম্যকভাবে তালুকুহরে প্রবেশ করে যায় তখন, কেবল তখনই দু চোখের তারাকে নাসামূলের নিকটে এনে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ভ্রূদ্বয়ের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দৃঢ় নিবদ্ধ করতে হয়। ভরা মনের ষোল আনা আকুতি নিয়ে কাতরভাবে সে সময় পরমেশ্বর শিবসুন্দরের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেই প্রাণের ঠাকুর জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকটিত হন। তাঁর সেই দিব্য অঙ্গজ্যোতিঃ স্থিরভাবে দেখতে দেখতে অকস্মাৎ একসময়ে প্রণব বিজড়িত দীপকলিকাকার অন্তরাত্মার দর্শন লাভে সমগ্র জগৎসহ নিজেকে ঐ জ্যোতিঃ পুঞ্জের মধ্যে দেখতে পেয়ে সাধক কৃতকৃতার্থ হয়ে যান। সে সময়

সচরাচর সর্বত্রই ঈশ্বরকোটির সিদ্ধ মহাপুরুষদের দর্শন এবং অযাচিতভাবে তাঁদের কৃপালাভ সম্ভব হয়। আমি জানি না আপনারা কেউ খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করেন কিনা। যদি কেউ করে থাকেন তিনি বা যিনি কোনদিনই খেচরী অভ্যাস করেননি তিনি আমার তালে তালে বিশ্বমিৎ সবনং এর মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতে থাকুন। দেখবেন এই খেচরী পীঠের প্রভাবে আপনাদের জিহ্বা স্বতঃই আলজিহ্বার ঊর্দ্ধস্থিত গর্তপথে সহস্রার মণ্ডলে প্রবেশের জন্য বেঁকে যাবে। এই বলে তিনি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে জিহ্বাকে কিভাবে রেখে মন্ত্রগুলি ছন্দে ছন্দে উচ্চারণ করতে হয় তা দেখাতে লাগলেন। তিনি বললেন — যোগী ব্যক্তি জিহ্বাকে বিপরীতগামী করে লম্বিকার অর্থাৎ আলজিহ্বার উর্ধ্বস্থিত গর্ত তালুকুহরে ঢুকিয়ে নিয়ে ঐ স্থানে জিহ্বাকে স্থির রেখে ধ্যান করতে থাকবেন তাতে সকল রকম কর্মবন্ধনের ভয় দূর হয়। ঐ ধ্যান পরিপক্ক হলে, প্রগাঢ় ধ্যানের অবস্থায় সহস্রার চক্রক্ষরিত সুধা বা মধুক্ষরণ হতে থাকে। এই মধু পান করলে শরীর রোগহীন হয়, অতীন্দ্রিয় জগতের অনেক অলৌকিক দৃশ্যের দর্শন ঘটে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতে লাগলেন —

১। ওঁ অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহুতিভিঃ। ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ।।

শুভ্র শুচি তোমার শিখা ছড়িয়ে আছে দেব-বিভূতি।
এস অগ্নি! দীপ্ত উজল গ্রহণ করো মোদের স্তুতি।।

২। ওঁ আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক ! মন্দ্রসানং সুতং পিব। ন্যবমায়ুঃ প্রসূতি(র), কৃধি সহস্রসাম্ ঋষিম্।।

হে কৌশিক শতক্রতু ! ক্ষিপ্র প্রভু হেথায় আসি —
মধুস্থলীর মধু ধারা পান করহে হাসি হাসি।।

৩। ওঁ উপ নঃ সুতম আগহি হরিভিঃ ইন্দ্র কেশিভিঃ। সুতে হি ত্বা হবামহে।।

ঝলমল রশ্মি তোমার কেন্দ্র হতে পড়ছে ঝরি।
চুয়ানো সেই মধুর লাগি তোমায় যে আজ বরণ করি।।

৪। ওঁ যে যজত্রা যে ঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া। মধোরগ্নে! বষট্‌কৃতিঃ।।

পূজ্য তুমি যজনীয়, বষট্‌কারে হবন করি।
প্রাণাগ্নি রূপ রসনাতে পান কর এই মধুর ঝারি।।
ঈড্য আজি উঠছে জেগে যেথায় প্রভু তোমার স্থিতি।
এই মধু যে তোমার পরশ ধন্য যে এই বষট্‌কৃতি।।

৫। ওঁ সেমং নঃ স্তোমম্ আগহি উপেদং সবনং সুতম। গৌরঃ ন তৃষিতঃ পিব।।

রসের লাগি সুধাকরের যে পিপাসা নিত্য দেখি,
তোমারও কি সেই আকুতি মোদের সনে মিলন লাগি?
(তবে) পান কর হে মধুর ধারা হৃদয় ভরে দিই আহুতি।
এটাই সত্য ব্রহ্মপূজা তোমার কাছে যাবার রীতি।

৬। ওঁ ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধিবর্হিষি তানু ইন্দ্র সহসে পিব।।

ছড়িয়ে আছে সোমসুধা স্নিগ্ধ এবং পবিত্র যা —
(মোদের) শীর্ষস্থানের যজ্ঞকুণ্ডে ইন্দ্র! তুমি পান কর তা।।

৭। ওঁ অয়ৎ তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃক অস্তু শন্তমঃ। অথ সোমং সুতং পিব।।

স্পর্শ করুক হৃদয় মোদের হোক এই যাগ সুখতম।
নন্দিত হও হে মঘবা! পান কর সোম অনুপম।।

৮। ওঁ বিশ্বমিৎ সবনং সুতং ইন্দ্রো মদায় গচ্ছতি। বৃত্রহা সোমপীতয়ে।।

ওঁ বৃত্রহা সোমপীতয়ে।। ওঁ -- বৃ-ত্র-হা-সো-ম-পী-তয়ে।
বেদ তোমার মন্ত্রবাণী সেথায় তুমি অভয় দেছ।
বৃত্রহন্তা স্বরূপ তোমার, যোগের বাধা সদাই নাশ।।
বিশ্বমিৎ যজ্ঞকালে সোমপানের মহানন্দে।
এসে থাক ত্বরিৎগতি হর্ষভরে হাস্যছন্দে।।

সেই আশাতে বুক বেঁধেছি হর্ষভরে যজ্ঞ করি।
বিশ্বমিৎ মোর এই খেচরী পূর্ণ হোক তোমায় বরি॥

৯। ওঁ যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্। যত্র লোকাও জ্যোতিষ্মন্তাঃ তত্র মাং অমৃতং কৃধি।

যেথায় রাজে বিপুল জ্যোতিঃ দ্যুতিচ্ছটায় দীপ্ততম
স্বরূপজ্ঞানের কল্যাণেতে দূর হয়ে যায় তীব্র তমঃ।
হিরন্ময় যেথায় সবে, জ্যোতির্ময় সেই দিব্যধামে —
নিয়ে চল প্রভু আমায়, সেই অমৃত, সেই জ্যোতিষ্টোমে॥

১০। ওঁ যত্রানন্দাশ্চ মোদশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে। যত্র সর্বেচাপ্তকামাঃ তত্র মাং অমৃতং কৃধি॥

যেথায় মধু-আনন্দ-রস-কাম-কামনা নিরাকৃত,
জ্যোতিষ্মতী প্রজ্ঞা সুধা হৃদয় করে সুবর্ধিত —
আপ্তকামের ভূমি সে যে, ভূমার সনে আলিঙ্গিত,
হে জ্যোতিষ্মান্! সে অমৃতে কর, কর অভিস্নাত॥

মহাদেবের দিব্যরূপ যেন মন্ত্রগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পুরোহিতজী প্রত্যেকটি মন্ত্র পাঠ করছেন আর দু' তিন মিনিটকাল চুপ করে যাচ্ছেন। আবার দু লাইন পাঠ করছেন। আবার ধ্যানস্থ হচ্ছেন। আমাদের সর্বাঙ্গে মুহুর্মুহু শিহরণের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বরকে যেন দর্শন করছি। শরীর ও মন এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে আছে। মস্তিষ্ক কোষে শুনছি মহাসংগীতের মাধুর্য ও মাদকতা। তা এমনই মধুনিস্যন্দিনী যে অনাবিল শান্তি ও আনন্দে আমি বিহ্বল হয়ে উঠেছি। সমানে বেজে চলেছে অনন্ত সংগীত।

কতক্ষণ যে এই অবস্থায় আমাদের কেটেছিল জানা নেই। যখন চেতনা এল তখন ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখি পড়ে আছি এক অন্ধকারময় মন্দিরের মেঝেতে। মনে পড়ল আমরা শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের মধ্যে পড়ে আছি।

আমি ধীরে ধীরে শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। দেখি একে একে আমার সাথীদেরও ধ্যান ভেঙেছে। মন্দিরের বাইরে তাকিয়ে দেখি, প্রাতঃকালীন সূর্যের উদয়রশ্মি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের উপর। বুঝতে পারলাম পুরো একটা দিন আমাদের এখানে কেটে গেছে। আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। এমন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে কাটালাম যে কাল সময়, ঘন্টা, মিনিট, দণ্ড, পল যেন এই মন্দিরের ভিতর কি দ্রুততালে আবর্তিত হয়ে গেল?

— লেও, আপলোগ্ শুণ্ডিকেশ্বর মহাদেবকা পঞ্চামৃত পিজিয়ে।

পুরোহিতজীর কথায় চিন্তায় ছেদ পড়ল। প্রত্যেকে তাঁর হাত হতে পঞ্চামৃত নিয়ে গলায় ঢেলে দিলাম।

ব্রাহ্মণ বললেন — শুণ্ডিকেশ্বর খেচরী পীঠ নামে প্রসিদ্ধ। শুণ্ডিকেশ্বর নামটির মধ্যে সেই তাৎপর্যই নিহিত। আর তাঁর শুণ্ডীশ্বর, মহাদেব কর্তৃক গলিত কুষ্ঠী শুঁড়িবেশ ধারণের তাৎপর্য এই যে মহাদেব আশুতোষ, সর্বজীবের উপর তাঁর সমান দয়া। তাঁর কাছে শুচি অশুচি, শুঁড়ি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি কোন জাতি বিচার নাই। তিনি হীন পতিতের ভগবান। শুধু পুণ্যবানের উপরেই তাঁর দয়া নাই, পাপীর দুঃখ ও অনুশোচনাতেও তাঁর প্রাণ কাঁদে। যত্র জীব তত্র শিব। ঘাটে ঘাটে তিনি বিরাজ করছেন। শুঁড়ি বেশেও তিনি, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ রূপেও তিনি, সদ্গুরু রূপেও তিনি। জঘন্য দূষিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বা যাঁর কন্দর্পকান্তি শরীর, সকলরূপে সকল বেশের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিরাজ করছেন।

ব্রাহ্মণ নীরব হলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার মহাদেব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা এবং করুণানিধান শুণ্ডীশ্বরের স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমি — আমার বাবা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বেদপন্থী। বৈদিক ঋষিদের আচরিত মার্গই ছিল তাঁর সাধ্যসাধন তত্ত্ব। আমি বাবার কাছে আপনার প্রদর্শিত বিশ্বমিৎ ক্রিয়ার পাঠ নিয়েছি। পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসে জিহ্বায় অগ্রভাগ উলটিয়ে তালুতে ঠেকিয়ে এই সিদ্ধ বেদমন্ত্র ছন্দানুসারে উচ্চারণ করতে থাকলে, সেই মন্ত্রের এমনই বর্ণবিন্যাস যে তা উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেই প্রতি বর্ণের উদ্ঘাত ও স্পন্দন অভ্যাসকালের মধ্যেই জিহ্বাকে তালুকুহরে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য করে। বেদে কুত্রাপি 'খেচরী' শব্দের উল্লেখ নাই, বৈদিক ঋষিরা নাম

দিয়েছিলেন 'বিশ্বমিৎ'। বেদোক্ত সেই বিশ্বমিৎ ক্রিয়াকেই বাবা খেচরীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলতেন। এছ বাহ্য। কোনপ্রকার ক্রিয়া কসরৎ করে জিহ্বাকে তালুকুহরে প্রবেশ করানোকে বাবা খেচরী হিসাবে স্বীকারই করতেন না। তিনি বলতেন — খেচরীর অর্থ 'খ' তে বিচরণ করা। 'খ' এর অর্থ আকাশ। আকাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে 'কাশ্' ধাতু থেকে। কাশৃ ধাতু দীপ্তো। কাজেই আকাশ অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত ব্রহ্মতত্ত্বে বিচরণ করতে পারলেই খেচরী সিদ্ধ বলা যাবে। সহজধ্যান সহজ সমাধিতে তা সম্ভব হয়। প্রভুর জন্য যদি প্রাণে আর্তি থাকে শরণাগতির ভাব নিয়ে বুকভরা কান্না নিয়ে ধ্যান করতে থাকলে নিবিড় ধ্যানে প্রভুর দর্শন মিলে। প্রগাঢ় ধ্যানাবস্থায় জিহ্বা স্বতঃই বিপরীতগামী হয়ে যায়। ধ্যান ভাঙলে সাধক অনুভব করতে পারেন দিব্যানুভূতির কালে বিনা চেষ্টায় বিনা কসরতেই তাঁর জিহ্বা তালুকুহরে প্রবিষ্ট ছিল। শিবনেত্র হয়ে চোখের তারা দুটোকে নাসামূলের অতি নিকটে এনে ললাটের অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত অন্তরাত্মার জ্যোতির্ময় রূপ কল্পনা করতে করতে যে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে থাকে, বাবার ভাষ্যানুসারে সে জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতির আভাস হতে পারে, সর্বাংশে তাকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলা যাবে না। 'কান্না' শব্দের অর্থ বাবা করতেন — কেঁদে আনা। সাধকের আকুতি এবং আশুতোষের কৃপা — এই হল ব্রহ্মদর্শনের মূল কথা। বাবা বারবার আমাদেরকে একজন মুসলমান সুফী সাধকের একটি উক্তি শোনাতেন — রোবে ত রব পাবে। ফারসী ভাষায় 'রব' মানে আল্লা বা পরমেশ্বর। 'রোবে' অর্থ কাঁদবে। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বাবার মতে ব্রহ্ম কোনমতেই কোন ক্রিয়া সাপেক্ষ বস্তু নন। খেচরী মুদ্রা শাম্ভবী মুদ্রা প্রভৃতি কোন ক্রিয়া কসরতেই তাকে প্রকট করা যায় না। তিনি নিজেই প্রকটিত হন। চোখ কান মুখ টিপে খেচরী বা শাম্ভবী দ্বারা সাময়িকভাবে যে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে সে জ্যোতিকে দিব্যজ্যোতি বলে না। বাবার মতে —

অকল্পিতোদ্ভবং জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ প্রকাশিতম্।
অকস্মাদ্ দৃশ্য জ্যোতিস্তৎ জ্যোতিঃ পরমাত্মনি॥ (যোগসন্ধ্যা)

অর্থাৎ যে জ্যোতি বিনা কল্পনায় উৎপন্ন হয়, যে জ্যোতি স্বয়ং প্রকাশিত হয় এবং যে জ্যোতি হঠাৎ দেখা যায় সেই জ্যোতি পরমাত্মায় অবস্থিত বলে জানবে। সেই দিব্যজ্যোতিই যথার্থত — ব্রহ্মজ্যোতিঃ।

পুরোহিতজী — খুব যত্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে সংগোপনে একমাত্র এই বৈদিক খেচরী মুদ্রার সাহায্যে ভ্রুদ্বয়ান্তর্বর্তীস্থানে কপালকুহরে জিহ্বা ঢুকিয়ে দিয়ে প্রণব বিজড়িত জ্যোতির কল্পনায় ধ্যানাবিষ্ট হলেই সদ্গুরুর দর্শন মেলে। আপনাদের প্রত্যেকেরই সদ্গুরু প্রাপ্তি ঘটেছে বলেই নর্মদা পরিক্রমায় এসে আপনারা মা নর্মদার কৃপালাভ করেছেন। এই সিদ্ধক্ষেত্রে বসে এই ক্রিয়ার সাহায্যে আপনারা নিজ নিজ সদ্গুরুর দর্শন লাভ করুন আর তার আনন্দরস উপভোগ করুন।

জানবেন, সদগুরু চেনা বড় দুষ্কর। আলোর ধারা যেমন কখনও নিবে যায় না তেমনি গুরুসত্ত্বা সর্বব্যাপী; অন্ধকার ঘরে আলো দেন। 'গু' মানে অজ্ঞানতার অন্ধকার এবং 'রু' মানে তন্নিরোধক বিমল চৈতন্য জ্যোতিঃ। গুরু শব্দ বোঝাচ্ছে তাঁকে, যিনি ১) সর্বদা উৎসাহিত হতে চাইছেন ২) তিনি সর্বপ্রকার স্তুতির যোগ্য ৩) যাঁকে দেখতে পাওয়া যায় ৪) যাঁকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। একমাত্র তিনিই উৎক্রমণের জন্য ঊর্দ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যান।

ঋষি পতঞ্জলিই বলেছেন — স এযঃ পূর্বেযামপি গুরু কালেন অনবচ্ছেদাৎ। অর্থাৎ গুরুসত্ত্বা পূর্বে ছিল এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে — তার ব্যাহিতী (অবিচ্ছিন্নতা) নেই।

কিন্তু সাড়ে তিন হাত দেহধারী সৎগুরু কোথায় আছেন তা জানা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। গুরু খুঁজে নিতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই আছে। Preconceived notion থাকার ফলে কন্দর্পকান্তি, কি জটাজুট সমন্বিত, কি বিবিধ বিভূতিসম্পন্ন বা তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান দেখেই মনে হবে ইনিই সৎগুরু। এমনিভাবে বাছাই করতে গেলেও ভুল হতে পারে। কেউ যদি বলে দেন বা তাঁর গুরুর কাছে বা অন্য কারুর কাছে পাঠান তাতেও ভুল হতে পারে। পিঁপড়ে যেমন কখনো পাহাড় মাপতে পারে না তেমনি কারুর নির্দেশে গুরু খুঁজতে নেই। গুরু নিজেই তাঁর কাছে প্রকট হন, যিনি তাঁকে চান। The moment Guru accepts you, he sits on your astral plane and regulates your every action.

তবে কি করে সেই গুরুর দর্শন পাওয়া যাবে?

মহর্ষি যাস্কাচার্য্য, মহর্ষি পাণিনী প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন — চোখ বন্ধ করে মন সহজ করে পরম নিশ্চিন্ততায় ভাবী গুরুর কাছে আত্মসমর্পন করে তাঁর দর্শন প্রার্থনা করতে হবে।

চোখ বন্ধ করলে প্রথমে একটা পর্দা ভাসবে। এই পর্দা অজ্ঞানের অন্ধকারের যবনিকা — তাও তিনি, কারণ একঃ ব্রহ্মঃ দ্বিতীয়ো নাস্তি।

নিশীথ রাত্রে হঠাৎ মাঠের মধ্যে হাতের লাঠি হারিয়ে গেলে যেমন লাঠির খোঁজে চারিদিকে তাকালে অন্ধকার ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে আসে, আবছা আবছা আলো দৃষ্ট হয়। তেমন চোখ বন্ধ অবস্থায় চোখের পর্দার আড়ালের অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে আসবে। নিশীথ সূর্যেরই বিচ্ছুরিত রশ্মি যা conserved হয়ে আছে বস্তু কণায়, তাই অন্ধকারকে স্বচ্ছ করে। প্রত্যেকেরই চিৎগুহায় যে চিন্ময় পুরুষ আছেন তিনি সেই অখণ্ড পরমকারণ সত্তা। তাঁর জ্যোতি হৃদয় পুণ্ডরীকে সকলের মধ্যে আছেন। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখতে চাইছে যে জ্যোতির্ময় পুরুষের পঞ্চকোশাত্মক আবরণযুক্ত সূক্ষ্মসত্ত্বা। সেই জ্যোতিরই আলোকে আলোকিত অজ্ঞানাবরণমুক্ত অবস্থায় তাঁকে ক্রমে দেখতে পাবে।

কালো পর্দার আড়ালে গুরুশক্তির প্রতীক্ষায় আত্মনিবেদন করলে যার যেমন অপেক্ষা করতে হবে ও যে সব বাধা দৃষ্ট হবে তা থেকে এজন্মের আধারের ভেদ বোঝা যাবে। অন্ধকারের ঝাপসা ভাব কমে এলে অনেকগুলো আলোর বিন্দু ভাসবে। ক্রমে এই আলোর বিন্দুগুলো বিঘূর্ণিত হতে থাকবে। ক্রমে একটা আলোক বিন্দু স্থির হবে। সেই আলোর বিন্দুটি ক্রমে বড় হলে তালের মত হবে। এবার তা বিস্ফারিত হবে। বিন্দুর বিস্ফোরণ হবে। তারপরই ঐ বড় গোলাকৃতি আলোর পিছনে বিদ্যুতের ঝিলিকের মত গুরুর জ্যোতিঘন রূপ ভেসে উঠবে। কয়েকদিন এরকম আবছাভাবে গুরুর জ্যোতির্ময় রূপ দেখার পর তাঁর এই মনুষ্যদেহে অধুনা স্থিত অবয়বটি স্পষ্ট দেখা যাবে। ঐ রকম অবয়ববিশিষ্ট যাঁকে দেখবো তাঁকেই গুরু জানতে হবে। এই পদ্ধতিতে যে গুরু পাওয়া যাবে তাতে কোন ভুল নেই — কারণ যাঁকে খুঁজছি এর বিষয়ে Preconceived কোন ধারণাই নেই। বৈদিক ঋষিদের নির্দেশিত এটা হল গুহ্যাতিগুহ্য পথ। নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। এই পথকে মুণ্ডক্য উপনিষদে 'শিরোব্রত যোগ' বলা হয়।

এই উপায়ে আধার ভেদে ৫ থেকে ৩৫ দিনে বা খুব বেশী হলে ৩২০ দিনে প্রত্যেকেরই গুরু দর্শন হতে পারে। হতে পারে বললাম, কারণ গুরু যদি চান তাহলে অন্য ভাবেও শিষ্যের কাছে দেখা দিতে পারেন। সে তাঁর মরজি।

কালো পর্দার আড়ালে গুরুশক্তির প্রতীক্ষায় আত্মনিবেদন করলে যার যেমন অপেক্ষা করতে হবে ও যে সব বাধা দৃষ্ট হবে তা থেকে এজন্মের আধারের ভেদ বোঝা যাবে।

আধার বিভেদ পাঁচ প্রকারের—(১) মায়িক জীব (২) কার্মিক জীব (৩) শকল জীব (৪) ভ্রান্ত জীব (৫) ভ্রষ্ট জীব।

মায়িক জীবদের পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্য তাদের চোখের সামনে যে সব আলোর বিন্দু ভাসে তাতে মনসংযোগ হতে চায় না। তাদের সারাদিনের কর্মের চিন্তা মনের মধ্যে কেবলই ভেসে ওঠে। অফিস, আদালত, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির চিন্তাই কেবল আলোড়িত হয়। তাদের মধ্যে Tendency দেখা যায় চোখ বন্ধ অবস্থায় অন্ধকারের পর্দাটা পাতলা হলেও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না বলে মনের লাগাম ছেড়ে দিয়ে মন যেদিকে যেতে চায় সেদিকে ছেড়ে দেয়। তা কিন্তু চলবে না। মায়িক জীবরা যদি গুরুশক্তির কাছে মনে মনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ঐ কালো পর্দার পিছনে তাঁর দেখা মিলবে এই প্রতীক্ষায় থাকে তখন বিন্দুগুলোর মধ্যে একটি জ্যোতির বিন্দু ক্রমে বড় হয় ফোটে ও সাত দিনের মধ্যে তার পিছনে গুরুর জ্যোতির্ময় রূপ ভেসে উঠবে প্রথমে ঝিলিকের মত, তারপর স্পষ্ট ভাবে। এটাই প্রস্তুতি। গুরুলাভের জন্য শিষ্যের কৃত্য শুধু এইটুকুই। তারপর গুরুদর্শন হলে আর যা কিছু কৃত্য তা শুধু গুরুরই।

কার্মিক জীব হল দ্বিতীয় প্রকারের জীব। এদের পূর্বজন্মের কর্মফল এমনই যে, যখন চোখ বন্ধ করে কালো পর্দার আড়ালে গুরু শক্তির কাছে আত্মসমর্পনের জন্য প্রতীক্ষা করে অর্থাৎ জপ ও ধ্যানে মন নিবিষ্ট করে তখন নানা বাধা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। হয়ত পূর্বের-পুরানো বন্ধু এল কুশলা-কুশল নিতে বা পাশের বাড়ীতে ঝগড়া শুরু হল বা ঠাকুরঘরের সামনে বসে বিড়াল ম্যাঁও ম্যাঁও আওয়াজ শুরু করায় ধ্যান জপে মন বসল

না। এই জপ বা ধ্যান কোন বর্ণাত্মক নামে বৈখরীতে বা শ্বাসে শ্বাসে বা মনে মনে বারবার বলা নয়। জপ হল 'যঃ যত্র বুদ্ধি নিষ্পন্দ্যতে স এব জপঃ' অর্থাৎ যা পরাবাকে মহাস্পন্দ্রের স্থানে নিষ্পন্ন হয়।

শকল জীবদের, মায়িক ও কার্মিক জীবদের তুলনায় মায়িকমল ও কর্মমল কম থাকে। তাই তারা যখন চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা অন্ধকার ভাবটা একটু সহজেই অপসৃত হয়। তখন তাদের চোখের সামনে ভোর রাত্রিরের কুয়াশার মত আবছা আলো কণা ভাসতে থাকে। একেই ঋষিরা বলেছেন — নীহারকণাবৎ।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎ স্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপানি পুরঃসরানি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ (শ্বেতাশ্বেতর)

ভোর রাত্রের কুয়াশার মধ্যে জোনাকী পোকা যেমন ঘুরে বেড়ায় তেমনি আরো কণা ভাসে।

এইভাবে গুরুর পতীক্ষায় আত্মনিবেদন করে থাকলে ক্রমে অনেকগুলি আলোর কণার ভিতর থেকে ক্রমে একটি কণা বড় হয়ে সমস্ত আকাশটাকে ঘিরে থাকবে। তারপর তা বিস্ফারিত হয়ে দু'ভাগ হয়ে যাবে। তারপর তার পশ্চাতে গুরুর জ্যোতির্ময়রূপ প্রথমে আবছাভাবে বিদ্যুতের ঝিলিকের মত ও তার কয়েকদিন পরে তাঁর রূপ স্পষ্ট দেখা যাবে, তিনিই সদ্‌গুরু। তিনি নিজেই এসে দেখা দেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ আপনি হয়ে যায়।

এই যে আলোর কণা ভাসে বললাম এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দরকার। যেহেতু আমরা পঞ্চাকোষের আবরণের মধ্যে আছি, সেহেতু এই স্থূলজগতে দৃষ্ট সমস্ত রকমের আলো আমাদের ধারণায় আসে কিন্তু এই আলো হল জ্ঞানজ্যোতির আলো। চতুর্থ রকমের জীব হচ্ছে ভ্রান্ত জীব। এরা যখন চোখ বন্ধ করে অন্ধকারের পর্দার আড়ালে গুরুকে দেখবার বাসনায় তাঁর কাছে পূর্ণ সমর্পণ করে তখন কিন্তু মায়িক জীব, কার্মিক জীব বা শকল জীবদের মত কালো পর্দাটা হাল্কা হলেও আলোর ফুটকি বা কুয়াশা বা নীহারকণাবৎ জোনাকীর আলো তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা প্রথমেই দেখতে পায় একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা — তা শ্বেতশুভ্র — ক্রমে তা যেন ঐ চিদাকাশে তাকে ঘিরে ধরে। তারপর সেই আগুনের বেড়াজালের ভিতর থেকে একটা আগুনের লেলিহান পিণ্ড দেখা যায়। এই গোলাকার অগ্নিপিণ্ডটা দু'ভাগ হয়ে যায়। তার পশ্চাতে সদ্‌গুরুর জ্যোতিঘন রূপ প্রথমে ঝিলিকের মত ও ক্রমে পরিষ্কার রূপে দেখা যায়। এই সব ভ্রান্ত জীবদের একমাস সময় লাগে গুরুর দেখা পাবার। যেখানে অন্যদের সাত দিন লাগে। কারণ — ভ্রান্ত জীবদের জীবনে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। যেমন দেহের কোথাও বা কোথাও নিরন্তর একটা বেদনা থাকে। আবার কর্মবন্ধনের জন্য সর্বদা জাগতিক বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়। কিন্তু মায়িক, কার্মিক ও শকল জীবদের তুলনায় ভ্রান্ত জীবদের কর্মবন্ধন কম। পূর্বজন্মে এদের কোন শুদ্ধ সংস্কার ছিল কিন্তু অন্যান্য কর্মের বন্ধন থাকার ফলে তারা তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয় না।

পঞ্চম প্রকার জীব হচ্ছে ভ্রষ্ট জীব। এঁরা যখন চোখ বন্ধ করে গুরুর দর্শন অপেক্ষায় থাকেন তখন এদের চোখের সামনে আলোর বিন্দু বা অগ্নিগোলক এইসব দর্শিত হয় না। এঁরা দেখেন অপার নীলাম্বু জলধি। ক্রমে এই নীল সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে যায়। সেই অগ্নি প্রথমে শ্বেতশুভ্র, তারপর নীলাভ অবশেষে পিঙ্গলবর্ণ হয়। এরপর এঁদের সামনে পূর্ব পূর্ব জন্মের সদগুরুরা দর্শন দেন ও আশীর্বাদ করেন। সবশেষে এখন দেহধারী যে সৎগুরু সত্ত্বা আছেন তাঁর অবয়ব পরিস্ফুট হয়। এইসব ভ্রষ্ট জীবদের জন্মজন্মার্জিত সংস্কার শুভ থাকে। শুধুমাত্র আণবমলের Coating থাকার ফলে এঁদের পঞ্চকোষের বন্ধনে আসতে হয়। গুরুলাভের পর এই জন্মেই তাঁদের পরামুক্তি হবে। এটাই তাঁদের শেষ জন্ম।

এখন বলব কোন স্থানে গুরুর ধ্যান করা দরকার।

মুখের মধ্যে তালুর শেষে মুখ গহ্বরের ঠিক উপরেই মাতৃস্তনের মত ঝুলানা আলজিহ্বা রয়েছে। তার একটু উপরে White matter brain cell আছে। এর উপরে আছে Grey matter. এই White এবং Grey Matter এর সংযোগস্থলে আলজিহ্বার বরাবর উপরে দুটি নাড়ী ঈড়া ও সুষুম্না পরস্পরকে Cross করে গেছে। মাথার উপরে ব্রহ্মতালু থেকে এই Point অবধি কেশান্তের দুই প্রান্ত থেকে দুটি নাড়ী এই Point এ Touch করেছে ইংরাজী $x$ এর মত এবং ওখান থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেছে $x$ এর আকারে। হিতানাড়ী মাথার উপরে ছুঁয়ে আছে। হিতানাড়ী বেয়ে অখণ্ড সত্ত্বাই প্রত্যেক জীবদেহে আছেন ও থাকেন। ইড়া ও পিঙ্গলার meeting

point-এ রয়েছেন গুরু ও আত্মা। ঐখানে concentrate করলেই গুরুর ভাস্বর মূর্তি ফুটে উঠবে।

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে ঋষি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলেছেন—

'অন্তরেণ তালুকে। স এষ স্তন ইবালম্বতে। সেন্দ্র যোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে। ব্যাপোহ্য শীর্ষ কপালে। ভূরিত্যাগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমাত্মা প্রতিষ্ঠিত।' অর্থাৎ গুরুই হলেন উপায়। 'তাসাং মূর্দ্ধানম্ভিনিঃসৃতৈকা'। মূর্দ্ধাদেশ দিয়ে অভিনিঃসৃত একানাড়ী সুষুম্না চলে গেছে। এই পথে উৎক্রান্ত হলেই জীব গতাগতির উর্দ্ধে গিয়ে পরামুক্তি পায়।

আমি — দ্বিদলপদ্মস্থানে এই যে সৎগুরু দর্শনের কথা আপনি বললেন একেই শ্রীচৈতন্য বলেছেন — আপনি আসেন কৃষ্ণ গুরু চৈত্যরূপে। চৈত্যপুরুষই গুরুর অবয়ব নিয়ে দেখা দেন। তিনিই আলোর দিশারী — ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী। শৈবাগম শাস্ত্রের 'শিবসূত্রবিমর্ষিণী' তে গুরুকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে —

সংসার সিন্ধোস্তরনৈক হেতো দধে গুরুম মূর্ধণি শিবস্বরূপম।

সদ্‌গুরুর কৃপায় তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পর মহেশ্বরের দিব্য চেতনায় জীব আলোর জগতে উদ্ভাসিত তুরীয় চৈতন্যে জেগে ওঠে, কাল ও কর্মের বন্ধন হতে মুক্ত হয়।

পুরোহিতজী ফিরে গেলেন, আমরা লাঠি, কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। বেলা তখন প্রায় দশটা-সাড়ে দশটা হবে অনুমান করলাম। মনের তন্ময়ভাব এখনো যায়নি, একটা যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছি। সাতপুরা পর্বতমালা রৌদ্রোদ্ভাসিত। স্নান করে শিবপূজার জন্য কিছু বনফুল সংগ্রহ করে এনে মন্দিরে ফিরে এলাম। আমি ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্রকে মনে মনে নির্বাচন করে নিয়ে উর্ধবাহু হয়ে জপ করলাম। ঘুমে চোখে জড়িয়ে আসছে। একধারে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন সূর্য অস্ত গেছেন। নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেছে সমগ্র মহারণ্য। গাছপালা নর্মদা পাহাড় কোন কিছুই আর চোখে পড়ছে না। বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম নানা কথা। মন্দিরের বাইরে এসে চুপচাপ বসে থাকলাম। সঙ্গীদেরও অবস্থা তথৈবচ। আমার শরীর খুব হাল্কা মনে হল। মনে হল আমার শরীর যেন তুলার মত হয়ে গেছে। মন্দিরের মেঝেতে পা ঠিকঠাক পড়ছে না। অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের স্রোত বইছে শরীরে।

সান্ধ্য আরতির পর পুরোহিতজী আমাদের কাছে এসে বসলেন। পুরোহিতজী বললেন — চুপচাপ বৈঠকে আনন্দকী রস লেতে রহো। নর্মদার তটে তটে, বিভিন্ন তীর্থে আপনারা পরিক্রমা করছেন। বহু জায়গায় দেখেছেন দেবালয়কে ঘিরে ভক্তের ভীড়। বিভিন্ন জায়গায় ভক্তের ভক্তি প্রকাশের নানা ভঙ্গিমাও আপনারা দেখেছেন। এইখানে এই শুণ্ডিশ্বর তীর্থেও দেখছেন বহু ভক্তের ভীড়। ভক্তদের এই ভক্তির সহজার্থ হল ভালবাসা। সুখ বা আনন্দই হল ভালবাসা — যা জীবমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম। সুখের বিষয় যা, যাতে আনন্দ বিদ্যমান আছে তাকেই আমরা ভালবাসি, তাই আমাদের নিকট প্রিয় হয়ে থাকে। যা সুখের বিষয় নয় অর্থাৎ যা ভাল লাগেনা, তা আমরা ভালবাসি না। জীবমাত্রেই সুখ বা আনন্দকে ভালবাসে বলে সুখের বিষয়মাত্রেই জীবের প্রিয় হয়। সুখের অনুরোধেই সুখের বিষয়ের প্রতিও ভালবাসা জন্মে থাকে। জীব আনন্দ ব্যতীত আর কাউকেও বা কোন কিছুই ভালবাসে না। অতএব যেখানেই ভালবাসা বা প্রিয়তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে তারই অভ্যন্তরে সুখ-সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান, জানতে হবে।

সংসারে যাকে আমরা প্রিয় মনে করি যা কিছু আমরা ভালবাসি সেই স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদ, ধনরত্ন, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, প্রভৃতি বিষয় সকল কেহই বা কিছুই প্রিয় নয়; এদের কাউকেও কেউ ভালবাসে না। আমরা ভালবাসি কেবল আনন্দকেই। একমাত্র আনন্দই আমাদের প্রিয় বস্তু। তবে উক্ত বিষয় আমাদের নিকট প্রিয় বলে বোধ হয়। আমরা যে ঐ সকল বিষয়কে ভালবাসি বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সে ভালবাসা বিষয়ের প্রতি নয়, তা আনন্দ বা সুখকেই ভালবাসা। স্ত্রী পুত্রদিগকে যে ভালবাসি, সে ভালবাসা তাদের প্রতি নয়, স্ত্রী পুত্রাদি হতে আমরা যে সুখ পাই, সেই সুখ, সেই আনন্দকেই ভালবাসি বলে। সুখের বিষয়স্বরূপ স্ত্রী পুত্রাদি আমাদের নিকট প্রিয় হয়ে থাকে। সেই স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদ, ধন-রত্নাদি যে আমাদের নিকট প্রিয় হয়ে থাকে — সেই প্রিয়তা সেই ভালবাসাও বিষয়ের জন্য নয়, সেই সকল বিষয় হতে আমরা যে আনন্দ পাই, সেই আনন্দ বা সুখকেই ভালবাসি বলে সুখের অনুরোধেই সুখের বিষয় সকলও আমাদের নিকট প্রিয় বলে বোধ হয়। যেমন দুগ্ধের প্রতি ভালবাসা আছে বলে গাভী লোকের প্রিয় হয়, যেমন ইক্ষু রসের প্রতি

ভালবাসা আছে বলে ইক্ষু লোকের প্রিয় হয়। সেরূপ সুখের সম্বন্ধেই সুখের বিষয় সকল লোকের প্রিয় হয়ে থাকে। আনন্দই প্রিয় বস্তু; আনন্দ পাই বলেই দুগ্ধ প্রিয় হয়। আনন্দের সম্বন্ধবশতঃ দুগ্ধ প্রিয় বলেই গাভী প্রিয় হয়ে থাকে ও আনন্দের সম্বন্ধবশতঃ গাভী প্রিয় বলে গোষ্ঠও লোকের প্রিয় হয়ে থাকে। আবার দুগ্ধ যার ভাল লাগেনা, দুগ্ধে যার প্রিয়তা নাই তার নিকট দুগ্ধ সুখের বিষয় নয়। গাভী ও গোষ্ঠ কিছুই তার প্রিয় নহে, অতএব একমাত্র সুখ বা আনন্দই মুখ্য প্রয়োজন বা সাধ্য বস্তু। আর দুগ্ধ, গাভী, গোষ্ঠের ন্যায় স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় সকল সুখের সাধনমাত্র — তা সুখ বস্তু নয়। তা কেবল সুখের সম্বন্ধ পরম্পরায় প্রিয় হয়ে থাকে।

যেমন দুগ্ধ ও গাভী এক বস্তু নয়। তেমনই সুখ ও সুখের বিষয় এক নয়, পৃথক বস্তু। গাভী দুগ্ধ বললে যেমন গাভীই দুগ্ধ এরূপ প্রতীতি না হয়ে, গাভীর দুগ্ধ অর্থাৎ গাভী হতে প্রাপ্ত দুগ্ধকেই নির্দেশ করা হয়, সেরূপ বিষয় সুখ বলতে বিষয়ই সুখ এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, কিন্তু বিষয়ের সুখ বা বিষয় হতে প্রাপ্ত সুখকেই নির্দেশ করা হয় — সুখের বিষয় হতে যা প্রাপ্ত হয়। আত্মবস্তু ভিন্ন আনন্দ নাই এবং আনন্দ ভিন্ন প্রিয়তা ও ভালবাসাও নাই — এই কথাটি আমাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। যা চৈতন্য তাই আনন্দ ও সেখানেই প্রিয়তা। যা আনন্দ তাই চৈতন্য ও আনন্দ। এবং যেখানে প্রিয়তা, তাই চৈতন্য ও আনন্দ। চৈতন্য, আনন্দ ও ভালবাসা এই তিনে নিত্য ও নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

জীবের প্রকৃত স্বরূপ চৈতন্য বা আনন্দ। জীব নিজে আনন্দে আনন্দিত হয় এবং আনন্দকেই ভালবেসে থাকে; অপর কোনও আত্মতর বা অনাত্ম বস্তুকে ভালবাসে না বা ভালবাসতেই পারে না। অতএব এটি সুনিশ্চিত যে, আত্মবস্তু ব্যতীত অনাত্ম বা জড়ীয় দেহ, গেহ, দারা পুত্রাদি বিষয় সকল বাস্তবিক পক্ষে সুখকর হতে পারে না। সুতরাং সেই সকল অনাত্ম বস্তুকে প্রীতিকর বলাও চলে না। এখন সংশয় হতে পারে এই যে, অনাত্ম বা জড় বিষয় সকল — যা হতে আমরা সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকি, তা সুখ বা প্রিয় না হতে পারে; কিন্তু সুখের অর্থাৎ প্রীতিকর বিষয় বলে তা সুখকর ও প্রীতিকর হবে নাইবা কেন? আফিং নিজেই নিদ্রা না হলেও, তা হতে যখন নিদ্রাপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আফিংকে নিদ্রাকর বলে উল্লেখ করা যেমন অসঙ্গত হয় না, তেমনই জড় বিষয় নিজেই 'সুখ' বস্তু না হলেও, তা হতে যখন সুখপ্রাপ্ত হয়, তখন বিষয়কে সুখকর অতএব প্রীতিকর বলে মনে করা যে অসঙ্গত, তারই বা হেতু কি হতে পারে?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আফিং নিজেই নিদ্রা না হলেও নিদ্রাকারিতা যেমন আফিং-এর নিজ শক্তি বা স্বধর্ম বলে আফিংকে নিদ্রাকর বলা অসঙ্গত নয়, বৃক্ষই ফল না হলেও ফল যেমন বৃক্ষেরই নিজ শক্তি বা স্বধর্ম বলে বৃক্ষকে ফলকর বলা অসঙ্গত হয় — অনাত্ম বিষয় হতে আমরা যে সুখ, যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকি, তা জড়ের নিজশক্তি বা স্বধর্ম নয় বলে, এই জন্যেই অনাত্মবিষয় মাত্রকে সুখকর ও প্রীতিকর বলে উল্লেখ করা সুসঙ্গত হয় না; যদি বৃক্ষ ফলের ন্যায় বিষয়সুখ অনাত্ম বিষয়ের স্বধর্ম হত, তা হলে সুখের বিষয় সকলকে অবশ্যই সুখকর ও প্রীতিকর বলে বুঝার দোষ ছিল না; কিন্তু সুখ বা আনন্দ, অনাত্ম বা জড়ীয় বস্তুর স্বধর্ম না হওয়ায় উহা সুখকরও নয় সুতরাং প্রীতিকরও নয়। সুখ বা আনন্দ আত্মবস্তুরই স্বভাব।

যা আত্মবস্তু, একমাত্র তাই সুখ স্বরূপ ও সুখ স্বরূপ হয়েও সুখকর এবং তা প্রিয় ও প্রিয় হয়েও সুখকর এবং তাই প্রিয় ও প্রিয় হয়েও প্রীতিকর, অর্থাৎ যে বস্তু একাধারে যুগপৎ সুখ ও সুখকর, প্রিয় ও প্রীতিকর — তাই আত্মবস্তু। অনাত্মবিষয়ের যে সুখধর্ম, তা জড়ের স্বধর্ম না হওয়ায় তা যে প্রিয় বা প্রীতিকর এই উভয়ের কিছুই হতে পারে না, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলে একথা আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারি।

জীব আত্মবস্তু বলেই দেহাদির ন্যায় জড়বস্তু নয়। জড়বস্তুতে আত্মবস্তুর ন্যায় সুখধর্ম ও প্রিয়তা না থাকায়, উহার অপর নাম অনাথবস্তু। আমরা অবিদ্যাবশতঃ দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মার সন্ধান অবগত নই বলে, সেই চিদাত্মার পরিবর্তে নিজ নিজ অনাত্ম দেহকে আমি বা আত্মস্বরূপ মনে করি। তেমনি আবার স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যাদির দেহাতিরিক্ত হওয়া যায় — তাকেই সুখ বা আনন্দ — এবং সুখ বা আনন্দ যাতে অবস্থিত, তাকেই সুখের বিষয় জানতে হবে। সুখকে সুখ ও যা সুখের বিষয় — যা সুখ প্রদান করে, তাকেই 'সুখকর' বলা হয়ে থাকে, সুতরাং সুখ ও সুখের বিষয় যখন পৃথক বস্তু তখন সুখ ও সুখকর এই শব্দ দুইটিকেও পৃথক জানতে হবে। আবার সুখই যখন জীবের প্রিয় বস্তু, তখন সেই সম্বন্ধবশতঃই সুখের বিষয়মাত্রেই জীবের প্রিয় হয়ে থাকে। সুখ ও সুখকর যেমন পৃথক বস্তু তেমনি 'প্রিয়' ও 'প্রীতিকর' শব্দার্থ পৃথক বস্তুকে নির্দেশ করে

থাকে। অর্থাৎ যা সুখ কেবল তাই প্রিয় এবং যা সুখকর তা প্রিয় হতে পারেনা; তা সুখের সাধন মাত্র।

সুখের স্বরূপ অবগত নই বলে আমরা সুখের বিষয় বা সুখের সাধনকেই ভ্রমবশতঃ সুখ বলে মনে করে থাকি। বস্তুতঃ তাকে আপাতত সুখকর ও প্রিয়কর মনে হতে পারে। কিন্তু 'সুখ' ও 'প্রিয়' নয় যা কেবল সুখ পদার্থ, একমাত্র তাই জীবের প্রিয়, একমাত্র তাই জীবের ভালবাসার বস্তু। যা চিন্ময় বা আত্মবস্তু তাই আনন্দ বা সুখময়। চিদ্‌বস্তু বা চৈতন্যই আনন্দ এবং আনন্দই চৈতন্য বা চিদ্‌বস্তু, অতএব চিন্ময় বা আত্মবস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত কোথাও আনন্দ বা সুখ উপলব্ধি করা কোনমতেই সম্ভব নয়। যেখানে সুখ লক্ষণ বিদ্যমান, সেখানে আত্মবস্তুর সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, চিদাত্মার সাথে স্বীকার করতে হয়, চিদাত্মার সাথে পরিচয় না থাকায় তাদের জড়ীয় দেহকেই 'আমার' বা 'আত্মীয়' জ্ঞানে সেই অনাত্ম জড়পিণ্ড সকলকে সুখের বা প্রীতির বিষয় বলে মনে করে থাকে —এটিই স্বরূপভ্রান্ত জীবের প্রতি মায়ার নিষ্ঠুর পরিহাস। বস্তুতঃ চিন্ময় বা আত্মবস্তু ব্যতীত কোনও অনাত্মবিষয়ে সুখধর্ম্ম বিরাজমান থাকতেই পারে না — অতএব তা প্রিয় বা প্রীতিকর হতেও পারে না। সুখ বা আনন্দ একমাত্র আত্মবস্তুরই নিজধর্ম্ম, সুতরাং আত্মবস্তুই একাধারে যেমন সুখ ও সুখকর, তেমনই সুখই প্রিয় বলে, সুখকর আত্মবস্তুই আবার যুগপৎ প্রিয় ও প্রীতিকর।

জীব আত্মবস্তু — তাই জীবাত্মা সুখময়। জীবাত্মার সুখধর্মের এতই প্রভাব যে, যদি কোন অনাত্ম বা জড় বস্তুতে আত্মসম্বন্ধ যুক্ত বা আত্মভাবের আরোপ হয়, তথাপি সেই সুখহীন অনাত্মবিষয়ে আত্মার আভাস পতিত হওয়ায়, তাকেও সুখকর ও প্রীতিকর বলে উপলব্ধি করায়। যে ধর্ম্ম বা যে লক্ষণ, যাতে নাই, তাতে ভ্রমবশতঃ সেই ধর্মের যোজনা করাকেই আরোপ বলে। সেই অনাত্ম বিষয় সকলকে অর্থাৎ যাতে সুখধর্ম নাই, সেই সকল জড়ীয় বিষয়ে অবিদ্যাবশতঃ অহংমমাদি জ্ঞান অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার আত্মসম্বন্ধ আরোপ করে আত্মার সুখধর্মে, তাদেরকে সুখকর ও প্রীতিকর মনে করাকেই অনাত্ম বিষয়ে আত্মবুদ্ধির আরোপ বলে। আত্মবস্তুর আনন্দ ও প্রিয়তার এতই প্রভাব যে, আত্মভাব আরোপিত অনাত্ম বিষয়ও সুখময় আত্মার সুখ সম্বন্ধে সুখকর ও প্রীতিকর হয়ে উঠে।

জলস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব উচ্ছলিত হয়ে কোনও জ্যোতিহীন পদার্থে নিপতিত হলে, তাও যেমন জ্যোতির্ময়রূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেহে প্রতিবিম্বিত আত্মভাব উচ্ছলিত হয়ে অপর কোনও অনাত্ম বিষয়ের উপর পতিত হলেও সেই সুখহীন বিষয়কে সুখকর ও প্রীতিকর বলে উপলব্ধি করে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে সুখ ও প্রিয়তা ধর্ম জড় বস্তুতে থাকে না; চিন্ময় মুখ্য আত্মার সম্বন্ধবশতঃ জড়ীয় দেহে আত্মবোধ হয়ে আবার সেই দেহরূপ গৌণ আত্মার সম্বন্ধ বা আত্মাভাস অপর অনাত্ম বিষয়ে আরোপ করা হলে দেহের ন্যায় তাও সুখকর ও প্রীতিকর বলে বোধ হয়। সারমেয় যেমন রসরক্তহীন শুষ্ক অস্থিখণ্ডকে বারংবার চর্বন পূর্বক উহাকে স্বীয় দর্শন নিঃসৃত রুধিরাগে রঞ্জিত ও স্বীয় রসনানি সৃত লালা দ্বারা সিক্ত দেখে, স্বীয় রসরক্ত দিয়েই যেমন শুষ্ক অস্থিখণ্ড হতে প্রাপ্ত বিষয় বলে মনে করে, তেমনি অনাত্ম বিষয় স্বরূপতঃ সুখহীন ও অপ্রিয় হয়েও আত্মাভাবের আরোপ হেতু আত্মারই সুখকর্ম্ম ও প্রিয়তা দ্বারা রঞ্জিত হওয়ায়, উহাকে সুখকর ও প্রীতিকর বোধ হয়।

আত্মভাবের আরোপ না হওয়া পর্যন্ত কোনও অনাত্ম বিষয় সুখকর ও প্রীতিকর হয় না; সুতরাং সুখ ও প্রিয়তা যে জড়ের নিজ ধর্ম নয়, একথা একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সুখ আত্মদেহে আরোপ করা হলে, তখন দেহকেই 'আত্মা' ও 'আমি' বলে বোধ হয়। আবার সেই দেহরূপ 'আমি' বা গৌণ আত্মার সম্বন্ধে যে বস্তু বা যে বিষয়ে আভাসিত হয়ে থাকে — আত্মা সম্বন্ধনিবন্ধন তাও আত্মীয় বা আত্মাসম্বন্ধীয় রূপে অনুভূত হওয়ায় আত্মপ্রায় সুখের ও প্রীতির বিষয় হয়ে উঠে। আত্মভাবকে 'আমি' ও আত্মীয়ভাব বা আত্মসম্বন্ধীয় বিষয়কে আমরা 'আমার' বলে থাকি। কোনও বস্তুতে আমার বলে বোধ না জন্মালে, তা হতে সুখলাভ করা কখনও সম্ভব হয় না, অতএব তা প্রীতির বিষয়ও হয় না; আবার যে বস্তুতে যে পরিমাণে 'আমার' বোধ সংযুক্ত হয়, তা সেই পরিমাণে প্রিয় হয়ে থাকে। মিষ্টিহীন বস্তু মধুর দ্বারা সংলিপ্ত করে সেবন করলে তাও যেমন মিষ্টি লাগে, তেমনই অনাত্ম বিষয়ে 'আমার' বুদ্ধি বা আত্মীয়ভাব সংলিপ্ত হওয়াই তার প্রিয়তার কারণ। আত্মসম্বন্ধ সংযোগ ব্যতীত কোনও অনাত্মবিষয় কারও নিকট যা কিছু 'আমার' তাই প্রিয়; যা আমার নহে তা — প্রিয় হয় না। স্বামী, স্ত্রী, স্বদেশ, স্বজন, আহার বিহারাদি কোনও বিষয় কাহারও প্রিয় হয় না, যে পর্যন্ত সেই অনাত্ম বিষয়ের সঙ্গে 'আমার' বা আত্মীয় বুদ্ধির আরোপ না হয়।

সুখ ও প্রিয়তা যদি স্ত্রী, পুত্র, ধন ধন্যাদি বস্তুর বা আহার বিহারাদি বিষয়ের নিজ ধর্ম হত, তবে ঐ বিষয় সকল সময়ে সকলের নিকটে প্রিয় হতে পারত, কিন্তু যা কর্তৃক উক্ত যে কোনও বিষয়ে যে কাল পর্যন্ত 'আমার' বা মমতা বুদ্ধির সংযোগ হয়ে থাকে, কেবল তার নিকট সেই বিষয় সেই কাল পর্যন্ত প্রীতিকর হতে দেখা যায়, তখন সুখ ও প্রিয়তা যে অনাত্ম বা জড়ীয় বিষয়ের স্বভাব নয়, এ কথা সহজেই বোধগম্য হতে পারে। সকল জননীই নিজ নিজ পুত্রকে যে ভালবাসেন, নিজ নিজ পুত্রে জনগণের 'আত্মীয়' ভাব বা মমতা সম্বন্ধ থাকাই তার কারণ; এইরূপ পিতাপুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-ভগ্নী প্রভৃতি সকলের ও সকল বিষয়ের প্রতি ভালবাসা আত্মীয় ভাবই একমাত্র কারণ। পুত্রাদিই যদি প্রিয়বস্তু হত তবে যে কোনও জননীর নিকট যে কোন পুত্র প্রিয় হতে পারত। কিন্তু যে পুত্রে যে জননীর 'আমার পুত্র' এই প্রকার আত্মীয়তার সংবদ্ধ, কেবল সেই পুত্র ব্যতীত সেই জননীর নিকট অপর কোন পুত্র প্রিয় হয় না। আবার নিজ সন্তানের প্রতি মাতার যে ভালবাসা দেখা যায়, সেই প্রিয়তা নিজ সন্তানের স্বভাবগত ধর্ম হলে, সকল সময়ে সেই প্রিয়তা পরিলক্ষিত হত। সৌরভ মৃগমদের স্বভাব বলে উহা আঁধারে বা আলোকে যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, তার সুবাসের ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু অন্ধকার গৃহমধ্যে জননী কর্তৃক আপন সন্তানকে সস্নেহে কোলে নেবার পরক্ষণই যদি উহাকে সপত্নী-পুত্র বলে ভ্রম জন্মে তবে নিজ সন্তান হলেও তৎপ্রতি আত্মীয়ভাবের সংযোগ ছিন্ন হওয়া মাত্র, তৎক্ষণাৎ সেই নিজ সন্তানই আবার পরিত্যক্ত হয় এবং তদনুরূপ অবস্থায় বিপরীত ভ্রমবশতঃ আবার যখন বিমাতা কর্তৃক 'আমার' বোধ প্রযুক্ত হওয়ায়, সপত্নী, পুত্রকেই স্নেহ পরবশে বক্ষে তুলে নেয়, তখন সুখ ও প্রিয়তা বা ভালবাসাকে সুখময় আত্মার স্বধর্ম না বুঝে উহা স্ত্রী পুত্রাদিরই নিজধর্ম বলে মনে করা যে কতদূর অবিদ্যার প্রতারণা, তা সকলেরই চিন্তনীয় বিষয়। যে স্থলে স্বেচ্ছাপূর্বক বিমাতা কর্তৃক সপত্নীর সন্তানকে যে পরিমাণে সস্নেহ পালন করতে দেখা যায় — অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সেই সন্তানের প্রতি বিমাতার তৎপরিমিত আত্মীয়ভাব বা 'আমার' বোধ অবশ্যই জাগ্রত আছে। এইরূপ ধন, ধান্য, গৃহাদি বিষয় সেই পর্যন্ত কারও নিকট প্রীতিকর হয় না। যে পর্যন্ত সেই সকল বিষয়ের সঙ্গে 'আমার' বোধ বা আত্মীয়ভাবের সম্বন্ধ না ঘটে। সুখ ও প্রিয়তা যদি বিষয়ের স্বভাব হত, তবে তা সকলের নিকট সকল অবস্থায় একইভাবে প্রকাশিত হত; কিন্তু তা না হয়ে অনাত্ম বিষয়মাত্রকেই যখন আত্মীয়ভাবের সংযোগ প্রিয় ও বিয়োগে অপ্রিয় হতে দেখা যায়, তখন সুস্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, একমাত্র আত্মাই সুখকর ও প্রীতিকর বলে, সেই আত্ম সম্বন্ধ বা তৎসম্বন্ধাভাসও যার উপর প্রযুক্ত হয়, আত্মার সুখধর্মেই তাকে সুখকর ও আত্মার প্রিয়তায় তাকে প্রীতিকর বোধ করিয়ে থাকে।

জলাশয়ে তরঙ্গ ও নিস্তরঙ্গবশতঃ যেমন তৎপ্রতিবিম্বিত সূর্যের চঞ্চলতা ও স্থিরতা সাধিত হয়, সেইরূপ বিকারশীল দেহের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবান্তর প্রাপ্তিতে, দেহ নিবদ্ধ আত্মভাবে সুখ ও দুঃখ অনুভূত হয় বলেই আমরা দেহের আরোগ্যাদি অনুকূলতা প্রাপ্তির ও পীড়াদি প্রতিকূলতা নিবৃত্তির চেষ্টা করে থাকি, বস্তুতঃ এই প্রয়াস দেহের প্রীতি সাধনের জন্য নয় — আত্মাকে ভালবাসি বলেই আত্মার সুখাভাব নিবৃত্তির জন্যই আমার দেহের প্রীতিসাধন করে থাকি। আবার দেহে সেই আত্মভাব সংবদ্ধ দেহের সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে আত্মীয়ভাব বা 'আমার' বোধ জন্মে সেই স্ত্রী-পুত্র, ধন-ধান্যাদি বিষয়কে সুখকর মনে করে, যে সকল বিষয়কে ভালবেসে থাকি, সেই ভালবাসা তাদের প্রীতির নিমিত্ত হয় না — আত্মাকে ভালবাসি বলে উহা সেই প্রিয় আত্মার প্রীতির জন্যই জানতে হবে। আত্মা যদি সুখকর ও প্রিয়বস্তু না হত, তবে কারও নিকট অপর কোন বস্তুই সুখের ও প্রীতির বিষয় হত না। আত্মসম্বন্ধ বশতঃ আত্মপ্রীতি সাধন কামনায় সমস্তই প্রিয় হয়ে থাকে। এই অভ্রান্ত তত্ত্বই বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে ঋষি তাঁর জীবনব্যাপী তপস্যার ফল প্রিয়তমা পত্নীকে বোঝাতে গিয়ে যা বলেছেন তার মধ্যেই জীবের সুখ ও ভালবাসার মূল কোথায়, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন —

ন বা আর পত্যুঃ কামায় পত্যুঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়া ভবতি। ন বা আর জায়ায়ৈ কামায়, জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।

'আরে মৈত্রেয়ী! জায়া ও পতির প্রীতিসাধনের জন্য পতিকে ভালবেসে থাকে; আবার পতি যে জায়াকে ভালবাসে, তাও জায়ার প্রীতির জন্য নয়, কেবল আত্মার প্রীতিসাধন নিমিত্ত। পুত্র সকলের প্রীতির জন্য পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় না; কিন্তু আত্মার প্রীতির নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়। বিত্তসকলের প্রীতির জন্য

বিত্তসকল প্রিয় নয়, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই বিত্তসকল প্রিয় হয়ে থাকে। কারও প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রিয় হয় না। আত্মাই প্রিয় বস্তু বলে, কেবল আত্মার প্রীতিসাধনের জন্য সকলেই প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব সেই আত্মবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করবে, পরে অনুকূল যুক্তি দ্বারা শ্রুত বিষয় মনন করবে এবং পরিশেষে সেই বিচারিত বিষয় নিরন্তর ধ্যান করবে।

'আত্মা বা আর দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খলু আর দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্'।

অতএব, আত্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধিই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু। আত্মজ্ঞানলাভই সুখ ও আনন্দের উৎস। আত্মজ্ঞানই সুখ। তাই আনন্দম্। অলমিতি।

পুরোহিতজী চলে যেতেই সকলেই শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল সকাল হয়ে গেছে। আমরা স্নান, তর্পণের জন্য নর্মদার ঘাটে উপস্থিত হলাম। এই মন্দিরের একপাশে পাথরের রাজ্য, অন্য পাশে জলের। বাম দিকে থাকে থাকে উঠে গেছে পাহাড়। ছোট পাহাড়, মাঝারি পাহাড়, বড় পাহাড়। সেই আকাশ-চুম্বী সাতপুরা পর্বতের ঘনঘোর জঙ্গলে ঢাকা, বড় বড় বনস্পতির ভীড়ে তার মেরুদণ্ডটা ঠাউরে ওঠা অসাধ্য। ডানদিকে নর্মদার উথাল-পাতাল তরঙ্গ স্রোত। সূর্যকরস্নাত এই নর্মদাতটের শোভা মনকে করে শান্ত, স্নিগ্ধ।

আমরা আমাদের নিত্যকর্ম সেরে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। শিবলিঙ্গের উপর চন্দন, বিল্বপত্র ও প্রচুর বুনোফুল দেখে বুঝলাম, আমরা এখানে পৌঁছানোর পূর্বেই কেউ পূজা করে গেছেন। শিবলিঙ্গকে খুবই দীপ্তিময় মনে হচ্ছে। আমি নর্মদার জল ঢেলে পূজা করলাম। জপ ও প্রণাম করে বেরিয়ে এসে দেখি উত্তরতটে নর্মদার কিনারে এক দল হরিণ জল খাবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য প্রায় দশ মিনিটকাল উপভোগ করলাম। সহসা চোখের পলকে হরিণগুলো ত্বরিৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হরানন্দজী বললেন — প্রাতঃকৃত্যাদি সারবার জন্য যখন নর্মদায় যাচ্ছিলাম তখন দূর থেকে একবার পুরোহিতজীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর দর্শন মেলেনি। বেলা একটা নাগাদ পুরোহিতজী আমাদের আহার্য নিয়ে মন্দিরে উপস্থিত হলেন। পুরী, ডাল, সব্জী ও পায়েস। আমরা সবাই খুবই তৃপ্তি করে খেলাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে বসে খেলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই একটু গড়িয়ে নিলাম। বেলা চারটা নাগাদ পুরোহিতজী উপস্থিত হলেন। নানারকম গল্পের ফাঁকে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন —

আপনি বেদাধ্যায়ী। দুর্ভাগ্যক্রমে বেদাধ্যয়নের সুযোগ আমার ঘটে নাই। কাজেই আপনি যদি দয়া করে আমার জিজ্ঞাসার উপর যথোচিত আলোকপাত করেন তা হলে বিশেষ বাধিত হব।

সম্প্রতি বোম্বাইস্থ ভারতীয় বিদ্যাভবন হতে প্রকাশিত History and culture of Indian People (Vol.1) নামক বইখানি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, শ্রী সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. ডি. লিট (প্যারিস), শ্রী বি. এল. আপ্তে এম. এ., পি.এইচ.ডি, (ক্যান্টাব) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও পণ্ডিতদের রচনার দ্বারা বইখানি সমৃদ্ধ। বইটির 'The Vedic Age' নামক অধ্যায়ে বৈদিক যুগে বিবাহ ও স্ত্রীলোকর মর্যাদা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে শ্রীযুক্ত আপ্তে লিখেছেন — The guests are entertained with the flesh of cows, killed on the occasion (Rig. 10.85.13) শুধু তাই নয়, The Vedic Index (P 145) নামক পুস্তকেও দেখলাম Macdonel এবং Keith সাহেবও ঐ একই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বেশ জোরের সঙ্গেই লিখেছেন —'The marriage ceremony was accompanied by the slaying of oxen, clearly for food' পড়ে মনটি বিষাদে ভরে গেল। শঙ্কা নিরসনের জন্য মূল ঋগ্বেদ খুলে দেখলাম। তাতে আছে,

সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যতে গাবো অর্জুন্যোঃ পর্য্যুহ্যতে॥ (ঋগ্বেদ ১০/৮৫/১৩)

স্পষ্টতঃই লেখা আছে 'হন্যতে গাবো'। সত্যই কি বৈদিক যুগে ঋষিরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন? এই জন্যই কি অতিথির প্রতিশব্দ 'গোঘ্নঃ'? অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে অশ্ব ও গরু বলি দেওয়া হত ? সেকালে কি বিবাহবাসরে গোমাংসের সঙ্গে সোম পাক করে খাওয়ার বিধি প্রচলিত ছিল? প্রসিদ্ধ মহাত্মা

তিব্বতী বাবা এবং সো২হং স্বামীও নাকি ঐ রকম মতের পরিপোষক ছিলেন। কিছুদিন আগে ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য আমার এক বন্ধু সো২হং স্বামীর একখানা বই দেখিয়ে (অবশ্য কতকটা মজা করবার জন্যই) বললেন যে, গোমাংস ভক্ষণ নাকি সম্পূর্ণ বেদসম্মত। যাহোক, আমাদের পূর্বপুরুষরা গোখাদক ছিলেন, একথা মানতে প্রবৃত্তি হয় না। অনেক পণ্ডিত 'গো' শব্দের অর্থ 'জিহ্বা', 'পৃথিবী', প্রভৃতি করে একটা কষ্টকল্পিত অর্থ খাড়া করেন। কিন্তু 'গোঘ্নঃ হন্যতে গাবো' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ এবং পুরাকালে অশ্বমেধ গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের কথা ভাবলে, রহস্যময় যৌগিক অর্থের দোহাই দিয়ে যুক্তিবাদী মন পরিতৃপ্ত হয় না।

— প্রথমেই আপনি একথা জেনে নিশ্চিন্ত হোন যে বৈদিক ঋষিরা গোখাদক ছিলেন না, বেদে অশ্ব বা গো হত্যার কথা কোথাও নাই। বেদ বুঝতে হবে যথোচিত তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এবং স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন হয়। তদ্‌ভাবে মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণ, মহামুনি যাস্কাচার্য প্রণীত নিরুক্ত, শ্রী দুর্গাচার্য কৃত ভাষ্য, নিঘন্টু ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি আচার্যের কাছে পড়তে হয়। নতুবা বৈদিক শব্দের মর্ম বোঝা যাবে না। যে সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে হেয় করার জন্য সর্বদা তৎপর, সায়ণ মহীধর, উবট প্রভৃতির বিকৃত বেদব্যাখ্যাই যাদের একমাত্র সম্বল, তাঁদের বই পড়ে যাঁরা বেদ বা বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, তাঁরা যত বড়ই পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে খ্যাতিমান হোন না কেন — তাঁরা ভ্রান্ত, সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। ট্র্যাজেডি এই যে, যে দেশে গোমাতাকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করা হয়, কোন চর্ম নির্মিত বস্তু নিয়ে যে দেশে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, গোহত্যাকারীদের দেশে ম্লেচ্ছ এবং যবন বলে নিন্দা করা হয়েছে সেই যুগ যুগ ধরে লালিত পবিত্র সংস্কারের বিরোধী গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণের কথা সে সব পণ্ডিতের উর্বর মস্তিষ্কে উদ্ভব হওয়াই যে সম্ভব! এ এক বিষম কলি কৌতুক! আমাদের দেশে একজন কোন বিষয়ে বড় হলেই তিনি মনে করেন যে তিনি সর্বজ্ঞ এবং পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ে মন্তব্য করার অধিকার তাঁর জন্মে গেছে!

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ করা হত। তাই কিছু কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁদের উচ্ছিষ্টভোজী এদেশী পণ্ডিতরা মনে করেন যে, ঐ সব যজ্ঞকালে যথেচ্ছভাবে অশ্বহত্যা ও গোহত্যা করা হত। তাঁদের ঐ ধৃষ্ট মন্তব্যের উত্তরে জিজ্ঞাসা করুন — আমাদের শাস্ত্রে তো পিতৃযজ্ঞ ও অতিথি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। তাহলে কি বুঝতে হবে ঐ সব যজ্ঞে মাতাপিতা এবং অতিথিবর্গকে হত্যা করা হত ? নিঘন্টুতে যজ্ঞের একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে অধ্বর (৩/১৭)। 'অধ্বর' শব্দের নিরুক্তি করতে গিয়ে যাস্কাচার্য লিখেছেন — 'অধ্বর ইতি যজ্ঞানাম্। ধ্বরতি হিংসাকর্মা, তৎপ্রতিষেধ, তৎপ্রতিষেঃ।' (১/৮) ঐ মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে শ্রীদেবরাজ যজ্বা লিখেছেন —

ধ্বরতের্বধ কর্মণঃ, পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ (অষ্টাধ্যায়ী ৩/৪, ১১৮)

নঞ্‌পূর্ব। ধ্বরা হিংসা, তদভাবো যত। (নিঘন্টু ১/১৭)

এর অর্থ হল, অধ্বর শব্দটির দুটি ভাগ — অ+ধ্বর। 'অ' এর অর্থ নিষেধ, 'ধ্বর' এর অর্থ হিংসা করা। কাজেই অধ্বর শব্দের অর্থ হল হিংসা না করা। কাজেই যজ্ঞ শব্দের সার্থক প্রতিশব্দরূপে 'অধ্বর' ব্যবহার করে যজ্ঞকালে প্রাণী হত্যা বা যে কোন রকমের হিংসা যে নিষিদ্ধ তা বৈদিক ঋষিরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এছাড়া যজুর্বেদের ১৩/৪২ নং মন্ত্রটি দেখুন; সেখানে ঋষির স্পষ্ট অনুশাসন 'অশ্বং না হিংসীঃ'। কাজেই অশ্বমেধ যজ্ঞ মানে যে অশ্ব বধ নয় তা প্রমাণিত হল। এবারে ঋষিরা গরু খেতেন কিনা সে বিষয়ে একটু বিচার করা যাক্।

বৈদিক শব্দকোষ নিঘন্টুতে 'গো' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে পাই — অঘ্ন্যা, অদিতি, উস্রা, উস্রিয়া, অহী, মহী, জগতি ইত্যাদি — (২/১১)। নিঘন্টুর টীকাকার শ্রীদেবরাজ যাজ্ব অদিতি শব্দের নির্বচন করেছেন — 'নদ্যতি অখণ্ডনীয়া' অর্থাৎ যার অঙ্গ ছেদন অনুচিত। অ+দিত অখণ্ডনীয়া। 'গো' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে অদিতি শব্দের প্রয়োগ মনে রেখে এবার যজুর্বেদের দুটি স্পষ্ট ঘোষণা শুনুন —

গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্॥ (১৩/৪৩)

গরু অদিতি — তা বধের অযোগ্যা, তাকে হিংসা কোর না।

ঘৃতং দুহানামদিতিং জনায়াগ্নে মা হিংসীঃ পর মে ব্যোমন্। (১৩/৪৬)

শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা পাই —

........ ঘৃতং দুহানামদিতিং জনায়েতি। ... এষু লোকেষ্বনং মা হিংসীরীতি॥

অর্থাৎ মানুষকে যে ঘৃতদান করে তার নাম অদিতি, কাজেই তাকে হিংসা করো না। এইভাবে পরোক্ষ ব্যাখ্যা ছাড়াও যাস্কাচার্যের ব্যাখ্যাতে 'গো' শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থও পাই।

তিনি লিখেছেন — 'অথাপ্যস্যাং তাদ্ধিতেন তেন কৃৎস্নবন্নিসমা ভবন্তি। গোভিঃ শ্রীণীত। মৎসরামিতি পয়সা মৎসর সোমো, মন্তৃতেস্তৃপ্তি কর্মণঃ। (নিরুক্ত ২/৫)

টীকাকার শ্রীদুর্গাচার্য এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'অথাপ্যস্যামেব পশুগবি, তাদ্ধিতেন প্রয়োগেনাকৃৎস্নানায়াং সত্যাং কৃৎস্নবন্নিগমা ভবন্তি। তদ্যথাগোভিঃ শ্রীণীতমৎসরমিতি গোরেক দেশস্থ পয়সঃ কৃৎস্নবৎপ্রয়োগঃ।' অর্থাৎ বেদে গো শব্দটি গরুর একদেশ অর্থাৎ দুধ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। এরই উদাহরণ দিতে গিয়ে যাস্ক, 'গোভিঃ শ্রীণীতমৎসরম' এই মন্ত্রভাগ উপস্থিত করেছেন। এর সরল অর্থ হল — গো অর্থাৎ দুধের সঙ্গে সোম পাক কর। কেউ কেউ ঐ কথা থেকে গোমাংসের সঙ্গে সোম প্রস্তুত কর, এই রকম অর্থ করেন। বৈদিক সাহিত্যে অনধিকারী নামকরা কোন কোন পণ্ডিত তাই স্পর্ধিত উক্তি করেছেন যে ঋষিরা গোমাংসের সঙ্গে সোম পাক করে খেতেন। তাঁরা সোমেরও অর্থ বুঝেছেন মদ, তাই ঠিক এখন যেমন মাতালরা মদের সঙ্গে মাংস খায় তেমনি তাঁদের ধারণা হয়েছে, বৈদিক যুগে লোকে সোমের সঙ্গে গোমাংস খেতেন। এখন শুধু বিচার করে দেখুন সোম যদি মদ হয়, তাহলে মদকে কি কেউ পাক করে খায়? অগ্নির তাপে মদের পরিণতি কি হবে তা কি ঐ কল্পনাবিহারী পণ্ডিতম্মন্যরা একবারও ভেবে দেখেছেন? কাজেই সোম মানে মদ নয়, তেমনি 'গো' শব্দের অর্থ গোমাংস নয়। গো বলতে বৈদিক দৃষ্টিতে দুধ বুঝাবে — এই রকম অর্থ যে করা হয় — সংস্কৃতে এই নিয়ম 'তাদ্ধিত' নিয়ম নামে প্রসিদ্ধ। কাজেই বেদের যেখানে যেখানে যজ্ঞবাসরে গো শব্দটির প্রয়োগ দেখা যাবে, সেখানে সেখানে এই তাদ্ধিত নিয়মানুসারে দুধ অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

এইবার আপনি যে বেদমন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন (ঋগ্বেদ ১০/৮৫/১৩) এবং যেটির অর্থ নিয়ে Macdonel, Keith, Max Muller সাহেব থেকে আরম্ভ করে শ্রীযুক্ত বি,এল আপ্তে এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত মহোদয় ব্যক্তিরা বিভ্রাট ঘটিয়েছেন, সেই মন্ত্রটি এবার একটু আস্বাদন করা যাক্।

ঐ মন্ত্রের দেবতা সূর্য। ঐ সম্পূর্ণ সূক্তটিতে সূর্য, পৃথিবী প্রভৃতি লোকের আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দিব্যগুণের বর্ণনাই মুখ্য বিষয়। সেই সঙ্গে অলঙ্কার রূপে মানব সমাজের বিবাহাদি প্রথা সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষণীয় উপদেশ আছে। ঐ মন্ত্রে হন্ ধাতু (হন্যতে) দেখেই বেদবিরোধীরা হত্যা অর্থ বুঝে বসে আছেন। কিন্তু বেদে 'হন্' ধাতুর অর্থ কেবল হিংসা বুঝায় না, হন্ ধাতুর অর্থ গতি (নিঘন্টু ২/১৪), জ্ঞান, গমন, চালনা করা, তাড়না করা, প্রেরণা দান প্রভৃতিও বুঝায়। 'অঘাসু হন্যতে গাবঃ' কথাটির লৌকিক সরল অর্থ হল, বৈদিক যুগে গরুই ছিল আর্যদের প্রধান সম্পদ, বিবাহাদিতে যৌতুকস্বরূপ গরুই দান করা হত। মঘা নক্ষত্রে সূর্যের কিরণ মন্দীভূত হয়, কাজেই কন্যার পিতৃপ্রদত্ত গবাদি পশু ঐ সময়েই বরের গৃহে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত (Whipped along) আর 'অর্জুন্যো পর্য্যুহ্যতে' অর্থাৎ ফাল্গুনী নক্ষত্রে কন্যা স্বামী গৃহে যাত্রা করতেন। প্রমাণস্বরূপ অথর্ববেদের ১৪ কাণ্ডের প্রথম সূক্তের ১৩ নং মন্ত্রটি দেখবেন, সেখানে ঠিক একই রকমের একটি মন্ত্র আছে। সেখানে কেবল 'অঘাসু' স্থলে আছে 'মঘাসু'। 'অর্জুন্যো' স্থলে আছে 'ফাল্গুনীষু' আর 'পর্য্যুহ্যতে' স্থলে আছে 'ব্যুহ্যতে'।

প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত শ্রী ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদীজী ঐ মন্ত্রের ভাষ্য করেছেন — '(সূর্যায়াঃ) প্রেরিকায়া। সূর্যদীপ্তিবৎ তেজোবত্যঃ কন্যায়াঃ বহুতঃ এধি বহ্যশ্চতুঃ উ ১/৭৭ বহ প্রাপনো চতুঃ। বিবাহকালে কন্যায়ৈ দেয় পদার্থঃ বিবাহঃ। বহন কারণম্। (প্র আগাৎ) প্রকর্ষেণ গচ্ছতু (সবিতা) জনকঃ পিতা (যম্) পদার্থম্ (অবাসৃজৎ) দত্তবান্ (মঘাসু) মহ পূজায়াম অচ্ অর্শ আবচ। মঘ ধনানাম (নিঘন্টু ২/১০)। সৎকারবতীষু ক্রিয়াসু ধনবতীষু (হন্যন্তে) গম্যন্তে। প্রাপ্যন্তে (গাবঃ) বাচঃ (ফাল্গুনীষু) ফলে গুর্ক্ চ উ ১/৫৬ ফল (নিষ্পত্তৌ) উণনা গুর্ক্ চ নীপ সফল ক্রিয়াসু (ব্যুহ্যতে) বিবিধনীয়তে।' এর অত্যন্ত সরল ভাবার্থ হল — বিবাহকালে সুন্দরী কন্যাকে স্ত্রীধন হিসাবে নানা বস্ত্রালঙ্কার এবং গোধনাদি সম্পদ পিতা সাধ্যমত দান করবেন এবং আত্মীয়স্বজনাদি সমবেত সকলেই স্বস্তিবাচনের দ্বারা ঐ শুভকর্মকে সফল করে তুলবেন।

আশাকরি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, ঐ মন্ত্রটিতে গোহত্যার কোন কথা নাই। ঠিক এমনইভাবে 'গোঘ্নঃ' শব্দটিতেও গোহত্যা কল্পনা করা যায় না। অঘ্ন শব্দের অর্থই ন হন্তব্যা — যা নিধনের যোগ্য নয়। গোমাতা অর্হনীয়া অর্থাৎ পূজার যোগ্য। একথা সত্য বটে যে, ঋগ্বেদ (১০/৮৭/১৬), যজুর্বেদ (৮/৮৩) এবং অথর্ববেদের (৯/৪/১৭) নানা মন্ত্রে গরুর নাম 'অঘ্ন্য' বা 'অঘ্ন্যা' বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ 'অঘ্ন্যা' শব্দের অর্থ কি?

ভগবান যাস্ক মুনি 'অঘ্ন্যা' শব্দের অর্থ করেছেন — 'অঘ্ন্যা অহন্তব্যা' (নিরুক্ত ১১/৪৪)। কাজেই গো শব্দটির সঙ্গে 'অঘ্ন্য' যুক্ত আছে বলেই বরং গোহত্যার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করা উচিত্ নয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে স্বয়ং বেদব্যাস কেমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন দেখুন — অঘ্ন্যা ইতি গবাং নাম ক এতান্ হন্তুমর্হতি?

আসল কথা হল — গোঘ্নোহতিথিঃ — এখানে 'গোঘ্নঃ' শব্দটি অতিথিপূজার অর্থবাদ মাত্র। অতিথির প্রতিশব্দ হিসাবে গোঘ্নঃ এই বিচিত্র শব্দটি প্রয়োগ করার মূলে বৈদিক ঋষির আশয় এই যে অতিথির জন্য গোধন হেন সম্পত্তিও ত্যাগ করা যায়, তাঁকে দান করা যায়। কারণ এই যে অতিথি নারায়ণ, তাঁর পরিচর্যার জন্য যদি গোমাতাকে ত্যাগ ও তাড়না করতে হয় তাও করা উচিত। মহর্ষি পাণিনির, দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে (৩/৪/৭৩) এই মন্ত্রটি মনন করলে আমার ব্যাখ্যা যে সত্য তা প্রমাণিত হবে। পাণিনির ঐ সূত্রের কাশিকা ও ন্যাস টীকায় বলা হয়েছে যে, অতিথির চেয়ে গরুকে এইভাবে হেয়ত্ব গরুর অপমান। অপমান মৃত্যুতুল্য।

কাজেই অতিথি গোঘ্নঃ। সত্য সত্য অতিথির জন্য গৃহস্থ গোহত্যার মত মহাপাপে লিপ্ত হবেন না। তা যদি হতেন, তাহলে নিমিত্ত কারণ হিসাবে অতিথিকে চণ্ডাল বলা হত — 'নিপাতন সামর্থ্যাদেব গোঘ্ন ঋত্বিগাদিরুচ্যতে, ন তু চণ্ডালাদিঃ। অসত্যপি গোহননে তস্য যোগ্যতয়া গোঘ্ন ইত্যভিধীয়তে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের শ্রম, অধ্যবসায় এবং জ্ঞানপিপাসা প্রশংসনীয় হলেও, ভারতীয় মানসিকতা তাঁরা পাবেন কি করে? কাজেই তাঁদের বৈদিক শব্দের অর্থবোধ যথাযথ না হওয়াই অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বড় দুঃখ হয় যে, নিজেদের পিতৃপুরুষদের আচরিত ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবলীলাক্রমে কিছু লিখতে কিংবা বলতে গিয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের একবারও বুক কাঁপলো না। তাঁরা যে কিভাবে গোঘ্নঃ শব্দ হতে বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণের সিদ্ধান্তে আসেন তা আমার বুদ্ধির অগম্য। অত কথা কি, তাঁরা যদি বৈদিক শব্দকোষ মূল নিঘন্টুটাই একটু ভাল করে পর্যালোচনা করেন, তাহলেই তাঁদের এ বিষয়ে ভ্রম হতে পারে না। নিঘন্টুতে (২/১৪) গত্যর্থক ধাতুমালাতে হন্ ধাতুর উল্লেখ আছে — হনতি, হন্তি, হন্তাৎ।

কিন্তু ঐ নিঘন্টুর (২/১৯) বধার্থক ধাতুমালাতে 'হন' ধাতুর প্রয়োগ সর্বথা নাই। সুতরাং বেদে গোঘ্ন শব্দের অর্থ বধ অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কাজেই পূর্বাপর সংগতি বজায় রেখে বুঝতে চাইলে বলতে হয় — গোঘ্ন শব্দের অর্থ, গাং হন্তি — গচ্ছতি অস্মৈ ইতি — গোঘ্নোহতিথিঃ। অস্মৈ অতিথ্যর্থে দুগ্ধাদি প্রাপণাথং গোপার্শ্বং গচ্ছতি। এইভাবে এই অর্থে অতিথিকে গোঘ্ন আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

আর একটি কথাও প্রণিধান যোগ্য। হিংসা শব্দের অর্থ তাড়না করাও বুঝায় তা আমি পূর্বে দেখিয়েছি। শ্রী দুর্গাচার্য লিখেছেন — নিহন্তি অভিগচ্ছন্তি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ।।'

যে সব ভারতীয় পণ্ডিতদের লেখা পড়ে আপনার নৈষ্ঠিক মন বিষাদে ভরে গেছে সেই সব পণ্ডিতদের গুরুঠাকুর হলেন Macdonel, Keith, Max Muller প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত। আবার এই সব পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মাথার মণি হলেন সায়ণাচার্য। এখন এই সায়ণাচার্যই 'মঘাসু হন্যতে গাবঃ, অর্জুন্যো পর্য্যুহ্যতে' —এই মন্ত্রটির কি অর্থ করেছেন দেখুন। তিনি লিখেছেন — 'মঘাসু গাবঃ সবিত্রা দত্তাঃ সোমগৃহং প্রতি হন্যন্তে দণ্ডৈস্তাড্যন্তে প্রেরণার্থম্ ইতি — অর্থাৎ বিবাহের দিন কন্যার পিতা বরকে যে গরুবাছুর দান করেন, সেগুলি বরের বাড়ী তাড়না করেই নিয়ে যেতে হত। অনেক সময় স্বধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ দক্ষিণা হিসাবে অতিথিকে গরু দান করতেন। কাজেই — গাং হন্তি তাড়য়তি অস্মৈ প্রদানাদ্যর্থম্ — এই অর্থে এবং 'দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে' পাণিনির এই সূত্রানুসারে — সম্প্রদান অর্থে 'গোঘ্ন' শব্দ সিদ্ধ হয়।

এখন আপনারাই বিচার করে বলুন, আপনারা কার কথা মানবেন? ক্যান্টাব বা কেমব্রিজের ডক্টরেট ডিগ্রীধারীর কথা, না — মহর্ষি পাণিনি ও যাস্কাচার্যের কথা? বেদের অর্থ যথাযথভাবে কে বেশী বুঝবেন বলে মনে হয়? ঋষি দেবরাজ যজ্বা ও শ্রীদুর্গাচার্যের মত বেদজ্ঞ প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত, না — প্যারিস বা মরিসের

ডক্টরেট উপাধিধারী? ইংরাজীর মাধ্যমে বেদজ্ঞান আহরণ না করে কেউ যদি মূল বেদ পড়েন, তাহলে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি তাঁর চোখে না পড়ার কথা নয়। এখানে গরুকে গোমাতা বলে স্তুতি করা হয়েছে।

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যনামমৃ তস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়, মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট। (ঋ ৮/১০১/১৫)

এর অর্থ হল — গরু হল বসু, রুদ্র আদিত্যদের কন্যা, মা ও ভগিনীর সমান। গরু দুধ রূপ অমৃত দান করে। সকলে জেনে রাখ, গরু — যার অদিতি, তাকে বধ করো না। মা বধিষ্ট।

ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্রটি ছাড়াও যজুর্বেদের (৮/৪৩) মন্ত্রে গরুর প্রতিশব্দগুলির অর্থ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। সেখানে ঋষি গরুকে কি বলে সম্বোধন করেছেন দেখুন —

ইড়ে রন্তে হব্যে কাম্যে চণ্ডে জ্যোতি২দিতে সরস্বতি মনি বিশ্রুতি।
এতা তে অঘ্নে নামানি দেবেভ্যো মা সুকৃতং ব্রূতাৎ॥

ইড়া — অন্নদাত্রী, উৎসাহদাত্রী; রন্তা — আনন্দদায়িনী; হব্যা — আদরণীয়া, পূজানীয়া; কাম্যা — রমণীয়া; চন্দ্রা — সুদর্শনা; জ্যোতি —দীপ্তিময়ী পুষ্টিদায়িনী; অদিতি — অখণ্ডনীয়া, সরস্বতী — সুরসদায়িনী; অঘ্ন্যা — অবধ্যা ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি শব্দের গভীর অর্থ আছে। তা বাদ দিলেও ঋষিরা যেভাবে এক একটি সুনির্বাচিত শব্দে গরুর মহিমা কীর্ত্তন করেছেন, তাতে একমাত্র অভিসন্ধিপরায়ণ নিন্দুক ছাড়া ঋষিরা গোখাদক ছিলেন একথা বলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়

এরই পাশাপাশি, গরুকে যারা হিংসা করবে তাদের প্রতি বেদের শাসনবাক্য শুনুন —

(১) অন্তকায় গোঘাতম্। (যজু ৩০/১৮) — 'গোঘাতকের প্রাণদণ্ডই বিধান'

(২) আরে তে গোদনমুত পুরষঘ্নম্॥ (ঋ ১/১১৪/১০) — 'গোহত্যাকারী ও নরহত্যাকারী দূর হও'

আশাকরি আপনি এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে, গোমাংস ভক্ষণের রীতি কখনই হিন্দু সমাজে ছিল না। যাঁরা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ তাঁরা ভারতবিশ্রুত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের Hindu Civilisation নামক গ্রন্থটি পড়লে দেখবেন সেখানে তিনি বৈদিক অর্থ যথাযথভাবে বুঝে লিখেছেন — The cow was already deemed aghnya – not to be killed.

এতসব স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন যে, পূর্বকালে ঋষিরা গোমাংস খেতেন তাহলে রূঢ় শোনালেও বাধ্য হয়েই বলতে হয় যে, 'পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের উচ্ছিষ্ট ভোজী' ঐ সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা অবজ্ঞা করাই উচিত।

আমাদের পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষগণ অর্থাৎ পবিত্রাত্মা ঋষিগণ কখনই ঐরকম অভক্ষ্য ভক্ষণ করতেন না, এইটাই প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত।

আমার কথা শেষ হতেই পুরোহিতজী ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায় আপন কুঠিয়াতে ফিরে গেলেন।

আমি মা নর্মদা এবং ঋষি মেধাতিথি দৃষ্ট মন্ত্রমালা অনুধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল হল। আমরা গাঁঠরী বেঁধে পুরোহিতজীকে আলিঙ্গন করে তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিলাম। পাহাড়ের উপর দিয়ে পত্রান্তরাল হতে প্রভাত-সূর্যের উদয় রশ্মি ধীরে ধীরে অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে পথের উপর। মনের মধ্যে দক্ষিণতটে মা নর্মদার অমৃতময়ী আনন্দ বিজড়িত স্মৃতিকে মনের মণিকোঠায় চিরভাস্বর রেখে আরও সম্পদ আহরণের জন্য সাগ্রহে এগিয়ে চললাম। রেবা মন্ত্র জপ করতে করতে উঠে এলাম পাহাড়ী পথের উপর। উদয়-সূর্যের বন্দনা গান গাইতে গাইতে আমরা হাঁটতে লাগলাম। নীল মেঘের মধ্যে দূরের পর্বতশ্রেণী অপূর্ব দৃশ্য রচনা করেছে। পথ চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছি, দু-পাশে শাল ও সাজা গাছের বন, মধ্যে মধ্যে আমলকী, ভেলা লেবু প্রভৃতি নানা জাতীয় গাছ। গাছগুলি সব ছবির মত সাজানো। মাঝে মাঝে নানারকমের বনফুল ফুটে আছে। একটি চিতল হরিণকে দৌড়ে যেতে দেখা গেল।

প্রায় ছয় মাইল এইভাবে চড়াই উৎরাই করে এসে পৌঁছলাম বাবরী গ্রামে। দূরে দূরে কিছু ঘরবাড়ী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছি। দু'দশ জন বাসিন্দারও চলাফেরা চোখে পড়ল। চলার পথেই একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে ইন্দনা সংগমের পথ জিজ্ঞাসা করতেই সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন — সিধা, বীচ্ বীচ্‌মে ছোটা ছোটা ঝাড়ি পথ।

আমরা দ্রুততালে ঝোপঝাড় এড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম। মাইল পাঁচেক এইভাবে কঙ্কর ও প্রস্তরময় পথে হাঁটার পর একটা জঙ্গল পেলাম। রাস্তার দুপাশে বড় বড় শাল, সাজা, সালাই ও শিশু গাছের ভীড়। সাবধানে পথের দু দিক লক্ষ্য করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। নর্মদার তীরে তীরে ঘন অরণ্য জঙ্গলের ভিতরে আরো মাইলটাক হেঁটে যাবার পর দেখি পথ ক্রমশঃ উর্ধে উঠছে। এই সংকীর্ণ পথে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। নিচেই খরস্রোতা নর্মদা গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছেন।

জঙ্গল ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে। সংকীর্ণ পাকদণ্ডী দিয়ে অতি সন্তর্পণে হাঁটতে হচ্ছে।

প্রায় সাড়ে সাত মাইল পথ হেঁটে ইন্দনা সংগমে পৌঁছে গেলাম। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট নিচে ইন্দনা নদীর স্ফটিকজল গর্জন করতে করতে নর্মদায় আছড়ে পড়ছে। নর্মদার গতিবেগ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। দুই নদীর মিলনস্থলে জল অত্যন্ত ফেনিয়ে উঠেছে। বড় বড় নুড়ি পাথর স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে।

অনুমান করলাম বেলা তখন একটা দেড়টা হবে। মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ বড় বড় গাছ ভেদ করে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে না, গাছ ও পাতার ফাঁকে কেবল ঝিকমিক্ করছে, যেন লুকোচুরি খেলছে। পথ এবারে আরো ঢালু, আরও দুর্গম। উবু হয়ে বসে, পাথরকে ধরে ধরে নামছি। স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। লতাপাতা থেকে যেন জল ঝরছে। জলের বাষ্পে সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। জল এত উঁচু হতে নিচে আছড়ে পড়ছে যে কাছে যাবার উপায় নেই। লাঠি ঠুকে ঠুকে আর একুটি এগোতেই দেখলাম এক শিব মন্দির। সূর্যকরোজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটায় চারিদিক ঝলমল করছে। মন্দিরের কোন দরজা নাই। মন্দিরের ভিতর উঠে গেলাম। মন্দিরের জীর্ণ পাথর কোথাও কোথাও ভেঙ্গে পড়েছে। এই দুর্গম জঙ্গলে এই মন্দিরকে তখন আমাদের নিরাপদ স্থান বলে মনে হল। এই আশ্রয়স্থল ছাড়তে আমাদের মন চাইল না।

মন্দিরে এক চতুর্মুখ মহাদেব বিরাজমান। শিবলিঙ্গের কেউ কোনদিন পূজো করেছে বলে মনে হল না। আমি এই ধরণের শিবলিঙ্গ দেখে বিস্ময়ে হতবাক, বললাম — সমগ্র উত্তরতট পরিক্রমাকালে বা দক্ষিণতটেও আমি এ ধরণের শিবলিঙ্গ দেখিনি। একমাত্র গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড় এবং মঙ্গলাগৌরী মন্দিরের মধ্যস্থলে আছেন পঞ্চমুখী স্বয়ম্ভুলিঙ্গ 'প্রপিতেশ্বর মহাদেব'। এই চতুর্মুখ মহাদেব এবং পঞ্চমুখী 'প্রপিতেশ্বর মহাদেব' এমনই জীবন্ত এবং অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ যে মনে হবে তিনি অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

দেখতে দেখতে সমগ্র বনভূমি অতলান্ত অন্ধকারে ঢেকে গেল। হরানন্দজী বললেন — এই মন্দিরে কোন নিরাপত্তা না থাকলেও, বাঘ, চিতা, নেকড়ে সাপ এর যাতায়াতের স্থান এখানে অবারিত হলেও এই শিবলিঙ্গই আমাদের রক্ষক, অতন্দ্র প্রহরী। মা নর্মদা সর্বদা আমাদের রক্ষা করবেন। হর নর্মদে হর।

হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে সহসা কাক জ্যোৎস্নার মত একটা আলোর আভাস জেগেছে। আমরা যে যার কমণ্ডলু থেকে জল খেয়ে গাঁঠরী খুলে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি আসে? ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে। কোন সাড়াশব্দ নাই। মাঝে মাঝে বহু দূর থেকে রাত জাগা পাখীর ডাক ভেসে আসছে। বিশ্বভুবন নিস্তব্ধ।

'রেবা রেবা' জপ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। সূর্যোদয় হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। রাত্রির অবসানে প্রকৃতির স্বচ্ছতা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

নর্মদা দর্শনের জন্য তৎপর হয়ে উঠলাম। গাঁঠরী পড়ে রইল। কেবল কমণ্ডলু ও দণ্ডটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বড় বড় পাথরের চাঙড় ও বিরাট শাল, শালাই ও হরিতকী গাছের মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচশ গজ এগিয়ে যাবার পরই চোখে পড়ল নর্মদার স্বচ্ছ জলের ধারা। পশ্চিমগামিনী নর্মদার বিস্তার এখানে প্রায় এক মাইল। এদিকে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সূর্যের আলো ঢুকছে না। কিন্তু উত্তরতট সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে।

নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলাম। ঘুরে দেখি, সঙ্গীরাও এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নর্মদাকে প্রণাম করছেন। পেট পুরে স্বচ্ছ জল খেলাম। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে, সূর্যার্ঘ্য ও তর্পণ সেরে ফিরে এলাম চতুর্মুখ মহাদেবের মন্দিরে। মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় জল ঢেলে গোটা কতক বনফুল শিবের মাথায় দিয়ে উচ্চারণ করতে লাগলাম মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের সিদ্ধমন্ত্র —

ওঁ শুভঙ্করায় নর্মদা-শংকরায় তে নমঃ শিবায়। ১
ওঁ কর্মপাশ-নাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়। ২

ওঁ শর্মদে নর্ম-ভস্মকণ্ঠ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়। ৩

ওঁ সংসার-ঘোর দুঃখহারিণে তে নমঃ শিবায়। ৪

ওঁ অন্তশ্চিন্মাত্রৈক লিঙ্গরূপদেহম্ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়। ৫

পূজা শেষে চতুর্মুখ শিবঙ্গিকে প্রণাম জানিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ইতিমধ্যে প্রেমানন্দ সকলের জন্য কন্দমূল কেটে ভাগ করে রেখেছেন। আমরা দু'দিন ধরে অভুক্ত। তাই আমরা এক টুকরো করে কন্দমূল চিবিয়ে পেটপুরে জল খেলাম।

কন্দমূল খেতে খেতে হরানন্দজী বললেন — কাল এই স্থান ভীতিপ্রদ বলে মনে হলেও দিনের বেলায় এই স্থানটিকে তপোভূমি বলে মনে হচ্ছে। আজ এই স্থান ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মহানন্দস্বামী বলে উঠলেন — আমার ও প্রেমানন্দেরও তাই ইচ্ছা। কিন্তু আপনার ভয়ে বলতে পারিনি। যদি আপনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠেন। এখানে এক দিন বাস করলে আমাদের গায়ের ব্যথাও কমবে। হরানন্দজী হাসতে হাসতে বললেন — তাই ভালো। আজকের দিনটা এখানেই কাটাবো। এলোমেলো ভাবে সবাই চুপচাপ বসে রইলাম। কারো মুখে কোন কথা নেই। হরানন্দজী জপে মনোনিবেশ করলেন। আমি কিছুক্ষণ বসে সপ্তাক্ষর শিবমন্ত্রের সঙ্গে নর্মদা মায়ের সপ্তাক্ষরী বীজমন্ত্র জপ করলাম।

সকলের যখন জপ শেষ হল তখন দেখি মার্তণ্ডদেব মধ্যগগনে। ত্রিদিবানন্দ অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন — মহাদেব কেন বিষপান করেও মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন বলতে পারেন?

আমি — উত্তরতট পরিক্রমাকালে বর্ষাকালে ধাবড়ী কুণ্ডে যোগিরাজ একলিঙ্গস্বামীর কাছে আড়াই মাস অতিবাহিত করি। আমার সঙ্গী ছিলেন রসরাজ (একলিঙ্গস্বামী তাঁকে এই নামেই ডাকতেন) সম্বিদানন্দজী। তাঁর নিত্য সাহচর্যে সূক্ষ্ম যোগতত্ত্ব, নানা শাস্ত্রের নির্যাস এবং কাব্যের রস প্রাণভরে পান করেছি। তাঁর কাছে আমি অনেক শিখেছি, অনেক জেনেছি। এ সময় যদি শিবতত্ত্ববেত্তা যোগী সম্বিদানন্দজী এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে তিনি পরিহাসছলে হাসতে হাসতে বলতেন —

পার্বতীমোষধীমেকামপর্ণাং রোগনাশিনীম্।
লব্ধা বিষমপি পীত্বা শূলী মৃত্যুঞ্জয় স্থিতঃ।।

একে শূলী, তায় জ্বলে গলায় গরল
যন্ত্রণায় তাই শিব হইয়া বিহ্বল,
অপর্ণা পার্বতী মহারোগ-বিনাশিনী
একমাত্র ওষধিরে সার মনে গণি,
মহানন্দে লইলেন তাঁহারি আশ্রয়
সে অবধি হয়েছেন ভবে মৃত্যুঞ্জয়।

একবার আমি তাঁকে প্রশ্ন করি মহাদেব বিষপানকালে প্রাণের আশঙ্কা করেন নি কেন এই তত্ত্ব শুনতে চাই। স্বভাবকবি একটি মধুর শ্লোকে শিবের বিষপান তত্ত্বকে রসস্নিগ্ধ করে বললেন —

হরতা মম সুরতটিনী ব্যতিকার মরণেহপি তুল্যৈব।
গঙ্গাধর ইতি গরলং করতল তরলং নিজগ্রাস।।

এখন স্বয়ং শিব আছে এই ভবে
বিষপানে মৃত্যু হলে শিবত্বই রবে
পবিত্র জাহ্নবী-জল স্পর্শ যদি করে
শবের শিবত্ব হয়, জানি এ সংসারে।
যে শিবত্ব সে শিবত্ব থাকিতে আমার,
বিষপানে তবে মোর ভয় কিবা আর?
গঙ্গাধর মনে মনে ইহাই বিচারি
বিষপান করিলেন আশঙ্কা না করি!

তাঁর রসালো চুটকি আমাকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলল। আমি সেই মহাযোগীকে রাগস্বরে বললাম — বলুন তো শিবের মাথায় চন্দ্র কেন?

আমার বাচালতায় বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন —

গঙ্গাজল নয়নাজল-মিলনাদেকত্র নৈব কল্যাণম্।
তৎ কিং ধূর্জটি মুর্দ্ধানি মধ্যস্থা বৈধবী লেখা॥
ঢলঢল করিতেছে শিরে গঙ্গাজল
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে নয়নে অনল।
জল অনলের শত্রু, পাছে তথা গিয়া।
নির্ঝাণ করিয়া দেয়, ইহাই ভাবিয়া,
চন্দ্রকলা গিয়া সেই শঙ্করের শিরে,
মধ্যস্থ হইয়া আছে চিরদিন ধরে!

তারপর তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললেন — ঔর কুছ্? আমি তাঁর মুখে এইরকম অদ্ভুত জবাব ও বিচিত্র রসবোধকে পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ করতে করতে বললাম — এখন বলুন ত, অন্নপূর্ণা **যাঁর** গৃহিনী সেই মহাদেব কেন ভিক্ষা পাত্র হাতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন?

এক মিনিট রুখ যাইয়ে। গুরুজীকো ইয়াদ করনে দিজিয়ে। এই বলে তিনি চোখ বন্ধ করে সমকায়শিরোগ্রীব হয়ে বসে দুলতে লাগলেন। আমিও হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবছি — আমার একের পর এক এইরকম প্রশ্নে সম্বিদানন্দজীকে অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলা উচিত হয়নি। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব কিনা ভাবছি। দেখি সম্বিদানন্দজী আমার দিকে তাকিয়ে মিট্ মিট্ করে হাসছেন।

— আভি শুনিয়ে এই বলে তিনি শুরু করলেন —

সিমন্তিনী যস্য গৃহেহন্নপূর্ণা ত্রিলোকরক্ষাকরণেহন্নদানৈঃ
সংভিক্ষতে সোহনি কপালপানি ললাটরেখা ন পুনঃ প্রয়াতি।
অন্নদানে ত্রিসংসার রাখিবার তরে
ভগবতী অন্নপূর্ণা নিত্য যাঁর ঘরে,
লইয়া মড়ার মাথা তবু সেই হর
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হইয়া কাতর!
ললাটের বিধিলিপি যেবা করে লয়?

সম্বিদানন্দজীর মুখে এইরকম জবাব শুনে আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে বললাম — হে বিদ্বান্ তপস্বিন! আপনার বিচিত্র রসবোধকে নমস্কার। হে স্বভাব কবি, মুখে মুখে শ্লোক রচনার আপনার যে অলৌকিক প্রতিভা, সেই প্রতিভাকেও প্রণাম জানাচ্ছি।

আমার কথা শেষ হল। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই চুপচাপ বসে। দেখছি, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বললাম — আরও একটা ঘটনার কথা না জানিয়ে পারছি না। একদিন একলিঙ্গস্বামীর প্রবচন শেষ হয়েছে। আমরা চুপ করে বসে আছি। হঠাৎ একলিঙ্গস্বামীর এক শিষ্য বিদ্যানন্দ একলিঙ্গস্বামীর কাছে বললেন — ভগবন্ সম্বিদানন্দজী আমাকে খুব স্নেহ করেন। সবসময় হাসি খুশী, সদা আনন্দময়। রসালাপে সিদ্ধ। ওঁকে অন্তরঙ্গভাবে কোন প্রশ্ন করলে উনি বরাবরই হাসি ও টিপ্পনী কেটে উত্তর দেন। ওঁর রসিক স্বভাবের সঙ্গে আমি বহুদিন হতেই পরিচিত তাই আপনার সামনে ওনার মুখ থেকে শুনতে চাই — মহাদেব কেন কালীর চরণ বক্ষে ধারণ করেছেন?

বিদ্যানন্দের কথায় একলিঙ্গস্বামী হাসতে হাসতে বললেন — সম্বিদানন্দ! বাতাইয়ে বাতাইয়ে। বিদ্যানন্দকা শঙ্কা দূর কিজিয়ে! তোমার উত্তর শুনে আমি তৃপ্ত মনে উঠে যাবো।

সম্বিদানন্দ — গুরুজী! আপনার মত দৈবী প্রতিভা আমার নেই। তবু বলছি শুনুন।

দেবৈর্মন্থিত দুগ্ধ সাগরতলাদুত্থাপিতং ভীষণং
পীত্বা ভূরি বিষং পুনঃ পশুপতিসৎ জ্বালয়া বিহ্বলঃ।
বিন্যস্বোরসি কালিকাপদযুগং কৈবল্যদং শীতলং।
সংপ্রাপ্যাতুলনির্বৃতিঞ্চ বহুলামদ্যাপি তন্নোজ্‌ঝতি॥

দেবগণ করে যবে সমুদ্র মন্থন,
পরম প্রচণ্ড বিষ উঠিল তখন।
চুক্ চুক্ করি সেই বিষপান করি,
ছট্‌ফট্ করে হর বহুকাল ধরি।
অবশেষে বুঝে কালী-চরণ-কমল
একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল;
আনন্দে মাতিয়া তাই দেব দিগম্বর
কালীপদ-যুগ নিজ বক্ষের উপর
রাখিয়া পরম সুখে বিভোর হইয়া
দুর্জয় বিষের জ্বালা গিয়াছে ভুলিয়া।
ছাড়িলে বিষের জ্বালা পুনঃ বেড়ে যায়,
অদ্যাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায়।

সম্বিদানন্দজীর জবাব শুনে একলিঙ্গস্বামী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন এবং সম্বিদানন্দজীর পিঠ চাপড়িয়ে দিলেন।

এমন সময় ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি এল। তার সঙ্গে মেঘগর্জন ও মুহুর্মুহু বজ্র, বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। পাহাড়ের উপর হতে দুড়্‌দাড় শব্দে ছোট বড় পাথর গড়িয়ে পড়ছে শুনতে পেলাম। এক ঘেয়ে অবিরাম ধারার বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় সাতটা বেজে গেছে। সকলেরই বিছানা গুটানো, নর্মদার ঘাটে দেখছি সকলেই স্নান করছেন। আমিও তাড়াতাড়ি কম্বল গুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রাতঃকৃত্য, স্নান, তর্পণাদি সেরে মন্দিরের গর্ভগৃহে গিয়ে নানা রং এর বিচিত্র বনফুল অঞ্জলি ভরে নিয়ে চতুর্মুখ শিবকে স্নান করাতে করাতে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলাম —

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং হেন নানাস্তি কিঞ্চিৎ।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োহবতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্।।

অর্থাৎ হে প্রভো! একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য সনাতন ব্রহ্মাই বিদ্যমান। এই সংসারে নামরূপের কোন পারমার্থিক সত্বা নাই, এক রুদ্রই এ জগতে অদ্বিতীয় পরম পদার্থ, সেই অদ্বিতীয় মহেশ্বরমূর্ত্তি আপনি, অতএব আমি আপনার শরণাগত হলাম।

মন্ত্রপাঠের পরেই আমরা অঞ্জলি-ভরা ফুল মহাদেবের উপর অর্পণ করে প্রণাম করলাম। সকলেই একে একে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। সম্মুখস্থিত মা নর্মদাকে প্রণাম করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে আমরা চলতে থাকলাম পাহাড়ী পথে। পথ কঙ্করময়, উঁচু নীচু। প্রায় প্রত্যেকেই মাঝে মাঝে ঠোক্কর খেতে খেতে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় মাইলখানিক ডাহি প্রস্তরময় পথ হেঁটে যে পথ পেলাম, সেই পথের দুধারে শাল সেগুন ছাড়াও বট অশ্বত্থ অর্জুন কাঁঠাল এবং জামীর প্রভৃতি গাছ চোখে পড়তে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা কখনও এগিয়ে পিছিয়ে পড়ছি।

এই সময় গাছপালার আড়াল সরে যেতেই নর্মদার ধারা আমাদের চোখে পড়ল। সূর্যরশ্মি জলের উপর পড়ায় পশ্চিমগামিনী নর্মদাকে দেখে মনে হল মা যেন তাঁর সন্তানদের দেখতে পেয়ে হাসছেন। দূরে দূরে ঘরবাড়ী চোখে পড়তে লাগল। আমি একজন দীর্ঘ শিখাযুক্ত এক বয়স্ক ব্রাহ্মণকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন — মহল্লে কা নাম আম্বরী। তালপুর সে করীব ছয় মীল। পর্বতকে টিলে পর ভীম-কুণ্ড হ্যায়। বনবাসকে সময় পাণ্ডবোঁনে কুছ সময় তক ইধার নিবাস কিয়া থা। সোমবতী অমাবস্যা পর ইঁহা মেলা লগতা হ্যায়। কথা বলতে বলতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলতে লাগলেন — মহাভারতের বনপর্বে পড়েছি, নহুষ ছিলেন আয়ুর পুত্র, চন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। তিনি যাগ যজ্ঞ তপস্যা বেদপাঠ, ইন্দ্রিয় সংযম ও পরাক্রমে দিগ্বিজয়ী, বীর ছিলেন। তাঁর দাপটে ব্রাহ্মণরা তাঁর শিবিকা বহন করতেন। একবার অগস্ত্য মুনি যখন রাজা নহুশের শিবিকা বহন করছিলেন সেইসময়

রাজার পাদস্পর্শে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে মহর্ষি অভিশাপ দেন 'সর্প হয়ে পতিত হও'। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করবেন'। নহুষ তৎক্ষণাৎ হীনতেজা হয়ে সর্পরূপে আকাশ হতে এই স্থানে পতিত হন এবং এই পর্বতের উপর বসবাস করতে থাকেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে নর্মদার এই তীরে উপস্থিত হন। পাণ্ডুনন্দন ভীম মৃগয়া করতে করতে এখানে এই আম্বরী গ্রামে উপস্থিত হয়ে মৃগ, হস্তী, বরাহ, মহিষ সংহার করেন এবং পর্বতাকার এক ভীষণ অজগর সর্পের সম্মুখীন হন। সেই সর্পের গাত্রস্পর্শে ভীম বিমোহিত হয়ে সংজ্ঞা হারান। সংজ্ঞা ফিরে পেয়েও ভীম অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সর্পের কবল থেকে মুক্ত করতে পারলেন না। তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন — 'তুমি কে ? আমাকে তোমার পরিচয় প্রদান কর। আমাকে তোমার কিসের প্রয়োজন? আমি পাণ্ডু তনয় যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় ভ্রাতা ভীম।' সেই কথা শ্রবণ করা মাত্র অজগর ভীমকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন করতে করতে বললেন, 'হে মহাবাহো! আমি তোমার পূর্বপুরুষ রাজা নহুষ। মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে আমার এই অবস্থা। তুমি আমার অবধ্য কুটুম্ব হলেও আমি এখন ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার পীড়নে আমি তোমাকে গ্রাস করব। তবে মহর্ষি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই আমার শাপমুক্তি ঘটবে।

এদিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের অনুপস্থিতিতে চিন্তান্বিত হয়ে মৃগয়ার চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে এই পর্বতকন্দরে এসে দেখলেন যে মহাবীর ভীম এক ভীষণ সর্পদ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় ভূতলে পড়ে আছেন। তখন যুধিষ্ঠির অজগরের কাছে ভীমের প্রাণভিক্ষা করলে সর্পরূপী নহুষ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার ভাইকে ভক্ষ্যরূপে পেয়েছি, তাকে আমি পরিত্যাগ করতে পারব না। তবে তুমি যদি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পার তবে ভীমকে পরিত্যাগ করব।'

অতঃপর যুধিষ্ঠির সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরদানে স্বীকৃত হলেন।

সর্প জিজ্ঞাসা করলেন — বল, ব্রাহ্মণ কে? বেদ্যই (জ্ঞাতব্য) বা কি?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন —

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্মৃতঃ॥

হে সর্পরাজ! যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, আনৃশংস্য, তপঃ ঘৃণা লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ।

বেদ্যং সর্প! পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম॥

হে সর্প! যাঁকে জানলে সুখদুঃখ থাকে না, যাঁকে প্রাপ্ত হলে কোন শোক থাকে না সেই ব্রহ্মই বেদ্য। এর চেয়ে তোমাকে আর কি বলার আছে।

সর্প দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন — তুমি যে সকল গুণের কথা বললে সেইসব লক্ষণ অনেক শূদ্রে দেখা যায়, তবে কি শূদ্রও ব্রাহ্মণও হতে পারে? তুমি যাঁকে বেদ্য বললে, সেই সুখদুঃখবিহীন পরব্রহ্ম যে আছেন, তা ত বুঝতে পারি না।

যুধিষ্ঠির তার উত্তরে বললেন —

শূদ্রে চ তদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥
যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ।
তাভ্যাং হীনমিতি হ্যত্র পদং নাস্তীতি চেদপি॥
এবমেতন্মতং সর্প! তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে।
যথা শীতোষ্ণয়োর্মধ্যে ভবেন্নোষ্ণং ন শীততা॥
এবং বৈ সুখদুঃখাভ্যাং হীনমস্তি পদং ক্বচিৎ।
এষা মম মতিঃ সর্প! যথা বা ম্যনতে ভবান্॥

অনেক শূদ্রে যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তা ব্রাহ্মণে দেখা যায় না; সুতরাং শূদ্রজাত হলেই শূদ্র হয় না; ব্রাহ্মণজাত হলেই ব্রাহ্মণ হয় না।

হে সর্প! যে সব ব্যক্তির মধ্যে বৈদিক লক্ষণ (ব্রহ্মজ্ঞান) আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যে সব ব্যক্তিতে তা দৃষ্ট হয় না, তাঁরাই শূদ্র। তারপর আপনি আবার যে বললেন — সুখদুঃখবিহীন জ্ঞাতব্য বস্তু নাই। সে বিষয়ে আমি বলি যেহেতু সুখদুঃখবর্জিত কোন পদার্থ এই সংসারে নেই। সেহেতু দৃশ্যমান জগতে সেরূপ বস্তু যদি না থাকে, কিংবা জলে যেমন উষ্ণতা থাকে না এবং অগ্নিতে যেমন শৈত্য থাকে না। তথাপি প্রাণীর দেহে সুখদুঃখবিহীন অর্থাৎ নির্গুণ কোন বস্তু (জীবব্রহ্ম) আছে। একমাত্র পরমব্রহ্ম সুখদুঃখহীন।

এরপর সর্পের তৃতীয় প্রশ্ন — রাজ! তুমি যদি গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ স্বীকার কর, তবে যে পর্যন্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণ না হয়, সে পর্যন্ত তার ব্রাহ্মণ জাতি ব্যবহার অমূলক।

যুধিষ্ঠির বললেন —

জাতিরত্র মহাসর্প! মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণনাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ।

হে মহামতি সর্প! আমার ধারণা এ যে, সমস্ত বর্ণেরই সাঙ্কয্যবশতঃ মানুষ মাত্রেরই জাতি নির্ণয় করা দুষ্কর।

সর্বে সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমংনৃণাম।

সকল মনুষ্য সর্বদা সকল স্ত্রীলোকের গর্ভেই সন্তান উৎপাদন করে। বাক্য, মৈথুন, যম, মরণ সকল মানুষেরই সাধারণ ধর্ম।

যুধিষ্ঠির আরো বললেন — জন্ম হিসাবে সব জাতিই সমান। এদের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বদর্শী ও যাগশীল, তাঁরাই ব্রাহ্মণ। যতদিন পর্যন্ত বেদপাঠ না করে ততদিন সকলেই শূদ্রের সমান। কেবলমাত্র বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। স্বয়ম্ভুব মনুর মতে — যে পর্যন্ত উপনয়ন না হয়, সে পর্যন্ত বালক শূদ্রতুল্য থাকে। একমাত্র বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অন্যে নয়।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরদানে সন্তুষ্ট হয়ে সর্প বললেন, 'হে যুধিষ্ঠির! তুমি বিদ্বান্ বিচক্ষণ প্রাজ্ঞ। আমি তোমার ভাইকে মুক্তি দিলাম। তোমার ও তোমার ভ্রাতার মঙ্গল হোক। আমি এখন সুরলোকে যাত্রা করব'। এই বলে নহুষ সর্পদেহ ত্যাগ করে দিব্যশরীর গ্রহণ করে স্বর্গধামে ফিরে গেলেন।

— দেখুন, কথা বলতে বলতে আমরা কুলেরা ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম। এর প্রাচীন নাম কুন্তলপুর বা কুন্তীপুর। মহারাণী কুন্তী এইস্থানে কিছুকাল বাস করে গেছেন। আসুন। আপনাদের গ্রামের শিবমন্দির থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি এই শিবমন্দিরের পুরোহিত। মহাভারত পাঠ করার জন্য আমাকে দূর দূরান্তে যেতে হয়। কাল সেইরকম এক জায়গায় থেকে মহাভারত পাঠ করে আসার সময়ে পথে আপনাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আরো বললেন — আপনারা আমার অতিথি। আজ এখানে বিশ্রাম করুন। আমিই আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করব।

এই বলে পুরোহিতজী ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালে হরানন্দজী বললেন — আপনি যেভাবে রাজা নহুষ ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কথোপকথনের কাহিনী শুনালেন তা এককথায় জীবন্ত। মনে হচ্ছিল আমরা যেন সেই যুগে ফিরে গেছি। আপনার কাছ থেকে মহাভারতের আরও পাঠ শুনবার ইচ্ছা রইল।

পুরোহিতজী হাসতে হাসতে বলললেন — আপনাদের কেবল গল্পটি শুনিয়েছি এই গল্পের মর্মার্থ শুনানো হয় নি। জেনে রাখুন এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এক নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সত্যটি হল — জাতিগত পার্থক্য জন্মগত নয়। জন্মমাত্রেই মানুষ শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারমধ্যে যাঁরা বেদপাঠ, সত্য, দান, তপ, জপ, অহিংসা, ধর্মনিত্যতা অবলম্বন করেন তাঁরাই ব্রাহ্মণ। সুতরাং জন্মগত ব্রাহ্মণ হলেই ব্রাহ্মণ হয় না।

এই সত্যটুকু উচ্চ জাতি মাত্রেই ভুলে যান। আমাদের সমাজের দুর্গতি ও বিশৃঙ্খলতা এই মিথ্যা কৌলীন্যের উপর নির্ভর করে।

পুরোহিতজী আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন। আমরা তাঁর গমনপথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। মন্দিরের পশ্চিমদিকে প্রায় দু'শ গজ দূরে নর্মদার ধারেই তাঁর বাড়ী। আমরা ঝোলা গাঁঠরী ইত্যাদি মন্দিরের চাতালের উপর গুছিয়ে রাখলাম।

আমি মন্দিরের বাইরে কম্বল বিছিয়ে মহর্ষি তণ্ডিকৃত শিবস্তব পাঠ করতে লাগলাম। রৌদ্রালোকিত মুক্ত আকাশ-তলে এইরকম পরিচ্ছন্ন এইরকম ঝকঝকে ঘাটে নর্মদার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেই মন আপনা হতেই নিবিষ্ট হয়ে যায়। নিবিষ্ট চিত্তে মহাদেবের স্তব করতে লাগলাম। পাঠ শেষ হতেই দেখি পুরোহিতজী তাঁর দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যাহ্নের আহার নিয়ে আসছেন।

বেশ তৃপ্তি সহকারেই আমাদের ভোজন পর্ব সমাধা হল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখি সূর্যাস্তের আর বেশী দেরী নেই। অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি নর্মদার জলে পড়ে ঝিকমিক করছে। সেই মনোহারী দৃশ্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মন্দিরে ফিরে আসতেই দেখলাম পুরোহিতজী ও তাঁর দুই পুত্র আরতির আয়োজন করছেন। সন্ধ্যা হতেই পুরোহিতজী লিঙ্গটিকে রাজপোষাকে সাজিয়ে, মাথায় রৌপ্য মুকুট পরিয়ে আরতি আরম্ভ করলেন। শিঙা, ডম্বরু ও দামামা বাজতে লাগল। পুরোহিতজী প্রাণঢালা আরতি আমাদের মোহাবিষ্ট করে রাখল। আরতির শেষে পুরোহিতজী সকলের মাথায় নর্মদার জল ছিটিয়ে দিলেন। বাইরের আকাশে চাঁদের প্লাবন, জ্যোৎস্নায় নর্মদার জল, পাহাড় ও বনস্থলী যেন হাসছে।

হরানন্দজী পুরোহিতজীকে হাত ধরে আমাদের সামনে এনে বসালেন। বললেন — আপনার মুখ থেকে মহাভারত কথামৃত শোনার জন্য বসে আছি।

— বলুন, আপনারা মহাভারতের কোন উপাখ্যান শুনতে চান?

আমি — যক্ষরূপী ধর্মরাজ ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর পর্ব শুনতে চাই। কারণ এতে বর্ণিত সমুদয় নীতিবাক্য হল মনুষ্য জীবনের মূলমন্ত্র।

পুরোহিতজী বলতে আরম্ভ করলেন — বনবাসকালে দ্বৈতবনে পাণ্ডবগণ যখন বসবাস করছিলেন একদা একটি হরিণ শৃঙ্গদ্বারা এক তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণী ও মন্থ (অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠের নাম — অরণী এবং তা ঘর্ষণ করবার দণ্ডের নাম - মন্থ) শৃঙ্গাগ্রে স্থাপন করে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। সেই তপস্বী অরণী ও মন্থের খোঁজে এসে পাণ্ডবদের মুখোমুখি হন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করেন —

তস্য গত্বা পদং রাজন্! আসাদ্য চ মহামৃগম্। অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ॥

— হে পাণ্ডবগণ! শীঘ্র আমার অরণি মন্থ এনে দিন, অন্যথা আমার অগ্নিহোত্র বিনষ্ট হবে।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মৃগের অনুসরণ করলেন এবং কর্ণী, নালীক ও নারীচ নিক্ষেপ করেও তাকে বিদ্ধ করতে পারলেন না। মৃগ অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু পাণ্ডবগণ ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে সেই নিবিড় বন মধ্যেই শীতল ছায়া যুক্ত এক বটবৃক্ষের নীচে উপবেশন করলেন।

শীতলচ্ছায়ামাগম্য ন্যগ্রোধং গহনে বনে।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাঙ্গাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন॥

রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে বললেন —

আরুহ্য বৃক্ষং মাদ্রেয়! নিরীক্ষস্ব দিশো দশ।
পানীয়মন্তিকে পশ্য বৃক্ষাংশ্চাপ্যুদকাশ্রিতান্।
এতে হি ভ্রাতরঃ শ্রান্তাস্তব তাত! পিপাসিতাঃ।

হে মাদ্রেয়! আমরা পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত; নিকটস্থ কোন উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করে দেখ কোন নিকটবর্তী স্থানে উত্তম পানীয় জল পাওয়া যাবে কিনা।

নকুল সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করে একটি জলাশয় দেখতে পেয়ে বললেন —

পশ্যামি বহুলান্ রাজন্! বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্।
সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্।

রাজা! জলাশ্রিত বহুতর বৃক্ষ দেখতে পাচ্ছি এবং সারসপক্ষীর রবও শুনছি। সুতরাং ঐখানে নিশ্চয়ই জল আছে।

যুধিষ্ঠির নকুলকে তৃণদ্বারা সরোবরের জল আনার নির্দেশ দিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে নকুল সারস পক্ষী পরিপূর্ণ সেই সরোবরের নির্মল জল পান করতে গেলে, তখন অন্তরীক্ষ হতে এক যক্ষ তাঁকে বললেন —

মা তাত! সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু মাদ্রেয়! ততঃ পিব হরস্ব চ॥

বৎস! এই জল পূর্ব হতেই আমার অধিকারে আছে। হে মাদ্রেয়! প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জল পান কর বা হরণ কর।

নকুল অত্যন্ত পিপাসার্ত ছিলেন বলে যক্ষের কথায় কর্ণপাত না করে সেই সরোবরের জল পান করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করলেন। এদিকে নকুলের বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে নকুলের সন্ধানে পাঠালেন এবং সত্বর জল আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। সহদেব সরোবরের তীরে পৌঁছান মাত্রই অন্তরীক্ষবাসী যক্ষের নিষেধ না শুনে বা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপান করায় নকুলের মত প্রাণত্যাগ করলেন। এইভাবে একে একে ভীম ও অর্জুনও সরোবরের তীরে উপস্থিত হলেন এবং যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলেন।

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের বিলম্বের কারণ চিন্তা করে অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে সেই জন-শব্দ-শূণ্য মহাবনে প্রবেশ করলেন এবং স্বর্ণ পদ্ম পরিশোভিত সেই সরোবর দর্শন করলেন।

সেই সরোবরের জল পদ্মলতায় আবৃত এবং তীরদেশ সকল সিন্ধুবার, বেতস, কেতক, করবী ও পিপ্পল বৃক্ষে পরিপূর্ণ। পরিশ্রান্ত পিপাসার্ত যুধিষ্ঠির এরূপ সরোবর দেখে বিস্মিত হলেন।

উপেতং নলিনীজালৈঃ সিন্ধুবারৈঃ সবেতসৈঃ।
কেতকৈঃ করবীরৈশ্চ পিপ্পলৈশ্চৈব সংবৃতম্।
শ্রমার্তস্তদুপাগম্য সরো দৃষ্টাথ বিস্মিতঃ॥

এরপর যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিগোচর হল ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের নিথর নিষ্পন্দ মৃতদেহ। ধনুর্বানসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু কারো দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন বা অন্য কারো পদচিহ্ন না দেখে তিনি নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন এবং শোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে মৃত্যুর কারণ চিন্তা করতে লাগলেন।

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন হয় কোন দুষ্ট ভূত তাঁর ভ্রাতাদের প্রাণনাশ করেছে। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল দুর্যোধনের প্ররোচনায় গান্ধাররাজ নির্জনে এই সরোবর নির্মাণ করে বিষপ্রয়োগে এই সরোবরের জল দূষিত করেছেন। কারণ কালান্তক যম ভিন্ন কেউই তাঁর ভ্রাতাদের প্রাণনাশ করতে সমর্থ নয়।

এই বলে যুধিষ্ঠির সরোবরে নামার উপক্রম করতেই আকাশবানী শুনলেন —

অহং বকঃ শৈবলমৎস্যাভক্ষো নীতা ময়া প্রেতবশং তবানুজাঃ।
ত্বং পঞ্চমো ভবিতা রাজপুত্র! ন চেৎ প্রশ্নান্ পৃচ্ছতো ব্যাকরোষি॥

'হে রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক; আমিই তোমার ভ্রাতৃগণকে যমালয়ে প্রেরণ করেছি। যদি তুমিও আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও তবে তুমিও তোমার ভ্রাতাদের পথ অনুসরণ করবে।

মা তাত! সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয়! ততঃ পিব হরস্ব চ॥

বৎস কৌন্তেয়! পূর্ব হতেই এই সরোবর আমার অধিকারে আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে তোমাকে জলপান করতে বা জল তুলতে দেব না।

যুধিষ্ঠির বললেন —

রুদ্রাণাং বা বসূনাং বা মরুতাং বা প্রধানভাক্। পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো নৈতচ্ছ কু নিনা কৃতম্॥
হিমবান্ পারিপাত্রশ্চ বিন্ধ্যো মলয় এব চ। চত্বারঃ পর্বতা কেন পাতিতা ভূরিদেজসা॥
অতীব তে মহৎ কর্ম কৃতজ্ঞ বলিনং বর!! যান্ ন দেবা ন গন্ধর্বা অনসুরাশ্চ ন রাক্ষসাঃ।
বিষহেরন্ মহাযুদ্ধে কৃতং তে তন্মহাদ্ভুতদম্॥
ন তে জানামি যৎ কার্য্যং নাভিজানামি কাঙ্ক্ষিতম্। কৌতহলে মহজ্জাতিং সাধ্বসঞ্চাগতং মম॥
যেনাস্ম্যুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সমুৎপন্ন শিরোজ্বলঃ পৃচ্ছামি ভগবং স্তস্মাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি॥

হে মহাজন! আপনি কি রুদ্রগণ, বসুগণ বা মরুদ্দগণের মধ্যে কেউ? আপনিই কী আজ হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, মলয় পর্বতরূপ — এই চারটি পর্বত সকলকে পাতিত করেছেন? দেবগণ, অসুরগণ, রাক্ষসগণ যাদের ভয়ে ভীত সেইসব মহাবলীকে, আপনি সামান্য বকপক্ষী হয়ে বধ করেছেন তা আমার বিশ্বাস হয় না। দয়া করে বলুন আপনি কে? আর আমার ভ্রাতাদের হত্যার পিছনে আপনার অভিলাষই বা কী? শীঘ্র করে বলুন যাতে আমার চিত্তবেদনা ও ভয় দূর হয়।

তখন বকপক্ষী যক্ষ রূপ ধারণ করলেন। বললেন —

যক্ষোহহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ।
ময়ৈতে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ॥

তোমার মঙ্গল হোক। আমি যক্ষ। জলচর পক্ষী নই। আমিই তোমার এই সকল মহাবলী ভ্রাতাদের বধ করেছি।

যুধিষ্ঠির দেখলেন —

বিরূপাক্ষং মহাকায়ং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম। জ্বলনার্কপ্রতীকাশমধৃষ্যং পর্বতোপমম্।
বৃক্ষমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ ভরতর্ষভঃ। মেঘগম্ভীরনাদেন তর্জয়ন্তং মহাস্বনম্॥

বিকৃত নয়ন, মহাকায়, তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, প্রভাবান এবং পর্বতের ন্যায় অনাক্রমনীয় এক যক্ষ ঘনঘটার ন্যায় ভীষণ গর্জন করতে করতে একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন —

ইমে তে ভ্রাতরো রাজন্! বার্য্যমাণা ময়াসকৃৎ। বলাত্তোয়ং জিহীর্ষন্তস্ততো বৈ সূদিতা ময়া।
ন পেয়মুদকং রাজন্! প্রাণানিহ পীরপ্সতা। পার্থ! মা সাহসং কার্ষীর্ম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানানুক্ত্বা তু কৌন্তেয়! ততঃ পিব হরস্ব চ॥

হে পৃথানন্দন! আমি বারবার বারণ কার সত্ত্বেও আপনার চার ভাই বলপূর্বক জলপান করতে গিয়েছিল। যেহেতু এই সরোবরের অধিকার আমার সেহেতু আমার অনুমতি ভিন্ন কেউ এই জলপান করতে বা তুলতে পারবে না। একমাত্র যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে সেই সরোবরের জলপানের অধিকার পাবে। তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করতে যাও তবে তোমার অবস্থাও হবে তোমার অপর ভাইদের মত।

যুধিষ্ঠির বললেন —

ন চাহং কাময়ে যক্ষ! তব পূর্বপরিগ্রহম্। কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তো হি পুরুষাঃ সদা।
যদাত্মনা স্বমাত্মানং প্রশংসেৎ পুরুষর্ষভ। যথাপ্রজ্ঞন্তু তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাম্॥

হে যক্ষ! আমি আপনার অধিকৃত বস্তু বলপূর্বক গ্রহণ করতে অভিলাষী নই। আমি আমার নিজের বুদ্ধিমত আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। একে যেন আমার আত্মশ্লাঘা বলে ভাববেন না। সাধুরা বলেন — আত্মশ্লাঘা মহাপাপ।

যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং স্বিদাদিত্যমুন্নয়তি কে চ তস্যাভিতশ্চরাঃ।
কশ্চৈনমস্তং নয়তি কস্মিংশ্চ প্রতিতিষ্ঠতি॥

কে সূর্যকে উন্নত করেন? কারা সূর্যের সকলদিকে বিচরণ করে? কে সূর্যকে অস্তমিত করেন? সূর্য কোথায় অবস্থান করেন?

যুধিষ্ঠির বললেন —

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়াতি দেবাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ।
ধর্মশ্চাস্তং নয়ত্যেনং সত্যে চ প্রতিষ্ঠতি॥

ব্রাহ্মণরা সূর্যকে উন্নীত করেন। গ্রহরা সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণ করে। রাশিচক্রের ভ্রমণ সূর্যকে অস্তে প্রেরণ করে। সূর্য রাশিচক্রকে অবলম্বন করে আকাশে অবস্থান করেন।

— আমরা কঠোপনিষদেও (২।১।৯) এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই —

যতশ্চোদেতি সূর্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চনঃ॥

যা হতে সূর্য উদিত হন; এবং যাতে তিনি অস্তগমন করেন, তাঁতে সকল দেবতা প্রবিষ্ট আছেন; তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে। ইনিই সেই ব্রহ্ম।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কেন স্বিচ্ছোত্রিয়ো ভভতি কেন স্বিদ্বিন্দতে মহৎ।
কেন স্বিদ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্! কেন চ বুদ্ধিমান্।

ব্রাহ্মণ কোন্ গুণে শ্রোত্রিয় হন? মানুষ কিভাবে ব্রহ্মকে লাভ করেন? লোক একাকী থেকেও কোন্ গুণে সহায়শীল হয়? নির্বোধ মানুষও কোন উপায়ে বুদ্ধিমান হয়?

যুধিষ্ঠির বললেন —

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়া ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান বৃদ্ধসেবয়া॥

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞানে (বেদপাঠে) শ্রোত্রিয় হয়। মানুষ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করে। লোক একাকী হয়েও যজ্ঞ (ধৈর্য্য) দ্বারা সহায়শালী হয়। নির্বোধ মানুষও বৃদ্ধের উপদেশে বুদ্ধিমান হয়।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব।

ব্রাহ্মণগণের দেবত্বের কারণ কী? তাঁদের কোন ধর্ম সাধু ধর্ম? তাঁদের মনুষ্য ভাব কি? তাঁদের দুর্জনতুল্য আচরণই বা কী?

যুধিষ্ঠির বললেন —

বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণদের দেবত্বের কারণ। সাধুদের ন্যায় তপস্যাই তাঁদের প্রধান ধর্ম। মরণ তাঁদের মনুষ্যভাব এবং পরনিন্দা তাঁদের দুর্জনতুল্য আচরণ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষো ভাবঃ পরীবাদোঽসতামিব॥

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব। কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব।

ক্ষত্রিয়গণের দেবত্বের কারণ কী? সাধুদের ন্যায় তাঁদের কোন ধর্ম? ক্ষত্রিয়দের মনুষ্যধর্ম কি? তাঁদের দুর্জনতুল্য আচরণই বা কী?

যুধিষ্ঠির বললেন —

অস্ত্রশিক্ষা নৈপুণ্যই ক্ষত্রিয়দের দেবত্বের কারণ। সাধুদের ন্যায় যজ্ঞ করাই তাঁদের প্রধান ধর্ম। ভয় তাঁদের মনুষ্যভাব। শরণাগত ত্যাগই তাঁদের দুর্জনতুল্য আচরণ।

ইস্বস্ত্রমেষাং দেবত্বং, যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষোভাবঃ পরিত্যাগইসতামিব।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কা চৈকা বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে।

যজ্ঞীয় সাম কী? যজ্ঞীয় যজু কী? কোন বস্তু যজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয়? যজ্ঞ কোন বস্তুকে অতিক্রম করে না?

যুধিষ্ঠির তার উত্তরে বললেন — প্রাণ হল জ্ঞানযজ্ঞের সাম, মন হল জ্ঞানযজ্ঞের, যজু, মন্ত্র যজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয় এবং যজ্ঞ কখনই মন্ত্রকে অতিক্রম করে না।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে॥

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং স্বিদাবপতাং শ্রেষ্ঠং কিং স্বিন্নিবপতাং বরম।
কিং স্বিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিং স্বিৎ প্রসবতাং বরম্॥

যাঁরা দেবতাকে দান করেন, তাঁদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি ? যাঁরা পিতৃলোককে দান করেন, তাঁদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি ? যাঁরা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি? সন্তানোৎপাদিগের পক্ষেই বা শ্রেষ্ঠ কী?

যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরে বললেন — যাঁরা দেবতাকে দান করেন তাঁদের পক্ষে বৃষ্টি শ্রেষ্ঠ। যাঁরা পিতৃলোককে

দান করেন, তাঁদের পক্ষে শুক্রই শ্রেষ্ঠ। যাঁরা লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের পক্ষে ধেনু শ্রেষ্ঠ। সন্তানোৎপাদিকের পক্ষে পুত্র শ্রেষ্ঠ।

বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠং বীজং নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিষ্ঠামানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরঃ॥

এরপর যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবন্ বুদ্ধিমাল্লোঁকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি॥

কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখভোগে সমর্থ, বুদ্ধিমান, লোকপূজিত, সর্বভূতের সম্মত হয়েও জীবিত থাকতেও জীবিত নয়।

যুধিষ্ঠির বললেন —

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ স ন জীবতি॥

দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আত্মা — এই পাঁচ শ্রেণীর লোককে যে ব্যক্তি যথাযোগ্য দান করে না, সে ব্যক্তি জীবিত থেকেও জীবিত নয়।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং স্বিদগুরুতরং ভূমেঃ কিং স্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ।
কিং স্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিং স্বিদ্বহুতরং তৃণাৎ॥

পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর কে? আকাশ হতে উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? কার সংখ্যা তৃণাপেক্ষাও বহুতর?

যুধিষ্ঠির বললেন —

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ॥

মাতা পৃথিবী হতেও বহুতর। পিতা আকাশ হতেও উচ্চতর। মন বায়ু হতেও শীঘ্রতর। চিন্তা তৃণ হতেও বহুতর।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি।
কস্য স্বিদ্‌হৃদয়ং নাস্তি কিং স্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে॥

কোন্ প্রাণী নিদ্রিত হয়েও চক্ষু মুদ্রিত করে না? কোন্ প্রাণী জন্মের পরে স্পন্দিত হয় না? প্রাণীস্বরূপ কোন্ পদার্থের হৃদয় নেই? কোন্ পদার্থ বেগে বর্ধিত পায়?

যুধিষ্ঠির বললেন —

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে॥

মৎস্য নিদ্রিত হয়েও নয়ন মুদ্রিত করে না। অণ্ড (ডিম) জন্মে স্পন্দিত হয় না। প্রস্তরময় বিগ্রহের হৃদয় নেই। নদীর বেগধারা বৃদ্ধি পায়।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং স্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ॥

প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহস্থের মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে ? মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?

যুধিষ্ঠির বললেন —

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্‌মিত্রং দানং মরিষ্যতঃ॥

প্রবাসীর মিত্র — সহচর (সাথী)। গৃহস্থের মিত্র - ভার্য্যা। রোগীর মিত্র - চিকিৎসক। মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র - দান।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কোহতিথিঃ সর্বভূতানাং কিং স্বিদ্ধর্ম্মং সনাতনম্।
অমৃতং কিং স্বিদ্রাজেন্দ্র! কিং স্বিৎ সর্বমিদং জগৎ॥

সর্বভূতের অতিথি কে? সনাতন ধর্ম কী? অমৃত কী? এই জগৎটা কোন্ বস্তুময়?

যুধিষ্ঠির বললেন —

অতিথিঃ সর্বভূতানামগ্নিঃ সোমো গবামৃতম্।
সনাতনঃ সত্যধর্মো বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ॥

সর্বভূতের অতিথি হলেন অগ্নি। সত্য ধর্মই সনাতন ধর্ম। সোমরস ও গোদুগ্ধই অমৃত এবং এই সমস্ত জগৎটাই বায়ুময়।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং স্বিদেকো বিচরতি জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিং স্বিদাবপনং মহৎ॥

কে একাকী বিচরণ করে? কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। হিমের ঔষধ কি ? প্রধান বপন ক্ষেত্র কে?

যুধিষ্ঠির বললেন —

সূর্য একো বিচরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ॥

সূর্য একাকী বিচরণ করেন। চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। অগ্নি হিমের ঔষধ। ভূমি (পৃথিবী) প্রধান বপন ক্ষেত্র।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং স্বিদেকপদং ধর্মং কিং স্বিদেকপদং যশঃ।
কিং স্বিদেকপদং স্বর্গং কিং স্বিদেকপদং সুখম॥

ধর্মের একমাত্র আশ্রয় কী? যশের একমাত্র আশ্রয় কী? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কী? সুখের একমাত্র আশ্রয় কী?

যুধিষ্ঠির বললেন —

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্মং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্॥

ধর্মের একমাত্র কারণ — যজ্ঞাদিক্রিয়ানৈপুণ্য। যশের একমাত্র কারণ — দান। স্বর্গের একমাত্র কারণ — সত্য এবং সুখের একমাত্র কারণ — সচ্চরিত্র।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং স্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিং স্বিদ্দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং কিং স্বিদস্য কিং স্বিদস্য পরায়ণম্॥

মানুষের বহির্ভূত আত্মা কী? মানুষের দৈবকৃত সখা কে? মানুষে জীবিকা নির্বাহের উপায় কি? মানুষের প্রধান আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির বললেন —

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনঞ্চ পর্জ ন্যো দানমস্য পরায়ণম্॥

মানুষের বর্হির্ভূত আত্মা — পুত্র। দৈবকৃত সখা — ভার্য্যা। জীবিকা নির্বাহের উপায় — মেঘ। প্রধান আশ্রয় — দান।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

ধন্যানামুত্তমং কিং স্বিদ্ধনানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্॥

ধন্য লোকদের গুণের মধ্যে কোন গুণ উৎকৃষ্ট। ধনের মধ্যে কোন ধন শ্রেষ্ঠ ? লাভের মধ্যে কোন্ লাভ প্রধান? সুখের মধ্যে কোন সুখ উত্তম?

যুধিষ্ঠির বললেন —

ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং সুখানাং তুষ্টিরুত্তমা।।

ধন্য লোকদের গুণের মধ্যে কার্য্যদক্ষতা উৎকৃষ্ট গুণ। ধনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধন। লাভের মধ্যে আরোগ্য প্রধান লাভ। সুখের মধ্যে সন্তোষই পরমসুখ।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কশ্চ ধর্মঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্মঃ সদাফলঃ।
কিং নিয়ম্য ণ শোচান্তি কৈশ্চ সন্ধির্ণ জীর্য্যতে।।

জগতে কোন্ ধর্ম প্রধান? কোন ধর্ম সর্বদা ফল উৎপাদন করে? কি সংযত করলে সুখ থাকে না? কাদের সঙ্গে সন্ধি করলে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?

যুধিষ্ঠির বললেন —

আনৃশংস্যং পরো ধর্মস্ত্রয়ী — ধর্মঃ সদাফলঃ।
মনো যস্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ণ জীর্য্যতে।।

আনৃশংস্যই (দয়া) প্রধান ধর্ম। বেদোক্ত ধর্মই সর্বদা ফল উৎপাদন করে। মনকে সংযত করলে শোক হয় না। সজ্জনের সঙ্গে সন্ধি করলে সন্ধি কখনও ভঙ্গ হয় না।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিং নু হিত্বা ন শোচতি।
কিং নু হিত্বার্থবান্ ভবতি কিং নু হিত্বা সুখী ভবেৎ।।

মানুষ কি ত্যাগ করলে লোকের প্রিয় হয়? মানুষ কি ত্যাগ করলে শোক দূর হয়? মানুষ কি ত্যাগ করলে অর্থবান হয়? মানুষ কি ত্যাগ করলে সুখী হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন —

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ।।

মানুষ গর্ব পরিত্যাগ করলে প্রিয় হয়। ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক দূর হয়। আকাঙ্খা পরিত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়। লোভ ত্যাগ করে লোক সুখী হয়।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থ চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থঞ্চৈব রাজসু।।

ব্রাহ্মণকে কি জন্য দান করা হয়? নট ও নর্তককে অর্থ কি জন্য দেওয়া হয়? পোষ্যবর্গকে কি উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়? রাজা বা তাঁর প্রধান পুরুষদের কি জন্য দান করা হয়?

যুধিষ্ঠির বললেন —

ধর্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোহর্থং নটনর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থঞ্চৈব রাজসু।।

ধর্মের জন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়। যশের জন্য নট ও নর্তককে দেওয়া হয়। ভরণের জন্য পোষ্যবর্গকে বিতরণ করা হয় এবং ভয় নিবৃত্তির জন্য রাজাগণকে বা তাঁদের প্রধান পুরুষদিগকে দান করা হয়।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কেন স্বিদাবৃতো লোকঃ কেন স্বিন্ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি।।

কে লোক সকলকে আবৃত করে রেখেছে? কি জন্য লোক প্রকাশ পায় না? মানুষ কি দোষে মিত্র ত্যাগ করে? মানুষ কি দোষে স্বর্গে যেতে পারে না।

যুধিষ্ঠির বললেন —

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাত্ত্যজতি মিত্রানি স্বর্গং ন গচ্ছতি॥

অজ্ঞানতাই লোক সকলকে আবৃত করে রেখেছে। তমোবশতঃই জীব অপর জীবের নিকট স্বরূপে প্রকাশ পায় না। মানুষ লোভ বশতঃই মিত্র পরিত্যাগ করে। মানুষ দুর্জন সংসর্গ বশতঃই স্বর্গে যেতে পারে না।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন — তপঃ, ক্ষমা, দম ও লজ্জার কারণ কি?

যুধিষ্ঠির বললেন —

তপঃ স্বধর্মবর্ত্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ।
ক্ষমাদ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্যনিবর্ত্তনম্॥

স্বধর্মবর্ত্তিত্বই তপস্যা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ক্ষমা, মনের দমন (সংযম) দম, অকার্য্য হতে নিবৃত্তিই লজ্জা।

যক্ষ জিজ্ঞাস করলেন — জ্ঞান, শম, দয়া, আর্জব কাকে বলে?

যুধিষ্ঠির বললেন —

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্বসুখৈষিত্বমার্জবং সমচিত্ততা॥

তত্ত্বের অর্থ উপলব্ধি হল জ্ঞান। চিত্তের প্রশান্ততা হল শম। সকল ভূতের সুখেচ্ছা হল দয়া। সমচিত্ততা হল আর্জব (সরলতা)।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন — পুরুষের কোন শত্রু দুর্জয়? কোন্ ব্যাধি অনন্ত? কোন্ লোক সাধু? কোন্ লোক অসাধু?

যুধিষ্ঠির বললেন —

ক্রোধো সুদুর্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ॥

ক্রোধ হল দুর্জয় শত্রু। লোভ হল অনন্ত ব্যাধি। সর্বভূতহিতকারী ব্যক্তিই সাধু। নির্দয় ব্যক্তি হল অসাধু।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন — মোহ, মান, আলস্য, শোকের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির বললেন —

মোহ হি ধর্মমূঢ়ত্বং মানস্ত্বাত্মাভিমানতা।
ধর্মনিষ্ক্রিয়তালস্যং শোকস্তজ্ঞানমুচ্যতে॥

ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞানতা মোহ, আত্মাভিমান মান, ধর্মনিষ্ক্রিয়তা আলস্য। শোক অজ্ঞান।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন — পণ্ডিত কে? নাস্তিক কে? কাম কি? মৎসর কি?

যুধিষ্ঠির বললেন —

ধর্মজ্ঞঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ঃ নাস্তিকো মুখ উচ্যতে।
কামঃ সংসারহেতুশ্চ হৃত্তাপো মৎসরঃ স্মৃতঃ।

ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত। নাস্তিক মুর্খ। কাম সংসারহেতু। মনস্তাপ মৎসর।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন — অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব ও পৈশুন্য কি?

যুধিষ্ঠির বললেন —

মহাজ্ঞানমহাঙ্কারো দম্ভো ধর্মধ্বজোচ্ছ্রয়ঃ।
দৈবং দানফলং প্রোক্তং পৈশুন্যং পরদুষণম্॥

মহৎ অজ্ঞান অহঙ্কার, ধর্মধ্বজার উন্নয়ন দম্ভ। দানফল দৈব, পরনিন্দা পৈশুন্য।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন — প্রিয়বাক্য বললে কি লাভ? বিবেচনাপূর্বক কর্ম করলে কি লাভ? বহুমিত্র হলে কি লাভ? ধর্মে অনুরক্ত হলেই বা কি লাভ?

যুধিষ্ঠির বললেন —

প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি বিমৃষিতকার্যকরোহধিকং জয়তি।
বহুমিত্রকরঃ সুখং লভতে যশ্চ ধর্মরতঃ স গতিং লভতে॥

প্রিয়বচনবাদী প্রিয় হয়, বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি সর্বদা জয়লাভ করে। বহুমিত্রশালী ব্যক্তি সুখে বাস করে। আর যিনি ধর্মানুরাগী তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো মৃতো ভবেৎ।

মানুষ জীবিত থেকেও কেন মৃতের ন্যায় থাকে? রাজ্য ঠিক থাকলেও কেন মৃততুল্য হয়? শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হয়েও কেন মৃতের ন্যায় (অসম্পন্ন) হয়?

যুধিষ্ঠির বললেন —

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্তদক্ষিণঃ।।

দরিদ্র মানুষ জীবিত থাকলেও মৃতের ন্যায় থাকে। রাজ্য অরাজক হলে মৃততুল্য হয়ে পড়ে। শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হলেও সেই শ্রাদ্ধ যদি পণ্ডিত ব্রাহ্মণশূণ্য হলে মৃতের ন্যায় হয়। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলেও দক্ষিণা শূণ্য যজ্ঞ মৃততুল্য।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কা দিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি ততঃ পিব হরস্ব চ।

দিক কি? দল কি? অন্ন কি? বিষ কি? শ্রাদ্ধের কাল কি?

যুধিষ্ঠির বললেন —

সন্তো দিগ্ জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ কথং বা যক্ষ! মন্যসে।।

সাধুজনই দিক্, আকাশ জল, গরুই অন্ন সংগ্রহকারক, মানী লোকের যাঞ্চা করাই বিষ এবং পঙক্তিপাবন ব্রাহ্মণ প্রাপ্তিকালই শ্রাদ্ধের কাল।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।

বার্তা কি? আশ্চর্য কি? পথ কি? কে আমোদ করে? আমার এই চারটি প্রশ্নের উত্তর বলে জল পান কর।

যুধিষ্ঠির বললেন —

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্ত্তুদর্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।

সূর্যরূপ অগ্নি, দিন ও রাত্রিরূপ কাঠ দিয়ে এবং মাস ও ঋতুরূপ দর্বী (হাতা) সঞ্চালিত করে প্রাণিগণকে এই মহামোহরূপ কটাহে নিক্ষেপ করে কাল তাদেরকে পাক করছেন। এটিই বার্তা।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

প্রত্যহ প্রাণীরা যমালয়ে যাচ্ছে দেখেও অবশিষ্ট প্রাণীরা চিরস্থায়িত্ব ইচ্ছা করে। এর থেকে আশ্চর্য আর কি হতে পারে?

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নো নাসে মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন এবং এমন কোন মুনি নাই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব অজ্ঞেয় স্থানে রক্ষিত আছে, সুতরাং প্রধান প্রধান লোক যে পথে গিয়েছেন সে-ই পথ।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর! মোদতে

যে লোক অঋণী ও অপ্রবাসী থেকেও দিনের অষ্টমভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক পাক করে ভক্ষণ করে তিনিই সুখী।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন —

আখ্যাতা মে ত্বয়া প্রশ্না যাথাতথ্যং পরন্তপ।
পুরুষঞ্চ সমাখ্যাহি যশ্চ সর্বধনেশ্বরঃ।

শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে? সকলের মধ্যে ধনী কে?

যুধিষ্ঠির বললেন —

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা। যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে।
তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখ তথৈব চ। অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ।।

পুরুষের নাম পুণ্যকর্মদ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করে পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়। যাবৎ সেই পুরুষের নাম বর্তমান থাকে ততদিন তিনি পুরুষ বলে খ্যাত হন। যিনি অতীত বা অনাগত সুখদুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, ভূত ও ভবিষ্যত, উভয়ই সমান জ্ঞান করেন তিনিই সকলের মধ্যে ধনী ব্যক্তি।

এরপর বকরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরের উত্তরদানে সন্তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠিরকে তার ইচ্ছানুসারে যে কোন একজন ভ্রাতার জীবনদানে সম্মত হলে যুধিষ্ঠির যক্ষের কাছে কাঞ্চনবর্গ, রক্তনয়ন, বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, দৃঢ়বক্ষা ও মহাবাহু নকুলের জীবন প্রার্থনা করলেন। যক্ষ যুধিষ্ঠিরের এরূপ আচরণে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন —

প্রিয়স্তে ভীমসেনোহয়মর্জ্জুনো হঃ পরায়ণম্।
স কস্তান্নকুলং রাজন্! সাপত্নং জীবসিচ্ছসি।।

কেন তিনি ভীম, অর্জুন তার সহোদর ভ্রাতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নকুলের জীবনদান করার প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন —

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্ম হতো বধীৎ।।
কুন্তী চ যক্ষ! মাদ্রী চ ভার্য্যে চৈতে পিতুর্মম। উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ।।
যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তিমে তয়োঃ। মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ! জীবতু।।

যে ধর্ম নষ্ট করে, সে ধর্ম দ্বারাই নষ্ট হয়। যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন তিনি ধর্ম দ্বারাই রক্ষিত হন। তাই আমি ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার মা। তাঁদের প্রতি আমার কোন ভেদজ্ঞান নেই। আমি চাই তাঁরা দুজনেই সপুত্র থাকুন। অতএব যক্ষ! আপনি নকুলকেই জীবনদান করুন।

যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে বললেন যেহেতু তুমি ধর্মকেই অর্থ ও কাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর সেহেতু আমি সকল ভ্রাতারই জীবনদান করলাম। যক্ষের আশীর্বাদে একে একে নকুল, সহদেব, ভীম, অর্জুন গাত্রোত্থান করলেন এবং তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হল।

হরানন্দজী হাতজোড় করে বললেন — পুরোহিতজী, আপনার বাচনশৈলী আমাদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। জানি অনেক রাত হয়েছে, তবুও আপনি পরের অংশটুকু আমাদের শুনিয়ে যান, নাহলে আমরা সারা রাত্রি ঘুমাতে পারব না।

পুরোহিতজী হাসতে হাসতে বললেন — তথাস্তু। তথাস্তু। তিনি পুনরায় কম্বুকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন —
তখন যুধিষ্ঠির বললেন —

সরস্যেকেন পাদেন তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্। পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো ন মে যক্ষো মতো ভবান্।।
মম হি ভ্রাতর ইমে সহস্রশতযোধিনঃ। তং যোধং ন প্রপশ্যামি যেন সর্বে নিপাতিতাঃ।।
সুখঞ্চ প্রতিবুদ্ধানামিন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়ে। স ভবান্ সুহৃদস্মাকমথবা নঃ পিতা ভবান্।।

মহাশয়, একপদে দণ্ডায়মান আপনি কে? আপনাকে সামান্য যক্ষ বলে মনে হয় না। আপনি কি বসু, রুদ্র, মরুদ্গণ বা দেবরাজ ইন্দ্র! আমার ভ্রাতারা লক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু তাদের পরাজিত করার মত যোদ্ধা ত আমি দেখতে পাই নি!

যক্ষ বললেন —

অহং তে জনকস্তাত! ধর্মো বীর! সনাতনঃ। ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ।
যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমার্জবং হ্রীরচাপলম্। দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যমিত্যেতাস্তনবো মম।।
অহিংসা সমতা শান্তিস্তপঃ শৌচমমৎসরঃ। দ্বারাণ্যেতানি মে বিদ্ধি প্রিয়োহ্যসি সদা মম।।

দিষ্ট্যা পঞ্চস্থ রতোহসি দিষ্ট্যা তে ষট্‌পদী পিতা। দ্বে পূর্বে মধ্যমে দ্বে চ চান্তে সাম্প্ররায়িকে॥
বরং বৃণীষ্ব রাজেন্দ্র! দাতা হ্যস্মি তবানঘ! যে হি মে পুরুষা ভক্তা ন তেষামস্তি দুর্গতিঃ॥

'বৎস! আমি তোমার পিতা — সনাতন ধর্ম। তোমাকে দেখবার জন্য ও পরীক্ষা করার জন্য এসেছি। যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য — এই দশটি হল আমার মূর্তি। অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্যা, পবিত্রতা, প্রেম — এই ছয়টি হল আমার ইন্দ্রিয়। তুমি ভাগ্যগুণে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি — এই পাঁচটিতে অনুরক্ত এবং ক্ষুধা, পিপাসা শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু — এই ছয়টিকে জয় করেছ। হে নিষ্পাপ রাজশ্রেষ্ঠ! আমার ভক্তের কোনদিন কোন দুর্গতি হয় না। তুমি বর গ্রহণ কর। আমি তোমাকে বর দান করব।

যুধিষ্ঠির বললেন —

অরণীসহিতং যস্য মৃগ আদায় গচ্ছতি।
তস্যাগ্নয়ো ন লুপ্যেরণ্ প্রথমোহস্তু বরো মম॥

দেব! ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র ক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেইজন্য হরিণ যে অরণী মন্থ নিয়ে গেছে তা আমাকে দান করুন। সেটাই হোক আমার প্রথম বর।

ধর্মরাজ বললেন —

অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণস্য হৃতং ময়া। মৃগবেশেন কৌন্তেয়! জিজ্ঞাসার্থং তব প্রভো।
দদানীত্যের ভগবানুগুরুং প্রত্যপদ্যত অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং ত্বমমরোপম্॥

তথাস্তু! হে কৌন্তেয়! তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যই আমি মৃগরূপে ব্রাহ্মণের অরণী মন্থ হরণ করেছি। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির বললেন —

বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশমুপস্থিতম্।
তত্র নো নাভিজাণীয়ুর্বসতো মনুজাঃ ক্বতিৎ॥

দেব! বার বৎসর আমাদের বনে অতীত হয়েছে। ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত। আমাদের বর দিন যেন অজ্ঞাতবাসকালে কেউ আমাদের চিনতে না পারে।

ধর্মরাজ বললেন —

যদ্যপি স্বেন রূপেন চরিষ্যথ মহীমিমাম্। ন বো বিজ্ঞাস্যতে কশ্চিত্রিষু লোকেষু ভারত !
বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎপ্রসাদাৎ কুরূদ্বহাঃ! বিরাটনগরে গূঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিষ্যথ॥
যদ্বঃ সঙ্কল্পিতং রূপং মনা যস্য যাদৃশম্। তাদৃশং সর্বে ছন্দতো ধারয়িষ্যথ॥

তথাস্তু! হে ভরতনন্দন! যদিও তোমরা আপন আপন রূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করবে, তথাপি ত্রিভুবনে কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না। তোমরা আমার আশীর্বাদে ছদ্মবেশে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করবে এবং আমার ইচ্ছানুসারে তোমাদের মধ্যে যে যেরূপ ধারণ করার ইচ্ছা হবে, সে সেরূপ ধারণ করতে পারবে।

ধর্মরাজ আরও বললেন —

অরণীসহিতঞ্চেদং ব্রাহ্মণায় প্রয়চ্ছত। জিজ্ঞাসার্থ্যং ময়াহ্যেতদাহৃতং মৃগরূপিণা।
প্রবৃণীষ্বাপরং সৌম্য! বরমিষ্টং দদানি তে। ন তৃপ্যামি নরশ্রেষ্ঠ ! প্রয়চ্ছন্ বৈ বরাংস্তব॥

এখন এই অরণী মন্থ তোমরা ব্রাহ্মণকে সমর্পণ কর। হে সৌম্য নরশ্রেষ্ঠ ! তোমাকে বহুতর বর দান করেও আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না।

যুধিষ্ঠির বললেন —

দেবদেবো ময়া দৃষ্টো ভবান্ সাক্ষাৎ সনাতনঃ। যং দদাসি বরং তুষ্টস্তং গ্রহীষ্যামহ্যেং পিতঃ।
জয়েষং লোভমোহৌ চ কামক্রোধৌ সদা বিভো! দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততংভবেৎ॥

'পিতঃ! আপনি দেবদেব এবং সনাতন; আপনাকে যে দর্শন লাভ করলাম তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি যেন সর্বদা লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধকে জয় করতে পারি। সর্বদা দান, তপস্যা ও সত্যে আমার মতি থাকে।

ধর্মরাজ বললেন —

উপপন্নো গুণৈরেতৈঃ স্বভাবেনাসি পাণ্ডবঃ।
ভবান্ ধর্ম পুনঃশ্চৈব যথোক্তং তে ভবিষ্যতি॥

'পাণ্ডুনন্দন! তুমি স্বভাবতই সকল গুণ সম্পন্ন এবং তুমিই বাস্তবিক ধর্ম। তুমি যা বলবে ভবিষ্যতে তাই হবে।

এই বলে লোকরক্ষক ভগবান ধর্ম অন্তর্হিত হলেন।

পাণ্ডবগণ ফিরে এসে সেই অরণীযুক্ত মন্থনদণ্ড তপস্বী ব্রাহ্মণকে সমর্পন করলেন।

কিছুক্ষণ থেমে পুরোহিতজী বলতে শুরু করলেন — এখানে স্বয়ং ধর্মরাজ হলেন প্রশ্নকর্তা। পুত্র ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির হলেন উত্তরদাতা। গুরু-শিষ্যের এই কথোপকথন পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবে। এর মাধ্যমে যে সমস্ত নীতিবাক্য উদ্ভাসিত হল — তা এ জীবনের মূলমন্ত্র। এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে শুধু মহাভারতের সারকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে তা নয় গীতা অনুগীতার বাণীতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রসগ্রাহী আলোচনা শেষ হল। পুরোহিতজীর দুই পুত্র লণ্ঠন নিয়ে পুরোহিতজীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আমরাও আমাদের আসনে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। সহজে ঘুম এল না। ভাবতে লাগলাম মহর্ষি বেদব্যাস এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন এই সকল তত্ত্ব কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করলে মানব দীর্ঘায়ু হবে। সব শোক দুঃখ অতিক্রম হবে। সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে অন্তিমে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করবে।

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্য হেতোঃ।
ধর্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যঃ হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

কামের জন্য, ভয়হেতু, লোভহেতু এবং জীবনের জন্য কোনমতে ধর্ম পরিত্যাগ করবে না। যেহেতু ধর্ম নিত্য, সুখদুঃখ উভয়ই অনিত্য; জীব নিত্য, কিন্তু তার কারণ অনিত্য।

পরদিন ভোরে উঠে শৌচাদি সেরে নর্মদার ঘাটে গিয়ে দেখি পুরোহিতজী স্নান করছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে নমো নারায়ণায় জানিয়ে বললেন — মহাভারতের মত মহাকাব্যে প্রায় সমস্ত ধর্মের বীজ দেখতে পাওয়া যায়। যাক, সেসব আলোচনা পরে হবে। আগে বলুন, আজ এখানে থাকছেন তো। নাহা কর, মন্দির মেঁ আইয়ে। আজ সোমবার পূজা পাঠকে বাদ হমলোগ্ ফির মহাভারতকা তত্ত্ব আলোচনা করেঙ্গে। আমরা তাঁর কথায় সম্মতি জানালাম।

স্নান তর্পণ সেরে মন্দিরে গিয়ে দেখি বহুলোক শিবের পূজোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আমরা আগেই শিবলিঙ্গের পূজা সেরে নিলাম। তারপর পুরোহিতজী পূজায় বসলেন। আমরা মন্দিরের পিছনদিকে জপে বসলাম। জপ যখন শেষ হল তখন বেলা বোধহয় দশটা। মন্দিরের সামনের দিকে এসে দেখি পুরোহিতজীও নিত্যপূজা শেষ করেছেন। ভক্তদেরকে সিদ্ধির সরবৎ-প্রসাদ স্বরূপ বিতরণ করছেন। আমরাও প্রসাদ পেলাম। পুরোহিতজীও কিঞ্চিৎ তা গ্রহণ করলেন। বললেন — চলুন, আমাদের গ্রামটি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

গ্রামটি সেগুন, অশ্বত্থ, বেল, পেয়ারা গাছ দিয়ে ঘেরা। দেখতে কিন্তু একটি তপোবনের মত। কলকে, জবা এবং নানারকম বুনো ফুল ফুটে থাকায় এ স্থানের স্বাভাবিক শ্রী মনোরম হয়েছে। গাছ-গাছালির ফাঁকে নর্মদার ধারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুরোহিতজী হাঁটতে হাঁটতে বললেন — মুনি ঋষিরা দেবাদিদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ ও শিব বলে অভিহিত করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বলেন মহাদেবের মূর্তি দু'প্রকার — এক মূর্তি ভীষণ। যেমন — অগ্নি, বিদ্যুৎ, ভাস্কর। অপর মূর্তি মঙ্গলময়। যেমন — সৌম্যমূর্তি ধর্ম, জল ও চন্দ্র। ঋষিদের চোখে এঁর শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও আর এক অর্দ্ধাংশকে সোম বলেন।

ইনি সৌম্য মূর্তিতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান ও উগ্রমূর্তিতে সংহার করেন। মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বের জন্য মহাদেবকে 'মহেশ্বর' বলা হয়। ইনি বিশ্বসংসার প্রতিপালন করেন। তাই মহাদেব। ধূম্ররূপী বলে ইনি ধূর্জটি। মনুষ্যগণের শিববিধান করেন তাই শিব। ইনি স্থির হয়ে, ঊর্ধে অবস্থান করে প্রাণীগণের প্রাণনাশ করেন. সেজন্য স্থাণু। বিশ্বদেবগণ এর মধ্যে অবস্থিত সেজন্য বিশ্বরূপ। ইনি পশুগণের প্রতিপালন করেন সেজন্য পশুপতি। এঁনার

লিঙ্গপূজা মূর্তিপূজা হতে উৎকৃষ্টতর। এই লিঙ্গপূজা করে মানুষ পরমগতি লাভ করে। শ্মশান এঁর বাসস্থান। ইঁনি দেবগণের মৃত্যু ও শরীরস্থ প্রাণ ও অপানস্বরূপ। ইনি দেবগণের আদি, ইনি কখনও শরণাগতকে ত্যাগ করেন না। ইনি বিরাটরূপে বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত। ইনি দেবগণের আদি। মানুষদের আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও নানা কামনা প্রদান করেন। আবার ইনিই এই সমস্তের নাশ ঘটান। ইনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। সমুদ্রস্থিত বাড়বামুখ এঁর বক্ত্র।

এরপর পুরোহিতজী বললেন — এইবার আসুন আপানাদেরকে দূর থেকে একটি পবিত্র স্থান দেখাই। কুন্তিপুরের মধ্যে এইটি একটি আশ্চর্য স্থান। তাঁর সঙ্গে আমরা হাঁটতে লাগলাম উত্তর-পূর্ব দিকে। এ দিকটা অপেক্ষাকৃত ঘন জঙ্গল। পার্বত্যপথে ছোট বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে প্রায় আধ মাইলটাক যাবার পর দূর থেকে একটি মন্দির দেখতে পেলাম। সবুজ গাছপালায় আচ্ছাদিত। তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন মন্দিরে। মন্দিরের ভিতরে আছে একটি তামার যজ্ঞকুণ্ড। হোমের গন্ধে ঘরটি সুরভিত। তিনি বললেন এই যজ্ঞকুণ্ডে আমি সরস্বতী ষোড়শী দেবীর রূপের দশম নাম ও দশম স্বরূপ গান্ধারীর উদ্দেশ্যে হবন করি, ঘৃত মধু ও রক্তচন্দন দিয়ে। প্রায় দু'ফুট দীর্ঘ ও দেড় ফুট প্রশস্থ একটি তাম্রপাত্রে গান্ধারীর রূপ অঙ্কিত আছে। এই চতুর্ভূজা দেবীর কোন বাহন নেই। এঁর ডান হাতে পরিখ অর্থাৎ লৌহকন্টকযুক্ত মুদ্গর আর ডান হাতে সীর (লাঙ্গলাস্ত্র)। এর দুই স্থান বাঁকা। মুখ ও মূলাংশ লৌহবদ্ধ, সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ। এই যন্ত্রের কাজ আকর্ষণ ও নিপাতন। এই দেবীর অপর নাম চণ্ডা। এই মূর্তিকে ঘিরে রয়েছে স্নিগ্ধ জ্যোতি, যা মনকে বড়ই আকর্ষণ করে। আমার গুরু নর্মদার উত্তরতটে হাতনী সংগমে থাকেন। নাম কপালী বাবা, অগ্নিহোত্রী, বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর ও দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে আমার সমগ্র মহাভারত কণ্ঠস্থ। সরস্বতীর কৃপা কটাক্ষ ভিন্ন কোন বিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আমি পুরাণ বর্ণিত সরস্বতীকে নয়, বৈদিক দেবতা হিসাবেই তাঁকে মান্য করি।

এ মন্দির দেখে আপনারা ভাবছেন আমি বা আমার গুরুদেব কপালীবাবা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু কতকাল আগে কোন শতাব্দীতে যে এই মন্দির গড়ে উঠেছে তা বলতে পারব না। তবে এই মন্দিরের একটি কাহিনী আছে যা লোক পরম্পরায় শুনে আসছি। কাহিনীটি হল — ভারতবর্ষের দুজন বিখ্যাত কবি, একজন কালিদাস, অন্যজন ভবভূতি। কালিদাসের অনুপম কবিত্ব, অপূর্ব ভাব, ছন্দের মাধুর্য মনকে মুগ্ধ করে। ভবভূতির ভাবের গাম্ভীর্য, ঝঙ্কার আর বিষয়ের গভীরতা বিস্ময়ে মনকে ভরিয়ে দেয়। এঁদের নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। কেউ বলেন কালিদাস শ্রেষ্ঠ, কেউ বলেন ভবভূতি শ্রেষ্ঠ। কেউ বলেন মেঘদূতের সুরসৃষ্টি মনকে স্নিগ্ধ করে। কেউ বলেন উত্তররামচরিতের কারুণ্য পাষাণ গলিয়ে দেয়।

এই দুই পক্ষের অমীমাংসিত প্রশ্নের বিচারের ভার নিলেন স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতী।

একদিন দেখা গেল নর্মদার তীরে এই স্থানে বসে ছোট একটি মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছে। তার হাতে একটি কাগজ। কাগজে একটি কবিতার দ্বিতীয় পদটি লেখা আছে, 'চৌরেণাপহৃতং সর্বং বিনানাসাগ্রমুক্তিকাং' অর্থাৎ 'নাকের মুক্তাফুল ছাড়া চোর সর্বস্ব হরণ করেছে।'

ভবভূতি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছোট্ট একটি মেয়েকে অমনভাবে কাঁদতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে, কাঁদছ কেন?'

মেয়েটি উত্তর দিল — 'আমার বাবা রাজসভার পুরাতন পণ্ডিত। বৃদ্ধ হয়েছেন বলে তিনি এখন আর রাজসভায় যেতে পারেন না। রোজ একটি করে শ্লোক লিখে তিনি আমার হাতে দেন। আমি সেই শ্লোকটি রাজার কাছে নিয়ে যাই। শ্লোকটি পড়ে তিনি যা দেন তাতে আমাদের দিন চলে।

আজকে আমি শ্লোকটি নিয়ে আসছিলাম। কিন্তু আমার হাত থেকে সেটি নদীর জলে পড়ে গেল। তুলে দেখি প্রথম পদটি জলে ধুয়ে গেছে। এখন এই লেখা নিয়ে আমি রাজার কাছে যাই কি করে? আর গেলে কি তিনি কিছু দেবেন? তাঁর কাছ থেকে কিছু না পেলে আমার বাবাকে কি খেতে দেব? তিনি যে পথের দিকে চেয়ে আছেন, আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে খেতে দেব।

ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ পিতার কথা মনে করে মেয়েটির দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

ভবভূতির কোমল হৃদয় গলে গেল, 'আহা তাই তুমি কাঁদছ? দাও আমি তোমার কবিতার হারানো পদটি লিখে দিই।' কাগজটি হাতে নিয়ে ভবভূতি লিখলেন ঃ

নিদ্রাব্যস্তগলদ্‌বেণীশ্বশৎফণিমণিভ্রমাৎ চৌরেণাপহৃতং সর্বং বিনা নাসাগ্রমুক্তিকাম্‌॥

অর্থাৎ 'নিদ্রায় স্খলিত বেণীকে সর্প মনে করে এবং মুক্তাকে তার মণি ভ্রম করে চোর নাকের মুক্তাফলটি ছাড়া সর্বস্ব হরণ করেছে।'

কিন্তু প্রথম পদটি মেয়েটির মনোমত হল না, কই তার বাবা তো এমন কথা লেখেন নি।

'কি লিখেছিলেন তিনি'? ভবভূতির প্রশ্নে মেয়েটি উত্তর দিল, তাতো মনে নেই, তবে এ কথা তিনি লেখেন নি।

ভবভূতিও জোর করে বলতে পারলেন না ঠিক এই পদটিই হবে। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

মেয়েটি মনে মনে হাসল। নিজের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে তাহলে ভবভূতির সন্দেহ আছে।

যতক্ষণ ভবভূতিকে দেখা গেল ততক্ষণ মেয়েটি তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার নদীতীরে বসে আগের মত কান্না আরম্ভ করল।

কালিদাস আসছিলেন সে পথে। তাঁকে দেখে মেয়েটির কান্না বেড়ে গেল। ভবভূতির মত কালিদাসও এগিয়ে এলেন। তার কান্নার কারণ শুনে অসমাপ্ত পদ্যটি শেষ করতে গিয়ে লিখলেন —

অধরাঞ্জনরাগাভ্যাং গুঞ্জাফল ইতি ভ্রমাৎ চৌরেণাপহৃতং সর্বং বিনা নাসাগ্রমুক্তিকাম্‌।

অধরের রাঙা রঙে রঞ্জিত মুক্তাফুলটিকে কাঁচফল ভেবে চোর সেটিকে স্পর্শ করেনি, আর যথাসর্বস্ব হরণ করেছে।

মেয়েটি পূর্বের মত এবারও আপত্তি জানাল যে তার বাবা এমন কথা লেখেন নি। কিন্তু কালিদাস তার আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না। বললেন এ ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। এই প্রথম পদটি ছাড়া দ্বিতীয় পদের কোন সার্থকতা নেই।

এবার মেয়েটি নতমস্তকে স্বীকার করে নিল যে পদ্যটি নির্ভুল হয়েছে। বালিকাবেশী মেয়েটি নিজরূপ ধারণ করল। কালিদাসকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন।

বালিকাবেশী সরস্বতীর বিচারে কালিদাসের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হল, ভবভূতির নয়। সেই থেকে এই স্থান তীর্থের মর্যাদা পেয়েছে।

এখন চলুন বাসায় ফেরা যাক। ফিরে আসতে আসতে বললাম — আপনি এতক্ষণ ধরে আপনার গুরুজীর যে গল্প শোনালেন, তা হল আমার কাছে 'মার কাছে মাসির বাড়ীর গল্প।' কারণ উত্তরতট পরিক্রমাকালে আমরা এগারটি ডুংরি অতিক্রম করে যখন হাতনী সংগমের বৃষকপি মন্দিরে পৌঁছি তখন আমাদের অবস্থা ছিল কুষ্ঠরোগীর মত। আপনার গুরুজীর সেবায় সুস্থ হয়ে তবেই আবার পরিক্রমায় অগ্রসর হই। সেই সময় তাঁর মুখ থেকে সরস্বতীর বৈদিক ব্যাখ্যা শোনার এবং তাঁর আতিথ্যের গুণে তিনি আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় চির-ভাস্বর হয়ে আছেন। কথা বলতে বলতে মন্দিরের পথে ফিরে চললাম। পুরোহিতজী বললেন — অপরাহ্নকালে কিংবা সান্ধ্য আরতি সেরে কালকের মত গল্প করব। সেই মহাভারতের আরও কিছু কথা আপনাদের শোনাব। তাঁর সঙ্গে মন্দিরে ফিরে আসতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল।

বেলা একটায় আমাদের ভোজনপর্ব শেষ হল। মধ্যাহ্নভোজনের পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাজেই অপরাহ্নে তাঁর কাছে আমাদের বসা হল না। ঘুম থেকে উঠেই আমরা নর্মদার ধারে গিয়ে বসলাম। গল্প করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। পুরোহিতজী সন্ধ্যা হতেই মন্দিরে গিয়ে আরতি শুরু করলেন। নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরে ফিরে এসে যে যার সান্ধ্যক্রিয়ায় বসে গেলাম।

পুরোহিতজীর আরতি শেষ হল। আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে মন্দিরের বারান্দায় এসে বসলাম। বেশ ভালই গরম পড়েছে। পুরোহিতজীও আমাদের কাছে এসে বসলেন। তিনি জানালেন — কাল সকালে উঠে দুর্ভেদ্য জঙ্গলখণ্ডে দশ মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে পারলে হোসেঙ্গাবাদ পৌঁছে যাবেন।

পুরোহিতজীর কথা শেষ হতেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম — আজ সকালে স্নান করতে করতে আপনি যে বললেন পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের বীজ মহাভারতে নিহিত আছে সে সম্বন্ধে আপ থোড়া কুছ রোশনী ডালিয়ে। পুরোহিতজী আমার অনুরোধে বললেন — বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, খ্রীষ্টধর্মের উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকদের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল 2448 B.C. যা মহাভারতের রচনাকাল। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম

হিন্দুধর্মের শাখা। এঁদের মূলমন্ত্র — অহিংসা পরম ধর্ম। এই নীতি মহাভারতের আদিপর্ব থেকে শুরু করে শেষ পর্ব পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধদেব এই উপদেশ ছাড়া আর কোন উপদেশ মহাভারত হতে গ্রহণ করেন নি। বরং তিনি বেদবিরোধী অনেক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধদেবের সাম্যবাদ নীতি বর্ত্তমান যুগে রুশো প্রবর্ত্তন করেন যা মহাভারত প্রচারিত নীতির বিরোধী। তিনি দৈব এমন কি আত্মাতেও বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে ভোগবিলাসের পথ যেমন কল্যাণের পথ নয়, তেমনি তপস্যা দ্বারা দেহকে কর্ষণ করাও বোধিলাভের উপায় নয়।

যীশুখৃষ্টের জন্ম আজ থেকে প্রায় ১৯৫০ বছর আগে। অর্থাৎ মহাভারতে খৃষ্টের জন্মের 2449+1950=4399 বছর আগে রচিত। কিন্তু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হবার পর অলৌকিক যোগশক্তির প্রভাবে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় সারা ভারত বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল বলে তাঁর ধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টধর্ম অনেকাংশে মহাভারত ও গীতার কাছে ঋণী। খ্রীষ্টধর্মের প্রধান নীতি ত্যাগ ও অনুতাপ এই দুই বিষয়ের বীজ এই মহাকাব্যে পরিস্ফুট। তিব্বতের হিমিশ মঠে সুরক্ষিত, যীশুর স্বহস্তলিখিত পুঁথি পড়লে দুই ধর্মের সাদৃশ্যগুলি চোখে পড়বে। বিখ্যাত রাশিয়ান পরিব্রাজক ডাঃ নটোভিচ্ The Unknown Life of Jesus Christ' নামক বইটিতে মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে লিখেছেন।

আমি — ১৯৫০ সালে আমি যখন প্রথম কাশ্মীরে যাই, তখন ঘটনাচক্রে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি মাহ্‌ঝুরের (Mahjoor) সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ইনি 'কালাইম-মাহ্‌ঝুর' এবং 'সালাইম-মাহ্‌ঝুর' নামে দুটি বিখ্যাত কাশ্মীরী কাব্যের লেখক। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কাশ্মীরী গীতিকার বসুলমীর ও চলা বসুল-নজ্‌কি প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরী সাহিত্য সভার সম্পাদক এই কবি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য। তিনি কাশ্মীরের তৎকালীন যুবরাজ করণ সিং এর লাইব্রেরী থেকে এনে নটোভিচের মূল বইটি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন।

কবি আমাকে একটি নতুন কথাও শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যীশুখ্রীষ্ট অমরনাথ গুহাতে দীর্ঘকাল সাধনা করেছিলেন, এমনকি শ্রীনগর থেকে মাত্র চার মাইল দূরে হরি পর্বতের নীচে খান-ইয়ারী নামক স্থানে যীশুর সমাধিস্থান আজও বর্ত্তমান। কবির সঙ্গে গিয়ে আমি ঐ সমাধিস্থল দেখে এসেছি। স্থানীয় জনসাধারণ বলে — পয়গম্বর ঈশানীর সমাধি। তারা এখনও এখানে ধূপ দেয়, মোমবাতি জ্বালে, নানারকম মানসিক করে, এমন কি দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমের জন্য 'হত্যা'ও দেয়। কাশ্মীরের জনসাধারণ বিশ্বাস করেন যে অমরনাথ গুহার প্রথম আবিষ্কারক হলেন এক গুজর অর্থাৎ গুজরতে হুয়ে রাখাল বালক — The Wandering Shepherd lad; ইনি যীশু ছাড়া আর কেউ নন।

বাইবেলে যীশুর ১৩ বৎসর বয়স থেকে ২৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত, এই ১৬ বৎসরের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে ঐ ষোল বৎসর কাল তিনি ভারতবর্ষে কাটিয়েছিলেন।

পুরোহিতজী — ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুর মৃত্যু হয়নি। অলৌকিক যোগশক্তি প্রভাবে তিনি বেঁচে উঠে ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিলেন এবং কাশ্মীরে সমাধি লাভ করেন। ডাঃ নটোভিচের লেখা ছাড়াও বিখ্যাত বৈদান্তিক সাধু স্বামী রামতীর্থজী প্রণীত 'The spiritual power that wins' নামক পুস্তকেও এর আভাস মেলে। স্বামীজী লিখেছেন — ... crucified Christ threw himself into that state (samadhi) for three days and like a yogi came to the life again, made his escape and came to live in Kashmir. There is standing a grave at Khar-i-asar at the foot of Hari Hills for last two thousand years. It is held very sacred and called the 'Grave' of 'Esha (Isha)' which was the name of christ in Hindusthan. Again the people of India have a kind of magic ointment which is called christ ointment (Malun-i-Isha) and the story, the people who prepare the ointment, tell that with this ointment Isha used to heal the wounds.'

আমি — কবি আমাকে আরও জানিয়েছিলেন যে ভারতে আসার পথে কাবুলে যে পুকুরে যীশু স্নান করেছিলেন তা নাকি এখনও 'ঈশা-তালাও' নামে বিখ্যাত। আরবী গ্রন্থ 'তারিক-ই-আজাম' এ নাকি এসবের বর্ণনা আছে। যেহেতু ভারতবর্ষে যীশু ঈশা নামে পরিচিত, সেজন্য বর্তমানে একদল নবীন গবেষকের উদ্ভব হয়েছে, যাঁদের মতে মুসলমানদের এই ঈশা, জেরুজালেমে ঈশানী সম্প্রদায়ের ঈশা এবং নাথ-যোগীদের

ঈশানাথ নাকি একই ব্যক্তি। যীশু যখন ইস্রায়েলে জন্মগ্রহণ করেন তখন ইস্রায়েলের মধ্যে 'Essenes' নামে এক সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। যেহেতু Essenses কে বাংলায় বলা হয় ঈশানী এবং ঈশান শিবেরই একটি নাম, তাছাড়া বাইবেলে উল্লিখিত লিঙ্গমূর্তি chium (শিউম) এবং সংস্কৃত শিবম্ শব্দের মধ্যেও যখন পরিপূর্ণ সাদৃশ্য আছে, তখন যীশু এবং ভারতীয় বিখ্যাত নাথযোগী ঈশানাথ যে একই ব্যক্তি তা তাঁরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত।

পুরোহিতজী — কিন্তু আমার তা মনে হয় না। কারণ, নাথ-যোগীদের উপাস্য দেবতা শিব, তাঁরা লিঙ্গ পূজা করে থাকেন। মহাত্মা যীশু এবং ঈশানাথ যদি একই ব্যক্তি হন, তাহলে যীশু তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে শিব তথা লিঙ্গপূজার প্রবর্তন করেন নি কেন? নাথ-যোগীরা সাধারণতঃ কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হাড় ও রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল, করঙ্গা এবং কাষ্ঠ নির্মিত এক বিচিত্র যোগ-দণ্ড ধারণ করে থাকেন। যীশুর কেউ ঐ সব বস্তু ব্যবহার করতেন বা করেন, এমন কি কোথাও প্রমাণ আছে? যীশু নিজে কি করতেন? কান ফাট্টা যোগীদের মত বিচিত্র ভূষিত যীশুর মূর্তি বা চিত্র কেউ কি কোথাও দেখেছেন? তাছাড়া যীশু মূর্তিপূজা জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এজন্য পুরীতে পাণ্ডা এবং পুরোহিতদের হাতে নির্যাতিত হয়ে প্রাণের ভয়ে তাঁকে রাতারাতি পালিয়ে যেতে হয়েছিল। নটোভিচের বই-এর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পড়ে দেখবেন, সেখানে এর সবিশেষ বর্ণনা আছে। নটোভিচ্ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখেছেন ঃ

But Issa, warned of his danger fled in the night from Juggernath, gained the mountains and took refuge in the Gothamide-country, the birth place of the great Buddha Muni, among the people who adorned the only and sublime Brahma.

Having perfectly learned the Pali tongue, the just Issa applied himself to the study of the sacred Molls or Soutras.

Six years later, Issa whom the Buddha had chosen to spread his holy words could perfectly explain the sacred rolls. কাজেই যীশুখ্রীষ্টের উপর নাথযোগী তথা হিন্দুধর্মের কোন প্রভাব ছিল বললে তাকে নিছক ভাবাতিশয্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নটোভিচের উপরিলিখিত বর্ণনা থেকে বরং এইটেই প্রমাণিত হয় যে যীশু ভারতবর্ষে এসে খুব ভালভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি পড়েছিলেন এবং তাঁর উপর যদি কোন ধর্মের প্রভাব পড়ে থাকে তা হল বৌদ্ধধর্ম।

যীশুর জন্মের বহু পূর্ব হতেই সিরিয়া এবং ইস্রায়েলে যে ঈশানী সম্প্রদায়ের মানুষজন ছিলেন, তাঁরা কোনমতেই ঈশান অর্থাৎ শিবের সেবক তথা নাথ সম্প্রদায়ীদের অনুবর্তী ছিলেন না। গিরনার পর্বতে আবিষ্কৃত অশোকের শিলালিপি থেকে বরং এই তথ্যই জানা গেছে যে, ঈশানীরা বৌদ্ধধর্মেরই একটি শাখা। মহারাজ অশোক গ্রীস, প্যালেস্টাইন, জেরুজালেম, মিশর প্রভৃতি স্থানে, যে সব ধর্ম-প্রচারক পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অনুবর্তীরাই Essenes নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক Pliny, এমন কী গোঁড়া খ্রীষ্টান লেখক Renanও তাঁর লেখা Life of Jesus নামক পুস্তকে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বিখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিদ Count M. Bejornstyjerna তাঁর 'The Theogony of the Hindus' নামক পুস্তকে লিখেছেন, প্যালেস্টাইনের ঈশানীরা (Essenes) প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ এবং যীশুর শিক্ষা গুরু Johnও এইরকম একজন ঈশানী ছিলেন। ডঃ রমেশ চন্দ্র দত্তের মত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরও ঐ একই সিদ্ধান্ত ঃ 'Thus we learn that when christ was born, Buddhism prevailed in Palestine, Syria and Egypt and the Buddhist precepts were received as household words among the Essenes of Palestine.' (Ancient India Vol-II, P-329) ডঃ দত্ত তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে Bunsen's Angel Messiah of Buddhists, Essenes and Christians' নামক পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত সমূহ বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছেন।

সত্যিকথা বলতে কি, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের বহু বিষয়ে অদ্ভুত সাদৃশ্য। বুদ্ধের জন্মকথা, উপদেশ এবং নীতিবাক্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় যীশুর জন্মবৃত্তান্ত, কর্মধারা এবং উপদেশের মধ্যে। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বহিরাচার এমন কি বিহার স্তূপ গীর্জা প্রভৃতির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য রীতির মধ্যেও একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি ঃ—

১) বুদ্ধ জননী মহামায়া দেবী এবং যীশু জননী মেরী উভয়েই নাকি virgin অবস্থাতে নিজ নিজ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, এজন্য সাধারণ নারীর মত তাঁদেরকে পুরুষ সঙ্গ করতে হয়নি।

২) উভয়েরই জন্মকালে বহু মঙ্গলচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বুদ্ধের জন্মকালে পুষ্যা নক্ষত্রের উদয় এবং যীশুর জন্মকালে আকাশে একটি Messionic star এর সহসা আবির্ভাব ঘটে। উভয় ধর্মের মধ্যে এই ঘটনার সাড়ম্বর বর্ণনা দেখলে স্বতঃই মনে হয় যেন এক পক্ষ অপর পক্ষের অনুকরণে এরকম ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

৩) বুদ্ধের জন্মকালে অসিত নামে একজন মুনি শুদ্ধোধনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি নবজাত শিশুর সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করেন,

প্রজ্ঞাম্বুবেগাং স্থিরশীল বপ্রাং সমাধিশীতাং ব্রত চক্রবাকাং।
অস্যোত্তমাং ধর্মনদীং প্রমৃত্তাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ।

অর্থাৎ তৃষ্ণার্ত জীবলোক এই শিশুর ধর্মনদীর জল পান করে পিপাসা দূর করবে; সেই নদীর স্রোত হল প্রজ্ঞা, তীর হল নীতি ও স্বভাব, শীতলতা হল সমাধি এবং চক্রবাক হল ব্রতস্বরূপ (অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত)।

New Testament এর বর্ণনাতেও পাই — 'When Jesus was born in Bethlehem of Judia in the days of Herod the king behold there came wisemen from the East to Jerusalem saying, 'where is he that is born the king of the Jews? For we have seen His star in the East and have come to worship him, (Methew II, 1-2)

৪) বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণনা আছে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে মার যেমন বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করেছিল তেমনি যীশুকেও নাকি শয়তান (Satan) প্রলুব্ধ করেছিল।

৫) উভয়েরই বারোটি করে শিষ্য ছিল; উভয়েই সশিষ্যে ধর্মপ্রচার করতে পরিক্রমায় বেরুতেন এবং স্ব স্ব শিষ্যকে জগৎময় সদ্ধর্ম প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উভয়েই জাতপাত সম্প্রদায় এবং বহিরাচারের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতা এবং বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করে গেছেন। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট ক্ষমা প্রেম মুদিতা এবং করুণার বাণী যীশু প্রদত্ত উপদেশের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়।

৬) উভয় মহাপুরুষের উপদেশ দেওয়ার রীতিটিও ছিল অভিন্ন। বুদ্ধ যেমন সারনাথে মৃগদাবে প্রারম্ভিক উপদেশ বাণীতে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের সারকথা বিবৃত করেন, তেমনি যীশুও তাঁর গিরি-প্রবচনে (Sermon on the Mount) খৃষ্টধর্মের সারমর্ম ব্যক্ত করেছিলেন। বুদ্ধদেব নানা রূপক গল্পের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতেন, যীশুর উপদেশের মধ্যেও সেইরকম Parables এর ছড়াছড়ি। কোথাও কোথাও উপাখ্যানেরও আশ্চর্য মিল দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ John V-14 এবং Luke XII-16 প্রভৃতিতে বর্ণিত parables গুলিকে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 'ভরদ্বাজ-সুত্ত' এবং 'ধনিয়সুত্ত' এর অনুবাদমাত্র বলা চলে। বুদ্ধ যেমন একখানা পিষ্টক দিয়ে পাঁচশত সন্ন্যাসীকে খাইয়েছিলেন, যীশুও তেমনি পাঁচখানা রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী শুভা যেমন তাঁর প্রতি প্রেমনিবেদনকারী দুশ্চরিত্র যুবকের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নিজের সুন্দর চক্ষু দুটি উৎপাটিত করেছিলেন তেমনি খৃষ্টানদের মধ্যেও একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, সন্ন্যাসিনী লুসি ও ব্রিগিটাও ঐ একই কারণে নিজেদের চোখগুলি উৎপাটিত করেছিলেন। তাছাড়া যীশুর অনুরক্তা শিষ্যা মেরি ম্যাগডেলেনের যে ভাব চিত্র পাই তাতে তাঁকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী আম্রপালির সিরিয় সংস্করণ বলে মনে হয়।

৭) উভয় ধর্মের সম্প্রদায়গত আচার অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য আরও বিস্ময়কর। বৌদ্ধদের মধ্যে যেমন মহাযান এবং হীনযান নামে দুটি প্রধান সম্প্রদায় তেমনি খৃষ্টধর্মেরও দুটি প্রধান সম্প্রদায় হল রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট। বৌদ্ধধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু হলেন দলাই লামা। তদনুরূপ খৃষ্টধর্মেরও সর্বোচ্চ ধর্মগুরু Pope. দলাই লামার পরে বিভিন্ন উপাধিকারী যেমন বিভিন্ন লামা থাকেন, তদনুসরণে খৃষ্টধর্মের মধ্যেও Pope এর পরে Archbishop, Bishop, Cardinal প্রভৃতি বিভিন্ন পদমর্যাদার সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে দলাই লামা হতে আরম্ভ করে পদমর্যাদা অনুয়ায়ী বিভিন্ন লামারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় যেমনভাবে নানা বিচিত্র বেশভুষা এবং টুপি প্রভৃতি পরে থাকেন খ্রীশ্চানরাও তেমনি নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকালে নির্দিষ্ট পোষাক টুপি মালা ধারণ করে থাকেন।

৮) বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাকালে মাথায় জল সেচন করে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। খৃষ্টধর্মেও Baptism এর সময় Jordan এর জল সিঞ্চন একটা অবশ্য করণীয় অঙ্গ।

৯) বৌদ্ধধর্মের মূল তিনটি প্রতিজ্ঞা বাক্য — বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি। খৃষ্টানদের প্রচারিত God, The Son of God and The Holy Ghost — এই Trinity তত্ত্বকে বৌদ্ধধর্মের উপরিলিখিত ত্রিতত্ত্বের প্রতিভাস বলে আমি মনে করি।

১০) বেদীতে ফুল মালা এবং দীপ দান বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত। খৃষ্টানরাও চার্চে গিয়ে candle জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন।

বুদ্ধ ও খৃষ্টের উপদেশের সাদৃশ্য ঃ

ক) 'What is the use of plated hair? O Fool! What of the raiment of goat skins? Within thee there is ravening, but outside thou makest clean.' – Dhammapada 394

'And the Lord said unto him, Now do ye pharisees, make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of mavening and wickness.' – Luke XI 39.

খ) 'Hatred does not cease by hatred at any time, hatred ceases by love – this is its nature, Let us live happily, not hating those who hate us. Among men who hate us, let us live far from hatred, Let him overcome anger by love; let him overcome evil by good.' – Dhammapada V, 197 & 223

'But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you and pray for them which despite fully use you and persecute you.' – Mathew V, 44

গ) Destroying living beings, killing, cutting, binding, stealing, speaking falsehood, fraud, deception, worthless-reading, intercourse with another's wife – this is Anigandha (What defiles a man) – Anigandha Sutta Nipat (Sacred Books of the East Series p-40)

For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adultries, fornication theft, false witness, blasphemies, These are the things which defile a man. – Mathew XV 19-20

ঘ) 'Like a beautiful flower, full of colour but without scent, are the fine and fruitless words of him who does not act accordingly.' – Dhammapada 51

'All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not.' – Mathew XXIII

ঙ) All men tremble at punishment, all men love life. Remember that you are like unto them and do not kill or cause slaughter. – Dhammapada 130

'And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.' – Luke VI-31

চ) The fault of others is easily perceived but of ourself is difficult to perceive. A man winnows his neighbour's fault like chaff, but his own fault he hides as a cheat hides the bad die from the gambler. – Dhammapada

'And what beholdest thou the mote that is in thy brother's eye but considerest not the beam that is in thine own eye.' – Mathew VII, 3

ঐ সমস্ত আশ্চর্য সাদৃশ্য বা মিলকে কেবল Chance বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই যীশুখৃষ্টের উপর বৌদ্ধ ধর্মের যে সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছিল, এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডেভিস্ (Prof. Rhys Davids) এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, 'If all this be chance, it is a most stupendous miracle of coincidence, it is in fact ten thousand miracles.' (Hibbert Lectures 1881, Pg. 193)

বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন 625 B.C. । যীশুখ্রীষ্ট বুদ্ধের জন্মের মাত্র ৫০০বছর পর তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। সুতরাং তিনি যে বৌদ্ধধর্মের নীতিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন সেদিক থেকে কোন সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টধর্মের ত্যাগ-নীতি গীতা ও বৌদ্ধধর্মের সারধর্ম। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট বৌদ্ধধর্ম ছাড়া মহাভারতের ধর্মেও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যেমন — মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে আছে —

অতিবাদং ন প্রবদেন্ন বাদয়েৎ যো নাহতং প্রতিহ্ন্যান্ন ঘাতয়েৎ।
হন্তুশ্চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহন্ত্যাগতায়।

কেউ নিন্দা করলে নিজে অথবা অন্য কারো দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে না। নিজে অন্যের দ্বারা আহত হলেও, নিজে কিংবা অন্য কারো দ্বারা আঘাত করবে না। যিনি এরূপ করেন, দেবগণও তাঁর স্তুতি করে থাকেন।

Whatsoever shall smite thee on the right check, turn to him the other check also. (Mathew 39)

মহাভারতের বনপর্বে আছে পাপ করে অনুতাপ করলেই মুক্তিলাভ ঘটে যার প্রতিফলন দেখা যায় Repentance of Christiamity তে। আলোচনার শেষে আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর যে যার জপতপ সেরে রাত্রি সাড়ে ন'টার মধ্যে সকলে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সেরে আমরা যে যার গাঁঠরী, কমণ্ডলু, লাঠি হাতে নিয়ে নর্মদা বন্দনা করতে করতে আমরা কুন্তিপুরের শিবমন্দির পরিক্রমা করে শেষবারের মত প্রাণম জানিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। পুরোহিতজী প্রায় এক মাইলটাক রাস্তা এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।

আমরা চলতে শুরু করলাম নদীর ধার ধরে। অনুমান করলাম বেলা বোধহয় ন'টা বেজেছে। কিছুটা যাওয়ার পরে নদীকে আর দেখতে পেলাম না। নদী বেঁকে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। হাঁটার সুবিধার জন্য কতকগুলো ছোট ছোট গাছের ডাল ভেঙে আমরা এগিয়ে চললাম। যাইহোক, আমরা ক্রমে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে ঢুকে পড়লাম। এখানে শালগাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বটে তবে সংখ্যায় অনেক কম। ধাওয়া, মেহরীন ও বড় বড় মোটা মহুয়া গাছই বেশী। আমরা এগিয়ে চললাম ক্রমোচ্চ চড়াই পথে। আধঘন্টা হেঁটে যেতেই সেই ছোট জঙ্গলটি অতিক্রম করতে পারলাম। পাহাড়ের ঢাল ক্রমে সমতল হচ্ছে বলে মনে হল। বড় বড় শাল, মহুয়া, সাজা গাছ এ পথে আছে বটে তবে একে ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। পাহাড়ের ঢালের কোন কোন অংশে চাষবাসও হচ্ছে। লোকজনের কিছু কিছু বাড়ী ঘরও চোখে পড়ছে দূরে দূরে। নীরবেই এতক্ষণ হাঁটছিলাম। হঠাৎ সামনে আবির্ভূতা হলেন মা নর্মদার জলধারা। এতক্ষণ নদীটা আড়ালে আবডালে বয়ে চলেছে। আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। নর্মদা দর্শনের পর মন আনন্দে ভরে গেল। আমরা নতজানু হয়ে মা নর্মদাকে প্রণাম করলাম। পাহাড়ের ঢাল থেকে নামতে নামতে প্রেমানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ গাছের উপর থেকে পাক খুলে খুলে নেমে আসছে। আমরা কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই বিকট দর্শন প্রকাণ্ড অজগরটা গাছ থেকে নেমে ধীরে ধীরে রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' 'রেবা, রেবা' বলতে বলতে আমরা সেইটুকু রাস্তা দ্রুতগতিতে পার হয়ে এলাম। নর্মদার বিস্তার যেন ক্রমশঃ কমছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্বত্যপথে হাঁটছি। কেউ আর কোন উচ্চাবাচ্য করল না। কারো মুখে শব্দ নেই। যাইহোক এতক্ষণে একজন দেহাতি বৃদ্ধকে নর্মদাতে স্নান করতে দেখলাম। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ভিজে কাপড়ে আমাদের কাছে উঠে এলেন। হরানন্দজী দূরের মন্দিরের চূড়া দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — ওটি কোন্ দেবতার মন্দির?

— গৌরীশঙ্করজী মহাদেব কা। উধার নর্মদাতটকা প্রসিদ্ধ মহাত্মা গৌরীশঙ্কর মহারাজকা সমাধি মন্দির ভি হ্যায়। ঔহি মহল্লাকা নাম হ্যায় কোকসর। উধার কেবল্যারি নদীকা সঙ্গম নর্মদাজীকা সাথ হুয়া।

তাঁর কথা শেষ হলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেই মন্দির লক্ষ্য করে হেঁটে চললাম। আমাদের পরিক্রমার পথ থেকে কিছুদূরে দেখতে পেলাম একটা রাস্তা চলে গেছে অনুর্বর পার্বত্য প্রান্তরের বুক চিরে শৈলমালা ও অরণ্যানীর দিকে। দূরে দূরে লোকালয় দেখা যাচ্ছে। আধ ঘন্টাটাক হাঁটার পরেই পৌঁছে গেলাম মন্দিরের কাছে। দেখলাম চারজন সাধু মন্দিরের চত্বরে বসে জপ করছেন। আমরা মন্দিরস্থ দেবতা এবং নর্মদাবাসী মহাত্মা

গৌরীশঙ্করজীর সমাধি ভূমিতে প্রণাম নিবেদন করে উঠে আমার সাথীদের বললাম — কমলভারতীজীর পর তিনিই হাজার হাজার সাধুর জমায়েত নিয়ে 'নর্মদা' পরিক্রমারূপ তপস্যাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

কোকসরের পূর্বদিকে হোসেঙ্গাবাদ। আর মাত্র বারো মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে পারলেই আমরা হোসেঙ্গাবাদ পৌঁছে যাব। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মন্দিরের চত্বরেই বিশ্রাম করতে বসলাম। জঙ্গলের গাছের ডালে কত রকমের এবং কত জাতের যে পাখী উড়ে এসে বসছে এবং বিচিত্র সব কলকল ধ্বনি তুলছে, তার ইয়ত্তা নেই। পাখীদের কলকাকলি শুনতে শুনতে 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে রওনা হলাম। হেঁটে চলেছি মনের আনন্দে। সেই একই জঙ্গলাবৃত পাহাড়ী পথ হলেও আমাদের চলার গতি বেড়ে গেছে। দু ঘন্টায় বন্ধুর পথে প্রায় সাত আট মাইল হেঁটে ফেললাম। দূরে একটি সাইনবোর্ডে লেখা — রগুাল ঘাট। সর্বত্র শাল, বেল, কেদ্, আবলুষ, শিশুগাছ, জামীর, হরিতকী ও আমলকী গাছের জটলা। ঘন বন। কিন্তু এতক্ষণ এই পথের মধ্যে কোন বন্য জন্তু দেখলাম না। মাঝে মাঝে কয়েকটি ভেঙে পড়া মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। রগুাল ঘাট থেকে বামদিকে খাড়া উৎরাই-এর পথ ধরলাম। ক্রমশঃ পাহাড়ের নিচের দিকে নামছি। সকলেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে এগোতে লাগলাম। প্রায় মাইল তিনেক এইভাবে দুর্ভেদ্য জঙ্গল অতিক্রম করার পর জঙ্গল কিছুটা পাতলা হল বলে মনে হল। বন কিছুটা পাতলা হতেই সূর্যের আলো এসে পড়েছে স্থানে স্থানে বড় বনস্পতির ডালপালা ভেদ করে।

আমাদের চলার পথে আড়াআড়ি ভাবে খুব শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝর্ণা। দুদিকে পাষাণময় উঁচু তীর। শিলাতটে প্রতিহত হয়ে কুলুকুলু ধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছে নির্মল জলের ধারা। কাঠের গুঁড়ির পুল পেরিয়ে ঝর্ণাটা অতিক্রম করলাম। ঝর্ণাটা অতিক্রম করার পর প্রায় দু'মাইল রাস্তা পার্বত্যপথে হেঁটে আমরা যখন হোসেঙ্গাবাদে এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আজ গল্প করতে করতে সারাদিনে প্রায় চোদ্দ পনের মাইল রাস্তা চলে এসেছি। নর্মদা ঘাটে বহুলোক সমাগম দেখলাম, স্ত্রী-পুরুষ-বালক নির্বিশেষে স্নান করছে। ঘাটের উপরেই শিবমন্দির। শিবমন্দিরের পাশাপাশি অনেকগুলি মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। একটি নর্মদা মন্দির, একটি বিষ্ণু মন্দির এবং একটি হনুমান মন্দির। ঐ মন্দিরগুলোর আড়ালে আরও দু'তিনটি মন্দির রয়েছে। ঘাটটি সুন্দর করে বাঁধানো। ঝকঝকে ঘাট। ঘাটের গায়ে মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা আছে — শেঠানী ঘাট। জানকীবাঈ শেঠানী নামে ধনাঢ্য মহিলা নর্মদা মাতার কৃপা লাভ করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঐ বিশাল ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। হোসেঙ্গাবাদ শহরের সবচেয়ে সুন্দর ঘাট এটি। অনুমান করলাম ঘাটের পিছনেই মূল শহর। নর্মদায় হাত মুখ ধুয়ে নর্মদা মন্দিরের নীচে আসন পাতলাম। নর্মদা মন্দিরে নর্মদামায়ীর পূর্ণাবয়ব শ্বেতপাথরের মূর্তি দেখতে বড়ই সুন্দর।

কিছুক্ষণ পরেই চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘাটের উপরেই নর্মদামুখী হয়ে যে যার জপে বসলাম। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। সমগ্র আকাশ জুড়ে আলোর বন্যা। পুরোহিতমশাই আরতির জন্য নর্মদা মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন। আরতির পর তিনি পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে ঘোরাতে ঘোরাতে ঘাটের উপর প্রবহমান নর্মদার দিকে তাকিয়ে ভাবের জোয়ারে নৃত্য শুরু করে দিলেন। ঢুলুঢুলু নেত্রে ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে তিনি নাচের তালে তালে গাইতে লাগলেন —

ওঁ সরাংসি নদ্যঃ ক্ষয়মভ্যুপেতা ঘোরে যুগেহস্মিন্ হি কলৌ প্রদূষিতে,
ত্বং ভ্রাজসে দেবি জলৌঘপূর্ণা দিবীব নক্ষত্রপথে চ গঙ্গা।।
তব প্রসাদাৎ বরদে বরিষ্ঠে কালং যথেমং পরিপালয়িত্বা।
যমোহথ রুদ্রং তব সুপ্রসাদাৎ তথা অয়ং কুরু বৈ প্রসাদম্।।

— মা নর্মদা গো! এই কলিদূষিত ভীষণ যুগে সরিৎসরোবরাদি ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে, কিন্তু একমাত্র তুমি নক্ষত্রপথে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জলরাশি সূক্ষ্মভাবে বক্ষে ধারণ করে বিরাজ করছ। হে বরদে! তোমার প্রসাদে যাতে আমরা এই ভীষণ সময় অতিবাহিত করে রুদ্রপদ প্রাপ্ত হতে পারি। হে বরিষ্ঠে! আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

স্তব শেষ হল। জ্যোৎস্না প্লাবিত নর্মদাতটে এই ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে শ্রুতিমধুর স্তোত্রধ্বনি প্রত্যেকের কানে

মধুবর্ষণ করছে। দেখলাম পুরোহিতমশাই আস্তে আস্তে টলে পড়ছেন। মনে হয় তাঁর দুই পুত্র দুদিকে দাঁড়িয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। পঞ্চপ্রদীপ হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল। একজন ভক্ত সেটি ধরে ফেললেন। পুরোহিতমশাই পুরোপুরি জ্ঞান হারালেন। তাঁকে ধরে একটি খাটিয়াতে শুইয়ে দেওয়া হল। সেটিকে কাঁধে করে তাঁরা নিয়ে চলে গেলেন। চোখের সামনে পুরোহিতমশাইয়ের সমাধির দৃশ্য দেখার পর আমরা চুপচাপ বসে আছি নর্মদার দিকে তাকিয়ে। ওপারে উত্তরতটের দু'একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। আমার সহসা মনে পড়ে গেল গুলজা গ্রামের খাড়েশ্বরী মহারাজার কথা। নর্মদাতটের সেই অদ্ভুতকর্মা কঠোর তপস্বী বোধহয় আজও একপায়ে খাড়া থেকে কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছেন। তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন — য়হুঁ খালাকা ঘর নাহি। জানি না, তাঁর চরমপ্রাপ্তি অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে কিনা, কিন্তু নর্মদাতটে যত সাধু মহাত্মাকে দেখেছি, তাঁদের কাউকে এঁর মত কঠোর তপস্যা করতে দেখিনি, নর্মদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দিনরাত্রি একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, এ যে কত বড় তপস্যা, তা সাধারণের ধারণার বাইরে। মনের মধ্যে অনেক চিন্তা ভীড় করে এল। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদেরকে ইষ্টসিদ্ধির জন্য অনেক রকম শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে দেখেছি। আমি উর্ধবাহু, আকাশমুখী, পঞ্চধূনী, জলশয্যী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সাধু দেখেছি। গুদড়ী সম্প্রদায়ের সাধু সবসময়ে চলতে থাকেন, হয় পথে নতুবা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পদচালনা করতে করতে হয়ত তাঁদের দুটো পা ফুলে গেছে তবুও হাঁটার ছন্দে তাঁদের পদচালনার বিরাম নেই। কেউ কেউ এক বা উভয় বাহুকে সতত উর্ধেই তুলে রাখেন। কেউ বা উপরের দিকে কোন গাছের ডালে পা দুটো বেঁধে রেখে অধোমস্তকে ঝুলতে থাকেন এবং মাথার নিচে অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করেন। এঁদের নাম উর্ধ্বমুখ তপস্বী। আমার মনে হল, প্রীতম্ প্রিয়তমের প্রতি আকুল করা পাগল করা সব ভুলানো প্রেমভাব না জন্মালে ভগবানের কৃপালাভ সম্ভব নয়। পুরোহিতমশাইয়ের সমাধির দৃশ্য আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি সকাল হয়ে গেছে। সূর্যোদয় হচ্ছে। বালসূর্যের উদয় রশ্মি এসে পড়েছে সুউচ্চ পর্বতের উপর। আর অরুণকিরণবালায় শুধু বড় বড় গাছের চূড়া নয়, সমগ্র দিকচক্রবাল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যিনি সত্যম শিবম্ সুন্দরম্ তাঁর দৃষ্টি কত সুন্দর ও রমনীয় তা চোখ ভরে এবং মন ভরে দেখতে লাগলাম। আমার চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল প্রেমানন্দের কন্ঠস্বরে। তিনি বললেন — কি ভাবছ?

আমি বললাম — এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়।

প্রেমানন্দ — তোমাকে একটি অনুরোধ করব — Max-Muller প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা ভারতীয় আর্য্যদের সূর্য্য, চন্দ্র, ঊষা প্রভৃতির বন্দনাকে 'Songs of the Peasants' বলে ব্যঙ্গ করেছেন, অথচ আমরা ভারতীয়রা জানি যে বৈদিক ঋষিরা শুধু শুধু প্রকৃতির মহিমান্বিত রূপ দর্শনে ভাববিহ্বল হয়েই তাঁদের বন্দনা করেন নি, সৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যে পরম স্রষ্টার প্রকাশকে উপলব্ধি করেই আনন্দোচ্ছল আবেগে তাঁরা স্তুতি করেছেন। তাঁরা জড় প্রকৃতির পূজারী ছিলেন না।

ঊষার উন্মেষে মঠে আমার ঘরের পূর্বদিকের জানালা দিয়ে যখন প্রথম আলোকরশ্মি স্ফুট হতে থাকে তখন ইচ্ছা করে, শিশুকালে পিতৃদেবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে যেমন পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পিতৃপুরুষদের নাম স্মরণ ও পাঠ করতাম, তেমনই জীবনসন্ধ্যায় সবিতৃদেব ও ঊষার বন্দনা গান প্রাণ ভরে করি।

আমাদের সান্ধ্যমন্ত্রে আছে,

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥

— বিশ্বভুবন আলোকিত করে তিনি প্রকাশিত হন। সেই বরণীয় পুরুষের ধ্যান নিত্য করি।

জীবন সায়াহ্নে বহু প্রাচীন শাস্ত্র-বাক্য যা ঋষিদের দৃষ্ট ও লিখিত তার প্রমাণাদি পেয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর যা করণীয় তাতে খুব বেশী অবহেলা নাই। সংসারে 'মৃতঃ কোহবা ন জায়তে' — তাই পরজন্মে বিধাতাপুরুষ দয়া করে যদি নরজন্ম সার্থক হবার মত কিছু ভাল ফল দেন উত্তম, নয়তো কিছু করার নেই — like a drift wood কাল সাগরে ভাসা সার!

আমি — আমাদের প্রাচীন ভারতের জীবনধারাই ছিল স্বতন্ত্র। সেযুগে আমাদের তপোবনগুলিই শুধু সামগানে মুখরিত থাকত না, প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারের জীবনচর্চাই ছিল শ্রী, হ্রী ও শুচিতায় মণ্ডিত; ফলে প্রত্যেকটি গৃহই পরিণত হয়েছিল ব্রহ্মাঙ্গনে, প্রত্যেকেরই জীবন ছিল ধর্মের সুরে বাঁধা।

আর আপনি আপনার শিশুকালে পিতা ও পিতামহের সঙ্গে ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে যে উষার তিমির-বিদারী-উদার-অভ্যুদয়কে ব্রহ্মের প্রকাশ ভেবে কলকণ্ঠে স্তুতিগান গাইতেন বা এখনও গেয়ে থাকেন, ঐ পবিত্র চিত্রটিই ছিল প্রাচীন ভারতে আদর্শ ঋষি পরিবারের ছবি।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের যতই নিরলস অধ্যয়ন নিষ্ঠা এবং গবেষণা স্পৃহা থাকুক না কেন, তাঁদের পক্ষে কোনমতেই এই ভারতীয় মানসিকতা পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ ভারতের বেদ-বেদান্ত চর্চার মূলে যদি কোন পাশ্চাত্ত্যবাসীর মনে দুরভিসন্ধি থাকে তাহলে ত কথাই নাই। বেদের নিগূঢ় অর্থের যথার্থ উপলব্ধি তাঁর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। এই অসুবিধা বিভ্রাটের ফলেই তাঁরা বেদোল্লিখিত সূর্য, চন্দ্র, ঊষা, বরুণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে কেবল Natural Phenomenon হিসাবেই দেখেছেন। তাঁদের প্রকৃতিগত গঠন ঐ রকম বহির্মুখ ভাবনাতেই অভ্যস্ত।

অথচ আমাদের সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষিদের শিক্ষা হল, সূর্য, চন্দ্র, উষার ঐ স্থূলরূপটাই সব নয়। সমগ্র জগৎ জুড়ে সীমার মধ্যে অসীম, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের এটা লীলা চলেছে — ঐগুলি সেই ব্রহ্মসত্তারই চিদ্‌বিলাস। তাই আমাদের চোখে সূর্য, চন্দ্র এবং ঊষা হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মদূতী — ব্রহ্ম-ই।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে এই আর্ষ দৃষ্টিভঙ্গী আমরা আশা করতে পারিনা। ম্যাক্সমুলার বেদকে শুধু Songs of the Peasants বলেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তাঁর Chips froma German Workshop নামক বই-এর প্রথম খণ্ডে মন্তব্য করেছেন — The Veda contains a great deal of what is childish and foolish.

আপনার মত একজন স্বধর্মনিষ্ঠ দণ্ডী সন্ন্যাসীর এতে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। আমার মত একজন পরিক্রমাকারীকে যে ঐ রকম একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির প্রগল্‌ভতার 'সমুচিত জবাব' দিতে বলেছেন, এটি আমার কর্তব্য বটে, বাবার কাছেও এই দীক্ষাই আমি পেয়েছি তবুও একটা বড় 'কিন্তু' এসে আমার মনকে পীড়িত করছে। কেবলই ভাবছি, ম্যাক্সমুলারের স্বরূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা। কারণ, আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ যে আগে থেকেই ঐ পণ্ডিত মহোদয়কে প্রাচ্য না পাশ্চাত্ত্যের 'সায়ণাচার্য' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বসে আছেন!

তা হোক, যিনি যেমনভাবে যে ভাষাতেই ম্যাক্সমুলারের স্তুতি রচনা করুন, কোন বেদভক্ত হিন্দুরই তা গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নাই। যে ধরণের মনন, স্বাধ্যায় এবং মানসিকতা থাকলে বেদের অর্থ বুঝা যায়, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের কাছে তা আশা করা উচিত নয়, ম্যাক্সমুলারের কাছে ত মোটেই নয়। কারণ, তাঁর লিখিত Chips from a German Workshop, Physical Religion,Natural Religion ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে, ভারতে খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে সহায়তাই ছিল তাঁর মূল্য লক্ষ্য। তিনি দেখেছিলেন বেদে হিন্দুদের অটল বিশ্বাস; হিন্দুরা আপ্তোপদেশকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করেন। কাজেই বেদের মধ্যে যে মহত্তম ভাবসত্য রয়েছে, তাকে হেয় না করতে পারলে বৈদিক ধর্মের তুলনায় নিতান্ত অসার অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদকে (Doctrine) বেদময় ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। তিনি ভেবেছিলেন, বেদ কেবল 'চাষার গান বা বালকোচিত উন্মত্ত প্রলাপ' ইত্যাদি অপপ্রচারের দ্বারা শিক্ষিত হিন্দুকে যদি কোনমতে বীতশ্রদ্ধ করা যায়, তবেই এদেশে তাঁর প্রিয় খৃষ্টধর্মের অনায়াস প্রচার সম্ভব হবে। এই দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়েই যে তিনি বেদচর্চা করেছিলেন এবং বেদ বিষয়ে বই প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর শ্রীমুখের নিম্নলিখিত উক্তিটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ —

'Under this circumstances it was felt that nothing would be a greater assistance to the missionaries in India than an edition of the Veda.' (Chips from a German Workshop voll)

ম্যাক্সমুলারের বেদচর্চার মূলে ছিল মিশনারীদের ঐ assistance দানের সাধু (!) সংকল্প। এ কেবল

আমার কথা নয়, বিখ্যাত 'আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ' গ্রন্থে সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি শ্রীমৎ *শিবরামকিঙ্কর ভার্গব যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর মত মহাপুরুষও (যাঁকে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মত তত্ত্বদর্শী গুরুবৎ মান্য করতেন) ম্যাক্সমুলারের বেদচর্চার মূলে কি জাতীয় মনোভাব ছিল— সে সম্বন্ধে কি বলেছেন শুনুন —

'খৃষ্টান ভ্রাতারা হিন্দুদের ধর্ম-দুর্গ কিভাবে আক্রমণ করবেন বলে দেবার সময় স্বদেশ ও স্বধর্মপ্রিয় নীতিকুশল মোক্ষমুলার বলেছেন যে বেদভক্ত হিন্দুজাতিকে প্রথমতঃ বুঝাতে হবে যে বর্তমানে হিন্দুধর্ম তদনুরূপ নয়, বর্তমান হিন্দুধর্ম পৌরাণিক ও তান্ত্রিকধর্মের মিলিত মূর্ত্তি। হিন্দুরা যদি ঠিক বেদাদি ধর্মের অনুসরণ করত তা হলে তাদের ধর্ম অনেকটা খ্রীষ্টান ধর্মের অনুরূপ হত। দুঃখের বিষয় নীতিজ্ঞ মোক্ষমুলার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শত সহস্র স্থানে প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসাদি দোষে স্বকীয় উক্তিকে দূষিত করেছেন। যে সকল হিন্দু সন্তান মোক্ষমুলারকে তাঁদের পরম মিত্র বলে বুঝেন, স্বদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতাপেক্ষা মোক্ষমুলারকে আদর করলে প্রকৃত বেদজ্ঞের সম্মান করা হবে যাঁদের এই প্রকার ধারণা, তাঁদের নিমিত্ত নিম্নে মোক্ষমুলারের কতিপয় উক্তি বলছি শুনুন —

(১) It should be shown to the natives of India that the religion which the Brahmins teach is no longer the religion of the Veda though the Veda alone is acknowledged by all as the only divine source of faith. A Hindu who believed only in the Veda would be much nearer to christianity than those who followed the Puranas or the Tantras etc. (Chips from a German Workship Vol 1)

(২) 'I could add other passages particularly from the Brahmans and Upanisads as all confirming father Calmett's idea that the Veda is the best key to the religion of India and that a through knowledge of it, of its strong as well as its weak points is indispensable to the students of religion and more particularly to the missionary who is anxious to make sincere converts.' (Physical Religion)

আর্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের ঐ প্রামাণ্য উক্তিতে আশা করি বুঝতে পারছেন ঐ তথাকথিত 'পাশ্চাত্ত্যের সায়ণাচার্যের' উদ্দেশ্য এবং আশয়টি কি ছিল। বেদ যে কিছুই নয়, সভ্য জাতির এতে শিখবার মত কিছু নাই, বেদ কেবল কতকগুলি আদিম মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের প্রলাপ মাত্র এই বিশ্বাস জন্মিয়ে হিন্দুধর্মকে মসীলিপ্ত করা এবং দলে দলে সকলকে খৃষ্টান করাই ছিল ম্যাক্সমুলারের একমাত্র মতলব। কিন্তু বেদ এবং ধর্ম এই দুটি শব্দের তাৎপর্য অনুধাবন করলেই কোন ধর্ম যে কখন বেদবিরুদ্ধ হতে পারে না এ তত্ত্ব সহজেই বুঝা যায়। কারণ বেদই হল নিখিল মানবজাতির ধর্মের মূল সূত্র — 'বেদোঽখিল ধর্মমূলম্।' বেদবিদ্ পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন —

'ধর্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশ্বমনপেক্ষং স্যাৎ।' (পূর্ব-মীমাংসা দর্শন ১/৩/১)

অর্থাৎ শব্দ বা বেদই ধর্মের মূল, যা বেদবিরুদ্ধ তা ত্যাজ্য। বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, ব্রহ্ম বেদের পর্যায়ন্তর — 'ব্রহ্ম তত্ত্বতপো বেদে ন দ্বয়োঃ পুংসি বেধসি (মেদিনী)। অমরকোষ নামক বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধানেও বলা হয়েছে যে বেদ ও ব্রহ্ম সমার্থক শব্দ — 'বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম'।

একথা অবশ্য সকলে স্বীকার করবেন যে স্বামী বিবেকানন্দ কথিত 'পাশ্চাত্ত্যের সায়ণাচার্য' ম্যাক্সমুলারের

---

***শিবরামকিঙ্কর ভার্গব যোগত্রয়ানন্দ স্বামী** (১৮৫৮-১৯২৫) — অযাচকবৃত্তিধারী শিবকল্প মহোযোগী। পূর্বাশ্রমের নাম — শশিভূষণ সান্যাল। জন্মস্থান বালি, হাওড়া। দীর্ঘকাল বরাহনগর এবং কাশীতে বাস করেন। গুরুর নাম — যোগীরাজ শিবরামানন্দ। আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ ছাড়াও যোগত্রয়ানন্দজীর লিখিত মানবতত্ত্ব ও বর্ণবিবেক, পরলোকতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও শিবার্চনপদ্ধতি। ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ত্ব, গণিতের দার্শনিক রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ। একসময় ইনি পতঞ্জলি-কৃত পাণিনির মহাভাষ্য পড়বার আকুল আগ্রহে কাশীর দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের নিকট গমন করেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করায় যোগত্রয়ানন্দজী অন্নজল ত্যাগ করেন। তখন স্বয়ং পতঞ্জলি আবির্ভূত হয়ে তাঁকে মহাভাষ্যের পাঠ দেন। কথিত আছে এইভাবেই তিনি মহর্ষি গৌতমের কৃপায় একরাত্রির মধ্যে সমগ্র ন্যায়দর্শন আয়ত্ত করেছিলেন। একবার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বেদ ব্যাখ্যা শুনে বলেছিলেন —'আমার ইচ্ছে হয়, কোন নির্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আপনার চরণতলে বসে ঋষিদের শাস্ত্রগুলো একান্ত মনে পাঠ করি। বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নীচু করবে না?'

চেয়ে ভগবান পাণিনিদেব এবং পতঞ্জলিদেব নিশ্চয়ই বেদ রহস্য ভাল করে বুঝতেন। ম্যাক্সমুলার যেখানে বলছেন বেদ অসভ্য এবং ঈষৎ সভ্য মনুষ্যবৃন্দ রচিত অসার কতকগুলি বালকোচিত কবিতা সমষ্টি, সেখানে স্বয়ং পাণিনি এবং পতঞ্জলি বলছেন নিখিল বিশ্বের যাবতীয় প্রজ্ঞাময় সাধু শব্দ মাত্রই বেদ পদবাচ্য অর্থাৎ বেদের প্রতিটি শব্দই সাধু এবং বোদ্ধিঋদ্ধ, প্রতিটি শব্দই মণিবিচ্ছুরিত জ্যোতিকণা —

'বর্ণজ্ঞানং বাগ্বিষয়ো যাত্র চ ব্রহ্ম বর্ততে। সোয়মক্ষরসমাম্নায়ো
বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকবৎপ্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ।'

(পতঞ্জলিকৃত পাণিনির মহাভাষ্য ১/১/২)

ভগবান পাণিনি 'অথ শব্দানুশাসনম্' অর্থাৎ ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উপদেশ দিতে গিয়ে প্রথমেই অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্ ইত্যাদি চোদ্দটি প্রত্যাহার সুত্রের উল্লেখ করেছেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপদেশ দিতে গিয়ে প্রথমেই কেন তিনি বর্ণ বা অক্ষর সমূহের উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন তা বুঝানোর জন্য ভগবান পতঞ্জলির উপরি উদ্ধৃত বচনের অবতারণা। বর্ণজ্ঞানশাস্ত্রই (বর্ণ বা অক্ষর সকল যার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় তার নাম বর্ণজ্ঞানশাস্ত্র) বাক্ বা শব্দের বিষয়, তা হতেই বাক্ বা শব্দের জ্ঞান হয়ে থাকে। আর এই জ্ঞানের স্বরূপ হল — যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে অর্থাৎ যাতে ব্রহ্ম — বেদপুরাণ ইতিহাস সাহিত্য বিজ্ঞানাদি তাবৎ শাস্ত্র নিহিত। এই বাক্ বা শব্দ আসলে 'অক্ষরসমাম্নায়' বা বর্ণসংহতি মাত্র। কারণ, বাক্ বা শব্দকে বিশ্লেষণ করলে বর্ণ বা অক্ষর ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। ভগবান পতঞ্জলি তাই বলেছেন অক্ষরসমাম্নায়ই অর্থাৎ বর্ণসমাহারই বাক্য বা শব্দের উপাদানকারণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেও ঐ পতঞ্জলি বাক্যেরই প্রতিধ্বনি পাই — 'বর্ণপৃক্তঃ শব্দোবাচ উৎপত্তিঃ।'

আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল, সৃষ্টি স্থিতি লয় বা আবির্ভাব — এককথায় স্থিতি ও তিরোভাবাত্মক এই জগৎ অনাদিকাল হতেই আছে এবং থাকবেও অনন্তকালের জন্য। যে চন্দ্র সূর্য এখন দেখছি, তা পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকবে। সকলই প্রবাহরূপে নিত্য। তাই বেদের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে পূর্বোদ্ধৃত বচনে পতঞ্জলিদেব বলেছেন, চন্দ্রতারকবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্‌সমাম্নায়ই বেদ বা ব্রহ্ম। বিশ্বজগৎ শব্দ-ব্রহ্মেরই বিবিধ পরিণাম, অনাদিনিধন শব্দব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়ে থাকেন,

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।। (বাক্যপদীয়)

সারসিদ্ধান্ত হল — বেদ অনন্ত জ্ঞানের আকর, ভারতীয় সংস্কৃতির মণি-মঞ্জুষা। চারিবেদের মধ্যে কোন কালগত পৌর্বাপর্ব নাই, এগুলি যুগপৎ আবির্ভূত হয়ে থাকে। কিন্তু ম্যাক্সমুলার বোধ হয় সমাধিবান ঋষিদের চেয়েও নিজেকে বড় জ্ঞানী ভাবতেন, তাই তাঁর অপরূপ সিদ্ধান্ত হল — ঋগ্বেদই আসল, অপর তিনটি বেদ পরে রচিত। কোন বেদের মধ্যেই কোন উচ্চ ভাব নাই। প্রাচীন হিব্রুজাতির আদিম অবস্থায় মৌখিক কিছু নীতিবাক্য বা অনুশাসনকে বাইবেল বললে তা যেমন হাস্যকর, সাম যজু এবং অথর্ববেদকেও বেদ নামে অভিহিত করা তেমনি হাস্যকর।

'But for our own purposes vig., for teaching the earliest growth of religious ideas in India, the only important, the only real Veda is the Rig Veda...The other so-called Vedas which deserve the name of Veda no more than the 'Talmud deserves the name of Bible', (Chips from a German Workshop Vol 1)

এখানে তাঁর 'for our own purposes' এবং 'so called' শব্দ কয়টি লক্ষ্য করুন। আমাদের বেদের গায়ে সুকৌশলে কালি ছিটিয়ে তাঁদের নিজস্ব অভিসন্ধিপূরণের জন্য আগাগোড়া চেষ্টা করে গেছেন। Talmud শব্দটিতে হিব্রুদের আদিম অবস্থায় কিছু মৌখিক অপরিণত উপদেশ বাক্য এবং সামাজিক বিধিবিধানকে বুঝায়। আমি শ্রুতিবাক্য ও ঋষিবাক্যের প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি যে বেদ পরিপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার অথচ ম্যাক্সমুলার ঋষিদের উপলব্ধ শাস্ত্র বেদচর্চার অভিনয়টি বজায় রেখে সেই ঋষিবাক্য শ্রুতিবাক্যকেই অমান্য করেছেন। শুধু অমান্য করেন নি, তাকে হেয় করবার জন্য সব রকম চেষ্টাই করেছেন। তিনি যতবড় বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতই হোন না কেন, আমি একথা বলতে বাধ্য যে, যেরকম বেদবিৎ আচার্যের কাছে, যে

ঐতিহ্যানুসারী (Traditional way) আর্ষ পদ্ধতিতে বেদ অধ্যয়ন করলে বেদের অর্থ বোধগম্য হয় তা তিনি করেন নি, তাঁর করবার প্রয়োজনও ছিল না কারণ তাঁদের Purposes' সিদ্ধির জন্য যেটুকু ভাসা-ভাসা পড়ার দরকার তা তিনি পড়েছিলেন। যদি প্রকৃত নিয়মে বেদাধ্যয়ন করতেন তাহলে তাঁর একথা অজানা থাকার কথা নয় যে, বেদের প্রতিটি মন্ত্রই যুক্তিসিদ্ধ এবং উপলব্ধি জাত। তিনি যে ঋগ্বেদে দয়া করে সামান্য মূল্য দিয়েছেন সেই ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেই আছে,

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বশক্তিমান্ যজ্ঞ বা পরব্রহ্ম হতেই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ উৎপন্ন হয়েছে, মহর্ষি দয়ানন্দের মতে বেদমাত্রই যখন গায়ত্র্যাদি ছন্দোন্বিত তখন এখানে ছন্দঃ শব্দের দ্বারা অথর্ববেদকেই বুঝাচ্ছে। ঋগ্বেদের আর একটি মন্ত্রে আছে —

ইন্দ্রায় সামগায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যব॥ (ঋগ্বেদ, ৬/৭/১)

এই মন্ত্রের অর্থ হল — হে উদ্গাতৃবর্গ! হে সামগ! সামবেদবিদ্ ব্রাহ্মণসমূহ। তোমরা বিপ্র (মেধাবী) বৃহৎ (মহৎ) ধর্মকৃৎ বিদ্বান্ ও স্তুত্য (স্তবের যোগ্য) ইন্দ্রের (ব্রহ্মের) জন্য বৃহৎ নামক সামগান কর।

ঐ মন্ত্র দুটিতে অন্যান্য বেদের নামোল্লেখ থাকায় একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে অন্যান্য বেদ ঋগ্বেদের পরে রচিত হলে ঋগ্বেদে তাদের নাম থাকত না।

এই স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ বলেন যে ঋগ্বেদের সৃষ্টি আগে হয়েছে এবং অন্যান্য বেদ পরে রচিত তাহলে সত্যের খাতিরে রূঢ় শোনালেও আমরা বলতে বাধ্য যে তিনি বেদ বুঝেন নি। পক্ষপাতদুষ্ট অন্তঃকরণে বেদের মর্ম বুঝাও যায় না।

বিদেশী হয়েও অতুল অধ্যবসায়ের সঙ্গে ম্যাক্সমুলার বেদের চর্চা করেছেন এতেই ভারত-প্রেমিক বিবেকানন্দ গদগদ। তাই ভাবপ্রবণ চিত্তে তিনি ম্যাক্সমুলারকে 'ভারত-হিতৈষী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছিলন। কিন্তু একটু ধীর মস্তিষ্কে ম্যাক্সমুলারের রচিত গ্রন্থগুলি সব এক সঙ্গে পড়লে বুঝা যায় যে তাঁর বই পরস্পর বিরোধী উক্তি বিপ্রলিপ্সা এবং ছলোক্তিতে পরিপূর্ণ। বঞ্চনার ইচ্ছা, নিজ জ্ঞাত অর্থ বা শাস্ত্রনিহিত প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ না করা এবং স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভুল অর্থ যোজনা করার নাম বিপ্রলিপ্সা। আর আমাদের শাস্ত্র 'ছলোক্তি'র সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন — 'অভিপ্রায়ান্তরেণ্ প্রযুক্তস্যার্থান্তরং প্রকাশ্য দূষণং ছলম্' অর্থাৎ অন্য অভিপ্রায়ে (যথা, খৃষ্টধর্মের প্রচার ও পুষ্টির জন্য) প্রযুক্ত শব্দের অর্থান্তর কল্পনার (যেমন বেদকে চাষার গান ইত্যাদি বলা) নাম ছল।

তাঁর কিছু স্ববিরোধী উক্তির উদাহরণ দিলেই এই ভারত-হিতৈষী মহোদয় ব্যক্তিটি কি রকম সরলপ্রাণ ছিলেন তারও পরিচয় পাবেন। দার্শনিক শোপেনহায়ার* যখন উপনিষদের অপেয় রসের স্বাদ পেয়ে বললেন — 'উপনিষদ পাঠের মত লাভজনক (Rewarding) এবং আত্মোন্নতিকারী (elevating) আর কিছু জগতে নাই। ইহা জীবনে আমাকে শান্তি দিয়াছে (peace)। মরণেও এনে দিবে তৃপ্তি।' সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্সমূলার বাণী দিলেন — 'শোপেনহায়ারের ঐ কথাগুলির যদি সমর্থন লাগে, তাহা হইলে বহু দর্শনগ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠে নিবেদিত 'আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহা দিতে আমি নিজেই প্রস্তুত আছি।'

অর্থাৎ যে বেদকে তিনি ইতিপূর্বে 'চাষার গান' 'বালকোচিত উন্মত্ত প্রলাপ' ইত্যাদি বলে নিন্দা করেছেন, সেই বেদবাণীকেই এখানে শোপেনহায়ারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'Rewarding', 'elevating' এবং 'শান্তিপ্রদ'

---

* **আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) ঃ—** জার্মানের বিখ্যাত দার্শনিক, কিছুদিন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। এই নিঃসঙ্গ দার্শনিকের একটি কুকুর ছাড়া আর কোন সঙ্গী ছিল না। কুকুরটির নাম রেখেছিলেন 'The Soul'. তাকে নিয়েই তিনি আমৃত্যু একটি হোটেলের ফ্ল্যাটে জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, দান্তে যে নরকের বর্ণনা দিয়েছেন এই বাস্তব পৃথিবী দেখে মানুষের সম্বন্ধে সেই রকমই ধিকৃত ধারণা জন্মে। তাঁর মতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নেকড়ের সম্পর্কের মত — 'Homo Homini Lupus'. 'Die welt als wille und Vorsetelling' (The World as Will and Idea) নামক তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে তিনি অনেক যুগান্তকারী তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। শেষ জীবনে উপনিষদ পড়ে এই চির বিক্ষুব্ধ দার্শনিক শান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই উপনিষদগুলি সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য — 'The Upanishads have given me the Solace of life.')

বলতে তাঁর আপত্তি নাই। 'সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে — (বেদের সৌভাগ্যই বলতে হবে!) — তিনি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। এখানে দেখুন, নিন্দা এবং বন্দনা — দুটোতেই তাঁর সমান আবেগ, সমান উৎসাহ! ইনিই আবার অন্যত্র কেমন অবলীলাক্রমে কি কথা বলেছেন দেখুন — 'It is easy to say it before an audience like this, but I should not be afraid to say it before an audience fo Brahmans, Buddhists, Parsis and Jews that there is no religion in the whole world which in simplicity in purity of purpose, in charity and in true humanity comes near to that religion which christ taught to his disciples' (Natural Religion)

এইটাই তাঁর প্রাণের কথা। আর প্রাণের কথা বলেই বৌদ্ধ, পারসিক এবং ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছাড়াও বৈদিক ধর্মের অনুসরণকারী বেদভক্ত 'ব্রাহ্মণদের' সামনেও খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে অর্থাৎ বৈদিক ধর্মের চেয়ে খৃষ্টধর্ম যে মহত্তর সে কথা বলতে তিনি ভয় পান না বলছেন। এখানে তিনি সিন্টোধর্ম, তাও ধর্ম, ইসলাম বা জৈনধর্মের নাম উল্লেখ করেন নি, তাঁদের আয়োজিত সভায় 'যখন যেমন, যেখানে যেমন' বিদ্যার এই সিদ্ধাচার্য আবার কী বলতেন সেটা অবশ্যই গবেষণার বিষয়!

স্বর্ধমের প্রচার-লিপ্সু কূট অভিসন্ধিপরায়ণ এই রকম কোন বিদেশী পণ্ডিতের বেদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্যকে উপেক্ষা করাই উচিত। কূপমণ্ডুককে কূপের বাইরে কোন ভূমি আছে বুঝানো যেমন দুষ্কর তেমনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কোন মানুষকেও ঋষিগণ কূটস্থ হয়ে বোধির সাহায্যে যে পরম সত্য অনুভব করেছিলেন বেদের সেই শাশ্বত সত্যের মন্ত্ররূপ বুঝানোও তেমন দুষ্কর বলে আমি মনে করি।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ না করলে একদেশদর্শী হয়ে পড়ব। শুধু ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি বিদেশী বিধর্মী পণ্ডিতদেরকেই দোষ দিলে চলবে না। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের সরিষার মধ্যেই ভূত আছে? স্বদেশের অনেক বেদভাষ্যকারই যে বেদের অর্থ করতে গিয়ে অনর্থ এবং কদর্থ করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে *সায়ণাচার্য এবং মহীধরের** নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সায়ণাচার্য স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত হলেও

---

* **সায়ণাচার্য** — আবির্ভাবকাল খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দী। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়, এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত হলেও তাঁর জন্মসাল সম্বন্ধে নিশ্চিত নন। তাঁর পিতার নাম মোয়ন, মাতার নাম শ্রীমতী এবং গুরুর নাম শ্রীকণ্ঠ। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন বিখ্যাত পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ভোলানাথ। কাঞ্চীভরমের এক শিলালিপি এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাদির 'পুষ্পিকা' হতে জানা যায় যে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের (বিদ্যানগর) রাজা বুক্কের মৃত্যুর পর তাঁর শিশুপুত্র দ্বিতীয় হরিহরের প্রতিনিধিরূপে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। 'অলঙ্কার সুধানিধি' নামক স্বরচিত গ্রন্থে বিভিন্ন অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে যে শ্লোকটি তিনি রচনা করেছেন তাতে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাই জানা যায়। জানা যায় যে, তিনি বুক্ক, কম্পন, দ্বিতীয় সঙ্গম এবং দ্বিতীয় হরিহর এই চারজন রাজারই মন্ত্রী ছিলেন। তৎকালে তিনি তিরুভেলমের যুদ্ধে চম্পাদি চোলরাজগণকে পরাজিত করেন, দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের কবল হতে রাজ্য রক্ষা করেন এবং গরুড় নগর নামক একটি রাজ্য আক্রমণ করে জয় করে নেন। ঋগ্বেদ ভাষ্য, তৈত্তিরীয় সংহিতা ভাষ্য, আশ্বলায়ণাদি সূত্র ভাষ্য, সাম, যজু ও অথর্ববেদের ভাষ্য ছাড়াও সুভাষিত সুধানিধি, ধাতুবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্তসুধানিধি, যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থ সায়ণকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঋগ্বেদের সায়ণকৃত বেদানুক্রমণিকায় দেখা যায় তিনি শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যই প্রথম রচনা করেন। অনেক পণ্ডিতেরই মতে তিনি ঋগ্বেদ এবং তৈত্তিরীয় ভাষ্য শেষ করে যেতে পারেন নি, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরাই ঐ ভাষ্যের অবিশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করেন। তাই ঐ ভাষ্যগুলির পূর্বভাগে যে রকম গাম্ভীর্য এবং প্রবীণতার পরিচয় পাওয়া যায়, ভাষ্যের উত্তরভাগে তা দেখা যায় না। ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত এক তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, সায়ণ রাজকার্যে অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় বেদভাষ্য রচনার জন্য যথাক্রমে পণ্ডিত নারায়ণ বাজপেয়ীজী, নরহরি সোমযাজী এব পন্টরী দীক্ষিত প্রভৃতিকে নিযুক্ত করেছিলেন। (Rao Bahadur R. Narsinghachar (বাঙ্গালোর) রচিত প্রবন্ধাবলী, Indian Antiquary Vol XIV, 1916, January Pg-1-6 এবং February Pg-17-24 এবং কাশী কামরূপ মঠ হতে প্রকাশিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের জীবনমুক্তি-বিবেক নামক গ্রন্থের ভূমিকাদি দ্রষ্টব্য।

** **মহীধর আচার্য** — যজুর্বেদের ভাষ্যকার। তাঁর ভাষ্যের নাম — বেদদীপ। আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দী। জন্মস্থল — বারাণসী, পিতার নাম — আচার্য রামভক্ত এবং তাঁর শিক্ষাগুরুর নাম পণ্ডিত রত্নেশ্বর মিশ্র। ইনি যে সায়ণ, মাধব এবং উবটাচার্যের পরবর্তী তা তাঁর যজুর্বেদের ভাষ্যারম্ভ পড়লেই বুঝা যায়, তিনি লিখেছেন — প্রণম্য লক্ষ্মীং নৃহরিং গণেশং ভাষ্যং বিলোক্যৌবটমাধবীয়ম্। যর্জুমনুনাং বিলিখামি চার্থং পরোপকারায় নিজেক্ষণায়। কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র ভাষ্য, কাত্যায়ন শুল্বসূত্র ভাষ্য, ঈশোপনিষদ ভাষ্য, রামগীতা টীকা, বিষ্ণুভক্তিকল্পলতাপ্রকাশ, এবং একাক্ষরকোষাদি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে মহীধরের নাম পণ্ডিতমহলে প্রসিদ্ধ। মন্ত্রমহোদধি নামক গ্রন্থেরও তিনি সঙ্কলক। লক্ষণাচার্যের প্রসিদ্ধ সারদাতিলকের মত এটিও একটি সংগ্রহ গ্রন্থ।

তিনি নিজে রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায় বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত বিভিন্ন বেতনভূক পণ্ডিত দিয়ে বেদ ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ঐ পণ্ডিতরা যে যাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও সংস্কারমত বেদার্থ করতে গিয়ে অনেক কদর্থ করে গেছেন।

শুধু বিদেশী পণ্ডিতরাই নন, স্বদেশী পণ্ডিতরাও পবিত্র বেদমন্ত্র তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবমূর্ত্তিকে কালিমা লিপ্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ — 'আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানঃ' ইত্যাদি যে মন্ত্রটি অধ্যাহার করেছেন তা আলোচনা করে দেখাচ্ছি।

ঐ মন্ত্রটি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৫ নম্বরের সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র। মন্ত্রের দ্রষ্টা বা ঋষি — হিরণ্যস্তূপ। দেবতা — সবিতা। ছন্দঃ জগতী। ব্রাহ্মণদের নিত্য উচ্চারিত এই মন্ত্র ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবন্দনাকালে সূর্যোপস্থানের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়। এর প্রকৃত গদ্যরূপটি হল — সবিতা কৃষ্ণেন রজসা আ বর্ত্তমানো অমৃতং মর্ত্যঞ্চ নিবেশয়ং ভুবণানি পশ্যন্ হিরণ্যয়েন রথেন আয়াতি।

সায়ণাচার্য বা তদ্‌নিযুক্ত পণ্ডিতমশাইরা এই ঋকের ভাষ্য করেছেন — সবিতা সূর্যঃ কৃষ্ণেন রজসা কৃষ্ণবর্ণেন লোকেন। অন্তরীক্ষলোকো হি সূর্যাগমনাৎ পুরা কৃষ্ণবর্ণো ভবতি। তেনান্তরীক্ষ মার্গেনাবর্তমানঃ পুনঃপুনরাগচ্ছন্ অমৃতং দেবং মর্ত্ত্যং মনুষ্যং চ নিবেশয়ন্ স্ব স্ব স্থানেঽবস্থাপয়ন্। ... যথোক্তগুণোপেতঃ সবিতা দেবো ভুবনানি পশ্যন্ অবেক্ষমানঃ। প্রকাশয়ন্নির্তর্থঃ। হিরণ্যয়েন সুবর্ণ নির্মিতেন রথেনায়াতি অস্মাৎসমীপমাগচ্ছতি ইত্যাদি। এর অর্থ হল, 'সবিতা সূর্যদেব কৃষ্ণবর্ণ লোকের দ্বার অন্তরীক্ষমার্গে বর্তমান হয়ে পুনঃ পুনঃ আগমনপূর্বক দেবতা ও মনুষ্যকে স্ব স্ব লোকে অবস্থাপিত করেন। ...যথোক্তগুণযুক্ত সূর্যদেব লোকসমূহকে প্রকাশ করতে করতে সুবর্ণনির্মিত রথের দ্বারা আমাদের নিকট আগমন করেন ইত্যাদি।

মজা দেখুন, মূল ঋক্‌মন্ত্রের 'আ' উপসর্গটি পৃথকভাবে আছে, 'বর্তমান' শব্দের সঙ্গে যুক্ত নাই। সায়ণ বর্তমানঃ শব্দের সঙ্গে আ যুক্ত করে সূর্যের আবর্তন অর্থাৎ সূর্য যে গতিশীল তা প্রতিপন্ন করেছেন। ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা একে পঞ্চানন্দ, তার উপর ধূনার গন্ধ সদৃশ এই সায়ণভাষ্য তাঁদেরকে বলবার সুযোগ দিয়েছে যে বৈদিক ঋষিদের জ্যোতিষ বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। কারণ বিজ্ঞানের মতে সূর্যের গতি নাই, অথচ বেদ বলছে সূর্যের গতি আছে, কাজেই বেদবাক্য অভ্রান্ত নয়।

সায়ণের ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত ঐ ভাষ্যে তাঁদের হাতে বেদ-নিন্দার রসদ তুলে দিয়েছে। তাঁরা সায়ণের তূণ থেকেই যে বাণ সংগ্রহ করেছেন, তারই আঘাতে আপনার মত বেদপ্রাণ মানুষগুলি কষ্ট পাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি?

যে বৈদিক ঋষিরা ঘোষণা করেছেন — 'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি ব্যোম্নি সচলো তিষ্ঠতি' — অর্থাৎ সূর্য চিরস্থির আছেন, পৃথিবীই আপন কক্ষপথে তাকে পরিক্রমা করে চলেছেন, সেই পরমবিজ্ঞানীরা কখনই সূর্যকে গতিশীল বলতে পারেন না, এইটাই ধ্রুব সিদ্ধান্ত ; তাছাড়া ঐ ঋক্‌মন্ত্রের অর্থও তা নয়। বেদের প্রতিটি শব্দই এমনই সুনির্বাচিত এবং সুপ্রযুক্ত যে প্রতিটি শব্দেরই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক — এই তিন রকম অর্থ হয়।

প্রকৃতপক্ষে 'আ' আর 'বর্তমানো' এই দুই পদের পৃথক অবস্থিতিই সূর্যের অচঞ্চল ভাবই দ্যোতনা করে। 'আ' উপসর্গের দুটি অর্থ — পর্যন্ত এবং সর্বতোভাবে। 'বর্তমানঃ' অর্থ বিদ্যমান। স্থূল আধিভৌতিক অর্থ গ্রহণ করে সূর্যকে যদি জড় সূর্যও বলে ধরা হয়, তাহলে তিনি যে সর্বতোভাবে (আ) বিদ্যমান (বর্তমানো) আছেন, তিনি চিরস্থির, অন্যান্য গ্রহাদির মত তিনি ঘুরে বেড়ান না, এই ভাবটিই প্রকট হয়। আর এর আধ্যাত্মিক অর্থ — জগৎ প্রসবিতা চিদ্ সূর্য সৃষ্টির আদি হতে শেষ পর্যন্ত, ব্রহ্মাদি অমানব হতে কৃমিকীট পর্যন্ত প্রতি বস্তুতে নিত্য বর্তমান আছেন, আধিদৈবিক অর্থ ধরলে যেখানে অর্থ হয় — তিনি অন্ধকারময় অন্তরীক্ষ্যলোকে বিদ্যমান থেকে সংসারে আলোক বিকীরণ করছেন, সেখানে আধ্যাত্মিক অর্থ হবে — তিনি এই ধূলিধূসরিত ধরণীর মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য সব বস্তুর মধ্যেই সর্বতোভাবে অবস্থিত থেকে প্রতিটি জীবের হৃদয় জ্ঞানের আলোকে বিকীরণ করে চলেছেন।

বলা বাহুল্য, বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থই গ্রহণীয়। কারণ সমাধিবান ঋষিরা উপলব্ধির উত্তুঙ্গ চরমভূমিতে উঠে বেদমন্ত্র দর্শন করেছিলেন। তাঁরা দর্শন করেছিলেন বলেই ঋষি — ঋষ্ ধাতু দর্শনে। ঋষিরা কেউ বেদমন্ত্রের কর্তা নন, তাঁরা দ্রষ্টামাত্র — ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্ত্তারঃ।

সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় উদ্দিষ্ট মন্ত্রে ঋষিরা সূর্য শব্দ ব্যবহার করেন নি, বলেছেন — 'সবিতা' অর্থাৎ জগৎ প্রসবিতা। জড় সূর্য কি ত্রিজগৎ সৃষ্টি করেছেন? কাজেই ঋষিরা এই মন্ত্রে গতি বা স্থিতি কোন বিষয়ে কিছু বলেন নি। তাঁরা আনন্দবিহ্বল চিত্তে সেই সচ্চিদানন্দেরই বন্দনা গান করেছেন।

মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'যাতি' ক্রিয়ার সঙ্গে 'আ' যুক্ত করলেও সূর্যের গতি প্রতিপন্ন হয় না। বৈদিক শব্দ বর্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন নয়, বৈদিক ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই বৈদিক শব্দের অর্থ বুঝতে হয়। সেই দৃষ্টিতে এর স্থূল অর্থ সূর্যের রশ্মি আমাদিগকে প্রাপ্ত হয়। এর আধ্যাত্মিক অর্থ — উৎক্রমণের পর সাধকের আত্মা (দেবো) সেই হিরন্ময় সূর্যকে প্রাপ্ত হয়। আর 'যাতি' পদের অর্থ যদি গমন অর্থ ধরা হয়, তবুও সূর্যের গমনাগমন বুঝায় না, ঐ মন্ত্রের 'দেবো যাতি' এর অর্থ দেবঃ (মলাদিবিনির্মুক্ত আত্মা) যাতি অর্থাৎ হিরন্ময় মণ্ডলে গমন করেন।

এটি গভীর অনুধ্যানের বিষয়। তত্ত্বটি পরিস্ফুট করার আগে 'নিবেশয়ন্ অমৃতং মর্ত্ত্যং চ' এই মন্ত্রাংশটিকে একটু বিচার করে দেখা যাক্। এর প্রচলিত অর্থ সেই সবিতা মরণশীল জীব এবং অমর দেবতাগণকেও অমৃত দান করেন। জড় সূর্যের সাধ্য কি যে সে সকলকে অমৃত দান করবে? প্রকৃত অর্থ হল, দেবতা বা মানুষ তাঁকে প্রাপ্ত হলে তবেই অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমার এই অর্থই যে ঠিক তা মন্ত্রের তৃতীয় অংশ 'ভুবনানি পশ্যন্' দ্বারা সমর্থিত হয়। বেদের আধিভৌতিক অর্থ গ্রহণ করে সবাই বুঝে বসে আছেন যে, সূর্যের প্রকাশে সকল ভুবন প্রকাশিত হয়। সূর্যের উদয় হলেই যে সব কিছু আলোকিত হয়, এ ত সকলের জানা কথা। এ এমন কি নূতন তত্ত্ব যে বৈদিক ঋষিকে তা ঘোষণা করতে হবে?

'পশ্যন্' শব্দের সর্বজনবিদিত অর্থ হল — দেখিয়া। ভুবনানি পশ্যন্ — ভুবনকে দেখিয়া। জড় সূর্য কি সব কিছুরই দ্রষ্টা? প্রকৃত অর্থ, বৈদিক ঋষি এখানে বলছেন, জগৎ স্রষ্টা চিদ্-সূর্য অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এবং সর্বতোচক্ষুঃ। প্রত্যেকের বাহ্যাভ্যন্তরের কোন কিছুই তাঁর অপরিজ্ঞাত নয়। চৈতন্যস্বরূপে সেই অন্তর্যামী পুরুষ সকলের প্রকাশ্য এবং গোপন কর্মের প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

মন্ত্রের মনোরম উপসংহার — 'হিরণ্যয়েন রথেন আ যাতি, এই মন্ত্র পড়ে বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝবে যে, বুঝিবা এখানে সূর্যের স্বর্ণনির্মিত রথের কথাই বলা হল। সায়ণও এর অর্থ করেছেন, হিরণ্যয়েন সুবর্ণনির্মিতেন রথেন আয়াতি অস্মাৎ সমীপমাগচ্ছতি। বলা বাহুল্য, এটি সম্পূর্ণ কদর্থ। এর নিগূঢ় অর্থ হল — এখানে আণবমল, মায়িকমল, কর্মমল প্রভৃতি (মর্ত্ত্যং চ) মুক্ত হয়ে আত্মার ঊর্ধ্বরতির কথা বলা হয়েছে। আত্মা চলেছেন ঊর্ধ্বের অভিসারে (অমৃতং প্রাপ্তির পথে)। আমাদের দৃষ্টি এই ভূতাকাশের অন্তরালে সূক্ষ্মাকাশ, চিদাকাশ, দহরাকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ অতিক্রম করে আত্মা চলেছেন হিরণ্যাকাশে হিরণ্যসূর্যে মিলিত হতে। Simultaneously তাঁর বুদ্ধি পরিণত হচ্ছে যথাক্রমে প্রজ্ঞায়, প্রজ্ঞা সংবিদে, সংবিদ ঋতম্ভরায়, ঋতম্ভরা বোধিতে, বোধি বিশোকাতে, বিশোকার পর্যাবসান ঘটছে জ্যোতিষ্মতী-তে।

রথের অর্থ carrier, বাহক বা মাধ্যম। জ্যোতিষ্মতী প্রজ্ঞাকেই এখানে বলা হয়েছে রথ। এই হিরন্ময় রথকেই আশ্রয় করে জীবাত্মা হিরণ্যাকাশের হিরণ্যসূর্য অর্থাৎ ভর্গ, ভর্গমণ্ডলের ভর্গতেজে মিলিত হন। এইখানেই এসেই জীবের চিদ্-সূর্যে নিত্যস্থিতি— নিত্যকালের উপস্থান অর্থাৎ উত্তরণ।

এইভাবে জীবাত্মার মহাচেতন সমুত্থানের রহস্যটি ঐ ঋকে বিবৃত হয়েছে বলেই মন্ত্রটি সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ অর্থাৎ প্রয়োগ হয়।

অতএব সমগ্র মন্ত্রটির অন্বয় সহ প্রকৃত ব্যাখ্যা দাঁড়াল — সবিতা (চিদ্-সূর্যঃ বা ভর্গঃ) আকৃষ্ণেন (আকর্ষণকারী শক্তি দ্বারা) রজসা (সূর্যাদি লোক সহ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে) বর্তমানঃ (বিদ্যমান) সন্ মর্ত্ত্যং (মর্ত্ত্যজীবং) নিবেশয়ন্ (অবস্থাপনং, ধারণং কৃত্বা) অমৃতং (মোক্ষসাধকব্রহ্মজ্ঞানং) দদাতি। দেবো (মলাদি বিনির্মুক্ত জীবাত্মা) চ হিরণ্যয়েন রথেন (জ্যোতিষ্মতীপ্রজ্ঞারূপা রথেন) আ যাতি (তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, তাঁহাতে উত্তরণ ঘটে)।

এইভাবেই বেদের মন্ত্র বুঝতে হয়। আমার এই ভেবে দুঃখ হয় যে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা নিতান্ত একদেশধর্মী না হলে, বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝার মত মানসিকতা এবং যোগ্যতা তাঁদের না থাকলেও তাঁরা যদি

প্রতিটি মন্ত্রের মধ্যে যে কাব্যগত সৌন্দর্য, চারুতা এবং রসমধুর কারুকলা আছে, কেবল সেইটুকুই যদি দয়া করে লক্ষ্য করতেন, তাহলেই আমার স্থির বিশ্বাস — তাঁরা চমৎকৃত হতেন, 'চাষার গান' ইত্যাদি অসংবদ্ধ প্রলাপ বকার দুঃসাহস তাঁদের হত না। যেমন ধরুন, আপনার উদ্ধৃত যে মন্ত্রটির আমরা এতক্ষণ ধরে ধর্মালোচনা করলাম, সেটিতে শ্লেষালঙ্কারের প্রয়োগ আছে। বাক্য মধ্যে একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বুঝালে সাধারণতঃ শ্লেষালঙ্কার হয়। আমি মন্ত্রাংশগুলির অর্থবিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছি যে প্রতি শব্দই আধিভৌতিক আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থের দ্যোতক। মন্ত্রটিতে শ্লেষের ব্যঞ্জনা সমস্ত বাক্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকায় একটি অপূর্ব বাক্যগত শ্লেষেরও সৃষ্টি হয়েছে। সেই স্থলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সূর্য যেমন স্বীয় আকর্ষণ শক্তির দ্বারা (আকৃষ্ণেন রজসা) পরিভ্রাম্যমান পৃথিবী আদিকে স্ব স্ব কক্ষপথে গতিশীল রেখেও স্বধামে নিয়ত বর্তমান, তেমনি সেই চিদ্-সূর্য (সবিতা) স্বীয় তেজের দ্বারা সমগ্র লোক লোকান্তরকে ধারণ করেও স্বধামে স্বমহিমায় নিত্য বর্তমান আছেন, তিনিই সকলকে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতের সকলেই জ্যোতিষ্মতী প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রাপ্ত হন।

অপরের কথায় অনাবশ্যক দুঃখ আহরণ না করে, আসুন আমরা ঋষিদের অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা পরীক্ষিত সেই মহাসত্য বেদবাণীরই অনুধ্যান করি, তাতেই আমাদের জীবনের কৃতকৃত্যতা। তাহলেই আমাদের আর Like a drift wood' কাল সাগরে ভাসতে হবে না।

বাঃ! চমৎকার! ম্যা'মুলার এর নগ্ন মুখোশ আপনি ভাল ভাবেই খুলে দিয়েছেন। হঠাৎ না শুনা কণ্ঠস্বরে আমরা চমকে উঠলাম। ঘুরে দেখি নর্মদা মন্দিরের পুরোহিতমশাই। তিনি বলতে লাগলেন — বেদের উপর সায়ণ মহীধর প্রভৃতি যেরকমভাবে বিকৃত ভাষ্য করেছিলেন, তার উপর সেগুলিকে অবলম্বন করেই ম্যা'মুলার বেদভক্তের অভিনয়ে বেদভাষ্যের যথেচ্চ বিকৃতি ঘটিয়েছেন। সায়ণ মহীধরাদি মূলতঃ ছিলেন বেদপ্রেমী; তাঁরা সজ্ঞানে বেদের মহিমা ক্ষুণ্ণ করার ইচ্ছায় নিশ্চয় ভাষ্য রচনা করেননি। বেদের যৌগিক অর্থ গ্রহণ না করে, আপনার ভাষায় 'আধিভৌতিক' অর্থাৎ স্থূল অর্থ গ্রহণ করার ফলেই বেতনভুক বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ভাষ্য রচিত হওয়ায় যে অর্থান্তর ঘটেছে আপনি তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। অন্যদিকে ম্যা'মূলার খৃষ্টধর্মের একজন মিশনারী মাত্র। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ এবং জার্মানি সরকার ম্যা'মূলারকে বিনাভাড়ায় থাকবার জন্য পুরস্কার হিসাবে বাসস্থানও দান করেছিলেন। সত্যিই ম্যা'মুলার আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করে গেছেন। সন্ধ্যা মন্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আপনি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করায় আমার আনন্দের অবধি নেই।

— Max Muller সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই। খৃষ্টধর্মের মহিমা খ্যাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ইচ্ছা করেই বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং অনুবাদাদি প্রচার করে গেছেন। এই উদ্দেশ্যেই Lord Macaulay নিজের উদ্যোগে তাঁকে মিশনারী হিসাবে এদেশে এনেছিলেন। না — Max Muller কোন বেইমানি করেন নি। এ কাজ যে তিনি ভালভাবেই সম্পাদন করেছিলেন, Life and Letters of Frederck Max Muller নামক গ্রন্থটি পড়লেই তার প্রমাণ পাবেন। এই বই এ দেখা যায়, তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রীকে একখানি পত্রে লিখছেন — 'This edition of mine and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India – it is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand years.'

সনাতন বৈদিক ধর্মকে Uproot বা নির্মূল করা যায় না, ম্যা'মুলারও পারেন নি, তবে তাঁর সেই অপচেষ্টার জন্য যে ইংরাজ সরকারের অঢেল দাক্ষিণ্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন, Rev. Edward Bon Veric D.D. নামক ম্যা'মুলারের এক বন্ধুর একখানি চিঠিই তার প্রমাণ! ঐ বন্ধু ম্যা'মুলারকে লিখেছিলেন, "Your work will form a new era in the efforts for the convention of India and Oxford will have reasons to be thankful for that by giving you a home, it will have facilitated a work of such primary and lasting importance for conversion of india."

পুরোহিতমশাই নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরের দিকে গেলেন। আমরাও একে একে নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে বাদ্য ভাণ্ড সহকারে খুব ঘটা করে দেবী নর্মদা ও মহাদেবের পূজা সাঙ্গ

হল  একসঙ্গে এতখানি পথ হেঁটে এলেও আমাদের শরীর খুব সুস্থ বলে মনে হল। কারো শরীরে কোন ব্যথা বেদনা নেই বললেই চলে।

পুরোহিতমশাই বললেন — হোসেঙ্গাবাদে স্কুল, দোকান, বাজার, তিন চারটি ধর্মশালা এবং দুটো বড় সদাবর্ত আছে  সেইজন্য পরিক্রমাবাসীরা দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমার সময় এই হোসেঙ্গাবাদে এসে আশ্রয় নেন। কিছুদিন বিশ্রাম করেন। জপতপ করেন। আপলোগোকা ভিক্ষা তো আভিতক্ নাহি হুয়া। একটি বাড়ী দেখিয়ে বললেন — ওহি হ্যায় দেবীজীকা অন্নসত্র। রোজ পাঁচশো নারায়ণকো উধর সেবা মিলতি হ্যায়। আপলোগ্ হামারা সাথ চলিয়ে। কোঈ অসুবিধা নেহি হোগা। অন্নসত্রকা পাশমেঁ ধর্মশালা ভি হ্যায়। শেঠানীজীনে প্রতিষ্ঠা কিয়ে থে। উধর্ আপলোগ ঠার সকতে হৈ।

আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম — আপ্ বেফিকর রহে। খানা হামলোগোকা সাথমেঁই হ্যায়। আজ পর্যন্ত বহুলোকের ব্যবহৃত ধর্মশালায় রাত্রিযাপন কিংবা কোন অন্নসত্র বা লঙ্গরখানায় বহুলোকের সঙ্গে ভাত-রুটি ভক্ষণে আমাদের কোনদিন প্রবৃত্তি হয় নি। আমরা আকাশবৃত্তিধারী। মা নর্মদা যখন যা জুটিয়ে দেন আমরা তা দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি।

পুরোহিতমশাই চলে গেলেন। সত্যই আমাদের ক্ষুধা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের ঝোলা শূণ্য। হরানন্দজী বললেন — আজ আমাদের শুধু নর্মদার জল খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

কিন্তু না, পাঁচ মিনিট পরেই দেখি এক মায়ী মাথায় একটি কুঁদা নিয়ে আমদের সামনে এসে কুঁদাটি নামিয়ে দিয়ে সাশ্রু নয়নে দেহাতী ভাষায় কিছু বলতে লাগল। আমরা তার কথার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু তার কাতর অনুনয়ে আমি উঠে কুঁদার মুখের ঢাকনা সরাতেই দেখি কুঁদা ভর্তি মাঠা। এবার সে ইঙ্গিতে সেই মাঠা আমাদের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে সেই মাঠা উৎসর্গ করার পর আমরা প্রসাদস্বরূপ সেই মাঠা যে যতটা পারলাম গ্রহণ করলাম।

খাওয়ার পর হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি মায়ী আর আমাদের সামনে নেই। কিছুক্ষণ পরেই দেখি সেই দেহাতী মায়ী এক ঘড়া জল এনে আমাদের খাওয়া ও থাকার স্থানের চারপাশ ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে দুটি ঘড়া নিয়ে ঘাটের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাওয়ার আগে কালও যে সে আমাদের খাদ্য স্বরূপ মাঠা নিয়ে আসবে তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। কারও কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না। মায়ী চলে যেতে মাঠা পানে পরিতৃপ্ত হয়ে আমরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, এই ভারতের মাটিতে পুণ্যালোভাতুর ব্রতচারিণী হিন্দুরমনীর উচ্চাদর্শ এবং পবিত্র ধর্মসংস্কারের কথা। এরপর আমি ত ঘুমিয়েই পড়লাম। বেলা পাঁচটা নাগাদ আমার ঘুম ভাঙল। প্রায় ৬টা নাগাদ আমরা দেখতে পেলাম পুরোহিতমশাই আমাদের দিকে আসছেন। তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন — নর্মদার দক্ষিণতটের বড় তীর্থ হোসেঙ্গাবাদ এমন একজন নর্মদা মায়ীর কৃপাসিদ্ধ মহাত্মার চরণস্পর্শে ধন্য যে, প্রায় তিনশ বৎসর পূর্বে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও তাঁর তপস্যার তেজে এখনও এখানকার পরিমণ্ডল তপস্বীকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, একথা আমার পূজনীয় পিতৃদেবের কাছে শুনেছি। অন্যান্য পরিক্রমাবাসী মহাত্মার কাছেও শুনেছি এই আকর্ষণেই পরিক্রমাবাসীরা এখানে আসেন।

হরানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন — কে সেই মহাত্মা যিনি তিনশ বৎসর আগে আর্বিভূত হয়েও এতকাল ধরে পরিক্রমাবাসী সাধুদেরকে প্রভাবিত করতে পারছেন? তাঁর নাম কি?

পুরোহিতমশাই বললেন — তাঁর নাম ছিল রামজী। হোসেঙ্গেবাদ হতে মাইল পাঁচেক দূরে ঘানাবড় গ্রামে এক চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। পূর্বজন্মের সংস্কার ও সুকৃতিবশে তিনি শিশুকাল হতেই ভগবানের নাম ভজন করতে ভালবাসেন। সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেও তাঁর মন বসত না। খেলতে গেলেই দেখা যেত, যখন অন্য বালকরা খেলার আনন্দে মেতে আছে, এক ফাঁকে রাম একধারে সরে গিয়ে একখণ্ড পাথর বা নুড়িকেই ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে, পূজা পূজা খেলছে। হোসেঙ্গাবাদে এখনও যেমন, সেযুগেও তেমন সাধু-মহাত্মাদের ভীড় লেগেই থাকত। তখন অবশ্য হোসেঙ্গাবাদ নাম ছিল না, এর নাম ছিল নর্মদাপুর। সাধু মহাত্মা দেখলেই রাম লুকিয়ে তাঁদের কাছে চলে যেত। পরিক্রমাকারী সাধুরা প্রায় প্রত্যেকেই রেবা রেবা জপ করে থাকেন। তাই দেখে বালক রামও রেবা রেবা জপ করত। একবার রামের

বয়স যখন দশ বা এগারো, তখন কতকগুলি বোরার উপর গম ও বাজরা রোদে মিলে দিয়ে, যাতে পাখী বা গরু বাছুর এসে তা খেয়ে না যায়, তা পাহারা দিবার জন্য তাঁর বাবা সেখানে বসে থাকতে বলেন। বাড়ীর সমর্থ স্ত্রী, পুরুষ সকলেই নিজেদের ক্ষেতিতে কাজ করতে চলে যান। দুপুর বেলা তাঁরা ফিরে এসে দেখেন একপাল পাখী মনের সুখে গম বাজরা খাচ্ছে, একটা বাছুরও গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে। রামজী হাসতে হাসতে ছড়া কাটছেন —

রেবাকো চিড়িয়া, রেবাকো গেহু,<br>
রেবাকো চীজ্, রেবাকো দেহুঁ।

তাঁর বাবা রাগে দৌড়ে এসে রামজীর গালে এক থাপ্পড় মারলেন। রামজী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ কিছুতেই হয় না। প্রায় সন্ধ্যাকালে জঙ্গল থেকে এক সাধু এসে তাঁর কানে রেবামন্ত্র শোনালেন। রামজীর জ্ঞান এলো। তিনি তাঁর বাবাকে বলে গেলেন, এই ছেলেকে দিয়ে তোমার সংসারের কোন কাজ হবে না। একটি আলাদা কুটির করে দিয়ে একে ভজনেই মেতে থাকতে দাও। কিন্তু সংসারী লোক প্রাণ থাকতে কি বিষয়ে নির্লিপ্ত থেকে ভগবানকে ডাকার উপদেশ মেনে নিতে পারে? বিশেষ করে পিতৃহৃদয়ের উদ্বেগ শতগুণ। দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হলে কে তাঁর এই পাগল ছেলেটাকে দেখবে? তাই তিনি রামজীকে কিছু ক্ষেতি কাজ শিখাবার জন্য অনেক আদর করে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক দিন মাঠে লাঙ্গল করাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু একপাক লাঙ্গল ঘুরিয়ে যেই দেখলেন লাঙ্গলের ফালে রক্তের দাগ, সঙ্গে সঙ্গে রামজী লাঙ্গল ফেলে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। অনেক খুঁজে পেতে তাঁর বাবা-মা খুঁজে পেলেন নর্মদার ধারে। উভয়ে কাঁদাকাটা করে তাঁকে কোনো মতে ফিরিয়ে আনলেন ঘরে। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে তাঁর বাবা তাঁকে একটি পৃথক কুটির করে দিয়ে একটি তামাকের দোকান করে দিলেন। কুটিরের দাওয়ায় তামাক পাতার বাণ্ডিল আর একটি দাঁড়িপাল্লা এবং বাটখারা পড়ে থাকত। তামাক পাতা বিক্রয়ের দিকে রামজীর মন ছিল না, তিনি কুটিরের মধ্যে বসে ভজনেই মেতে থাকতেন। পাশাপাশি মহল্লার লোকেরা তামাক পাতা কিনতে এসে নিজেরাই ওজন করে যে যার প্রয়োজন মত তামাক নিয়ে দাম সেখানেই রেখে যেত। এই ভজনানন্দী মানুষটাকে কেউ ঠকানোর কথা চিন্তাও করত না। একবার এক খরিদ্দার দুষ্টবুদ্ধিবশে এক সের তামাক নিয়ে আধ সের তামাকের দাম রেখে চলে গেল। বাড়ী গিয়ে দেখল তামাক পাতা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। সে ছুটে এসে রামজী বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সেই থেকে মহল্লাবাসীরা ধীরে ধীরে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হতে লাগল। একবার নর্মদায় প্রচণ্ড বান এল। সেই 'বাঢ়মেঁ' সবকিছু ভেসে গেল। বানের প্রচণ্ড তোড়ে ঘানাবড় গ্রাম এবং অনেক মহল্লাই জলে ডুবে গেল। গরু মহিষ যে কত ভেসে গেল তার ইয়ত্তা নাই। মহল্লার লোকজন বাড়ীঘর ফেলে পাহাড়ে উঠে কোন মতে আত্মরক্ষা করল। বানের জল সরে যেতে চারদিক থেকে ভক্তরা রামজীর খোঁজ নিতে এলেন। তাঁরা দেখে অবাক হলেন, চারিদিকে থৈ থৈ করছে শুধু জল আর জল, মাঝখানে রামজীর কুটিরটি শুধু জেগে আছে। তাঁর সেই ভজন কুটিরের চেয়ে আরও উঁচু স্থানের বাড়ী ঘর জলে ডুবে গেছে কিন্তু প্রলয়ঙ্করী বন্যার জল কুটিরের দাওয়া পর্যন্ত এসেছে। আত্মভোলা রামজী দাওয়ায় বসে নর্মদা মায়ীর ভজন গেয়ে চলেছেন।

এই ঘটনার পর নর্মদা মায়ীর কৃপাসিদ্ধ মহাত্মা হিসাবে তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। হাজার ভক্তের ভীড়ে এবং ভজনগানে তাঁর আশ্রম সর্বদা মুখর থাকত। তিনি কাউকে দীক্ষা দিতেন না, বলতেন — আকুল হয়ে ভগবানের শরণ নিলেই ভগবান ভক্তকে দেখা দেন, রক্ষা করেন। রেবাতীরে 'রেবা' নামই মহাসিদ্ধ মন্ত্র। শিব প্রদত্ত মন্ত্র।

তাঁর দেহরক্ষার ঘটনাও অলৌকিক। আগে থেকেই তিনি মৃত্যুর দিনক্ষণ ঘোষণা করে একটি সমাধি-কুটির তৈরী করান। নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হাজার হাজার ভক্তকে আশীর্বাদ করে কুটিরের মধ্যে বসে যান যোগাসনে। ভক্তরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে সাশ্রুনেত্রে প্রতীক্ষা করতে থাকেন সেই মহাক্ষণটির। যথালগ্নে যথাক্ষণে তাঁর শরীর ঘিরে দাউ দাউ করে স্বতঃই আগুন জ্বলে উঠে।

হাজার হাজার ভক্তের চোখের সামনে তাঁর দেহ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। ঘানাবড়ে সেই সমাধি-মন্দির এখনও আছে। প্রতিদিন শত শত গৃহীভক্ত এবং পরিক্রমাবাসীরা রামজী বাবার আশীর্বাদ নিতে যান। এছাড়াও ঘানাবড় হতে কয়েক মাইল দূরে খাপড়খেদা গ্রামে এবং হোসেঙ্গাবাদ ষ্টেশনের কাছেও আরও দুটি রামজী বাবার সমাধি-মন্দির বা স্মারক-মন্দির আছে।

যোগীশ্বররাই এইভাবেই আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার দ্বারা নিজ দেহকে প্রজ্বলিত করে ফেলতে পারেন যেমন কন্যা সতীও একইভাবে প্রজাপতি দক্ষের মুখে পতি নিন্দা শুনে নিজেকে অশুচি জ্ঞানে সমাধিজাত অগ্নি দ্বারা নিজ দেহকে প্রজ্বলিত করেছিলেন। নিজ দেহকে প্রজ্বলিত করবার পূর্বে সতী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দক্ষকে বলেছিলেন----

ন যস্য লোকেহস্ত্যতিশায়িনঃ প্রিয়স্তথাহপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন সমস্তাত্মানি মুক্ত বৈরকে ঋতে ভবন্তং কতম প্রতীপয়েৎ।।

হে পিত! ইহলোকে যিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নাই, যাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নেই, যিনি দেহীগণের আত্মাবৎ প্রিয়, যিনি সর্বভূতান্তরাত্মা, যিনি সর্ববৈরিতা হতে মুক্ত, আপনি ভিন্ন অন্য কে তাঁর প্রতিকূলাচরণ করবে?

কাল সকালে আপনাদেরকে সেই পুণ্য তীর্থ দেখিয়ে নিয়ে আসব বলে পুরোহিতজী মন্দিরে ঢুকে গেলেন।

সূর্যাস্ত হচ্ছে, ধীরে ধীরে অন্ধকারের ঢল নামছে সাতপুরা পর্বতের সর্বত্র। আজও আরতির পর পুরোহিতমশাই নর্মদা বন্দনা করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মধুর চেয়ে মধুরতর, মধুময় নর্মদা স্তোত্র শুনতে শুনতে আমরাও তন্ময় হয়ে গেলাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল নর্মদা মন্দিরের মঙ্গলারতির শব্দে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। নর্মদা মায়ীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পুরোহিতমশাই বললেন — চলুন রামজী বাবার সমাধি মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়ি। এখনই না বেরিয়ে পড়লে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। আমাদের জিনিষপত্র পড়ে রইল অরক্ষিত অবস্থায়। এখানে চোরের ভয় নেই। তবু তিনি তাঁর দুই পুত্রকে ডেকে আমাদের ঝোলা-কম্বলগুলি দেখার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লাঠি এবং কমণ্ডলু হাতে আমরা তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে লাগলাম। ভোরের বাতাসে শরীর মন জুড়িয়ে গেল। আজ কাঁধে সেই গাঁঠরীর বোঝা নাই তাই আজ হাঁটতে আরাম লাগছে।

ঘাট পেরিয়ে শহরে যাবার রাস্তা ধরলাম। বেশ জম-জমাট শহর। রাস্তার দু'ধারে প্রচুর দোকান-পাট। রি' চলাচল করছে। বাজার-হাটে প্রচুর লোক। এইরকম শহুরে পরিবেশে স্থানীয় লোকের কাঁচা পাকা বাড়ীঘর অতিক্রম করতে করতে প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর ক্রমশঃ অপেক্ষাতর নির্জন স্থানে এসে পৌঁছালাম। পর্বতের ঢালু দিয়ে উঠা নামা চলছে। অত্যন্ত সংকীর্ণ রাস্তায় ছোট বড় পাথর ডিঙাতে ডিঙাতে আরও প্রায় আধ-ঘন্টা হেঁটে মাইল পাঁচেক দূরে ঘানাবড় গ্রামে পৌঁছালাম রামজী বাবার সমাধি স্থলে। সমাধিস্থলের সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে পদতলে শুধু কৃষ্ণ পাষাণস্তূপ আর তরঙ্গায়িত শ্যামল বনভূমি। অদ্ভুত এক ভাষাহীন আকুতিতে সমগ্র সমাধিস্থলই থম্‌থম্‌ করছে।

সমাধি মন্দিরের বারান্দায় কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে দেখলাম নর্মদাতে স্নান করে এসে মন্দিরের চাতালে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়লেন। মনে হয় নিজেদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য তারা রামজী বাবার সামনে হত্যা দিলেন। নাটমন্দিরে বসে তিনজন সন্ন্যাসী জপ করছেন। একটি অনির্বচনীয় দৈব ভাবের মাধুর্যে মন্দিরের সর্বত্র একটি শুচি-সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। পুরোহিতমশাই জানালেন — এই সমাধি-মন্দিরে প্রার্থনা করলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের দিনে এখানে বিরাট মেলা বসে। সারা ভারতের সাধুসন্ত গৃহীরা এসে এখানে জমায়েত হন।

আমরা রামজী বাবার সমাধি-মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে দু'বার প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের বারান্দায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরে চললাম আমাদের নর্মদাতটের আশ্রয়স্থলে। সমাধি মন্দির ছেড়ে কিছুটা আসার পরে পুরোহিতমশাই বললেন — বহুদিন ধরে আমার মনে একটা প্রশ্ন আমাকে পীড়িত করে কিন্তু সেইরকম কাউকে পাই নি যিনি আমার শঙ্কা দূর করেন। আপনাদের দেখে আমার মনে হয়েছে আপনারাই আমার শঙ্কা দূর করতে পারবেন। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে পথ চলতে চলতে আমার প্রশ্নটি আপনাদের বলি। গল্প করতে করতে গেলে পথশ্রম অনেক লাঘব হয়।

হরানন্দজী বললেন — বলুন, দেখি আমরা আপনার শঙ্কা দূর করতে পারি কিনা?

পুরোহিতমাশাই — যে সময় বাংলাদেশের বারদীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, বেদান্তমূর্ত্তি বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, গাজীপুরের পওহারী বাবা, ভোলানন্দ গিরি, মহাত্মা

গম্ভীরনাথজী, রামদাস কাঠিয়া বাবা, বেদমূর্তি মহর্ষি দয়ানন্দ, আগ্রার পরমসন্ত শিবদয়াল সিংজী (রাধাস্বামী সাহেব) নর্মদাতটে কমলভারতীজী, গঙ্গোনাথের বালানন্দ ব্রহ্মচারীর মত মহাপুরুষরা ভারতবর্ষ আলো করেছিলেন, প্রায় সেই সময় কলকাতায় রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঘটে। আমি তাঁদের জীবনী গ্রন্থ পড়েছি। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবকে স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'-এ অবতার বলে ঘোষণা করেছেন।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে --- 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ (যোগদর্শন ১৷২৪) অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ — এই পাঁচরকমের ক্লেশ থেকে উৎপন্ন যে কর্মফল তা হতে মুক্ত এবং বাসনারহিত যিনি তিনিই ঈশ্বর পদবাচ্য। সর্বব্যাপক পরমাত্মা একটা পরিচ্ছিন্ন স্থানে পরিণামশীল দেহ নিয়ে একটি ক্ষুদ্র গর্ভাশয়ে জন্মান না। তবে সূর্য যেমন কয়লা, পাথর, জল, কাঁচ, স্ফটিক সকল বস্তুতেই কিরণ দেয়, কিন্তু কয়লা পাথরে প্রতিফলন দেখা যায় না। জলে স্বচ্ছ, কাঁচে স্বচ্ছতর এবং স্ফটিকে স্বচ্ছতম ভাবে দেখা যায়, তেমনি পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপক সকলেরই হৃদয়স্থিত বলে, সাধু মহাত্মাদের হৃদয় শুচিশুদ্ধ হওয়ায় তাঁদের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ বেশী। তাই বলে সাধু মহাত্মারা কেউ সাক্ষাৎ ভগবান নন। রামকৃষ্ণদেব একজন সাধু, ভগবৎভক্ত ছিলেন, শিশুসুলভ সরল ছিলেন। পূর্ণ পরমাত্মাই একবারে গদাধর ওরফে রামকৃষ্ণরূপে জন্মেছিলেন, এ সবের মূলে সাম্প্রদায়িক প্রচার, স্বার্থবোধ আছে বলে আমার বিশ্বাস হয়। আপনাদের এ বিষয়ে মত কী?

— রামকৃষ্ণদেব বাসনাশূণ্য ছিলেন না কিংবা ঐ পঞ্চক্লেশে নিয়তই নিপীড়িত হয়ে কর্মবিপাকে প্রারব্ধ ভোগ করেছেন। তিনি নরাকৃতি পরব্রহ্ম নন। রামকৃষ্ণ যে কর্মাধীন মানুষ ছিলেন এমন দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে দেখা যায়। তিনি দুষ্কৃতকে ঘৃণা করতেন। কলিকাতার জনৈক যুবক পরমহংস জিলিপি ভালবাসতেন শুনে জিলিপি নিয়ে গেছলেন, 'শ্রীশ্রীপরমহংসদেব উহা গ্রহণ ত করিলেনই না; অধিকন্তু যে স্থানে যুবক জিলিপি রাখিয়াছিলেন, তথাকার মাটি পর্যন্ত উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে গোবর ও গঙ্গাজল দিয়া পরিষ্কৃত করিতে বলিলেন'। (স্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত কর্তৃক রচিত 'শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত')।

তারাপদ নামক জনৈক যুবক রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে তিনি তিরস্কার করে বললেন, 'তুই গোহত্যা না ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিস্ শীঘ্র বল, তোকে দেখিয়া অবধি আমার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া হতভাগ্য তারাপদ নিজের জন্মদোষ প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। ... তাঁহার স্থান ত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে তারাপদের বসিবার স্থান হইতে এক কোদাল মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে গঙ্গাজল দিতে আদেশ করিলেন।' (শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লীলামাধুরী (মধ্যলীলা), নিত্যপরমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক রচিত এবং রেণু মিত্র এম.এ রচিত 'সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল')

অলৌকিক দিব্যশক্তি বা দিব্য বিভূতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলেও লোকনাথ ব্রহ্মচারী, গোঁসাইজী, রামদাস কাঠিয়া বাবা, ভাস্করানন্দ এবং ত্রৈলঙ্গস্বামীর মত রামকৃষ্ণের জীবনে দিব্য বিভূতির অজস্র প্রকাশ দেখা যায় না। ত্রৈলঙ্গস্বামী, বিশেষ করে ভাস্করানন্দের খ্যাতি ত সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ বা কংস শিশুপাল বধাদির মত ঐরকম কোন উৎকট সংহারলীলা রামকৃষ্ণ করেন নি। তবে যদি গিরিশ ঘোষের মদ ও বেশ্যা ছাড়ানোর জন্য ভগবানকে কামারপুকুরে জন্ম নিতে হয়েছিল তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা!

আরও বিচার করে দেখুন, ঐ সব অন্তর্যামী, ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষরা যদি বুঝতে পারতেন যে, তাঁদের ধ্যানের বস্তু দক্ষিণেশ্বরে 'মা কালী, মা কালী' করে কাঁদছেন, তাহলে তাঁর তা নিশ্চয়ই মানুষী তনুধারী ভগবানের লীলা দেখে ধন্য হওয়ার জন্য ছুটে আসতেন? কিন্তু তাঁরা কেউ আসেন নি। বরং রামকৃষ্ণই সকল সাধুকে দর্শন করবার জন্য যেতেন। মহর্ষি দয়ানন্দকে দর্শন করতে গিয়ে ভয়ে বাক্যালাপই করেন নি। ত্রৈলঙ্গস্বামীকে কাশীতে দর্শন করে বলেছিলেন, 'কাশীতে সচল বিশ্বনাথ দেখে এলুম। ত্রৈলঙ্গস্বামী কাশী আলো করে বসে আছেন।' বৃন্দাবনে গিয়ে নিধুবনের গঙ্গামাতার কাছে ত থেকে যেতেই চেয়েছিলেন; মথুরবাবু শেষে তাঁর মায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভগবানকে ভুলিয়ে এনেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে।

অবশ্য ঐ সময় অনেক সাধু প্রায়ই রাণী রাসমণির অতিথিশালায় আসতেন। তাও তাঁরা ঐ 'ভগবানকে

দেখবার জন্য নয়: গঙ্গাসাগর ও জগন্নাথ দর্শনের পথে ঐ কালীবাড়ী; স্নান, আহার, বিশ্রাম এবং 'দিশাজঙ্গল' শৌচাদির সুবিধা। এর সুযোগ সুবিধার জন্যই তাঁরা আসতেন ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' (সাধক ভাব ঐ, গুরু ভাব, উত্তরার্ধ তাঁদের মধ্যে আবার যাঁকেই রামকৃষ্ণের ভাল লাগত তাঁরই কাছে তিনি দীক্ষা নিয়ে বসতেন। এইভাবেই তিনি কেনারাম ভট্টাচার্য (ঐ), জটাধারী (ঐ), সুফি গোবিন্দ রায় (ঐ), ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী এবং আরও অনেকের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এটা মোটেই তাঁর যুগাবতারত্বের প্রমাণ নয়।

রামকৃষ্ণ না এলে সব হিন্দু যুবকরা খ্রীস্টান হয়ে বিধর্মী হয়ে যেতেন, একথাও অমূলক। খ্রীস্টান ধর্মও একজন মহাপুরুষের উপলব্ধ সত্য। এমন কিছু তা গর্হিত নয়, ভগবানের চোখে তা বিধর্ম, অধর্ম হওয়ারও কথা নয়। কাজেই সাত তাড়াতাড়ি তাঁকে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে, বাংলার কতিপয় হিন্দু যুবককে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্য জন্মাতে হয়েছিল, একথাও হাস্যকর। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, রামকৃষ্ণ কোন 'বিধর্মী' যুবককে 'শুদ্ধিযজ্ঞ' করে হিন্দু করেন নি, বা সে সময় যে কয়জন রামকৃষ্ণের followers' হয়েছিলেন, তাঁরা রামকৃষ্ণের পদচ্ছায়ায় এসে পৌঁছেছিলেন বলেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছলেন, নতুবা তাঁরা খ্রীস্টান হয়ে 'বিধর্মী' হয়ে যেতেন, এমন কোন প্রমাণ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্মসভায় অবজ্ঞাত হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলে প্রমাণ করছিলেন এই জন্য যদি রামকৃষ্ণের 'যুগাবতারত্ব' demand করা হয়, সে দিকে তা তো বিবেকানন্দের কৃতিত্ব! রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে খুব সাধতেন। ভাবদৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন যে বিবেকানন্দ হলেন দিব্য অখণ্ড মণ্ডলের 'দিব্য জ্যোতিঃঘনতনু, সপ্তর্ষির অন্যতম; রামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন যে তিনি নাকি আসার সময় ওঁকে 'আবাহন করে' এসেছিলেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)। এইবারে থাকে 'সর্বধর্মসমন্বয়ের' প্রশ্ন। আচ্ছা, সব ধর্মই যদি তাঁর চোখে এক ছিল, তাহলে আমাদের জাতির গৌরব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন যখন রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করতে যান, তখন তিনি নিজে প্রথমে গেলেন না। তাঁর অন্তরঙ্গ বিশ্বাসভাজন শাস্ত্রীকে পাঠালেন। শাস্ত্রী ঐ মহামনীষীকে কি বলেছিলেন তার বর্ণনা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' থেকেই বলছি, 'কি! এই দুই দিনের সংসারে পেটের দায়ে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করা? এ কি হীন বুদ্ধি! ইঁহাকেই আবার লোকে বড়লোক বলে এবং ইঁহার গ্রন্থ আদর করিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া শাস্ত্রীজীর মনে বিষম ঘৃণার উদয় হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত আর অধিক বাক্যালাপে বিরত হন।' তাঁরই প্রতিভূ হয়ে বাক্যালাপ করতে গিয়ে শাস্ত্রী যে 'বিধর্মী' বলে অতবড় মহামনীষীকে 'ঘৃণা' করলেন, এজন্য কিন্তু 'সমন্বয়কারী ভগবান' তাঁকে কিছু বললেন না; বরং 'বিধর্মী' দেখে তাঁরও মুখ চাপা হয়ে গেল। সর্বধর্মসমন্বয়কারী পতিত পাবন যুগাবতারের শ্রীমুখের উক্তি, 'আমার মুখ যেন কে চেপে ধরলে — কিছু বলতে দিলে না।' (ঐ)!!

শুধু তাই নয়, মাইকেল চলে যাওয়ার পর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ নিয়ে কটু আলোচনা করা হয়, 'স্বধর্ম ত্যাগ করা যে অতি হীন বুদ্ধির কাজ', একথা ঠাকুরঘরে ঢুকবার দরজার পূর্বদিকের দালানের গায়ে একখণ্ড কয়লা দিয়ে বড়বড় অক্ষরে লিখে রাখেন; বহুদিন যাবৎ রামকৃষ্ণ ভক্তরা তাই দেখে 'কৌতুহলাক্রান্ত' হতেন। কিন্তু তথাপিও 'সর্বধর্মসমন্বয়কারী যুগাবতার' সে সম্বন্ধে কিছু সমন্বয়ের বাণী বলে ভক্তবৃন্দের ভ্রান্তি মোচনের কোন চেষ্টা করেন নি।

'অ্যাঁও ঠিক, অঁ-ও- ঠিক, এটাও হয় — ওটাও হয়' — এ ধরনের যে সমন্বয়ের বাণী, তা সমন্বয় নয়, একটা সমন্বয়ের খিঁচুড়ি! লব্ধভূমিকত্বের অভাবে এ হল ক্লীবের আপোষ! সমন্বয়ের মহাসত্য যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি সেই নির্ভীক সত্যকে প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ধর্ম জগতে একটাই। অজ্ঞরাই ধর্মের বহুত্ব দেখে এবং নিজের সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ ধর্মের বাইরে সব কিছুকে 'বিধর্মী' ও 'বিধর্ম' বলে মনে করে। সবাই সেই পরম দয়ালের সনাতন, তাঁর চোখে জাতপাত বর্ণ বিভেদ নেই।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণীতে যে মানবতার জয়গান ফুটে উঠেছিল, সত্য ও সমন্বয়ের মহামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সেও 'নতুন কাণ্ড' নয়। শঙ্করাচার্যের 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ' সাধক চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', 'দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ (মৈত্রেয়োপনিষৎ)' 'সর্বেঃ সুখিনঃ ভবন্তু, সর্বেঃ সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বেঃ ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাক্ ভবেৎ', প্রিয়জন ত বটেই, যে আমার শত্রু, তারও কল্যাণ হোক, শ্রেয়োলাভ ঘটুক 'যশ্চ মাং দ্বেষ্টিলোকেস্মিন্ সোহপি ভদ্রানি পশ্যতু',

'ন ত্বাং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং, কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনাং আর্তিনাশনম্' — ইত্যাদি বিশ্বোদার মহামন্ত্র এবং সার্বভৌম মানবতাবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র! যদি এজন্য ঐ সব ঋষিদেরকে (তারাও অনেকেই লোকহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন) অবতার বলা না হয়, তাহলে বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণকেই বা 'যুগাবতার' বলা হবে কোন্ যুক্তিতে?

যুগে যুগে নানা সংস্কৃতির সমাগমে ও সমন্বয়ে ভারতের সংস্কৃতিতে এবং ধর্মে একটা উদার মানবতাবাদ এবং নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা বারবার জেগে উঠেছে। যখন জাতি নানা কারণে রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতির জন্য ঘুমিয়ে পড়ে তখন এইসব উদার ভাব চাপা পড়লেও, পরে এক একজন মহাপুরুষ আবার আসেন, ঘুমন্ত জাতিটাকে পুনরায় তাঁরা জাগিয়ে দেন উদ্বোধনীর তড়িৎ সংঘাতে। মধ্যযুগে কবীর সাহেব সকল রকমের কুসংস্কার, ক্লেদ এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডী আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে সত্য ও সমন্বয়ের মহামন্ত্র নির্ভীক ভাবে প্রচার করে গেছলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐ সমস্ত মহাপুরুষরা পুনরায় সেই সত্যকে জাতির মর্মদেশে প্রতিষ্ঠা করলেন। কলকাতাতেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনগত আচরণের দ্বারা দুর্গত মানবের সেবা পূজা সৎকার করে মানুষের সেবাই যে ভগবানের সেবা, নরই নারায়ণ — এই মানবতাবাদের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যে মাইকেলকে উপদেশ দিতে গিয়ে 'যুগাবতারের' গলা আটকে গেছল, সেই মাইকেলকে কতভাবে সেবা সাহায্য বিদ্যাসাগর করে গেছেন। সে যুগে হাজার হাজার নর-নারীকে সেবা করে, সবরকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, শুদ্ধ মানবতাবাদ যদি কেউ আচরণ করে দেখিয়ে গিয়ে থাকেন, তিনি হলেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। এইজন্য মহাকবি মাইকেল তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'He has the wisdom of an ancient sage, energy of an Englishman and heart of a Bengali Mother* রামকৃষ্ণও এঁকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন,'খানা ডোবা নদী পেরিয়ে এবার সাগরে এসে মিশলুম।' রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে 'ক্ষীর সমুদ্র', 'অমৃত সমুদ্র' বলে অভিহিত করেছিলেন। কৈ, এজন্য ত দয়ার সাগর, মহাবিপ্লবী, শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমিক বিদ্যাসাগরকে 'যুগাবতার' বলা হয় না!

অজ্ঞের ভ্রূকুটি যাঁর ভীতি উৎপাদন করে, কিংবা যিনি প্রতিষ্ঠা লিপ্সু অথবা যিনি উপলব্ধির পরম ভূমিতে গিয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হন নি, সেই লোকই যা লোকপ্রিয় তাই বলেন এবং এই আপোষ রক্ষা করতে গিয়ে, 'নর্মদাতে স্নান করলেও যা গঙ্গাতে স্নান করলেও তা' 'হরেকৃষ্ণ বললেও যা ফরেকৃষ্ণ বললেও তা', God বললেও যা dog বললেও তা' 'মূর্তিপূজাও ঠিক, অদ্বৈততত্ত্বও ঠিক' — এই ধরণের so called সমন্বয়ের কথা বলে যান! নির্ভীক সত্য প্রকাশ করতে এইসব so called সত্যদর্শী, সমন্বয়বাদীদের সঙ্কোচ লাগে!! রামকৃষ্ণের সমন্বয়, ঠিক এই ধরণের সমন্বয়।

রামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম সাধনার সময় 'গোমাংস ভক্ষণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, মুসলমানদের হাতে খেয়েছেন' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ), খ্রীস্টান ধর্মের সাধনা করার সময়, 'তাঁর দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা বিলীন হয়ে, ঈশান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জাগল' (ঐ), তন্ত্র সাধনার সময় কুকুর শেয়ালের এঁটো খাওয়া ও অন্যান্য জঘন্য কৌল-আচার অনুষ্ঠান করেছিলেন, মধুর ভাবের সাধনার সময় তিনি বারাণসী শাড়ী গহনা, ঘাঘরা, ওড়না পরে মথুরবাবুর অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে থাকতেন, মথুরবাবুর জামাই-এর শয়ন ঘরে রাত্রিতে মথুরবাবুর কন্যাকে সখীর ন্যায় হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন (ঐ), ঐ সময় তাঁর নাকি স্ত্রী শরীরের ন্যায় উপর্যুপুরি তিন দিন শোণিত স্রাব হত (ঐ), মহাবীরের সাধনার সময় তাঁর এক ইঞ্চি লাঙ্গুল বৃদ্ধি (Enlargement of the coccyx) হয়েছিল, তিনি রঘুবীর, রঘুবীর বলে চিৎকার করতেন, গাছের উপরেই অনেক সময় থাকতেন (ঐ)— এইসব সর্বধর্ম সাধনার জন্য নাকি রামকৃষ্ণের বেশী credit ! এ জন্যই নাকি তিনি 'যুগাবতার'*!!

বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ ফিরে এলাম হোসেঙ্গাবাদের ঘাটে। এসে দেখি সেই মায়ী যথারীতি আমাদের জন্য কুঁদা ভর্তি মাঠা নিয়ে বসে আছে। পথশ্রমে খুবই ক্লান্ত ছিলাম। ক্ষুধাও পেয়েছে। নর্মদাতে নামলাম হাত মুখ ধোওয়ার জন্য। হাত মুখ ধুয়ে আমরা মাঠা খেতে বসলাম। পুরোহিতমশাই ও তাঁর দু'পুত্রকেও মায়ী

* রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে লেখক ও মনীষী চিন্তানায়ক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ) কিছু পত্রালাপ এই বইয়ের পরিশিষ্টে পাঠকদের জানানোর জন্য প্রকাশ করছি। ... প্রকাশক

হাতজোড় করে দেহাতী ভাষায় মাঠা খাবার অনুরোধ জানালেন। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে মাঠা খেতে বসে গেলেন। মাঈ খুব যত্ন করে মাঠা পরিবেশন করলেন। পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন সমাধা করলাম। তিনি অন্যদিনের মত যথারীতি আমাদের খাবার স্থান ধুয়ে মুছে ঘাটের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শরীর খুব ক্লান্ত থাকায় আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। পুরোহিতমশাই তাঁর দু'পুত্রকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। বিশ্রাম করতে করতে পুরোহিতমশাই বললেন — মায়ের জাত ছাড়া এরকম যত্ন এবং সেবা কাদের পক্ষে সম্ভব? নর্মদার তটে তটে যেমন মহা মহা যোগসিদ্ধদের দর্শন মিলে, তেমনি অনেক ভক্তদেরও দর্শন পাওয়া যায়। নর্মদা মায়ী তাঁর পরিক্রমাবাসী সন্তানদের জন্য সব ব্যবস্থাই রেখেছেন।

আমি তাঁকে বললাম — দীর্ঘদিন নর্মদাতটে কাটালেন। আশা করি মা নর্মদার কৃপা লাভ করেছেন। নর্মদাতটে আপনার অনুভূতি কি? পুরোহিতমশাই শিশুর মত খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন — কায়সে মনসে বচনসে সত্যনিষ্ঠ হোনা চাহিয়ে। কলিকালমেঁ উনসে বড়া কোঈ তপস্যা নেহি। অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। অর্থাৎ কলিতে সত্যের চেয়ে বড় তপস্যা নাই। কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। জলের দ্বারা কেবল শরীর শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়ে থাকে।

নর্মদা মার মহিমা বলে শেষ করা যায় না। নর্মদা পরিক্রমাই একটা মহা তপস্যা।

স্মরণাৎ জন্মজনিতং দর্শনাৎ চ ত্রি জন্মজং।
সপ্তজন্মকৃতং নশ্যেৎ পাপং রেবাবগাহনাৎ।।

অর্থাৎ মা রেবার স্মরণে এক জন্মার্জিত, দর্শনে তিন জন্মার্জিত আর অবগাহনে সাত জন্মের পাপ নষ্ট হয়। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েছে। আজ সোমবার, শিবের বার, পূর্ণিমা। নর্মদা মন্দিরে ঘি-এর প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। পঞ্চপ্রদীপও সাজানো হয়েছে। 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' বলতে বলতে পুরোহিতমশাই অনেক পুষ্পসম্ভার এবং রৌপ্য পাত্রে পঞ্চামৃত নিয়ে পূজা শুরু করলেন। নর্মদা মার পূজা এবং আরতি সেরে তিনি পঞ্চপ্রদীপ জেলে ঘাটে এসে নর্মদা বন্দনা করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন। আমরাও প্রণাম করলাম। আজ কিন্তু পুরোহিতমশাই স্বাভাবিক আছেন। তিনি হাততালি সহ নর্মদা বন্দনা করতে করতে তিনবার মন্দির পরিক্রমা করে আমাদের নমঃ নারায়ণায় জানিয়ে ফিরে গেলেন।

পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণে সমগ্র নর্মদার তটভূমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকাচ্ছি, সেইদিকেই যেন আলোর ঢেউ। স্তব্ধ গম্ভীর রাত্রির নির্জনতায়, এই পূর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখের সামনে সবকিছুই অবারিত। সবই স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভাসছে। মনে জেগেছে আনন্দের শিহরণ। সুখের মোহনীয় আবেশ যেন। চাঁদের যে এমন যাদু আর মাধুর্য আছে তা মুক্ত আকাশতলে প্রকৃতির খোলামেলা মুক্তাঙ্গনেই জ্যোৎস্না রাতের মদিরতা ভালভাবে বোঝা যায়। চাঁদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি, হে শিবসুন্দর! তোমার সৃষ্টি এত রমনীয়! হঠাৎ দেখলাম, উল্কার মত একটা আলোর শিখা হাউই-এর মত নেমে আসছে তীব্রবেগে। মনে হল সেটা যেন মন্দিরের চূড়ার উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের গর্ভগৃহের ঝোলানো ঘন্টায় শব্দ উঠল ঢং। মন্দিরের ভিতর থেকে ভেসে আসতে শুরু করল সুগন্ধি। মনে মনে গেয়ে উঠলাম আমাদের গ্রামের এক বাউলের গান। জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে শিশু যেন তার মাকে বলছে —

কোলে শুয়ে সোনা মণি, মাকে চুমো খেয়ে,
দুষ্টু মিঠেল সুরে বলে আকাশ পানে চেয়ে।
বল্ দেখি মা! কোন্ তারাটি দেখতে লাগে ভালো
আকাশে আজ এত তারা কাহার বেশী আলো।
ইচ্ছে করে যেতে মাগো, তারাদের এই দলে।
সারা রাতি জ্বালিয়ে বাতি জাগি আকাশ তলে,
মা হেসে তাঁর সোনারে কন ওরে আমার মাণিক
তুই যে আমার বুকের চাঁদ, তারা যে তোর খানিক।

আকাশের পাগলকরা জ্যোৎস্না আর মন্দিরের পাগলকরা সৌরভ আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করল। রাত্রি তখন বড়জোড় বারটা। ভ্যাপসা গরমের তাপ নদী তীরে শুয়ে মোটেই অনুভব করছি না। মুক্ত আকাশের তলায়,

এই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির, এই নৈশ প্রকৃতির শোভা নিজের চোখে দেখবার জিনিষ, কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন আমার গায়ে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। উঠে দেখি, প্রত্যেকেই যে যার কাজে তৎপর হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গীদের স্নান পর্ব শেষ হয়েছে। হরানন্দজীকে দেখলাম, সূর্যার্ঘ্য অর্পণ করছেন। আমিও স্নান তর্পণ শেষ করলাম।

বেলা দশটা নাগাদ পূজাদি সেরে বেরিয়ে আসতেই পুরোহিতজীর সঙ্গে দেখা হল। পুরোহিতমশাই একটি বই আমাকে পড়তে দিয়ে বললেন — আমার এক শিষ্য গুজরাট থেকে এই বইটি পাঠিয়েছে। সারা দিন ধরে বইটি পড়ুন। সন্ধ্যাবেলা নর্মদা মাতার আরতির পর এই বইটি নিয়ে আলোচনা করব। আসলে, বইটার বিষয়বস্তু আর আমার এতদিনের ধারণাগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান; আমি জানতে চাই কোনটা সত্যি?

যে বইখানি থেকে পুরোহিতমশাই-এর মনে এত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি — সেটি উলটিয়ে দেখি তার নাম হল — History of Mankind : Cultural and Scientific Development, Vol. II, সাধারণ সম্পাদক হলেন ঃ Luigi Paretti. এক International Commission for a History of the Scientific and Cultural Development of Mankind এর গবেষণার ফলশ্রুতি এই বই। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে 'প্রামাণ্য' তথ্য নিরূপণ করেছেন Professor R. C. Majumdar; ইনি এই Commission এর একজন Vice-Presidentও।

তিনি বললেন — বইটার বিষয়বস্তু যা তার নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এইটি হল প্রাচীনকালের ধর্ম, দর্শন, সভ্যতার বর্ণনা। এতে নানা দেশের কথা আছে। ভারতের কথাও আছে। কিন্তু পড়তে পড়তে মনটা বড় বিষণ্ণ হল। ভাবলুম — এই তাহলে আমাদের দেশের সত্যিকারের ইতিহাস! যে আর্য সভ্যতা মহান 'বেদের' ধারক, বাহক, পরিবেশক, তা কি এক ভবঘুরে, যুদ্ধবাজ পশুপালক এবং বর্বর এক অপরিণত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন গোষ্ঠীমাত্র? এই বইটির ছত্রে ছত্রে তাই লেখা রয়েছে। পাশ্চাত্তের জনগণ এইরূপ ধারণায় বই লিখলে আমার মন এতটা চঞ্চল হত না। পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের এক লেখায় পড়েছিলুম যে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা সহজে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে ত লেখকরা আমাদেরই জনবরেণ্য পণ্ডিতবর্গ, যেমন Prof. R. C. Majumdar, Prof. J. N. Banerjee, Prof. Humayun Kabir, Sir Sarvapalli Radhakrishnan, Prof. K. A. Nilkanta Shastri ইত্যাদি।

আমার ভেতরে যে সব কথা তোলপাড় করছে তার সেই সব অংশে আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। সেগুলির কতকগুলি বলছি ঃ— (১) Vedic Culture হল foreign to Indian Soil। আরও (২) ...'this rude society of Aryan shepherds and soldiers conceived a series of sacred lays; and at the end of the second millennium B. C. these were gathered into the four great collections of the Veda. They were very soon accepted as revealed truth, and remained always (at least in theory) the fundamental basis of Indian Religion'

এখানে আমার প্রথম প্রশ্ন বৈদিক সংস্কৃতি কি ভারতভূমির বাইরের থেকে আগত? আর, conceived ক্রিয়াপদটির সঙ্গে 'মন্ত্রদর্শন' এর 'দর্শ' ক্রিয়াপদটির মিল খুঁজে পাচ্ছি না আমি। তবে কি মন্ত্র conceive করেছিলেন? 'ঋষ' ধাতুর অর্থ 'দর্শন' — তা কি কবির কল্পনা মাত্র? আর, পশুপালক এক যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শী গোষ্ঠী কি করে বৈদিক মন্ত্রগুলি conceive করে ফেললেন? অধ্যাত্মসাধনার কোন প্রস্তুতির-ই ত উল্লেখ নেই এখানে। তবে, তপস্যা, সাধনা, স্বাধ্যায়, ধ্যান...ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কি রইল? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার সংস্কার, বেদ অপৌরুষেয়। আপনি বেদধ্যায়ী। আপনি পণ্ডিতবংশের সন্তান। আপনি ব্যবহারিক অনুশীলন এবং মর্মগ্রহণ এই উভয় পথেরই যাত্রী। আপনি আমায় সংশয় নিরসন করুন। যা সত্য তাই অকপটে বলুন। আমি শুনতে প্রস্তুত। তবে বলে রাখি, আলোচ্য বইটিতে বহু ভারতীয় পণ্ডিতই, 'বেদ অপৌরুষেয়' এই মতের উল্লেখ করেন নি; সমর্থন ত দূরের কথা।

আরও আছে। ৩) 'The Aryan invaders who succeeded immediately or after a lapse of time were in all probability without a script'. যাঁদের মধ্যে চরমতম, সার্থকতম, পারমার্থিক বোধের বোধন হচ্ছে তাঁরা লিপি লিখন জানেন না। 'যদ্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' কোথায় রইল তাহলে?

(৪) 'There is apparently no long tradition behind mathematics in India ; it seems impossible to discover anything of a mathematical nature in the Rigveda'। এই ধরণের উক্তি বইটির মধ্যে অন্যত্রও আছে। সত্যটা কি? অঙ্কশাস্ত্র আমরা জানতুম না?

(৫) Veda is essentialy a ritualistic religion, with little ethical content... 'শুধুই ritaliastic? তবে সমস্ত ritual বর্জনের আহ্বানটা কি আমার কল্পনা?

আরও যা সাঙঘাতিক কথা আছে। তা হল যে বৈদিকযুগে নরবলি হত। 'Purusamedha' শব্দের অর্থ করা হয়েছে নরবলি। তেমনি 'সোম' শব্দের অর্থ করা হয়েছে মদ্যজাতীয় liquor। কিন্তু আসলে ঐ সব শব্দগুলির মানেই একেবারে আলাদা।

তাঁরা আরও বলেছেন, মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা আর্যপূর্ব। আর্যদের নিজেদের কোন উন্নত সংস্কৃতি ছিল না; তাঁরা ভাষা, লিপি, সভ্যতা দৃষ্টি সব কিছুই গ্রহণ করেছিলেন দ্রাবিড়দের কাছ থেকে, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা দ্রাবিড়দের অবদান আর্যদের নেতা ইন্দ্র এই মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার পুর বা নগরীর ধ্বংস করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয়েছিল 'পুরন্দর'। এই বই ছাড়া আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ John Marshall এর লেখা 'Mahenjo Daro and Indus Valley Civilisation নামক পুস্তকে পড়েছি তিনি ঐ একই কথা বলেছেন, তাঁর মতে মহেঞ্জোদাড়ো কথার অর্থ 'মৃতের স্তূপ' — আর্যরা ঐ দুটি সুসভ্য ও সমৃদ্ধ নগরীর আক্রমণ করে দুই লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এই হল মোটামুটি কথা। আরও অনেক বলার আছে। অনেক স্ববিরোধও এঁদের উক্তিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন ৫ পাতায় এক জায়গায় বলা আছে যে গ্রীকরা অঙ্ক শিখেছিলেন ভারতীয়দের কাছ থেকে। অর্থটা এই রকমই দাঁড়াচ্ছে। আর কতই বলব।

আপনি বইখানি একবার দেখবেন। আমার প্রথম এবং প্রধান জিজ্ঞাস্য হল বেদের মর্মোপলব্ধি হয়ত বা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে হয় নি — হওয়া কঠিন। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতকুলতিলকেরা কি যথার্থ উপলব্ধি করেছেন বেদের মর্মবাণীকে? এই বই-এর বিষয়বস্তুই কি সত্য? না এটা মিথ্যা, ভ্রম, পল্লবগ্রাহিতার প্রতিফলন মাত্র? নাকি বেদের এ রকম অর্থও আছে যা সাধারণের কাছে প্রকাশ হয় — আর আসল মর্মার্থ কেবল সাধন-সাপেক্ষ— সেটা অপরোক্ষানুভূতি ভিন্ন হয় না? কোনটা ঠিক?

পুরোহিতজী চলে গেলেন। বইটি নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। সান্ধ্য আরতির পর পুরোহিতজী আমাদের কাছে এসে বসলেন। বইটি সম্বন্ধে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম —

UNESCO-র উদ্যোগে অর্থানুকুল্যে Luigi Paretti এর সম্পাদনায় History of Mankind নামক বিরাট পুস্তকের ছত্রে ছত্রে আপনার কথিত শুধু 'Villification of Vedas' তো বটেই যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবান অবদানকে কার্যতঃ অস্বীকার করে তাকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। পূর্বে এই বই আমার পড়া ছিল না। সেটা আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনে মা নর্মদার সামনে বসে এই নর্দমা ঘাঁটতে গিয়ে আমার বিবমিষা দেখা দিয়েছে। আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য তাঁদের International Commission এর ফাঁদে পা দিয়ে জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, কে.এম. পান্নিকার, ডঃ সুনীতি চাটুজ্জ্যে, রমেশ মজুমদার, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বিশ্রুত পণ্ডিতগণ কেন যে এতবড় ভুল করলেন, পবিত্র মাতৃ অঙ্গে কালি ছিটোলেন তা বিধাতারও অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে বেদ বুঝা দুষ্কর কারণ তাঁদের সেইরূপ মানসিকতাই নেই। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতরা সজ্ঞানে যদি এই অপকর্মের অংশীদার থাকেন তাহলে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কি থাকতে পারে? আরও Tragedy এই, ঐ পণ্ডিতরা বহু অধীতী হলেও তাদের হাতে অপরে যে 'গঞ্জিকাসেবন' করে গেলেন তা তাঁরা বুঝেও বোঝেননি। History of Mankind এর উদ্যোক্তাদেরকে কোনমতেই দোষ দেওয়ার সুযোগ নেই। তাঁরা এই পুস্তক রচনা করতে দিয়ে স্থালীপুলাক ন্যায়ানুসারেন্ কাজ করেছেন। তাঁদের এই কার্যক্রম নিশ্ছিদ্র।

বেদ বুঝতে হলে যে ধরণের মানসিকতার প্রয়োজন শুধু মানসিকতাই বা বলি কেন বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য যে তপস্যা শ্রদ্ধা এবং সর্বত্রগামিনী ধীশক্তির আবশ্যক হয় তা বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে আশা করা বৃথা। শুধু তাঁর উপর দোষারোপ করলেও আমাদের একদেশদর্শিতা হবে। আপনি ঐ বইতে দেখেছেন আমাদের

স্বদেশীয় পণ্ডিতরাই নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো যে সাক্ষীগোপালের কাজ করেছেন তার মূলেও আমাদেরই স্বদেশী পণ্ডিত কুলচূড়ামণি সায়ণাচার্যের ভাষ্যকে সর্বত্র অন্ধের মত অনুসরণ করার ফলমাত্র। এঁদের দুঃসাহস দেখে অবাক হই যে এঁরা তাঁদের ধৃষ্ট কলমের মুখে যথেচ্ছ মন্তব্য করার পূর্বে একবারও ভেবে দেখেননি, যে বেদকে অপৌরুষেয় দিব্যজ্ঞানের আলো প্রভৃতি বলে ঋষিরা বর্ণনা করেছেন, যে মহাগ্রন্থের মূল পাঠ তার প্রত্যেকটি নির্ভূল স্বরচিহ্ন হাজার হাজার বছর ধরে অবিকৃত অবস্থাতে সুরক্ষিত হয়ে আসছে তার সেই অমেয় এবং দুর্মর প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করার কথা একবারও কেউ গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখলেন না। অবশ্য একথা স্বীকার করা ভাল যে বেদের অর্থ বুঝার মূলে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। মজার কথা এই যে তাও বেদোক্ত বেদের গূঢ়ার্থ নির্ণয়ে সবচেয়ে বড় অন্তরায় বেদেরই নিজস্ব সাংকেতিক ভাষা। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা পরবর্ত্রীকালে সন্ধ্যা ভাষার মত আলোছায়া এবং কুহেলির জাল বুনে সমাধির ভাষায় সেই অব্যক্ত তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলেই বর্তমান কালে বেদার্থ অনুধাবনে বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে। যতদিন বেদ সত্যদ্রষ্টা ঋষি বা ঋষিকল্প সনাতনী পণ্ডিতদের হাতে ছিল ততদিন দুর্বোধ্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তা ঋষিদের হাত হতে পুরোহিততন্ত্রের কবলে এল তখন থেকেই বেদ ক্রিয়াকাণ্ডবহুল কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেল। সায়ণভাষ্য সেই যুগ সেই ধারার দুঃখজনক অনুবর্ত্তন হওয়ার ফলে বিভ্রাটটা আরও গুরুতর আকারে রূপ নিয়েছে।

বেদার্থ নির্ণয়ে সবচেয়ে মূল্যবান জীবন্ত মহাগ্রন্থ হল মহর্ষি যাস্কাচার্য প্রণীত মহাকোষ নিরুক্ত এবং নিঘন্টু। সকলে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন যে বেদের প্রাচীনত্ব অমেয়। তার রচনাকালের বয়স প্রায় গণনাতীত কিন্তু বিচার করার সময় সাম্প্রতিককালের ভাষা এবং ব্যাকরণকে আশ্রয় করে তারা বেদের ভাষ্য পড়তে বসে যান। বেদের ছন্দ এবং সাহিত্যিক সংস্কৃত ছন্দের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। বিশেষ করে যে কোন ছাত্র একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন বৈদিক ভাষায় সন্ধির প্রয়োগে যথেষ্ট উদারতা এবং সাবলীলতা ছিল। পরবর্ত্তীকালের ভাষায় এবং ব্যাকরণ সূত্রে যত্রতত্র সন্ধির নিময়াবদ্ধ প্রয়োগ সমগ্র ভাষা শৈলীকে যে অযথা জটিল করে তুলেছে তা চোখে না পড়ার কথা নয়। সব জীবন্ত ভাষাতে যেমন হয় সেই ধারা অনুসরণ করেই বৈদিক ঋষিরা ব্যাকরণের নিগড় তার কঠিন নিয়মাবলী গতানুগতিকভাবে মেনে চলতেন না। সন্ধি এবং সমাস তাদের আত্ম উপলব্ধিকে কোনমতেই কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারে নি। তারা অন্তরের অনুভূতি অনুসারে দুইটি স্বতন্ত্র শব্দের সন্ধি বা সমাস কখনও করতেন কখনও করতেন না। তারা কখনও সন্ধিবিচ্ছেদ করে কখনও বা দুইটি পৃথক শব্দ আলাদা আলাদা দেখিয়ে যুগ্ম এবং বদ্ধ শব্দগুলিকে ভেঙে ভেঙে বেদমন্ত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং কাব্যময় ব্যঞ্জনা (Spontaniety of Lyric rapture) সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যে সব পণ্ডিতরা বেদমন্ত্রের ভাষ্য এবং টীকা করতে গেলেন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ততার দিকে নজর দিলেন না। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলাটাই যেন তাঁদের কাছে মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে বেদের যে সাংকেতিক ভাষা নির্ভূল স্বরসঙ্গতিএবং ছন্দ বজায় রেখে স্বতঃই পাঠকের চিত্তে গূঢ়ার্থকে উদ্দীপিত এবং স্পষ্টীভূত করে তুলত সেই প্রাণের গতিটি ব্যাকরণের শৈবালদামে রুদ্ধ হয়ে গেল। বেদের অর্থ নির্ণয়ে ভুলভ্রান্তির মূলে এটিও একটি প্রধান কারণ। বেদ্যাধ্যায়ী মাত্রেরই এটি ভাবনা করা উচিত বেদে কোন সূক্ত যদি পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বেদমন্ত্রের বিন্যাসের মূলে কোন ত্রুটি নেই আমরাই তার সংযোগ সূত্রটি ধরতে না পারায় তার অর্থ গ্রহণ করতে পারি নি। এই সংযোগ সূত্রটি প্রকৃতপক্ষে এমনই সরল যে তা ধরতে পারলেই বেদমন্ত্রের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অনবদ্য ছন্দ ও সজীব ভাষার মহত্ব উপলব্ধিতে কোন বাধা থাকে না। ঋষিদের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন পণ্ডিতদের বোধি বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এমনি একটা তেজ ছিল যাতে বেদ নিহিত গুপ্তরহস্য আংশিকভাবে হলেও পুনরুদ্ধার করা যেতে পারত। কিন্তু পরবর্তীকালে যে নীরস পাণ্ডিত্য এবং ব্যাকরণের শুষ্ক নিয়মের জঞ্জাল পথের দিশা না দিয়ে বিপথে ভুলিয়ে দেয় সেই ভ্রান্তি সকলকে গ্রাস করে বসল। নিরুক্তে শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করে যাস্ক যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন বিজ্ঞান সম্মত ব্যাকরণের বা শব্দগঠনের (Itimology) সেইটাই হল মূল আধার। কিন্তু সায়ণ এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী স্বদেশী বা বিদেশী পণ্ডিতের দল সর্বথা যাস্ককে অনুসরণ করেন নি। তাঁরা যদৃচ্ছাক্রমে অন্বয় করে মূল ভাষার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছেন। তিনি অনেক স্থলে কল্পিত অর্থ স্থাপন

করতে গিয়ে এমনভাবে সুনির্দ্দিষ্ট সব সূত্রের এক এক স্থলে এমন অর্থ করেছেন যা পূর্বাপর বিরোধী এবং সঙ্গতিহীন। কিন্তু এহ বাহ্য। সায়ণ ভাষ্যের প্রধান দোষ হল তিনি সর্বদা আনুষ্ঠানিক বিধান নিয়ে মেতে আছেন এবং অবিরাম বেদের অর্থ জোর করে তাঁর কষ্টকল্পিত এবং সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। যেমন বেদে বৃত্র শব্দের অর্থ আবরণ, যা আচ্ছাদন করে রাখে মানুষের কাছ থেকে তার মনোরথ এবং অভিপ্সাকে, যা আচ্ছাদন করে রাখে, দূরে সরিয়ে রাখে যা দিব্য বস্তুর আবরক তারই নাম বৃত্র। কিন্তু সায়ণ সেই গূঢ়ার্থ না গ্রহণ করে বৃত্র শব্দের অর্থ করেছেন, কখনও মেঘ কখনও বা ইন্দ্রশত্রু এক দৈত্য! ঋষিরা নৈসর্গিক চিত্রের মধ্যে দিয়েই অনৈসর্গিক তত্ত্বকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন! এর কারণ অতি পরিচিত দৃশ্যমান পদার্থের ভিতর দিয়েই অদৃশ্য বোধাতীত তত্ত্বকে উপলব্ধি করা সহজ হবে। তাই ইন্দ্র, মরুৎ, বরুণ, উষা, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি দেববাচক এবং প্রকৃতিবাচক শব্দগুলি একই ব্রহ্মের প্রকাশ হলেও সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োগ করে তারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে সাধকমাত্রই যিনি ভূমিতে থাকবেন সেই সেই ভূমি থেকে তাঁর স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই আরোহক্রমে সেই একমেবাদ্বিতীয় তত্ত্বে উন্নীত হওয়ার পথে কোন বাধা নেই। সায়ণ তাঁর বেতনভুক পণ্ডিতদের সাহায্যে এই সুগভীর রহস্যটি বুঝতে না পেরে অর্থ করে বসলেন যে মিত্র হলেন দিন, বরুণ হলেন রাত্রি, অর্যমা এবং ভগ হলেন সূর্য, ঋভুরা হলেন জলের দেবতা ইত্যাদি। বেদে প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা রয়েছে বলে বিদেশী পণ্ডিতরা যে তারস্বরে চিৎকার করেছেন সায়ণ-ই হলেন তার পথ প্রদর্শক। সায়ণ ভাষ্যের মধ্যে বেদের নৈসর্গিক ব্যাখ্যার বীজ নিহিত। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা সেই মতকেই ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। সায়ণপন্থী এদেশী পণ্ডিতরাও যে উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যার দোষে বেদকে Mythology এবং Myth এর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন এটিও তার প্রধান কারণ।

সায়ণ ভাষ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের চিন্তাই সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাঁর মতে যেন এইটিই হল বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু। অনুষ্ঠানপ্রিয়তা এত বেশী যে তার চাপে বেদমন্ত্রগুলি পিষ্ট এবং নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। দর্শনের সব শাখাতেই বেদের সূক্তকে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তার প্রয়োগটিকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সায়ণ সর্বত্র এই ধারণা নিয়ে কাজ করেছেন এবং এই ছাঁচে ঢেলেই বেদের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করেছেন। গভীর ভাবোদ্দীপক প্রত্যেকটি পরিভাষার এবং সংজ্ঞার টেনেটুনে এমন অর্থ বের করেছেন যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব মন্ত্রই যেন আড়ম্বর সর্বস্ব যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি বিধানের জন্যই প্রযোজ্য! হোতা দাতা ধন স্তুতি যজ্ঞ যজ্ঞবিধি সব কিছুর উদ্দেশ্য হিসাবে ধরা হয়েছে ঐহিক ভোগের যেন উপকরণ মাত্র। যেন সম্পত্তি বল ক্ষমতা দাসদাসী সন্তান স্বর্ণ গো অশ্ব যুদ্ধজয় এবং শত্রুদলনই ছিল বৈদিক ঋষিদের একমাত্র পরমার্থ। বেদের এই নিকৃষ্টতম যতপ্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে তার মধ্যে হীনতম হলেও সেই সায়ণভাষ্যকে চিরকালের জন্য প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করার রীতি ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে যে প্রবর্ত্তিত হয়েছে সেটাই সবচেয়ে বড় Tragedy. বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে এই তথাকথিত প্রামাণ্যের মুগুর হতে পরিত্রাণ পেতেই হবে। তার একমাত্র উপায় হল সনাতন আর্ষ পদ্ধতির অনুসরণ। বর্তমানকালের ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ নয় বেদ যে যুগের সেই যুগের বৈদিক ব্যাকরণ বা পাণিনি এবং যাস্কাচার্যের আলোকে বেদার্থ অনুশীলনই পরিত্রাণের একমাত্র পথ। পাশ্চাত্ত্য জগতের মানসিকতা নিয়ে বেদবেদান্ত বোঝা কোনমতেই সম্ভব নয়। বেদের ভাব ভাষা তত্ত্ব এবং অর্থকে বৈদিক দৃষ্টিতেই বিচার করে দেখতে হবে তাহলে বেদ যে অমৃত এবং আনন্দের উৎস তার সন্ধান পেতে স্বদেশী এবং বিদেশী কোন পণ্ডিতের অসুবিধা হবে না। বৈদিক ঋষিরা যে দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎ এবং জীবনকে দেখতেন সেই ভূমি বা দৃষ্টিকোণ হতে তাঁদের ভাব-ভাষার প্রয়োগ উপলব্ধি করতে হবে। History of Mankind গ্রন্থের কয়েকটি অপব্যাখ্যার অক্ষরস্যঃ খণ্ডন করে স্থালীপুলাক ন্যায়ানুসারে সমস্তই যে খণ্ডিত হল তা দেখানোর পূর্বে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বেদ ব্যাখ্যার আর্ষ পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলে নিচ্ছি।

বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে মানবজীবন ছিল সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ — তম হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে যাওয়ার সাধনা, এক কথায় মনের আলো আঁধারি হতে দিব্যসত্যের পূর্ণ দীপ্তিতে ক্রমগতি। তারা দেখেছিলেন মানবজীবন যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। দেবাসুরের সংগ্রাম — জ্যোতির সন্তানদের সঙ্গে রাত্রির সন্তানদের অবিরত যুদ্ধবিশেষ। তাঁদের চোখে জীবন ছিল যেন অবিরাম পথ চলা। তাঁরা এর পরিভাষিক নাম

দিয়েছিলেন অধ্বযাত্রা, অধ্বযাজ্ঞ। এগুলির বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন তাঁদের অভিনব নিজস্ব পদ্ধতিতে এক একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিত্রের মনোরম আলপনায়। তাঁদের জীবনযাত্রাও যেমন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর তেমনি ঐ সংকেতগুলি বুঝবার জন্য বেদে তার তদনুরূপ শব্দ রূপক চিত্র এবং উপমাও ব্যবহার করেছেন। সেগুলো তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব সহজ সরল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সূর্য চন্দ্র মেঘ রাত্রি দিবা ঊষা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে। অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত ছিল যে পারিপার্শ্বিক জীবন তাই ছিল তাঁদের উপমাস্থল। প্রাকৃতিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তাঁরা তাঁদের মন্ত্রে ব্যবহার করলেও সেগুলির স্থূল রূপে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রকাশ থাকত তাঁদের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের মর্মে। সেই মহত্তম ভাব প্রকাশের জন্য তাঁরা এমন এক এক শ্রেণী নির্বিশেষ অর্থবিশিষ্ট নমনীয় চিত্র ব্যবহার করতেন যে তাতে রূপক এবং রূপকথা ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকত — ঠিক যেন সব মণিখচিত ঝালর। আর পরমাশ্চর্যের কথা এইরকম পার্থিব চিত্রের দ্যোতনার দ্বারাই তাঁরা ঊর্ধ্বজগতের তত্ত্বকে পরিস্ফুট করতেন। দু একটি উদাহরণ দিলে এই ছবিটি স্পষ্ট হবে।

'হে রশ্মি ক্রিয়া কর সচল হও আবির্ভূত হও আমাদের দিকে চেয়ে'।

অগ্নির উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের এই যে উক্তি লক্ষ্য করে দেখুন এর মধ্যে একসঙ্গে দুটি ভাব প্রকাশ করা হল। এর দ্বারা একদিকে যেমন স্থূলবেদীর উপর অগ্নির জ্বলে ওঠা এবং তার উজ্জ্বল শিখার খেলাটিও যেমন বুঝাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বুঝাচ্ছে অনুরূপ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা — আমাদের হৃদয়বেদীতে দিব্যশক্তি আলোকের নিস্তারিণী চিদ্‌শিখার আবির্ভাব, মুক্তযোগীর ত্রিকূটিতে দ্বিদলপদ্মে দীপকলিকাকার আত্মার জলদর্চিমান প্রকাশ।

'পৃথিবী ও স্বর্গের পুত্র ইন্দ্র তার জনক জননীকে সৃষ্টি করিলেন'।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৫৪ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে এই পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন উক্তিকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এবং আধুনিক যুগের শিক্ষিতগণ উদ্ভট ভেবে নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন কিন্তু যদি পাণিনি নিরুক্ত এবং নিঘন্টুর সাহায্যে বুঝে নেওয়া যায় ইন্দ্র শব্দটির বৈদিক অর্থ কি? এবং স্মরণে রাখা যায় যে ইন্দ্র হলেন পরমপুরুষের একটা শ্বাশত নিত্যবিভাব। তিনিই স্বর্গ পৃথিবীর স্রষ্টা; স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের তিনিই জনয়িতা একমরূপে তিনিই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট তারই চিদ্‌কণা পিতামাতার বীর্য এবং রজঃএর মধ্যে অনুস্যূত আছে বলেই এই আপাত রম্য জগতরূপী রঙ্গমঞ্চের অবতারণা। তাহলেই বুঝতে পারা যায় এই চিত্র কত সমর্থ কত বাস্তব কত সুপ্রযুক্ত কত অল্পকথায় কেমন সুন্দর ও স্পষ্ট করে একটি নিগূঢ় সত্য বৈদিক ঋষি উদ্‌ঘাটন করে দিলেন। এসব তত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের পক্ষে জন্মজন্মান্তরেও ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ র‍্যাফেল অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহৎ শিল্পীর art একজন আনাড়ীর স্থূলদৃষ্টিতে কতগুলি রেখার হিজিবিজি মাত্র। কিন্তু art এর প্রকৃত বোদ্ধা যিনি তাঁর কানে এবং মনে ঐ রেখা রঙ ও তুলির আঁচড়গুলি জীবন্ত হয়ে কথা বলে। একটা অরূপ জগতের ভাবব্যঞ্জনা বোদ্ধার প্রাণে সুন্দরমকে প্রকাশ করে দেয়।

এখন বিচার করে দেখুন সাধারণ মানুষের সামান্য দৃষ্টিতে সমুদ্র অগাধ জলরাশি মাত্র। এই অপার জলরাশি তার মনে বড় জোর একটা বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু ঐ একই সমুদ্র দেখে ভাবুক ও দার্শনিকের প্রাণে অনন্তের ছোঁয়া লাগে। সমুদ্রের জলতরঙ্গ তার প্রাণে দিব্যতরঙ্গ তোলে, তিনি সমুদ্র কল্লোলের মধ্যেই নন্দনলোকের ডাক শুনতে পান। কোন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-বিশারদ বাদ্যযন্ত্রে রাগ-রাগিনীর আলাপ করতে থাকলে সাধারণের কানে তা অর্থহীন চিৎকার, কতগুলো শব্দের ঝনঝনানি বা একটা শ্রুতিকটু কোলাহল মাত্র বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত রসিকজনের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঐ একই শব্দের ঝঙ্কার, তাল, লয়, মানের সূক্ষ্ম কারুকলা, ঐ সুরের মূর্চ্ছনা অপার্থিব আনন্দের জোয়ার আনে। তার ভাবদৃষ্টিতে রাগ-রাগিনী মূর্ত হয়ে উঠে। তিনি দিব্য আনন্দে বিভোর হন।

সারকথা বেদ প্রণীহিত জ্ঞান কেবলমাত্র মনন বা বুদ্ধির বিচার নয়, ধী শক্তির দ্বারা সত্যের একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ অন্বেষণ বা আবিষ্কার করাও নয়, এই জ্ঞান হল সত্যকে আত্মার প্রদীপে দেখা। বৈদিক ঋষিরা যেমন করে বেদমন্ত্রের সাক্ষাৎকার করেছিলেন তেমনিভাবে দেখতে হয় বেদকে স্বরূপের আলোকে অনন্তের চোখ দিয়ে। এই অনন্তের চোখ বা আত্মার প্রদীপে দেখতে পারলে তবেই বেদাধ্যয়ন বা বেদচর্চা সার্থক হয়। বেদের প্রতিটি মন্ত্র ঋষিদের জীবনব্যাপী সাধনার অপরোক্ষানুভূতির (Direct Realization) ফল। এই অর্থেই বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়।

সমগ্র ঋষিদের সামগ্রিক অনুভূতির সমষ্টিপ্রকাশ, সেই সামগ্রিক জ্ঞানের নাম যদি বেদ হয় তাহলে তা কোন পুরুষবিশেষের দৃষ্ট বা সৃষ্ট একথা বলা যায় না। কাজেই কোন বিশেষ লোক নিজেকে বেদমন্ত্রের রচয়িতা হিসাবে দাবী করতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা সায়ণের ভাষ্য অনুসরণ করে অপৌরুষেয় অর্থে কোন লোকের দ্বারা রচিত নয় — এই ভেবে এই তথ্যকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় মানব সভ্যতা বলতে কি কোন বিশেষ মানুষের অবদানকে বুঝায়? তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে কালে কালে সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে সমগ্র মানবসমাজের যে অবদান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত যে প্রগতিশীল প্রবহমানতা তারই নাম যদি মানব-সভ্যতা হয়, তা যেমন কোন বিশেষ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয় তেমনি মানবীয় জ্ঞানের সামগ্রিক রূপের নামই বেদ; এই অর্থেও বেদ অপৌরুষেয়।

বেদমন্ত্র শুধু তত্ত্বকথা নয় — বেদমন্ত্রের মত আনন্দ পরিপ্লাবিত সাহিত্য পৃথিবীতে আর কোথাও নাই; এর কাব্যগত সৌন্দর্য্য অমেয়, ভাগবত ঐশ্বর্য অসীম। অসীম তত্ত্বের সাধকরা খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তাঁদের হৃদ-পুণ্ডরিক মধুরসে নিষিক্ত করে বৈখরীতে প্রকাশ করেছেন তাঁদের উপলব্ধ সত্য। অহং এর কেন্দ্র হতে দৃষ্টি অর্থাৎ চৈতন্য যখন সেই নিত্যসাক্ষী অখণ্ড চৈতন্যের কেন্দ্রে স্থাপিত হয় তখনই আমাদের ভৌম-দৃষ্টির আবরণ হয় উন্মোচিত এবং সেই মুক্ত দৃষ্টির বলেই অমর্ত্য জগতের সংবাদ তাঁরা পরিবেশিত করেছেন বেদমন্ত্রের ছত্রে ছত্রে। তারফলে সেই অখণ্ড দৃষ্টির আলোতেই তারা জগতের সত্যরূপটি ঋকের দোলায় উদঘাটিত করেছেন। তাঁরা এই ধূলি ধুসরিত ধরণীর মর্ত্য মানুষের কাছে আনন্দবার্ত্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে সেই নিত্যকালব্যাপী স্পর্শানুভূতির একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আনন্দের হিল্লোল তুলে বয়ে চলেছে সাগর সঙ্গমে। 'এই নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে তোমরা আত্মচৈতন্য এবং ব্রহ্মচৈতন্যের সাযুজ্য লাভ করো।'

এই পরম অবস্থা বেদমন্ত্র মননের ফলে সম্ভব হয় এবং তা যখন সম্ভব হয় তখন এই বিশ্বপ্রকৃতির খণ্ড খণ্ড প্রকাশ যথা নদী ঝর্ণা পর্বত ঊষা অগ্নি সূর্য বিদ্যুৎ সব কিছুকে একটা মহাকাব্য বলে মনে হয় — যে মহাকাব্য আনন্দেরই উজ্জ্বল স্ফূরণ। কাজেই তারা প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েছেন বলেই সেটা তাদের প্রকৃতির পূজা নয় — প্রকৃতির দৃশ্যমান প্রেক্ষাপটে কাব্যপাঠ মাত্র। তাই তাঁরা আনন্দ উচ্ছ্বাসে কলকণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন।

অন্তি সন্তং ন জহাতি, অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যম, ন মমার জীর্যাতে।।

অর্থাৎ কাছে আছেন তাকে ছাড়া যায় না। কাছে আছেন তাকে দেখা যায় না, দেখ দেখ কৃতির অন্তরালে সেই পরমাশ্চর্য দেবতার অর্থাৎ ব্রহ্মের কাব্যবিলাস — যে কাব্য মরে না জীর্ণ হয় না। ঋষিরা এই অজর অমর দেবস্য কাব্যের একাধারে পাঠক এবং শ্রোতা। নির্বোধ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী স্বদেশী পণ্ডিতদের ভৌম দৃষ্টিতে বেদবাণীর এ রহস্য অনুধাবন করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

ঐ নির্বোধদের বেদমন্ত্র সম্বন্ধে ধৃষ্ট মন্তব্যের জবাব দেওয়ার পূর্বে অর্থাৎ তা অক্ষরসঃ খণ্ডন এবং তা চূর্ণ বিচূর্ণ করার পূর্বে বেদমন্ত্র নিয়ে তথাকথিত পণ্ডিতদের কেন ব্যাখ্যা বিভ্রাট ঘটেছে সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

নৈমিষারণ্যে আমি যখন বেদ মনন করতাম তখন আমার একজন অন্তেবাসী সহপাঠী (পণ্ডিত দ্বিজদাস) পণ্ডিত্যাভিমানী ম্যাক্সমুলার এরই এক বন্ধু Bloomfield সাহেবের সঙ্গে বেদমন্ত্রের বিচার প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ হচ্ছে —

'To show how a word may deceive a Vedic student and may be the mother of all kinds of legends, myths and superstitions, we will cite one example from Rikveda. The word 'হস্তী' today, we all know, means an elephant and in that sense we meet with the word 'হস্তী' even in the Rikveda

'মৃগাইব হস্তিনঃ খাদথাবনা'। (১ম৬৪ম৭)

The Marut or God in storm – like a wild elephant destroys the forest. Again we have in the Rikveda

'অংশুং দুহন্তি হস্তিনঃ'। (৩ক্টঙ৬ক্ট৭)

If you take 'হস্তিনঃ' here in the sense of elephants and interpret it as, 'the elephants cut the soma creeper into small pieces and extracted the juice, you might accuse the Rishis of the wildest superstitions and perversities, such as believing elephants like men to have performed the soma sacrifice ! More formidable still is the, the universal food giver (ইন্দ্র) or God himself is called in the Rikveda a great elephant – মহাহস্তী—

আ তু ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রম গ্রামং সংগ্রীভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন। (৮ক্ট৮১ক্ট১)

If you interpret মহাহস্তী as a great elephant, you might accuse the Rishis of believing the elephant also to be an incarnation of God and swell the number of animal-avatars by adding Fish, Tortoise (কূর্ম) and elephant also in the category ! But to go back to the root meaning of 'হস্তী' as one having a hand, the elephant is a 'হস্তী' because of his human hands. So also God is মহাহস্তী i.e. great handed, meaning thereby he is almighty. It is on this 'Parnomasia' or শ্লেষালঙ্কার in the Rikveda that Swami Dayananda lays the greatest stress for it was a necessary condition of the Rishis'. very existence and without realising if you could not catch the Rishi's true meaning.

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে We শব্দের প্রয়োগের হেতু ঐ বিচারযুদ্ধে আমিও পণ্ডিত দ্বিজদাসের সঙ্গী ছিলাম এবং আমাদের সেই বক্তব্য Northern Express পত্রিকাতে Rikveda Unveiled নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বৈদিক ব্যাকরণে সূত্রগুলি সর্বদাই প্রাঞ্জল। বর্ত্তমান যুগের প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বেদার্থ বুঝতে গিয়ে পণ্ডিতদের দল তাকে অযথা জটিল করে তুলেছেন।

Legui Paretti এবং তাঁর International Commission এর সদস্য হিসাবে ধুরন্ধর পণ্ডিতবর্গের অপরিমেয় মূর্খতার প্রমাণ 'পুরুষমেধঃ' শব্দটির অর্থ বিভ্রাট। অশ্বমেধ গোমেধ এবং পুরুষমেধ এইসব শব্দের তাঁরা অর্থ করেছেন যথাক্রমে যজ্ঞে গোহত্যা, অশ্বহত্যা এবং মানুষহত্যা। একবার কল্পনা করতে ইচ্ছা হয় এই Legui Paretti এবং তার সহচর পণ্ডিতবর্গ মনে করুন যেন বৈদিক যুগের জীব, বৈদিক যুগে নিত্য যজ্ঞ করতে হত মুহূর্তের জন্য ভেবে নিন এবং কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে থাকুন আপনিও সেই যুগেরই একজন সমকালীন বাসিন্দা হিসাবে দেখছেন Legui Paretti, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশ মজুমদার, কে.এম. পান্নিকর প্রভৃতিরা ঋত্বিক, প্রতিঋত্বিক, অধ্বর্যু এবং অগ্নিহোত্রী হিসাবে গোমেধ, অশ্বমেধ এবং পুরুষমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি এবং সংস্কার অনুযায়ী। আপনি দেখছেন তাঁরা গোমেধ যজ্ঞকালে গোহত্যা, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অশ্বহত্যা এবং পুরুষমেধ যজ্ঞকালে human sacrifice করে চলেছেন। সহসা একদিন পিতৃমেধ যজ্ঞের তিথি এল। আপনি কি দেখবেন? আপনি কি দেখবেন ঐ পুরুষ প্রবরের দল স্ব স্ব পিতৃদেবকে হত্যা করে ঐ যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন? পুরুষমেধ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে মেধ শব্দটির ব্যুৎপত্তি বোঝা চাই। মেধ শব্দ মিথ্ হতে নিষ্পন্ন। মিথ্ ধাতুর অর্থ নিরুক্তে রয়েছে বিকলনে বিপনে এবং বোধনে। গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় কাজেই গোমেধের অর্থ ইন্দ্রিয়ের বিকলন বা নাশ। অশ্ব শব্দের অর্থ বর্ত্তমানে আমরা ঘোড়া বুঝলেও এর বৈদিক অর্থ হল সূর্যরশ্মি বা জ্ঞানরশ্মি। কাজেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অর্থ হল যজ্ঞে অর্থাৎ যোগক্রিয়া অনুষ্ঠানে জ্ঞানরশ্মি দীপনা। অনুরূপ অর্থেই পুরুষমেধ শব্দের অর্থ —

য পুরয়তীতি স পুরুষ তস্য বোধনং পুরুষমেধম্।

বৈদিক ব্যাকরণ এবং লৌকিকব্যাকরণের মধ্যে এত বেশী প্রভেদ যে যথোপযুক্ত আর্ষ পদ্ধতিতে পাণিনি এবং পাণিনির পূর্ববর্ত্তী আচার্যদের ব্যাকরণ শাস্ত্রের শব্দ বিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে নিরুক্ত এবং নিঘন্টু বর্তমান যুগের প্রচলিত শব্দকোষের অর্থানুযায়ী বৈদিক যে কোন একটি শব্দও অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

সায়ণ থেকে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ম্যাক্সমুলার থেকে Legui Paretti (History of Mankind এর সম্পাদক) সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পণ্ডিত হলেও তারা কেউ সজ্ঞানে আবার কেউ বা অজ্ঞানতা বশতঃ লৌকিক ব্যাকরণের সাহায্যে শব্দের প্রচলিত অর্থানুয়ায়ী বেদ বুঝবার অপচেষ্টায় এই মারাত্মক ভুল করেছেন। বৈদিক

সংস্কৃত এবং লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যে প্রভেদটি যে কত বড় তা বুঝবার জন্য কয়েকটি শব্দের তুলনামূলক অর্থ বিচার করে দেখাচ্ছি —

| বৈদিক শব্দ | বৈদিক অর্থ | লৌকিক সংস্কৃতে অর্থ |
|---|---|---|
| বিষ্ণু | সূর্য | চতুর্ভুজ দেবতা |
| বিষ | জল | গরল |
| অগ্নি | ভৌতিক অগ্নি বা ঈশ্বর | সাধারণ আগুন |
| হিরণ্য | জ্যোতি পৃথিবী, বাণী বাক্য | স্বর্ণ, গাভী বা গৃহপালিত জন্তু |
| অহি | মেঘ বা পর্বত | সাপ |
| ইন্দ্র | বিদ্যুৎ | দেবরাজ |
| বৃত্র | মেঘ | অসুর বিশেষ |
| অশ্ব | শীঘ্রগামী বাহন | ঘোড়া |
| ধেনু | বাণী বা বাক্য | গরু |
| পুরীষ | অমৃত | বিষ্ঠা বা মল |
| ব্রাত্য | পবিত্র অতিথি | নীচ বা পতিত বা আচারভ্রষ্ট |
| অমৃত | জল | দেবতাদের পানীয় (যা পান করলে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে সমর্থ হয়) |
| কূর্ম | প্রজাপতি | কচ্ছপ |
| কশ্যপ | সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বর | জনৈক মুনির নাম |
| গয়া | প্রাণ | তীর্থ বিশেষ |
| গৌতম | চন্দ্রমা | ঋষি বিশেষ |
| অহল্যা | রাত্রি | ঋষি গৌতমের স্ত্রী |
| গৌরী | বাণী বা বাক্য | শিবের স্ত্রী |
| ঘৃতম | জল | ঘি |
| মেধ | বিকলন বা দীপন | নাশ বা হত্যা |

উপরের তুলনামূলক তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে আশা করি বুঝতে পারবেন কৃতবিদ্য পণ্ডিতদের অর্থ বিভ্রাটের হেতু কি? দুঃখের বিষয় ভারত বা ভারতের বাইরে পৃথিবীর বরেণ্য পণ্ডিতবর্গ যথোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে বেদাধ্যয়ন না করেই বেদ সম্বন্ধে যথেচ্ছ মন্তব্য করে গেছেন তাঁদের এই বেপরোয়া ধৃষ্টতাকে বেদের উপর বলাৎকার বলা যায়।

সর্বজনমান্য ঐ সব পণ্ডিতবর্গ সম্বন্ধে আমার এই রূঢ় কঠিন শব্দ প্রয়োগ করার হেতু তাঁরা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধাত্রী স্বরূপা ভারতাত্মার মর্মবাণী ব্যাখ্যা করার মত যোগ্যতা এবং দক্ষতার অধিকারী না হয়েও একের পর এক মন্তব্য করে চলেছেন। Legui Paretti এবং তাঁর সহযোগীরা যে যে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন সেইসব মন্তব্যের উৎস বা source এর কোথাও নামোল্লেখ করেন নি, বৈদিক মন্ত্রের কোন কোন শ্লোক পড়ে তাঁরা এইরূপ মন্তব্য করার মত উপাদান পেলেন তার সংখ্যাসূচী এবং প্রসঙ্গের নামগন্ধ ঐ বই-এর কোথাও পাওয়া যাবে না। অথচ কোন বিষয়ে মন্তব্য করতে গেলে, খণ্ডন ও মণ্ডন যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, নির্দিষ্টভাবে সেইসব শ্লোক সংখ্যা অধ্যায় সর্গ বা মণ্ডলের নামোল্লেখ করা সভ্য সমাজে সর্বজনমান্য রীতি।

এই রীতি লঙ্ঘন করেই তাঁরা বলেছেন বৈদিক যুগের মানুষদের অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু পাটীগণিত যে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের বিজ্ঞান, বৈদিক ঋষিরাই যে তার উদ্ভাবক একথা আজ প্রমাণিত সত্য। পাটীগণিত হিন্দুদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এক থেকে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা ও শূণ্যের আবিষ্কার বিরাট বিরাট সংখ্যা সমূহের কল্পনা ও উদাহরণ। একমাত্র বৈদিক ভারত ছাড়া আর কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে এ তথ্য পাওয়া যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ যে রোম সভ্যতা বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে ঢক্কানিনাদ করেছেন সেই রোমান গণিতে Mille বা ১০০০ এবং গ্রীক গণিতে Myraid বা ১০০০০ এর উর্দ্ধে কোন সংখ্যার নাম তাঁরা কুত্রাপি কোথাও আবিষ্কার করতে পারবেন না। অপরপক্ষে আমাদের বাজসেনীয় সংহিতায় ও তৈত্তরীয় সংহিতায় অযুত বা ১০০০০এর উর্দ্ধে নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত এবং রার্দ্ধ এই উত্তোরত্তর দশগুণ আটটি সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতা, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং সাংখ্যায়ণ শ্রৌত সূত্রেও অনুরূপ রূপে ক্রমবর্ধমান কতকগুলি সংখ্যার শ্রেণী লিপিবদ্ধ আছে। Legui Paretti প্রভৃতি মহাত্মাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় তাঁরা ঐ বাজসেনীয় সংহিতা, তৈত্তরীয় সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থকে বৈদিক সাহিত্য বলে মনে করেন, কি করেন না? সায়ণাচার্যের ভুল ভাষ্য এবং ম্যা`মুলার, উইলসন্ প্রভৃতি কৃত তস্য জার্মানি বা ইংরাজী অনুবাদ পড়ে কি মূল মহাগ্রন্থের রহস্য বোঝা যায়? যদি মূলগ্রন্থ পড়বার মত তাঁদের যোগ্যতা না থাকে তাহলে তাঁরা কি অভিসন্ধিতে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঐরকম মন্তব্য করে বসলেন? এটা কি সজ্ঞানে villificatiion নয়? তাঁদের অপকর্মের স্বাক্ষর ঐ বই পড়ে যাঁদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁদের অবগতির জন্য জানাই যে সাংখ্যায়ণ শ্রৌত সূত্রে ন্যর্বুদের পরেও আরও পাঁচটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। সেগুরি নাম যথাক্রমে নির্খব, সমুদ্র, সলিল, অন্ত ও অনন্তর। সবগুলিই বৈদিক পরিভাষা। শেষোক্ত সংখ্যাটিকে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে গেলে ১ এর পর ১৩টি শূণ্য বসাতে হবে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ করা এবং বর্গমূল নির্ণয় করা এসবই বৈদিক ঋষিদের অবদান। নিখুঁত বর্গ বা perfect square নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয়ে বৈদিক হিন্দুরা যে দক্ষ ছিলেন তা বুঝানোর জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রাচীন গণনানুসারে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে ঃ—

$$\sqrt{২} = ১ + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩.৪} - \frac{১}{৩.৪৩৪}$$

এর দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে এর মান দাঁড়ায় ১.৪১৪২১৬৫ আর বর্ত্তমান গাণিতিক নিয়মানুসারে এর মান দাঁড়ায়

যে কোন নিরপেক্ষ লোক একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন বর্ত্তমান জগতের উন্নত গণিত বিজ্ঞানের গণনা এবং অন্ততঃ দশহাজার বছর পূর্বে প্রকটিত বৈদিক বিজ্ঞানের গণনার মধ্যে তফাৎ কতটুকু। শ্রীধর, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, লীলাবতী প্রভৃতি পরবর্ত্তী যুগের হিন্দু গণিতজ্ঞ প্রণীত 'শুল্কসূত্রে' Ö৩, )-ঈ৫, ঈ২৯, ঈ৬১ প্রভৃতি অনেক অপরিমেয় সংখ্যার স্থুলমান নির্ণয় করা আছে। সেই সুদূরতম অতীতকালে যে বৈদিক ভারত অব্যক্ত গণিত (Algebra), ছন্দগণিত (Differential Calculas), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), মহাকাশ বিজ্ঞান (Space Science) প্রভৃতির রহস্য জানতেন সে সম্বন্ধে পুরীর গোবর্ধন মঠাধীশ ভারতী কৃষ্ণতীর্থ মহারাজের 'Hindu Mathematics' এবং বিভূতিভূষণ দত্ত প্রণীত 'History of Hindu Mathematics' নামক দুটি বই পড়লে অঙ্কশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যাবে।

History of Mankind নামক বিরাট গ্রন্থের ততোধিক বিরাট গবেষকদের আর একটা আবিষ্কার যে তাঁরা বলেছেন মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা নাকি আর্য সংস্কৃতির ধারক বাহক নয়, ঐটি নাকি দ্রাবিড়দের সভ্যতার অঙ্গ এবং তাঁদের মতে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্ত্তী। Legui Paretti এর সগোত্র John Marshall তাঁর বিখ্যাত 'Mahenjodaro and Indus Vallry Civilization' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা নাকি ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিকাশ লাভ করেছিল। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর বিখ্যাত Onion নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে জ্যোতিষ্কের সমাবেশ হতে দেখা যায় তা খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বা ৪৫০০ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। কোন কাল্পনিক কথা নয় এটি জ্যোতিষিক ঘটনার কথা। শুধু তিলক নয় অধ্যাপক Jacobiও তিলকের মত জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা ঐ একই সাল পেয়েছেন। কেবল একজন নয় ঐ দুইজন বরেণ্য পণ্ডিতদের অনুসারেই বৈদিক সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা হতে অন্ততঃ ২০০০ বছর পূর্বের ঘটনা। John Marshall মহেঞ্জোদাড়ো কথাটর অর্থ করেছেন মৃতের স্তূপ। Legui Paretti দের কাছে John Marshall এর মন্তব্য বেদবাক্যের মত গ্রাহ্য যদি হয় তাহলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি কোন গ্রাম নগর বা মানুষের নামকরণ করতে গিয়ে কোথাও কি

কোনোভাবে কেউ কোন অশুভ শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন? একথা সত্য যে পরবর্ত্তীকালে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিরাট ধ্বংসস্তূপ বা মৃতের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। এইরূপ পরিণতি লাভের পূর্বে নিশ্চয় ঐ স্থান একটি জীবন্ত সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিল। প্রথম থেকে তা নিশ্চয় মৃতের স্তূপ ছিল না। প্রথমেই তাহলে তা মৃতের স্তূপ নামকরণ হয় কি করে? Wheeler এবং Mackkey লিখেছেন যে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা নামক পুর বা নগরকে ধ্বংস করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের নাম নাকি পুরন্দর হয়েছে। পুরন্দর শব্দের প্রকৃত অর্থ মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার সভ্যতা। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা না আর্য সভ্যতা সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং ঐ শব্দগুলির প্রকৃত নির্ণয় করার পূর্বে আমি একটি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন করছি।

তথাকথিত পাশচাত্ত্য পণ্ডিতরাই বলেছেন যে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় বিরাট নগর ছিল সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস ছিল। আর্যগণ তথা আর্যদের নেতা পুরন্দর যদি ঐ পুর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করে থাকতেন তাহলে সেখানে বহুবর্ষব্যাপী বিরাট খননকার্যের পরেও Marshal সাহেব এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র দুটির বেশী নর-কঙ্কাল আবিষ্কার করতে পারেন নি কেন? বাকী নর-কঙ্কালগুলি কোথায় গেল? পাশচাত্ত্য পণ্ডিতরাই অনেক মাথা ঘামিয়ে তাঁদের উর্বর মস্তিষ্ক চালনা করে নির্ণয় করেছেন যে নূন্যধিক খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ বৎসর পূর্বে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো নগরী বিদ্যমান ছিল। আর আর্যরা নাকি খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বৎসর পূর্বে ভারতে আগমন করেছিলেন। তাঁদের কোন কথাটি সত্য? ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আর্যরা ভারতে গমন করে তাদের আগমনের ২০০০ বৎসর পূর্বে যে নগরী বিদ্যমান ছিল তা তাদের দ্বারা ধ্বংসসাধন কিভাবে সম্ভব হয়? গঞ্জিকা প্রসাদাৎ গগনবিহারী বা সুরা প্রসাদাৎ জলবিহারী গবেষক ছাড়া এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গবেষণা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব কি? এই প্রসঙ্গে আপনারা জেনে রাখুন মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা সভ্যতা দ্রাবিড়দের সভ্যতা নয়। ঐ সভ্যতা পুরোপুরি আর্যদের অবদান এবং আর্যরাও বিদেশগত জাতি নন। তাঁরা সৃষ্টির প্রথম হতেই ভারতের অধিবাসী। John Marshall কথিত মহেঞ্জোদাড়ো অর্থ মৃতের স্তূপও নয়। মহঞ্জোদাড়ো অর্থ মহা-ইঞ্জ্-দড়ো। সংস্কৃতে ইঞ্জ্ ধাতুর অর্থ নির্দেশ বা সংকেত দেওয়া। দড়ো শব্দের অর্থ দুর্গ। কাজেই মহেঞ্জোদাড়ো শব্দের অর্থ সৈন্যদেরকে নির্দেশ প্রদায়ক দুর্গ অর্থাৎ Military Head Quarter. কেউ যেমন নবজাতক শিশুর নাম মৃত্যু মরণ যম বা প্রেত রাখে না কিংবা কেউ যেমন তার প্রিয় জন্মভূমির নাম প্রেতপুরী, শ্মশান বা নরক রাখে না তেমনি মহেঞ্জোদাড়ো সুসভ্য অধিবাসীরা নিশ্চয় তাদের প্রিয় মাতৃভূমির নাম Marshal সাহেব কথিত মৃতের স্তূপ রাখতে পারেন না। পরবর্ত্তীকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে বলে কার্যতঃ মৃতের স্তূপে পরিণত হবে বলে এই অনুমান করে কি তাদের এই নগরীর প্রাথমিক নামকরণ সম্ভব ছিল?

আমার কথা শেষ হতেই পুরোহিতজী মন্তব্য করলেন — আপনে বহুত শোচনেকা লায়েক বাত্ বাতায়া। ইসমে গহেরা তথ্য ভি হ্যায়। ম্যাঁয় তু বহুত প্রসন্ন হুঁ। হম্ ত নর্মদা মাতাকী পাশ এহি বিনতী করতা হুঁ, আপ্ জিন্দেগীভর ভারতীয় কৃষ্টিকো লিয়ে জীবন বীতা দেনেসে আচ্ছাই হোগা। বৈদিক সংস্কৃতিকে উদ্ধার ঔর প্রোজ্জ্বল করনেকে লিয়ে আপ্ জীবন উৎসর্গ কর দেঁ। নর্মদা মাতা আপকা সাধনাকো সম্ভালেংগে।

আলোচনার শেষ হল তখন বড়জোর দশটা। সবাই শুয়ে পড়লাম একে একে। খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল। বন্য মোরগের ডাক শুনতে পাচ্ছি। তার মানে সকাল হয়ে আসছে। আমরা স্নান সেরে ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে ফেললাম। প্রায় ৩০ ফুট দূর হতে কলকলনাদে বয়ে যাচ্ছেন নর্মদা। আজ চতুর্দশী তিথি। সোমবার। আমরা নর্মদা মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি নিবেদন করে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। পুরোহিতমশাই বললেন — পূর্বদিকে আট দশ মাইল গেলেই পাবেন বাঁদরাভান। সেখানে বৈদিক দেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নির তপস্যাক্ষেত্র আছে। বৈশ্বানর নামে এক রাজাও সেখানে তপস্যা করেছিলেন। বাঁদরাভান প্রসিদ্ধ নর্মদাতীর্থ। পুরোহিতমশাইকে অভিবাদন জানিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি তুলে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে আমাদের যাত্রা হল শুরু। নর্মদার তট ধরে কিছুটা পূর্বদিকে হেঁটে যাবার পরেই কঠিন পার্বত্যপথ শুরু হল। চড়াই-এর পথে এক বিরাট মালভূমিব উপর উঠে এলাম। চারদিকেই শাল, মেহগিনি, পিপলাস গাছের জটলা। পায়ে অল্প অল্প পাথরের খোঁচা লাগছে। পাহাড়তলীতে নর্মদার ধার ঘেঁসে জংলা পাখীর মেলা বসে গেছে। গাছ গাছালিতে ঢাকা মালভূমির মাঝখানে

খাঁড়ি আর খোয়াই। সেই সঙ্গে ইতস্ততঃ ছড়ানো ঝোপ। আমরা ধীরে ধীরে মালভূমি বেয়ে এসে পৌঁছলাম ডাঙ্গা জমির শেষপ্রান্তে, ডাঙ্গার পাড় যেখানে ঢালু হয়ে একটা পাহাড়ী নদীর খাতে নেমে গেছে। পাহাড়ের গোটা এলাকা জুড়ে এঁকে বেঁকে গেছে সেই নদী, গিয়ে মিশেছে নর্মদার সঙ্গে। নদীর এই বিচিত্র ধারার গতিপথকে দেখলে প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই সঙ্গমস্থলের একটু দূরেই একটি শিবমন্দির।

মহানন্দস্বামী বললেন — নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে যে নদী তার নাম তপা। রামায়ণে আছে প্রাচীনকালে রাজা বৈশ্বানর নিজ হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য মন্দার পর্বতে ঘোর তপস্যায় রত হন। তথায় নারদ উপস্থিত হয়ে তাঁকে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে বলতে লাগলেন —

বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষদ। উপনিষদ সমূহই বেদের অন্ত বা চরম ভাগ। উপনিষদ সমূহে যে তত্ত্ববিদ্যা উপদিষ্ট হয়েছে তাই বেদান্তদর্শনের উপজীব্য। অতি প্রাচীনকাল হতেই উপনিষদের বাণীসমূহ আলোচনা করে তার পরস্পর আপাতঃ বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয় করবার চেষ্টা হয়েছে। ভগবান বাদরায়ণ ঐ উদ্দেশ্যে উপনিষদ বাক্যসমূহের সমন্বয় করেছেন, তার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের মধ্যে। বাদরায়ণের বেদান্ত সূত্রই এ জাতীয় প্রয়াসের চরম ফল। পূর্বতন ঋষিগণও যে এরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। উপনিষদের মৌখিক বাক্যসমূহের অর্থ নিয়ে যেখানে মতভেদ উত্থিত হয়েছে সেখানে মহর্ষি বাদরায়ণ পূর্বাচার্য্যগণের অভিমত সসম্মানে উল্লেখ করেছেন। আচার্য্য রামানুজ বলেছেন যে, তিনি বোধায়ণকৃত অতি বিস্তীর্ণ বৃত্তিকে অবলম্বন করে তাঁর পূর্ববর্তী আচার্য্যগণ যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছেন, সেই মত অবলম্বনে 'শ্রীভাষ্য' রচনা করেন। অপর ভাষ্যকার — ভাস্করাচার্য্যও উপবর্ষ প্রণীত বৃত্তি অবলম্বন করে তার ভাষ্য রচনা করেন, এটাই তিনি বলেছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁর 'শারীরক ভাষ্য' অনেকস্থলে বৃত্তিকারের মত বলে কোনও প্রাচীন ব্যাখ্যাতার মতের খণ্ডন করেছেন। কিন্তু এই বৃত্তিকার কে? তিনি বোধায়ণ কিংবা উপবর্ষ অথবা অন্য ব্যক্তি। এ বিষয়ে কোন অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সমূহের মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত 'শারীরক ভাষ্য'ই অতি প্রাচীন ও তৎপ্রণীত উপনিষদ ভাষ্য সমূহই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাখ্যা।

রামানুজ, মাধ্ব, ভাস্করাচার্য্য, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সকলেই ব্রহ্মসূত্রের উপর এবং কেউ কেউ উপনিষদের ও গীতার উপর ভাষ্য রচনা করেন। উপনিষদ সমূহকে শ্রুতি প্রস্থান, ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায় প্রস্থান ও গীতাকে স্মৃতি প্রস্থান বলে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক আচার্য্য বা তদনুবর্ত্তী শিষ্যগণ প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য বা টীকা রচনা করেছেন। কিন্তু অন্য ভাষ্যকারগণ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্তী। শঙ্করাচার্য্য প্রস্থানত্রয়ের উপরেই ভাষ্য লিখেছেন এবং তিনি এই ভাষ্য সমূহে যে মত প্রচার করেছেন তার নাম অদ্বৈতবাদ।

অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্থূলভাবে প্রধানতঃ তিনটি তত্ত্বে নির্দেশ করা যায় — ১) একমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ২) জগৎ প্রপঞ্চ নানা বিচিত্র আকারে প্রতীতি গোচর হলেও তা অবিদ্যাকল্পিত ৩) জীবগণও এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের অবিদ্যাকৃত বিবর্ত বা প্রকাশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্তের উপজীব্য 'মায়াবাদ'। ব্রহ্ম যদিও এক এবং তদ্‌ব্যাতিরেকে দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকতে পারে না, তথাপি প্রতীয়মান নানাত্বের অপলাপ করা যায় না বলে — এই নানাত্বের সঙ্গে একের অবিরোধ প্রতিপাদন করা আবশ্যক। যদিও নানা দার্শনিক এই একের সঙ্গে বহুর বিরোধ ও সমাধান নানা প্রকার কল্পনার সাহায্যে সম্পাদন করেছেন, তথাপি সেই সমস্ত সমাধান ও সিদ্ধান্ত ঐকান্তিক। অদ্বৈতবাদের অনুকূল নয়। রামানুজ একের সঙ্গে বহুর অঙ্গাঙ্গীভাব বা শরীর-শরীরী ভাবসম্পদ কল্পনা করে এক ও বহুর সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রুতি ও যুক্তির স্বারসিক গতির উপর কিছু না কিছুর সঙ্কোচ করা হয়েছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই শ্রুতি ও যুক্তির স্বরসের প্রতিকূলতা না করে অদ্বৈতবাদকে দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি নানান জোড়াতালি দিয়ে একের মধ্যে স্থান দেবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর ব্যাখ্যায় যুক্তিবিরোধ নেই। যুক্তির কণ্ঠরোধ করে শ্রুতির স্বমতানুকূলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা তাঁর ভাষ্যে দেখা যায় না। যদি কোথাও শ্রুতির আপাতঃ প্রতীত অর্থের পরিহার করে লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করা হয়; সে স্থলেও নিপুণভাবে ও অপক্ষপাত বিচার করলে দেখা যাবে যে, যুক্তিবিরোধ পরিহার করাই সে স্থলে ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

অদ্বৈতবাদীরা সত্য নির্ণয়ের উপায়রূপে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব, এই তিনটি প্রমাণ অবলম্বন করেন। এদের অবিসম্বাদ ও একবাক্যতায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, তাই উপাদেয় হয় এবং যে মত স্বীকার করলে, এদের মধ্যে অন্য মতের বিরোধ উপস্থিত হয়, সে মত তাদের মতে ত্যাজ্য বলে বিবেচিত হয়। যাইহোক একের সঙ্গে প্রতীয়মান নানাত্বের বিরোধের সমাধান প্রত্যেক আচার্যকেই করতে হয়েছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে নানা আপাতঃ প্রতীয়মান হলেও তার পরমার্থ সত্তা নেই। তা শুক্তি রজতের ন্যায় মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র। কিন্তু সৎস্বরূপে মিথ্যার প্রতীতই বা হয় কেন? — এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, অবিদ্যা বা মায়াই এইরূপ প্রতীতের হেতু। এই অবিদ্যার আশ্রয় চৈতন্য এবং অনাদিকাল হতে এটি বর্তমান এবং এই বিচিত্র নানা ভেদসম্ভারপূর্ণ জগৎরূপে চৈতন্যকে প্রতিভাসিত করে। ১) অবিদ্যার স্বরূপ, ২) চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধ এবং ৩) জীব ও জড় প্রভৃতি ভেদে চৈতন্যের প্রতীতিতে তাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি অতি জটিল সমস্যার সমাধানে বেদান্তদর্শন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন।

মায়াবাদই অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে। মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান — এই তিনটি শব্দ মূলতঃ সমানার্থক। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা জ্ঞানের অভাবমাত্র নয় — এটি ভাবরূপ। অন্ধকার যেরূপ প্রকাশকে আবৃত করে, তেমনি অবিদ্যা আত্মচৈতন্য স্বরূপ প্রকাশকে আবৃত করে রাখে এবং তার ফলে জীবের সৃষ্টি হয়। জীব নিজের অসঙ্গ ও চিদানন্দ স্বভাব বুঝতে পারে না। তার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল স্বরূপের আবরণ মাত্রই করে তা নয়, উহা চৈতন্যের উপর নানা বিচিত্র ধর্মের সৃষ্টি করে এবং চৈতন্যের সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ ঘটায়। তার ফলে এক অদ্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন বস্তু স্বরূপতঃ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ হয়েও নিজেকে পরিচ্ছিন্ন, অজ্ঞনাবৃত ও নিরানন্দ বলে মনে করে এবং দেহ ও ইন্দ্রিয় হতে নিজেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করতে পারে না বলে জীবভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এই জীবত্ব অবিদ্যা এবং মিথ্যা। মিথ্যা শব্দের অর্থ 'অসৎ নয়', কিন্তু 'অনির্ব্বাচ্য; যাকে সৎ দিয়ে অসৎ বলে নির্বাচন করা যায় না। তা অনির্ব্বাচ্য। দেহ প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুর স্বভাবই এই যে, একে সৎ বলা যায় না, কারণ সৎ তাকেই বলা যায় যা দেশ বা কালের (Space and time) দ্বারা অবচ্ছিন্ন (Limited) হয় না এবং কোন দেশ বা কালে বাধিত হয় না। যা সৎ তার অসত্তা হতে পারে না।

নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।

— এই গীতামন্ত্রের ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য সৎ ও অসতের এরূপ স্বরূপ নির্বাচন করেছেন 'যদ্ বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যাভিচরতি তৎ সৎ, যদ্ বিষয়া ব্যভিচরতি তৎ অসৎ' অর্থাৎ যে বস্তু বিষয়ে জ্ঞানের ব্যভিচার হয় না তা সৎ এবং যে বস্তু বিষয়ে জ্ঞানের ব্যভিচার হয় তা অসৎ। ঘট বিষয়ে জ্ঞান হয়। কিন্তু পট বিষয়ক জ্ঞানকালে ঘটের জ্ঞান হয় না। অতএব ঘট 'সৎ' নয়; এইরূপ পট বিষয়ক জ্ঞানও ব্যভিচারী হয়, সুতরাং পটও সৎ নয়। কিন্তু সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই সত্তার জ্ঞান হয় এবং এই সত্তা জ্ঞানের অর্থাৎ Knowledge of the Inner Self-এর ব্যভিচার হয় না। ঘটজ্ঞানেও 'সৎঘট' ও পটজ্ঞানে 'পটসৎ' — এরূপ সত্তার (Spirit force) জ্ঞান অব্যাভিচারী হয়। 'ঘট নাই' এরূপ জ্ঞান অর্থাৎ অভাব বিষয়ক জ্ঞানেও সত্তার জ্ঞান হয়ে থাকে। অভাবও সৎ বলে প্রতীত হয়। অবশ্য সত্তা অভাবের ধর্ম নয়, তথাপি অধিকরণের সত্তাই অভাবে প্রতিভাত হয়, এটি অস্বীকার করা যায় না এবং এইজন্য এটিকে 'সৎ' বা সত্য বলে মানতে হবে। এরূপে যার অপলাপ করলে স্ববিরোধ বা স্ব-ব্যাখ্যাত (Self Contradiction) দোষ অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে তা 'সৎ' বলে মানতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই যে জ্ঞান বা চৈতন্য সৎ পদার্থ। কারণ 'জ্ঞান নাই' এরূপ নিষেধ করলেও জ্ঞানের সত্তা নিষিদ্ধ হয় না। জ্ঞান নাই ইহা আমরা জ্ঞানের সাহায্যেই নিষেধ করতে পারি এবং তাতে জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করতে হল। অন্য সমস্ত জ্ঞেয়ের নিষেধ করলে স্ব ব্যাখ্যাত দোষ উপস্থিত হয় না কিন্তু জ্ঞানের নিষেধে তা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এজন্য চরম ও পরম তত্ত্ব যাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেন, তা সৎ ও চৈতন্য স্বরূপ হল। এটিই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই সত্তা ও চৈতন্য পৃথক নয়, উহা এক বা দুটি অপরিচ্ছিন্ন বস্তু থাকতে পারে না। 'পরিচ্ছেদ' শব্দের অর্থ হল কাল, দেশ বা অন্য বস্তু দ্বারা পৃথক করণ। নিত্য ও বিভু দ্রব্যের কাল বা দেশকৃত ভেদ থাকতে পারে না; যদি চৈতন্য সত্তা হতে পৃথকীভূত বস্তু হয় তবে তা অসৎ হবে এবং চৈতন্যকে জগতের মূল তত্ত্ব বলে স্বীকার করলেও শূণ্যবাদে পর্য্যবসান হতে নিস্তার পাওয়া যাবে না। অতএব চৈতন্যকে 'সৎ' বলতে হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, চরমতত্ত্ব চৈতন্যস্বরূপ হলে তাকে 'সৎ' বলতেই হবে। এটিই মানতে হল। কিন্তু তাকে সত্তাস্বরূপ বললেও চৈতন্যস্বরূপ বলবার আবশ্যকতা থাকবে না। এই মতও বিচার সহ হতে পারে না। এটি জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বিচার করলে দেখতে পাই। যদি সত্তা মাত্রই অর্থাৎ চৈতন্যভিন্ন সত্তাই চরমতত্ত্ব বলে পরিগণিত হয়, তবে প্রশ্ন হবে এই সত্তা বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কিনা। যদি সত্তা কোন প্রমাণজনিত জ্ঞানের বিষয় হয় তবে তা অনির্বাচ্যই হবে। অর্থাৎ শুক্তি রজতের ন্যায় মিথ্যা হবে। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ যদি শুদ্ধ ভেদাত্মক হয় তবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বস্তুর ভেদ থাকবে না। আমরা অজ্ঞাত বলে তাকেই নির্দেশ করি যা জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নি অর্থাৎ জ্ঞান হতে ভিন্ন বা বহির্ভূত থেকে যায়, তবে তাকে অজ্ঞাত হতে পৃথক করবার কোন হেতু থাকবে না। আর যদি জ্ঞাত বস্তু জ্ঞানের সঙ্গে অভেদাপন্ন হয় তা হলে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ থাকবে না। এবং 'ইহা বিষয়', 'ইহা জ্ঞান' এরূপ নির্দেশ করা যেতে পারবে না। ফলে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ ভেদ বা অভেদ না হওয়ায়, ইহা অনির্বাচ্য হবে।

আমরা দেখলাম জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অনির্বাচ্য। তাই বেদান্ত বলেন যা জ্ঞেয় তা অনির্বাচ্য, কারণ তা জ্ঞানের সঙ্গে ভিন্ন বা অভিন্ন, ইহা নিরূপণ করা যেতে পারে না। যেমন রজত শুক্তির সঙ্গে ভিন্ন বা অভিন্ন এটা বলা যায় না। যেহেতু একসঙ্গে ঘট পটাদির সঙ্গে শক্তির অভিন্ন অবস্থা প্রতীত হয় না। অভিন্ন বলা যায় না, কারণ তা হলে শুক্তির স্বরূপ জ্ঞান রজতের বাধা হত না; এবং রজত শুক্তির স্বরূপ হলে শুক্তির ন্যায় তা অবাধিত ভাবে প্রতীত হত। তা যখন হয় না তখন রজতকে অনির্বাচ্য বা মিথ্যা বলতে হবে। মিথ্যা তাকেই বলা যায় যা কোন অধিকরণে প্রতীত হলেও সেখানে কোন কালেই থাকে না অর্থাৎ কর্তা স্বরূপতঃ অসৎ হয়েও প্রতীতির বিষয় হয়। মিথ্যাকে অলীক বলা যায় না — যেহেতু অলীক যেমন চতুষ্কোণ বৃত্ত (Square Circle) প্রত্যক্ষ প্রতীতির বিষয় হয় না। দেখা গেল, যা জ্ঞানের বিষয় হয় তা সৎ নয়, অনির্বাচ্য। যদি চরমতত্ত্ব 'সত্তা' জ্ঞানাত্মক না হয় তবে জ্ঞানের বিষয় হবে এবং তা হলে তা মিথ্যা বা অনির্বাচ্য হবে। কিন্তু সত্তা তত্ত্ব অথচ মিথ্যা বা অসৎ — এটা বললেও ব্যাখ্যাতদোষ দুর্নিবার হবে। কাজেই চরমতত্ত্ব 'সত্তা' ও 'চৈতন্য' অভেদ এটা বলতেই হবে।

এরূপ ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়েছে। তার প্রমাণ অনুভব ও সেই অনুভবের ভিত্তিতে যুক্তি। যদি ব্রহ্ম, যিনি জীবের আত্মা, আনন্দ বা সুখ না হত তাহলে কারও নিজের স্বরূপের প্রতি এরূপ অচ্ছেদ্য প্রেম হত না। আত্মা সকলের প্রিয়। এই আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে বলেই অন্য বস্তু প্রিয় হয়। আনন্দ যে বাইরের বস্তু নয়, তা একান্তভাবে ভিতরের এবং তা আমাদের স্বরূপ, ইহা আনন্দ অনুভূতির প্রণালী অনুভব করলেই বোঝা যাবে। সুখাদ্য ভোজনে সুখ হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, সুখাদ্য হতে সুখ সমাহৃত হয়ে থাকে কিংবা তার দ্বারা মাত্র তার স্বরূপানন্দের স্ফূরণ বা অভিব্যাক্তি হয়? কোনটা ঠিক? খাদ্যের মধ্যে সুখ নেই, খাদ্য ভোজনেও সুখ নেই, কারণ সর্বত্রই শ্রম ও আয়াসের আবশ্যকতা আছে। আয়াস ত সুখের কারণ হতে পারে না। আয়াসের আত্যন্তিক অভাবই সুখ। সুখের অভিব্যক্তি হয় যখন সমস্ত ত্বরা, উদ্বেগ এবং উৎসুক্যের অবসান হয়। সে সুখ ভিতরের — তা আমাদের স্বরূপের। ইন্দ্রিয়ের তাড়না নিবৃত্ত হলে চিত্ত তবেই বহির্মুখ প্রয়াস হতে নিরত হয় এবং ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হয়। চিত্ত অন্তর্মুখী হলে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্বসম্পাতে তবেই চিত্তে সুখের উপলব্ধি হয়।

অতএব আমরা দেখলাম, চরমতত্ত্ব হল — সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। জীবের স্বরূপও তাই। আত্মা ও ব্রহ্ম এক। আত্মা বলতে জীবাত্মাকে বুঝি। তার কারণ অবিদ্যারূপ যবনিকা দ্বারা আবৃত আত্মা আমাদের কাছে স্বমহিমায় প্রকাশিত হন না। যখন বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্যা নষ্ট হবে তখনি ভেদবুদ্ধিও তিরোহিত হবে; কারণ ভেদজ্ঞান মিথ্যা এবং ভ্রান্ত এবং যা মিথ্যা ভ্রমাত্মক, তা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শুক্তির স্বরূপ জ্ঞাত হলে তাতে কল্পিত রজতের ভ্রম দূর হয়ে যায় — যা অনুভবসিদ্ধ। এই অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয় বলে সৎস্বরূপ নয়, কারণ 'সতের' বিনাশ নাই, কিন্তু এটি 'অসৎ'ও নয়। যদি অসৎ হত তাহলে এর ক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কোন function থাকত না। যা কোন অর্থক্রিয়া বা কার্য্য উৎপন্ন করে, তা অলীক হতে পারে না। কাজেই এটি অনির্বাচ্য এবং অনির্বাচ্য বলেই অবস্তু। অবিদ্যা কেন আছে এবং কোথায় উৎপন্ন হয় — তা জিজ্ঞাসা করা যায় না। যেহেতু এর উৎপত্তি স্বীকার করলে এর উপাদান কারণরূপে অপর অবিদ্যার সত্তা স্বীকার করতে হবে এবং এটি যে আছে, তা অনুভবসিদ্ধ।

আমরা সকলেই অনুভব করি, 'আমি জানি', এই 'আমি জানি' অবিদ্যার প্রত্যক্ষবোধ। এটি জ্ঞানভাব নয়। 'জ্ঞান নাই' এটি জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধ হবে। জ্ঞান আছে, অথচ জ্ঞান নাই বলা স্ববিরোধ ভিন্ন কিছুই নয়। সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চজ্ঞানের বিষয় হয়, এইজন্য তা অনির্বাচ্য। জ্ঞেয় বস্তুমাত্রই যখন মিথ্যা তখন তার কারণও মিথ্যা হবে এবং এই কারণ অবিদ্যা বা মিথ্যা ভিন্ন কিছুই নয়। কার্য্য যে জাতীয়, কারণ তার বিরুদ্ধ জাতীয় হবে। এরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধই কল্পনা করা যেতে পারে না। কাজেই অবিদ্যার অস্তিত্ব বা কারণতা অস্বীকার করা যায় না।

অবিদ্যার অস্তিত্ব বেদান্তদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু অবিদ্যাও চৈতন্যরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। অবিদ্যার স্বভাব আবরণ এবং বিক্ষেপ। যা প্রকাশ স্বভাব তারই আবরণ হতে পারে। অবিদ্যা স্বয়ং আবৃত। জড় শক্তি কখনও অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে না। কারণ জড়তে প্রকাশধর্ম নেই। প্রকাশ চৈতন্যেরই ধর্ম। কাজেই অবিদ্যা নিজের স্বরূপ ও অস্তিত্ব প্রকটিত করতে পারে না বলে চৈতন্যের অপেক্ষা করে; এবং চৈতন্যের সঙ্গে অভেদ প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় সত্তা জ্ঞাপন করতে পারে। অবিদ্যার প্রকাশ নেই, তার ধর্ম অপ্রকাশ। কাজেই চৈতন্য না থাকলে অবিদ্যার প্রকাশ হত না। অবিদ্যার আশ্রয় ও ভাসক চৈতন্যের স্বীকার না করলে অবিদ্যার অস্তিত্বই প্রকাশিত হত না। অতএব অবিদ্যা মাত্রই জগৎ প্রপঞ্চের কারণ বললে অবিদ্যার প্রকাশ না থাকায় অবিদ্যা-জন্য জড় প্রপঞ্চেরও প্রকাশ থাকবে না। কিন্তু জগৎ তো আমাদের সামনে প্রকট ও ভাসমান। কাজেই চৈতন্যরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে অবিদ্যার আবরণ কার্য্য অসম্পন্ন হবে। শুধু তাই নয়, অবিদ্যার বিচিত্র সৃষ্টিকারিত্ব রূপ বিক্ষেপও অসম্ভব হবে। 'বিক্ষেপ' শব্দের অর্থ এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে প্রতিভাত করা। যদি কোন অনুষ্ঠান না থাকে, কোথায় বিক্ষেপ হবে? নিরাস্পন্দ অর্থাৎ without any supporting cause কোম ভ্রম জন্মিতে পারে না। যেখানে যা নেই তার প্রতীতি হচ্ছে এটি ভ্রম মাত্র এবং এর নামান্তর বিক্ষেপ বা আরোপ। কাজেই জ্ঞেয় মিথ্যা হলে জ্ঞানও মিথ্যা হবে। শূণ্যবাদীর এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। বস্তুতঃ জ্ঞেয় যখন জ্ঞানের অতিরিক্ত হয় না এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয়ের উপলব্ধি হয় না বলে জ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞেয়ের অসত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। বেদান্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানকেও অনির্বাচ্য বলে স্বীকার করেন। কিন্তু বিজ্ঞান পরমার্থতঃ essentially ক্ষণিক হতে পারে না। যদি বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস থাকে তবে এই উৎপত্তি ও ধ্বংস বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ জ্ঞানের দ্বারাই বস্তু সিদ্ধ হয়ে থাকে। যদি এরূপ জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করতে হয়, তবে তা নিত্য; এটা মানতেই হবে। যে জ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস হবে, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তার উৎপত্তি বা ধ্বংসের জ্ঞান হতে পারে না। কারণ জ্ঞানের ধ্বংসকালে সে জ্ঞান থাকে না এবং উৎপত্তির সময়ে সে জ্ঞান নিজের স্বরূপমাত্র প্রকাশ করলেও তা পূর্বক্ষণে অসত্ত্বা ছিল, এটা জানতে পারে না। বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করলে পরিণামে তা শূণ্যবাদে পরিসমাপ্তি হবে। বেদান্তী বলেন, জ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস স্বীকার করলে তা অন্য উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল বস্তুর ন্যায় অনির্বাচ্য হবে ফলে তা অসৎ হবে। জ্ঞানের উৎপত্তি ও ধ্বংস জ্ঞানের দ্বারাই নিরূপিত হয়; কাজেই জ্ঞানের অনিত্য সত্ত্বা স্বীকার করা যায় না। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী জ্ঞান (Subject) ও জ্ঞেয়ের (Object) অভেদ কল্পনা করে জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানকেও ক্ষণিক বলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হবে জ্ঞেয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞান অভেদ হয় এবং জ্ঞেয় ক্ষণিক বলে জ্ঞানকেও যদি ক্ষণিক বলা হয় তবে জ্ঞেয় অসৎ বলে জ্ঞানকেও অসৎ বলা হয় না কেন? বস্তুতঃ এর উত্তর বেদান্তীই দিয়েছেন। বেদান্তমতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অভেদ নয়, ভেদও নয় — ইহা অনির্বচনীয়। জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞানের যে অভেদ উপলব্ধি হয় তা আধ্যাসিক অভেদ অর্থাৎ ওটি কল্পিত অভেদমাত্র। কল্পিত অভেদের দ্বারা একের ধর্ম অন্যত্র প্রতিপন্ন হয় না। এক শুক্তিতে রং ও রজতরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অনুক্ত করা হলেও রং রজতের ভেদ নিবন্ধন, শুক্তির ভেদ হয় না। সেরূপ জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞানের ঐক্য অর্থাৎ তার অবিরত প্রবাহ বা ধারা তার দ্বারা ব্যহত হয় না। যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কল্পিত অভেদ মেনে জ্ঞেয় ধর্ম ক্ষণিকত্ব হলে আরোপিত হয় মাত্র। বস্তুত জ্ঞানের সম্বন্ধ তত্ত্বতঃ অভেদ হত তবে জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানও ক্ষণিক হত। বৌদ্ধ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পরমার্থিক অভেদ স্বীকার করে ভ্রমে পতিত হয়েছেন।

অতএব বেদান্তের ঋষিদের সিদ্ধান্ত হল, কোন বস্তুর সামান্য জ্ঞান থাকলে তবেই অধ্যাস হবে, অন্যথা হবে না। অর্থাৎ কোন বস্তুকে বিশেষভাবে জানা থাকলে তাতে অধ্যাস হবে না, সেরূপ আত্মার সামান্য জ্ঞানের

সঙ্গে অজ্ঞানের বিরোধ নেই। বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের বিরোধ। বিশেষ জ্ঞান বলতে আত্মজ্ঞানকে বোঝায়। আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ হলে অর্থাৎ জ্ঞেয়কে জানলে আর অজ্ঞান অর্থাৎ অধ্যাস বা ভ্রম হবে না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, জ্ঞেয় আছেন, আমার যে আত্মা আছেন তা এতই ধ্রুব যে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেই জ্ঞেয়তে জগতের অধ্যাস বা ভ্রম হয় কিরূপে? জ্ঞান ও অজ্ঞানের একই সঙ্গে অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব? বেদান্তের পরিভাষায় অস্তিত্বরূপে এই যে জগৎ চৈতন্য — একে সামান্য চৈতন্য এবং আমি নিত্য মুক্ত বুদ্ধ আনন্দস্বরূপ। এই বিশেষ জ্ঞানকে চৈতন্য বলা হয়। এই বিশেষ চৈতন্য ও সামান্য চৈতন্যের স্ফূরণ কি simultaneously সম্ভব? বেদান্ত-এর উত্তর দিয়েছেন — হ্যাঁ সম্ভব। ভিন্নত্বে গতি অভিন্ন সত্তাকত্বম্ — ভিন্ন হয়েও অভিন্ন সত্তাকে অর্থাৎ জগৎরূপে জ্ঞান এবং ধ্রুব নিত্য জ্ঞেয় — দুই-ই ভিন্ন তত্ত্বের একই সঙ্গে অবস্থান সম্ভব। সমসত্তাক্ পদার্থ নিজের মধ্যে একই সঙ্গে সাধক ও বাধক দুই-ই হয়। যেমন কাষ্ঠ ও অগ্নি। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে — কাষ্ঠ সাধক কিন্তু অগ্নি বাধক। একই সঙ্গে দুই-ই বস্তু থাকলেও তাদের বিরোধ নাই। তেমনি আমি জ্ঞেয় স্বরূপ আত্মা হলেও একই কালে এবং একই সময়ে জগৎ-জ্ঞানের অধ্যাস হচ্ছে। কাষ্ঠ মধ্যস্থিত অগ্নির সঙ্গে কাষ্ঠের বিরোধ হয় না। কিন্তু মর্থিত অগ্নির দ্বারা সেই কাষ্ঠ ভস্মীভূত হয়ে যায়। সেরূপ 'আমি নিত্যযুক্ত বুদ্ধ আনন্দস্বরূপ' এই বুদ্ধি আরূঢ় চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞেয় তত্ত্ব উদ্ভাসিত হলে তা অজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

সারকথা — আত্মার সত্তায় এই জগতের স্ফূরণ হচ্ছে। যার মূলে 'জানা' (জ্ঞান) বলে বস্তু নাই, সেই বস্তুকে জানবার কেউই নাই — তার অস্তিত্বই নাই। এই 'জানা' বা জ্ঞানই আত্মা। যে বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভবের সীমার মধ্যে না আসে — সেই বস্তুর অস্তিত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে ছিল না। এটা নিশ্চয় যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে হলে তার একজন জ্ঞাতা বা অনুভব কর্তা থাকা চাই। অনুভবের বিষয়গুলি ভিন্ন বলে অনুভবিতাকেও অর্থাৎ জ্ঞানকেও ভিন্ন বলে বোধ হচ্ছে। এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আছেন। তার উপর বহুবিধ যে বস্তু আসছে তা বাস্তবিক নয়। তথাপি যে থাকার মত দেখা যাচ্ছে তাই মায়া। তাই অজ্ঞান — যা নাই, অথচ আছে বলে ভাণ হয় — এরই নাম মায়া।

কার্য-কারণ ভাব-আত্মাতে নাই, তাই জগৎ নিষ্কারণ, সর্পভ্রমটা ভ্রম মাত্র। সর্প সত্যই নেই — রজ্জুতে থাকে। অতএব জগৎ যা দেখছে — তা ইন্দ্রজাল মাত্র। অজ্ঞানে এটি দেখছে — বাস্তবিক সে সকলের অস্তিত্ব নাই। দৃশ্যজগৎ কোন কালেই ছিল না। বর্তমান সময়েও নাই, পরেও থাকবে না। যখন এক আছে — তখন অন্যান্য অনুভবের scope কোথায়? পরিপূর্ণ যা তাতে 'আমি' বা 'ইদং' অনুভব থাকে না। যখন আমি বা ইদং অনুভব জাগে তখন দ্বিতীয় একটি ভাসে — সেটাই 'অহং'। এই অহংবৃত্তির উৎপত্তি ও নাশ আছে। অহংবৃত্তি উৎপত্তি বা নাশ হচ্ছে বলে — অহংবৃত্তির সঙ্গে জড়িত যে চৈতন্য বা জ্ঞান — তারও উৎপত্তি ও নাশ হচ্ছে বলে মনে হয়। যেমন — ঘটাদি উপাধি নাশে তদুপহিত আকাশের নাশ হয় না, সেরূপ জ্ঞান বা চৈতন্যের উপাধি 'অহং' এর নাশে জ্ঞান বা চৈতন্যের নাশ হয় না। আকাশ সর্বত্র পরিপূর্ণ হলেও ঘটের মধ্যে এসে পরিচ্ছিন্নের মত (Limited as it were) বোধ হয়; সেরূপ চৈতন্য বা জ্ঞান এক ও পূর্ণ হলেও অহং বৃত্তি যোগে পরিচ্ছিন্নের মত বোধ হয়।

মূলকথা — জ্ঞানের উৎপত্তি নেই, নাশও নেই। এই জ্ঞানই আমার আমি বা আত্মা — The True self – The Inner Self. আত্মা অখণ্ড অবিনাশী ও অজর। ইহাই জ্ঞেয় তত্ত্ব।

কিন্তু রাজা নারদের কথায় কর্ণপাত না করে অন্য চিন্তায় মগ্ন রইলেন। রাজার অন্যমনস্কতা দেখে নারদ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বাঁদরে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দেন। নারদের অভিশাপ শুনে রাজা বৈশ্বানর তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে নারদ তাঁকে ধবলগিরি থেকে উৎপন্ন তপা নদী যেখানে নর্মদায় মিলিত হয়েছে সেখানে গিয়ে শিবপূজা ও ধ্যান করবার উপদেশ দিয়ে বলেন — ঐ সঙ্গমস্থলে তপস্যার ফলে সে তার হৃত রাজ্য ফিরে পাবে। তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সদ্‌গতি হবে।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বৈশ্বানর। যেহেতু তিনি এই সঙ্গমস্থলে তপস্যা করে বানর রূপ থেকে মনুষ্যরূপ লাভ করেছিলেন তাই তাঁরই নামানুসারে এই তীর্থের নাম বানরভালু তীর্থ।

আমরা মন্দিরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। শিবলিঙ্গ প্রায় এক ফুট উঁচু। শিবলিঙ্গের উপরে চন্দনলিপ্ত

বিল্বপত্র চাপানো আছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। মন্দিরের বাইরেই এক বিশাল কুণ্ড।

কুণ্ডের ধারেই পুরোহিতজী কুণ্ডের পূজা সেরে এসে বললেন — লেওজী, ইয়ে নর্মদা মাতাকী খাস পরসাদী হ্যায়। এ হ্যায় ব্রাহ্মীবুটি। শুকনো একগুচ্ছ ঘাসের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে খেঁসারির বুটির মত লেগে থাকা দানা দেখেই আমি চিনতে পারলাম যখন আমি পিতৃ আদেশে প্রথম অমরকন্টকে আসি তখন মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরে এক জটাজুট নাঙ্গা সাধু আমাকে পাতার মোড়কে কিছু সাদা ভস্ম ও ব্রাহ্মীবুটি দিয়েছিলেন।

আমি আমার সঙ্গীদের বললাম — এই ব্রাহ্মীবুটি স্বরভঙ্গ দোষ দূর করে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ বায়ু পিত্তের সাম্য ঘটায় ও যোগীর দেহকে যোগাগ্নি পরিপক্ক হতে সাহায্য করে।

আমাদের প্রসাদ দেওয়ার পর পুরোহিতজী বললেন — চোখের সামনে এই যে বিশ্বজগৎ দেখছেন — এ এক মায়াপুরী। এই জগৎ কাল্পনিক এবং আমাদের খেয়াল হতে উৎপন্ন। কল্পনায় আমরা নিজেদের, এই জগতে আবদ্ধ করে বসে আছি এবং হাহুতাশ করছি। কিন্তু এই বন্ধন কাল্পনিক বন্ধন। আমাদের মনে হচ্ছে কেউ একজন ভিতরে বসে এই পরিবর্তনের পরম্পরা ঘটতে দেখছে। কিন্তু তাঁর নিজের কোন পরিবর্তন বা বিকার নেই। তাঁর চক্ষে নিমেষ নাই, তাঁর কোন পরিবর্তন নাই. বিকার নেই। নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ, নির্বিকার ভাবে দেখছে। এই নিত্য পরিবর্তনের চিরন্তন বিনিদ্র সাক্ষী অথচ এই পরিবর্তন ঘটনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। জানবেন এই নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার উদাসীন সাক্ষীই আত্মা। জড় জগতের ঘাত প্রতিঘাতে আমরা নাচছি, কাঁদছি, হাসছি। কখন জাগ্রত, কখন স্বপ্নাবস্থা, কখন বা সুষুপ্ত ক্রীড়াপর, কর্মশীল সুখী, দুঃখী, রাগী, দ্বেষী, ঈর্ষী, ঘৃণী। এখন এমন, তখন তেমন। আজ অন্যরূপ, কাল এইরূপ। কিন্তু আত্মা নিশ্চল, নিস্পন্দ, সদা জাগ্রৎ থেকে এই ক্রিয়ার, এই চাঞ্চল্যের এই বিকারের নিত্য সাক্ষী।

যাবতীয় পদার্থকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, একের নাম বিষয়ী (আত্মা), অপরের নাম বিষয় (অনাত্মা)। যে উপলব্ধি করে সে বিষয়ী, যা উপলব্ধ হয় তা বিষয় অর্থাৎ যে দেখে সে আত্মা আর যাকে দেখে সে অনাত্মা। অনাত্মা বলতে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ।

যেমন সুবর্ণ হতে জাত দ্রব্য চিরকালই সুবর্ণ, তদ্রূপ আত্মা হতে জাত জগৎ আত্মাই। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন অলীক, স্বপ্নাবস্থায় অলীক, সুষুপ্তিকালে দুই থাকে না কিন্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্ত এই তিন অবস্থায় সাক্ষী চিৎস্বরূপ আত্মা। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করে, সেইরূপ বিমূঢ় ব্যক্তি আত্মাকেই দেহস্বরূপে পরিণত করে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন স্বর্ণকে কুণ্ডল ভাবে তদ্রূপ আত্মাকে দেহরূপ কল্পনা করে। যেমন পোতগামী ব্যক্তি তীরস্থ সকল বস্তুকেই প্রলয়শীল জ্ঞান করে তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়।

যেমন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকে পরিভ্রমণ করালে সূর্যের ন্যায় বর্তুলাকার বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন মোহ হেতু কোন ব্যক্তির দিগভ্রম হয়, তদ্রূপ আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়। যেমন আকাশে মেঘ সকল ধাবিত হলে চন্দ্রকে ধাবমানের ন্যায় বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়। দিবাকরের আলোকসমূহ আশ্রয় করে যেমন মানবগণ স্বীয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করতঃ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এরা আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে.

যেমন স্ফটিক, নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি বস্তুর সংযোগে সেই বস্তুর বর্ণপ্রাপ্তের ন্যায় হয়ে থাকে, সেইরূপ আত্মা দেহাদির সংযোগে তৎতুল্য হয়ে থাকেন। যেমন জলের অভ্যন্তরে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হলে সেই জলের সঞ্চলনাদি তন্মধ্যস্থিত চন্দ্রে কল্পিত হয়ে থাকে, তদ্রূপ অন্তঃকরণের সুখ দুঃখাদি ধর্ম আত্মাতে অজ্ঞান প্রযুক্ত আরোপিত হয়ে থাকে।

মন বিদ্যমান থাকলে অনুরাগ ইচ্ছা সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই থাকে; নিদ্রাসময়ে মন বিলয়প্রাপ্ত হলে তখন সুখ দুঃখাদি কিছুই থাকে না; অতএব সেই সমস্ত মনের ধর্ম কখনই আত্মার নয়।

আত্মা দেহ হতে ভিন্ন, সুতরাং দেহের ধর্ম জন্ম, মৃত্যু কৃষতা প্রভৃতি আত্মার নাই। চক্ষু যাকে দেখতে পায় না যার সাহায্যে চক্ষু দেখে থাকে তাকেই আত্মা বলে জানবেন। মন যাকে মনন (চিন্তা) করতে পারে না, যার সাহায্যে মন চিন্তা করে থাকে তাকেই আত্মা বলে জানবেন। যেমন অগ্নিসংযোগে লৌহ উত্তপ্ত হয়ে বিবিধ আকার প্রাপ্ত হয় এবং সেই পরিমাণ লৌহেরেই হয়, উত্তাপের হয়না, তদ্রূপ আত্মার সংযোগে মন বিবিধ নাম বিষমাকারে আকরিত হয়ে থাকে।

যার দ্বারা মন চিন্তা করে, চক্ষু দেখে, কর্ণ শ্রবণ করে, নাসিকা আঘ্রাণ করে, জিহ্বা রস আস্বাদন করে তাকেই আত্মা বলে জানবে।

যেমন নিজের চক্ষুকে আমরা দেখতে পাইনা; কিন্তু চক্ষুর দ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করি; সেইরূপ আত্মাকে আমরা দেখতে পাইনা কিন্তু আত্মার দ্বারা মন, ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ব্যাপার সিদ্ধ হয়ে থাকে। আত্মার সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই; এই সকল মনের কল্পনা মাত্র। যেমন সুবর্ণই সত্য, তাতে হার, বলয় প্রভৃতি কল্পিত মিথ্যা, তদ্রূপ আত্মাই সত্য, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এই সমুদয় জগৎ মনের কল্পিত মিথ্যা মাত্র।

যেমন মৃত্তিকা সত্য, ঘট (নামরূপ) মিথ্যা তদ্রূপ আত্মা সত্য, নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা প্রত্যয় মাত্র। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানাবিধ কর্ম করে থাকি, বাস্তবিক সে সমস্ত মিথ্যা সেইরূপ এই দৃশ্য প্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ মিথ্যা।

যেমন অন্ধকারে একগাছি দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হয় কিন্তু সেই ভ্রমকালে সেখানে দড়ি ভিন্ন সাপ থাকেনা, সেইরূপ ভ্রমবশতঃ আত্মাতে সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু এই জগৎ দেখে থাকি বস্তুতঃ এই সকল মিথ্যা প্রত্যয় মাত্র। যেমন নিজ মুখকে আমরা দেখতে পাইনা, দর্পনে প্রতিবিম্বিত হলে দেখতে পাই, তদ্রূপ সেই আত্মা মনরূপ দর্পনে প্রতিবিম্বিত হলে দেখতে পাই।

আত্মার মধ্য দিয়েই সমস্ত ব্যবহার হয়ে থাকে, 'আত্মা' বা 'আমি' না থাকলে মন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হত না। সংস্কৃতে যাকে আত্মা বলে, বাংলায় বলতে গেলে তাকে আমি — এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করি। আত্মা অবিকারী, কিন্তু মন, বুদ্ধি শরীর প্রভৃতি বিকারী বস্তু; অতএব এই সমস্ত 'আত্মা' হতে পারে না। আত্মার উৎপত্তি নাই, ধ্বংস নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই।

আমি দেখি, আমি শুনি, আমি চিন্তা করি, আমি ভয় পাই — কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে অন্তরালে কে একজন বসে বসে এই সকল বিচ্ছিন্ন ব্যাপারগুলিকে একের অধীন করে এই বিচ্ছেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে। যে ইহা করে তার নাম 'আত্মা'।

আমি খাই, আমি হাসি, আমি নাচি, আমি গাই, আমি দেখি, আমি শুনি এবং আমার দেখবার জন্য ও শুনবার জন্য এই জড় জগৎ এর কল্পনা করি। আমার নাচবার, গাইবার জন্য এই ক্রীড়াক্ষেত্র নির্মাণ করি এবং আমিই আবার অন্তরালে বসে হাসি কান্না, নাচ-গান, দেখাশোনা প্রত্যক্ষ করি। আমি ভিতর হতে দেখি যে, আমি করছি, আমি দেখছি, আমি সেই সৎ পদার্থ — আমি মায়াবী ইন্দ্রজালিকের মত একটা জগৎ-এর ইন্দ্রজাল রচনা করে নিজের রচিত ইন্দ্রজালের কুহকে আপনাকে প্রতারিত করে নিজের অজ্ঞানে আপনাকে আবৃত করে সূচ সেজে বসে আছি। আমি মায়াবশ হয়ে আমাকে আত্মা হতে পৃথক জীবরূপে দেখছি মনে করছি যে, আমি দেখছি, শুনছি, হাসছি, নাচছি, মনে করছি আমার জন্ম আছে, মরণ আছে, মনে করছি, আমি অনিত্যং কিন্তু উহা অবিদ্যা ভ্রম। আমি জীব সেজে আপনাকে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ দেখি। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র নই, বদ্ধ নহ, আমি সদা মুক্ত। মনে করছি, আমি বদ্ধ কিন্তু এরূপ মনে করা ভ্রম ব্যতীত কিছু নয়।

আত্মাই সত্য বা সৎ পদার্থ, তদ্ব্যতীত সমস্ত অনিত্য। সত্য তাকেই বলা যায়, যার অন্যথা ভাব কল্পনায়ও আনা যায় না। যেমন ব্যাধি, ঔষধ সেবন ব্যতীত 'ঔষধ ঔষধ' উচ্চারণ করলে আরোগ্য হয় না, তদ্রূপ অনুভব ব্যতীত বাক্য কথন দ্বারা মুক্তি লাভ ঘটে না।

যেমন উৎকট পীড়ার উপশমার্থে সযত্নে নিজে ঔষধ সেবন করতে হয়, তদ্রূপ সংসার বন্ধন মোচনার্থে আপনারই যত্ন করা উচিৎ। একটি স্থানু (শাখাহীনবৃক্ষ) রয়েছে, যার ভূতের ভয় আছে, সে সেই স্থানুটিকে ভূতরূপ দর্শন করে। পাহারাওয়ালা উহাকে চোর বলিয়া মনে করলে সেই একই স্থানু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হচ্ছে। স্থানুটিই সত্য, আর এই যে বিভিন্নভাবে দর্শন তা কেবল মনের বিকার মাত্র। একমাত্র আত্মাই আছেন। তিনি কোথাও যান না, আসেনও না। অজ্ঞান মানব স্বর্গ বা তথাবিধ স্থানে যাবার বাসনা করে। এই পৃথিবীর স্বপ্ন যখন তাদের চলে যায়, তখন সে এই জগৎকেই স্বর্গরূপে দেখতে পায়। কারণ, সে স্বয়ংই তার সৃষ্টি করেছে। এইরূপ স্বপ্নের পর আর একটি স্বপ্ন আসছে। তাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগতের নিয়ম বা সম্বন্ধ বলে কিছুই নাই। কিন্তু আমরা ভাবছি পরস্পরের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের জগৎও এইরূপ অসম্বন্ধ জিনিসমাত্র। কোনটির সঙ্গে কোনটির কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

একটি সত্তা মাত্রই আছে আর সেই এক সত্তা অজ্ঞানবশতঃ পৃথিবী স্বর্গ, নরক, মানব, এই সমুদয় বোধ

হচ্ছে। গুটিপোকার মত আমিই আমার চারিদিকে গুটি নির্মাণ করে যাচ্ছি। আমাকেই ঐ গুটি কেটে বের হতে হবে। যে ভাবে আমি 'বদ্ধ' সে বদ্ধই হয়ে যায়, আর যে ভাবে 'আমি সদা মুক্ত, আমি জন্ম রহিত, ধ্বংস রহিত, পরিণাম শূণ্য' সে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়ে যায়। ভয়ই পাপ, দুর্বলতাই পাপ, অতএব যাতে ভয় দুর্বলতা প্রভৃতি প্রশ্রয় পায় সেরূপ ভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। জন্ম, মৃত্যু, প্রভৃতি মনের কল্পনা, স্বপ্ন মাত্র।

পুরোহিতজীকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে আমরা সকলে আবার নর্মদাতটের রাস্তা ধরে পূর্বমুখে হাঁটতে লাগলাম। পুরোহিতজীও আমাদের হাত জড়িয়ে ধরে প্রসন্ন চিত্তে আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের বামদিকে রয়েছে নর্মদার জলপ্রবাহ। ডানদিকে রয়েছে বহু সম্পন্ন পল্লী। নর্মদা যেন উপরদিকে থেকে সোজা ঢালু হয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। আমরা যে তটরেখা ধরে চলেছি, সেই পথে এতদ্ঞ্চলের বহু লোকও যাতায়াত করছেন। নানা কাজে নানা ব্যাপারে। তাঁরা আমাদেরকে দেখে সশ্রদ্ধভাবে যুক্ত করে রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। আমাদের যাওয়ার পথকে বাধা বন্ধহীন সুগম করে দিচ্ছেন। পরিক্রমাবাসীদের প্রতি তাঁদের যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তা আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করছে। আমরা মা নর্মদাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণে রেখে শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে এগিয়ে চলেছি। প্রায় ছয় মাইল হেঁটে যাওয়ার পর আমরা সূর্যকুণ্ডতীর্থে এসে পৌঁছলাম। এখানে ঘাটের উপরেই এক শিবমন্দির। ঘাটে পল্লীর অনেক লোকজন স্নান তর্পণাদি করছেন। বেলা প্রায় একটা বেজে গেছে। একটি অল্পবয়সী যুবক আমদের দেখে এগিয়ে এসে বলল — ইহাঁ সূর্য ভগবাননে তপ কিয়া থা। নর্মদাজীমেঁ সূর্য-কুণ্ড হ্যায়। লোগ কহতে হ্যায় কি ইস্ স্থান পর সূর্য ভগবান নে অন্ধকাসুরকো মারা থা। উস্ দৈত্য কী হাড্ডিয়া ইঁহা পর নর্মদাজীকা কিনারে বিশাল পথরকে রূপমেঁ পরিবর্তিত হো গয়ী হ্যায়। তারপর এক প্রকার জোর করে আমাদের হাত ধরে টেনে নর্মদার ধার হতে কিছুটা অভ্যন্তরে প্রায় কোমর সমান জলের মধ্যে এক কুণ্ডের ধারে এনে দাঁড় করালো।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম নর্মদার জল ঠাণ্ডা কিন্তু কুণ্ডের জল গরম। আর তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। যুবকটি জানাল — সূর্য ভগবান এই কুণ্ডেই স্থিত আছেন। যদি দড়িতে বেঁধে চাল ও ডাল এই কুণ্ডে নামিয়ে দেওয়া হয় তবে দু মিনিটের মধ্যে চাল, ডাল সিদ্ধ হয়ে যাবে। পরিক্রমার পথে বহু পরিক্রমাকারী এই কুণ্ডের জলে নিজেদের আহার প্রস্তুত করেন। আপনারাও তা করতে পারেন। এই কুণ্ডের জলে চর্মরোগ ও বাতজ ব্যাধির নিরাময় ঘটে।

আমি বললাম — আমরা কপর্দকহীন অবস্থায় পরিক্রমা করছি। আমরা আকাশবৃত্তিধারী। মা নর্মদা যখন যা জুটিয়ে দেন আমরা তা গ্রহণ করি। আমার কথায় যুবকটি থতমত খেয়ে গেল। মিনিট খানেক চুপ থেকে বলল — অব চলেঙ্গে। আমরা নর্মদার পাড়ে উঠে এলাম। যুবকটি আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। দ্রুতপদে চলে গেল।

আমি সঙ্গীদের বললাম — বিহারের বরকট্টাতেও আমি এরকম এক উষ্ণ কুণ্ড দেখেছি। কথিত আছে, সেখানেও সূর্য ভগবান তপস্যা করেছিলেন। এটি এশিয়ার উষ্ণতম কুণ্ডগুলির একটি। ঐখানে প্রায় ২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সূর্য ভগবানের কষ্টিপাথরের তৈরী মূর্তি বিরাজমান। এক মৌনী সাধু ঐ কুণ্ডের ধারে বাস করেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোন অবস্থাতেই তিনি কুণ্ডের কাছ ছেড়ে যান না। ঐ কুণ্ডের দশ বিশ মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম বা জনপ্রাণীর দেখা পাওয়া ভার। চতুর্দিকে জমাট বাঁধা মেঘের মত জঙ্গল আর থরে থরে পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের কথার ফাঁকে যুবকটি তার বাড়ী থেকে এক বালতী দুধ এবং গোটা কুড়ি পাকা মর্তমান কলা নিয়ে এসে হাজির হল। ছেলেটির সঙ্গে এসেছে তার মা ও ছোট বোন। তারা সকলে হাতজোড় করে আমাদের আহারের জন্য অনুরোধ জানাল। আমরা আহারের সম্মতি জানাতেই যুবকটি নর্মদার জল এনে পা ধুইয়ে দিল। যুবকটির মা খুবই যত্ন সহকারে খাদ্য পরিবেশন করলেন। বেলা আড়াইটা নাগাদ আমাদের ভিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হল।

তারা আমাদের প্রণাম করে চলে যাবার উপক্রম করতেই হরানন্দজী তাদের ডেকে ঝোলা হাতড়িয়ে একটি শ্বেতশুভ্র নর্মদা লিঙ্গ বার করে যুবকটির মার হাতে দিয়ে পূজা করতে বললেন। বললেন — এই শিবপূজার ফলে তোমাদের সংসারের মঙ্গল হবে। শিবমস্তু। শিবমস্তু।

তারা শিবলিঙ্গটিকে বারবার মাথায় ছুঁইয়ে ফিরে গেল তাদের বাসায়। আমাদের যাত্রা হল শুরু। দেখছি পাহাড়ের উপর শালগাছের সঙ্গে লতা-পলাশের জড়াজড়ি। বসন্তকালে এই লতার গাঁঠে গাঁঠে অজস্র রক্ত পলাশ ফোটে। সমগ্র বনশোভা তখন অপরূপ হয়ে উঠে, আমরা পথের মধ্যে একটা ঝর্ণা পেলাম। কুলকুল করে বয়ে চলেছে। ঝরণার কলতানকে মধুর সঙ্গীত বলে মনে হচ্ছে। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই দূর থেকে দেখতে পেলাম নর্মদার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপের মত স্থান দেখা যাচ্ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি। স্রোত প্রচণ্ড। আমরা গৌঘাট নামক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। প্রায় পাঁচটা বাজতে চলল। এখনও সূর্য সম্পূর্ণতঃ অস্ত যায় নি। এখনও পথঘাট, পাহাড়ের গাছপালা সব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। গৌঘাটের মধ্যস্থলে একটি বড় রকের ওপর বার যোগিনীর মন্দির। এখানে বহু লোকজনের বসতি চোখে পড়ল। মাঠভরা ফসল এবং ক্ষেতি-খামার দেখে বুঝা গেল গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ।

দ্বীপের দুই দিকে নর্মদার ধারা দুভাগ হয়ে বয়ে চলেছেন। আমরা নর্মদা স্পর্শ করলাম। তপোবন সদৃশ এই স্থানটি অশ্বত্থ, বট, আমলকী, পাকুড়, বিল্ব, যজ্ঞ-ডুমুর, শমী প্রভৃতি বৃক্ষে এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। এখানে দুই ধারার মধ্যে এক ধারায় জল বেশী এবং চওড়া। কিন্তু অন্য ধারায় জল অপেক্ষাকৃত অনেক কম হলেও জল ঘূর্ণিত হচ্ছে প্রচণ্ডবেগে। এই ধারার নাম বৃদ্ধরেবা। আমাদের এখন আশ্রয় প্রয়োজন, প্রয়োজন বিশ্রামের। লাঠি হাতে রাখাল বালকের কাছে তার সন্ধান জানতে চাইলাম। সে বলল — আউর আধঘন্টা চলনেসে সাঙ্গখেড়া ঘাটমেঁ পহুঁছ যায়েগা। উধার পরিক্রমাবাসীয়োঁকে লিয়ে আচ্ছা ইন্তেজাম হ্যায়। এই কথা শুনে হরানন্দজী বললেন, সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে পা দুটো যন্ত্রনায় কট্‌কট্ করছে। আর হাঁটতে পারছি না।

প্রেমানন্দ বললেন — এখানে কোথায় থাকবেন?

হরানন্দজী — এই তরুতলে। এই বলে মাথার উপর অশ্বত্থ গাছ দেখিয়ে দিলেন। আপনাদের যদি যেতে ইচ্ছা হয় যান, আমি এখানেই থাকব। আজ রাত্রিটা বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাব।

বার যোগিনীর মন্দিরের সামনেই এই গাছ। এই গাছের তলাতেই আমরা ঝোলা গাঁঠরী রেখে দিলাম। আমরা গাছতলায় বসে মন্দিরের মধ্যে স্তোত্র পাঠ শুনতে পাচ্ছি। মন্দিরের সামনে বিরাট চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি এত চওড়া যে এক এক ধাপে এক একজন আরামে শুয়ে রাত কাটাতে পারবে। মন্দিরটি পাথরের উঁচু প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। মন্দিরের প্রবেশ করেই দেখলাম মন্দিরের দেওয়ালে বারজন যোগিনীর মূর্তি। প্রত্যেকটি মূর্তি গঠন পরিপাট্যে অপূর্ব স্থাপত্যকলার স্বাক্ষর বহন করছে। এই মন্দিরের মধ্যে বিরাজিত আছেন এক শিবমূর্তি। মূর্তিটি ষড়ভুজ। উপরের হাতে আছে বজ্র ও পদ্ম। মাঝের দুই হাতে খড়্গ ও পাত্র এবং নিচের দু হাত পিছনে ফিরান।

পুরোহিতজী বললেন — মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে আরম্ভ হয়। এই মন্দিরের বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে, যেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। মন্দির দর্শনের পর ফিরে এলাম অশ্বস্থ গাছের তলায়। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। পুরোহিজতী একটি প্রদীপ জ্বেলে গাছের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন। পথশ্রমের ক্লান্তি ও আলস্যে আমাদের চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নর্মদা স্পর্শ করে যাত্রা শুরু করলাম। বার যোগিনীর মন্দিরে প্রণাম করে, মন্দির পরিক্রমা করে চলতে লাগলাম পূর্বদিকে পশ্চিমগামিনী নর্মদার ধারাকে চোখে চোখে রেখে।

ক্রমে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। রাস্তা বা পায়ে চলার দাগ বলতে কিছু নাই, কঠিন পার্বত্য পথ ঝোপেঝাড়ে লতায় পাতায় সব ঢেকে গেছে। মোটামোটা শালগাছ, কেঁদ, বারম, সাজা গাছের জঙ্গল। প্রায় প্রত্যেকেই লাঠির ঘা মারতে মারতে ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। যতই এগোচ্ছি তত জঙ্গল ঘন হচ্ছে। শালবনের ভিতর দিয়ে কালো কালো পাথরের আঁকা-বাঁকা পথ এঁকে-বেঁকে যেতে যেতে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। এবার চড়াই শুরু হবে। পাহাড়ের উপর বড় বড় গাছের ঘন নীল শোভা বড় সুন্দর লাগছে। ক্রমে ক্রমে চড়াই শুরু হল। বড় বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিযে ডিঙিয়ে প্রায় ছয়-সাতশ ফুট উপরে উঠে এলাম। এমন পথ যে চিনে উঠতে পারছি না। ঘনঘোর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ী পথকে সর্বত্র একই রকম মনে হয়। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করলাম। সামনে অজানা দুর্গম পথ। পাহাড়ের দু পাশে খস্‌খস্ শব্দ শুনে দুদিকেই ঘুরে তাকালাম। একদিকে

দেখলাম আমাদের চলার পথ থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একপাল হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে দেখলাম প্রায় চার পাঁচটা নেকড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। তারা বোধহয় শিকারের সন্ধান পেয়েছে। আমাদের ভয় হল। আমরা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। সূর্যকিরণ একইরকমভাবে নর্মদার জলে ঝিলিমিলি খেলছে। একবার ভয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম। এখন আর সেই হরিণ আর নেকড়ের দলকে দেখতে পেলাম না। আমরা রেবামন্ত্র জপ করতে করতে প্রাণপণে হাঁটতে শুরু করলাম। ঘন ঘন দুদিকে তাকাচ্ছি। পাহাড়ের দুধারে অনেক বনফুল ফুটেছে। সুবাস ভেসে আসছে। কিন্তু তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার মত মনের অবস্থা আমাদের নয়। প্রাণপণে হাঁটতে গিয়ে মহানন্দস্বামী হোঁচট খেয়ে পড়লেন। গাঁঠরী আর কমণ্ডলু হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। আমি সেগুলি কুড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মহানন্দস্বামীর খুব লেগেছে। হরানন্দজী তাঁর শুশ্রূষা করছেন। একটু পরেই মহানন্দস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমাদের চলার গতি গেল কমে। কমণ্ডলুর জল ঢেলে আমরা গলাটা ভিজিয়ে নিলাম। আর কিছুটা যাবার পরেই পথের সংযোগস্থল দেখতে পেলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম মানুষের কণ্ঠস্বরে। শব্দ লক্ষ্য করে ডানদিকের পথেই পা বাড়ালাম। মিনিট পাঁচেক পরেই দেখলাম চারজন লোক এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের কণ্ঠে শঙ্খনাদ ও স্তোত্র পাঠের শব্দ শুনতে পেলাম।

আমরা দ্রুত পা চালিয়ে তাঁদের সঙ্গ ধরলাম। হঠাৎ পিছন থেকে তাঁদের পাশে আসতেই তাঁরা হকচকিয়ে গেলেন। তাঁদের স্তবপাঠ থেমে গেল। তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' বলে আমি বিনম্র কণ্ঠে বললাম — ভগবন্! আপ কাঁহাসে পধারে? তিনি হেসে বললেন — মেরা নাম হরিদেবানন্দ। হমলোগ হোসেঙ্গাবাদ সে কুব্জা সঙ্গম তক্ যাউঙ্গা। হামারা গুরুদেবকী কাহানা হ্যায় —

তাঁরা স্তব শুরু করলেন —

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্র ঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু।।

মাতৃভূমি আমাদের বিশ্বম্ভরা। জ্ঞানে, ঐশ্বর্যে, ঋদ্ধি ও আলোকের বাণীতে তিনি জগৎকে ভরিয়ে দিয়েছেন। ভারতমাতা তাই সর্বরত্নের খনি। সকল সত্যের, জ্ঞানের ও কর্মের প্রতিষ্ঠান। জগৎ প্রাণীর বাসভূমি। অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শান্তিনিকেতন। এই মাতৃভূমি পরমাত্মার আশীর্বাদপূতা। বৈশ্বানর এখানে বিশ্বনরের কল্যাণে চিরপ্রদীপ্ত। এই পুণ্যা জননী আমাদের কল্যাণে, ধনে ও সমৃদ্ধিতে উন্নত করুন।

উপহ্বরে গিরীণাং, সঙ্গমে চ নদীনাম, ধিয়া বিপ্রঃ অজায়ত।।

গিরির গহ্বরে, কিংবা নদীর সঙ্গমস্থলে বসে ধ্যান করতে করতেই সাধব বিপ্রত্ব লাভ করে। অর্থাৎ নির্জন পরিবেশ আর গভীর ধ্যানই সত্যলাভের উপায়।

তাই আমরা কুব্জা সংগমে বসে গুরু নির্দিষ্ট পন্থায় সাধন করবার জন্য চলেছি। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করলেন — আপ্লোগ কাঁহাসে পধারে।

হরানন্দজী বললেন — আমরা অমরকন্টক যাব। এখন গৌঘাট থেকে আসছি। তবে এখন আপনাদের সঙ্গে কুব্জা সংগম পর্যন্ত যাব। আমরা হাঁটতে লাগলাম নর্মদার ধারে ধারে। চারদিকে তাল আর শিমূল গাছ। অতিকষ্টে সেইসব পাথর ডিঙিয়ে মাইলখানেক হাঁটবার পর বুনো গাছপালার ভিড় দেখলাম। অন্যান্য নদীর যেমন তটরেখা থাকে, নর্মদার তটরেখা বলতে কিছু নাই। নর্মদার এই রকম বিচিত্র তটরেখাহীন গতিপথের জন্য অন্যান্য নদী হতে তার একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়ে। মিনিট দশেক হেঁটে মাছা গ্রামে কুব্জা সংগমের মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি দুই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ বিরাজমান। শিবের সামনে প্রার্থনারত অবস্থায় কুব্জারূপী সরস্বতী এবং লিঙ্গের পিছনে মা নর্মদার শ্বেতপাথরের মূর্তি। পুরোহিত পূজা করছিলেন। আমরা মহাদেবকে প্রণাম করে উঠতেই পুরোহিতজী বললেন — একদা দেবী সরস্বতী পিতৃগৃহে যাবার সময় পথিমধ্যে তপস্যারত কুদর্শন মারিচীক ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে সরস্বতী ঋষির কুৎসিৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে নানা কটাক্ষ শুরু করেন। ঋষি দেবীকে ক্ষান্ত হতে বললে দেবী আরও বেশী করে তাঁকে ব্যঙ্গ করতে থাকেন। ঋষি কুপিত হন এবং অভিসম্পাৎ দেন — তু শুদ্রো হো জায়েগী। ঋষিকে শান্ত করার জন্য সরস্বতী ঋষির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন

সে দাসী মন্থরারূপে রামের পরিবারের সেবা করবে কিন্তু রাম স্পর্শে তার মুক্তি ঘটবে না। পরজন্মে কৃষ্ণের সময় সে কুব্জা রূপে জন্মগ্রহণ করবে। পরে নারদ কুব্জা সরস্বতীকে চিত্তশুদ্ধির জন্য নর্মদা তীরে তপস্যা করতে বলেন। নারদের অনুজ্ঞা মত কুব্জা নর্মদার এই ঘাটে এক যজ্ঞ শুরু করেন এবং তাতে চন্দন-চর্চিত বিল্ব পত্র আহুতি দিতে থাকেন। তখন সেই যজ্ঞ-কুণ্ডে এক জ্যোতিঃঘন রূপ প্রকট হয়। সেই জ্যোতির মধ্য থেকে প্রকট হন এই মহাদেব। এই মহাদেব বিল্ব পত্র হতে উদ্ভূত হয় বলে এই তীর্থের নাম বিল্বামুক-তীর্থ। তিনি এই শিবলিঙ্গের সামনে ঘোরতর তপস্যা শুরু করেন। পরে তাঁর চিত্তশুদ্ধি ঘটলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সেই থেকে এই ঘাটের নাম হয় কুব্জা সঙ্গম। আর শিবের নাম কুব্জেশ্বর। বায়ুপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে কুব্জেশ্বর মহাদেবের বিশদ বর্ণনা আছে।

পুরোহিতজীর কথা শেষ হতেই হরানন্দজী হরিদেবানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন — আপলোগকা সাধন পন্থাকে উপর থোড়া রোশনী ডালিয়ে।

হরিদেবানন্দজী বলতে আরম্ভ করলেন — চারি বেদ চার পুরোহিতের। ঋগ্বেদ প্রশস্তিবেদ। হোতা নামক পুরোহিত স্তোত্র উচ্চারণ করে দেবতার সন্তোষ সাধন করেন। সামবেদ সঙ্গীতবেদ। উদ্‌গাতা উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে সে সকল গান করেন। অথর্ববেদ ব্রহ্মবেদ। ব্রহ্ম নামক পুরোহিত যিনি যজ্ঞ পরিচালনা করেন। কিন্তু যজ্ঞে সবচেয়ে বড় কাজ ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকাণ্ডের মর্ম যিনি জানেন তাকে বলা হয় অধ্বর্য্যু। আর এই অধ্বর্য্যুর প্রয়োজনীয় মন্ত্রমালার সংগ্রহই যজুর্বেদ।

যজুর্বেদের দুইটি ভাগ — শুক্ল, কৃষ্ণ। বেদব্যাস ব্রহ্মপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদকে চার ভাগে ভাগ করে পৈল, বৈশম্পায়ণ, জৈমিনি ও সুমন্ত্রকে- উপদেশ দেন। বৈশম্পায়ণ তাঁর ছাত্র যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অধীত বিদ্যা প্রত্যর্পণ করতে বলেন। গুরুর আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য যোগবলে গৃহীত বেদ বিদ্যা উদ্‌গীরণ করেন। তখন বৈশম্পায়ণের শিষ্যেরা তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করে সেই বেদ গ্রহণ করেন। সেই বেদের নাম হয় তৈত্তিরীয় সংহিতা। শিষ্যের মলিন বুদ্ধি হতে জাত বলে এই বেদের নাম হয় কৃষ্ণ যজুর্বেদ।

এরপর যাজ্ঞবল্ক্য নির্মল বেদবিদ্যা লাভের আশায় সূর্যের উপাসনা শুরু করলেন। সূর্য তখন বাজ রূপ ধারণ করে তাঁকে অমৃত বিদ্যা দান করেন। তার নাম হয় বাজসনেয় সংহিতা। এই বেদের ভাষা সুসংস্কৃত ও সুনির্মল বলে এর নাম শুক্ল যজুর্বেদ। ঋষি বৈশম্পায়ণের যে তথ্য অজ্ঞাত ছিল, তা এতে আছে বলে এর আর এক নাম 'অযাতি যাম'।

যাজ্ঞবল্ক্য অধিগত এই নির্মল বেদ বিদ্যা তাঁর পনেরজন শিষ্যকে দান করেন। গৌধেয়, কাম্ব, জাবাল, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি পনেরজন শিষ্য এক একটি শাখার প্রবর্তক। বর্তমানে শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখাই বেশী প্রচলিত।

বেদপাঠ ব্রাহ্মণের প্রাত্যহিক কর্তব্য। স্বাধ্যায় নিত্য কর্ম। যে ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করেন না, তিনি আদৌ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নয়। মনু বলেছেন —

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী, যথা চর্মময়ো মৃগঃ
যশ্চ বিপ্রহোনধীয়ান স্ত্রয়স্তে নাম ধাবকাঃ।

কাঠের হাতী যেমন হাতী নয়, চামড়ার হরিণ যেমন হরিণ নয়, তেমননি যে ব্রাহ্মণ বেদে পড়েন না, তিনি ব্রাহ্মণ নন। তিনি কেবল ব্রাহ্মণ রূপ নাম ধারণ করেন। বেদ মানুষের নিঃশ্রেয়স্কর শাস্ত্র। মানুষের যজ্ঞের পথ সকল, তপস্যাদি ও ভাল কাজের নিগূঢ় বাক্যই বেদে আছে। তাই বেদাধ্যয়ন না করলে প্রতবায়গ্রস্ত হতে হয়। যিনি বেদ না পড়ে অন্য পাঠে আসক্ত, তিনি পাপী। বেদই মানুষকে নবজীবন দেয়।

সহস্রকত্বস্ত্বভাস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোহপোনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে।।

সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে নবদেহ লাভ করে, তেমনি বেদাধ্যয়ন করে মানুষ নবজন্ম লাভ করে।

এই পরমবিদ্যা, অধ্যাত্মসম্পৎ অনুভূতির বিষয়। উপলব্ধির বিষয়। অর্থ না বুঝে কেবল আবৃত্তি বৃথা। যাস্ক বলছেন —

স্থানুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীতা বেদং ন বিজানাতি যোহর্থম্।
যোহর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা।
যদ্‌গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ।।

বেদ পড়ি অথচ অর্থ জানি না। তা হলে স্থানুর মতই ভার বহন করে চলি। যে অর্থ জানে, সেই কল্যাণ পায়। জ্ঞানের দ্বারা বিধূতপাপ হয়ে স্বর্গে যায়। যেখানে আগুন নাই সেখানে শুষ্ক কাঠ ফেললে যেমন আগুন জ্বলে না, তেমনি অর্থ না জেনে ফটফট করলেই বেদজ্ঞ হওয়া যায় না।

এখন যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার মন্ত্রের দ্যোতনা এবং মাধুর্য শ্রবণ করুন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন —

অগ্নে ব্রতপতি ব্রতং চরিষ্যামি। তচ্ছকেয়ম তন্মে রাধ্যতাম।
ইদমহমনুতাৎ সত্যমুপৈমি।

ব্রতপতি অগ্নি তোমায়, জানাই নমস্কার
আজকে আমি নিলেম শিরে কঠোর ব্রতভার।
পারি যেন সাধতে তাহা পুরক মনস্কাম,
এই আমারো মিথ্যা হতে মিলুক সত্যধাম।

বেদপন্থীর জীবন ব্রতজীবন। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অমোঘ আশীর্বাদে সেই ব্রত যেন আমরা প্রতিপালন করতে পারি।

যজুর্বেদের মন্ত্রগুলিতে আছে আশা, আলোক ও আনন্দ। প্রার্থনা, প্রক্রিয়া ও কর্মের মহিমাময় স্থান ধর্মে আছে। যজুর্বেদের মন্ত্রগুলির মধ্যেও অনুপম কবিত্ব, অপূর্ব ব্যঞ্জনা এবং পরিশীলিত রসসংবেদনা দেখতে পাই।

বৈদিক ঋষি বৈরাগ্যবাদী নন তিনি জীবনকে পরমানন্দে পরিপূর্ণতার মাধুর্য্যে উপভোগ করতে চান। তাই তাঁরা প্রার্থনা করেন —

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাদচ্ছক্রমুচ্চরৎ
পশ্যেম শরদঃ শতম জীবেম শরদঃ শতম্
শৃণুয়াম শরদঃ শতম প্রবব্রাম্ শরদ শতমদীনাঃ
শ্যাম শরদঃ শতম ভূয়শ্চ শরদঃ শতাং। (৩৬৷২৪)

একশ শরৎ দেখব চোখে সূর্যদেবের অভ্যুদয়,
জগন্নেত্র দিবাকরের দেখব ওঠা জ্যোতির্ময়।
বাঁচব মোরা বাঁচার মতন, একশ শরৎ হাসি-গানে,
একশ শরৎ শুনব সকল শোনার মতন মুগ্ধ কানে।
একশ শরৎ বলব অনেক অদীন হয়ে থাকব সুখে,
শত শরৎ চেয়ে অধিক বাঁচব মোরা ধরার বুকে।

জীবনবাদী পান্থ পথ চলবে সূর্য্যের চক্রগতির ছন্দে। চলার সুরে তার জীবন কানায় কানায় ভরে উঠবে। তাই ত জ্যোতির দেবতার বন্দনা শুনি —

স্বয়ং ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মিবর্চোদা অসি বর্চো মে দেহি সূর্যাস্যাবৃতমন্বাবর্তে।

তোমার আলো সবার ভাল হে স্বয়ম্ভু সূর্য্য
বীর্যদাতা শক্তি তুমি দাও আমারে বীর্য্য
যে পথ দিয়ে নিত্যদিবা চলহ তুমি দৃপ্ত
সে পথ তোমার করব শরণ গতির গানে তৃপ্ত।

এই জ্যোতির গানের কথাই যজ্ঞের মূল কথা।

স্বাহা মন্ত্রে অগ্নির যে আহ্বান সে ডাক আলোকের ও পুলকের।
অগ্নির্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নি, স্বাহা

সূর্য্যো জ্যোতিজ্যোতিঃ সূর্য্য, স্বাহা
সূর্য্যো বর্চ্চো জ্যোতির্বর্চ্চো, স্বাহা
জ্যোতি সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতি, স্বাহা।

অগ্নি জ্যোতির ফুল, জ্যোতিই আগুন অতুল, স্বাহা।
সূর্য্য জ্যোতির মূল জ্যোতিই সূর্য্য, বিপুল স্বাহা
সূর্য তেজের কূপ শক্তি জ্যোতির ধূপ, স্বাহা
সূর্য্য জ্যোতির ফুল, জ্যোতিই সূর্য্য অতুল, স্বাহা।

এই আলোকের দিশারী যারা, অমৃতপথের পথিক যারা, তারা কোথাও দেখে না অমঙ্গল। পথে পথে জাগে তাদের কল্যাণ ও বিভূতি। পৃথ্বী তাদের প্রতি ক্ষেমঙ্করী। শঙ্কর তাদের শান্তি বিধান করেন। তাই তাদের দ্যৌ হয় শান্তিময়, তাদের পায়ের ধূলি হয় মধুময়, তাদের চারদিকে বহে রসে ভরপুর বাতাস, নদী ঢালে আনন্দধারা, পাখী গায় রসময় গান, জগৎ তোলে সুখতম তান।

তাই তাঁদের কামনা —

বিশ্বানি দেব সবির্তর্দুরিতাণি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

হে দেব সবিতা, যা কিছু অকল্যাণ।
যা কিছু পাপময়, কর তা দূর।
হে পবিত্র জ্যোতিদীপ! ভদ্র সংবিধান
আনো এ জীবনে মোর কল্যাণের সুর।

যজুর্বেদের কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া জটিলতা এবং অন্ধ দাসত্ব বোধকে যে কোন সভ্য ও ভব্য মানুষ অসহ্য মনে করেন। বিশেষ পারদর্শী অধ্বর্য্যু অধ্বরে সুদীর্ঘ জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের যে বিরাট ঘটা করতেন তা মানুষকে অলৌকিকের প্রতি টেনে নিয়ে যায়। এ যজ্ঞক্রিয়ার পিছনে এই দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞবিধির পরিপূর্ণতায় যজমান আপন অভীষ্টকে পান এবং দেবগণকে মন্ত্রবলে আয়ত্ত করে মানুষের যা কিছু অভিলাষিত তা পাওয়া যায়।

এই বোধ এবং এই প্রতীতি আমাদের অনেক সর্বনাশ করেছে। আমাদেরকে ধর্মের তেজোময় কল্যাণময় পথ হতে যাদু ও ভোজবাজীর লঘুতায় কলুষিত করেছে। কিন্তু এর মধ্যেও হঠাৎ যেন দূরাগত মেঘলীন সূর্যের আলো এসে পড়ে দিগ-দিগন্তকে উজ্জ্বল করে তোলে।

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণসন্ত্বোষধীঃ।
মধুনক্তমতুবশে মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো ন বনস্পতি মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

বাহ্যবায়ু শ্বাসবায়ু শিবোযোগ হোক মধুময়
মধুপ্রদ জীবনের লাগি,
বহমান সরিৎ-সাগর, ওষধিও হোক মধুময়ী
দ্যুলোকেতে পিতৃগণ হোন মধুভাগী।
মধু রাত্রি, মধু দিবা, মধুময়ী গতি
পার্থিব পায়ের ধূলি, সেও আজ হোক রসবতী।
মধুমতী প্রজ্ঞালোকে, আদিত্য হাসিছে হের,
বনস্পতি গাভী আদি সবই মধুক্ষরা আজি সকলই সরস,
মধুমতী মধুমিতা হয়ে নেমেছে ধরায়
বক্ষে তার পেয়েছি পরশ।

এই মধুর আনন্দরসে উজ্জীবিত সাধক ব্রহ্মবিহার করবেন — সর্বজনের কল্যাণ কামনায় সর্বমেধ করবেন। দেবজীবনই যজ্ঞজীবন। মানুষের মন যখন আপন স্বার্থের পরিমণ্ডলে ঘুরে আকুল হয় তখন তার জাগে বন্ধন। আর্ত ও ব্যথিত হয়ে চিত্ত তখন হাহাকার করে। সেই দুর্দিনে জীবনে পদ্ম-কলিকা ফোটে এবং

জ্ঞান-জ্যোতির উদ্ভাবনে সাধকের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে —

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রম্ তদ্ ব্রহ্মা তা আপঃ স প্রজাপতিঃ। (৩২৷১)

তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য, তিনি বায়ু, চন্দ্রমাও তিনি,
জ্যোতি তিনি ব্রহ্ম তিনি, প্রজাপতি ভাতি সর্ব তিনি।

সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভং। (৩২৷২)

যে এক পুরুষ হতে জেগেছে নিমেষ সর্ব বিদ্যুতের সম
উচ্চে নীচে মধ্যভাগে কেহ না বুঝিল তার চির অনুপম।

ন তস্য প্রতিমা অস্তিযস্য নাম মহদ্যশঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্নজাত ইত্যেষঃ। (৩২৷৩)

কেহ নহে প্রতিমা তাহার, নাম তার মহতী মহিমা।
না করেন হিংসা যেন সে হিরণ্যগর্ভ জাত কেহ নাহি জানে তার সীমা।

প্রাচীন ভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে হোতা এবং অধ্বর্য্যুগণ প্রহেলিকাগুণ ভাষার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবগুলি প্রশ্নোত্তর ছলে প্রকাশ করতেন। যজুর্বেদের ২৩ অধ্যায়ে সেইরকম বহু মন্ত্র আছে। নিম্নে অধ্যাহৃত মন্ত্র তারই কিঞ্চিৎ রূপান্তর —

অধ্বর্য্যু — কিং স্বিৎ সূর্যসমং জ্যোতিঃ কিঞ্চ সমুদ্রসমং সর।
কিং স্বিৎ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ঃ কস্য মাত্রা ন বিদ্যতে।

সূর্য সম জ্যোতি কার নিহিত গুহাতে?
সরসী সমুদ্র সম কোথায় মরতে?
পৃথিবীর চেয়ে বড় কিবা আছে ভাই —
বল দেখি কিবা তাহা মাত্রা যার নাই?

হোতা — পিতা সূর্যসমং জ্যোতিঃ মাতা সমুদ্রসমং সরঃ।
পিতা পৃথিব্যৈঃ বর্ষীয়ান্ মাতুর্মাত্রা ন বিদ্যদ্রতে।

পিতৃজ্যোতি সূর্য সম অপার অনন্ত
মাতৃস্নেহ সমুদ্রসে নাহি তার অন্ত।
পৃথিবীর চেয়ে বড় পিতা জ্যোতিষ্মান্।
জননীর মাত্রা কেহ জানে না ধীমান্!

যজুর্বেদের মধ্যে জীবনে আচরণের অমৃত মিলবে না অনেকে এই সন্দেহ করতে পারেন, কিন্তু আমি বলব — যজুর্বেদ ভাল করে অধ্যয়ন করলে আমরা এক প্রাণবন্ত চরিত্র-নীতির দর্শন পাই। যজুর্বেদ কর্মী গড়তে চায় —

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যযেতোহস্তি ন কর্ম লিখ্যতে নরে।

কর্ম কর দিবা রাত্রি, কর্ম কর চাহ সুদীর্ঘ জীবন
এই পথ সত্য পথ, নাহি অন্য জান —
কর্ম দেয় প্রাণশক্তি, নাহি আনে আলিম্পণ।
এই কর্মের জন্য দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ হতে হবে।

দীর্ঘজীবনের পন্থা ব্রতী-জীবন। যাকে প্রাচীনেরা যজ্ঞজীবন বলতেন। তাই তাঁরা বলতেন —

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্

পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্ যজ্ঞ যজ্ঞেন কল্পতাম্।
প্রজাপতে প্রজা অভূম স্বর্দেব অগন্মাম-তা অভূম।। (৯৺২১)

যজ্ঞের পরশে আয়ু পাক সফলতা
যজ্ঞের মধুর ধূমে প্রাণের পূর্ণতা।
চক্ষু হোক জ্যোতির্ময় সিদ্ধিতে উজ্জ্বল,
কর্ণ দুটি যজ্ঞসুরে হউক চঞ্চল।
পৃষ্ঠ হোক বলবান যজ্ঞশক্তি লাভে
যজ্ঞের সমৃদ্ধি হোক যজ্ঞের আরাবে।
প্রজাপতি পুত্র মোর, অমৃত সন্তান
মর্ত্তেতে লয়েছি আজ অমর্ত্ত্য সন্ধান।

জীবনের এই কথাটি নানাভাবে জাগরিত করাই বেদবিদ্যার উদ্দেশ্য।

যে নিঃশ্রেয়স আমাদের কাম্য, তা পার্থিব সমৃদ্ধি নয়, তা হল হৃদয়ের প্রসারতা, আমিত্বের বিস্তৃতি, বৃহতের পরিচয় এবং ভূমার আবির্ভাব। এ জন্যই ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে —

ওজশ্চ মে সহশ্চ মে আত্মা চ মে তনুশ্চ মে
শর্ম চ মে বর্ম চ মেহঙ্গানি চ মেহস্থীনি চ মে
পরনেষি চ মে শরীরাণি চ মে আয়ুশ মে
জরা চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম।

আমার ওজস্বিতা, আমার শক্তি, আমার আত্মা, আমার দেহ, আমার শর্ম, আমার কল্যাণ, আমার বর্ম, আমার রক্ষাকবচ, আমার অঙ্গ ও আমার অস্থি, আমার সন্ধিগুলি, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার আয়, আমার বার্দ্ধক্য যজ্ঞের পরমানন্দে আনন্দিত হোক, সফলতায় সমৃদ্ধ হোক, সিদ্ধির পরম পরিপূর্ণতায় পূর্ণ হোক।

সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে
বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোহশ্চ মে জাতং চ
মে জনিষ্যমানং চ মে সূক্তং চ মে সুকৃত্যং চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্

আমার জীবনের গভীর সত্য, আমার অন্তরের নিগূঢ় শ্রদ্ধা, আমার সচল গবাদি ধন, আমার অচল ধন, আমার দ্রব্যাদি, আমার আনন্দ, আমার ক্রীড়া ও আমোদ আমার কথা এবং ভাবী সন্তানেরা — আমার সুভাষিত এবং সুকৃত কর্ম সকলই পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হোক, যজ্ঞের শান্তিজলে অমৃতময় হোক।

হরিদেবানন্দজী নীরব হলেন। তারপর বললেন —

— কাল সকাল থেকে মা নর্মদার সামনে আমরা এক একটি মন্ত্রে যজ্ঞ করব। আমরা এখানে সাতদিন থাকব। কারণ নর্মদার জল গ্রাম বা বনাঞ্চল যেখান দিয়েই প্রবাহিত হোক না কেন সর্বত্রই নর্মদার জলের মহিমা, সর্বত্রই তিনি সমানভাবে পতিতোদ্ধারিণী। তিনি বলতে লাগলেন —

সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্বাঃ, কল্পে কল্পে ক্ষয়ং গতাঃ
সপ্ত কল্প ক্ষয়ে ক্ষীণে ন মৃতা তেন নর্মদা।

প্রলয়কালমেঁ সমস্ত সাগর এবং সভী সরিতায়েঁ স্বরূপসে ক্ষীণ হোকর যাতী হৈঁ লেকিন সাতকল্প তক্ য়হ্ নর্মদা নদী নষ্ট নহী হুয়ে। অতঃ উনকা নাম ন মরণেবালী নর্মদা হুয়া।

আপনারা ইচ্ছা করলে এই কুব্জা সংগমে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে পারেন।

হরানন্দজী — আমরা অমরকন্টক থেকে এখনও বহুদূরে। আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই। আমরা কাল সকালেই যাত্রা করব।

— যো আপলোগোকা মর্জি।

অনেক রাত্রি হয়ে গেল ঘুম আসতে। সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল, এখনই যাত্রা করতে হবে। আমরা ঝোলা-গাঁঠরী বেঁধে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হরিদেবানন্দজী ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ হতে বিদায় নিলাম। নর্মদা মাতাকে দর্শন করে প্রণাম করলাম। জয় মা নর্মদা! নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ।

সমস্ত সাতপুরাস্থিত জঙ্গলের উপর সূর্যরশ্মি সেইমাত্র এসে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। পর্বতের অধিত্যকা গাছপালার সবুজ আভায় বড় চমৎকার দৃশ্য রচনা করেছে। পার্বত্য পথের দুধারে গাছপালা পথের উপর লুটিয়ে পড়েছে; আমরা একটা রাস্তার মোড়ে এসে বাঁক নিলাম। অধিত্যকার এই অংশটি নিচের দিকে নামছে বলে মনে হল। মার্তণ্ডদেব তখন মধ্যগগনে। বেলা বোধহয় বারটা নাগাদ আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছালাম যে প্রবহমান নর্মদার ধারা দেখতে পেলাম। নর্মদা কলকলনাদে বয়ে যাচ্ছেন। এখান থেকে উৎরাই-এর পথে নেমে গেলেই উপত্যকা অঞ্চল পাব। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। আসার সময় পুরোহিতজী প্রদত্ত পেয়ারা ও মোয়া ঝোলা থেকে বের করে ভাগ করে খেলাম। প্রায় দুটো বাজতে যায়। আর কিছুটা গেলেই নর্মদাতটের উপত্যকা অঞ্চল পাব বলে মনে হচ্ছে। নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হেঁটে চলেছি। শিলাতটে প্রতিহত হচ্ছে নর্মদার নির্মল জলধারা। দূরে নিশ্চয়ই কোথাও গ্রাম আছে, কিন্তু আমরা গোচারণরত কয়েকটি রাখাল যুবক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। নর্মদার জলের শব্দকে এই নির্জন পরিবেশে মনে হচ্ছে যেন বনশ্রীর অনন্ত সংগীত। চলার আনন্দ আমাদের পেয়ে বসেছে। বিকাল বোধহয় পাঁচটা হবে। সূর্য পশ্চিমে অস্তাচলে ঢলে পড়েছেন। সকাল থেকেই হাঁটছি। নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। নর্মদার স্নিগ্ধ জলধারায় সব ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল।

স্নান সেরে ধড়াচূড়া এঁটে ঘাটের এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতেই দেখতে পেলাম একটি শ্বেত মন্দিরের চূড়া। পত্‌পত্‌ করে গৈরিক পতাকা উড়ছে। এই অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে সেগুন গাছের সঙ্গে কতকগুলি শিশুগাছও দেখতে পেলাম। গোচারণরত যুবকদের মধ্যে একজন জানাল — ইহ ঘাটকা নাম হ্যায় শাঁ'য়িা ঘাট। মধ্য রেলওয়েঁ কী পিপরিয়া স্টেশন সে শাঁ'য়িা তক পক্কী সড়ক ভী থী। ওহ্ হ্যায় শাণ্ডিলেশ্বর তীর্থকা মন্দির। উধার আপলোগোকা রাত্রিবাসকে লিয়ে জাগাহ্য মিলেগী, বহুত বড়া মন্দির হ্যায়।

আমরা সেই মন্দির লক্ষ্য করে হেঁটে চললাম। মন্দিরে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম — মন্দিরে পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন — আজ আপনারা আমার অতিথি। মন্দিরের পিছনেই পরিক্রমাবাসীদের থাকার জন্য আলাদা কুটির আছে। আপনারা সেখানেই রাত্রিবাস করবেন।

এই বলে পুরোহিতজী আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের পিছনের কুটীরে নিয়ে এলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। আমরা সেই ঘরে যে যার মত করে বিছানা পাতলাম। ঘরের মধ্যে দুটি জানলা। জানলা দিয়ে মা নর্মদাকে দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে পুরোহিতজী ঘরের মধ্যে দুটি মোমবাতি জ্বেলে দিলেন। আমাদের জলপানের জন্য দুটি ঘড়া নর্মদার জল ভর্তি করে আনলেন। পুরোহিতজী খুবই দয়ালু ও প্রেমিক প্রকৃতির মহাত্মা। তিনি হাতজোড় করে বললেন — সারাদিন আপনারা হেঁটে এসেছেন। হাত পা নিশ্চয় ব্যথায় টনটন করছে। আপনারা যদি গ্রহণ করেন তাহলে বাড়ী থেকে একটু কবিরাজী চূর্ণ নিয়ে আসতে পারি। আমরা সম্মতি জানাতেই তিনি চলে গেলেন, প্রায় আধঘন্টা পরে পুরোহিতজী আমাদের জন্য একলোটা গরম জল ও কিছুটা কবিরাজী ঔষধের চূর্ণ নিয়ে এলেন। তাকে মধু সহযোগে খল-নুড়ী তে মেড়ে আমাদেরকে খেয়ে নিতে অনুরোধ করলেন।

আমরা তা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরেই ঘুম ভাঙল। শরীর বেশ ঝরঝরে। নর্মদার ধারে গেলাম শৌচাদি সারতে। স্নান শৌচাদি সেরে ফিরে আসতেই পুরোহিতজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে বললাম গতরাত্রে গরমজলের সঙ্গে যে চূর্ণ খেতে দিয়েছিলেন, তা খেয়ে আমাদের শরীর বেশ সুস্থ হয়ে গেছে, কোন অবসাদ নেই। আমাদের কথায় তিনি খুব লজ্জিত হয়ে বলে উঠলেন — এ আর এমন কী। আপনারা মায়ের সন্তান। মায়ীই আপনাদের সুস্থ রাখবেন। আমি নিমিত্ত মাত্র। এই কথা বলেই তিনি মন্দিরে চলে গেলেন।

সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষভাগ রোদে ঝলমল করছে। সমতল অঞ্চলে বাজরা জোয়ার বেশ পরিপুষ্ট হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নর্মদাতে স্নান তর্পণাদি সেরে গেলাম মন্দিরে। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি যজ্ঞকুণ্ড। যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে কেবল সাদা ছাই। যজ্ঞকুণ্ডের কাছে গেলে বেশ তাপ অনুভব হচ্ছে। ভাবলাম পুরোহিতমশাই সকালে হয়ত যজ্ঞ করেছেন। কিন্তু কোন পূজা পাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ত শুনতে পাই নি। পুরোহিতমশাই পিছন থেকে বলে উঠলেন — এই শাণ্ডিলেশ্বর তীর্থের একটি কাহিনী আছে। প্রাচীনকালে বশিষ্ঠ, জামদগ্নি,

ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের সেই যজ্ঞে আবাহন করেন। একমাত্র ঋষি কশ্যপ ছাড়া সেই যজ্ঞতে সকলেই উপস্থিত হন। কশ্যপ ঋষি না আসায় যজ্ঞ আরম্ভ হতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ঋষিরা কশ্যপের নামাঙ্কিত একটি কুশগ্রন্থী যজ্ঞকুণ্ডের সামনে রেখে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে ঋষি কশ্যপ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলে সমস্ত ঋষিরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং কুশগ্রন্থী নির্মাণের কারণ জানান। ঋষি কশ্যপ নিজ কমণ্ডলুর জল দিয়ে ঐ কুশগ্রন্থীটিকে সিঞ্চন করতে থাকেন। আস্তে আস্তে কুশগ্রন্থটী মৃগচর্ম পরিহিত এক তপস্বী ব্রাহ্মণের রূপ পরিগ্রহ করে। এই ব্রাহ্মণ ঋষির নাম শাণ্ডিল্য। শাণ্ডিল্য ও শাণ্ডিলী উভয়েই এই যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই থেকে এই যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি আজও অনির্বাণ। বিনা কাঠে ঐ যজ্ঞকুণ্ড জ্বলছে। এর আগুন কখনও নেবে না। বশিষ্ঠ সংহিতাতে এই তীর্থের বর্ণনা আছে। সারাজীবন নর্মদাশ্রয়ী হয়ে নর্মদাতটে দাঁড়িয়ে কোন মিথ্যাচার করছি না।

আমরা কোন কথা বললাম না। কুটীরে ফিরে এলাম। তারপর আমি মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রকৃত ওঁকারেশ্বরের পূজা করার সময় আমাকে নিত্যপাঠ করার জন্য যে তণ্ডিকৃত অষ্টোত্তর সহস্র শিবনামরূপ স্তোত্রের প্রতিলিপি দিয়েছিলেন আমি বইপত্র ঘেঁটে সেই প্রতিলিপিটি খুঁজে বের করে যজ্ঞকুণ্ডের সামনে বসে শিবস্তোত্র পাঠ শুরু করলাম।

স্তোত্র পাঠ শেষ হতেই যজ্ঞকুণ্ডের ছাই চাপা আগুন ধীরে ধীরে উদ্দীপিত হয়ে ধক্ করে জ্বলে উঠল। অপূর্ব সুগন্ধে ভরে উঠল চারিদিক। আমি যজ্ঞকুণ্ডে প্রণাম করে ফিরে এলাম। পুরোহিতজী এসে আমাদেরকে দুধ ও খোয়া দিয়ে গেলেন।

হরানন্দজীকে বললাম — আমাদের ঋষি সেবিত ভারতবর্ষে কোথায় কি আছে, আমরা তার কতটুকুই বা জানি? শাস্ত্রমুখে বর্ণিত তত্ত্ব ছাড়াও আরও কত তত্ত্ব ও রহস্য যে অব্যাহত ধারায় আমাদের দেশে গুহায়িত হয়ে রয়েছে, কতজনই বা তার খবর রাখে?

— গত ১৯৫১ সালে দ্বিতীয়বার অমরনাথ (কাশ্মীর) হতে ফিরবার পথে ভায়া পাঠানকোট হয়ে আমি জ্বালামুখী গিয়েছিলাম। সে এক নূতন অভিজ্ঞতা। ট্রেন কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখলাম, ট্রেনের পাঞ্জাবী এবং পুশ্‌তুভাষী পাগড়ীধারী দীর্ঘকায় নরপুঙ্গবের দল সহসা ঝটপট্ করে কামরার জানালা কপাট সব বন্ধ করে দিতে লাগলেন। কারণটা অনুধাবন করতে পারছি না অথচ 'মাথায় বড় বহরে ছোট' নিরীহ বাঙালী সন্তান হিসাবে তাঁদের ঐ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ করারও সাহসও পাচ্ছিলাম না। নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রহস্যটি আমার কাছে ধরা পড়ল। যতই ট্রেন এগিয়ে যেতে লাগল ততই বন্ধ জানালা কপাট ভেদ করে অজস্র ধূলা এসে সমস্ত কামরাটিকে ভরিয়ে দিল। আমরা যখন জ্বালামুখী রোডে গিয়ে নামলাম, তখন প্রত্যেকেরই ধূলিধুসরিত কিম্ভূতকিমাকার চেহারা। তখন বুঝতে পারলাম যে যদি জানালা খোলা থাকত, তাহলে কী দশাই না হত? যাইহোক, ঐরকম ধূলি-মলিন অবস্থাতেই জ্বালামুখী রোড হতে বাসে 'খাস' নামক স্থানটি অতিক্রম করে জ্বালামুখী মন্দিরের নিকট নেমে নিষ্কৃতি পেলাম ধূলার হাত থেকে।

এই জ্বালামুখীতে জয়শ্রী পাণ্ডার বাড়ীতে ছিলাম। জয়শ্রী পাণ্ডার আতিথেয়তা এবং মিষ্ট ব্যবহারের সম্বন্ধে বলে বোঝানো যাবে না। শুধু জয়শ্রী পাণ্ডা কেন, এখানকার সমস্ত পাণ্ডারই ব্যবহার খুব ভাল। পুরী ও গয়া প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর লোভী এবং দুর্বৃত্ত পাণ্ডাদের তুলনায় জ্বালামুখীর পাণ্ডাদেরকে দেবতা বলা যায়। জয়শ্রী পাণ্ডার কাছে একটি নূতন তথ্য জানলাম। কলিকাতার মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী নিত্যগোপাল অবধূত দীর্ঘকাল এই জ্বালামুখীতে সাধনা করেছিলেন। জয়শ্রী পাণ্ডার পিতা ছিলেন তাঁর শিষ্য। এইজন্য বাঙালী যাত্রী মাত্রকেই এই পাণ্ডা মশাই ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। জ্বালামুখী পাহাড়ের উপরে শ্রী নিত্যগোপালের সাধনপীঠ ছাড়াও মহাত্মা গোরক্ষনাথজীর প্রাচীন সাধনপীঠও পাণ্ডাজী আমাকে দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে গল্প শুনেছি যে, দেবী দুর্গা একবার গোরক্ষনাথজীকে দর্শন দিয়ে কিছু আহার করতে চান। রিক্ত সন্ন্যাসীর ঝুলিতে তখন কিছু ছিল না। গোরক্ষনাথজী দেবীর এই পরীক্ষা এবং ছলনা বুঝতে পেরে, ভিক্ষা সংগ্রহ করে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করিয়ে সোজা চলে যান হিমালয়ে। দেবী আর কি করেন, স্বয়ং সশরীরে তো আর তাঁর নিত্যস্থিতি সম্ভব নয়, কাজেই তিনি নাকি সেই থেকে সেখানে জ্যোতিরূপে বর্তমান আছেন।

ভারতের প্রত্যেক তীর্থস্থানের উৎপত্তির মূলে যেমন কোন না কোন একটি রোচক উপাখ্যান থাকে তেমনি জ্বালামুখী তীর্থকে কেন্দ্র করেও এই উপাখ্যানের সৃষ্টি। উপাখ্যানটি বিশ্বাস করি আর না করি, মন্দিরের অভ্যন্তরে চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সত্যই বিস্ময়কর। বিশেষতঃ একটি পাত্রে দুধ নিয়ে তা যখন দেবীরূপে বর্ণিত জ্বালামুখী পাহাড়ের গাত্রে নৈবেদ্যরূপে ধরা হয় এবং তার উপর যখন নতনশীল অগ্নিশিখাটি লাফিয়ে এসে জ্বলতে থাকে, তখন সে দৃশ্য সত্যই সুন্দর। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ এই অগ্নিশিখার মূলে হিলিয়াম গ্যাসের বিদ্যমানতা ইত্যাদি যা কিছুই অনুমান করুন না কেন, এই তীর্থকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ হিন্দু জনতার মনে যে শ্রদ্ধার বীজটি বর্তমান তাকে উপেক্ষা করার সাহস কারও নাই।

এই শ্রদ্ধাই হিন্দুদের প্রাণশিখা। শ্রদ্ধায়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবি — শ্রদ্ধাই যুগ যুগ ধরে হিন্দুজনতাকে দীপ্ত এবং তৃপ্ত করে আসছে। ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলিতে এই শ্রদ্ধারই জীবন্ত প্রকাশ দেখা যায়।

তীর্থগুলির নানা অভাবাত্মক (negative) দিক আংশিকভাবে সত্য হলেও তীর্থের কতকগুলি কল্যাণকর দিকও আছে, সেগুলিকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। অতীতের ভাবলোকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যমই হল তীর্থ। তীর্থে গেলেই অতীত নিকটস্থ হয়, সুদূর অতীত যুগ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে দুস্তর ব্যবধান তা সাময়িকভাবে মুছে যায়, অতীতের নানা সংস্কার বিশ্বাস এবং কিংবদন্তী এমনভাবে আমাদের মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলতে শুরু করে, মনে হয় যেন নিজের হৃৎস্পন্দনের তালে তালে অতীত যুগের হৃৎস্পন্দন, পুলক, অশ্রু এবং আবেগ নূতন করে অনুভব করছি। যে যুগ গত হয়ে গেছে অন্তরপথে কখন যে সেখানে পাদচারণা আরম্ভ হয়ে যায় তা বুঝা যায় না — এক অবর্ণনীয় সুখাবেশে মনটি আপ্লুত হয়ে পড়ে। এইভাবে শুধু বাইরের দৃশ্য পরিবর্তনই নয়, মানসিক স্থিতিরও যে একটা অভিনব বিন্যাস ঘটে— এমনটি তীর্থ ছাড়া আর কোথায় সম্ভব?

বুদ্ধিদোষে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ যদি কোন বস্তুকে অপব্যবহার করে তাহলে তাতে মূল বস্তুটির দোষ ঘটে কি? একথা সত্য যে তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সব মনোহর পুষ্পিত বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, অনেক লোকই তীর্থের ভাবাদর্শ গ্রহণের পরিবর্তে সেগুলিতেই অযথা গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন কিন্তু সেজন্য তীর্থকে কোন মতেই দায়ী করা চলে না, তীর্থের মহিমাও তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। এক একটি মহত্তম আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শকেই আমাদের দেশে শাস্ত্রকারগণ তীর্থ ও তীর্থদেবতা রূপে চিত্রিত করেছেন এবং তীর্থের মহিমাজ্ঞাপনচ্ছলে এমন সুকৌশলে শ্রদ্ধার বীজটি উপ্ত করে দিয়েছেন যে 'বনত বনত বনি যাই' — এই নিয়মানুসারে মানুষ তীর্থে যেতে যেতেই এক সময় শ্রেয়ের প্রতি টান অনুভব করতে থাকে। আর এইভাবে শ্রেয়ের প্রতি টান অর্থাৎ শ্রদ্ধা একবার হৃদয়ে সঞ্চারিত হলে মানুষের আর অলভ্য কিছু থাকে না। কারণ, শ্রদ্ধা দ্বারা পরম পুরুষার্থ পর্যন্ত লাভ হয়। এটিকে আমি তীর্থযাত্রার একটি বড় অবদান বলে মনে করি।

কাজেই কোথায় কোন্ অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি পাপ-স্খালনের আকাঙ্খায় তীর্থকে অপব্যবহার করল সেটাই বড় কথা নয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু জনতা শ্রদ্ধাসহকারে যে তীর্থ পরিক্রমা করে সেই শ্রদ্ধাই তীর্থ যাত্রার প্রাণ। তাই শ্রদ্ধাকে প্রচোদিত করবার জন্য শাস্ত্রে শ্রদ্ধার বহুতর প্রশংসা আছে দেখতে পাই। ঋষিরা বলেছেন —'যথাদেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে'। দেবতারা অসুরদের মধ্যেও শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোটিপতি কালোবাজারী পাষণ্ড পামরও তীর্থে গিয়ে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়, এইখানেই তীর্থের মাহাত্ম্য।

প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।

— হে শ্রদ্ধা, যে দান করে তাকে তুমি শ্রদ্ধা দাও। যে দিতে চায় তাকে প্রিয় কর। শ্রদ্ধাপীঠ তীর্থগুলি যে পাপাত্মা পুণ্যাত্মা নির্বিশেষে সকলের চিত্তকে সাময়িকভাবে হলেও সেই প্রিয় পরমের রসে নিষিক্ত করে, এইটাই পরম লাভ।

যারা কেবলই কৌতূহল বশে, বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নূতন স্থান দেখার আগ্রহে কিংবা প্রাচীন শিল্পকলা ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য দেখবার জন্যে তীর্থে যায় তাকে প্রকৃতপক্ষে তীর্থযাত্রা বলে না। পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে — যে জানা, চেনা এবং দেখার মধ্যে চিত্তের সম্প্রসাদ থাকে তাকেই বলে শ্রদ্ধা। অন্তরে শ্রদ্ধার ভাবটি থাকলে শ্রদ্ধেয় বস্তুর গুণদর্শন এবং তার প্রতি আসক্তি উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। তীর্থে গিয়ে তীর্থদেবতার তত্ত্ব বহু সাধু পুরুষই মনন করে থাকেন। শৈব শৈব তীর্থে, বৈষ্ণব বৈষ্ণব তীর্থে, শাক্ত শাক্ত তীর্থে গিয়ে তাঁদের অন্তরস্থ শ্রদ্ধাকে প্রদীপ্ত করে নেন।

তীর্থ ভ্রমণ করতে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা কেবল সত্তায় পাপ হতে মুক্ত হওয়ার জন্যই লোকে করে একথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। আমার মতে মানুষের মধ্যে নিহিত যে সহজাত শ্রদ্ধা এবং ধর্মবোধ, তাই তাকে সমস্ত কষ্ট সহ্য করার প্রেরণা দেয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনের সমাধিপাদের ২০ নম্বর সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে বলা হয়েছে ঃ

শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ। সা হি জননীব কল্যাণী যোগীনং পাতি।

— অর্থাৎ শ্রদ্ধা হল চিত্তের সম্প্রসাদ। তা তীর্থযাত্রীকে বিশেষতঃ যোগীকে কল্যাণী জননীর ন্যায় প্রতিপালন করেন।

তীর্থেই যোগী এবং সাধুদের দর্শন মিলে আর যোগী এবং মহাত্মারাই হলেন ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁরা নিজেরাও যেমন তীর্থের অনুকূল পরিবেশে চিত্তের সম্প্রসাদ লাভ করেন, তেমনি তীর্থে গিয়ে সাধারণ লোকও তাদের দুর্লভ সঙ্গ লাভ করে কৃতকৃত্য হয়ে থাকেন। এটি তীর্থ যাত্রার একটি বড় সুফল। তীর্থই সাধারণকে অসাধারণের পুণ্য সঙ্গলাভের সুযোগ করে দেয়। আমি দেখেছি, মানুষের শ্রদ্ধা তীর্থকে কেন্দ্র করেই সহসা বিকশিত হয়ে উঠে। গ্রাম বা শহরের গৃহগত পরিবেশে যে বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই আগ্রহ দেখা যায় না, সেই লোকই যখন তিরুপতি জ্বালামুখী বা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে দেবতার সম্মুখে দরবিগলিত অশ্রু হয়ে সাষ্টাঙ্গ দেয় তখন বুঝা যায় তীর্থ নির্বিষয় রসেরও উদ্বোধক।

পরিক্রমায় বের হয়ে আমার বারংবার মনে হয়েছে যে তীর্থগুলি ভারতের সম্পদস্বরূপ। পথের অসাধারণ কষ্ট এবং সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে কেবল ধর্মের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের লোকেরা যেমন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন এমনটি কোন দেশে আছে বলে মনে হয় না। মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের জোয়ার যখন এসেছিল, তখন বহুস্থানে বহু মন্দির মঠ ও গীর্জাদি স্থাপিত হয়েছিল সত্য, এবং সেগুলি আজও ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করে বটে কিন্তু তার মূলে ধর্ম লাভের জন্য চিত্তের আকুলতা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ভ্রমণকারীরা ঐ সব গীর্জাদির অপরূপ শিল্পকলা এবং সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্যই ভীড় করে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে অবশ্য ধর্ম সাধনার অঙ্গরূপে তীর্থভ্রমণ (হজ প্রভৃতি) এখনও প্রচলিত আছে। বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান প্রতি বৎসরই মক্কা মদিনা প্রভৃতি দর্শনকে জীবনের চরিতার্থতা বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আরব দেশের এই তীর্থগুলিতে যে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ সংস্কার এবং বিশ্বাস বর্তমান, তা তাঁদের জীবন ধারাতেও প্রচলিত বলে ঐ সমস্ত পবিত্র তীর্থ দর্শন তাঁদের জীবনগত বিশ্বাস এবং আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রগতিশীল মনোবৃত্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং নানা বিজাতীয় ভাবধারার প্রচণ্ড আলোড়ন সত্ত্বেও যেভাবে এখানে প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাস এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে, তা কিভাবে সম্ভব হল তা গভীরভাবে চিন্তা করলে ভারতীয় হিন্দুর অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়বে।

ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে মন্দির আছে তার চারপাশে আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে। কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরে তীর্থ দেবতাকে কেন্দ্র করে যেভাবে পূজার্চনা এবং আচার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয় তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে সেই আবেষ্টনীর মধ্যে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস এবং পবিত্র ভাবাদর্শটি এখনও অক্ষুণ্ণ। পাশাপাশি আধুনিক যুগ এবং মধ্যযুগ — পরস্পর বিরোধী এই দুইটি যুগের প্রবল অবস্থিতি বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। অন্ধকারের মধ্যেও একটি স্তিমিত স্নিগ্ধ আলোকরেখা বলে মনে হয়।

অবশ্য তীর্থগুলির অভাবাত্মক দিকও যে নাই এমন নয়। তীর্থভ্রমণের মূলে মানুষের পাপস্খালনের প্রবৃত্তিটাই বড় বেশী বলে মনে হয়। তীর্থে গিয়ে সাধারণ লোকে মনে করে যে সে কলুষমুক্ত হল। তীর্থের ভাবাদর্শকে বরণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর প্রাত্যহিক জীবনেও তা প্রতিফলিত করি এমন সংকল্প তার মনে কদাচিৎ উদিত হয়! বরঞ্চ অনেক স্থানে দেখা যায় লোকে তীর্থভ্রমণকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের সহজ পন্থা বলে মনে করে। হজমী ঔষধ হাতের কাছে থাকলে একজন লোভী ব্যক্তি যেমন এই ভরসায় অতিভোজন করে যে, একমাত্রা হজমী ঔষধ খেলেই সব হজম হয়ে যাবে, তেমনি তীর্থ করে আসলেই পাপমোচন হয়ে যাবে এই ধরণের মনোবৃত্তিই মানুষকে অনেক সময় নূতন পাপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে। এটা কতকটা শিশু খাদ্যে ভেজালকারী অসাধু কোটিপতি ব্যবসায়ীর রাম নাম করতে করতে নিত্য গঙ্গাস্নান করবার মত। এর ফল এই

হয় যে, গঙ্গাস্নান কালে ঐ ধনী ব্যক্তিটির মনে সাময়িকভাবে যে ভাবপ্রবণতাটি দেখা যায়, তা গদীতে বসা মাত্রই মন হতে কর্পূরের মত উবে যায়। রাম নাম করলে বা কোন তীর্থে গিয়ে মন্দির বা ধর্মশালাদি করে দিলেই অর্জিত পাপ লঘু হবে, এই ধারণা তাকে পাপ কর্মের অনুষ্ঠানে অধিকতর প্ররোচিত করে।

জ্বালামুখীতেই দেখেছিলাম, একজন সাধক উদয়াস্ত প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে একাসনে বসে ধ্যান জপ করছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জ্বালামুখীর মত মহাপীঠস্থানে দশ লক্ষ নাম জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধি অনিবার্য। তিনি দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করে প্রফুল্ল মনে সেখান থেকে চলে যান। কয়েক বৎসর পরে তাঁকে তারাপীঠে অন্য এক অবস্থায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। জ্বালামুখীতে তাঁর মধ্যে যে তপস্যার নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা দেখেছিলাম, তাঁর তারাপীঠের জীবন যাত্রার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সঙ্গতি ছিল না। দুই-তিনটি ভৈরবীসহ নানাবিধ পাপাচরণ এবং শিষ্য বঞ্চনাতে তিনি মত্ত ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেছিলেন, 'পুনরায় জ্বালামুখীতে গিয়া দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করলেই আমি আমার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারব।' তীর্থ এইভাবে মানুষকে পাপাচরণে প্ররোচিত করে। এছাড়া তীর্থবাসী পাণ্ডা এবং পুরোহিতদের মনে যে তীর্থ একটা মায়াময় অন্ধ প্রভাব সৃষ্টি করে তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে কতকটা অন্ধ সংস্কার এবং কতকটা ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রেরণায় তীর্থ দেবতাকে জীবনে ধ্যান জ্ঞান করে বসেন। তাঁদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনেও এর ফল হয় মারাত্মক। কুসংস্কার এমনভাবে তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে যে প্রাণসংশয়কারী কঠিন পীড়াতে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে শান্তি স্বস্ত্যয়ন এবং দেবতার চরণামৃত পানকেই তাঁরা অধিকতর মূল্য দিয়ে বসেন। কাশীতে দেখেছি, একজন পাণ্ডা কঠিন নিমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন না। তাঁর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বান্ পুত্রগণও অগাধ বিশ্বাসে গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান এবং রোগীকে চরণামৃত পান করাতে লাগলেন। এর ফল হল এই যে পাণ্ডা মহাশয়ের মৃত্যু হল।

তীর্থকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে যে অন্ধ সংস্কার এবং বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠে, তাকেই আমি এখানে তীর্থের অভাবাত্মক (negative) দিক বলছি।

ভোর পাঁচটায় প্রায় সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল। গাঁঠরী বেঁধে সব গুছিয়ে নিলাম। স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিলাম। সকাল সাতটায় আমরা পুনরায় শাণ্ডিলেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। এখানটাতে গাছপালা কম, বন নাই বললেও চলে কিন্তু দূরে দূরে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। নর্মদা কিনারা ধরে প্রায় মিনিট কুড়ি হেঁটে আমরা অঞ্জনী সংগমে এসে পৌঁছে গেলাম। এই নদী সাতপুরার একটি ছোট পাহাড়কে ফাটিয়ে প্রচণ্ড বেগে এসে পড়েছে নর্মদাতে। একটি প্রস্তরের উপর ঝম্‌ঝম্ শব্দে গর্জন করতে করতে পড়ছে অঞ্জনীর জলধারা। অজস্র সাদা ফেনা উপর দিকে ছিটকে পড়ছে। আমাদেরকে প্রায় ভিজিয়ে দিল। সংগম হতে একটু দূরে দূরে অনেক বড় বড় গাছ আছে। তটের ধারে জারুল গাছই বেশী, সেইসব গাছের মাথায় জলকণা ঠিকরে পড়ে তলায় টস্ টস্ করে জল পড়ছে। ঠিকরে পড়া জলকণার আওতা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে সংগমের শোভা দেখতে লাগলাম। চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা বাম দিকে বাঁক নিয়ে চড়াই-এর পথে উঠতে লাগলাম, এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর মানুষের চলার দাগ লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম, গাছপালার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, ঘন বন ক্রমশই উঠে গেছে পর্বতের উপর দিকে। বেশ কতকটা উপরে উঠে এসে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম জারুল গাছগুলির ভিজা গায়ে সূর্যকিরণ পড়ায় চিক্‌চিক্ করছে। বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম, বন ছাড়িয়ে উঁচু নীচু মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে আবার ছোটখাটো বন, আবার মাঠ, মাঝে মাঝে পাথর ছড়ানো গ্রাম। আরও প্রায় এক ঘন্টা হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম খেড়িয়া গ্রামে। গ্রামের মধ্যে দূরে দূরে কিছু কিছু বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছে। এখানে এসে হোসেঙ্গাবাদ জেলা শেষ হল। শুরু হল জব্বলপুর জেলা।

আমরা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। বনের মধ্য দিয়ে উৎরাই-এর পথে ক্রমশঃই নামছি। বড় বড় গাছের ধার দিয়ে অনেক ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম করে অবশেষে আমরা একটি ছোট নদীর ধারে এসে পৌঁছালাম। মহানন্দস্বামী জানালেন — এই নদীর নাম দুধী। এই দুধী নামক পাহাড়ী নদী এখানে এসে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাই এই স্থানের নাম দুধী-সংগম।

হরানন্দজী আমাদের দিকে চোখ টিপে মহানন্দস্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন — কিহে, তুমি আগে এই স্থানে এসেছ না কি? না হলে তুমি কি করে এই নদীর নাম জানলে? পথে তো কারো সঙ্গে তোমার দেখাও হয় নি যে তার কাছ থেকে শুনে তুমি বলছ!

মহানন্দস্বামী — আপনি তো পথ চলার আনন্দে হেঁটে চলেছেন। অন্য কোন দিকেই তো আপনার লক্ষ্য নেই। আমাদের কোন কাজে পান থেকে চুন খসলেই আপনি রেগে অগ্নিশর্মা হন আর আমাদের বকাবকি করেন। হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলতে লাগলেন — বলুন ভাই! আসার পথে গাছের গায়ে টিনের প্লেটে দুধী সংগম লেখা সাইনবোর্ড হরানন্দজী যে দেখতে পাননি তার জন্য দোষ কার? উনি তো আমাদের দলপতি। ওনারই প্রথমে দেখা উচিত ছিল।

হরানন্দজী ও মহানন্দস্বামীর তরজায় আমরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠলাম। হরানন্দজী — বেশ, আমার ভুল হয়েছে স্বীকার করছি। এইস্থানের কোন মাহাত্ম্য বা গল্পকথা তোমার জানা থাকলে তা আমাদের শোনাও। তাতে আমাদের পথের কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।

মহানন্দস্বামী — তথাস্তু! আমরা যে অঞ্জনী-সংগম পেরিয়ে এলাম, সেই অঞ্জনী হচ্ছেন হনুমানজীর মায়ের নাম। তিনি নর্মদা তটে তপস্যা করে হনুমানজীকে পুত্ররূপে পান। তাঁর স্তন্য নিঃসৃত দুধ থেকেই এই দুধী নদীর উৎপত্তি। সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় যাবার প্রাক্কালে হনুমানজী তাঁর মায়ের আশীর্বাদ নিতে এই স্থানে আসেন। মা অঞ্জনী তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন — 'তুই সঙ্গে কোরে আমার দুধ নিয়ে যা। এই মাতৃদুগ্ধের প্রভাবে তুই বিজয়ী হবি।' এই বলে তিনি তাঁর দুগ্ধ নিঃসৃত করে হনুমানজীকে দেন। এরপর মাতৃদুগ্ধ পান করে সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় গিয়ে হনুমানজী রাবণের হাতে বন্দী হন। রাবণ বন্দী হনুমানের লেজে আগুন ধরালে হনুমান সেই আগুনে সোনার লঙ্কা ছারখার করে রামের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ পান করে যাত্রা করায় আগুন তাঁর শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। জানবেন মায়ের স্তন্যদুগ্ধ অমৃতের তুল্য।

দুর্লভ অমৃত লাভের জন্য দেবতারা সমুদ্র মন্থন করেছিলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্যের জন্য কোন কষ্ট করতে হয় না, মাতৃমহিমা অপার ও অনন্ত। এক টুকরো মিছরির যেমন ভিতর বাহির সব দিকেই মিষ্টতা, তেমনি মায়ের অর্ন্তসত্তা বহির্সত্তা সব দিকেই শুধু নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তাই মা-ই সর্বপ্রেমস্বরূপিনী।

যা পাবে মায়ের কাছে, তত স্নেহ কোথা আছে?<br>
আর কারও প্রেমে তুমি ভুলিও না ভাই,<br>
সে সব প্রেমের সরা, সতর্কে ওজন করা<br>
মার প্রেমে দরদাম কষাকষি নাই।

মহানন্দস্বামীর কথা শেষ হতেই বললাম — এই দুধী সংগমের কোন বৈশিষ্ট্য আপনাদের চোখে পড়ছে? সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন — কি বৈশিষ্ট্য?

আমি — দেখুন ওঁকারেশ্বরে আপনারা দেখেছেন দক্ষিণ থেকে কাবেরী নদী এসে নর্মদার সঙ্গে মিলেছেন, আর ওঁকারদ্বীপের পর্বতটি ছুঁয়ে কাবেরী কিছুটা পুর্বদিকে দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করে দ্বীপের উত্তর তীর ধরে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়েছেন। সেই প্রবাহ আবার দ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে উত্তর থেকে নর্মদায় গিয়ে মিশেছে। ওঁকারদ্বীপকে মাঝখানে রেখে কাবেরী নর্মদার যুগলধারা সুন্দরভাবে ওঁকার-চক্র সৃষ্টি করেছে। তেমনি এখানেও নর্মদা সোজাসুজি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছেন। আর অঞ্জনী নদী পাহাড় ফাটিয়ে আর একটি পাহাড়কে কুণ্ডলী আকারে বেষ্টন করে ঠিক ঞ-র রূপ ধারণ করে নর্মদায় মিশেছে।

ঞ-র আকার দেখ বিচিত্র লেখন<br>
পৃষ্ঠে কুণ্ডলিত কিছু, সম্মুখে চরণ।<br>
পা-দুটি ছড়ায়ে মাতা বসেছেন সুখে,<br>
পৃষ্ঠে বাছা কচি হাতে মাকে ধরে বুকে।<br>
ঞ-র অর্থে ক্রুর প্রাণী যদি মাতাপিতা ভুলে<br>
না ভুলিলে শুক্রাচার্য, সঞ্জীবনী মিলে।<br>
যতই করুক যোগী সুতীব্র সাধনা —<br>
মাতা পিতা না ভজিলে, ভ্রষ্টযোগী, ঞ-র ব্যঞ্জনা।।

আমরা আর দাঁড়ালাম না, পথের দাগ ধরে পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলাম মা নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে। সূর্যাস্ত হতে বেশী দেরী নাই। যতই এগুচ্ছি, ততই যে বন গভীর হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। পথ প্রস্তরাকীর্ণ হলেও প্রকৃতির শোভা অপরূপ। কখনও উঁচুতে উঠছি, কখনও নিচুতে নামছি — এইভাবে প্রায় ঘন্টা দেড়েক হেঁটে আমরা শ্যামশোভামণ্ডিত একটি ছোট পাহাড়ের কোলে এক প্রাচীন মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। মন্দিরের গায়ে একটি সাদা পাথরের বাড়ী। তার মাথায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে একটি হরিদ্রা বর্ণের সিল্কের পতাকা। মধ্যস্থলে শঙ্খ অঙ্কিত রয়েছে। নীচে লেখা — 'সাচ্চী বাবা', সত্যমেব জয়তে।

আমরা মন্দিরের দরজা খুলতেই মন্দিরের অভ্যন্তর ঘন্টা ধ্বনিতে নিনাদিত হয়ে উঠল। দেখলাম, দরজার সঙ্গে একটি দড়ি মহাদেবের মাথায় রাখা ঘন্টার সঙ্গে এমনভাবে সংযোজিত রয়েছে যে দরজা খুললেই ঘন্টা ধ্বনি হবে। একটা বড় পাথরের চাঙড় ভেদ করে প্রায় এক ফুট দীর্ঘ এক লিঙ্গ উত্থিত আছেন। গোটা শিবলিঙ্গ চন্দনে বিভূষিত, তাঁর শীর্ষদেশে একটি বিল্বপত্র, সেখান থেকে এক অপূর্ব সুরভি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে গন্ধটা নিলাম। আমরা মহাদেবকে প্রণাম করার জন্য নীচু হতেই আমাদের পিছন থেকে ভেসে এল —

নিরঞ্জন নিরাকার নির্বিকল্প নিরাময়
অগম্য অগোচর অলক্ষ্য গোরক্ষ সিদ্ধ বন্দিত।।
সিদ্ধানাঞ্চ মহাসিদ্ধ ঋষিনাঞ্চ ঋষিশ্বর
যোগীনাঞ্চৈব যোগীন্দ্র শ্রীগোরক্ষ নমস্তুতে।
অমনস্ক যোগধাতা যোগকীর্ত্তি বিবর্দ্ধন
যোগীভিঃ মনসাগম্য শ্রীগোরক্ষ নমস্তুতে।
শ্রীগুরুং পরমানন্দং বন্দে সানন্দ বিগ্রহম্‌
যস্য সান্নিধ্য মাত্রেন চিদানন্দায়তে তনুম্‌।।
বিশ্বতেজঃ বিশ্বরূপ বিশ্ববন্দ্য সদাশিব
বিশ্বনামা বিশ্বনাথ শ্রীগোরক্ষ নমস্তুতে।
অনন্ত লোকনাথশ্চ নাথ নাথ শিরোমণি।।

সহসা এক অপরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেও আমরা ঐ মন্ত্র পাঠ করতে করতে মহাদেবকে প্রণাম করলাম। পিছন ফিরে দেখলাম এক শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দু'হাত আমাদের দিকে বাড়িয়ে বলছেন — 'পরিক্রমাবাসী বা! সুস্বাগতম্‌, সুস্বাগতম্‌! আমাদের সঙ্গে 'নমো নারায়ণায়' র পর সাধুজী আমাদের নিয়ে এসে তুললেন সেই পূর্বদৃষ্ট পাথরের বাড়ীটির একতলার একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে। বললেন — আপলোগকো দেখকর ম্যায় সমঝ গিয়া আপলোগ্‌ অভুক্ত হ্যায়। আভী সাম হোনেসে দের হ্যায়। হামারা পাশ কুছ খা লিজিয়ে। তাঁর ঈঙ্গিতে তিনজন সন্ন্যাসী-শিষ্য আমাদের জন্য নিয়ে এলেন — গরম গরম ভাত, কিছুটা সিদ্ধ শাক, আমলকী ও এক ঘটি করে দুধ। অভুক্তের খাদ্য বিচারের সময় কোথায়? কাজেই কোন উচ্চবাচ্য না করে আমরা পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন সম্পন্ন করলাম। এতদিনের পরিক্রমাপথে আমি প্রথম ভাত খেলাম!

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সাধুজী আমাদের কাছে এসে বসলেন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন — এই স্থান মহাযোগেশ্বর শৈবাবধূত শ্রীগোরক্ষনাথজীর তপস্যাক্ষেত্র। গোরক্ষনাথজী নিজেও শৈবদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগচর্চার ক্ষেত্রে যেমন পতঞ্জলি সেরূপ হঠযোগ ও শৈব-সাধনার ক্ষেত্রে হলেন গোরক্ষনাথজী। আচার্য শঙ্করের পর সারা ভারতবর্ষে এতবড় সিদ্ধ পুরুষ বা আত্মজ্ঞানী জন্মান নি। তাঁর যোগ প্রভাবে নেপাল থেকে সিংহল এবং কামরূপ থেকে পাঞ্জাব ছিল প্রভাবিত। তাঁর শাস্ত্রবানীই আমাদের জ্ঞানদেহ তথা আন্তর সত্তার একাধারে ধাত্রী ও জনয়িত্রী। কলিযুগে স্বয়ং শিবই গোরক্ষনাথজী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত সাধনায় প্রবেশ করলে, তাঁর স্পর্শ পেলে যে কোন সাধকের দেহ চিন্ময় হয়ে যায়। এই যোগেশ্বর সদা সহজ ও পুণ্যের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। গগনমণ্ডলে এঁর নিয়ত বাস। আকাশে উঠেও ইনি আকাশ ছাড়েন না, সর্বদাই পান করেন মধুমহারস অমৃত। এই যোগী ব্রহ্মাগ্নিতে নিজ কায়া আহুতি দেন আর জেগে থাকেন ত্রিকূটী-সংগমে। 'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ' — শিব যেমন সকল সাধকের গুরু তেমনি গোরক্ষনাথ হলেন সকল গুরুর গুরু।

আমরা বিশ্বাস করি গুরু গোরক্ষনাথ তাঁর কৃপাঘন দিব্যসত্তা নিয়ে সদা জাগ্রত। সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ,

সর্বত্র তাঁর কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত। শৈব সাধকদের কাছে গুরু গোরক্ষনাথ হলেন — স্বেচ্ছাচারী স্বয়ংকর্তা লীলয়াচজরামরঃ অবোধ দেবদৈত্যানাং ক্রীড়তি ভৈরবো যথা।

আমার দিকে তাকিয়ে মহাত্মা বললেন — আপনি কোটেশ্বর তীর্থে মহাত্মা কৃপানাথের দর্শন ও স্পর্শন পেয়েছেন। ঐখানে সাধন কালে শৈবাগম-সাধনায় যে দিব্যানুভূতি আপনি লাভ করেছেন তা, 'আপকা বুলিমে মুঝে শুনায়েগা। হম সমঝ জায়গা'। তাঁর কথা শুনে আমি ঘাবড়িয়ে পেলাম। তিনি হেসে বললেন — আপনার কোন ভয় নাই। আমি মহাত্মা কৃপানাথের কাছ হতে আগে থেকে আজ্ঞা নিয়ে রেখেছি। সহসা মন্দিরের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের চমকে আমার সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। মহাত্মা কৃপানাথ যেভাবে মতিশঙ্খ বাজিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাতেন ঠিক সেইভাবে দূরাগত শঙ্খধ্বনি আমার কানে এসে বাজল।

আমি নতজানু হয়ে যুক্তকরে শুরু করলাম — শৈব সাধনার গুহ্যসাধন তত্ত্ব শিবপুত্রী নর্মদার করুণা ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। বৈদিক ধারার মতই শৈবাগম ধারাও সুপ্রাচীন এবং এই জ্ঞানও দিব্য ও অপৌরুষেয়। মহামুনি দুর্বাসাই আগম শাস্ত্রের প্রকাশক। মহিম্নস্তোত্র নামক পুঁথির টীকাতে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে — 'সকলাগামাচার্যচক্রবর্ত্তী সাক্ষাৎ শিব এব অনুসূয়া গর্ভ সম্ভূতঃ ক্রোধভট্টারকাখ্যো দুর্বাসা মহামুনিঃ'। আচার্য নন্দিকেশ্বর, উৎপলদেব, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি মহাত্মারাও এই মতেরই ধারক ও বাহক। প্রত্যাভিজ্ঞহৃদয়, বসুগুপ্তকৃত শিবসূত্রবিমর্শিনী, মহাস্বচ্ছন্দতন্ত্র, মৃগেন্দ্রাগম, রৌদ্রাগম, কিরণাগম, মতঙ্গাগম পরমার্থসার, তন্ত্রালোক, ঈশ্বরপ্রত্যাভিজ্ঞাবিবৃত্তিবিমর্শিনী, উৎপলদেবাচার্যকৃত ভাস্করী ও ঈশ্বরপ্রত্যভিক্ষাসূত্র, মৃগেন্দ্রতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শৈবাগমের আকরগ্রন্থ। প্রাচীন শাস্ত্রে এই তন্ত্রেরই সাধনতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চ প্রশংসা দেখা যায়।

অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, ধ্যানে বসে পরমতত্ত্বকে জানার কালে অর্থাৎ ঈশ্বরানুভূতি জাগ্রত হলে বিবিধ প্রকার দর্শন ও শ্রবণ হয়। শোনা যায়, সাধক নানারকম ধ্বনি শুনতে পান বা বিবিধ জ্যোতি দর্শন করেন। সেই সাধনালব্ধ রাজ্যে তাঁরা দেখেন বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মী-জনার্দন সোনার সিংহাসনে আসীন, কেউবা সাকেত-ভূমিতে দেখেন রামসীতাকে, কেউবা সেখানে দেখেছেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্তি বা বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ। এসব ছাড়াও সাধক শোনেন নুপূরের নিক্কণ, বীণা-ধ্বনি, মেঘ ডম্বরু বা সিংহনাদ ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার সেইসব স্তরে প্রথমে রক্তবর্ণ, তারপর হরিদ্রাভ বর্ণ, তারপর নীলাভ বর্ণ ও সবশেষে দেখেন শ্বেতশুভ্র বর্ণ। তথাকথিত সাধক নীলাভ বর্ণের ভিতরেই দেখতে পান বংশীবাদনরত শ্যামকে। এঁদের সকলেরই বিশ্বাস যে, সাধনার উচ্চস্তরে উঠলেই এইসব লোকোত্তর দর্শন বা জ্যোতিদর্শন বা ধ্বনি শ্রবণ-গোচর হয়।

মনে রাখবেন যে, এইসব দর্শন বা শ্রবণ ভূয়ো। Sub-Concious Region এ যে সমস্ত Idea imprinted হয়ে আছে, বদ্ধ সংস্কারমূলক ধারণা বা hypersensitive action of the brain এর ফলেই এইসব ঘটে থাকে। এইসব দর্শন বা শ্রবণে কোন সাচ্চামুক্তি লাভ হয় না। যখন বহিঃশৈচতন্যের সুষুপ্তি হবে তখন ঘটবে অন্তঃশৈচতন্যের লীলা-বিকাশ। যে ভাব ও সংস্কার, রূপ ও প্রতিচ্ছবির স্মরণ চিন্তনে মন রত থাকবে, তদাকার বৃত্তি নিয়ে সেইরূপ দর্শন ও শ্রবণ হয়। তা সত্যকারের কোন ঈশ্বরদর্শনও নয়, কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতিও নয়।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো থ উ সম্ভূত্যাঁ রতা।। (যজুর্বেদ, অধ্যায় ৪, মন্ত্র ৯)

অর্থাৎ যারা ব্রহ্মের স্থানে অসম্ভূতি অর্থাৎ অনুৎপন্ন, অনাদি প্রকৃতিরূপ কারণের উপাসনা করে, তারা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। যারা ব্রহ্মের স্থানে সম্ভূতিকে অর্থাৎ কারণ হতে উৎপন্ন কার্যরূপ পাঞ্চভৌতিক কোন কিছু — পাষাণ বৃক্ষাদির অবয়ব ও মানুষের শরীরের উপাসনা করে, তারা উক্ত অন্ধকার হতে আরও অধিকতর অন্ধকারে নিপতিত হয়।

এই জ্যোতি বা শব্দ তাদের আকর্ষণী শক্তিতে সাধককে হিতানাড়ীর পথ হতে বহুদূরে বিভিন্ন অক্ষাংশে নিয়ে যাবে। সাধক এমন স্তরে পৌঁছে যায় যা সপ্ত বিষুবৎ-এর বাইরের অক্ষাংশে অবস্থিত। এই অক্ষাংশগুলি অন্ধকার অঞ্চল। এদেরকে বলে ধুন্ধুকারদেশ। সেখানে শুধু

নাই দিবা, নাই রাত্রি, নাই রবিশশী
তিমির ভঞ্জন রূপ, নাদ অবিনাশী।।

এই ভূমগুলের তুলনায় সেখানকার আনন্দ অনেক বেশী হলেও কিন্তু সাচ্চামুক্তি হবে না। সেখানে বহুযুগ

ত্রিশঙ্কুর মত আটকে থাকতে হবে। এ জ্যোতি বা ধ্বনি শ্রবণ চরম বা পরম হলেও সেইসব অক্ষাংশ থেকে মূলবিন্দু পরম উৎসে পরাৎপর ব্রহ্মাসত্তায় কখনও যাওয়া যাবে না। সেই সব স্তর থেকে জীবাত্মাকে কল্পান্তে আবার এই পৃথিবীতে নেমে আসতে হবে, নূতন করে মানব জন্ম গ্রহণ করতে হবে। কারণ একমাত্র মানুষের শিরোদেশে যে বিন্দু স্থান আছে সেখানে পরমাত্মাই জীবাত্মা রূপে অবস্থিত এবং যার সঙ্গে মহাবিন্দু থেকে আগত বিমলবোধের নিত্য যোগ আছে। যদি মনুষ্যদেহে বিন্দুস্থিত আত্মায় যে মহাশব্দের ঝঙ্কার প্রতিনিয়ত ঝংকৃত হচ্ছে, যা উদ্‌গীথ এবং একমাত্র মহাবিন্দুর সঙ্গে যুক্ত তা ধরতে পারলেই সাধকের সাচ্চামুক্তি সম্ভব। বিন্দুর বিস্ফোরণ হলে তবেই বিদৃতিদ্বার দিয়ে এই বিমলবোধের ধারা ধরেই আত্মা পুনরায় মহাবৈন্দব স্থিতিতে ফিরে যেতে পারবে। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করে এই বিন্দুতে ধ্যান করলে বিন্দুটি বিস্ফারিত হয়, তারমধ্যে গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়। তাই আত্মাকে উর্ধের পানে টেনে নিয়ে যায়। সাচ্চা মুক্তির পথেই চাই বিমলবোধের উদয়। যা অম্লান, মলত্ব বিহীন, অনাবিল আনন্দরসে পরিপূর্ণ। যে সব সাধকের এই বিমলবোধের উদয় হয় তাঁদের এইসব বিবিধ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ হয় না। ইন্দ্রিয়াতীতকে লাভের জন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির দরকার হয় না।

পরমাত্মাই মানুষের জীবদেহে আত্মারূপে বিরাজমান। পূর্ণই পূর্ণ রূপে আছেন।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব তিষ্ঠতে ।।

সকল প্রাণী, স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষলতা সকলের মধ্যেই পরমাত্মা আছেন কিন্তু তাঁর পূর্ণ প্রকাশ মানুষেরই মধ্যে কারণ মানুষের আত্মা যে বিন্দুস্থানে আছে — একমাত্র সেখানেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ তিনটিরই সমাবেশ হয়েছে। বৃক্ষলতা বা পশু-পক্ষীর মধ্যে প্রাণ আছে কিন্তু চিতিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান বা বুদ্ধি নেই।

এই সাধনায় সিদ্ধ হলে তবে সাধকের লাভ হয় এক অপার্থিব অনুভূতি।

ইচ্ছামাত্র জাগে শিহরণ, জাগে গতি বিপুল স্পন্দন,
আরম্ভিল বিঘূর্ণন প্রচণ্ড নর্তন শব্দরূপে মহৎ কম্পন।
আলোড়ন, বিচ্ছুরণ মহাব্যোমে সৃষ্টি হল বিরাট গুঞ্জন,
সে বিশাল ধ্বনি স্তরে স্তরে নেমে এল তুলি প্রতিধ্বনি।
অখণ্ডমণ্ডল গুরু রসের নির্যাস, খণ্ডে খণ্ডে স্তরে স্তরে হইল প্রকাশ
অসীম চৈতন্যধারা শব্দের স্পন্দনে অগণিত গ্রহ তারা করিল গঠন, সুরু হল মহা বিস্ফোরণ।
মহা আবর্তন, প্রচণ্ড মন্থন, আকর্ষণে বিকর্ষণে ক্ষুব্ধ সমীরণ।
মহৎ তত্ত্ব প্রকৃতিতে উথালি পাথালি ভাবে মহারঙ্গে করিছে রমণ
নহে মহারণ, এ মহা রমন। সেই মহামনের ধ্বনি
জীব! তুমি তারই প্রতিভাস তারই প্রতিধ্বনি।।
শব্দের বিভ্রমে সৃষ্টি হল বুদ্ধিতত্ত্ব, বিক্ষোভেতে সৃষ্টি হল মন,
সৃষ্টি হল কালশক্তি বোধির বোপন।
জন্ম নিল মহারবে মহাবিস্মরণ — এই সেই লঙ্কার রাবণ।
সহস্রারে থমকিল সারশব্দ, গমকে গমকে কালধারা।
তন্মাত্রা রচি ফেলি রচে মহাভূত, কী অদ্ভুত, কী অদ্ভুত !
সুরু হল মর্কট নর্তন উৎক্ষেপ বিক্ষেপ সৃষ্টি, সুরু হল জীবের মরণ।
সৃষ্টি হল জলদমণ্ডল গ্রহে ঝরে শব্দ অবিরল
শব্দের কম্পনে — জলধারা মেঘে মেঘে হইল মিলন
আলিঙ্গন, সংঘর্ষণ, চমকে বিদ্যুৎ শব্দ স্থূলরূপ, দিকে দিকে গভীর গর্জন।
সুগম্ভীর ধ্বনি স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম, সব কিছু শব্দ প্রতিধ্বনি।
কারণ সলিল মাঝে, লক্ষ্য করি মধ্য বিন্দু কাল ধারা ঘোর শব্দে করে বিজৃম্ভন।
সৃজনের নিত্যক্রিয়া চলে চিরন্তন।

শব্দের তির্যক গতি ব্রহ্মের বিক্ষেপ, ফুঁসি ওঠে মায়ারূপে
মহাশব্দে ফুঁসি উঠে সুষুম্নার মধ্যপথে হইল পতন, সারশব্দ রহিল গোপন,
মহাকাল ক্রম বিবর্তন, লঙিঘ ক্রমে সমুদ্র শাসন
জাগে বিশ্ব অসহায় শিশুর মতন
অগণন প্রজনন; শেষ সৃষ্টি মানবের দুর্লভ জীবন।
সহস্রার সারশব্দ রহিল গোপন, থেকে থেকে করিছে রোদন।।
বিক্ষেপের শব্দধারা আজ্ঞাচক্রে নামি
সোমে মনে, ললনাকে করে বিঘূর্ণন।
আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রমে, মূলাধারে করে বিকীরণ
জীবের যতেক বৃত্তি দলে দলে পদ্মে পদ্মে হইল সৃজন।
মোহনিয়া শব্দের নর্তন বিস্তারিয়া ইন্দ্রজাল রচি ফেলি চিদাকাশ সুষুম্নার গায়,
সমুদিত তীব্র জ্যোতি রস মধু দিব্যদৃশ্য করে বিচ্ছুরণ
চক্রে চক্রে মনোলোভা দেবতা দর্শন
মহানন্দ লভি যোগী, ভ্রমে ভাবে অভীষ্ট পূরণ, মনে ভাবে হল জাগরণ
হায়, হায়, এ সবই যে শব্দ মায়া বিক্ষেপের যাদু, নহে ইহা মহাজাগরণ
বিক্ষেপের তালে তালে শব্দরূপী নটরাজ করিছে নর্তন।
আব্রহ্মাস্তম্ভ পর্যন্তং প্রাণীনাং প্রাণের বর্তন।
শ্বাস প্রশ্বাসের খেলা, জীবন-মরণ — সব কিছু আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রমে, করে নিয়ন্ত্রণ।।
কাল শব্দ অবরোহ পথে ভেদ করি গেলে পুনঃ আজ্ঞাচক্র করিলে রমণ
এ শব্দ হতে ওঠে এক মধুর স্পন্দন; যোগি কর্ণে ধরা দেয় প্রণব ঝঙ্কার
যোগি ভাবে মহাভ্রমে পড়ি —
এই বুঝি মুক্তিপদ জগতের সারাৎসার
একাক্ষর ব্রহ্মাবেদ্য পবিত্র ওঁকার
হায় এ সকলই কালের বিছানি, নহে ইহা বেদ-গাথা অমৃতের খনি
পরাৎপর সারাৎসার মহানাম মণি — কোটি সূর্য সমপ্রভ
সহস্রার বিন্দু হতে বিদৃতির দ্বারে নিত্যকাল করে কুলুধ্বনি।
আবর্তন বিবর্তন মায়াজাল কর্মজাল ছিন্ন করি এই শব্দধারা
দেয় জীবে মহা উত্তরণ তীর্থস্নান মহাজাগরণ,
বেদলক্ষ্য অমৃতের খনি সারশব্দ ধ্বনি।
উদ্‌গীথ সে মহাতান জীবে নেয় সত্তধামে আনন্দ-বিহ্বল, শব্দ ঝলমল
ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কমল বোধির দীপনে
দীপ্ত তৃপ্ত মুক্ত আত্মা সে আনন্দ-স্নানে।
উদ্‌গীথ সে নাদ অলখ অনামী ভেদি করে সিংহনাদ
হলেও ব্যুত্থান, সারশব্দ হেরে কম্পমান
মূর্চ্ছনার তালে তালে মধু বরিষণ, এনে দেয় চিরমুক্তি দয়িত মিলন
অবিরাম ধ্বনি মধুময় কোষে কোষে করে প্রতিধ্বনি।
সৃষ্টিক্রমে কোটিবর্ষ পরে ভারতের পুণ্যতীর্থ নর্মদার তটে
কালের শাসন তরে দহরের মধ্যবিন্দু ছানি আপনা আপনি বিচ্ছুরিল সারশব্দ বাণী।

আমার কথা শেষ হতেই সাচ্চী বাবা শুরু করলেন — পরমসত্তা তুরীয় ভূমিতে অবস্থিত। তিনি নির্মল চৈতন্যদেশে মহিমান্বিত অবস্থায় বিরাজিত। মহাবিন্দু থেকে সিসৃক্ষার ফলেই পরমাত্মা আবিঃছন্দের পথে মানবদেহে ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে অবসর্পিনী গতিতে সুষুম্নায় বিন্দুস্থানে জীবাত্মা রূপে নেমে আসে, যা সূক্ষ্মনাদে পরিপূর্ণ। আত্মার আসার পথ হল হিতানাড়ী, যা জীবের ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর স্পর্শ করে আছে। এখান থেকেই আত্মার বিভা সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সৃষ্টি ধারা সাতটি বিষুবৎ যথা তত্ত্ববিষুবৎ (সত্যলোক), কাল-বিযুবৎ (তপঃলোক), শক্তি-বিষুবৎ (জনঃলোক), প্রশান্ত বিষুবৎ (মহঃলোক), নাড়ী বিষুবৎ (স্বঃলোক), মন্ত্র বিযুবৎ (ভুবঃলোক), প্রাণ বিষুবৎ (ভূঃ লোক) থেকে শক্তি আহরণ করে একটি যোনিঃ বা অক্ষপথ দিয়ে নেমে আসে।

যোনিঃ শব্দটির অন্বয় হল য + ও + ন + ই + ঃ।

য — বায়ুর প্রতীক অর্থাৎ যার পরিণাম আছে। পরিণাম অর্থ Consequence নয়। পরিণাম হল পরিবর্তিত রূপ।

ও — কূর্মবৃত্তির প্রতীক অর্থাৎ যা আকুঞ্চন ও প্রসারণ করে।

ন — নিয়ন্ত্রনী ধারার প্রতীক অর্থাৎ যে নিয়মের পথে তিনি নেমে এসেছেন, সে নিয়মের বশে চৈতন্যধারা প্রবাহমান।

ই — চাঞ্চল্য বা গতির প্রতীক।

তাহলে যোনিঃ শব্দটি বোঝাচ্ছে সেই স্থান যেখানে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়ে চৈতন্যধারা নিয়ন্ত্রনী শক্তির প্রভাবে গতিশক্তি লাভ করে অন্য রূপে পরিবর্তিত হচ্ছে।

একটি পূর্ণ দুগ্ধ ভাণ্ডে বাঁশ রাখলে কিছুটা দুগ্ধ প্রসারিত হয়ে উপচে পড়লো কিন্তু বাঁশের গায়ে দুধ সঙ্কুচিত হয়ে লেগে রইল। এবার একটা দড়ি দিয়ে বাঁশটিকে পেঁচিয়ে দুদিক হতে টানতে থাকলে বাঁশটিতে আবর্তন সৃষ্টি হল। পরিণামে উৎপন্ন হল ঘোল, মাখন। আধুনিক বিজ্ঞান বলে দড়ির দু'প্রান্ত টানার ফলে আমার শক্তি ঐ বাঁশে সন্নিবিষ্ট হল, বাঁশটি আবর্তিত হল। কিন্তু ঋষিরা বলেন বাঁশের মধ্যেই (সাচ্চিদানন্দময় হতে জাত বলেই তার মধ্যে) চিতিশক্তি নিহিত ছিল। কারণ জগতের সকল বস্তুতে চিৎশক্তি সঞ্জীবিত আছে।

'শমীতি অভিস্করস্তু নঃ' — এই শমশক্তি বা উষ্মাশক্তি হল লিঙ্গ শক্তি। এই শক্তি যোনির সঙ্গে সহযোগে সৃষ্টি ক্রিয়া করছে, পরিণতি আনছে। আবার এই উষ্মাশক্তি স্থিতির অবস্থা। তাতে ই-কার যুক্ত হয়ে হল শিব। অর্থাৎ তা গতি লাভ করল। উষ্মাশক্তিই শিবশক্তি বা Potential Energy । এরই শক্তিতে সমস্ত জগৎ rejuvinated এবং sustained আছে।

বাবাজী শিবলিঙ্গটিকে জড়িয়ে ধরে জ্ঞান হারালেন। আমরা যে ঘরের মধ্যে বসে আছি সেখান থেকে দেখলাম নর্মদার সমস্ত জল যেন জ্যোতিরই জল; সহসা সমস্ত জ্যোতিজল এক পলকের মধ্যে জমাট হয়ে অপূর্ব কুমারী মূর্তি গ্রহণ করল! পরম ব্যোমমণ্ডল থেকে, লিঙ্গ গাত্র থেকে কেবলই ভেসে আসছে ওঁ ওঁ বম্-বম্-ববম্ নাদ।

কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। নর্মদা স্পর্শ করে এসেই যে যার সান্ধ্যক্রিয়া শেষ করার পর শুয়ে পড়লাম। ঘুম কিন্তু এল না। কানের মধ্যে অহরহ নানারকম শব্দের নাদ স্বতঃই গুণ্‌গুণ্ করে বেজে চলেছে। উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রমে ভিতরে হংস মন্ত্রের জপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হল একটা জ্যোতির রেখা ধীরে ধীরে আমাকে গোলাকারে ঘিরে ফেলল; আমি যেন জ্যোতির গোলকের মধ্যেই বসে আছি। এই অবস্থায় কতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না।

যখন আচ্ছন্নভাব কাটল তখন দেখি সকাল হয়ে গেছে। আমার দেহে মনে যেন আনন্দের জোয়ার বইছে। আমি নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। স্নান-তর্পনাদি সেরে মন্দিরে ফিরে পূজা সারলাম। মনে হল শিবলিঙ্গ আজ রক্তবর্ণ ধারণ করেছেন।

বাইরে বেরিয়ে সাচ্চী বাবা প্রদত্ত দুধ আমরা পেট ভরে পান করে বললাম — এখনই বেরিয়ে পড়তে চাই। আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি দিন।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন — আপনারা পরিক্রমাবাসী। পরিক্রমায় বাধা দেব না।

— দয়া করে কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।

— মৃণালকে ভেঙ্গে দু' টুকরা করলেও যেমন তাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু সংলগ্ন থাকে তেমনি হল সাধুদের বন্ধুত্ব বা ভালবাসা যা কখনও ভেঙ্গে যায় না বা শেষ হয়ে যায় না। ভঙ্গোঽপি হি মৃণালানামনুবয়তি তন্তবঃ। চলার পথে সর্বদা গোরক্ষনাথজীকে স্মরণ করে চলবেন। তিনি আমাদের কাছে —

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
য স্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।

অর্থাৎ সংযমী ও তপস্যামুখীদের কাছে তিনি সদা জাগ্রত। তাঁর কৃপাতেই হৃদয় গ্রন্থি ভেদ অর্থাৎ মায়া অপগত হয় এবং মোক্ষ লাভ হয়।

বেলা অনেকখানি বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। দূরে দূরে বহু বসতি গড়ে উঠেছে। তাদের কাঁচাপাকা বাড়ী সবই দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে দলে দলে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং তাদের দেখভাল করার জন্য লাঠি হাতে রাখাল বালকদের দল। দু-চারজন লোককেও পথে দেখলাম। তাদের কাছ হতে জানলাম আর তিন চার ঘন্টা চললে সোনাডহর গ্রামে পৌঁছে যাব। সেখানে মন্দির ও চতুষ্পাঠী আছে। আমাদের থাকবার কোন অসুবিধা হবে না। নমস্কার জানিয়ে তারা চলে গেল বেলা তিনটে নাগাদ আমরা সোনাডহর গ্রামে এসে পৌঁছে গেলাম। স্থানীয় লোকরা আমাদের থাকবার জন্য নিয়ে এল পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দের চতুষ্পাঠীতে। পণ্ডিতজী নিজেই চতুষ্পাঠীর একটি কামরা খুলে দিলেন। পরিক্রমাবাসী জেনে শ্রদ্ধাভরে কিছুটা মিছরী ও দুধও এনে দিলেন।

তাঁর কাছেই জানলাম এই সোনাডহর মহল্লাতে অন্তঃত চারটি চতুষ্পাঠী আছে। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বেদ পাঠেচ্ছু বহু ছাত্র এখানে এসে থাকে। প্রাচীন পদ্ধতিতে এখানে পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। বেদের ঐশ্বর্য্য এবং পবিত্রতা অতুলনীয়। দু'টি শ্লোক ক্ষোদিত রয়েছে দেখলাম চতুষ্পাঠীর দু'দিকের দেওয়ালে —

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি দেবান্তিনো
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অহর্ন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ

অর্থাৎ ঐক্যের আদর্শ আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে।

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্।।

অর্থাৎ আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্ম চাই না, আমি চাই আমাদের দেশের সকলের দুঃখ নিবারণ।

হরানন্দজী শ্লোকটি পড়ার পরেই বলে উঠলেন — এর চেয়ে সমাজ-সেবার উচ্চ আদর্শ আর কি হতে পারে? আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে এই ধরণের ঐতিহ্যকে আমার লাভ করেছি।

চতুষ্পাঠীর বারান্দায় ঝোলা গাঁঠরী রেখে বিশ্রাম করতে বসলাম। ভাবতে লাগলাম এই নর্মদাতটে পরিক্রমা করতে করতে আমাদের এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এখানকার গ্রামগঞ্জের অধিবাসীরাও অত্যন্ত সাধুভক্ত, সদাচারী ও সত্যনিষ্ঠ। আমি নর্মদার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। এখানকার নর্মদার দৃশ্য বড়ই মনোমোহক এবং নয়নাভিরাম। এখানে নর্মদার বিস্তার অনেকখানি। দক্ষিণতটে মন্দির, পাথরের অট্টালিকা, ঘাটে ঘাটে লোক সমাগম উত্তরতটের চেয়ে যথেষ্ট বেশী। এইজন্যই অধিকাংশ পরিক্রমাবাসী দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা করেন, কারণ পথ কম বিপদসঙ্কুল। লোকজনের বাস বেশী বলে মানুষজনের মুখ দেখতে পাওয়া যায়, দক্ষিণতটে যত্রতত্র সদাবর্তও আছে। আমি মা নর্মদাকে প্রণাম করে কুটীরে ঢুকে নিজের শয্যা পেতে ফেললাম। কিছুক্ষণ পরেই এক উপবীতধারী ব্রাহ্মণ যুবক আমাদের কুটীরে দুটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেলেন। ঘরের কোণে রেখে গেলেন একটি তামার কলসী ভর্তি নর্মদার জল।

কিছুক্ষণ পরেই চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ কৃষ্ণানন্দজী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সকলে মিলে তাঁকে সম্ভাষণ জানানোর পর প্রেমানন্দ বললেন — আমরা কাশীর কামরূপ মঠের সন্ন্যাসী। আপনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। আমরা আপনার মুখ থেকে যোগ সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই, যাতে আপনি আমাদের মনে চিরভাস্বর হয়ে থাকেন। কর্মগুলির মধ্যে যোগ যে একটা কৌশল — এ সম্বন্ধে আপনার অভিমতই বা কি?

কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকার পর পণ্ডিতজী বলতে লাগলেন — আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কৃতির মধ্যে স্বর্গীয় সম্পদ রয়েছে। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে রয়েছে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের সন্ধান। যা ঋষিদের জীবনব্যাপী সাধনার, অপরোক্ষানুভূতির ফল। জাগতিক সব বস্তু, সব সমস্যার অন্তরালে যে তত্ত্ব আছে তা তাঁরা দেখেছিলেন স্বরূপের আলোকে, অনন্তের চোখে। সেইজন্যই তাঁদের প্রত্যেকটি বাণী চিরন্তন, জীবন্ত ও নিত্যনূতন তাৎপর্যের বাহক। 'একম' এর সাধক ঋষিগণ এই একাত্মদৃষ্টির আলোকেই দেখেছিলেন বিশ্বের ও মানবের অন্তর ও বাহ্যজীবনের সর্ববস্তুর অন্তরতম সত্য। এই সত্যের আলোকেই তাঁদের সর্বসত্ত্বা হয়েছিল উদ্ভাসিত। এই আত্মজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞানের মহাকাব্যোচিত প্রশস্তিই হল পাতঞ্জল যোগদর্শন। এর মধ্যেই আমাদের নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকবার বীজমন্ত্র নিহিত। মহর্ষি পতঞ্জলি সূত্রাকারে যে শাশ্বত সত্য প্রকাশ করে গেছেন তা মনন, চিন্তন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা একমাত্র অনুভব করা যায়।

অচতুর বদনো ব্রহ্মা দ্বিভূজো অপরো হরিঃ।
অভাল লোচনঃ শম্ভুঃ ভগবান্ শ্রীপতঞ্জলিঃ।।

পাতঞ্জল যোগসূত্র যোগশাস্ত্রের মণি-মঞ্জুষা। যোগশাস্ত্রের যা কিছু জানবার আছে, পাতঞ্জল-যোগদর্শন আয়ত্ত হলে সকলই জানা হয়ে যায়। যুগযুগান্ত ধরে বৈদিক ঋষিরা যোগশাস্ত্রের যে সকল তথ্য দর্শন করে গেছেন, উপলব্ধি করেছেন, যোগসিদ্ধ মহাযোগী পরম করুণাময় ঋষি পতঞ্জলিরও সেই একই সত্যদর্শন হয়েছিল। পরম করুণাময় ঋষি দিব্যমণ্ডলে সত্য দর্শনের পর জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর উপলব্ধ সত্য সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন। কৈবল্যপদপ্রাপ্ত ঋষির তাঁর দৃষ্ট সত্য প্রকাশ না করলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু করুণা-হৃদয় ঋষি জগতের কল্যাণের জন্য তা প্রকাশ না করে পারেন নি।

জানবেন, পতঞ্জলি নামটিও অপূর্ব। পতৎ + অঞ্জলি। ব্যাকরণে লেখা হয় নিপাতনে সিদ্ধ — আর্য প্রয়োগ। ব্যাকরণ শাস্ত্র ব্রহ্মার চক্ষু। তাতে নিপাতনে সিদ্ধ বলা হলে তার অর্থ এই নয় যে কোন কারণ বা সূত্র না পাওয়ার জন্যই আর্য প্রয়োগ বলা হয়েছে। নিপাতনে সিদ্ধ অর্থ হল — নিশ্চিতরূপে পাতনে — পরিশ্রুত হওয়ায় যা সিদ্ধ হল। তা distilled, decanted — সর্ব আবর্জনা মুক্ত। পূর্ব পূর্ব ঋষিরা যে পরম জ্ঞানের বিষয় বেদ ও উপনিষদে নিজেরা দর্শন করবার পর প্রকাশ করে গেছেন — সেই সকল শাশ্বত সত্য, পরম সত্ত্বার সঙ্গে যোগের উপায়, বহু পূর্বতন ঋষিদের উপলব্ধ সত্য, প্রপাতধারার মত পতৎ অর্থাৎ ঝরে পড়েছিল, তাই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করে যিনি সূত্রাকারে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করলেন তিনিই ঋষি পতঞ্জলি।

সেই পরম ঋষিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তাঁর আশীর্বাদ না পেলে সূত্রাকারে প্রকাশিত যোগসূত্র অনুধাবন করা যায় না।

পণ্ডিতজী জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন — যোগ একটা পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। সব বিজ্ঞানেই যেমন পূর্ব পূর্ব বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষিত সত্যগুলোকে মেনে নিয়ে একটা hypothesis ধরে নিয়ে অগ্রসর হন, তাদের লব্ধজ্ঞানকে ভিত্তি করে নূতন নূতন গবেষণা করেন — এই যোগবিজ্ঞানও তেমনি পূর্বতন সত্যাদর্শ ঋষিদের উপলব্ধ সত্য, যা তাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য তাঁদের লব্ধভূমিকত্ব থেকে বলে গেছেন — যাকে 'আগম'* বলা হয় — তা মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

যুজ্ ধাতু বা যুঞ্জ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা যোগ শব্দ সিদ্ধ হয়। সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোথাও যুজ্ ধাতু বা যুঞ্জ ধাতু মিলন অর্থে বোঝায় না। যুজ্ ধাতুর অর্থ হল যোজনা — planning. জীবাত্মা, যে জীবভাব অবস্থায় আছে, কেমন করে তা থেকে পরমভাব লাভ করে পরমাত্মা হয়ে যাবে তার জন্য যে planning, অর্থাৎ জীবনচর্য্যার যে আমূল পরিবর্ত্তন তাই হল যোগ। জীবের আত্মার চারিদিকে যে অবিদ্যার coating পড়েছে, যার ফলে জীবভাব, খণ্ডভাব আছে, সেই আবরণ ছিড়েফুঁড়ে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে চেষ্টা বা যোজনা তাকেই বলে যোগ।

---

* আগম এই তন্ত্রশাস্ত্র অতি প্রাচীন। তন্ত্র অর্থাৎ তন্যতে বিস্তীর্ণতে যা, তাই হল তন্ত্র। আধুনিক অঘোরী বৌদ্ধ বজ্রযানপন্থীদের প্রচলিত তন্ত্র তা নয়। এই তন্ত্রে আত্মার এই জীবদেহে আসার নিগূঢ় তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। কাশ্মীরের শৈবাগম সম্প্রদায়, ঋষি দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য পরম্পরায় এই জ্ঞান ধরে রেখেছেন। ঋষি উৎপল, অভিনব গুপ্ত হলেন আগম শাস্ত্রের বিখ্যাত সাধক।

অত্যুচ্চ পর্বত শিখর থেকে হিমবাহের তুষার গলে ঝর্ণাধারায় যে প্রাণশক্তি গতিলাভ করলো, তারপর কোথাও গিরিখাত বেয়ে, কোথাও পর্বত বেষ্টন করে, কোথাও পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে, কখনো গিরিগহ্বরের তল দিয়ে ফুঁড়ে, উপলখণ্ড লাফিয়ে ডিঙ্গিয়ে, সামনের পাথরের স্তূপ ভেঙ্গে চুরমার করে, কোথাও প্রপাত ধারায়, কোথাও কলস্বিনী স্রোতস্বিনী রূপে, কত দেশ প্রান্তর পার হয়ে, কোথাও দুই কূল প্লাবিত করে অবশেষে মহাসমুদ্রে সঙ্গমের জন্য যেমন জলধারা ধাবিত হয় একটি উদ্দেশ্যে — প্রতিপদে তার এই যে চলার ভঙ্গিমা ও নিয়ন্ত্রণ এটাই হল যোগ। এই analogy-র মহাসমুদ্রে মিলনকে কিন্তু যোগ বলা যাবে না। নদীর চলার ভঙ্গিমা ও গতি যা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে — সেইটাই যোগ।

'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' (গীতা ২৪৫০) বলা হলেও 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'-এর ব্যাকরণগত অর্থ হল 'কর্মগুলির মধ্যে যোগ একটি কৌশল'। সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনে 'কর্মসু' শব্দটির অন্য কোন অর্থ করা যায় না।

আপনারা জেনে রাখুন, যোগ কর্মগুলির মধ্যে একটা কৌশল কখনই নয়। তা যদি হত, তাহলে যে ভেজাল কারবারী যাকে তার ভেজাল দ্রব্য বাজারে খাঁটি বলে চালাবার জন্য অনেক কূটবুদ্ধি প্রয়োগ ও মস্তিষ্ক চালনা করতে হয় — তার কাজটাকেও যোগ বলতে হয়। যে চৌর্য্যবৃত্তি করে, গৃহস্থ নিদ্রিত থাকলে তার অজ্ঞাতসারে বা সে জাগ্রত থাকলেও তার অগোচরে গৃহস্থের ধনসামগ্রী চুরি করবার জন্য তাকেও অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেই কৌশলকেও তাহলে যোগ বলতে হয়।

যে যেমন বৃত্তি অবলম্বন করে অর্থাৎ যে যে অবস্থায় আছে, জজ্, ব্যারিষ্টার, অফিসার, কেরানী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, মজুর, কৃষক— সকলকেই নিজের নিজের কর্মনির্বাহের জন্য একটা art বা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এ কৌশলকে যোগ বলা চলে না। সেইগুলোকেও যদি যোগ বলা হয় তাহলে 'যোগ' শব্দটির ব্যভিচারই মাত্র হয়।

সাধারণ সংসারী জীব এসব রোচক বাক্যে আকৃষ্ট হয়। শুনতে খুব ভাল লাগলেও — যে যেমন ঘাটে আছে সে সেখানে যেমন কৌশল তার কর্মসিদ্ধির জন্য অবলম্বন করছে তাই যোগ, যাই আমরা করছি তাতেই তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছি এসব রোচক বাক্য তাই সংসারী জীব চট করে মেনে নেয়।

*যোগ হল জীবাত্মার পরমাত্মা হয়ে যাওয়া।* জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদটা কোথায়? দুটো শব্দেই common factor আত্মা আছে। জীবাত্মা শব্দে আত্মার সঙ্গে আছে জীবভাব — যা অল্পের ভাব, ভূমার ভাব নয়, খণ্ডভাব, মর্ত্ত্য বা মরণশীল ও অজ্ঞানতা। আর পরমাত্মা শব্দটিতে আছে আত্মার সঙ্গে পরম ভাব, বৃহতের ভাব, ভূমার ভাব অমর্ত্ত্যের ভাব।

ঋষি বলেছেন অমৃতস্য পুত্রাঃ — সকলেই অমৃতের সন্তান। সেই সর্বব্যাপক পরম সত্ত্বাই সকলের মধ্যে আছে। কিন্তু আমিই যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছি, এ বোধ সবসময় থাকে না কেন? নিজেকে পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত বোধ করি কেন? এর কারণ হল আমার অমৃতসত্ত্বার চারিপাশে অবিদ্যার, অজ্ঞানতার একটা আবরণ বা coating পড়ে আছে। তাই আমিই যে ঈশ্বর এই বোধ আমার নেই। তা না হলে, মূলতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই।

*যোগ শব্দটির সাধারণ অর্থ হল একটি সংখ্যার সঙ্গে আর একটি সংখ্যার মিলন, যেমন এক আর একে দুই হয়।* তেমনি জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এক হয়ে যাওয়া — তাই হল যোগ।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বলে গেছেন —

১। সকল মানুষ অমৃতের সন্তান।

২। সর্বব্যাপক পরমসত্ত্বা সকলের মধ্যে আছেন, আমারও মধ্যে আছেন। জগতের প্রতি বস্তুতে তিনি অনুস্যূত আছেন।

এই দুইটি বিশ্বাস জ্বলন্ত ও জীবন্ত রাখতে হবে। বিশ্বাস শব্দটির অর্থ হল 'বিগত হয়েছে শ্বাস যাতে'। শ্বাস চাঞ্চল্যের প্রতীক অর্থাৎ শ্বাস বা চাঞ্চল্য যাতে বিগত হয় তাই হল বিশ্বাস। সর্বব্যাপক চৈতন্য সত্ত্বা সকলের মধ্যেই আছেন, আমারও মধ্যে আছেন এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকতে হবে।

মাকড়সা লালা থেকে রস নিঃসরণ করে যেমন আপনার জালে জড়িয়ে পড়ে থাকে, তেমনি বাসনার লালা থেকে কর্ম, অবিদ্যা, এগুলোর জালে জীবাত্মা জড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ পেঁয়াজের খোসার মত; যার ফলে

সে বুঝতে পারে না যে সে নিজেই ভূমা, সর্বব্যাপক সত্ত্বা, পরমাত্মা। অবিদ্যা দূর হলেই সে এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হবে। জগতের সর্ববস্তুতেই পরমসত্তা আছেন, আমারও মধ্যে আছেন, যা কিছু করছি, দেখছি, শুনছি — সবই একই ভাগবৎ সত্ত্বারই প্রকাশ, এই অনুভূতি চেষ্টা করতে করতে হয়। ক্রমে ক্রমে নির্ভরশীলতা, নিশ্চিন্ততা আসে। যা কিছু ঘটছে, সবই একটি অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে হচ্ছে, সবই তাঁরই প্রকাশ — এই ভাব থেকে নিশ্চিন্ততা আসে। 'সর্বচিন্তা পরিত্যজ্যাৎ নিশ্চিতম্ যোগমুচ্যতে'। এই নিশ্চিন্ততাই হল যোগ।

মানুষের অন্নময় কোষের আবরণটা খসে পড়লে হয় দেহের মৃত্যু। যে প্রাণশক্তি জীবকে প্রাণবন্ত রাখে তার বেরিয়ে যাবার দুটি উপায় আছে। একটি হল দেহের মৃত্যু — সাময়িক withdrawal আর একটি হল যোগ। 'জিতাজিত মুক্তি হাসিল', পরমাত্মা হয়ে যাওয়া।

যেমন amoeba নামক একটি এককোষী প্রাণী জন্মের কিছু সময়ে পরে, পরিণতি লাভ করলে দুইভাগ হয়ে যায়। একটি ভাগ নষ্ট হয়ে যায়, অন্য ভাগটি আবার একটি amoeba তে পরিণত হয়। কিছুসময় পর পরিণতি লাভ করে আবার সেটা দুইভাগ হয়ে যায়। একটি অংশ নষ্ট হয়ে যায় অন্য অংশটি আবার amoeba হয়। এমনিভাবে subtraction and transformation নিরন্তর কাজ করে চলেছে। নূতন amoeba টা রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এমনি ভাবে একই প্রাণের প্রবাহ বয়ে চলেছে, পরিণতি লাভ করে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। দুই কোথাও নেই। সন্তান-সন্ততিদের মধ্য দিয়ে সেই একই প্রাণশক্তি শুধু রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

আজ এই গাছপালায় যে পাখীটা কলকাকলি করে উঠছে, সেই পাখীটাই হাজার হাজার বছর আগে এমনি করে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করত। জন্মজন্মান্তরে পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পরায় সে নিজেই অর্থাৎ একই আত্মা বা প্রাণশক্তি নব নব রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তেমনি আজ যে মানুষটি পাখীর কলকাকলি শুনছে, সেও হাজার হাজার বছর আগেকার একই সত্ত্বা, পুত্র পৌত্র, প্রপৌত্র বংশপরম্পরায় সে নিজেই বেঁচে আছে রূপান্তরিত হয়ে।

সরল প্রাণী amoeba র বেলায় যা হয়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বেলায়ও তাই হয়। শুধু পদ্ধতিটা মানুষের বেলায় জটিল। মানুষ, যে ঈশ্বরের সর্বনিকটতম প্রতিরূপ, যে নিজেই ঈশ্বর — তার বেলায় সৃষ্টি ধারার এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন? দেহ নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষের আত্মা এমনিভাবে পুত্রকন্যার মধ্যে বেঁচে থাকে। তাই বলা হয় 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'। পিতামাতার শুক্রশোণিতের মিলনের ফলে যে জীবদেহের সৃষ্টি হয়, তার ভেতরে পিতাই পুত্ররূপে থাকে। শুধু মাতা-পিতার রজোবীর্যের সংযোগে দেহ উৎপন্ন হয় না — তাতে প্রাণ প্রবাহের মিলনেরও দরকার হয়, আত্মার সংযোগ হতে হয়, তখনই শুধু ভ্রূণের মধ্যে জীবাত্মার আগমন হয়। সেই একই প্রাণশক্তি ভ্রূণ কোষে সন্তানরূপে জাত হয়। ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে সন্তান রূপে ভূমিষ্ঠ হয়।

এমনিভাবে যেমন জন্ম হয়, তেমনি পরিণতি লাভ করে প্রাণশক্তি যখন এই পরিচ্ছিন্ন দেহের সীমা ছাড়িয়ে অসীমে চলে যায় — তখন জীর্ণ বস্ত্রের মত দেহটা পড়ে থাকে — বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় তাকেই বলা হয় মৃত্যু। কুলালচক্রের পাকের মত এই জীবন। চক্রের আবর্ত্তন যখন শেষ হল — পরিণতি লাভ করলো — তখন এই দেহের খোলসটা ছেড়ে যেতে হয়।

কিন্তু শুধু দেহটাই পরিত্যাগ করা হয়। দেহকে প্রাণবন্ত রাখে যে প্রাণশক্তি বা আত্মা তার মৃত্যু নেই। হাজার বছর আগে আমিই ছিলাম ও ভবিষ্যতে যদি থাকি আমিই থাকবো। মৃত্যু শুধু একটা পরিণাম বা পরিবর্ত্তন। জীবনের ধারা, জীবনের প্রবাহ, জীবনসত্তা একই থাকে। শুধু চাকার একটা course finished হয়ে গেল। একটা চক্রের আবর্ত্তন শেষ হয়ে যাওয়াই মৃত্যু।

আমি — আপনি এতক্ষণ ধরে যা বললেন আমাদের বিশ্বকবির ফাল্গুনি নাটকে তারই প্রতিধ্বনি শুনি। ক্রান্তদর্শী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে —

'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে;
এইতো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয় দ্বারে।'

জীবনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

'জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা, পা ফেলা।' (কণিকা ১/৬০৩)

আসা আর যাওয়া। এ যেন খেলা বিশেষ। শুক্রশোণিতের মিলনের ফলে প্রাণ এসে যখন সংযুক্ত হয়, তখন পরিগ্রহ করে জন্ম। আর যখন এই প্রাণ দেহের পরিচ্ছিন্ন সীমা ছাড়িয়ে অসীমে চলে যায় তাই হল মৃত্যু। তখন এই দেহটা শ্মশানে দগ্ধীভূত করতে হয়। কুলাল চক্রের course টা finished হয়ে যায়।

এককথায় মৃত্যু হলো অসীমে পা তোলা, যেমন জন্ম হল অসীম থেকে সীমার মধ্যে পা ফেলা।

পণ্ডিতজী বললেন — আপনে সাচ্ বাতায়া। জন্ম ও মৃত্যুর এই রহস্যটা জানার জন্য নচিকেতার মত যমবাড়ীতে সকলকে যেতে হবে না। কারণ, প্রত্যেকেই আমরা নচিকেতা। চিৎগুহায় যে নচিকেত অগ্নি সদাই আছে তা প্রজ্জ্বলিত হলে সবাই বুঝতে পারবে এই জন্ম মৃত্যুর রহস্য।

একই সত্ত্বা ঘুরে ফিরে জন্মজন্মান্তর ধরে নব নব রূপে পরিগ্রহ করছে এটা জানা থাকলে মৃত্যুভয় আর থাকবে না। মৃত্যু আমার পদলেহী কুকুরের মত থাকবে যখন ইচ্ছা করব, এই দেহটা অক্লেশে ছেড়ে চলে যেতে পারি — এই দেহটা আমি নই — এইবোধ থাকলে মৃত্যুভয় আর পীড়িত করবে না।

মানুষের মৃত্যুর যেমন ভয় থাকে, তেমনি পুনর্জন্মেরও ভয় থাকে। মৃত্যুর পর আবার জননী জঠরে শয়ন করতে হবে, কোথায় জন্মাব, আবার সেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিষ্পিষ্ট হতে হবে — এই ভয় প্রায়ই থাকবে। জন্ম ও মৃত্যু শুধু পা তোলা আর পা ফেলা — জীবনের খেলা বিশেষ — এটা জানা থাকলে মৃত্যুভয় বা পুনর্জন্মের ভয় আর থাকবে না।

এইরকম ভাবে বিশ্লেষণ করে চিন্তা করতে থাকলে সংস্কার মুক্তি হবে।

এই সংস্কার মুক্তির পর ধ্যান করতে হবে। ঋষিরা বলেছেন নেতি নেতি বিচারের ফলে যে জ্ঞানের উদয় হবে যে সর্বভূতেই পরমাত্মা আছেন, আমারও মধ্যে আছেন — আমিই ঈশ্বর — এই বিশ্বাস অচঞ্চল রাখতে হবে।

সংস্কার মুক্তির পর ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী বিন্দুতে ধ্যান করলে আপনা আপনিই revelation হয়ে যাবে।

ধী ধাতু + অনট প্রত্যয় = ধ্যান অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে গভীরভাবে মনন চিন্তন করা। আবার ধ্যৈ ধাতুর উত্তর অনট প্রত্যয় হলে ধ্যান হয় — যার অর্থ দ্বিদলপদ্মস্থানে ধ্যেয়ে বেড়ান। ঋষিরা ধ্যান সম্পর্কে বলেছেন — ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ অর্থাৎ মন একবার নির্বিষয় হয়ে গেলে ধ্যান হয়। একমুখী হয়ে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী অনুপূরিত বিন্দুস্থানে মনন করলে প্রথমে মন দাপাদাপি করবে। নানা চিন্তা উদিত হতে থাকবে কারণ মনের কাজই হল সঙ্কল্প বিকল্প করা। তাতে বিচলিত না হয়ে মাথার মধ্যে যেখানে একই অনুপূরিত আকাশে তিনি আছেন সেই একতত্ত্বকে জানতে আগ্রহশীল হলে, তখন সেই বিন্দুর প্রতি উন্মুখ একটা ঊর্দ্ধমুখী গতি হয়। তাই ক্রমে বিন্দুস্থানে যায় এবং মনের দাপাদাপি তখন চলে যায়।

ঋষি পতঞ্জলি কিন্তু এই সাধারণ প্রচলিত বোধকে ধ্যান বললেন না।

তিনি বলেছেন — তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥ (বিভূতিপাদ, ২)

তত্র সেইখানে — সেই রেণুপূরিত আকাশে — সেই ত্রিকূটিস্থানে প্রত্যয়ের একতানতা হল ধ্যান। এইস্থান শরবিদ্ধ করতে পারলে আত্মার চারিপাশে যে আণবমল, মায়িকমল, কর্মমল থাকে তার বারটি আবরণ, পঞ্চকোষের আবরণ, ষোলটি কলার প্রথম কলার আবরণ টুটে ভেঙ্গে যায়। তখন যে জ্যোতিঃদর্শন হয় তা কোটি সূর্য্যের চেয়েও উজ্জ্বল ও কোটি চন্দ্রের চেয়েও সুশীতল। কিন্তু এই জ্যোতিঃ দেখে তাকেই চরম ভাবলে চলবে না। ষোল কলার মাত্র একটি কলা ভেঙ্গে গেলে তখনই উজ্জ্বল কোটি সূর্য্যের আলো দেখা যায় কিন্তু তা পরমপদ নয়। এইখানে এই অবস্থায় প্রকৃত সৎগুরু — তিনি তাঁর প্রজ্ঞার জ্যোতি অভিক্ষেপ করে শিষ্যের অন্য পনেরটি কলার আবরণ ছিন্ন করে দেন। গুরু শিষ্যের হৃদয়ে আসন পেতে নিজেই সাধনা করেন — শিষ্যের হৃদয় তাঁর সাধনক্ষেত্র। তাই গুরুই এইখানে শিষ্যের অন্য পনেরটি কলা একে একে ছিন্ন করেন।

এই রেণুপূরিত আকাশ বা বিন্দুস্থানে একম্ এর সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্য মগ্নচিত্তে ভাবনা করলে সেইখানে মধুক্ষরা অমৃতঃ নিঃসন্দিনী একটি তাল বা মধুচ্ছন্দ সম্পৃক্ত হয়। তার সঙ্গে এক হয়ে গেলে একের সঙ্গে একতানতা হয়ে যায়। এই মধুচ্ছন্দ বা শব্দধারার বিপুল টানে আত্মা ক্রমে ঊর্দ্ধমুখী হয়। উত্তরা সুষুম্নার যে

শাখাটি বিদৃতিদ্বার অবধি গেছে তার মুখটি বোঁজা। একতানতার ফলে শব্দধারার ঊর্দ্ধমুখীন যাত্রায় এই রুদ্ধমুখে চিতিশক্তি নিরন্তর আঘাত করতে থাকে এবং ক্রমে যখন আণবমল, মায়িকমল কর্মমলের আবরণ ও বাকী পনেরটি কলা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন এই রুদ্ধ মুখটি খুলে যায়। এই বিদৃতিদ্বার দিয়ে আত্মা উৎক্রান্ত হলে হিতানাড়ী ধরে পরমসত্ত্বা যিনি স্বেমহিন্নি অর্থাৎ supreme source অবস্থায় আছেন তাঁর সঙ্গে মিলন হয়। অর্থাৎ তখন আত্মার জীবাত্মাভাব দূর হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হয়। এই দ্বিদলপদ্মস্থানে মনন করে (তত্র) অভিগমন ও একতান হওয়াকেই ঋষি পতঞ্জলি ধ্যান বলেছেন। ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাবার পর 'তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ'। সেই অবস্থায় যত্ন ও অভ্যাসের দ্বারা স্থিত হতে হবে। অভ্যাস হল অভি + অস্‌; অভিতঃ অর্থাৎ তাঁরই সামনে অস্ to be হওয়া — অর্থাৎ আছি — সর্বদা তাঁরই সামনে আছি বোধ রাখতে হবে।

মৃত্যুভয় বা পুর্নজন্মের ভয়ই হল সবচেয়ে বড় বিপাক। সেই বিপাক জয় করতে হবে। অর্থাৎ ঈশ্বর হতে হবে। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন — 'ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ'। (সমাধিপাদ, ২৪) মৃত্যুরূপ বিপাক হতে যে ক্লেশ তার দ্বারা অপরাসৃষ্ট যে পুরুষ সেই ঈশ্বর।

এই হল যোগ। এটা কোন কর্মের কৌশল নয়।

হিরন্ময়ানন্দ — কৈবল্যপাদে ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন—

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম ॥ ৬॥

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনিম্‌স্ত্রিবিধমিদতরেষা ॥ ৭ ॥

তিনি কেন বলেছেন যোগীদের কর্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ এবং অন্যদের কর্ম ত্রিবিধ?

পণ্ডিতজী বললেন — ঋষি পতঞ্জলির সূত্রটি বুঝতে হলে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সাহায্যে বুঝতে হবে। যাইহোক, আমি ব্যাখ্যা করছি শুনুন। আগে ৬নং মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করা গেলে তবেই ৭নং মন্ত্রের মর্মার্থ পরিস্ফুট হবে। তখনই জানা যাবে কেন ও কীভাবে যোগীদের কর্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ হয়।

অনেকে বলেন, পরহিতের জন্য যোগী কর্ম করেন। তিনি কল্যাণ কর্ম করেন কিন্তু ফলের দিকে তাকান না। অতএব কর্মফল তাঁকে স্পর্শ করবে না। — একথা ঠিক নয়। সৌভাগ্যবশতঃ ঋষি পতঞ্জলি তথাকথিত মহাপুরুষদের পূর্বে জন্মেছিলেন। তথাকথিত মহাপুরুষের শিষ্যরা সেবাকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, বন্যাত্রাণ, স্কুল-কলেজ, ইত্যাদি করে অনেক laudable, highly laudable কাজ করেন, পরিহিতব্রতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু সেসব কাজ গৃহীর, যোগীর নয়।

তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞরা বলেছেন, 'বাবুর বাড়ীর ঝি, বাবুর সুখে পুলকিত হয়, বাবুর ছেলে মারা গেলে কাঁদে কিন্তু সত্যিই সে এসব সুখে দুঃখে বিচলিত হয় না। 'বাবুর বাড়ীর ঝি' এই কথাগুলির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞের মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বাবুর বাড়ীর ঝি যেন মানুষ নয় এমনি একটা অবজ্ঞার ভাব আছে উক্তিটিতে। বাবুর সুখে দুঃখে সে লোক দেখানো আহ্লাদ শোক প্রকাশ করে। বাবুর ছেলেটা মারা গেলে সে যে কাঁদে তাও লোক দেখানো, সত্যিই তার প্রাণ বিগলিত হয় না — একথা বলা ভুল। অর্থনৈতিক কারণে বা কর্মবশে তাকে হয়তো ঝি-গিরি করতে হচ্ছে, তা বলে বাবুর বাড়ীর সুখদুঃখ তাকে স্পর্শ করে না, বাবুর ছেলেটি মারা গেলে তার জন্য যে সে কাঁদে তা শুধুই লোক দেখানো, আন্তরিক নয় — এ উক্তির মধ্যে অবজ্ঞার ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। ঐ ঝি রূপক ব্যক্তিটির মধ্যেও যে 'নরোত্তম'ই আছেন এ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকলে এরকম অবজ্ঞাসূচক উক্তি উপমার মাধ্যমেও তাঁর মুখ দিয়ে বের হত না। বাবুর সুখে সুখ, তাঁর দুঃখে দুঃখ বাবুর বাড়ীর ঝি নামক ব্যক্তিরও হতে পারে। বাবুর ছেলেটি মারা গেলে বাবুর বাড়ীর ঝি-র যে দুঃখ তা তার সেই অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থিত সেই নরোত্তমেরই অনুভূতি, একথা মনে রাখা দরকার।

লোকহিতের কাজ বা ফললাভের আকাঙ্খা বিহীন কর্ম যোগীরা করেন — এ কথাটাও সত্য নয়। ফললাভের আশা ব্যতীত কোন কর্মই কেউ করতে পারে না। যোগীও যে তপস্যা করেন তা মোক্ষফল লাভের আশা নিয়েই করেন। লোকহিতের কর্ম বা ফললাভের কামনাবিহীন কর্ম অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম নয়।

ঋষি ৬নং মন্ত্রটিতে বলেছেন — 'তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্'। ধ্যান দ্বারা যোগীর চিত্ত অনাশয় হয়। অনাশয় কি? এই প্রারব্ধ দেহ ও চিত্ত হল আশয়। আশয় শব্দের অর্থ হল আশ্রয়। পূর্ব পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম-চিত্তরূপ আশয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকে। চিত্ত হল চিতিশক্তির বিকার। প্রাণময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের

মাঝামাঝি চিত্ত আছে। এটাই record room — যাকে পুরাণকাররা চিত্রগুপ্তের খাতা বলে। এইখানে জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের ছাপ পড়ে থাকে। এই সংস্কার থেকেই জন্ম জন্মান্তরের পুনরাবর্তন হয়। তা-ই কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে। যোগ হল চিত্তের যা বৃত্তি — সেই সংস্কারের বন্ধন — যে সংস্কারের পুঁটলী নিয়ে জন্ম হয় — তার নিরোধ করা, নিঃশেষ করা। তারই ফলে জন্ম । যোগী চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা যোগ করেন ও ধ্যানের দ্বারা তাঁর চিত্ত অনাশয় হয়।

সমাধিপাদের দ্বিতীয় সূত্রেই ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন — যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ অর্থাৎ যোগ হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ। তিনি ত বলতে পারতেন যোগঃ মনোবৃত্তি নিরোধঃ অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা (অধিপতি) মনকে নিরোধ করলেই যোগ হয়। তা বলেন নি কেন? পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চারটি অন্তরিন্দ্রিয় বা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন — ঋষি একথা জানলেও জানতেন যে মনকে নিরোধ করা যায় না।

মন সদাই চঞ্চল, মন হল মদিরোন্মত্ত বৃশ্চিক দংশনে উন্মত্তপ্রায় মর্কটের মত সদা চঞ্চল। তাই তাকে নিরুদ্ধ করা যায় না। ঋষি পতঞ্জলি তাই মনকে নিরোধ করার কথা না বলে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করতে বলেছেন। এখানে নিরোধ কথাটির অর্থ নিশ্চিতরূপে রোধ করা। যেমন নদীর ওপর বাঁধ দিলে বা ক্ষেতে আল্ বেঁধে দিলে বানের জল উপছে প্লাবিত করতে পারে না। তেমনি চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলে চিতিশক্তি ঊর্দ্ধায়িত গতি পায় এবং আত্মাকে উর্দ্ধের পথে টেনে নিয়ে যায়।

আগেই বলেছি, চিত্ত হল চিৎশক্তিরই বিকার অবস্থা। চিতিশক্তি যা স্বেমহিম্নি অবস্থা থেকে নেমে এসেছে, তা নীচের ঘাটে এসে বিকারপ্রাপ্ত যখন হয়, তখন জ্বলতে থাকে সে নিরন্তর চায় কীভাবে সে আনন্দঘন স্বরূপে লীন হতে পারে। 'তস্মাৎ জায়তে তস্মিন লীয়তে চ ইতি তজ্জলন।' তাকেই চিত্ত বলা হয়। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের পুঁটলী এখানেই জমা থাকে। চিত্তবৃত্তির নিরোধের ফলে জোয়ারের জলের গতিশক্তির মত চিতিশক্তি ঊর্দ্ধপথে যায়। এক জায়গায় নিরোধের ফলে ঊর্দ্ধপথে চিতিশক্তি তখন প্রবাহিত হয়।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের পর সংস্কার সাক্ষাৎকার হয়। তখন যোগী তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার দেখতে পান। পতঞ্জলি ঋষিই বলেছেন — 'সংস্কার সাক্ষাৎ কারণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্' (বিভূতিপাদ-১৮)। যোগী তখন ধ্যানে তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারগুলি দেখতে পান। তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান হয়। যোগী তখন দেখতে পান পূর্ব পূর্ব জন্মে তার কি কি কর্মবন্ধন ছিল আর সেই সেই কর্মবন্ধন ক্ষয়ের আর কত বাকী আছে। দ্বিদলপদ্মে ধ্যান করে যোগী অনাশয় হন। যেসব কর্মবন্ধন বাকী আছে তা নিঃশেষ করবার জন্য দেহবন্ধন যতদিন আছে ততদিন তাঁকে থাকতে হয়। সব কর্ম শেষ করবার জন্য অনেক সময় যোগীরা অস্মিতা থেকে উপাদান আহরণ করে নির্মাণচিত্ততা অবলম্বন করে একই সঙ্গে ৫/৬টা দেহ তৈরী করেন।

নির্মান চিত্তানি অস্মিতামাত্রাৎ। (কৈবল্যপাদ, ৪)

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্ত মেকম্ অনেকষাম। (ঐ, ৫)

এই দেহগুলির চিত্ত একই থাকে। যদিও অনেকগুলি নির্মাণচিত্ত দেহধারী বিভিন্ন জায়গায় কর্মভোগ করতে থাকে তারা যে একই চিত্তের সঙ্গে যুক্ত তা তারা জানতে পারে না। এই নির্মাণচিত্ততা তৈরী করে যোগীরা তাঁদের যে ভোগ বাকী থাকে তা ভোগ করিয়ে নেন। মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি নিজেদের নির্মাণচিত্ত দেহ তৈরী করে তাঁদের উপদেশবাণী যুগে যুগে তাঁদের শিষ্যদের দান করে গেছেন। যোগীদের এই নির্মাণচিত্ত দেহ কল্পান্ত অবধি থাকে। সংস্কার সাক্ষাৎকার হওয়ায় কতটা কর্ম তাঁদের বাকী আছে জানা থাকার ফলে পুনরায় কর্ম সৃষ্টি হবে এমন কর্ম যোগীরা করেন না।

এই কারণে যোগীরা যেমন অপরের অনিষ্টকর কোন পাপকর্ম করেন না। তেমনি পরহিতব্রতে, লোকহিতকর কোন কল্যাণকর্মও তাঁরা করেন না। শুধু প্রারব্ধ ভোগের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটুকু কর্মই যোগীরা করেন। তাই যোগীদের ক্রিয়াকলাপ অনেক সময় দুর্জ্ঞেয় মনে হয়। কেন তাঁরা কোন কর্ম করছেন তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। অনেক সময় তাঁদের কাজ, অন্য লোকেদের প্রতি ব্যবহার নিষ্ঠুর বা অদ্ভুত মনে হতে পারে — তা সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। যোগীরা এই সব করেন কর্মভোগ নিঃশেষ করবার জন্য, দেনা পাওনা মিটাবার জন্য। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও তারা গুণে গুণে নেন ও ফেলেন। যেমন আপনারা বা অন্যান্য নর্মদা পরিক্রমাকারীরা অতি স্বল্প আহার, ফলমূল যা মা নর্মদা আপনাদের জুটিয়ে দেন তাই ঈশ্বরকে নিবেদন করে

জীবনধারণের জন্য গ্রহণ করেন। আপনাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চার ব্যত্যয় হয় না বলেই নর্মদা পরিক্রমাকে বলা হয়েছে পূর্ণযোগ।

এমনিভাবে যোগীরা সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম করেন। যেহেতু যোগীদের কর্ম কোন লোকহিতকর পরহিতযুক্ত পুণ্যকর্ম নয় এবং তা কারো ক্ষতিকরও নয় — তাই তা অশুক্ল — অকৃষ্ণ বা অশুক্লাকৃষ্ণ।

অন্যান্য গৃহীদের কর্ম ত্রিবিধ — ১) শুক্ল বা পুণ্য কর্ম, ২) কৃষ্ণ বা পাপ কর্ম, ৩) শুক্ল-কৃষ্ণ কর্ম। শুক্ল-কৃষ্ণ কর্ম হল যাতে পুণ্য ও পাপ দুই-ই হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে — দেশমাতার স্বাধীনতার জন্য নিঃস্বার্থপর কত দেশপ্রেমিক কত দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার নির্যাতন সয়েছেন, এমনকি অনেকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এইসব কর্মগুলি পুণ্য কর্ম বা শুক্ল কর্ম।

আবার অনেকে কারো ক্ষতি হয় এমন অনেক দুষ্কর্ম করে। সেগুলো কৃষ্ণ কর্ম। তার ফলও তারা ভোগ করে। আর একপ্রকার কর্ম আছে তাতে লোকহিত হয় কিন্তু কর্ত্তার তার সঙ্গে কিছুটা স্বার্থও জড়িত থাকে। যেমন, অনেক রাজনৈতিক কর্মী অনেক সময় জনস্বার্থে অনেক অত্যাচার অপমান সয়ে থাকে, উদ্দেশ্য তাদের ভালই যাতে জনগণের অভাব অভিযোগ দূর হয় তাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব হয়। কিন্তু এর পশ্চাতে একটা সুপ্ত বাসনা থাকে যে আগামী নির্বাচনে জনগণ তাকে নির্বাচিত করবে।

যোগীদের কর্ম এই ত্রিবিধ ভাগের মধ্যে পড়ে না। তাঁদের কর্ম তাই অশুক্ল ও অকৃষ্ণ। ঋষি পতঞ্জলি এই শুক্ল ও কৃষ্ণ কর্মগুলোকে দুটি ভাগে দেখিয়েছেন। তা হল ১) ক্লিষ্ট কর্ম ও ২) অক্লিষ্ট কর্ম।

ক্লিষ্ট কর্মগুলি হল — ১) ক্ষিপ্ত, ২) বিক্ষিপ্ত ও ৩) মূঢ়।

ক্ষিপ্ত হল পাগলের অবস্থা। জীব যখন নিত্যবস্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে অনিত্য বস্তুর দিকে ধাবমান — তখন সে ক্ষিপ্তই আছে।

বিক্ষিপ্ত অবস্থাও তদ্রূপ। বিশেষভাবে ক্ষিপ্ত যে অবস্থা তাই বিক্ষিপ্ত অবস্থা। মূঢ়ও এই প্রকার বিকৃত অবস্থারই সর্বাপেক্ষা হানিকর রূপ। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার পর বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে জীব মূঢ়মতি হয়ে যায়। জ্ঞান, বিবেক বিচার লুপ্ত হয়ে যায়। অজ্ঞান অবস্থায় জীব এই সব যে কর্ম করে যা অনিত্য বস্তুর প্রতি তাকে ঠেলে দেয় — নিত্য বস্তু হতে দূর রাখে — তাই ক্লিষ্ট কর্ম অর্থাৎ এ সব থেকে তাকে ক্লেশ স্পর্শ করে।

আর অক্লিষ্ট কর্ম হল — ১) একাগ্র ও ২) নিরুদ্ধ।

একাগ্র হল এককে অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম -এর প্রতি উন্মুখ — একই অগ্রে আছেন এই বোধ — এই রকম অবস্থায় জীব যা করে তাই একাগ্র অবস্থা।

নিরুদ্ধ হল যখন চিত্তবৃত্তি একাদশ দ্বার দিয়ে উপভোগ থেকে বিরত হয়ে, চিতিশক্তি উল্টামুখ করে ঊর্দ্ধের দিকে ধাবিত হয়। তাতে বিষয় ভোগ বাসনা নিরুদ্ধ হয় ও জোয়ারের জল যেমন উপ্চে ছাপিয়ে প্লাবিত করে তেমনি চিতিশক্তি উর্দ্ধপানে গতি লাভ করে। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাই হল অক্লিষ্ট কর্ম। অলমিতি।

এই বলে পণ্ডিতজী টলটলায়মান অবস্থায় উঠতে উঠতে বললেন আপনাদের পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে আরও কোন শঙ্কা থাকে তা নির্দ্বিধায় বলবেন আমি তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। এখন আমার নিত্যকর্মের সময় হয়েছে।

পণ্ডিতজী ফিরে গেলেন চতুষ্পাঠীর ভিতর দেউড়ীতে। ভেতরের বাড়ীর চারদিকে প্রশস্ত বারান্দা, মাঝখানে মস্ত উঠোন। সেই প্রশস্ত বারান্দায় প্রায় দশ-বারো জন ছাত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে পাণিনীয়ম্ মুখস্ত করছিল। আমরা নর্মদায় চললাম নর্মদা স্পর্শ ও সান্ধ্যক্রিয়া সারতে। ফিরে এসে দেখি ছাত্ররা দ্বিবেদীজীর সঙ্গে আবৃত্তি করছেন :—

ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতয়ত্ স্বন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসা সকেতা একং ক্রতুং অভি বি যন্তি সাধু॥ (ঋ-৬/৯/৫)

অর্থাৎ তিনি ধ্রুবজ্যোতি, শাশ্বত আলোক। অকম্প অনির্বাণ সে দ্যুতি মানসলোকের দ্রুততম চিন্তার চেয়ে দ্রুতগামী। সমস্ত বিবর্তনের মাঝে। সমস্ত ক্ষণিক ভাতির অন্তরে তাঁরই প্রকাশ — সেই নিগূঢ় আবির্ভাবই মানুষকে পথ দেখায়, জীবনের অন্ধকারকে সত্য ও সুন্দরের পথে নিয়ে যায়।

সর্বশেষে পণ্ডিতজী আবৃত্তি করছেন —

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বম। উত্তিষ্ঠিত প্র তরতা সখায়ঃ।

অত্রাজহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান বয়মুত্তরেমাভি বাজান্।। (ঋ ১০/৫৩/৮)

উপলবন্ধুর জীবনের নদী বয়ে চলেছে। চেষ্টা কর। সোজা হয়ে দাঁড়াও। চল আমরা যাত্রা করি — যা অমঙ্গল, যা অকল্যাণ, তাকে এখানে ফেলে রেখে আমরা শিবময় সাফল্য ও বিজয়শ্রী লাভ করব।

পণ্ডিতজীর কণ্ঠ নীরব হতেই আমি সাথীদের বললাম — জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, ভ্রান্তিবশতই তার জীবভাব বা মর্ত্যভাব, জীবত্বের অঞ্জন মুছে গেলেই নিরঞ্জন শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার অনন্ত সম্ভাবনা তার আছে (Infinite potentiality to be infinite). যৎ যৎ বস্তু চোখে পড়ে তৎসমুদয় যে এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তারই প্রকাশ ও বিকাশ (manifestation) এবং এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হলেই যে প্রকৃত বিশ্ববোধ ও বিশ্বমানবতা জন্মে — এটাই হল বেদ-বেদান্তের মর্মবানী। আনন্দ ময়োহভ্যাসাৎ — শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলেছেন, নিজের স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা কর। অনুভব করবে এই প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রনার বহু উর্ধ্বে তুমি — তুমি সৎ। তুমি চিৎ, তুমি আনন্দস্বরূপ। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

সমাধিবান ঋষিগণ এইসব বিবরণ লিখেছেন সমাধিপূর্ণ ভাষায়। বাবা বলতেন — 'বেদ বেদান্ত যেন ইক্ষুদণ্ড, গিললে কিছু পাবে না, গুরু পাশে বাস বসে সরসে চিবানো চাই।' তাই বলছি, এই সব ছাত্ররা তাদের গুরুজীর নিত্য সান্নিধ্যে থেকে তাঁর চরণতলে বসে নিজেদের সতীর্থদের মধ্যে পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ রূপে তর্ক বিচার ও অনুশীলন দ্বারা এরা একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতে পরিণত হবেন।

আমার কথা শেষ হতেই কৃষ্ণানন্দজী সহাস্য বদনে আমাদের মাঝে এসে বসলেন। বললেন — আমার ছাত্ররা আমাকে ভক্তি করে, ভালবাসে। এদের অধ্যয়ন করিয়ে আমি শান্তি পাই, যা অন্য কিছুতে পাই না। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ এটি আমার নিত্যকর্ম।

পণ্ডিতজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপকা পিতাজী মেরা গুরুদেব মায়ানন্দ সরস্বতীজীকা দোস্ত থে। আপকা পিতাজীকে পাশ আপ পাতঞ্জল যোগদর্শনকা পাঠ অচ্ছিতরেসে লিয়া। উনোনে সদৈব মহর্ষি পতঞ্জলিকো যো মন্ত্রসে আবাহন ও বরণ করতে থে উহ হ্যায় —

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচা মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।

যোহপাকররোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পাতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিয়াণতোহস্মি।।

অর্থাৎ যিনি যোগদর্শন প্রণয়ন করে চিত্তমল নাশের, পাণিনীয় মহাভাষ্য প্রণয়ণ করে বাক্যমল নাশের এবং চরক-সংহিতা প্রণয়ন করে দেহমল নাশের সাধনোপায় প্রদর্শন করেছেন, মুনিদের প্রকৃষ্টরূপে বরণীয় সেই পতঞ্জলিদেবকে নতমস্তকে প্রণাম করছি।

পণ্ডিতজীর কথায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও তাঁকে বললাম —

পাতঞ্জল যোগদর্শনের সমাধিপাদের ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন — ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্ (১৯)

আবার পরের শ্লোকে ঋষি বলেছেন — 'শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্' (২০)

ভাষ্যকার হরিহরানন্দ বলেছেন — 'স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ, তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি ।

এই শ্লোক দুটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

পণ্ডিতজী — সারাদিন পরিক্রমা করে আপনারা ক্লান্ত। এখন এই দুই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গেলে রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে।

হরানন্দজী — আমরা মোটেই ক্লান্ত নই। এই মাহেশ্বরী যোগমার্গের পথে আমরা বিশ্রাম করতে আসি নি। আপনি যদি ক্লান্ত না হয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন তবে আমরা অবশ্যই শুনবো। এই সিদ্ধ তপস্থলীতে দৈবীলীলা নিরন্তর চলছে, ঘুমিয়ে পড়লে আমরা সেই পথ থেকে বিচ্যুত হব।

আমি — বাংলার কবি সুরসিক কেদার বাঁড়ুজ্যে মহাশয় লিখেছেন,

'যেই দেবে আশ্বিনের হাওয়া, রেলের কনসেস্ন

উপরি আয়ের অনেক বাবুই বাংলাতে না রন্।

এমন বেগে নিত্য সবাই আসেন রাশি রাশি
তিলেক বিলম্বে যেন উবে যাবে কাশী।'

এরূপ কোন হুজুগ বা সাময়িকভাবে বায়ু পরিবর্তনের উন্মত্ত আগ্রহ বশতঃ আমি বা আমার সঙ্গীরা নর্মদা পরিক্রমা করছি না। মা নর্মদার আশীর্বাদে উচ্চকোটির সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ লাভ ও তাঁদের সাধনপথের অভিজ্ঞতা লাভ করে নিজেদের জীবনকে রাঙিয়ে তোলাই আমাদের একমাত্র ব্রত। অসাধারণ ব্যক্তিরা যে সাধারণ বেশভূষায় আত্মগোপন করে থাকেন এবং নর্মদা তীর্থেই এঁদের দর্শন মেলে — এ আমার পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা! আপনি ঈশ্বর আদিষ্ট পুরুষ। আপনার মুখ নিঃসৃত বাণী হতে পাতঞ্জল যোগদর্শন আমাদের কাছে সম্যকরূপে নিরুপিত হবে।

পণ্ডিতজী — ঋষি প্রথমে পতঞ্জলি যোগসূত্রে যে সূত্রগুলি বলেছেন তা খুব compact form এ এবং এগুলো interlinked এং interconnectedও। সূত্র দুটি বুঝতে হলে ঋষির ব্যবহৃত শব্দগুলি আগে বুঝতে হবে।

ঋষি বলেছেন — উপায় প্রত্যয় যোগিদের হয়, যাঁদের নির্বীজ সমাধিলাভ হয়, যা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির একটা প্রকারভেদ। আবার, নির্বীজ সমাধিলাভের পর যোগীদের ভবপ্রত্যয়ও হয়।

উপায়-প্রত্যয়টি কি? প্রত্যয় শব্দটির সাধারণ অর্থ বিশ্বাস হলেও প্রকৃত অর্থ হল যখন যোগীদের মধ্যেই চিতিধারার ঊর্ধ্বরতি জন্মে। প্রত্যয় শব্দটি = প্রতি — অয় + অল্ প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ হয়েছে। অয় ধাতুর অর্থ হল গতি বা গমন। প্রতি হল — দিকে বা অভিমুখে। তাহলে সেই একম্ এর প্রতি, দিকে বা অভিমুখে যা নিয়ে যাবে তা-ই হল প্রত্যয়। প্রতি বস্তুর খণ্ড খণ্ড বোধ, যার প্রত্যেকটি 'একম্'এর প্রতি নিয়ে যাচ্ছে, তা-ই হল প্রত্যয়। লক্ষ্যবস্তুর নিকটবর্ত্তী হওয়াই প্রত্যয়। আত্মাই লক্ষ্যবস্তু। আ পূর্ব্বক অত্ ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ম যুক্ত আ — হল আত্মা। অত্ ধাতু বিস্তারে। 'আততি বিস্তৃণাতি'। আত্মা অর্থাৎ মহাবিন্দুই বিস্তারিত হয়ে নিজেই সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন যিনি। সেই বিরাট পুরুষই আত্মা। আমাদেরও 'ভ্রূবোর্মধ্যগতোর্বিন্দুঃ'তে সেই একই পুরুষ বিরাজমান। ঋষি পতঞ্জলি আরোও বলেছেন — কোন ক্রিয়া কসরৎ, কোন দিনচর্চা পালনের দ্বারা নির্বীজ সমাধিলাভ সম্ভব নয়। চিতিধারার যে স্ফূরণ, স্ফুট, উর্ধ্বমানের ঘাটে ঘাটে এই যে উদ্বর্তন, উজ্জীবন — এই সম্পূর্ণ উত্তরণটা — চৈতন্য শিখরে সমুত্থানের এই যে whole course টা হল উপায় প্রত্যয়। চিতিশক্তির এই উর্দ্ধায়ন সেই পরমপদের প্রতি অভিগমনের দুটি মাত্র পথ হল —

১) সমর্থ গুরু কৃপা করলে যোগ্য শিষ্যের চিতিশক্তিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য উত্তরা সুষুম্না পথ ধরে এই বিদৃতিদ্বারটি খুলে দেন। তা নাহলে জ্ঞান লাভ দ্বারাই শুধু জন্ম জন্মান্তরের পর এই রুদ্ধ মুখটি খুলে যায়।

২) পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের ফলে অর্থাৎ তার সম্যক জ্ঞান লাভ হওয়ার কারণেই — অর্থাৎ জ্ঞান গুরুর সাহায্যে (প্রকট গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেই) অগ্রসূচী বা অগ্রনখের পথে আত্মস্থানে আত্মাকে দর্শন করে পরমপদ লাভ হয়। তারও আত্মা ঐ বিদৃতিদ্বার দিয়ে উত্তরা সুষুম্না পথে উৎক্রান্ত হয়।

আমাদের জীবনের কোন একটি দিনের অনুভূতি যদি analyse করি, আমরা দেখতে পাই যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা hundreds of things এর বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে রমণ করছি। আমাদের প্রতি কার্য্যে, চলায়, বলায়, প্রতিমুহূর্ত্তে চিন্তায় — তাদের সঙ্গে constant intercourse হচ্ছে। এই অসংখ্য বস্তুর ও ভাবের সঙ্গে আমাদের আত্মার যে রমণ হচ্ছে তা সবই ভগবৎ সত্তারই সঙ্গে রমণ হচ্ছে এই বোধই হল প্রত্যয়। আত্মারাম, আত্মক্রীড় হতে হবে।

উপনিষদে ঋষি বলেছেন —

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম।। (কঠ ২।২।২৩)

মন্ত্রটির অর্থ — 'এই আত্মা বলহীনের লভ্য নয়, মেধা দ্বারা বা বহুশ্রুতির দ্বারাও ইহা লভ্য নয়। যে ইহাকে (আত্মাকে) রমণ করে তাহা কর্তৃকই ইহা লভ্য।' প্রতি বস্তুতে ভগবৎ সত্তার সঙ্গে যার রমণ হয়, অর্থাৎ সর্বব্যাপক চৈতন্য সত্তা সর্বভূতে আছেন, আত্মাই সর্বত্র আছে — এক ছাড়া দুই নেই — এই অনুভূতি যখন হয়, তখন যে আত্মক্রীড় যোগীর আত্মরতি হয়, সেই বলশালীরই আত্মা লভ্য। এই রমণ ক্রিয়াই প্রত্যয়।

প্রতি বস্তুতে এই রমণক্রিয়া কে করছে? এই আত্মরতি, কে করে?

এই আত্মরতি করে একমাত্র 'চিতিশক্তি'।

কি সেই চিতিশক্তি?

সম্যকরূপ জ্ঞানই চিতিশক্তি। কোন energy যখন অবরোহ পদ্ধতিতে নেমে আসে, তখন তার ধর্ম হল তা ছড়িয়ে পড়ে, বিস্তারিত হয়ে পড়ে। আবার যখন আরোহ পদ্ধতিতে energy উঠতে থাকে, তখন তা concentrated হয়, তার intensity বাড়ে এবং তার ঊর্দ্ধদিকে যাওয়ার গতি সঞ্চার হয়।

প্রাণময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের মাঝে আছে 'চিত্ত'। এই চিত্ত হল চিতিশক্তির বিকার অবস্থা। যাকে পুরাণকাররা বলেন 'চিত্রগুপ্তের খাতা'। জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের দাগ বা ছাপ এই চিত্তপটে থাকে।

চিতিশক্তির গুণ বা ক্রিয়া বিষয়ে ঋষি বলেছেন চিতিশক্তি হল শুদ্ধা, অনন্তা, অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রমণা ও দর্শিত বিষয়া। 'দর্শিত বিষয়া' শব্দটির 'দর্শিত' শব্দাংশটি ক্ত প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ। অর্থাৎ কোন বিষয় থেকে রগড়ে রগড়ে রস নিষ্কাশিত করে নেওয়াকে বোঝায়।

চিতিশক্তি এই 'দর্শিত বিষয়া' জ্ঞান এনে দেয়। 'চাঁদ দেখ' বললে শিশু বোঝে 'ওটা চাঁদ' — চাঁদের বিষয়ে শিশুর মনে স্পষ্ট ধারণা হয়। আবার ঐ চাঁদই দেখে শিল্পীর একরকম বোধ হয়, কবির অন্যরকম, আবার বিজ্ঞানীর চিন্তারাজ্যে অন্যপ্রকার দোলা দেয়। আবার কোন যোগী বা ঋষি, যাঁর তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে, ঐ চাঁদ দেখে তাঁর চিন্তারাজ্যে এমন কিছু ফুটে উঠবে যা শিশু, কবি বা বৈজ্ঞানিকের হবে না।

চিতিশক্তি একটি সূক্ষ্ম তরঙ্গ প্রবাহের মত। কিন্তু জল যেমন এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে রাখলে তার আকার পরিবর্তন হয় কিন্তু পাত্রভেদে চিতিশক্তির পরিবর্তন বা পরিণাম হয় না। পূর্বজন্ম জন্মান্তরে চিতিশক্তির চারপাশে বিভিন্ন আবরণ পড়ায় চিতিশক্তির ক্রিয়া হতো ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু পূর্ব কোন জন্মে যদি চিতিশক্তি developed হয়ে থাকে পরের জন্মে নূতন আধারে দর্শিত বিষয়জ্ঞান প্রতিসংক্রামিত হচ্ছে না বা পরিণামী হচ্ছে না। এই জন্য চিতিশক্তিকে অপরিণামিনী ও অপ্রতিসংক্রমণা বলা হয়।

প্রত্যয় বলতে ঋষি বলেছেন 'খণ্ড খণ্ড বোধ'। সমুদ্রপারের সমস্ত বালুরাশির সঙ্গে যদি কিছু চাল মিশানো থাকে তখন যেমন চালগুলো বাছতে জিন্দেগী ভোর লেগে গেলেও হবে না তেমনি খণ্ড খণ্ড বোধ হতে অখণ্ড বোধ আনা, সব বস্তুর মধ্যে একতানতা আনা সমস্ত জীবনেও সম্ভব নয়।

তাই প্রেমময় ঋষি, কষ্ট পাচ্ছে অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে যে জীব, তার কষ্ট লাঘব করবার জন্য, বহুর মধ্যে অখণ্ডবোধ আনার জন্য, একটি উপায় নির্দেশ করেছেন। এটিই উপায় প্রত্যয় তত্ত্ব।

উপায় শব্দটির নিরুক্তমতে অর্থ হল — 'ঊর্দ্ধং পায়িনং যৎ'। অর্থাৎ যা ঊর্দ্ধের দিকে পান করে যা ঊর্দ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যোগীর মধ্যে চিতির ধারা ঐভাবে উর্দ্ধগা হয়। দিব্যমণ্ডলের চেতনা রস ও আনন্দ অকস্মাৎ করে যোগীর চিত্তে সম্প্রসাদ-প্রশান্তি-সম্বোধি জাগায়। তাই চিতির ঐ স্বাভাবিক উর্ধ্বরতির নাম উপায়। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' যে পরমতত্ত্ব তাকে ঋষিরা বলেছেন — সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এই চিৎ হল জ্ঞান। তা-ই চিতিশক্তিরূপে, প্রাণশক্তিরূপে জগতের সর্বত্র অনুস্যূত আছে। এই চিতিশক্তিই জ্ঞান। তাই ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন, 'চিতি সংজ্ঞানে'। এই চিতিশক্তিই ক্রমে ঊর্দ্ধের পানে ওঠে, মহাবিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়। ঊর্দ্ধের দিকে পান করা, অর্থাৎ সেই অমৃতরস আস্বাদনের জন্য উঠা, তাই হল উপায়। এটা যোগীদের হয়।

ক্ষরভূমিতে আছে জীবের যে চিত্ত, তাকে অক্ষরভূমিতে নিয়ে যাওয়া, অল্প থেকে ভূমায় তুলে নিয়ে যাওয়া — এই অবস্থাকেই উপায় বলা হয়।

অক্ষরভূমিতে যে অমোঘ নিয়ম বা নিয়তি আছে, যার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি কর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাকে বেদে বলা হয়েছে 'দণ্ড'। 'দণ্ডেন হি মহত্তেজাঃ'। এ হল সেই নিয়ম ও শৃঙ্খলার দণ্ড যা জগৎসৃষ্টিকে পরিচালিত করছে। অক্ষর ভূমিতে এই চিতিশক্তিই দণ্ডের বা নিয়মের কাজ করে। ক্ষরভূমিতে এই চিতিশক্তি যখন নেমে আসে, বিকারপ্রাপ্তির ফলে তার চারপাশে আণবমল, মায়িকমল, কর্মমল পড়ায়, তা খণ্ডখণ্ড বোধের প্রত্যয় করায়। নিম্নতর ঘাটে বিভিন্ন প্রবৃত্তির বশ হয়ে যে সব বোধ হয়, তাও চিতিশক্তিরই ক্রিয়া।

বস্তুর অনিত্যতা চিতিশক্তিকে স্পর্শ করতে পারে না। অনুভূত বিষয়ের যে স্মৃতি রয়ে যায় তাই হল সংস্কার।

এই জ্ঞান বিন্দুতে, অর্থাৎ রেণুপূরিত আকাশে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী স্থানে থাকে। নূতন নূতন জন্মে যে দেহ আমরা পরিগ্রহ করি, তার মধ্যে এসেও পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান, যাকে সংস্কার বলা হয়, তা নষ্ট হয়ে যায় না। বা ঐ নূতন জন্মের পরিবেশে, নূতন দেহে তা পরিবর্ত্তিত হয় না। এই সংস্কার চিতিশক্তিরই কাজ। যেহেতু চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রমণা ও অপরিণামিনী, সেইহেতু পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান ও সংস্কার এ জন্মেও থাকে। কিন্তু তার উপর আণবমল, মায়িকমল ও কর্মমলের আবরণ পড়ায় তা সুপ্ত থাকে। চিতিশক্তি শুদ্ধা ও অনন্তাও। এই শুদ্ধা অবস্থাই হল 'বিমলবোধ' যা মহাবিন্দু থেকে অর্চিপথে হিতানাড়ীর ভিতর দিয়ে সব মানুষের চিদ্‌গুহায় পড়ছে। চিদ্‌গুহায় যে বিন্দু আছে সেখানে যে আত্মা আছে আর মহাবিন্দুতে যে পরমাত্মা আছে দুইই মূলতঃ এক। এই দুই বিন্দুর সঙ্গে নিত্য সংযোগ আছে। শুধু কতকগুলো coating পড়ে থাকার ফলে, আণবমল, মায়িকমল, কর্মমলের আবরণ পড়ার ফলে, জীবের অখণ্ডবোধ থাকে না।

এই খণ্ডবোধ দূর করবার জন্য যে উপায় প্রত্যয় তত্ত্ব, তা বুঝতে হলে প্রথমে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের মৌলিক কার্য্যগুলি জানতে হবে। এগুলির বিভাগ এইরকম— ১) গ্রহণ ২) ধারণ ৩) উহ ৪) অপোহ ৫) তত্ত্বজ্ঞান ও ৬) অভিনিবেশ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ ও চিত্তভাবের সম্বন্ধবোধ হল গ্রহণ।

কোন বস্তুর বহিরঙ্গরূপ গ্রহণ কোরো না, এই বোধে জগতের যা কিছু গ্রহণ করে, তাই হল প্রকৃত গ্রহণ। অ-সৎ অবস্থায় যদিও বা থাকি, তবু তারও মধ্যে সৎ-ই আছেন, এই জ্ঞান মনে রেখে কোন কিছুর বহিরঙ্গ রূপ দেখেই বিভ্রান্ত না হয়ে জগতের সব বস্তুই 'সৎ' এরই প্রকাশ মনে করে যে গ্রহণ, তাই হল প্রকৃত গ্রহণ। অসৎ অর্থ হল অল্প সৎ।

স্বপ্নাবস্থায় মানুষের নির্জ্জন মন ক্রিয়া করে চলে, কিন্তু তখন বাইরের বস্তুর সঙ্গে সংঘাত না হওয়ার ফলে মনের দাপট কমে যায়। সারাদিনের মধ্যে আঠার ঘন্টা জাগ্রত অবস্থায় থেকেও যদি কেউ আরোপ করে, ভান করে যে সে অমৃতের পুত্র, জগতের সর্ববস্তুতে জগদাধার চৈতন্যসত্ত্বা অবস্থিত, তারও মধ্যে একই চৈতন্যসত্ত্বা আছে — তাহলে তার স্বপ্নাবস্থায়, যখন মনের দাপট কম ক্রিয়াশীল –– তখন অনিত্যকে নিত্য বলে, অসত্যকে সত্য বলে যে ভ্রান্তি হয় মনের তা তার হবে না। তার ঐ শ্বাশত সত্য জানা থাকার ফলে ঐ সত্যগুলিই তখন অবচেতন মনে প্রকট হয়। অবশ্য নিদ্রা ও স্বপ্নের কাজ বিকল্প ও বিপর্য্যয় আনা। ঋষি পতঞ্জলিই বলেছেন — 'প্রমাণ বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ' (সমাধিপাদ-৬)। এর ফলে স্বপ্নের মধ্যে বিকল্প ও বিপর্য্যয় ভাবও হয়, কারণ তখনও মনের দাপট কিছুটা ক্রিয়াশীল থাকে।

কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় (অর্থাৎ আত্মা যখন সু বা সুন্দরভাবে উপ্ত) যে আনন্দময় অবস্থা হয়, তখন মনের দাপট কোন কাজ করে না। দিনের মধ্যে ১৮ ঘন্টা জাগ্রত অবস্থায় থেকেও কেউ যদি বিশ্বাস করবার চেষ্টা করে যে সকলেই অমৃতের পুত্র, জগদাধার চৈতন্যসত্ত্বা সকলের মধ্যেই অছেন, আমারও মধ্যে আছেন — তাহলে তার সুষুপ্তির মধ্যে তার কাছে এইসব সত্য আপনি প্রকট হয়। এটাই হল ধারণ।

উহ হল উত্তরণ। অমৃতের পুত্র যে, সে অনিত্য অবস্থায় আছে, সে নিত্য বুদ্ধ চিন্ময় — এই নিত্যবোধে যে উত্তরণ তাই হল উহ।

অপোহ হল উহিত বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি ত্যাগ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির গ্রহণ।

তত্ত্বজ্ঞান হল তৎ + ব অর্থাৎ তিনিই হন সবই-এই বোধ। মহাবিন্দু থেকে চিতিশক্তি যখন নেমে আসে তখন তাঁর নামার প্রথম ঢল আসে এই তত্ত্ববিষুবৎ-এ। এই তত্ত্ববিষুবতে উঠে যোগী ঋষিরা উর্দ্ধের পানে চেয়ে অপেক্ষা করে থাকেন। এখানে উঠলে আর নেমে আসা নেই। দেরী হতে পারে, কিন্তু এইখান থেকে মহাবিন্দু অবধি গতি তাঁর নিশ্চিত। 'তিনিই হন', তিনিই আমি — এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান।

অভিনিবেশ হল সেই অবস্থা যখন কোন কিছুতে আসক্তি থাকবে না। তখন সূক্ষ্মস্তরের আভাস, তত্ত্বজ্ঞানের আভাস প্রতিভাসিত হবে।

'উর্দ্ধং পায়িনং যৎ' যে চিতিশক্তি, তার এই সব গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ হয়।

যোগীদের উপায় প্রত্যয় হয়।

যোগী কে? যিনি যোগের পথ অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ তাঁরা সংসারের মধ্যে থেকেও 'সং'-মুখী হন

না — জগৎটাকে সং বা তার অনিত্যতাকে তাঁরা নিত্য মনে করেন না। তাঁরা সংসারের সারবস্তু অর্থাৎ সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষই একমাত্র আছেন এবং 'তত্ত্বমসি (তৎ + ত্বম্ + অসি) — তিনিই তুমি — এই বুঝে 'সারটাকেই আঁকড়ে ধরেন, কারণ, পূর্বজন্মের সংস্কারের উদ্বোধন ঘটেছে তাঁর মধ্যে।

যোগীদের সর্বদা একটা অভাব বোধ থাকে। কি যেন নেই, কি যেন চাইছে, অথচ পাচ্ছে না — কি চাইছে তা-ও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না — কিন্তু সর্বক্ষণ একটা অভাবের জ্বালা বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে। চিত্তের সম্প্রসাদের একটা অভাব সর্বক্ষণ বোধ হয়। অজানাকে পাওয়ার একটা আকুতি নিরন্তর অন্তরে ধ্বনিত হতে থাকে। এই অবস্থাকেই ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন, চিত্তের সম্প্রসাদের অভাব, ঋষি বেদব্যাস মহাভারতে একেই বলেছেন —'বিষাদ যোগ'। যোগীর জাগ্রত অবস্থাতে এই যে শূণ্যতা বোধ, অজানা অচেনার অমৃত স্পর্শ পাঠায় এই যে প্রেরণা তাও সৃষ্টি করে চিতি। চিতিধারার vibration -এর ফলেই এই অবস্থা আসে। যোগীর যখন সুষুপ্তি হয়, যখন নির্জ্ঞান মনও নিষ্ক্রিয় তখন তাঁর মধ্যে চিতিশক্তির স্পন্দন বেগে উর্ধ্বমুখী হয়। অবরোহ পথে যে চিতির ধারা নিম্নঘাটে এসে বাসনা কর্মাশয় সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের কর্মফল, আণবমলের বাঁধনে বাঁধে, যোগীর ক্ষেত্রে সেই চিতির ধারাই তাঁর পূর্বজন্মের সুকৃতীর ফলে আরোহের পথ ধরে। তার উর্ধ্বমুখী স্পন্দনের ফলে যোগীর চিত্ত ধীরে ধীরে কর্মফল আণবমল মুক্ত হয়ে ক্রমে লীন হয়ে যায়। একটা দৃঢ় অথচ তীব্র সম্বেগ তাকে ক্রমশঃ স্বরূপমুখী করে।

নদীর স্রোত তখন উজান বেয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিলতে চায়। ঋষি প্রাচেতস অর্থাৎ বাল্মীকি একেই রূপক ভাবে বলেছেন — রাম শব্দের মরা মরা জপ — উল্টা জপ। কবীর একেই বলেছেন — উলট্ গতি। উলট্ গতিমেঁ মছলি চলে। তুলসীদাসের ভাষায় এই তত্ত্বই —'উল্টা জপ জপে জগ জানা বাল্মীকি হুয়া ব্রহ্মসমানা'।

যাইহোক — এই analysis থেকে এটা স্পষ্ট হল যে, যোগীর ক্ষেত্রে তাঁর জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাটাও সাধনার অঙ্গ। তাঁর ক্ষেত্রে জাগ্রত অবস্থা হোক, স্বপ্ন অবস্থা হোক, সুষুপ্তি অবস্থা হোক — Under any circumstances — চিতিধারা — যা এসেছে কপাল কুহরস্থ অনুপূরিত আকাশ স্থান অর্থাৎ বিন্দু থেকে — সেই চিতিধারাই তাকে টেনে নিয়ে যাবে স্বরূপ স্থিতির পথে — চিতিই তাঁকে বিন্দুমুখী উৎস মুখী করবে। এরজন্য তাঁকে কোন দিনচর্চা পালন, নিয়ম নিষ্ঠার সংস্কার তথাকথিত কোন যৌগিক ক্রিয়ার কসরৎ করতে হবে না।

যোগীদের নির্বীজ সমাধি লাভ হয়। নির্বীজ সমাধি লাভ হলে তবেই কৈবল্য প্রাপ্তি হতে পারে।

পণ্ডিতজী — আচ্ছা, শৈলেন্দ্রনারায়ণজী! আপকা সমাধি কী বারেমেঁ যো জ্ঞান প্রাপ্ত হুয়া ওহি শুনাইয়ে।

আমি মহাত্মা সোমানন্দজীকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে এই নর্মদা পরিক্রমাকালে তাঁর মুখ থেকে যা শুনে শিখেছি তাই বলতে শুরু করলাম — সমাধি সম্বন্ধে সাধারণের কোন ধারণাই নেই বললে চলে। যেকোন একটা মূর্ছাগ্রস্থ cloroformic stage বা কম্পন, ঝাঁকুনি, খিচুনি বা নিঝুম অবস্থা দেখে তাকে সমাধির যেকোন একটা সংজ্ঞা দিয়ে দেয়। ঐ সুযোগে বুজরুকদেরও প্রচার প্রতিষ্ঠা লাভের সুবিধা হয়। সমাধি হল সেই অবস্থা যে অবস্থায় পৌঁছলে সব সমাধান হয়। অর্থাৎ পূর্ণতম প্রজ্ঞা পূর্ণতম আনন্দলাভ হয়। সবসময় সর্বত্র যে কোন অবস্থাতেই সেই অখণ্ড পরমানন্দ, সমরস, রসস্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপে সমভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই সমাধি। সমত্বং যোগমুচ্যতে। যখন সমত্ব বোধ সব কিছুতে হয় তখনই হয় সমাধি। যখন যোগী ধ্যানযোগে সচ্চিদানন্দময়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, সর্ব ভূতান্তরাত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ হয়, তখন তাঁর কোন বিভেদ বোধ থাকে না। এই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় আচার্য শঙ্কর বলে উঠেছিলেন — 'অহং নির্বিকল্পো নিরাকারোপোবিভূর্ব্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্'। আবার যেহেতু এই অবস্থায় চিদাকাশে সম্যক জ্ঞানের উদয় হয়, সেহেতু বিশ্বের সকল রহস্যেরও সমাধান তাঁর কাছে হয়ে যায়। যোগীর তখন কিছুই অজানা থাকে না পূর্ণভাবে জানা হয়ে যায়। কাজেই সমাধিবান ঋষি বা যোগী ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যান। তাঁর পূর্ণতম প্রজ্ঞা, পূর্ণতম আনন্দ লাভ হয়। সমাধি হল সম্যক ভাবে জানা এবং সমভাবে অধিষ্ঠান, চৈতন্যের জাগরণ।

সমাধিস্থ অবস্থায় অনুভবী সাধকের অনুভূতিতে ফুটে ওঠে —

উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দ বস্তুনি।
সমাধিং সর্বদা কুর্যাদ্ হৃদয়ে বাথবা বহিঃ।

স বিকল্পোলবিকল্পশ্চ সমাধির্দ্বিবিধো হৃদি।
দৃশ্যশব্দানুবেধেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা॥
কামাদ্যাশ্চিত্তাসাদৃশ্যাত্তৎ সাক্ষিত্বেণ চেতনাম্।
ধ্যায়েদ্দৃশ্যানুবিদ্ধোয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥
অসঙ্গ সচ্চিদানন্দঃ সপ্রভো দ্বৈতবর্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোয়ং সবিকল্প সমাহিতঃ॥
স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্য শব্দানুপেক্ষ্য তু।
নির্বিকল্প সমাধিঃ স্যান্নির্বাতস্থলদীপবৎ॥

অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। নামরূপ কল্পিত বা মিথ্যা; এইটে নিশ্চয় করে, নামরূপকে পরিত্যাগপূর্বক, অন্তরে বা বাহ্যে, সর্বদাই সমাধি আশ্রয় করবে। আন্তর সমাধি — সবিকল্প নির্বিকল্প ভেদে দুই প্রকার, আবার নির্বিকল্প সমাধিও দুই প্রকারের — (১) দৃশ্যানুবিদ্ধ, (২) শব্দানুবিদ্ধ। ভাবাভাব চিত্তের কামাদি বৃত্তিগুলিও ভাব অভাব ধর্মযুক্ত। কারণ চিত্তের সদ্ভাবে তাদের সদ্ভাব চিত্তের অভাবে তাদের অভাব। জাগ্রতাবস্থায়, ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ এক বৃত্তির লয় হলে আবার অন্য বৃত্তির উদয় হয়। চিত্ত কখনও বৃত্তিশূন্য থাকে না, এক বৃত্তির লয় হলে আবার অন্য বৃত্তির উদয় হয়। পরন্তু সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাতে চিত্তের লয় হওয়ার আর কোন বৃত্তিরও উদয় হয় না। সেই চিত্তবৃত্তির বিবিধ প্রকার বিকৃতাবস্থা, তার ভাব ও প্রভাব এবং তদুভয়ের সন্ধিস্থল যিনি স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ করেন, তিনি প্রত্যক্ষ চৈতন্যরূপ আত্মা। অপরোক্ষভাবে এটি অবগত হয়ে তাঁর ধ্যান করবে — ইহাই দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। এই দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি দ্বারা প্রত্যেক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অনুভূতি দৃঢ় হলে, সেই অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধি হয়ে থাকে। এইরূপ দৃঢ় ভাবনাকে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। পূর্বোক্ত দৃশ্য ও শব্দানুবিদ্ধ সমাধি দ্বারা চিত্ত যখন সুস্থির হয়ে স্বরূপের সঙ্গে একত্ব লাভ করবে, তখন দৃশ্য ও শব্দ উভয়ই অন্তর্হিত হয়ে যাবে। তখন কেবল স্বয়ংসাক্ষী ও সাক্ষ্যভাবরহিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকবে, চিত্তনির্বাহ দীপকলিকার ন্যায় নিশ্চল হয়ে তদাকার অবস্থা প্রাপ্ত হবে, এই হল নির্বিকল্প সমাধি।

আমার কথা শেষ হতেই পণ্ডিতজী আমার চিবুকে নাড়া দিয়ে বললেন — সাবাস বেটা! তুমহারা পিতাজীকা আশীর্বাদমেঁ তুম্ বচপনসে বহু অধীতী বন গয়ে। 'নির্বীজ সমাধি' কি বুঝবার আগে সবীজ সমাধি কি তাও তোমাদের বোঝা দরকার।

তিনি বলে চললেন — সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পর্কে ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন —

'বিতর্ক বিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।' (সমাধিপাদ-১৭)
বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব সংকারশেষোইনাঃ। (সমাদিপাদ-১৮)

সজীব বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ছয় প্রকার — ১) সবিতর্ক, ২) নির্বিতর্ক, ৩) সবিচার, ৪) নির্বিচার, ৫) সানন্দ ও ৬) সাস্মিতা।

বৈজ্ঞানিকরা যে বিষয়ে অনুধ্যান করেছেন, সেই সত্য হঠাৎ তাঁদের কাছে প্রকট হয় — তাও এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফলে। কিন্তু এই সমাধি তাঁদের স্থায়ী হয় না। তখন তাতে continuity থাকে না। তাঁরা ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী দ্বিপদপদ্মে হয়তো ধ্যান করেন না, কিন্তু তাই বলে তাঁদের এই ধ্যান বা সমাধি যে হয় না তা নয়। কারণ তাঁদের এই চিন্তা ও গভীর মনন চিতিশক্তিরই ক্রিয়া। যে সব নব নব আবিষ্কার তাঁরা করেন, তাও চিতিশক্তিরই প্রকাশ।

তেমনি কোন সঙ্গীতশিল্পী যখন কোন রাগ-রাগিনী নিয়ে বিভোর থাকেন — তাও একপ্রকার সবীজ সমাধি। যে আনন্দানুভূতির মধ্যে তাঁরা তখন জগতের সব কিছু ভুলে যান, তা সমাধির জন্যই হয়। কেউ যখন কোন বিষয়ে তন্ময় হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়, তখন তার বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ধ্যান ভেঙ্গে যাবার পর তাতে আর কোন continuity থাকে না।

'শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পযুক্ত চিত্তবৃত্তি যদি স্থূল বিষয়া' হয় তাহলে তাকে সবিতর্ক সমাধি বলে। 'গৌ'

এই বিষয় নিয়ে ধ্যান করলে গরুর মূর্ত্তি মানসপটে ভাসে। আবার একজন ইউরোপীয়ের কাছে 'গৌ' বিষয়ে ধ্যান করলে এইরকম ছবি ভাসবে না। cow এর ধ্যান করলে হবে। আবার গৌ শব্দের অর্থ শুধু গরু নয়, ইন্দ্রিয়, রশ্মি ইত্যাদিও হয়। শুধু গৌ শব্দ নিয়ে ধ্যান করলে এই সব বিভিন্ন অর্থও মনে উদিত হবে। গৌ শব্দের পরা অবস্থায় যখন ধ্যান হবে তখনই নির্বিতর্ক সমাধি হবে।

শিবম্ শিবম্ এই ধ্যান যদি নিরন্তর করা যায় তাহলে আমাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কারমত মনশ্চক্ষে জটাজূটধারী ত্রিশূলডমরুকারমর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত শিবের চেহারা দেখতে পাবো। শিবম্ শিবম্ এই কথাগুলো উচ্চারণের মধ্যে যে অতি স্বল্প সময়টুকু লাগে সেই ব্যবধানটুকুর মধ্যেই মনের ক্রিয়ার ফলে সংস্কারানুযায়ী এইরকম শিবের মূর্ত্তি ভেসে উঠবে।

এই রকম কোন বিষয়ের বিভিন্ন রূপ, অর্থ ইত্যাদি নিয়ে গভীর চিন্তা করতে করতে যে সমাধি হয় তাকে সবির্তক সমাধি বলে।

আরও গভীর ধ্যান করতে করতে যখন ধ্যেয় বিষয় সম্পর্কে এইসব শব্দ, রূপ, অর্থ হতে যেসব বিভ্রান্তি দূর হয়, তখন যে সমাধি হয় তা হল নির্বিতর্ক সমাধি। এমনিভাবে সবিচার ও নির্বিচার সমাধি হয়। পরের একটা স্তরে যোগীর গভীর আনন্দবোধ হয়। সেই আনন্দে সে ডুবে থাকে। এই আনন্দানুভূতি এত গভীর যে তাই বন্ধন হয়ে থাকে। তারপর ধ্যান গভীর হলে সেই ধ্যানে মগ্ন হয়ে যোগী অসীম আনন্দে আপ্লুত হয়। এই অবস্থাই হল সানন্দ সমাধি।

এই সানন্দ সমাধির সময়ও আমি সমাধিযুক্ত হয়ে আনন্দলাভ করছি। এই সূক্ষ্মবোধ থাকে। সেই সমাধি অবস্থাকে বলা হয় সাস্মিতা সমাধি। এ সবই সবীজ সমাধি।

শেষ অবস্থায় এই সাস্মিত সমাধির অস্মিতা খসে পড়ে। তখনই হয় নির্বীজ সমাধি। এই জন্য ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন 'তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।' সমাধি বিষয়ে আবার ঋষি বিভূতিপাদে বলেছেন — 'তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূণ্যমিব সমাধিঃ'। অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়মাত্র নির্ভাস।

স্বরূপশূণ্যের ন্যায় ধ্যানই সমাধি। স্বরূপশূণ্যতাটা কি ? শূণ্য আমরা জানি শূণ্যের অর্থ শুধু ফাঁকা, এই অর্থে। কিন্তু ঋষি পতঞ্জলি এই অর্থে শূণ্য শব্দটি ব্যবহার করেন নি। শূণ্য আসলে পূর্ণ। শূণ্য গোলাকার। তা হল বিন্দুরই পরিব্যপ্তি। বিন্দুর সমষ্টি নিয়েই ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা বা অ, আ, ক, খ প্রভৃতি অক্ষর সৃষ্ট হয়েছে। বিশ্বজগৎ এই শূণ্য দিয়েই পূর্ণ অছে। তাই ঋষি বলেছেন —

পূর্ণমদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলে পূর্ণই বাকী থাকে। zero থেকে ১ বা ১০০ বাদ দিলেও zero ই থাকে।

নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হলে তবেই উপায় প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় হয়। ঋষি বলেছেন তার জন্য প্রয়োজন — শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা।

শ্রদ্ধা কি ? পতঞ্জলি বলেছেন — চিতির স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংসিদ্ধ উর্ধগতির ফলে যোগীর মধ্যে যে সম্বেগ যে সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগে তার ফলে তার অন্তর্নিহিত চিদ্‌পুরুষ যিনি আনন্দম, যিনি সত্যম তাঁর প্রতি টান জাগবে। আকুতি জাগবে। নিরুক্তকার যাস্কাচার্য বলেছেন — 'শ্রৎ অস্যাম্ সত্যম ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা'। যার দ্বারা সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে বোধ জন্মাবে — একটানা নিরবচ্ছিন্ন এই বোধ জন্মালে, এই বোধে স্থিতি হলেই নিজের স্বরূপ স্থিতিতে রুচিটি দৃঢ় হবে। প্রগাঢ় হবে। আর যোগী এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হবেন যে সত্যই সার — সত্যই শ্রেয় — অমৃতলাভের এ ছাড়া পথ নেই। কাজেই পতঞ্জলি শ্রদ্ধার synonyme দিয়েছেন — অভিরুচিমতি নিশ্চয় বৃত্তি। সত্যের প্রতি এ ধরণের টান জন্মানো মাত্রেই সঙ্গে সঙ্গে যোগীর মধ্যে এক গভীর প্রশান্তিও দেখা দেবে। তাঁর সহস্রারে মস্তিষ্কের কোষে কোষে দিব্যজ্ঞানের ঢল দেখা দেবে। কারণ যিনি সত্যম, তিনিই চিৎ। তিনিই আনন্দ। চিতিশক্তির এই উর্ধ্বগতিকে ঋষি বলেছেন সম্প্রসাদ। এই ভাবে শ্রদ্ধা তথা অভিরুচিমতি নিশ্চয় বৃত্তি অর্থাৎ সম্প্রসাদ জন্মালে, বারেক অমৃতের আস্বাদন পেলে যোগী তাতেই নিত্যস্থিতির জন্য উন্মুখ হবেন। নিত্যস্থিতির পথে যেগুলি বাধা বা স্ত্যান — তা সবলে উচ্ছেদ করে যা অনিত্য, যা অসার, যা অধ্রুব, যা বিনাশশীল অর্থাৎ এই বস্তু জগৎ ও ভাবজগতের মোহ তা উহ এবং অপোহ করে যোগীর চেতনা ধীরে ধীরে ভাগবত চেতনায় রূপান্তরিত হবে।

আবার যাস্কাচার্য 'শ্রৎ' কি বলতে গিয়ে বলেছেন — 'শ্রদিতি সত্যনামসু পঠিতম্'। সত্য বলতে কি বলেছেন — 'কালত্রয়াবাধিতম্ সত্যম্।' কালত্রয় দ্বারা যা অবাধিত তাই সত্য। সত্য হল তা যা পূর্বে ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তা হল একমাত্র পরমাত্মা বা আত্মা (কারণ পরমাত্মা ও আত্মা মূলতঃ একই)। এই সত্যের বা পরমাত্মার নিয়ত মনন চিন্তন করা, সারকেই ধরা, একেই সার বলে বোঝা — তাই হল শ্রদ্ধা।

এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণজগতের Power of gravitation মুক্ত হয়ে বিন্দু স্থিতির জন্য প্রয়োজন বলের। এটা কোনমতেই কোন ক্লীব দুর্বলচিত্ত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যোগীর পক্ষে যে যোগীর মধ্যে চিতিধারার উদ্বোধন ঘটেছে তাঁর পক্ষেই সম্ভব। কারণ এই চিতি তাঁর মধ্যে সেই ধরণের সম্বেগ আনে যার দ্বারা তাঁর পক্ষে সকল কর্মমল, মায়িকমল, আণবমলের বাঁধন ছিঁড়ে কেবল তাতে মগ্ন হওয়ার জন্য অস্থির হয়।

বীর্য্য অর্থ রেতঃধারণ নয়। ঋষি পতঞ্জলিই বলেছেন — 'ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াম্ বীর্য্যলাভঃ'। (সাধনপাদ-৩৮) ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাতে বীর্য্যলাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য অর্থ ব্রহ্মে বিচরণ করা। সবই ব্রহ্মের প্রকাশ এই অনুভূতিতে যে বিচরণ করে সেই ব্রহ্মচারী। এই অবস্থা যখন হয় তখন বীর্য্যলাভ হয়। বীর্য্যলাভ হলে বৈরত্যাগ হয়। ঋষি আবার বলেছেন — 'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ' (সা-৩৫)। সন্নিধৌ অর্থ শুধু নিকটে নয়। সৎ + নিধৌ — সৎ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পুরুষের নিকটে যাওয়া তাই হল সন্নিধৌ। অহিংসা প্রতিষ্ঠাতে সেই সচ্চিদানন্দময়ের সান্নিধ্যে আসায় বৈরত্যাগ হয়। বীর্য্য হল বল এবং এই 'অবৈর' অবস্থা। সৎ এর প্রতি আকুতি, শ্রদ্ধা হলে এই বল ও বীর্য্য লাভ হয়।

এইভাবে চিতিধারার আরোহ গতির ফলে চিতিধারা উপরের দিকে তা যতই গুটিয়ে মূল চৈতন্যভূমির দিকে যাবে ততই যোগীর মধ্যে এই বোধ জাগবে যে স্থূলে প্রতিদিন তার যা নাম রূপ উপাধি ছিল সেটা সত্য পরিচয় নয় — সে স্বরূপতঃ শুদ্ধ বোধ স্বরূপ অপূর্ণ অবস্থায় চিতিধারার নিম্নঘাটে থাকার ফলে এই বোধ তার রুদ্ধ ছিল। এখন তার সেই রুদ্ধ অবস্থাটা কেটে গেলে, নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে তার পুনর্বোধ জাগলো। রুদ্ধ অবস্থা থেকে এই যে পুনর্বোধ — এরই পারিভাষিক নাম স্মৃতি।

'অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রোষ অর্থাৎ তাবন্মাত্রেরই গ্রহণ বা পুনরুভূতি (নূতনের অগ্রহণ) তাহাই স্মৃতি। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন — 'অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। (সমাধিপাদ-১১)।

বীজাঙ্কুর ন্যায়বৎ স্মৃতির উদয় হয়। অর্থাৎ বীজ হতে গাছ হয়, গাছে ফল হয়, ফলে বীজ হয়, সেই বীজ মাটিতে পড়ে আবার তা অঙ্কুরতি হয়, সেই অঙ্কুর ক্রমে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। এমনি ভাবে, তার জীবন প্রবাহ চলতে থাকে। একই রকমে কর্মবীজ থেকে জীব যে সংসারে জন্মগ্রহণ করে তা নিঃশেষ না হওয়া অবধি জন্মজন্মান্তর ধরে পুত্রপৌত্রাদির ভিতর দিয়ে বীজাঙ্কুর ন্যায়বৎ জীবন প্রবাহ বয়ে চলেছে। 'সংস্কার সাক্ষাৎ করুণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্'। সংস্কার সাক্ষাৎ হলে পূর্ব পূর্ব জীবনের বীজাঙ্কুর অবধি প্রথম যে স্ফোট হয়েছিল তা দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে।

এই শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতির উদ্দীপন চিৎশক্তির বলেই হচ্ছে, সবকিছুই তারই ঘাটে ঘাটে কূলে কূলে উত্তরণের ফল। নিজের অক্ষয় আনন্দ সত্তার পরিচয় পেলে পুনর্বোধ অর্থাৎ বোধের বোধন হলে স্বভাবতই তাতে যোগী মগ্ন হতে চাইবেন। পূর্ণঘাটে পৌঁছে এই যে মগ্ন হওয়া — তার নাম সমাধি। সমাধি মানে সমভাবে অধিষ্ঠান। চিতির ধারা নিম্নঘাটে প্রবাহিত হয়েছিল সেটাই vibrated হয়ে হয়ে তা বাসনা, কর্মাশয় সৃষ্টি করেছিল তার ফলেই সংসারী মানুষ বা যোগী সংসারের যা সং অর্থাৎ নাম রূপ উপাধির কুহেলিকায় অসমছন্দে অসমতলে দুলেছিল খেলেছিল এই বেতাল আর বেয়াড়া ঢেউ অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর প্রবাহে পড়ে সে খাবি খাচ্ছিল এবার তার ইতি হয়ে গেল এবং সে সমভূমিতে সেই অচ্যুতভূমিতে অমৃত আনন্দ স্থিতিতে পৌঁছে গেছে।

প্রজ্ঞা হল 'দগ্ধীভূত বীজস্য'। কর্মের বীজ, সেই আদিকর্মের বীজ যার জন্য জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান জন্ম হয়েছে, যা দগ্ধীভূত হলে আর পুনর্জন্ম হবে না — তার প্রকৃষ্ট জ্ঞান।

কর্মবীজে নাড়া দিয়ে চিতির ধারা নিম্নঘাটে জন্মমৃত্যুর অবিরাম অনাদি প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল — সেই চিতির ধারাই যখন উর্ধ্বভূমিতে withdrawn হয়ে কেন্দ্রায়িত হল তখন কর্মবীজ নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন সাধকের তন্মুখীনতা আসে। চিতিশক্তি ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠতে থাকে। কী করে এই চিতিশক্তির মহা

সমুত্থান হবে? সমাধিসিদ্ধ যোগী তাঁর নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। যোগী শিষ্যের দ্বিদলপদ্মস্থানে জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলিত করেছেন। তখন সেই শিষ্যের চিতিশক্তির বা চেতনার মহাজাগরণ হয়। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন নির্বীজ সমাধি হলে এই মহাজাগরণ হয়। তখন কৈবল্যলাভ হয়। এ ধরণের সমাধিকে নির্বীজ সমাধি বলা হয়।

ভবপ্রত্যয় বুঝতে পারলে যোগের সবকিছুই জানা হয়ে যাবে।

নির্বীজ সমাধি হলে কি হয় ঋষি বলেছেন প্রতিটি পাদের শেষ মন্ত্রটিতে।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব নিরোধ্যাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ (স ৫১) অর্থাৎ তারও (সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারেরও) নিরোধে সর্বনিরোধ হতে নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয়।

ততঃ পরমাবিশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্॥ (সাধনপাদ-৫৫) অর্থাৎ নির্বীজ সমাধি হলে ইন্দ্রিয়গণের পরম বশ্যতা হয়। কার পর ইন্দ্রিয়দের পরমা বশ্যতা লাভ হয়? 'ইন্দ্রিয়'ই বা কি? ইন্দ্রিয়দের পরমা বশ্যতা লাভ হলেই বা কি পুরুষার্থ লাভ হবে? যদি পুরুষার্থ লাভ হয় তাহলে ইন্দ্রিয়দের পরমা বশ্যতা কি?

সাধারণতঃ লোকে ধরে নিয়েছে ইন্দ্রিয় বলতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, চারটি অন্তরিন্দ্রিয়কে বুঝায়। 'ইদি' ধাতুর উত্তর রণ্ প্রত্যয় যোগে 'ইন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ হয়। ইন্দ্র অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যবান পরমাত্মা। বিকারার্থে 'ইয়' প্রত্যয় দ্বারা ইন্দ্র হতে 'ইন্দ্রিয়' শব্দ হয়েছে। অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যবান পরমাত্মা হতে বিমুখ করে যা আছে, তাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলোর বৃত্তি হল করণ ও গ্রহণ। মনই প্রকৃতপক্ষে অন্য ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে এই করণ ক্রিয়া ও গ্রহণ ক্রিয়া করায়। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন মনের নির্জ্জন অবস্থায় মনের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর ক্রিয়া কম কার্য্যকরী হয়। সুষুপ্ত অবস্থায়, অর্থাৎ সুন্দর ভাবে উপ্ত অবস্থায় যখন মনের কোন function থাকে না তখন মনের বা ইন্দ্রিয়গুলোর কোন কাজ হয় না। অর্থাৎ তখন এই করণ বা গ্রহণ হয় না।

ইন্দ্রিয়গুলোকে impetus দেয় মন। মনই তাদের পরিচালিত করে। ইন্দ্রিয়ের স্বপ্ন বিষয়ে মনই এদের আসক্ত করাচ্ছে। অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখাচ্ছে, রসনা দ্বারা আস্বাদ করাচ্ছে ইত্যাদি। এইভাবে চক্ষু, বাক প্রভৃতি সব ইন্দ্রিয়গুলোকেই — যা নয় তা মায়াকে ভুলভাবে গ্রহণ করাচ্ছে। পরমৈশ্বর্য্যবান ইন্দ্র থেকে, পরমেশ্বর থেকে উল্টা দিকে মুখ করাচ্ছে। সেই জন্যই এই ভুল করণ ও গ্রহণ ক্রিয়া যাদের, তাদের ইন্দ্রিয় বলে। এদের পরমা বশ্যতাতেই কৈবল্য লাভ হয়।

তাই বৈদিক ঋষি বলে গেছেন —

> 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

'শোনো, অমৃতের পুত্রগণ সবাই শোনো। আমি জেনেছি সেই মহান পুরুষকে, যাঁকে জানলে মৃত্যুর পারে যাওয়া যায় — আর কোন পথ নেই। মৃত্যুর পূর্বে তোমরাও তাঁকে জেনে নাও — তাছাড়া আর কোন পথ নেই।'

এই অমৃততত্ত্ব ভুলে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের বিষয়ে আসক্ত করাচ্ছে ও ভুলভাবে বিষয়গুলো গ্রহণ করাচ্ছে।

আনন্দে জাত, আনন্দে পরিবর্দ্ধিত, আনন্দেই লীন হবে সবাই — আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্তি, সংবিশন্তি — তাই আনন্দের অভীপ্সা সকলেরই আছে।

কিন্তু নিত্যবস্তু ভুলে গিয়ে, অমৃততত্ত্ব থেকে সরে গিয়ে, মর্ত্ত্য ক্ষর জগতে ভোগ্য বিষয়গুলিতে আসক্ত করে রাখছে ইন্দ্রিয়। আনন্দ অবস্থা থেকে দূরে রাখছে এই ইন্দ্রিয়গুলি।

তাই এই ইন্দ্রিয়গুলি জয় করতে হবে।

তাই এই মন্ত্রে বলেছেন — 'ততঃ' — তারপর — পরমাবিশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্। কার পর ইন্দ্রিয়গুলির পরমা বশ্যতা হয়ত তা তিনি পূর্বের সূত্রটিতে বলেছেন — 'স্ববিষয়াসম্প্রযোগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহার॥(৫৪) অর্থাৎ স্ববিষয় অসম্পারযোগ অর্থাৎ স্ববিষয়গুলো থেকে বিযুক্ত হলে ইন্দ্রিয়দের প্রত্যাহার হয়। ততঃ, তখন ইন্দ্রিয়দিগের বশ্যতা হয়।

এই ইন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যাহার অর্থাৎ এই আহরণ ক্রিয়ার উল্টো আসক্তি থেকে অনাসক্তি করতে হবে এদের (ইন্দ্রিয়দের) আপন বিষয় থেকে বিযুক্তি দ্বারা। তবেই তাদের পরমা বশ্যতা হবে। বিষয়ের প্রতি সংযুক্ত করা মনের ধর্ম: চক্ষুর বিষয় দর্শন, কর্ণের বিষয় শ্রবণ, নাসিকার বিষয় ঘ্রাণ, বাক্-এর বিষয় প্রকাশ করা — এইরকম স্ব স্ব বিষয়ে মনই এদের সংযুক্ত করছে। এই সংযুক্তি থেকে এদের বিযুক্ত করতে হবে। তাতেই হবে তাদের প্রত্যাহার। এদের ভিন্নমুখী করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলো অনিত্য মুখী আছে, তাদের নিত্যমুখী করতে হবে। তারা মর্ত্ত্যভাবে আছে, তাদের অমর্ত্ত্যমুখী করতে হবে। অল্প থেকে ভূমায়, তাদের নিয়ে যেতে হবে। ক্ষরমুখী থেকে তাদের অ-ক্ষরমুখী করতে হবে।

ঋষিরা ত বলেই খালাস। কি করে এই প্রত্যাহার করা যাবে? পাঞ্চভৌতিক এই দেহ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক পাণি পাদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার-অন্তরিন্দ্রিয়। এদের natural tendency-ই হল স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করা অর্থাৎ এই সব পাঞ্চভৌতিক বস্তুতে সংযুক্ত হওয়া। তাহলে কি করে এই ইন্দ্রিয়গুলোকে তাদের স্ব স্ব বিষয় থেকে বিযুক্ত করা যাবে?

পরম ঋষি তারও পথ বলে দিয়েছেন। ঋষিরা যে শুধু অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন তা নয়। ভূত জগৎ বিষয়েও তাঁরা অবহিত ছিলেন। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকরা ভূত জগৎ ও astral plane এর বিষয় নিয়ে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মনন করে নব নব সত্যের আবিষ্কার করেন। তাঁরাও ঋষি পদবাচ্য। কারণ তাঁদেরও চিতিশক্তির স্ফূরণের ফলেই এই সব ভূত জগতের নূতন নূতন আবিষ্কার সম্ভব হয়। তাঁদের intense thinking এর ফলেই চিতিশক্তির স্ফূরণের জন্য এই সব সত্য তাঁদের চিদগুহায় প্রকট হয়। শুধু ঋষিদের সঙ্গে তফাৎ এই যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা gross ভূতজগতের তত্ত্ব নিয়ে মগ্ন থাকেন — তাঁদের intense thinking এর ফলে ভূত জগতের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। আর বৈদিক ঋষিরা এই সব ভূতজগতের রহস্য সম্পর্কে ত অবহিত ছিলেনই - যার জন্য এই সব রহস্যের সমাধানও তাঁরা করে গেছেন — উপরন্তু ভূতজগতের বাইরে অধ্যাত্ম জগতের রহস্য, এমনকি দিব্যমণ্ডলের পরম রহস্যও তাঁরা সমাধান করে গেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান আজ জেনেছে যে পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম সত্ত্বা নয়। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা বহু বহুকাল পূর্বেই জেনেছিলেন যে পরমাণুই ক্ষুদ্রতম পদার্থ নয়। তার সূক্ষ্মতর অংশকে তাঁরা বলতেন 'তন্মাত্রা'। আবার তন্মাত্রেরও তন্মাত্রা আছে। ঋষিরা জেনেছিলেন এই পঞ্চ মহাভূতের তন্মাত্রা ও তন্মাত্রার তন্মাত্রা হল এইরকম —

| পদার্থ | তন্মাত্রা | তন্মাতার তন্মাত্রা |
|---|---|---|
| আকাশ (ব্যোম) | শব্দ | সর্বগামিতা |
| অগ্নি | তেজ | উষ্ণতা |
| অপ (জল) | রস | স্নেহ |
| ক্ষিতি | গন্ধ | কঠিনতম |
| বায়ু (মরুৎ) | স্পর্শ | প্রণামিতা (সঞ্চরণশীলতা) |

ঋষিরা জেনেছিলেন যে ইন্দ্রিয়গুলিও পদার্থ এবং তাই জড়। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার — এগুলি সবই পদার্থ, তাই জড়। এগুলো তাদের তন্মাত্রা এবং তন্মাত্রগুলো তাদের তন্মাত্রা থেকে তৈরী। ঋষিরা এও জানতেন যে পদার্থের কেন্দ্রবস্তুকে যদি কণা দিয়ে আঘাত করা যায়, তাহলে তার পরিবর্তন হয়। এই আঘাতের ফলে পদার্থের কণাগুলোর যদি অদল বদল করিয়ে দেওয়া যায়, কিছু যোগ বিয়োগ করে তাদের Electron, Proton ও Neutron এর অর্থাৎ তন্মাত্রের তন্মাত্রাগুলোর তারতম্য ঘটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আধুনিক বিজ্ঞানও এই একই সত্য আবিষ্কার করেছে।

ঋষি পতঞ্জলি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার বলতে এই ইন্দ্রিয় পদার্থের মূল উপাদান অর্থাৎ তন্মাত্রার তন্মাত্রাগুলোর অদল বদল বিষয়ই বলেছেন। ইন্দ্রিয় পদার্থগুলোর পরিবর্ত্তন হতে পারে যদি তন্মাত্রাগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে কণা দিয়ে ঘা দেওয়া যেতে পারে। চিৎ-কণা দিয়ে এই আঘাত দিতে হবে।

এই চিৎকণা দিয়ে আঘাত সম্ভব। তাই ঋষি জৈগীষব্য বলেছেন 'চিত্তৈকাগ্র্যাদ্ অপ্রতিপত্তিরেব ইতি।'

একমকে অগ্রে রেখে তন্মুখীন হলে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী দ্বিদলপদ্মস্থানে রেণুপূরিত আকাশে যে বিন্দু আছে — যেইখানে আত্মা সবারই মধ্যে আছেন, সেইখানে সমাহিত হলে আত্মজ্যোতির কণা ইন্দ্রিয় পদার্থগুলির তন্মাত্রার তন্মাত্রাগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত করে। ফলে ইন্দ্রিয় বিষয়গুলোর অনুবিন্যাস বদলে যায়। তাই তাদের প্রতি রাগ বা আসক্তি দূর হয়। তাকেই ইন্দ্রিয়গুলোর অপ্রতিপত্তি বলে। ঋষি বলেছেন — 'পদার্থাৎ চ শক্তিঃ প্রকতেঃ মহৎতীশক্তি উপজায়তে'। আবার ঋষি বলেছেন — 'অথ যদিদম্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকং বেশ্ম'।

ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী দ্বিদলপদ্মস্থানে ব্রহ্মপুরে দহরাকাশে আত্মা আছেন। সেইখানে একাগ্র হলে, নিদিধ্যাসন করলে, আত্মা সমাহিত হয়। চিত্তের একাগ্রতার ফলে বিষয়ে বিরাগ হয়। রাগ আসক্তি চলে যায়।

তখনই ইন্দ্রিয়গুলির পরমা বশ্যতা হয়। শব্দাদি বিষয়ে অব্যসন অর্থাৎ অনাসক্তি ইন্দ্রিয় জয় ঘটায়। ইন্দ্রিয়গুলোর তন্মাত্রাতে চিৎকণার আঘাতের ফলে ইন্দ্রিয়গুলোর তন্মাত্রা রূপান্তরিত হয়। তখন ইন্দ্রিয়গুলো আর স্ববিষয় গ্রহণ করতে পারে না, তা থেকে আহরণ করতে পারে না। তাই তখন ভোগরাগের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলোর ভোগের ইচ্ছাই জীবকে টেনে রাখে, তা আর কার্য্যকরী হয় না। তাই তখন ইন্দ্রিয়গুলির পরমা বশ্যতা হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈব্যলমিতি॥ (বিভূতিপাদ-৫৫) অর্থাৎ কৈবল্য কি?

পুরুষার্থশূণ্য গুণগুলির (সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ) প্রতি প্রসব (অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া) — তাই হল কৈবল্য বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। স্বরূপে, অর্থাৎ আপনরূপে প্রতিষ্ঠা। আত্মা জীবদেহে খণ্ডের মধ্যে আসার ফলে যে খণ্ডবোধ এসেছে, তা অবিদ্যার জন্য। এই অবিদ্যা দূর হলে প্রত্যেকেই যে স্বরূপতঃ সৎ চিৎ ও আনন্দ এই বোধ হয়। এই স্বরূপ বোধ প্রতিষ্ঠাতেই কৈবল্য লাভ হয়। এই স্বরূপ প্রতিষ্ঠাই চিতিশক্তি। তাই হল চিতিশক্তির চৈত্যপুরুষে লয়।

এই চিতিশক্তিই স্বেমহিম্নি কারণাতীত ভূমিতে নিজেই প্রকাশের জন্য আদিকর্মের তাগিদে জীবাত্মা অভিমানে নীচের ঘাটে নেমে আসে। তখন তার উপর আণবমল, মায়িকমল ও কর্মমলের Coating পড়ে। চিত্ত হল চিৎ বা চিতিশক্তিরই বিকার অবস্থা। যখন উপরের দিকে তার ঊর্দ্ধায়ন হয়। তখন এই চিতিশক্তিই উপরের দিকে উঠতে থাকে।

কী করে এই চিতিশক্তির মহাসমুত্থান হবে? ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন নির্বীজ সমাধি হলে এই মহাজাগরণ হয়। তখন কৈবল্য লাভ হয়। যোগীদের তখন ভবপ্রত্যয় হয়।

পুরুষার্থ শূণ্যানং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃকৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি॥ (কৈবল্যপাদ ৩৪) অর্থাৎ কৈবল্য লাভ হলে কি হয়?

কৈবল্যলাভ কিভাবে হয় তা বলতে গিয়ে ঋষি বলেছেন — 'তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যমং॥ ২৫॥ আবার বলেছেন' — বিবেক খ্যাতির বিপ্লবা হানোপায়ঃ॥ ২৬॥ তদভাবাৎ তাহার অভাব হতে — কিসের অভাব হতে এবং কি হয়? ২৪ নং সূত্রে আছে — 'তস্য হেতুরবিদ্যা'। তার হেতু অবিদ্যা। এই অবিদ্যার জন্য সংযোগের অভাব থেকে 'হানং' হয়। এই হানক্রিয়াটি কি? ছেলেবেলা থেকে সবাই শুনে আসছি অবিদ্যা হল অজ্ঞানান্ধকার। বিদ্ ধাতু জ্ঞানে। এই জগতে যা দেখছি তা নয়, তবু তাই মনে হয়। এটাই অবিদ্যা, জ্ঞানের অভাব। হানক্রিয়া হল যাকে যা দেখছি তা তার সত্য স্বরূপ নয় জানা আছে, তবুও তাকে তাই মনে করা। যেমন — বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, শত্রু। প্রকৃতপক্ষে সকলেই মূলতঃ সৎ পুরুষই এক ছাড়া দুই নেই জানা আছে, — তবু এই হানক্রিয়ার জন্যই এদের স্বরূপ ভুলে গিয়ে আরোপ করা বাবা, মা ইত্যাদি বোধই আমাদের হয়।

তারপর বিবেকখ্যাতি হলে 'হান' অবিপ্লবা' হয়। হান হল কোন বিষয়ের জ্ঞান যখন ভুলে যাই। অবিপ্লবা শব্দটি অত্যন্ত গভীর অর্থবহ। বি + প্লবা = বিপ্লবা। বি - বিশেষণে আবার বি-বিগত (অভাব) অর্থেও হয়। প্লব ভাসমান এই অর্থ। যখন বিশেষভাবে ভাসমান না হয় - তাই অবিপ্লবা। এটি অভাব অর্থে। আবার বিগত ভাসমান যে অবস্থা এটাও অবিপ্লবা। (অনা বি বিগত প্লবা ভাসমান)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঊর্ধের দিকে পান করায় চিতিশক্তিকে যা, তাই হল উপায় প্রত্যয়। নীচের ঘাটে এসেছে যে চিতিশক্তি তা যখন ঊর্দ্ধমুখী হয়ে স্বরূপে ব্যবস্থিত হতে চায়, স্থিতিস্থাপকতা ফিরে পেতে চায়, তার

জন্য শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা হয়। এই সমগ্র ব্যাপারটাই হল উপায় প্রত্যয়। নির্বীজ সমাধি লাভের পর যোগীদের এই উপায় প্রত্যয় হয়। প্রত্যয় হল আত্মস্বরূপের অভিতঃ (দিকে) গমন।

বৈদিক ঋষিরাও কোন বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার সময় তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিপাদ্য বিষয় প্রথমেই বলে দিতেন। যাতে বিষয়বস্তুটি তার স্পষ্ট ধারণা হয়। ঋষি পতঞ্জলিও তাঁর যোগদর্শনসূত্রে সমাধিপাদে বলে দিলেন সমাধিলাভের পর কি হয়। তারপর সাধনপাদে, সাধনপথে কিভাবে অগ্রসর হতে হয় এবং বিভূতিপাদে চিতিশক্তির অভ্যারোহণ পথে যে সমস্ত বাধা স্ত্যান আসে তার কথা ও কি করে সেগুলো অতিক্রম করতে হয় তার কথা বললেন। অবশেষে কৈবল্যপাদে সমাধিলাভের পর কি হয়, কি পায়, তা ব্যাখ্যা করে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন।

নির্বীজ সমাধি লাভের জন্য আর একটি প্রত্যয়ের কথা ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন তা হল ভবপ্রত্যয়। ঋষি পতঞ্জলির উক্ত যোগসূত্রের সমাধিপাদের ১৯নং সূত্রটি হল — 'ভবপ্রত্যয়ো বিদেহলীন প্রকৃতিলয়ানাম্'।

ভবপ্রত্যয় বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের হয়। ভবপ্রত্যয় যোগীদের হয়। বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীন যোগীদের বিশেষ উপলব্ধ অবস্থা। বি-দেহ-শব্দটির অর্থ অতি উপাদেয়। এটি একটি অতি সুনির্বাচিত শব্দ। বি বিপরীতার্থে হয়, যেমন বিগত হয় আসক্তি যার বিরক্ত। আবার বিশেষার্থেও বি হয় যেমন বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষ ভাবে ন্যাস বা স্থাপন বিন্যাস। বিশেষ দেহ অর্থাৎ বৈন্দব দেহ হল বিদেহ। আবার অভাব অর্থেও বি ব্যবহৃত হয় যেমন বিগত হয়েছে দেহ যার বিদেহ। বিদেহ শব্দটিতে এই তিনটি ভাবই আছে — দেহের বিপরীত, বিশেষ দেহ, বৈন্দব দেহ ও বিগত দেহ (বিশুদ্ধ দেহ ও)। যোগীদের একই সঙ্গে দেহহীন, বিশেষ দেহ ও বিশুদ্ধ দেহ হয় এবং নির্মাণ চিত্ততার সাহায্যে সেই অবস্থায় জীবানুগ্রহের জন্য কল্পান্ত অবধি থাকেন। প্রকৃতিলীন হল মূলা প্রকৃতিতে লীন হয়ে গেছেন যিনি। নির্মাণকার চিত্ত যোগীর প্রকৃতিলীন অবস্থা হয়। তারা তত্ত্ববিষুবৎ-এর ক্ষেত্রে নির্ম্মাণ শরীর নিয়ে থাকেন। প্রকৃতিলীন অবস্থা ওরই কাছাকাছি অবস্থা। তত্ত্ববিষুবৎ এর ক্ষেত্র থেকে বিদেহলীন যোগিরা জগতের কল্যাণের জন্য সম্যক যোগ্য শিষ্যকে সাহায্য করেন। তাঁদের নির্মাণ চিত্তদেহ নিয়ে তাঁরা ইচ্ছে করলে যোগ্য আগ্রহী আত্মাকে সাহায্য করেন পরম অভিলষিতের দর্শন লাভে। বিদেহলীন যোগীদের ভবপ্রত্যয় হয়। প্রকৃতিলীন যোগীরা তত্ত্ববিষুবৎ ক্ষেত্র হতে একটু নীচে অবস্থান করেন। দুই জনের তফাৎ সাধারণ থেকে বুঝতেই পারবে না।

বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীন হলে যোগীর চিতিশক্তি ধাপে ধাপে এসে এমন স্তরে ওঠে যে তার পরমসত্ত্বার প্রতি গমন হয়। লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখে (প্রতি) গমনই হল প্রত্যয়। প্রতি পূর্বক অয় ধাতু অল্ যোগে। এই প্রত্যয় ও পরমপদের সঙ্গে যোগ নির্বীজ সমাধিলাভ হলে তবেই হয়।

নির্বীজ সমাধি লাভ হলে তবেই উপযুক্ত পথে পরমপদের দর্শন লাভ হতে পারে। আমি এই তত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভে যে পথের উল্লেখ করেছিলাম তা এখন একে একে বলব।

ঋষিরা বলেছেন, পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে আত্মস্থানে অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকে আছেন। মাথাটা বেঁকিয়ে পিছন দিকে হেলালে যেখানে একটা টোল পড়ে সেই জায়গাটাই হল মস্তকগ্রন্থি। এখানেই আজ্ঞাচক্রের* কেন্দ্র। ধ্যানবিন্দু উপনিষদের মতে — এই স্থানটিই আত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র — হৃদিস্থানে আজ্ঞাচক্রং বর্ততে। তন্মধ্যে রেখাবলয়ং কৃত্বা জীবাত্মরূপং জ্যোতিরূপমণুমাত্রং বর্ততে। আজ্ঞাচক্রই প্রকৃত হৃদয়। প্রকৃত অধ্যাত্মসাধনা অর্থাৎ আত্মার অধিরোহনপর্ব এখান থেকেই সুরু হয়। এই স্থানে ধ্যান করলে পিতৃসাধনা সুরু হয়। দিব্যজ্যোতির প্রকাশ ঘটে। এই জ্যোতি হঠযোগী ক্রিয়াযোগী তান্ত্রিক প্রভৃতি আবিষ্কৃত চোখ-কান টেপা, ন্যাস প্রাণায়াম কুম্ভকের কুহেলিকা নয়, মায়া কী প্রাঙ্গণমেঁ মজে কা খেল্ নয়, কোন বাহ্যিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রহেলিকা নয়, এই জ্যোতিই প্রকৃত চৈতন্য রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র।

অকল্পিতোদ্ভবং জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ প্রকাশিতম্<br>
অকস্মাৎ দৃশ্যতে জ্যোতিস্তৎ জ্যোতি পরমাত্মনি।

---

* মস্তিষ্ক মধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র হতে নিঃসৃত চিদাত্মক জ্ঞানশক্তি এই কেন্দ্র হতে নিয়মিত Controlled & regulated হয়ে স্থূল শরীরে আসে বলেই ঐ কেন্দ্রের নাম আজ্ঞাচক্র।

যে জ্যোতি বিনা কল্পনায় বিনা প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়, যে জ্যোতি স্বয়ং প্রকাশিত হয় এবং যে জ্যোতি হঠাৎ দেখা যায়, সেই জ্যোতি পরমাত্মার জ্যোতি। এই পরমাত্ম জ্যোতিতেই পিতৃলোক উদ্ভাসিত।

আইনস্টাইন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি শক্তিকে সংকেতের সাহায্যে বলেছেন $E=MC^2$ অর্থাৎ আদ্যাশক্তি আলোগতি রূপে বিভিন্ন অনুপাতে প্রত্যেক পদার্থে সন্নিবিষ্ট আছেন। প্রত্যেক পদার্থই আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ (১৪/৩)। অংশ বলতে সবাই ভাগ বুঝলেও পূর্ণের কোন ভাগ বা খণ্ড হয় না। অংশ অর্থ অংশু বা কিরণ। বৈদিক পরিভাষায় স্ফুরজ্যোতি। সকল জীবই সেই একই ব্রহ্মশক্তির স্ফূরিত জ্যোতির ধারা মাত্র।

ঋষি দীর্ঘতমা ঐ আদ্যশক্তিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —

সা চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্তং বিদ্যুদ্ভবনী প্রতি ব্রহিম্ ঔহৎ। (ঋ১।১৬৪।২৯)

অর্থাৎ তাঁর চঞ্চল গতি সমূহের চরণপাতে অর্থাৎ সংঘাত সৃষ্ট প্রত্যেক মর্ত্যজাত পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎরূপা হয়ে নিজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেন।

আইনস্টাইন যাঁকে বলেছেন আলোগতি। বৈদিক-বৈজ্ঞানিক দীর্ঘতমা তাঁকেই বলেছেন — বিদ্যুৎগতি। এই যে বিদ্যুৎরূপা শক্তি, বা চৈতন্যধারার কথা বলা হ'ল, ঐ শক্তি বৃত্তধর্মযুক্তা, বৃত্তধর্মসৃষ্টিকারিণী অর্থাৎ বৃত্তাকারে ঐ তেজের ঢল নেমে আসে, বৃত্তকারেই কেন্দ্রীভূত হয়। একথা সবাই জানেন, একটি বিন্দু কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রসারতা লাভ করলে একটি বৃত্ত হয়। বৃত্তের সাধারণতঃ পরিধি পর্যন্ত সর্বাঙ্গের প্রত্যেকটি বিন্দু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে আবার কেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। বৃত্তের সাধারণ ধর্ম বহির্মুখী (Centrifugal) হলেও এর প্রত্যেকটি অঙ্গ-বিন্দু যুগপৎ কেন্দ্রোন্মুখীও (Centripetal) হয়, যুগপৎ চর ও অচর। শব্দ বা বাক্ অর্থাৎ স্পন্দন (vibration) বৃত্তাকারে চরাচর বিশ্বভুবনময় বিস্তারিত হওয়ার ফলেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি-বিজ্ঞানের রহস্যই এই। প্রত্যেক পদার্থ ঐ তেজ বিদ্যুৎ বা শক্তির তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রত্যেক তরঙ্গের মধ্যে পূর্বোক্ত আদিশক্তি বিদ্যুৎরূপে অবস্থিত। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হ'ল যে ঐ শক্তি বিদ্যুৎরূপা হ'য়ে বৃত্তধর্মী তরঙ্গরূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও পরিচালনা করছেন।

ঋষিদের মত আজকাল বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করছেন যে সৃষ্টির মূলে স্পন্দন — Vibration, Sound বা শব্দ। স্পন্দনের মাত্রা (Wave-length) এবং ঘনত্বের (Pitch) তারতম্যানুসারে জগতের বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি। সৃষ্টির মূল কারণীভূত স্পন্দনের মাত্রা ও ঘনত্বের অন্তর্নিহিত জীবনী বা তেজশক্তিই এক একজন দেবতা। বেদজ্ঞানবিরহিত তথাকথিত সাধু যোগী তান্ত্রিক ও পুরাণের বর্ণনানুসারে দেবতারা বর্তমানে ভক্তদের কাছে মানবাকৃতি হয়ে পড়লেও উপরের গূঢ়রহস্য মনে রেখে ঋগ্বেদে দেবতার অন্য নাম দেওয়া হয়েছে — স্পন্দ্রা। স্পন্দ্রা মানে স্পন্দনের অন্তর্নিহিত অগ্নি তেজ বা প্রাণশক্তির 'র' অর্থাৎ প্রকাশ বা বিস্তৃতি। জীবনীশক্তির (Energy) ক্রিয়ায় সর্বদাই দুটি রূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে — পুরুষ (Static) ও প্রকৃতি (Dynamic), সুতরাং দেবতারা বেদের ভাষায় — 'সযোষা', যোষিৎ বা স্ত্রী সহ; সেইজন্যই শক্তি সহ শিব, মাতাসহ পিতা, অঙ্গাঙ্গীভাবে অর্ধনারীশ্বর। মাতাপিতার প্রত্যক্ষ সেবা পরিচর্যা দ্বারা দেহমল, মনমল, চিত্তমল শোধন হয়, সেই সঙ্গে তাঁদেরকে জীবন্ত ঈশ্বর-ঈশ্বরী জ্ঞানে প্রকৃত আজ্ঞাচক্রে ধ্যান জপ করলে চিতিশক্তির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ ঐ বিদ্যুৎরূপা শক্তির লহর বা ঢলের উত্তরণ ও অবরোহন প্রতি বস্তুতে ছন্দায়িত হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন অজস্র ঢেউ অনবরত উঠানামা করছে, তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে; ঐ বিদ্যুৎরূপা মহাশক্তির সৃষ্টিবিক্রিয়ারও বিরাম নাই। সমুদ্রের তরঙ্গ প্রথমতঃ হাতের কনুই ভাঙার মত উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে নিম্নে পতিত হয় অর্থাৎ তার গতি ভঙ্গিমাটি ভুজের মত গমন করে অর্থাৎ ভুজগ; তর্‌তর্ করে গড়িয়ে সংস্কৃত ভাষায় সৃপ্ করে অগ্রসর হয়, তাই এর এক নাম সর্প (সৃপ ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন, বিদ্যুৎরূপা ঐ মহাতেজের লহর সৃপধর্মী)। সমুদ্রের ঢেউ গর্জে উঠে অগ্রসর হওয়ার সময় কুণ্ডলী (হ্বর) পাকায়, ঐ দিব্যশক্তির খেলাও তদ্রূপ, সেইজন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে কুণ্ডলিনী বা হ্বার। সমুদ্রের জল যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে স্প্রিংএর মত সহসা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে সেই রকম ঐ আদ্যাশক্তির চিদ্‌ধারাও কুণ্ডলী পাকিয়ে স্প্রিং এর মত উর্ধ্বে নর্তনশীলা হয়ে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতের সমূহ বস্তু সৃষ্টি ও নিয়মন করে চলেছে। সেইজন্য এর অপর নাম — পৃদাকু। দূর প্রান্তের পরিধি পর্যন্ত সমুদ্রের

ঢেউ এগিয়ে যায় সত্য কিন্তু জল যেখানে ছিল সেইখানেই থাকে, জল এগিয়ে যায় না। আদ্যাশক্তির ধারাও সৃষ্টির স্তরে স্তরে উছল হয়ে উঠলেও তা কোন মতেই সৃষ্টির যে ঋতম্, ছন্দ বা লঙ্ঘন করে না; অতিক্রম করে না, এগিয়ে যায় না — ন+আগ=নাগ। বাস্তব জগতে সর্প নামক জীবের চলন-গমনে এই সমস্ত ধর্মই দেখা যায়, তাই ঐ মহাচৈতন্যের ধারাকে ভুজগা, নাগ, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে; অননুভবী ও মূর্খদের কল্পিত ধারণানুযায়ী সত্য সত্যই মানুষের Spinal Cord এর মধ্যে লিঙ্গমূলে ঐ রকম কোন সর্পাকৃতি বস্তু সুপ্তাবস্থায় পড়ে নাই। যাঁরা বৈদিক মহাযোগে সিদ্ধকাম কিংবা যাঁরা বেদাধ্যায়ী তাঁরা সবাই জানেন, আদ্যাশক্তি বা ত্রিজগৎব্যাপ্ত ঐ মহাচিতিশক্তির খেলা অর্ন্তদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেই ঋগ্বেদের ঋষি সূর্যরশ্মির অন্তর্নিহিত তড়িৎশক্তিকে 'সসপরী বাক্' বলে বন্দনা করেছেন। অর্থববেদেও (১০।৪।২৩) অগ্নি, ওষধি, জল ও বিদ্যুৎজাত সৃপধর্মী তেজ বা তড়িৎকণার মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

সসপরীবাক বহুধা মহান্তি মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্যেন স যোনিঃ॥

— ঐ সৃপধর্মী দিব্যতড়িৎ কণাই মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যলোকের মূল সৃজনীধারা, তার দ্বারাই, সৃষ্টির ঐশ্বর্য বহুধা বিকশিত হয়।

এই মস্তকগ্রন্থি থেকে একটু উপরে যেখানে ব্রাহ্মণরা শিখা বাঁধে সেই জায়গাটাকে শিখাস্থান বলে। ঐ শিখাস্থানের কাছাকাছি একটা জায়গায় আত্মা আছে। সেই জায়গাটাই হৃৎপুণ্ডরীক। সুষুম্না এই স্থান হ'তে দু'ভাগ হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়েছে। আজ্ঞাচক্র হ'তে সম্মুখস্থ ললাট প্রদেশের অভ্যন্তর পথে অর্ধবৃত্তাকারে বেঁকে ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে তার একটি মুখ, অপর মুখটিও অর্ধবৃত্তাকারে বেঁকে ব্রহ্মরন্ধ্রের অপর পাশে গিয়ে ঠেকেছে বটে তবে সেটি গিয়েছে আজ্ঞাচক্রের পেছন দিক দিয়ে। এই উভয় পথই শূন্যনালী অর্থাৎ আকাশময়। ব্রহ্মতালুদেশে সুষুম্নার ঐ দুই মুখের মধ্যস্থলে ব্রহ্মরন্ধ্র। ব্রহ্মরন্ধ্রের অর্থ, যে রন্ধ্র বা ছিদ্র দিয়ে ব্রহ্মমার্গে জীবাত্মার উৎক্রমণ ঘটে, কিংবা যে রন্ধ্র দিয়ে পরমাত্মা শরীরস্থ সীমায়িত স্থানে এসে জীবাত্মারূপে প্রকট হ'ন। ঐতরেয় উপনিষদে (১।৩।১২) এই তত্ত্ব বিশদীকৃত করতে গিয়ে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা মাতৃগর্ভস্থ শিশুর তালু ভঞ্জ্ বা বিদীর্ণও করে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জীবরূপে প্রতিভাত হ'ন। ব্রহ্মরন্ধ্রের সুষুম্নাস্থানে এই বিদারণ ক্রিয়া হয়, তাই তার নাম বিদৃতিদ্বার। ভঞ্জ্ করে আসেন বলে তাঁর নাম — ভগ। ঋগ্বেদে তাই প্রাচীন আদি দেবতার নাম ভগ, এখন বলা হয় ভগবান।

মস্তিষ্কের পশ্চাৎ ভাগস্থ সুষুম্নাপথে ব্রহ্মরন্ধ্র হতে নিবৃত্তিমূলক শক্তি এবং সম্মুখস্থ সুষুম্নাপথে প্রবৃত্তি মূলক শক্তি আজ্ঞাচক্রে আসে বা জাগে। এই নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি শক্তির দুটি ধারাকেই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল বলা হয়। ইতর যোগীদের ধারণামত ধ্যানাবস্থায় সত্য সত্য দুই পাঁপড়ি বিশিষ্ট কোন পদ্ম ফুল ফোটে না।

শৈবাগমের ঋষি ঐ আজ্ঞাচক্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন,

যঃ করোতি সদা ধ্যানম্ আজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতম্।
পূর্ব জন্মকৃতং কর্ম বিনশ্যতবিরোধতঃ॥

যিনি সর্বদাই প্রকৃত আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদলের ধ্যান করেন, তাঁর পূর্বজন্মকৃত সমূহ কর্ম অবাধে বিধ্বস্ত হয়।

স্বয়ং সদাশিব বলেছেন, দ্বিদলপদ্মে ধ্যানের মহিমা আমিও সম্যক বলতে পারি না। যে করবে সেই জানবে যে এই ধ্যানের ফলে বিচিত্র বিচিত্র ফল দিব্যানুভূতি ও দিব্যশক্তি আশাতীত ভাবে লাভ করা যায়,

দ্বিদলধ্যানমাহাত্ম্যং কথিতুম্ নৈব শক্যতে।
যঃ করোতি স জানাতি বিচিত্র ফলসম্ভবম্॥

ঐ আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বে মস্তক মধ্যস্থ ব্রহ্মতালু বা ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদল পদ্মের বিকাশ স্থল। সহস্র শব্দের অর্থ এখানে অনন্ত। অনন্ত শক্তির আধার বলে এই কেন্দ্রকে সহস্রদল কমল বলা হয়। বিভিন্ন চক্র, দল, অক্ষর ও দেবতাদিতে যত রকমের শক্তি ও জ্যোতির প্রকাশ আছে, তাদের সমষ্টি কেন্দ্র এটি। শূন্যের মধ্যে বা গ্রামাফোন রেকর্ডের মধ্যে যেমন শব্দ বা সুরশক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, সেই রকম এই সহস্রদল কমলের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের মূলীভূত দিব্যতেজ নিহিত রয়েছে। এই কেন্দ্র উজ্জীবিত হ'লে উদয়কালীন সূর্যের মত শ্বেতবর্ণের জ্যোতিতে দীপ্তিমন্ত হয়ে উঠে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন উর্ধ্বাকাশ হ'তে আলোগতি যখন ছুটে আসে তখন তার আকার ইংরাজী 'ভি'

অক্ষরের (V) মত। পূর্বকথিত আদ্যাশক্তির তেজও যখন ভূমণ্ডলে প্রকট হয় তখনও তার আকৃতি দাঁড়ায় ঐ 'ভি' এর মত। কিন্তু বিদৃতিদ্বার দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে জীবদেহে ক্রিয়মান হওয়ার সময় তার গতি হয় উল্টা 'ভি' অর্থাৎ 'Λ'। ঐ তেজ যখন ঊর্ধ্বায়িত হয় অর্থাৎ সাধনার দ্বারা জীবাত্মা ঊর্ধ্বপথে অগ্রসর হলে সেই জীবাত্ম-জ্যোতির রূপ হয় 'V' এর মত। এটি যোগীর উত্তরায়ণ পথে উত্তরণ পর্ব।

সহস্রারাদি দিব্যকেন্দ্র প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ ব্যোমমণ্ডলে বিরাজিত। শিবসংহিতার ভাষায়,

অতঊর্ধ্বং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহং
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদম্।।

— আজ্ঞাপদ্মের ঊর্ধ্বদেশে ঐ দিব্যসহস্রদল কমল, ব্রহ্মাণ্ডাখ্য এই দেহের বহির্দেশে বিদ্যমান। অর্থাৎ এই কেন্দ্রের বিস্তারের মধ্যেই স্থূলদেহ। এই কেন্দ্র পরম নির্বাণের স্থান।

তস্য মধ্যান্তরালে শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগিগমনং,
নিত্যানন্দাভিধানং পরমবোধিপদং শুদ্ধবোধপ্রকাশং।
কেচিদ্ ব্রহ্মাভিধানং পদমতি সুধিয়ো বৈষ্ণবং তল্লপন্তি,
কেচিৎ হংসাখ্যমেতৎ কিমপি সুকৃতিনো মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং।।

যাঁরা শৈব তাঁদের কাছে ঐ স্থানই পরমশিবপদ কৈলাসক্ষেত্র, যোগীদের কাছে চিরায়ত আনন্দের শান্তিবন তূরীয় ব্রহ্মপদ, সুধী বৈষ্ণবদের নিকট বিষ্ণুর পরম অব্যয়পদ, রামভক্তদের কাছে সাকেতভূমি অযোধ্যা, শাক্তদের কাছে মহাশক্তিপীঠ, নাথ ও সিদ্ধদের নিকট এটিই হংসপদ, আবার কোন কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তি একে মোক্ষপদের দ্বার বলে কীর্তন করেন।

আজ্ঞাচক্রের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে অথচ সহস্রদলকমলের কিঞ্চিৎ অধোভাগে নিষ্কলঙ্ক সুধাস্রাবী চন্দ্রমণ্ডল আছে। এই চন্দ্রমণ্ডলের অন্ত হতে মধ্যভাগ পর্যন্ত এক আনন্দময় দিব্যস্থানে বিদ্যুদাকার এক ত্রিকোণ যন্ত্র আছে —

ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি চ সততং বিদ্যুদাকাররূপং। — এই ত্রিকাণাকার যোনিমণ্ডল পরাপ্রকৃতির চরম পরম অবস্থা, এখানেই প্রণবের অর্ধচন্দ্রাকৃতি মহানাদ নিত্যপ্রকট। এই নাদমুখে ত্রিভুবনের মুক্তিদায়ক সদানন্দময় সদাশিব অর্ধনারীশ্বর রূপে নিত্য বিরাজিত,

লোকানাং যুক্তিজনকো লোকানাং মুক্তিদায়কঃ।
সদানন্দকরো দেবশ্চার্ধনারীশ্বরো বিভুঃ।।

— এই অর্ধনারীশ্বরের জ্যোতিতেই দিব্য পিতৃলোক উদ্ভাসিত আছে। ভগবান অর্ধনারীশ্বরের চিদ্‌বীর্য প্রাণচৈতন্য মায়াশক্তির আশ্রয়ে স্থূলরূপে যখন বিকাশোন্মুখ হয় তখন তা সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ ব্যোমমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হয়। রহস্যময় সৃষ্টিধারার ক্রম বজায় রাখার জন্য প্রকৃতির বিধানে মাতাপিতা যখন উভয়ে মিলিত হ'ন, তখন তাঁরই চিদ্‌রশ্মি পঞ্চীকরণের নিয়মানুসারে রজোবীর্যের সংযোগে মাতৃগর্ভে পাঞ্চভৌতিক শরীর গঠনে সাহায্য করে। তারই পরিণাম আপন আপন মাতাপিতার পুত্রকন্যা রূপে জন্মলাভ। সচ্চিদানন্দ অর্ধনারীশ্বরের ক্ষেত্র হ'তে ঐ ধারা নেমে আসে বলে মা বাবার আপন সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে, তাঁরা সন্তানের জন্য সদা কল্যাণ কামনায় তৎপর হয়ে থাকেন। পুত্র-কন্যার পক্ষে তাই মাতাপিতার ঋণ অপরিশোধ্য। পুত্রকন্যা যদি মাতা-পিতাকে ঐ অর্ধনারীশ্বর জ্ঞানে এই পথে অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বরক্ষেত্র হতে পূর্বোক্ত চিত্‌রশ্মিপথে (যা তার আপন আজ্ঞাচক্রে রয়ে গেছে) ধ্যান করেন, তবে ঐ অর্ধনারীশ্বরক্ষেত্র সহজেই উদ্দীপিত হয়, ঐ চিত্‌রশ্মির টানে উত্তরণের পথ সহজ হয়। তার ফলে অন্তে সান্দ্র ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। নিজ জীবনে কৃতকৃত্য ও চরিতার্থ হওয়ার এটি গুহ্যতম সিদ্ধপথ।

মহাযোগেশ্বরদের মতে, ইহস্থানং জ্ঞাত্ব নিয়তনিজচিত্তোনরবরো ন ভূয়াৎ সংসারে কুচিদপিচ বদ্ধস্ত্রিভুবনে।

এই রহস্য জ্ঞাত হয়ে যিনি নিজ চিত্ত এইরূপে ধ্যানের পথ লীন করতে পারেন, তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের কোন স্থানে আর আবদ্ধ হ'ন না, তাঁকে আর সংসারে জন্মগ্রহণও করতে হয় না।

তাই বেদে ঋষি প্রার্থনা করেছেন—

ভগভক্তস্য তে বয়ং উদশেম তবাবসা মূর্ধ্বানং রায়ঃ আরভে।। (ঋগ্বেদ ১।২৪।৫)

হে প্রভু, হে বরণীয় ভর্গদেবতা, এই পথ অনুসরণ করে জীব যেন প্রাণস্রোতের মূর্ধ্বাতে উজান বেয়ে চলে যেতে পারে।।

সমর্থ গুরু কৃপা করে যোগ্য শিষ্যের চিতিশক্তিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য এই বিদৃতিদ্বারটি খুলে দেন। তা না হলে জ্ঞান লাভ দ্বারাই শুধু জন্ম জন্মান্তরের পর এই রুদ্ধমুখটি খুলে যায়। অন্য আর কোন উপায় নেই।

শিষ্যের পূর্ব পূর্ব জন্মের অর্জিত শুভ সংস্কারের ফলে — অর্থাৎ তার সম্যক জ্ঞান লাভ হওয়ার কারণেই — অর্থাৎ জ্ঞান গুরুর সাহায্যে (প্রকট গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেই) এই আত্মস্থানে আত্মদর্শন হয়। তারও আত্মা বিদৃতিদ্বার দিয়ে উত্তরা সুষুম্না পথে উৎক্রান্ত হয়।

(২) আত্মদর্শনটি হয় অগ্রসূচী পথে। একে অগ্রনখ বা অষ্টদলকমলও বলে। দুটো চোখের মণির চারপাশে কালো একটা ঘেরা গোলাকৃতি স্থান আছে। এটি হল প্রথম কমল। এর পর তার মধ্যে চোখের কাল মণিটি — সেটা হল দ্বিতীয় কমল। তারপর চোখের মণির মধ্যে একটা অতি সূক্ষ্ম রেখার মত ফুটো আছে। সেইটি হল তৃতীয় কমল। আয়নার সামনে সূর্য্যের আলো নিজের চোখের মণির ওপর ফেললে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মণির মধ্যের ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্রপথের শেষ প্রান্তে সূঁচের ডগায় ছিদ্রের মত আর একটা অতিসূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এইটিই হল চতুর্থ কমল। দুটি চোখে চারটি করে ২ x ৪ = ৮ টি কমলদল। এই কমলদলে ধ্যান সন্নিবিষ্ট হলে এইস্থানে আলোকরেখার মত জ্যোতির্ময় পরমতত্ত্ব অনুভূত হয়। যে সাধকের পুর্বজন্মের সংস্কার শুদ্ধ হয়েছে, যার জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়েছে, তার প্রকট গুরুর সাহায্য ছাড়াই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হতে পারে। এই অষ্টদলকমল স্থানে আত্মদর্শন হয়। পরমতত্ত্ববোধ তারই হবে যে পূর্বজন্মের সুকৃতির বলে এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে এই পথে পরমতত্ত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। কর্মনিঃশেষের ফলে, জন্ম জন্মান্তর ধরে বিদৃতিদ্বারে আঘাতের সাথে উত্তর সুষুম্নার রুদ্ধমুখটি তার আপনি খুলে যাবে। একমাত্র তাদেরই, এইভাবে অষ্টদলকমলে ধ্যান করলে Realisation হবে। সেই সাধক এইখানে পরমপদের জ্যোতির্ময় রূপ দেখতে পান। অন্যদের, এই রহস্য জানা থাকলেও এপথে পরমতত্ত্বানুভূতি নাও হতে পারে।

যদিও এই গুহ্য রহস্যময় পথ দুটির কথা অনেকেই জানতে পারে, তবুও প্রথম পথটি একমাত্র গুরুকৃপা দ্বারা, এবং দ্বিতীয়পথটি নিজের পূর্ব জন্মার্জিত শুভ সংস্কারের ফলেই যোগ্য সাধনের দ্বারা আয়ত্ত হতে পারে।

উত্তরা সুষুম্নার ঐ পথটি ছাড়া সুষুম্নার আর একটি নিষ্ক্রমণের পথও আছে। মস্তকগ্রন্থি থেকে তালু গহ্বরের ঠিক ওপর দিয়ে। আলজিবটার ঠিক উপর থেকে আরম্ভ হয়ে মুখের ভিতরের টাকরাটার বারবার তালুগহ্বরের উপর দিয়ে কপাল মধ্যে দুই ভ্রূর মধ্যে স্থান অবধি অন্য সুষুম্নাটি চলে এসেছে। এখানে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী ফুটোটার সামনে এসে একটু ঘুরে উপরের দিকে ব্রহ্মতালু অবধি চলে গেছে। এই সুষুম্না নাড়ীর মুখটি খোলা। এই পথে রাজযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি যোগ ত্যাগের পর আত্মার উৎক্রমণ হতে পারে। এখানে সানন্দ, সাস্মিতা প্রভৃতি সমাধি লাভ হয়। অণিমা লঘিমাদি, অষ্টসিদ্ধি এমনকি অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভও এই পথে হতে পারে। কিন্তু এই পথে সবমুক্তি বা পরামুক্তি কখনই হবে না কল্পান্তে তাদের ফিরে আসতে হবেই।

ঋষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের এই সূত্রগুলি যখন বলেছিলেন তখন তাঁকে সমাধি লাভ করে বার বার সেই দিব্যমণ্ডলে উঠে যেতে হয়েছিল। সেখানে সত্যদর্শনের পর, ব্যুত্থানের পর জগতের কল্যাণের জন্য তিনি এই সব সত্য প্রচার করে গেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন —

পঞ্চ আকাশে কি রকম অনুভূতি হয়? সূর্য্যমণ্ডলে কি ঘটছে? তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়েছিল — যে স্বে মহিম্নি অবস্থা থেকে চিতিশক্তির উদ্ভব হয় সেইটি পরমাকাশ। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে জ্যোতিঃপুঞ্জ যে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তা এই পরমাকাশ। Gas বলা হল কারণ এটা বায়বীয় অবস্থা, অন্য কোনভাবে এ অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের গ্যাসীয় অবস্থায় সূর্য্যের মধ্যে এর Concentrated form আছে। পরমাকাশে এই জ্বলন্ত জ্যোতিরূপ যেমন, আমাদের চিৎগুহায়ও তেমনি তার প্রতিরূপ আছে। সমাধির চরম অবস্থায় এই জ্বলন্ত জ্যোতির পুঞ্জীভূত রূপ অন্তরাকাশে প্রস্ফুটিত হয়। একেই ঋষি বলেছেন —

ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (কঠ ২/১/১৫)

এই যে বাইরের সূর্য্যের দিব্যঘন জ্যোতি, তা আমাদেরও চিদগুহায় যেখানে আত্মা অবস্থিত সেখানেও দৃশ্য হয়। একই শক্তি আমাদের মধ্যেও আছে। আমাদের অন্তরাকাশে যে জ্যোতির্ময় সত্ত্বা তাও ঐ জ্যোতিময় সত্ত্বা — একই।

এরই নীচে হিরণ্যাকাশ।

বাইরের আকাশের ঐ সূর্য্যের গলিত আলোর দীপ্তি লক্ষ লক্ষ মাইল অবধি লেলিহান লক্‌লক্ জিহ্বা বিস্তারিত করে অহরহঃ নিঃসারিত হচ্ছে। এই corona যখন দীপ্তিময়, আমাদের মধ্যে রেণু পূরিত আকাশস্থানে তেমনি রক্তিম আলোক রেখার নিঃসরণের দীপ্তি আছে। এইখানেই হিরণ্যাকাশ। গায়ত্রীর মন্ত্র এইখানেই ঝংকৃত হয়। উপনিষদের ঋষি এই অবস্থায়ই পৌঁছে বলেছেন —

'হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।। (ঈশ - ১৫)

হে প্রভু তোমার মুখ হিরন্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত আছে। সরাও তোমার ঐ হিরণ্ময় অবরণ, আমি তোমাকে দেখব। সত্যধর্ম দৃষ্টির জন্য, হে পূষণ, তোমার ঐ হিরণ্ময় আবরণ অপাবৃত কর' এখানেই ভর্গ দেব দর্শন হয়।

ঐ হিরণ্যাকাশের নীচে আছে দহরাকাশ। দহরাকাশ হল হিরণ্যাকাশেরই reflection প্রতিফলন। বাইরের সূর্য্যের গলিত আলোকদীপ্তি ছড়িয়ে আছে corona মণ্ডলের পর যে chromosphere অবধি — তাই এই দহরাকাশ।

তারও নীচে আছে সূর্য্যাকাশ। তা আবার দহরাকাশের reflection। একে মহাকাশও বলে।

এর নীচে চিদাকাশ। এটা বাইরের আকাশেরই সূক্ষ্ম অবস্থা।

বাইরে যে পঞ্চ আকাশ আছে তার প্রতিটিরই প্রতিরূপ আমাদের অন্তঃকরণে আছে। যেখানে আত্মা ব্রহ্মনাড়ী বেয়ে হৃদয় নামক স্থানে আছে সদাভাস্বররূপে, সেখানেও পাঁচটা আকাশ আছে।

বেদ উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্মের বিষয়ে বলেছেন তিনি নিরবয়ব, অশব্দ, অস্পর্শ, রূপরসগন্ধ বিহীন। সমস্ত নাড়ী পরিত্যাগ করে ব্রহ্মনাড়ী ধরতে হবে। ব্রহ্মনাড়ী ধরে উত্তরা সুষুম্না পথ বেয়ে হিতানাড়ীর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। তবেই মুক্তি। না হলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে পরামুক্তি নেই। ভাষায় তাঁর বর্ণনা করা যায় না। তবু যদি বর্ণনার চেষ্টা করা যায় একমাত্র আকাশের সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। ব্রহ্মকে দেখা যায় না। আকাশও দেখা যায় না। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, আকাশও সর্বব্যাপক। গৃহাকাশের চার দেওয়াল ভেঙ্গে দিলে বাহিরাকাশ ও গৃহাকাশ ঘটাকাশ সব একই, জানা যায়। তেমনি ব্রহ্মসত্তা সকলেরই মধ্যে আছে। মনের ও পঞ্চকোষের আবরণের মধ্যে আছে বলে আলাদা মনে হয়। আবরণটা সরে গেলে দুই ই এক বোধ হবে। এমনি ভাবে আকাশকে বুঝলে পর ব্রহ্মকে বুঝতে ব্রহ্মের সম্পর্কে ধারণা কিছুটা হতে পারে। অলমিতি।

বন্য মোরগের ডাক শুনতে পাচ্ছি। তার মানে সকাল হয়ে আসছে। আমি নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম। নর্মদার জলে বাতাসের জন্য যে হিল্লোল জেগেছে তাতে উদীয়মান সূর্যের আলো পড়ে এক অপরূপ দৃশ্য রচনা করেছে, মনে হচ্ছে যেন স্বচ্ছতোয়া নর্মদার বুকে এ যেন সূর্য-রশ্মি নয়, সূর্য হতে সুবর্ণ বিগলিত হয়ে গলগল ধারায় নিরন্তর পড়ে চলেছে। ঢেউ এর বাধায় নর্মদার অভ্যন্তর হতে সূর্য যেন উপরে উঠে আসতে পারছে না। কিন্তু উর্ধাকাশে সূর্য স্বমহিমায় বিশ্বভুবন ভরিয়ে তুলছেন আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গুনগুন করে গাইতে লাগলাম —

নমো নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি।

কবিগুরুর এই গান কত সার্থক!

দেখলাম অন্য সকলে চলে গেছেন প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সারতে। আমিও নর্মদাতে নেমে স্নান তর্পন সেরে মন্দিরে ঢুকলাম প্রণাম ও পূজা সারতে। মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পণ্ডিতজীর শিষ্যরা যে যাঁর কর্তব্য করে যাচ্ছেন। প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করে এনে রাখছেন। আমি সভামণ্ডপের বাইরে বসে পণ্ডিতজীর পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাখ্যা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে লাগলাম।

এমন সময় মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে বেরিয়ে এসে ভিজা গামছা রোদে শুকতে দিয়ে পণ্ডিতজী বললেন — এখন আমার যজ্ঞের সময়। আমি যজ্ঞের আয়োজন করছি। সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থলে আসুন। আমি সকলকে নিয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হতে বললেন — আপনারা নর্মদা ও নর্মদেশ্বর মহাদেবের স্তব পাঠ শুরু

করুন। পণ্ডিতজী যজ্ঞকুণ্ডকে তিনবার পরিক্রমা করে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিস্থাপন করলেন। তিনি মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন —

ওঁ আত্মা ত্বং নর্মদা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো
যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।।

অর্থাৎ হে মহাদেব! তুমিই আমার আত্মা, মা নর্মদাই আমার বুদ্ধি, আমার ইন্দ্রিয়সমূহ তোমার ভৃত্য, শরীর তোমার পূজা করার উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার জন্যই আমার বিষয়ভোগ চেষ্টা, তোমাতে সমাহিত হওয়াই আমার নিদ্রা, আমার পাদ সঞ্চালনের অর্থ তোমার বিধিপূর্বক প্রদক্ষিণ করা, আমার বাক্যসমূহ তোমার স্তব, আমি যাই করি তা শুধু তোমার আরাধনার জন্যই করি।

চমসে করে যজ্ঞকুণ্ডে ঘি ঢালতে ঢালতে কৃষ্ণানন্দজী সমাধিস্থ হয়ে নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে রইলেন। যজ্ঞকুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সামনে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকার পর তাঁর শরীরে শিহরণ দেখা গেল।

যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে মনে করে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বসতে বলে শুরু করলেন — সাধনপাদের প্রথম সূত্রটি হল —'তপঃ - স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ' —

এই সূত্রটির তপঃ, স্বাধ্যায়, প্রণিধাণ, ক্রিয়াযোগ শব্দগুলোর প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করলে ঋষির উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না। এই মন্ত্রটির মধ্যে যোগের অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। তা বুঝতে হলে এই শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ আগে জানতে হবে।

তপঃ শব্দটির অর্থ থেকে সবাই ধরে নিয়েছে, তপস্যা অর্থাৎ বিষয়সুখ ত্যাগ করা, কষ্ট সওয়া, কৃচ্ছসাধন ইত্যাদি। কিন্তু তপঃ শব্দ এই অর্থে ঋষিরা ব্যবহার করেন নি। এই শব্দটির পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আছে।

পুকুরের ধারে লম্বা ঝাঁকড়া মাথা কোন তালগাছ থাকলে সূর্য্যের আলোয় তার ছায়াটা কখনো গাছের গোড়ায় পড়ে, কখনো বা ছায়াটা সামান্য বেঁকে পড়ে, কখনো বা দীর্ঘাকার হয়। একই গাছের ছায়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হবার কারণ হল সূর্য্যের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোর প্রতিফলনের তারতম্য। কোন বাধা না থাকলে আলো সোজা হয়ে লম্বাভাবে পড়ে কিন্তু সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আসার পথে stratosphere প্রভৃতি সূক্ষ্মস্তরে তা অনেক সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্য দিয়ে আসে। এই দীর্ঘ পথের কোথাও মহাকাশে গ্যাসীয় পদার্থ, কোথাও বা বাষ্প বা অন্যমুখী তরঙ্গ অথবা শ্রোত, ধুলিকণা, কোথাও বা মেঘের আবরণ থাকে। এই সব সূক্ষ্ম বাধা মাঝে থাকার ফলে আলোর গতি refracted হয়ে যায়। তা আর straight line এ পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে না। আলোর ধর্ম হল, পথে কোন রকম বাধা না পড়লে ও সমতল তলের ওপর পড়লে আলো লম্বাভাবে পড়ে। আলোটা কোন তলের ওপর পড়বার পর horizontally সমান্তরালভাবে একটু সরে গিয়ে আবার semi-veritical ভাবে পড়ে। পৃথিবীর উপরিভাগটা সমতল নয়। তার সব জায়গাই উঁচুনীচু। তাছাড়া মেরুপ্রদেশে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে কিছুটা চাপা কমলালেবুর মত। বৈদিক ঋষিরা বলেছেন — 'কপিত্থ ফলবৎ পৃথিবী।' আবার পৃথিবী নিজেও মেরুদণ্ডের ওপর পাক খাচ্ছে, তার গতিবেগে আলোর প্রতিসরণ হচ্ছে। ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে ঘোরার জন্যও আলোর গতিপথ refracted হয়ে যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যও আলোর গতি refracted হয়ে যায়।

উপর থেকে সূর্য্যের আলো যেখানে সোজাসুজি বা বাঁকা ভাবে পড়ে। উর্ধটানে সেই আলোই আবার একই সমান্তরালে উর্ধপানে প্রবাহিত হয়। এই সব factor গুলির জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর অসমতল plane, stratosphere থেকে পৃথিবীর তল অবধি সূক্ষ্ম বাধার স্তর, পৃথিবীর rotation and revolving ডিম্বাকৃতি পথে, কপিত্থ ফলবৎ পৃথিবী — সূর্য্যের আলো পৃথিবীর ওপর বাঁকা ভাবে পড়ে। Horizontally খানিকটা সরে গিয়ে প্রথম আলোর রেখার parallal line আরও একটা line এ আলো প্রতিফলিত হয়। আবার নিম্নমুখী আলোর উল্টা দিকে আর একটা গতি উপরের দিকে থাকে।

Stratosphere এর ওপরে যখন কোন রকম obstruction নেই, সেখানে থেকে কোন মসৃন তলের ওপর

আলো লম্বভাবে পড়ে, একটু horizontally সরে গিয়ে perpendicular reflection (প্রতিফলন) হয়, আবার ঐ আলো লম্ব ভাবেই উপরের দিকে উঠে যায়।

ছবির আকারে এই আলোর গতি প্রকাশ করলে এই দুরকমে আলোর পড়া, প্রতিফলন, ফিরে যাওয়া দেখতে দেবনাগরী তপ কথাটির মত।

যে আলোকরশ্মি বা জ্ঞানরশ্মি, সূর্য্য বা প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যও যার আলোকে আলোকিত সেই মহাবিন্দুর স্তর থেকে, আসছে পৃথিবীর ওপর তার রূপটা ত এর মত। অসমতল এই পৃথিবীর ওপর পড়ছে বলে তা তির্য্যক ভাবে পড়ে। জ্ঞানের জ্যোতিও এমনি ভাবে অসমতল, অর্থাৎ অসম অবস্থায় যারা আছি তাদের ওপর বাঁকাভাবে পড়ছে। তাই তা ত এর মত দেখতে।

আবার স্বে মহিম্নি বা মহাবিন্দু থেকে, যেখানে কোনরকম বাধা নেই — আলো ও জ্ঞানরশ্মি পড়ে লম্ব গতিতে, reflected হয়ে Horizontally সরে গিয়ে এর প্রতিফলন ও ওপরের দিকে ফিরে যাওয়া, সবই লম্ব ভাবে হয়। তা দেখতে দেবনাগরী 'প' এর মত। মহা বিন্দু থেকে এই জ্ঞান জ্যোতি যখন আমাদের বিন্দুস্থানে পড়ে, ঐ রেণুপূরিত আকাশে আত্মা মলের আবরণে ঢাকা যাচ্ছে বলে এই জ্যোতিঃ বাঁকা হয়ে পড়ে। তুরীয় ভূমি থেকে আর একটা জ্যোতি লম্বভাবে পড়ছে ও লম্বভাবে উঠে যাচ্ছে।

এই দুই রকম আলো ও জ্ঞানের আলো — যখন পড়ে দেখতে হয় এই রকম ত প বা তপ।

মলযুক্ত বিন্দুস্থানে জীবাত্মার ওপর যে আলোকরশ্মি বা জ্ঞানরশ্মি তির্যক ভাবে পড়ছে, তা যদি বিমল বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে যে লম্ব রেখা পড়ে ঊর্দ্ধের দিকে লম্ব ভাবেই যাচ্ছে, তা আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করবে।

এই ক্রিয়াটাই তপঃ (তপঃ)। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাই উচ্চারিত হয়েছিল তপঃ, তপঃ, তপঃ। অর্থাৎ কিনা এই ভাবে বিন্দুস্থানে (রেণুপূরিত আকাশে) যে পরমাত্মাই আছেন, তার বিমল বোধরূপের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।

পুরাণে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শুয়ে ছিলেন, তাঁর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উদ্ভব হল, চারিবদন। তিনি দৈববাণী শুনলেন — তপঃ তপঃ তপঃ। এসব উপরের বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যটিই অন্য ভাবে বলছে। ব্রহ্ম আকার নিলেন যখন তাই ব্রহ্মা। তাঁর চারিবদন হল চারিবেদ। তিনি চারিবদন দিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন। রূপক আকারে বৈজ্ঞানিক সত্যটাই বলা হয়েছে।

মহাবিন্দু থেকে নামতে অর্থাৎ একোঽহম্ বহুস্যামঃ অবস্থা থেকে বহু হয়ে, ক্ষরিত হয়ে, ক্ষর জগতে নেমে এলো। তখন তার বিসর্গ অবস্থা হয়।

আবার এই ক্ষর অবস্থা থেকে অক্ষর অবস্থায়, বহু থেকে একম্ হবার জন্য, এই বিসর্গ অবস্থাকে বিন্দু অবস্থায় যেতে হবে। যখন জীব নানাত্বের আকর্ষণ ছেড়ে দিতে পারবে, তখন বিসর্গের নিম্নমুখী বিন্দুর বিলুপ্তি ঘটবে।

তপঃ হল এই মহাবিন্দু অবস্থার ফিরে যাবার প্রথম step (সোপান)। তপের সাতটা স্তর আছে, একেই ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন — 'তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা' (সা-২৭)। এই সাতটি ভূমি হল —

১। শুভেচ্ছা — এই সৃষ্টির পরম কারণ স্রষ্টাকে জানতে হবে, এই আগ্রহই হল শুভেচ্ছা।

২। বিচারণা — এটা হল জাগরণ, তখন বিচার আরম্ভ হবে। যা নয় তা নিয়ে ভুলে আছি। এটাই আমাদের অভীষ্ট নয়, ও অভীষ্ট কি তা মনন করা — তাই হল বিচারণা।

৩। তনুমনসা — যা সত্য বলে বুঝলাম তাতে stick করা হল তনুমনসা।

৪। সত্ত্বাপত্তিঃ — সৎ এর বিকার অবস্থা হল সত্ত্ব। সৎ কে পাবার জন্য যে আগ্রহ, তাতে নিমগ্ন হবার অবস্থা তাই হল সত্ত্বাপত্তিঃ।

৫। অসংসক্তিঃ — এক ছাড়া দুই নেই - এই বুঝে সংএর জন্য সংসক্তি আর যখন থাকবে না এই অবস্থা হল অসংসক্তিঃ।

৬। পদার্থ ভাবনা — জগতের সর্ববস্তু ভাগবৎ সত্ত্বারই প্রকাশ, এই বোধ যখন হয়, তাই হল পদার্থ ভাবনা।

৭। তূর্য্যগা — তুরীয় ভূমিতে fourth dimension এ নির্বীজ সমাধির অবস্থা হল তুর্য্যগা।

Einstein ও তাঁর চিতিশক্তির ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টির পরমতত্ত্ব অনুভব করে বলেছিলেন — যে Time, Space and Quantum এর বাইরে — beyond the three dimensions — একটা চতুর্থ (তুরীয় বা চতুর্থ) ভূমি আছে যাকে তিনি fourth dimension বলেছেন। সেখানে একটা 'mathematical mind' ক্রিয়া করছে, যার জন্য এই বিপুল বিশ্বে এত নক্ষত্র, গ্রহ, ইত্যাদি একটা সুশৃঙ্খল নিয়মে বাঁধা আছে, কারুর সঙ্গে কারুর সংঘর্ষ হচ্ছে না। হলে সব ধ্বংস হয়ে যেতো। ঋষি আইনষ্টাইন যাকে 'mathematical mind' বলেছেন, বৈদিক ঋষিরা তাকেই বলেছেন 'দণ্ডেণ হি মহত্তেজাঃ'। একটা চৈত্য প্রবাহ সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়মের বন্ধনে বিধৃত করে রেখেছে।

Beyond three dimensional এই world এ, এই তুরীয় ভূমিতে সমত্ব আছে। Grosser plane এই স্থূল জগতে সমতা নেই। Earth এর pole দুটো ঈষৎ চাপা - কপিত্থ ফলবৎ — তার পৃষ্ঠ অসমতল, পাহাড় পর্বত, নদীনালা সমুদ্র পৃথিবী পৃষ্ঠে অসমতলভাবে আছে, পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে আবার কক্ষপথে ঘুরছে, অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্রের আকর্ষণী শক্তি সর্বদা কাজ করছে। এই সব বিবিধ influence - এর ফলে এই পৃথিবীর (এবং পিণ্ডদেশের) ভূমি অসম। তুরীয় ভূমিতে এসব কোন disturbing factor নেই। তাই সেখানে সব সম। সম-যুক্ত স্থানে আলোর গতি হয় লম্বভাবে এবং তা horizontally একটু সরে এসে reflect করে লম্ব ভাবেই। আবার এই আলোর গতি centrifugal force এ যেমন নেমে আসে, তেমনি তার আর একটা centripetal force থাকার জন্য এই আলো লম্বভাবে আবার ঊর্দ্ধের দিকে উঠেও যায়। প্রতিলোম গতিতে নেমে আসে আবার অনুলোম গতিতে উঠে থাকে।

সম অবস্থায় আছে যে, তার বিন্দুস্থানে মহাবিন্দু থেকে আগত এই আলো বা জ্ঞানরশ্মি যখন পড়ে তার রূপটা হয় নীচের চিত্রের মত। জ্ঞান বা চিতিশক্তির ঢল এই ভাবেই সমত্ব অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর উপর পড়ে। তার ছবিটা তখন দেখতে হয় এই রকম — प

এটা সংস্কৃত प -এর মত।
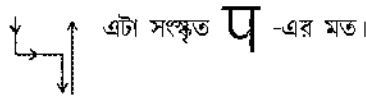
আর যখন আলো বা জ্ঞান অসমতল ভূমির ওপর পড়ে, যেমন এই gross universe এর ওপর পড়ছে তখন আলোটা পথের মধ্যের gas, বাষ্প, cross-current, বাধা-স্থ্যান ইত্যাদির জন্য তির্য্যগরূপে পড়ে। তার reflection ও rebound করে বাঁকা ভাবে পড়ে। তার ছবিটা তখন দেখতে হয় এই রকম — त

এটা সংস্কৃত त -এর মত।
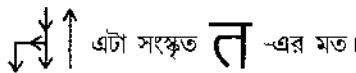
বৈদিক ঋষিরা বলেছেন — 'সম চতুরস্র কোণম্ সা মধ্যগা ভবতি'। উপরের দুটি মিলে রূপটা হয় সংস্কৃত तपः র মত।

তপঃ কথাটির শেষে একটি বিসর্গ আছে। বিসর্গ হল খণ্ডজগতের খণ্ডভাবের মধ্যে থাকা। পুকুরের জলে, কি একটা গেলাসের জলে টুসকী মারলে দেখা যায় জলের ওপরে যেমন, জলের নীচেও তেমনি অনেকগুলি বিন্দু নেমে যাচ্ছে। তেমনি অনেকগুলো বিন্দুর মত জীবাত্মা নেমে চলে। আমাদের ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তী বিন্দুস্থানে, অর্থাৎ দ্বিদলপদ্মের রেণুপূরিত আকাশে পরমাত্মাই যখন আদিকর্মের ফলে বিস্তারিত হয়ে নেমে এসে পরিচ্ছিন্ন দেহে এসেছে, তখন তাতে ঐ টুস্‌কী লাগার মত ধাক্কা লেগেছে। ফলে নীচের ঘাটে আত্মা নেমে এসেছে। এটাই হল বিসর্গ অবস্থা।

নীচের বিন্দুটা ক্ষয় করে তাকে আবার বিন্দু অবস্থায় যেতে হবে। এই খণ্ডভাবের অবস্থাটাই ঃ দ্বারা বোঝান হয়েছে।

জীবাত্মবোধ ত থাকে। যদিও কেউ জানে যে সেই পরমাত্মা — জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোন তফাৎ নেই — তবুও সেই বোধ প্রতিষ্ঠা তখনই হয় না। এই অ-সম অবস্থা থেকে সমতায় ফিরে যাবার উপায়টিই ঋষি পতঞ্জলি সাধনপাদের মন্ত্রটিতে বলেছেন 'তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'।

স্বাধ্যায় হল — সু + অ + অধ্যায়। সুন্দর ভাবে অশেষ ভাবে, যে অধ্যায় থাকে তাই হল স্বাধ্যায়'। আবার স্ব + অধ্যায়' অর্থাৎ স্বকে, (আপনাকে) জানার অধ্যায় যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তা স্বাধ্যায়।

ঈশ্বর কি তা ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন — ' ক্লেশকর্ম্ম - বিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর ক্লেশ, কর্ম্ম, মৃত্যুরূপ বিপাক — এই সমস্ত হতে যে আশয় বা সংস্কার হয় তা যাকে পরামৃষ্ট অর্থাৎ স্পর্শ করে না — সেই পুরুষবিশেষই হল ঈশ্বর।

প্রণিধান শব্দটির অর্থ শুধু জানা নয়। এর অর্থ হল প্রকৃষ্টভাবে নিধান-অর্থাৎ স্থিতি যখন হয়।

এই তপঃ স্বাধ্যায়, ঈশ্বর হয়ে যাওয়া এবং সেই অবস্থায় প্রকৃষ্টভাবে স্থিতি — এই সমগ্র ব্যাপারটাই হল 'ক্রিয়াযোগঃ'।

স্বয়ং পদ্মভূ ব্রহ্মা সমস্ত যোগ, যোগশাস্ত্র থেকে সার আহরণ করে সর্বযোগের সার এই ক্রিয়াযোগ বলেন। তাই কথিত আছে —

'যোগনাম্ যোগশাস্ত্রাণাম্ সারম্ আকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ঈদম্ তম্ সর্ব্বযোগসারম্ ক্রিয়াযোগম্ অকল্পয়ৎ॥'

স্বয়ম্ প্রজাপতি ব্রহ্মা পদ্মভূঃ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। অকল্পয়ৎ অর্থাৎ সাধন করলেন। সৃষ্টি করলেন।

এই ক্রিয়াযোগটি একটি গুহ্য তত্ত্ব। ক্রিয়াযোগঃ শব্দটি 'ক্রিয়া' আর 'যোগঃ' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে হয়েছে। 'কৃ' ধাতুর অর্থ কর্ত্তার ভাব। কর্ত্তা হলেন পরমেশ্বর। কর্ত্তা যা করেন তাই ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার তিনটি ভাব আছে — ১) সিদ্ধ ভাব, (তিনিই প্রকাশিত হতে চাইলেন — তাঁর বিন্দুস্থিত প্রগাঢ় অবস্থা — এটাই হল সিদ্ধভাব), ২) সাধিত ভাব ও ৩) সংযোগ-কারকভাব।

কারণভূমিতে সেই জগৎ-কর্ত্তারই সিদ্ধভাব। আবার সূক্ষ্মজগতে সাধিত ভাবও তাঁরই। সংযোগ-কারক ভাব হল যখন তিনিই স্থূল জগতে প্রকাশিত হলেন।

ঋষি অন্যত্র বলেছেন — 'যোগঃ জীবাত্মা পরমাত্মনো' জীবাত্মারই পরমাত্মা হয়ে যাওয়া হল 'যোগ'— এক ছাড়া দুই নেই। এক সদ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। এক জগৎ কর্ত্তাই আছেন, আর কিছুই নেই। কর্ত্তার এই ক্রিয়া — তপঃ, স্বাধ্যায় ঈশ্বর-প্রণিধান — এই সমগ্র ব্যাপারটাই হল ক্রিয়াযোগেঃ।

এই যে জীবাত্মা অর্থাৎ খণ্ডভাবাপন্ন আত্মা, তার পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ হয়ে যাওয়া সম্ভব হয় যোগ দ্বারা। যুজির্, যোগে, যুজ সমাধৌ। সমাধি লাভ হলে তবেই যোগ হয়। এই যোগ বা সংযোগ হলে জীবাত্মাই পরমাত্মা হয়ে যায়। তার আর বিদৃতিদ্বার দিয়ে উত্তরা সুষুম্না পথে উৎক্রান্ত হওয়ারও দরকার হয় না। এই দেহাশ্রয়ে থেকেই সে ঈশ্বর হয়ে যায়।

এই ভাবটিই বৃহদারণ্যক উপনিষদে (চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ মন্ত্র) বলা হয়েছে —

'ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি'। 'ব্রহ্ম ইব সন্ ব্রহ্ম এব ভবতি'। 'অথমর্ত্যোইমৃতাঃ ভবন্তি'। 'অথ ব্রহ্ম সমশ্নুতে'।

ঋষি পতঞ্জলিই বলেছেন — 'উদ্দিষ্ট সমাহিত চিত্তস্য যোগঃ' — সমাহিত চিত্ত হলে তবেই যোগ হয়।

পণ্ডিতজী বললেন — আজ এই সোনাডহর গ্রামে আপনারা মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শন মনন করে এবং রেবা মন্ত্র জপ করে সময় কাটান। সামকা বখৎ ভেট হোগা। আভি আরাম করিয়ে। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

হরানন্দজী বললেন — ঝোলায় কিছু ছাতু আছে, ছাতু ভিজিয়ে খেতে হবে। আপনি এখানে পাথরে উপরের বসেই শিবের নামাবলী পাঠ করতে থাকুন, আমরাও এক একটা পাথরে বসে নিত্যঃকৃত্য সারি। আমার যখন মহর্ষি তণ্ডিকৃত ১০০৮ শিবনাম পাঠ শেষ হল, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। অন্যান্য সাথীদেরও নিত্যকৃত্য সারা হয়ে গেছে। হরানন্দজী ছাতু গুলে নিয়ে এলেন। আমরা এক গোঁড়া করে ছাতু খেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বড় বড় পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসলাম।

আমি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। বেলা পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভাঙল। নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। প্রণাম জানালাম দৃষ্ট ও অদৃষ্ট তপোসিদ্ধ ঋষিবর্গের উদ্দেশ্যে।

এ কয়দিন এখানে থেকে একটানা বিশ্রামে শরীর আমাদের তরতাজা হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণানন্দজীর আশ্রমের

প্রাঙ্গণে হাত পাগুলো ছাড়িয়ে নেবার জন্য সকলে মিলে এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করতে লাগলাম। পায়চারী করতে করতে হঠাৎ দূরে এক জায়গায় ঘন বনের ফাঁকে সুন্দর চওড়া পাষাণময় বনানীর সৌন্দর্য চোখে পড়ল যে আমি স্থির দৃষ্টিতে সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেদিকে সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম — দেখুন, দেখুন দূরে ঐ নদীগর্ভে বনের ফাঁকে ঐ বিরাট চওড়া পাথরটার ওপারে কম্‌প্রিটাম লতার ফুল ফোঁটা বিশাল শৈলসানুর অরণ্যানী। কী গম্ভীর অপরূপ শোভা! মুণ্ডমহারণ্যের ঝাড়িতে বনে বনে বনান্তরালে কত স্থানে কত সৌন্দর্যভূমি যে ছড়িয়ে রেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কৃপণের মত দু একটা জায়গায় গুণে গেঁথে হিসাব করে রচনা করে রাখেন নি — ধনী দাতার মত দুহাত পুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন হাজারে হাজারে। মনে হচ্ছে বিশ্ব কারিগর নিরন্তর অপরূপ শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন, যেন বলছেন যার চোখ আছে সে দেখে আমার মনোহারিণী শিল্প সৃষ্টি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা ঘরে ঢুকে মোমবাতি জ্বাললাম। ঘরটিতে আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। পণ্ডিতজী এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা হাতজোড় করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম। তিনি চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন — অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রমেঁ ওঁকারতত্ত্ব মনন করনেসে জৈসে পিতাজীকা দর্শন মিলতা ঐঁসী হী বিচ্ বিচ্ মেঁ যোগশাস্ত্রকা কী মণি-মঞ্জুষা মনন করেগা। হম্ আশীর্বাদ দেতা হু। কাল যাত্রাকে লিয়ে শুভ হ্যায়। আপলোগ যাত্রা কর সকতে হ্যায়। আবার তিনি নীরব হলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠে গেলেন। আমি ঘরের দরজাটি দুটো বড় পাথর দিয়ে ঠেকা দিলাম।

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ দেখলাম, আমাদের ঘরটির জানালাহীন ফোকর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে। আমার ও হরানন্দজীর পিছনে পিছনে আর সকলে বেরিয়ে এসে মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়ালেন। চারদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পাহাড়ের উপর শাল মহুয়া দোকা বট অশ্বত্থ ও অর্জুন গাছের জঙ্গলে জ্যোৎস্নার যেন বান ডেকেছে। চারিদিকে তাকিয়ে এই নির্জন অরণ্যানির স্থির গম্ভীর শোভা দৃষ্টির প্রদীপে অনুভব করতে লাগলাম। উপরে ঝক্‌মকে তারা ছিটানো আকাশ, চারধারেই শৈলশ্রেণী, বড় বড় বনস্পতি, মাঝে মাঝে দু'একটা রাতজাগা পাখীর ডাক; সর্বোপরি একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই রাত্রে এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম — বাবা, বাবাগো প্রণাম। পূজনীয় পিতৃপুরুষগণকে প্রণাম। তোমাদের আশীর্বাদেই আমি এস্থানে আসতে পেরেছি, এই অপরূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখে ধন্য হতে পারলাম। নর্মদাকে প্রণাম করে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। পাথর দুটো এনে দরজায় ঠেকা দিয়ে দিলাম। আমরা কমণ্ডলুর জলে আচমনাদি করে জপে বসে গেলাম। আমাদের জপ তেমন হল না। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড় থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসতে লাগল। 'নমো নমো' করে জপ সেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি প্রায় দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ নর্মদার জল পেট ভরে খেয়ে শুয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই।

ঘুম ভাঙল সকাল ছটায়। সোনালি সূর্যরশ্মি তখন ছড়িয়ে পড়েছেন গোটা পাহাড়ে। সূর্যের জবাকুসুম শঙ্কাশ রশ্মি ধীরে ধীরে স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ভাবতে লাগলাম মহাপ্রকৃতিকে কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েছে ফুল ফোটাতে, ফল পাকাতে। সূর্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূরপ্রান্তে বসাতে হয়েছে, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েছে ঘন বনের মধ্যে ছোট বড় গাছকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যগ্র আগ্রহে। তবেই আজ ওর ফুল ফুটেছে, ওর ফল পেকে টুকটুক করছে। ক্ষর ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেছে ঐ বন্য গাছ গাছালি লোক লোকান্তরে। অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের এটি অতি সুকুমার শিল্প সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায় ফল ফুলে লাবণ্যময় দুলুনিতে। ওর মধ্যে দিয়ে আজ তাঁকে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আমি গেয়ে উঠলাম ছোটবেলায় পড়া সুনির্মল বসুর কবিতা —

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে দিলখোলা হই তাইরে।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে,

চাঁদ শিখালো হাসতে মিঠে, মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর, অন্তর হোক রত্ন আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে।
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরণা তাহার সহজ গানে গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যামবনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবে নতুন জিনিষ শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাওনাটা যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে সব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

হরানন্দজী বললেন—চলুন, যাত্রা শুরু করা যাক। পণ্ডিতজীকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমরা আর দাঁড়ালাম না। হাঁটতে লাগলাম অজানা গন্তব্যের পথে। নর্মদার ধারে ধারে দ্রুততালে হাঁটতে লাগলাম। পথ বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। সামনে এক ফাঁকা প্রান্তর চোখে পড়ল। তা অতিক্রম করতেই এক পাকদণ্ডীর মুখে উপস্থিত হলাম। পাকদণ্ডী বেয়ে হাঁটতে লাগলাম। যতই এগোচ্ছি জঙ্গল ততই ভয়ঙ্করভাবে ঘন হয়ে আসছে, বড় বড় গাছ বেয়ে বড় বড় লতার ঝোপ এমনভাবে আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে যে সূর্যরশ্মির সাধ্য কি এই জঙ্গলে প্রবেশ করে! বড় বড় গাছের ডালপালা, লতাপাতা যেন পাকদণ্ডীর পথকে ঢেকে ফেলার উপক্রম করছে; পাকদণ্ডী যেন শেষ হতেই চায় না। প্রায় দু'ঘন্টা এইভাবে চলার পর পাকদণ্ডী শেষ হল, উৎরাই-এর পথে নেমে এলাম ফাঁকা মাঠে। নর্মদাকে দেখতে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল, মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের খর উত্তাপ গায়ে লাগছে। অন্ধকার হতে এসে পৌঁছেছি আলোতে। মনে অনেক স্বস্তি! এক কমণ্ডলু জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেললাম। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। পাথরের চাঙড়গুলো নানা লতা গুল্মে ঢাকা। কোথাও কোথাও সেগুন গাছের জটলা। বেলা প্রায় বারটা। এ অঞ্চলে গাছপালার সংখ্যা কম হলেও পথ খারাপ বলে প্রায় একঘন্টা হেঁটে নর্মদাতে স্নানের ঘাট পেলাম। ঘাটের পাশেই মন্দির। মন্দিরে এক শ্বেতশুভ্র শিবলিঙ্গ বিরাজমান। আমরা ঘাম জুড়িয়ে নর্মদাতে স্নান করতে নামলাম।

কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় বনপথে খোল করতাল খঞ্জনীর ধ্বনি শুনতে পেলাম। দেখি সাতজন বৈষ্ণব সাধু আসছেন। তাঁদের মালা, তিলক ঝোলা শোভিত চক্রাঙ্কিত ললাটে গোপীচন্দনের ছাপ। বুঝলাম, এঁরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের। আমাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে মন্দিরের চত্বরের যে জায়গাটা বেশি পরিষ্কার সেখানে গিয়ে তাঁরা বসলেন। তাঁদের মধ্যে সিল্কের গেরুয়া পরিহিত জনৈক প্রভুপাদ আমাদের আড়চোখে দেখে নিয়ে তাঁর সঙ্গীদের বলতে আরম্ভ করলেন —

ধর্ম ও নীতি, মত ও পথ নিয়ে এ জগতে বিভেদ বিবাদের অন্ত নেই। যুগে যুগে এই নিয়ে বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও পরিণামে চরম সংঘর্ষ মানুষের যাত্রাপথকে করেছে দুর্গম কন্টাকাকীর্ণ — রক্তসিক্ত তার ললাটে এঁকে দিয়েছে দুরপনেয় কালো-কলঙ্করেখা — মানুষের সত্য শিব সুন্দরের বন্দনাগীতিকে করেছে মসীলিপ্ত; তার মঙ্গলকর সভ্যতা সূর্যকে অজ্ঞানতার নিরন্ধ্র ঘন মেঘে করেছে আবৃত। মানুষ পথ বিভ্রান্ত আজ। কোন্ মর্ত্যে নিজেকে করবে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ পথে সে যাত্রা করবে শুরু? কোন্ গহন-গহীন-গভীর আঁধারে অবলুপ্ত আজ তার অমৃত তীর্থ পথচিহ্নরেখা, কোন্ অজ্ঞান অন্ধকারের সীমান্ত পারে অপহৃত হয়ে আছে তার ঊর্ধ্ব-শীর্ষ প্রদীপ্ত জ্ঞান-প্রদীপ-শিখা মানুষ তা জানে না। আমি মনে করি, এই আশাহত অবস্থার অবসান কল্পে নিখিল মানুষের অন্তর রাজ্যে এবং বাহির রাজ্যে প্রেমপুরুষোত্তম চৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতবাণী অমৃতময় পথ-নির্দেশ এনে দিয়েছে অযুতযুগের অকূল ভরসা — আমাদের প্রিয় পরমকে একান্ত আপন করে পাওয়ার জন্য নির্বাণে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে হবে না, যোগের ধাঁধায় প্রক্রিয়ার প্রহেলিকায় বৃথা জীবন ব্যর্থ হবে না, সেই অসীমতত্ত্বকে বুঝবার ও জানবার তাঁর শ্রান্তিহর ক্লান্তিহর বুকের পরশ পাওয়ার উপায় আছে —

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপন্ শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণমৃতাস্বাদনং সর্বাত্মস্নপন্ পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তণং।

মহাপ্রভু বলে গেছেন — শুধু কৃষ্ণনাম কর; একমাত্র কৃষ্ণ নামেই চিত্ত দর্পণ মার্জিত হবে, হৃদয়পদ্ম হবে বিকশিত, অমৃত আনন্দের আস্বাদনে তৃপ্ত ও দীপ্ত হবে। এই কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব —

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ অনাদি আদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

উপনিষদ যাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন 'রসো বৈ সঃ — রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি' — সেই অখিলরসামৃত মূর্ত্তি হলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; যাঁকে লক্ষ্য করে ব্রহ্মসংহিতা ঘোষণা করেছেন

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটিষ্বশেষ - বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্
তদ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমং ভজামি,

মহাপ্রভু সেই পরমতত্ত্ব নিজে অনুভব করে ঘোষণা করে গেছেন —

১) অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
২) অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু — কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্মআত্মা ভগবান তিন তার রূপ।
৩) জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব — 'আস্বাদন যেই করে সেই যে মজয়', 'মধুর' 'মধুর' বলা ছাড়া আর তাঁদের ভাষার স্ফুরণ হয় না —

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো - মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।

এমন কি যাঁরা আত্মারাম জীবন্মুক্ত ব্রহ্মানন্দময় পুরুষ তাঁরাও কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত —

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূকো গুনো হরি। (ভাগ)

এই কৃষ্ণপ্রেমের রস ও মাধুর্য্য আস্বাদন করে — তাই তো একজন ব্রহ্মবিদ অদ্বৈতবাদী ঋষিও স্বগতঃভাবে বলে উঠেছিলেন —

অদ্বৈততত্ত্ববীথিকৈরুপাস্যা সানন্দ সিংহাসন লব্ধ দীক্ষা,
বয়ং কেনাপি বরং হঠেন গোপীবধূ বিটেন,

'আমি অদ্বৈততত্ত্বের উদ্যানে পথচারী পথিক, অদ্বৈততত্ত্বেই আমার দীক্ষা এবং প্রতিষ্ঠা। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি আমার মনটি চুরি হয়ে গেছে। খুঁজে পেতে চোরের সন্ধান পেলাম, সেই চোর আর কেউ নয় — গোপবধূলম্পট, গোপীদের মনোচরাই আমার মন চুরি করেছে।

মহাপ্রভু ঐ 'গোপবধূবিটে'র চরণেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, বিকিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই পরমতত্ত্ব নিজে আস্বাদন করে অপরকেও আহ্বান জানালেন — 'সেই অভয় অমৃত আনন্দস্বরূপকে যদি জানতে চাও — বিরজার পরপারে রসভূমিতে যদি নিবাস চাও, শুদ্ধাভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণে তোমার মনটা নিবেদন করে দাও। পূর্ণতম ভগবানের অভাব কিছুই নেই , অভাব থাকলে তো কিছু তাঁকে দেবে! অভাব একটা জিনিষের আছে — 'আভীরবামতনয়া হৃতমনসায়' দ্বাপরে আভীরতনয়া গোপিনীগণ তাঁর মনটা চুরি করে নিয়েছিল — তাই তাঁর মনের অভাব, তুমি নিষ্কাম চিত্তে অহেতুকীভাবে তোমার মনটা তাঁর চরণে নিবেদন করে দাও — 'শ্রীকৃষ্ণকায় নমো নমঃ ন মম, ন মম' বলে।

মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম প্রচার করে গেলেন — তা অপূর্ব-অভিনব-অনবদ্য। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও উপনিষদে, নারদ পাঞ্চরাত্রে শাণ্ডিল্য সূত্র থেকে জানতে পারি — ভারতে ভক্তিধর্ম্মের মহিমা ছিল — কিন্তু মহাপ্রভু যে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করে গেলেন তা হল শুদ্ধাভক্তি, অহৈতুকী প্রেম; এই প্রেম ভক্তির কাছে ধর্ম অর্থ কাম তো দূরের কথা মোক্ষবাঞ্ছাও অকিঞ্চিৎকর। শুধু তাই নয় — যে মুক্তির জন্য সকলে লালায়িত, বেদ উপনিষদে যার নির্দেশ আছে — মহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণভক্তি — এই মোক্ষবাঞ্ছা থাকলে প্রকট হতে পারে না;

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব।
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান যাহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান।

সকল কামনা বাসনা অভীপ্সা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করে যে কৃষ্ণগতপ্রাণতা — আকুল টান — সেই প্রেমের পথেই মহাপ্রভু ডাক দিয়েছেন — ভাগবতে পাই — গোপীগণ তথা রাধিকার প্রেমে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন —

ন পারয়েহ হং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধা যুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ সংবাচ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতি সাধুনা।

'দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল সকল নিঃশেষে ছিন্ন করে তোমরা আমার ভজনা করেছ; দেব পরিমিত আয়ু পেলেও তোমাদের এই প্রেমের ঋণ শোধ করতে পারবো না।' মহাপ্রভু ঐ সব উজাড় করা — অতুলনীয় কৃষ্ণ বশীকরণী - গোপীপ্রেমতত্ত্বকেই মুখ্য বলে গেলেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যতত্ত্ব অলোচনা কালে তাই তিনি কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার' রাধা প্রেম সাধ্যশিরোমণি' এই কথা শুনে সানন্দে অনুমোদন করে বলেছিলেন —

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেই প্রেমা হতে —
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।

রাধিকার যে প্রেম সেই প্রেমের প্রতিদান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও দিতে পারেন না, তিনি সেজন্য তাঁর কাছে ঋণী—

পূর্ণানন্দময় আমি, চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল।
রাধিকার প্রেম — গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।

বন্ধুগণ! ষড়গোস্বামীপাদের কৃপায় আমরা জানি মহাপ্রভুই 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং গৌরচন্দ্রং'; তাঁর উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদি মহাভাবময় অবস্থা এবং অবিরাম নর্ত্তন ক্রন্দন থেকে আমরা জানি — মহাপ্রভু কে ? তবুও ঐ আত্মসংবেদ্য রসের আলোচনা, অনুভবসিদ্ধ পরমতত্ত্বের গুহ্য কথা আমার মুখে শোভা পায় না — তাই মহাপ্রভু যে অপূর্ব অভিনব ভক্তির কথা প্রচার করে গেলেন — সেই আলোচনায় ফিরে আসি।

মহাপ্রভু বলেছেন —

অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন,
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু,
ব্রহ্মানন্দাদি যার নঁহে এর্কবিন্দু।

ভক্তি তাঁর কাছে সাধন ছিল না — ছিল সাধ্যবস্তু। এই অভিনব ভক্তির কথা প্রসঙ্গে তিনি ভাগবতকে মুখ্য ধরতেন, ভাগবত ছিল তাঁর প্রাণবস্তু। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণও মহাপ্রভুর মত সংক্ষেপে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশঃ তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ।

'শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণং অমলং'— ভাগবত ছিল মহাপ্রভুর প্রাণবস্তু; কাজেই মহাপ্রভুর ঐ পরমগুহ্যতত্ত্ব — পুরুষার্থ শিরোমণি, গোপীপ্রেম সাধ্যশিরোমণি রাধাপ্রেম, যে প্রেম 'কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন' — তা বুঝবার জন্য, আসুন ভাগবতের আশ্রয় নিই।

আমাদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র প্রায় সকলই — জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি — এই তিনটি সূত্র অবলম্বনে ব্যাখ্যাত। এই তিনের মূল বেদে, সুতরাং বেদই সকল শাস্ত্রের 'একায়ণ'। বেদান্তের বৈশিষ্ট্য জ্ঞান বা তত্ত্বে , গীতার বৈশিষ্ট্য কর্মে, ভাগবতের বৈশিষ্ট্য ভক্তিতে। ভক্তি বশঃ পুরুষঃ'। সেই পরমপুরুষ আর কিছু চান না — তিনি কেবল ভক্তির কাঙাল; তিনি স্বরাট বিরাট হয়েও ভক্তি ডোরে বাঁধা পড়েন, অসীম হয়েও ভক্তের আঙ্গিনায় খেলা

করেন। 'অহং ভক্তভিঃ গ্রস্তঃ হৃদয়ঃ' — এই তাঁর শ্রীমুখের কথা। তাই উপনিষদের ঋষিগণ ভক্তির মূল উপাদান সমূহ সকলই সংগ্রহ করে মহিমা গেয়ে গেছেন। গীতাকার তা নিয়ে জ্ঞান ও কর্মের মিশ্রণে ভক্তির একটি কাঠামো প্রস্তুত করেছেন, ভাগবতকার তাই দিয়ে গড়ে তুলেছেন ভক্তিদেবীর একটি পূর্ণাবয়ব সুষমাময়ী মূর্ত্তি। মহাপ্রভু এসে তাতে করেছেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমুখে গীতা, যুদ্ধশেষে ভাগবত, ভক্তিবাদে গীতা যেখানে শেষ, ভাগবত সেখানে আরম্ভ। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' — তাহলে আমিই তোমাকে মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ — গীতাতে এই বলেই কৃষ্ণ ক্ষান্ত হলেন; কিন্তু সত্যি কেউ সর্বধর্ম — লোকধর্ম কুলধর্ম পতিধর্ম ত্যাগ করে তাঁর শরণ নিতে পারে কিনা, শরণ নিলেও কৃষ্ণ ত্রাণ করেন কিনা — গীতাতে তা নেই; ভাগবতে আমরা দেখি তার Practical demonstration. গোপীরা সর্বধর্ম ত্যাগ করেই কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিল — কৃষ্ণও তাঁদেরকে গ্রহণ করেছিলেন — ভাগবত হল — সেই প্রতিজ্ঞাপূরণ; আর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব হলেন — সেই পরম সত্যের ও তত্ত্বের মূর্ত্তিমান আবরণ — জীবন্ত প্রতীক।

ভাগবত প্রতিপাদ্য 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' — অকপট ভক্তিধর্মের দিকেই দিশেহারা মানুষকে মহাপ্রভু আকর্ষণ করে গেছেন।

ভাগবত বলেছেন — 'ঔৎকণ্ঠ্য' বা অখণ্ড আগ্রহ , অহৈতুকী ভালবাসা দ্বারাই সেই 'সর্বানুভূঃ' শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, তখন ভক্ত তাঁর সঙ্গে সতত যুক্ততা লাভ করেন। তখন বাক্য মনের 'মৃষাগতিঃ' এবং অন্তর্বহি ইন্দ্রিয়দামের অসৎপথে প্রবৃত্তি সমূহ তিরোহিত হয়। এই আকুতি টান-আগ্রহ, 'তপোযুক্ত ভক্তিযোগ' দ্বারা লভ্য। শ্রবণকীর্ত্তনাদি এবং 'নিষ্কিঞ্চণের' পাদরজঃই এই তপস্যার প্রধান সহায়। এই পথেই শ্রদ্ধারতি ও ভক্তির অনুক্রমণ বা ক্রমাভিব্যক্তি। ভক্তিলব্ধ সুখ ও আনন্দ যেমন বাড়ে, জীবের দুঃখ তাপবোধ তেমনই কমে, চিত্তবৃত্তি তেমনই শান্ত 'অমৎসরঃ' ও রাগদ্বেষশূণ্য হয়ে ওঠে। দেহ একদিকে যেমন 'শ্ব-শৃগাল ভোগ্য' অপরদিকে আবার শ্রীহরির বিলাস নিকেতন; সংসার একদিকে যেমন 'উগ্রব্যাল-নিষেবিত' , অপরদিকে তেমনি 'সুরক্ষিত দুর্গ', পরিমিত ভোগের সঙ্গে এই ভক্তিবাদের কোন বিরোধ নেই, বিরোধ আসক্তির সঙ্গে। জাতি বয়স কুল মান পদ, মত ইত্যাদি সকল রকমের বৈষম্য — এই ভক্তিবাদে সর্বথা নিরাকৃত। ভক্তির ঘরে কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী ? কে ব্রাহ্মণ, কে স্ত্রী, শূদ্র আর কেই বা শ্বপচ। তাই প্রেমাবতারের অভয় বাণী —

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।<br>
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।<br>
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে হয়,<br>
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

ভক্তির যে আদর্শ মহাপ্রভুর প্রিয় ভাগবত বারবার নির্দেশ করেছেন — তা অন্যত্র দুর্লভ। বিষয় চাইলেও তিনি দেন না, এবং থাকলে কেড়ে নেন, সে স্থলে দেন — সকল ইচ্ছার নিদান স্বীয় পাদপল্লব; ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদ, ত্রিলোকের আধিপত্য ত অতি তুচ্ছ, এমন যে বহু কীর্ত্তিত স্বর্গভোগ — তাও অত্যন্ত তুচ্ছ; মোক্ষ মুক্তি অপুনর্ভবত্ত নিতান্ত ফল্গু — 'দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি'। ভক্ত চায় কেবল তাঁর পাদপল্লব। যে অন্য কিছু চায় সে তো বণিক'। গোপীপ্রেম এই অনিমিত্তা ভক্তি-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি। তাই মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যতত্ত্ব আলোচনায় এই গোপীপ্রেমের মহিমাই হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গেয়েছেন।

১) রাধার স্বরূপ, কৃষ্ণ-প্রেমলতা।<br>
সখিগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা।<br>
২) সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়<br>
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।

তাই মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্মে — সিদ্ধদেহে সখী অনুগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনই পরম প্রেমের পথ।

মহাপ্রভুর কথা — চাই শুদ্ধাভক্তি, অহৈতুকী ভালবাসা। ভক্ত ও ভগবানের এই ভালবাসা-বাসি, 'ধরা দেওয়া', বাঁধা-পড়া খেলা নিত্যকাল ধরেই চলছে। আনন্দের কথা, এই খেলায় চিরদিনই ভক্তের জিত, ভগবানের হার। 'স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্'। প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর হাত দিয়ে কত কষ্টই না দিলেন, তবুও

সে দমল না, অবশেষে নরসিংহরূপে তার কাছে আসতে হল। বালকভক্তের কাছে এই তাঁর প্রথম পরাজয়। বর দিতে চাইলেন, প্রহ্লাদ দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, এ তোমার কেমন কথা 'আমি কি বণিক'? পুনরায় পরাজয়। ছলনা করে বলীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে পাতালগামী করলেন। কিন্তু অহৈতুকী ভক্তিবলে প্রেমের মূল্যে ভগবানকে তিনি কিনে রাখলেন, ভক্তের সঙ্গে ভক্তির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রেমের ঠাকুরকে 'দ্বাররক্ষক' রূপে থাকতে হল। অম্বরীষের কাছে তো অহৈতুকী ভক্তিতে অধীন হয়ে স্বীকারই করে ফেললেন — আমি অস্বতন্ত্র ভক্তাধীন। সুতরাং হে দুর্বাশা তোমাকে রক্ষা করতে অক্ষম'। এখানেও পরাজয়। সর্বশেষে, গোপের ঘরে বসে 'ভরা ডুবাইলেন' — কি হারটাই না ঠাকুর হারলেন। প্রথমেই ত যশোদার রজ্জুতে বাঁধা পড়তে হল; গোপিনীদের কাছে বারবার পরাজিত হয়ে তাঁদের প্রেমের ঋণে নিজেকে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। অহৈতুকী ভক্তির কী মনোরম প্রতাপ। গোপিনীদের কাছে প্রথম হারলেন — গৃহে পতিদের ও অরণ্যে হিংস্র জন্তুর ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বিফল করবার নিষ্ফল চেষ্টায়। তারপর পুনরায় হেরে গেলেন — বস্ত্রহরণে তাদের সর্বস্ব সমর্পণে, অকুণ্ঠ শরণাগতিতে। রাসক্রীড়ায় এসে অবশ্য দু দুবার জিতবার চেষ্টা করেছিলেন — একবার অভিমানিনীদের নিকট হতে সহসা অন্তর্হিত হয়ে, আরেকবার প্রেমবিধুরাগণকে পরিত্যাগের ভয় দেখিয়ে; কিন্তু হায় — চতুর চূড়ামণির সমস্ত কলাকৌশল ব্যর্থ হল তাদের অহৈতুকী ভালবাসার ইন্দ্রজালে; ধরা দিলেন, বাঁধা পড়লেন, ঋণী হয়ে রইলেন — 'ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং ...' তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করতে আমি অক্ষম। শ্রীমদ্ভাগবতে আদ্যন্ত এই অহৈতুকী প্রেমের জয়গীতি; মহাপ্রভুর জীবন ঐ ভাগবতের জীবন্ত রূপায়ন। তত্ত্ব যদি শুধু গ্রন্থেই থাকে জীবের শ্রেয়ঃ কোথায়? দ্বাপরেই কি অহৈতুকী ভক্তির লীলা ভক্ত ভগবানে হয়ে গেছে? এই ঘোর কলিকালে উপায় কি? ঐ দিব্যভাব — ঈশ্বর বিরহ - নিয়ত ক্রন্দন নর্ত্তন প্রিয় মিলনের জন্য আকুলি বিকুলি কি সম্ভব? এই বিষম কলিযুগে সেই সন্দিগ্ধ প্রশ্নের জীবন্ত সমাধান — প্রত্যক্ষ উত্তর হলেন — প্রেম পুরুষোত্তম মহাপ্রভু। বাংলাদেশে তাঁর আবির্ভাব; কিন্তু গঙ্গোত্রীর উৎস থেকে নির্গত হয়ে গঙ্গা যেমন সারা দেশের উপর প্রবাহিত হয়ে তার স্বতোৎসারিত স্নিগ্ধ প্লাবনে দেশকে সজীব করে চলেছে — তেমনি প্রেমাবতার মহাপ্রভুর দিব্য প্রভাবও সারাদেশকে সারা ভারতকে দীপ্ত, তৃপ্ত ও অভিস্নাত করে নীলাচলের সমুদ্রতীরে গিয়ে অসীম অগাধ দিগন্তবিস্তারী জলধির মতই অসীমভাবে অক্ষয় গতিসত্ত্বা নিয়ে নিরন্তর প্রবাহমানা। তাঁর প্রবর্ত্তিত এই জীবনবেদ — ঐ অহৈতুকী ভক্তির জয় হোক।

তবুও — কলিহত জীব আমরা, প্রশ্ন থেকে যায় — ঐ অহৈতুকী ভক্তি যা মহাপ্রভুর পক্ষে — গোপিনীদের পক্ষে সম্ভব — তার কি আমরা অধিকারী? মহাপ্রভু সে সংশয়ের নিরসন করে গিয়েছেন —

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়
নাম সংকীর্ত্তণ কলৌ পরম উপায়।
নাম সংকীর্ত্তণ হৈতে সর্বানর্থনাশ
সর্বশুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস।
খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়,
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধ হয়।

তাই বলছিলাম ভাই — প্রেমাবতার মহাপ্রভুর অভয়বাণী এনে দিয়েছে — অযুতযুগের অকূল ভরসা।

ঐ দেখা যায়, দিগন্ত বিস্তৃত উর্ম্মিমেখলা মহাসাগর — তার মাঝে জড়বাদ নাস্তিকতার হাঙ্গর কুম্ভীর; তরঙ্গ-ভঙ্গ মহাকাল — উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষেপ; এর মাঝে নাম সাধনের মুক্তিসরণী নিয়ে কাণ্ডারী মহাপ্রভু এসে দাঁড়িয়েছেন, দিশেহারা মানুষকে কলিহত ভক্তিহীন জীবকে ডাক দিয়ে বলছেন — 'অভীঃ। মাভৈঃ।

কলের্দোষঃ সমুদ্রস্য শুন একো মহান্ যতঃ
নাম্নাং সংকীর্ত্তনা দেব বহির্নির্যান্তি কল্মষাঃ।

কলির সমুদ্র পরিমান দোষ হলেও তার মহান গুণ, কেবলমাত্র নামসংকীর্ত্তণেই পাপতাপ দূরে যাবে — অহৈতুকী ভক্তিলাভ হবে। এই নাম হল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

আমাদের নামে রুচি হোক — শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে রতি জন্মাক।

এরপর বাবাজী তার সঙ্গীসহ আমাদের সোৎসাহে তীর্থ বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলেন। তিনি বললেন —.

ব্যাসদেব পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের পর, মহাভারত ব্রহ্মসূত্রাদি রচনা করার পরেও যখন প্রাণে শান্তি পেলেন না তখন এস্থানে এসে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। কোন গ্রন্থকারের শেষ বয়সের শেষ গ্রন্থেই ত তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি এবং পরিমিত কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই বেদব্যাস বিরচিত, তাঁর পরিণত বয়সের পূর্ণজ্ঞানসমৃদ্ধ রচনা শ্রীমদ্ভাগবত। তাই এখানে তপ, জপ, গায়ত্রী পুরশ্চরণে সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে। এইজন্য পরিক্রমাবাসী মহাত্মা মাত্রই এখানে আসাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। সোমবারে এখানে খুব ভীড় হয়। যে সোমবার সপ্তমী তিথি পড়ে তার মাহাত্ম্য এখানে খুব বেশী বলে গণ্য করা হয়।

আমি তাঁর বক্তৃতার প্রতিবাদ স্বরূপ বলে উঠলাম — না, না, আমি শুনতে চাই না। আমি আপনার মুখে ভাগবতের রোচক মনোহারী গল্প শুনতে চাই না। আমি আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমার কথার মধ্যে ভাগবতের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হুলের সন্ধান পেয়ে সাধুজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ মুখের ভঙ্গিমাতে ক্রোধের ভাব কিঞ্চিৎ প্রকাশ পেলেও তিনি দ্রুত তা সামলে নিয়ে বেশ সংযত কণ্ঠেই বললেন — বেশ! আপনার মুখ থেকে ভাগবত সম্বন্ধে আপনি যে মত পোষণ করেন তা শুনতে চাই।

আপনি যে বলছেন শ্রীমদ্ভাগবত 'সর্বশাস্ত্রের প্রণম্য!', 'সর্বশাস্ত্রের বিমর্দক! নিখিলেতর শাস্ত্রমত প্রণতচরণস্য শ্রীভাগবত স্যাভিপ্রায়েণ'! প্রভৃতির দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন প্রেমদানে কৃষ্ণ নামই সমর্থ। কাজেই কৃষ্ণ নাম শ্রেষ্ঠ। 'ব্রহ্ম তো কৃষ্ণ তনুর আভা মাত্র!'

কিন্তু একটু বিচার করলেই সহজেই বুঝা যায় — এ সমস্তই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর বিষময় ফল। গুজরাটে এখনও যে সাত্বত বংশের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সাত্বত বংশের বিখ্যাত নায়ক ছিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যে ধর্ম প্রচলন করেছিলেন তার নাম ছিল ভাগবত ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে 'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহস্মি' বলে বাসুদেব ও তিনি যে এক তা তো বলেই গেছেন। কৃষ্ণ নিজে বৈষ্ণব ধর্মের কোন পত্তন করে যান নি। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকারের মতে কৃষ্ণ মানুষ ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে 'দেবতা পরাৎপর ভগবান' বানানো হয়েছে। পূর্ব মালবের বেসনগর (প্রাচীন বিদিশা) হতে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতেও বাসুদেব কৃষ্ণের মানবীয় সত্ত্বার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন 'বৌদ্ধঘতজাতক' এবং জৈন 'উত্তরাধ্যায়ণ সূত্র' থেকেও আমরা জানতে পারি। কাজেই কৃষ্ণই 'পরাৎপর তত্ত্ব' এবং কৃষ্ণ নাম জপই 'পরম পুরুষার্থ' স্বীকার করা যায় কি করে? কৃষ্ণের যে মানবীয় সত্তা ছিল — তিনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ছিলেন না — তার পরিচয় মহাভারতে বহু স্থানে আছে। তাঁর 'নাম' জপই শ্রেষ্ঠ সাধনা তা অযৌক্তিক। কারণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী পাণ্ডব এবং যাদবগণের নিত্য দর্শন স্পর্শন সত্ত্বেও তাদের কি গতি হয়েছিল তা মহাভারত বিচার করলেই বুঝা যাবে। পাণ্ডবদের কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমভাব ছিল তাছাড়া কৃষ্ণকেই তাঁরা তাঁদের একমাত্র গতি, ভর্তা, প্রভু, নিয়ন্তা, শরণ এবং সুহৃদ বলে জানতেন। তবুও তাঁদের লোভ, দ্বেষ, হিংসা, কাপট্য, ছলনা, কাম থেকে মুক্ত হন নি। পরমগতি লাভ তো দূরের কথা, কৃষ্ণের দেহান্তের পর অর্জুন যখন বৃষ্ণি বংশীয় যদু পত্নীগণকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দস্যুগণ অর্জুনকে পরাস্ত করে যদুপত্নীগণকে হরণ করে নিয়ে যায়। কৃষ্ণগত প্রাণ অর্জুন কৃষ্ণ নাম স্মরণ করে তো শত্রু জয় করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি পারেন নি। আবার অবলা নারীরাও 'হা কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো!' বলে আর্ত হয়ে ভক্ত বৎসলের বর্ণাত্মক শ্রেষ্ঠ নাম মাহাত্ম্যে ভবসমুদ্র পার হওয়া তো দূরের কথা, সামান্য দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না।

আমার মনে হয় — বর্তমানের 'ওঁ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট প্রভুপাদগণ', কৃষ্ণ নামের যে শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য উদ্ভাবন করেছেন তা হয়ত দ্বাপরে ছিল না। কেবল কলির কাল মাহাত্ম্যে 'কৃষ্ণ' কথাটির শক্তি বেড়ে গেল! আবার দেখুন কৃষ্ণ সখী কৃষ্ণাসহ পঞ্চপাণ্ডব এবং মাতা কুন্তীর কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ নির্ভরতা জগতে অতুলনীয় হলেও কৃষ্ণের বিধান, এঁরা বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে নতমস্তকে মেনে নিলেও এঁদেরকে নরকস্থ হতে হয়েছিল! এত কৃষ্ণগত প্রাণতা, নিয়ত কৃষ্ণ সঙ্গ, নিত্য কৃষ্ণ স্মরণ, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ পাণ্ডবদেরকে পরমগতি 'অপ্রাকৃত ব্রজভূমে নিত্য পার্ষদত্ব' দান করতে পারে নি। মহাভারত থেকে এঁদের দেহরক্ষা এবং তৎ তৎ বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের মন্তব্যগুলি বলছি শুনুন —

(ক) প্রথমেই, 'যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টাযোগা নিপপাত মহীতলে'। ভীম দ্রৌপদীর এই যোগভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুর কারণ

জিজ্ঞাসা করলে যুধিষ্ঠির বললেন, 'পক্ষপাতো মহান্ অস্য বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে!' পতিব্রতা দ্রৌপদীর পঞ্চপতির প্রতি সমদৃষ্টিটুকুও নিয়ত কৃষ্ণ নাম স্মরণ, কৃষ্ণ নির্ভরতায় হয়নি!

(খ) তারপর সহদেবের পতন হল; ভীমের জিজ্ঞাসায় যুধিষ্ঠিরের উত্তর ঃ— 'আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোহমন্যত কঞ্চন।' কৃষ্ণ সঙ্গ, 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' দর্শনে সহদেবের মলিন অহংকারটুকুও দূর হয় নি।

(গ) নকুলেরও সেই দশা! কারণ, তাঁর দেহপতনের কারণস্বরূপ যুধিষ্ঠির বললেন — 'রূপেন মৎসমোনাস্তি কশ্চিদিত্যস্য দর্শনম্।' নকুল ভাবতেন তাঁর মত কেউ রূপবান নেই !

(ঘ) মৃত্যুমুখে পতিত হলেন অর্জুন, ভীম জিজ্ঞাসা করলেন —

'অথ কস্য বিকারোহয়ং যেনায়ং পতিতো ভুবি?'

যুধিষ্ঠির —'একোহহং নির্দহেয়ং বৈ শত্রূনিত্যর্জুনোহব্রবীৎ ন চ তৎ কৃতবানেষ শূরমানী ততোহপতৎ।'

'একাকীই সমস্ত শত্রুকে ভস্মীভূত করব' — একথা অর্জুন বলেছিল কিন্তু তা সে করেনি, এই জন্যই পতিত হল!'

যে অর্জুনের সম্বন্ধে কৃষ্ণ বলেছিলেন — 'মমৈব ত্বং তবৈব্যহং যে মদীয়াস্তবৈব তে — তুমি আমারই এবং আমি তোমারই, যারা আমার তারাই তোমার' (মহাভারত) — সে হেন অর্জুনের 'নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সুলভ দৈন্য' আসে নি, কৃষ্ণসঙ্গ আর কৃষ্ণনামের গুণে! পতনও হল!

(ঙ) তারপর ভীমের যখন দেহপাত হচ্ছে — যুধিষ্ঠির কারণ স্বরূপ বললেন — 'অতিভুক্তং চ ভবতা প্রাণেণ চ বিকত্থসে — অতিরিক্ত ভক্ষণ আর শক্তির দম্ভই তোমার পতনের কারণ।'

ভেবে দেখুন, বিদ্বানের বিদ্যাভিমান, বীরের বীরত্বগর্ব, রূপবানের রূপের অভিমান একটু থাকেই, আর তা থাকাটা এমন কিছু গুরুতর দোষের নয়। 'জীবন্ত কৃষ্ণ ভগবানের একান্ত তদ্‌গত ভক্তদেরও নয়ত একটু ছিল! কিন্তু তাই বলে সেই সামান্য দোষের জন্যই কৃষ্ণসখা-সখীর পতন হল, পাপের ফল স্বরূপ হল নরক ভোগ!! অথচ বৈষ্ণবদের এই 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' গীতায় প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন —

'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

মহাভারতকার এঁদের নরকভোগের কী নিদারুণ চিত্র দিয়েছেন দেখ — নরকে পাপীদের নির্যাতন ভোগ এবং আর্তনাদ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন —

'অহো! কৃচ্ছ্রমিতিপ্রাহ তস্থৌ স চ যুধিষ্ঠিরঃ
উবাচ, কে ভবন্তো বৈ কিমর্থমিহ তিষ্ঠত ?' (মহাভারত)

ওহো, কী নিদারুণ যন্ত্রণা। কে তোমরা? কেন এখানে আছ?

'কর্ণোহহং ভীমসেনোহহমিত্যেব বে বিচুক্রুশুঃ — আমি কর্ণ আমি ভীম এইভাবে তারা আর্তনাদ করে উঠল'।

আর যুধিষ্ঠিরেরও কিয়ৎকাল নরকদর্শন, নরকে স্থিতির কারণস্বরূপ ইন্দ্র বললেন — 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ — দ্রোণকে এই ছলনা বাক্য বলার জন্যই এই নরকভোগ! ব্যাজনৈব ততো রাজন! দর্শিতো নরকস্তব'।

যুধিষ্ঠির জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নি। বারেক যে ঐ ছলবাক্যটি দ্রোণকে বলেছিলেন তাও কৃষ্ণের আদেশে। আর শোনা যায়, কর্ণ কৃষ্ণকে তুষ্ট করবার জন্য পুত্র বলিতেও পশ্চাৎপদ হন নি। কর্ণের দান এবং অতিথিপরায়ণতা জগতে অতুলনীয়। কিন্তু হায়! এত দেবগুণের আধার হয়েও, কৃষ্ণদর্শন কৃষ্ণার্পিত প্রাণ হয়েও তাঁদের যদি মুক্তি না হয়ে থাকে, সামান্য সামান্য অভিমানের জন্য, কৃষ্ণ-আদেশে মিথ্যা বলে সেই মিথ্যাভাষণটুকুরও ফল যদি নিদারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ এবং নরকদর্শনের মধ্য দিয়ে ভোগ করতে হয় 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' কে প্রত্যক্ষ দর্শনেও যদি সামান্য অপরাধগুলি খণ্ডিত না হয়ে থাকে, কৃষ্ণ জীবিত অবস্থাতেই যদি পরমগতি দান করে যেতে না পারেন, তাহলে কৃষ্ণের দেহত্যাগের হাজার হাজার বছর পরে, যারা কৃষ্ণকে জীবনে দেখল না, তারা মৃত কৃষ্ণের একটি কল্পিত মূর্তি মাত্রকে 'অপ্রাকৃত চিন্ময় জ্ঞানে' পূজা করে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' রবে গগনভেদী চিৎকার করলেই কি মুক্ত হয়ে যাবে? 'একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে পাতকীর শক্তি নাই অত পাপ করে' — বৈষ্ণবদের এই কথানুযায়ী বর্ণাত্মক কৃষ্ণ নামের যদি এতই মহিমা হতারিগতিদায়কত্ব তাহলে পাণ্ডবদের এবং তার পরিজনদের অত দুর্দশা হল কেন?

এবার আসা যাক মহাপ্রভু আচরিত প্রেমধর্ম প্রসঙ্গে। চৈতন্যদেব যদি বর্ণাত্মক কৃষ্ণ নামকেই mean করে

থাকেন, তাহলে প্রথমবার 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে চৌষট্টি অপরাধ অগ্নিতে শুষ্ক তৃণবৎ ভস্ম হয়ে যাবার কথা। দ্বিতীয়বার উচ্চারণে প্রেমভক্তির প্লাবন ভক্তচিত্তের তটভূমিকে বিপ্লাবিত করে নিয়ে যাবারই কথা। কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে তার প্রমাণ মিলে কি ? বাস্তব ক্ষেত্রেও তা ঘটে কি ?

মহাপ্রভু বলে গেছেন, 'হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্তব, নাস্তেব, নাস্তেব, গতিরণ্যথা — হরিনাম ছাড়া কলির জীবের আর কোন গতি নেই'। মহাপ্রভু এবং অন্যান্য অনুভবী নামানন্দী সাধকরা হয়তো ভুল বুঝিয়ে যান নি কিন্তু সমাধিবান্ মহাপুরুষদের কথা অজ্ঞ জীবরা যে ভুল বুঝেছে, আর ভণ্ড সাধুরা ঐ সমস্ত মহাপুরুষদের কথার কদর্থ করে, উল্টো অর্থ করে ভুল বুঝিয়ে গেছে। মহাপ্রভু আবার বলেছেন, কৃষ্ণ নামে চিত্তদর্শন মার্জিত হয়, হৃদয় পদ্ম বিকশিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি হয় নির্বাপিত, অপরা-আনন্দ-সিন্ধু উথলে উঠে — ইত্যাদি, এগুলি নিশ্চয়ই তাহলে অতিস্তুতি নয় কিংবা সাধারণ মানুষকে নাম রটনা করাবার জন্য এই চাতুরী করে যান নি? নামে এ সমস্ত হয়, এটি উপলব্ধি করে তবেই না তাঁরা সত্য প্রকাশ করে গেছেন? কৈ, লক্ষ লক্ষ লোক তো দিন রাত নাম জপছে, তাদের 'ভবমহাদাবাগ্নি' নিভে গিয়ে, অপার-আনন্দ-সিন্ধু উথলে উঠছে কি ? এমনও তো দেখা যায়, একজন ফোঁটা তিলক মালা চন্দনে সুশোভিত, মুখে সদৈব 'হরি হরি', অঙ্গুলিও বিদ্যুৎবেগে কাষ্ঠ মালার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঘূর্ণমান, ত্রিশ বছর যাবৎ হরিনামাশ্রিত, কিন্তু কুটিলতায় Yago অর্থলোলুপতায় Shylock the Jew এদের কাছে নিতান্ত শিশু। লাম্পট্য, জালিয়াতি, পশুজনোচিত যে কোন অনাচারে এদের জুড়ি মেলা ভার। কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বর্ণাত্মক নাম জপে যদি কোন ফল হত তাহলে নিশ্চয়ই এদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটত। কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ মিলে কি ? মহাপ্রভু এবং প্রকৃত অনুভবী নামানন্দী সাধুরা সবাই মিথ্যাবাদী? না, নিশ্চয়ই নয়। ভণ্ড সম্প্রদায়ী সাধুরা 'নাম' বলতে ভুল বুঝিয়েছে আর তাতেই যত অনর্থ। 'নাম সংকীর্তনাদেব বহির্নির্যান্তি পাতকাঃ' — এই সংকীর্তন খোল করতালসহ তাণ্ডব নর্তন বা কর্ণপটহবিদারী কোন কলরোল নয়, এ হল 'অন্তরি সংকীর্তন' সেই 'Internal Melody', সেই 'Song Celestial' — ব্রহ্ম Region থেকে আসছে যে ধ্বনি, ক্লীং এর ঝঙ্কার, রাধা যা শুনে কৃষ্ণের বাঁশী বলে পাগল পারা হয়ে যেত। রাধা যমুনা তীরে ছুটে যেত কদম্ব বৃক্ষের উপর কৃষ্ণ যেখানে বাঁশী বাজাচ্ছে — বাঁশীর সেই মন মাতানো সুরের টান; কুল, শীল, মান, ভয়, জুগুপ্সা, জটীলা-কুটীলার ভ্রূকুটি শাসন তর্জন কিছুই সে গ্রাহ্য করেনি। অজ্ঞ জীব তাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি অনুযায়ী সাধিকা রাধিকা ঐ সব ঘটনার এক একটা মন-গড়া স্থূল অর্থ বুঝে নিয়েছে; যমুনা বলতে বুঝেছে যে যমুনা নদী, যমুনেত্রী থেকে বেরিয়ে বৃন্দাবন দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, ব্রজভূমি বৃন্দাবন বলতে বুঝেছে ঐ ভৌম বৃন্দাবন আর কদম্ব বৃক্ষ বলতে বুঝেছে কদমগাছ। তাই বৈষ্ণব প্রভুদেরকে দেখি ছুটে যায় বৃন্দাবনে; ব্রজধূলা বলে মাটিতে গোড়ালুটি খায়? অথচ মহাপ্রভু বারবার বলেছেন 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন', 'বিরজার পরপারে অপ্রাকৃত ব্রজভূমি'।

কিন্তু ভণ্ড সাধুদের Interpretation , আর অননুভবী বহির্মুখী ভাষ্যকারদের বাহ্যিক ব্যাখ্যাতে মোহিত হয়ে সকলে আজ Inner Spirit বাদ দিয়ে বহিরাচারের শত নাগপাশে বাঁধা। যে ব্রহ্মসংহিতার উপর ভিত্তি করে বৈষ্ণবধর্ম, তাতে বৃন্দাবন এবং গোকুল সম্বন্ধে কি বলেছে দেখুন —

'সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যাং মহৎপদং
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবং।'

— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে মহৎ ধাম তার নাম গোকুল, এটি সহস্রদল পদ্মবিশিষ্ট। এই পদ্মের কর্ণিকা সকল, অনন্তদেবের অংশভূত যে স্থান, তার নাম গোকুল।

একজন মরমী বৈষ্ণব সাধক এই সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব একটি গানের মধ্যে প্রকাশ করে গেছেন —

'যদি বৃন্দাবন এত ভালবাস হৃদি বৃন্দাবন বিহারী,
আমার এ হৃদি বৃন্দাবনে (বল) কিসের অভাব আছে হরি?
রয়েছে সরল সুষুম্না-যমুনা, পঞ্চবিধা রসে রহিয়াছে পূর্ণা;
কেশীঘাট বংশীবট আদি করি, ষট্‌চক্রে ছ'টি কুঞ্জ আছে হরি,
মূলাধারে রাধা কুলকুণ্ডলিনী, তোমার বিরহে আছেন বিষাদিনী,
বিহর-বিধূরা আছেন অচৈতন্য, রসিক-নাগর করহে চৈতন্য

বংশীগানামৃত বরিষণ করি।
হৃদয়কদম্ব অনাহাতে বসি, 'রাধা রাধা' বলি বাজাও শ্যাম বাঁশী,
শুনি বংশীধ্বনি রাই উন্মাদিনী
রসে রসবতী রসাপ্লুত হয়ে,
মহাভাববেশে দোলা খেয়ে খেয়ে,
ভেটিবেন তোমা সহস্রারোপরি।
শুনিয়া সে তান, হয়ে আনন্দে পূরিত
সহস্রারে কিবা তড়িত জড়িত,
অপূর্ব আলোকে প্রাণ বিমোহিত,
সমাধিস্থ হবো সব পরিহরি'।

পরব্রহ্ম Region -এ যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন সেই চিন্ময় ভূমির Presiding Deity -কে 'কৃষ্ণ' বলা হয়। তার সঙ্গে জীব যুক্ত হলেই তা আকর্ষণ করে 'কৃষ্ণভূমি সেই সহস্রার কর্ণিকোপরি গোকুলাখ্য মহাপুরী'তে নিয়ে যাবে। এটি আকর্ষণ করে বলে এর নাম, এই attribute অনুযায়ী 'কৃষ্ণনাম' দেওয়া হয়েছে। কাজেই কৃষ্ণনাম বলতে 'কৃ' 'ষ্ণ' এই অক্ষরগুলির সংযোগে বর্ণাত্মক নাম নয়; ঐ current জীবের মন প্রাণকে অন্তরপথে হরণ করে নিয়ে যায় বলেই তা 'হরিনাম'; 'হরি' এই বর্ণাত্মক কথাটা নয়। সহস্রার চক্র থেকে যে Current আসছে, মনুষ্য ভাষায় প্রকাশ করলে যা ক্লীং ক্লীং বলে মনে হয়, যার সঙ্গে যুক্ত হলে জীবাত্মাকে সহস্রারে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে, ঐ আকর্ষণী শব্দধারাই হরিনাম বা কৃষ্ণের বাঁশী। এই কৃষ্ণনাম একবার করলে অর্থাৎ বারেক ঐ ধারার সঙ্গে যুক্ত হলে সব পাপ তাপ দূরে যাবে; কারণ চেতন রাজ্যের অনুভূতি পেলে জীবের কামনা বাসনা রিপুর তাড়না কিছুই থাকবে না। এই কৃষ্ণের বাঁশী একমাত্র রাধা বা চৈতন্য প্রভৃতি সাধককে ডেকেই শেষ হয়ে যায়নি, যে ঐ ধারার সঙ্গে আজও যুক্ত হতে পারবে, সেই হয়ে যাবে আনন্দে বিভোর। সদ্‌গুরুর কৃপাতেই এই Inward Music , ক্লীং — তান, manifested হয়। এই হল যথার্থ 'শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন'; এই সংকীর্তনেই মহাপ্রভু কথিত 'চেতোদর্পণামার্জনম্' ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনম্' হয়, হয় 'শ্রেয়োঃকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম্' আর 'সর্বাত্মস্নপনম্', বাহ্যিক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে' বলে চিৎকার করলে নয়। তাই দেখা যায়, সাঙ্গপাঙ্গরা যখন খোলকরতাল সহ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে গগনবিদারী ধ্বনি করতো চৈতন্যদেব হয়ে যেতেন সমাধিস্থ। মানে কি? গুহ্যতত্ত্ব হল এই যে ঐ সমস্ত বাহ্যিক কীর্তন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিত সেই অন্তরি-সংকীর্তন, তিনি যুক্ত হতেন সেই ক্লীং Current -এর সঙ্গে। একথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, যার মধ্যে ঐ sound manifested হয়নি, সে কিন্তু বাহ্যিক কীর্তন কালে ঐ ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে না। অনুভবী পুরুষ ঈশ্বর পুরীর কৃপায় চৈতন্যদেবের মধ্যে ঐ বাঁশীর তান song celestial manifested হয়েছিল বলেই বাহ্যিক কীর্তনে তাঁর উদ্দীপনা হত, তাতেই বিভোর হয়ে তিনি অর্ধ বাহ্যদশায় কাটাতেন, অন্যদের শুধু হাতপা ছোঁড়াছুঁড়ি, নর্তন কুর্দন ছাড়া কিছুই লাভ হয় না।

মহাপুরুষদের রূপক, সমাধির ভাষা, মর্মকথা না জেনেই ভণ্ড আর অজ্ঞরা যত সব অনর্থ সৃষ্টি করেছে। তাই একজন বৈষ্ণব কবি সাধিকা রাধার মুখ দিয়ে কি ব্যক্ত করেছেন শুনুন,

'মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখী তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি, আঁধার পেরিয়ে আলা
আলার ভিতরে কালাটি রয়েছে, চৌকি রয়েছে সেথা
সে দেশের কথা এদেশে কহিলে মরমে লাগিবে ব্যথা।'

এর থেকেই আশা করি একটা ধারণা করতে পারবেন নাম বলতে, সংকীর্তন বলতে কোন 'বাহিরের' বস্তু কি না। 'বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়ে 'ভিতর দুয়ার' খুললে তবে সে বস্তু লাভ হয়।

চৈতন্যদেব বলেছেন, 'হরের্নামৈব কেবলম্' 'হরি' এই 'কথাটি কেবলম্' তো বলেন নি? হরের্নাম অর্থাৎ

হরির নাম = হরিনাম। পাছে অজ্ঞরা তালগোল পাকায় এজন্য তিনি Clearly বলে গেছেন 'হরের্নামৈব কেবলম্'। হরি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হর হরেঃ (হরির)। কাজেই 'হরের্নাম' বলতে বোঝায় হরির নাম। তবে কি তেমনি হরের্নাম, হরির নাম বলতে 'হরি' এই বর্ণাত্মক কথাটা নয়। বিখ্যাত পণ্ডিত নিমাই এর কি বিভক্তি জ্ঞান ছিল না? শব্দরূপ জানতেন না? 'হরের্নাম' এই উক্তি কি তাঁর অর্ধ বাহ্যদশায় Slip of Tongue?

সহস্রার ভূমি থেকে যে ক্লীং — Sound Current আসছে তার সঙ্গে সদ্‌গুরু কৃপায় যুক্ত হতে পারলে জীবাত্মাকে তা বাহ্যজগত থেকে অন্তর্জগতে, তমঃ থেকে জ্যোতির পথে হরণ করে নিয়ে যায় বলেই তাকে এই attribute অনুযায়ী হরি বলা হয়েছে। কিংবা হরি বলতে মহাপ্রভু যে পুরুষোত্তমকে বুঝতেন, সেই পুরুষোত্তম ভূমি হতে আগত Current কে শব্দের ধারাকে, বাঁশীর তানকে হরের্নাম বা হরির নাম বলে mean করে বলে গেছেন —

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলম্
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তব গতিরণ্যথা।'

চৈতন্যদেব কয়েকটি শ্লোকে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেছেন — নিজ হাতে কোন বই লিখে যান নি। তাঁর সমাধির ভাষা, অর্ধ বাহ্যদশার রূপক গূঢ় উপদেশ শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে নানা Colouring মিশে বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা, ইনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ছিলেন না। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী চৈতন্যদেবের উপদেশ যেমন নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুভূতি মত বুঝতেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবার তার সঙ্গে নিজের মনের Colouring মিশিয়ে চৈতন্যদেবের উক্তি বলে অনেক কথা লিখে গেছেন। তার পরবর্তীকালের বহিরাচারী বৈষ্ণবদের হাতে পড়ে আবার 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে গেছে। যেমন মহাপ্রভুর উক্তি বলে চৈতন্যচরিতামৃতের,

'এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।'

এখানের নাম বলতে সবাই বর্ণাত্মক নাম বলে বুঝে রেখেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি ঐটিকে মহাপ্রভুর উপদেশ বলে ধরা হয় তাহলে একটু বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারবে এখানেও ধ্বন্যাত্মক নামেরই ঈঙ্গিত আছে। 'এক নামাভাস' বলতে কৃষ্ণ বলতে কি বোঝায়, কৃষ্ণ কে, সেই পরব্রহ্ম পুরুষের নাম মাহাত্ম্য স্মরণ মনন করতে করতে বিষয় বাসনা, ঈশ্বরানুরাগের অভাব ইত্যাদি 'পাপদোষ' যাবে এবং 'আর নাম' বলতে এখানে ঐ ব্রহ্মাণ্ড ভূমি (Materio Spiritual Region) হতে আগত হর্রেনাম — ক্লীং এই Sound Current কেই mean করা হয়েছে; এই কৃষ্ণ নাম বাঁশীর তানই জীবকে পৌঁছিয়ে দেবে সহস্রার চক্রে, 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে' কৃষ্ণভূমিতে। তাই মহাপ্রভুর উক্তি, 'আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।'

মহাপ্রভু এবং অন্যান্য সাধুরা নামের যে মহিমা গেয়ে গেছেন, সেই নাম বলতে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কিসের ঈঙ্গিত করতেন, আশাকরি এতক্ষণে তা বুঝতে পারছেন। মহাপ্রভু ব্রহ্মাণ্ড ভূমির ঐ Sound Current কেই নাম বলতেন, ঐ ধারাই ছিল তাঁদের কাছে কৃষ্ণের বাঁশী, হরিনাম, 'হরের্নামৈব কেবলম্'। ব্রহ্মাণ্ড ভূমির সর্বোচ্চভূমি পর্যন্ত তাঁদের গতি ছিল, ঐ ধামের নামের ভেদ (Inner Secret) তাঁরা জানতেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যদি বেদব্যাসের শেষ বয়সের রচনা হত, তাহলে প্রভুপাদদের মত আমিও নিশ্চয়ই ভগবতকে প্রমাণিক গ্রন্থ বলে গণ্য করতাম। কিন্তু বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা নন, শুকদেবও পরীক্ষিতকে ভগবত নামক বৈষ্ণব গ্রন্থটি শোনান নি।

মহাভারতে যে সমস্ত ঘটনা নেই, যে ভাবধারা নেই কৃষ্ণের 'অপ্রাকৃত লীলা' বর্ণনা করতে গিয়ে, ভাগবতকার এমন সব অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ করেছে যে তার ইয়ত্তা নেই। কৃষ্ণের পুতনা-অঘাসুর-বকাসুর বধ, গিরি-গোবর্ধন ধারণ, কুব্জাবেশ্যা সঙ্গম, রাসলীলা, গোপিনীতত্ত্বাদি 'অপ্রাকৃত লীলা খেলা'র ঘটনা মহাভারতকার উল্লেখই করেন নি। যদি বলেন, বেদব্যাস মহাভারতে যে সমস্ত ঘটনা লেখেন নি, সেগুলি ভাগবতে লিখেছেন, মহাভারতে যা আছে , তাই যে ভাগবতে লিখতে হবে, তার কোন নিয়ম নেই , আর হুবহু সেই সেই ঘটনা লিখতে হলে তো দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনই থাকে না! ঐ দুইটি গ্রন্থই একই গ্রন্থকারের লেখা হলে ত একই ঘটনা সম্বন্ধে (যেমন পরীক্ষিতের মৃত্যু প্রসঙ্গ) দুইরকম, পরস্পর বিরুদ্ধ, বর্ণনা থাকবে না?

আর বেদব্যাসের মত দ্রষ্টা পুরুষের রচিত কোন গ্রন্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবধারা, ঘটনার অসামঞ্জস্য থাকার কথাও নয় — সম্ভব নয়।

ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। ইনি আচার্য শঙ্করের পরে এসেছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শঙ্কর আবির্ভূত হয়ে অদ্বৈতাবাদের প্রতিষ্ঠা করে যান। তিনি প্রধান প্রধান উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার টীকা ভায্যাদি রচনা করে গেছেন। ঐ সময় পর্যন্ত যদি এই ভাগবতের অস্তিত্ব থাকত তাহলে তিনি খণ্ডন বা মণ্ডনের জন্য এই বই-এর সম্বন্ধে কিছু লিখতেন। কিন্তু তাঁর প্রচারের মধ্যে ভাগবতের নামগন্ধও নেই। তাতেই মনে হয়, এই বৈষ্ণবমান্য ভাগবতটি আচার্য শঙ্করের পরে এবং শ্রীধরস্বামীর পূর্বে লিখিত হয়েছে। বিশেষ করে ভাগবতেরই দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এবং চতুর্থ স্কন্ধের উনবিংশ অধ্যায়ে জৈন বৌদ্ধ তান্ত্রিক কাপালিক ধর্মাদিকে 'পাষণ্ড মত' বলে নিন্দা করা হয়েছে। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচালিত হওয়ার পরে যে ভাগবত রচিত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করা যেতে পারে না। কাজেই বেদব্যাসের লেখা কি করে হতে পারে?

ভাগবত যে বোপদেবের লেখা, সে কথা নগেন সরকার প্রণীত বাংলা 'বিশ্বকোষ' এবং সুবল মিত্রের বাংলা অভিধান গ্রন্থেও উল্লেখ করা আছে।

'হেমাদ্রি' গ্রন্থে আছে,

'শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়োণরিতম্।
বিদুষা বোপদেবের শ্রীকৃষ্ণস্য যশোণ্বিতম্।'

ভাগবতের সঠিক লেখক কে, কোন সময় লেখা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি এই ভাগতেরই ঘটনা এবং বিষয়বস্তুর অসংলগ্নতা, অসামঞ্জস্য এবং অসারতা বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে পারি এই অর্বাচীন গ্রন্থটির লেখক আর যেই হোন না কেন — মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনী থেকে ঐ রকম পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনা, তত্ত্ব, তথ্য এবং সংকীর্ণ ভাবধারায় পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ লিখিত হতে পারে না।

প্রথমেই দেখি, শুকদেব পরীক্ষিতকে এই ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে — এটি কত বড় প্রচণ্ড মিথ্যা! কারণ, মহাভারতে বৈশম্পায়ন কৃত ভীষ্ম বাক্য বর্ণনায় জানা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই শুকের দেহান্ত হয়েছিল!

ভীষ্ম উবাচ —

'নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ শুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ।
অভিবাদ্য পুনর্যোগমাস্থায়াকাশমবিশৎ'॥ ৯

নারদের অনুজ্ঞা নিয়ে শুকদেব যোগাবলম্বন করতঃ আকাশে আবেশ করলেন। অনন্তর তিনি প্রজ্বলিত বিধুম পাবকের ন্যায় নিত্যনির্গুণ লিঙ্গবর্জিত আদিত্যান্তর্যামী পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হলেন —

ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নির্গুণে লিঙ্গবর্জিত।
ব্রহ্মণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধুমোহগ্নিরিব জ্বলন্'

শুকদেবের বিদেহ কৈবল্য লাভ হল; তিনি সর্বগত, সর্বতোমুখ এবং সর্বাত্মা হয়ে গিয়েছিলেন —

'শুকঃ সর্বগতো ভূত্বা সর্বাত্মা সর্বতোমুখঃ ॥ ২৩
অন্তর্হিত প্রভাবং তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা
গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎপরম'॥ ২৬

শুকের এই মহাপ্রয়াণ হওয়ায় ব্যাসদেব (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৩ অধ্যায়) পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। মহাদেব তখন আবির্ভূত হয়ে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন—

'স গতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রপাম জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে! ত্বং ত্বং কিমনুশোচসি' ॥ ৩৬

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই যাঁর দেহপাত হয়ে গেল তাঁর পক্ষে পুনরায় যুদ্ধশেষের বহু পরে, দ্বাপরের শেষভাগে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতকে সেই শুক কর্তৃক ভাগবতরূপী হরিকথা শোনানো কি করে সম্ভব?

এই রকম হাজার হাজার অসংলগ্ন বাক্যে ভাগবত পরিপূর্ণ। যদি ভাগবত বেদব্যাসেরই রচনা হয় তাহলে একই ব্যক্তির রচিত মহাভারত এবং ভাগবতের ভাব, মতবাদ, সিদ্ধান্ত এমন কি বলেন যে, বিভিন্ন চরিত্র বর্ণনায় এত তফাৎ কেন? যদি 'অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীবিগ্রহবাদী' বৈষ্ণবদের মত পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ নিয়ে প্রকট হয়ে ভাগবত কথা শুনিয়ে গেছলেন তাও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। কারণ, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে যখন প্রয়োপবেশনে ছিলেন মুনিগণ পরিবৃত হয়ে, তখন শুকদেব 'যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে' সেখানে এসে পৌঁছলেন। ভাগবতকার শুকদেবের বর্ণনা দিচ্ছেন 'তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ', তাঁর বয়স ষোল বৎসর! দেহ শ্যামবর্ণ, গঠন সুবলিত, বেশ দিগুমাত্র (উলঙ্গ) কেশজাল ধূলিধূসরিত — 'দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণ কেশং......স্ত্রীণাং মনোজ্ঞ রুচিরাস্মিতেন' — ইত্যাদি।

যদি অপ্রকৃত চিন্ময় দেহেই তিনি উপদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সেই চিন্ময় সুক্ষ্মদেহের কি ষোল বছর পরিমান পরিচ্ছিন্ন বয়স নির্ণয়, কেশজাল শ্যামবর্ণ ইত্যাদি থাকবে! কোন চিন্ময় বস্তুর যে দেশকাল দ্বারা পরিছিন্ন বয়স, বর্ণ, প্রাকৃতিক গঠন পারিপাট্য ইত্যাদি থাকতে পারে না, সর্বজ্ঞ বেদব্যাসের কি সেই জ্ঞানটুকু নেই? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই যাঁর দেহান্ত হয়েছে, তাঁর মুখ দিয়ে পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনানোর আখ্যায়িকা বেদব্যাস কি করে বর্ণনা করতে পারেন? জীবন্মুক্ত শুকদেবের পিতা ঋষি বেদব্যাসের কখনও এ ভ্রম হতে পারে না, তিনি ভাগবত রচনাও করেন নি। মহাভারত রচয়িতাই যদি ভাগবত রচয়িতা হতেন তাহলে তাতে ত কোন অসামঞ্জস্য থাকার কথা নয়। আবার একই ঘটনা দুই গ্রন্থে দুইভাবে একই গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত হতে পারে কি? যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবদের ভাগবত গ্রন্থের পত্তন সেই মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং তাঁর মৃত্যুর সম্বন্ধে মহাভারত এবং ভাগবতে কিরকম পরস্পর বিরুদ্ধ সামঞ্জস্যহীন বর্ণনা আছে দেখুন।

মহাভারতের আদিপর্বের ৪২ অধ্যায় আছে, পরীক্ষিৎ শমীক ঋষি প্রেরিত গৌরমুখের নিকট 'সাত দিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে' শৃঙ্গীমুনির এই অভিশাপ শুনে —

সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চৈব স তকা মন্ত্রতত্ত্ববিৎ।
প্রাসাদং কারয়ামাস একস্তম্ভং সুরক্ষিতং॥ ২৯
রক্ষাং চ বিদধে তত্র ভিষজশ্চৌষধানি চ।
ব্রাহ্মণান্ মন্ত্রসিদ্ধাংশ্চ সর্বতো বৈ ন্যাযোজয়ৎ।। ৩০
রাজকর্ষাণি তত্রস্থঃ সর্বাণ্যে বাকরোচ্চ সঃ।
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্মজ্ঞ সমন্তাৎ পরিরক্ষিতঃ।। ৩১
ন চৈনং কশ্চিদারূঢ়ং লভতে রাজ সত্তমম্।।
বাতোহপি নিশ্চরংস্তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে।। ৩২

'নিজেকে রক্ষার জন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন এক স্তম্ভ-প্রাসাদ তৈরী করালেন যে সেটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। স্তম্ভের চারিদিকে প্রধান প্রধান রক্ষক, বৈদ্য, নানারকম বিষ নাশক ওষধি এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে, রাজা তার মধ্যে থেকেই রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। সেই স্তম্ভটি তিনি এমনভাবে সুরক্ষিত করেছিলেন যে, কোনও প্রকার প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং বায়ুও তাতে প্রবেশ করতে সমর্থ নয়'। তারপর যেদিন সপ্তম দিন উপস্থিত হল তক্ষক সেখানে উপস্থিত হয়ে হস্তিনাপুরে রাজা সুরক্ষিত অবস্থায় রাজকার্য পরিচালন করছেন দেখে সূক্ষ্মভাবে একটি ফলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন এবং রাজাকে ঐ ফল নিবেদন করা হল — সেই ফলের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়ে সগর্জনে তাঁকে দংশন করলেন —

'তস্মাৎ ফলাদ্বিনিষ্ক্রম্য যৎ তদ্রাজ্ঞে নিবেদিতম্।
বেষ্টয়িত্বা চ বেগেন বিনদ্য চ মহাস্বনম্।
আদশয পৃথিবীপালং তক্ষকঃ পন্নগেশ্বরঃ॥' ৩৬ (মহাভারত, আদিপর্ব, ৪৫ অধ্যায়)

এইবারে ভাগবতে ঠিক ঐ ঘটনাটিরই কিভাবে বর্ণনা আছে শুনুন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায় আছে, শমীক ঋষির এক শিষ্য এসে মহারাজ পরীক্ষিৎকে শৃঙ্গীমুনির অভিশাপের কথা শোনালে রাজা বিবেচনা করলেন — 'আমি এতদিন বিষয় সুখে মত্ত ছিলাম, এখন আমার সংসারের প্রতি অবশ্যই বৈরাগ্য জন্মিবে'।

অতো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং বিমর্শিতৌ হেয় তথা পরস্তাৎ
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান উপাবিশৎ প্রায়ম মর্ত্তানদ্যম্॥

'অনন্তর ইহলোক পরলোক উভয়ই ত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের পদসেবাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন এবং অনশনে প্রাণত্যাগ করার বাসনায় সুরধনীর তীরে উপবেশন করলেন'।

Mark the difference. মহাভারতে দেখা যাচ্ছে , পরীক্ষিৎ প্রাসাদ তৈরী করিয়ে চারিদিকে বিষঘ্ন ওষধি এবং মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে সুরক্ষিত অবস্থায় রাজকার্য করতে লাগলেন; তাঁর বাঁচবার ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে। আর কৃষ্ণভক্ত ভাগবতকার কৃষ্ণমহিমা দেখানোর জন্য বর্ণনা দিচ্ছেন, অভিশাপ শুনেই পরীক্ষিতের মনে বাঁচবার ইচ্ছা থাকলো না, বৈরাগ্য দেখা দিল, তিনি সব ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণসেবাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে অনশনে প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসলেন।

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ প্রায়োপবেশং প্রতিবিষ্ণুপদ্যাম্।
দধৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবো মুনিব্রতো মুক্ত সমস্তসঙ্গঃ॥ ৭

'সেই পাণ্ডবতনয় এইরূপে গঙ্গাতীরে প্রয়োপবেশন করে অনন্যমনে কৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করতে লাগলেন এবং বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে মুনিদের ব্রত ধারণ করলেন'! এইবার কল্পনাকুশল ভাগবতকার এরপর একদল ঋষিকে পরীক্ষিতের কাছে এনে হাজির করলেন যাঁদের একজনও দ্বাপরান্তে পরীক্ষিতের সময় জীবিত ছিলেন না! ভাগবতকারের বর্ণনাটির বহর দেখুন! রাজা ঐ ভাবে প্রায়োপবেশনে বসার পরেই সেখানে অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ সুবাহু, মেধাতিতি, দেবল, অর্ষ্টিসেন, ভরদ্বাজ, গৌতম পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, নারদ প্রভৃতি আরও আরও অনেক দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি সেখানে রাজদর্শনে এলেন।

'অন্যে চ দেবর্ষি মহর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ,
নানার্ষেয় প্রবরাণ সমেতানর্ভ্যচ্চ রাজা শিরসা ববন্দে'।

রাজা ঐ সমস্ত ঋষিদিগকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে বন্দনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুনিবৃন্দ! আমি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছি , তা উচিত কি অনুচিত' । মুনিগণ তা অনুমোদন করলেন। এমন সময় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতে করতে 'ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম সুবলিত শ্যামবর্ণ দেহ' (!!) শুকদেব সেখানে এলেন। রাজা তাঁকে বন্দনা করে, শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে ভক্তি-বিনম্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যোগিগণের পরম গুরু। অতএব আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, মুমূর্ষু, বিশেষতঃ মুমুক্ষু মনুষ্য কি কাজ করতে পারলে সিদ্ধিলাভ করতে পারে? অতঃপর, শুকদেব কর্তৃক বিষ্ণুপ্রিয় কৃষ্ণকথা আরম্ভ। ভাগবতের সূচনা।

সমগ্র ভাগবত শোনানোর পর শুকদেব পরিক্ষিৎকে দেহত্যাগের অনুমতি দিয়ে যতিগণসহ চলে গেলেন। সাত দিনের মধ্যেই সব হয়ে গেল; on the 7th day, তক্ষক রাজাকে দংশন করতে এসে পথিমধ্যে দেখলেন, বিষ বৈদ্য কশ্যপও রাজসভায় যাচ্ছে। তক্ষক কশ্যপকে ধনদানে নিবৃত্ত করে (ঘুষ দানে!) ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে এসে পরীক্ষিতকে দংশন করলেন (ভাগবত)।

ইতিহাস পুরাণের যথার্থ জ্ঞান যদি নাও থাকে তবুও তো রামায়ণ পড়া জ্ঞানটুকু থেকেও তো বুঝতে পারবেন, ত্রেতাযুগে রামের আমলে যাঁদের নাম শুনেছন, সেই বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম ইত্যাদি যে সমস্ত ঋষিদের নামের List ভাগবতকার অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই দিয়ে গেল, তাঁরা কি দ্বাপরান্তে পরীক্ষিতের সময়েও জীবিত ছিলেন? 'শুকঃ সর্বগতো ভূত্বা সর্বতঃ সর্বতোমুখঃ', মহাভারতের এ কথা তো পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ব্যাসের নাম দিয়ে বই লিখে শুকদেবের মুখ দিয়ে বলাতে পারলে authoritative হবে, কৃষ্ণকথায়, অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনাদিতে একটা অনাদিত্ব প্রাচীনত্ব, প্রামাণিকত্ব এনে দেওয়া যাবে, এই আশায় কৃষ্ণভক্ত কোন প্রভুপাদ স্বকপোলকল্পিত, বহুবিরুদ্ধ ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ ভাগবত রচনা করে, ব্যাস শুকদেবের নামে চালালেও মিথ্যা কোনদিন জয়যুক্ত হতে পারে না। তাই সত্যের শ্বাশত মহিমায়, ভাগবতকারেরই বর্ণনায়, এমন ত্রুটি অসংবদ্ধ প্রলাপের দৃষ্টান্ত রয়ে গেল যে, যে কোন বিচারশীল লোক বিচার করলেই বুঝতে পারবেন, মহাভারত যিনি রচনা করেছেন, সেই বেদব্যাসের পক্ষে এই রকম অলীক ঘটনা ভাগবতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ মহাভারতকে কোনক্রমেই অপ্রমাণ্য বলতে পারি না। ভাগবতও তা স্বীকার করেছে। এ হেন মহাভারত থেকেই জানতে পারি, মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবত-কথা আদৌ উপদেশ করা হয় নি। তাই ভক্তির আতিশয্যে রচিত ভাগবত সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কল্পিত।

ভাগবতে এমন সব পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনা ও কদর্য কথা আছে যা বেদব্যাসের কলম থেকে বের হতে পারে না। যেমন ঃ—

১। ক) প্রথম স্কন্দের প্রারম্ভে ২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে —'শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনে কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ' — মহামুনি ব্যাসের রচিত এই ভাগবত.......

খ) 'যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভাগবান বাদরায়ণঃ'' (ভাগবত ১।১।৭) — বেদবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবান ব্যাস

গ) 'এবং চকার ভগবান ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ' ( ঐ ১।৪।২৪) — দীনবন্ধু ভাগবান ব্যাস .....

ঘ) 'এবং নিষম্য ভাগবান্ দেবর্ষে জন্মকর্ম্মচ' (ঐ ১।৬।১)

ঙ) 'নির্গতে নারদ সূত ভাগবান্ বাদরায়ণঃ' (ঐ ১।৭।১) — নারদ চলে যাওয়ার পরে ভগবান ব্যাস....

— ইত্যাদি কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বেদব্যাস ভাগবত লেখেন নি। কেন না, কেউ নিজ রচিত গ্রন্থে নিজেকে 'মহামুনি', 'বেদবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', 'দীনবন্ধু' 'ভগবান্ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেন না। কিন্তু বেদব্যাস নিজের গ্রন্থে নিজে আত্মশ্লাঘা করবেন এ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। বেদব্যাসের নামের পূর্বে ঐ সব অলঙ্কার দেখে মনে হচ্ছে , ভাগবত এমন লোকের লেখা, যাঁর কাছে ব্যাস ভক্তির পাত্র, পূজ্য।

২। ক) ভাগবতেই আছে (৭।১।৫) — 'নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কতয়িষ্যে হরের্কথাম্' — ভগবান ব্যাসকে প্রণাম করে হরি কথা বলছি.....

খ) 'কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবান শুকঃ'(ঐ, ১।৪।২)

গ) 'তং ব্যাসসুনুমুপযামি গুরু মুনীনাম্' (ঐ, ১।২।৩) — মুনিদের গুরু ব্যাসপুত্র শুকদেবের শরণ নিই......

ঘ) 'যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিনে' (ঐ, ১২।১৩।২১) — অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ যোগীন্দ্র শুকদেবকে নমস্কার ইত্যাদি।

— কেউ কি স্বরচিত গ্রন্থে নিজেকে প্রণাম করে? নিজ পুত্রকে প্রণাম করে? উপরের ভাগবত-বাক্যগুলি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে — ঐ গুলি ব্যাসোক্তি নয়। এমন কি, পরীক্ষিতের প্রতি শুকোক্তি-ও নয়। ঐগুলির রচয়িতা এমন একজন যার নিকট ব্যাসদেব ও শুকদেব উভয়ে পূজ্য ও প্রণম্য । কাজেই ঐ ভাগবত বেদব্যাসের লেখা নয়। কোনও কৃষ্ণভক্তের লেখা — একথা বলাই যুক্তিযুক্ত।

৩। ক) ভাগবতে (স্ক ১। অ ৩) অবতারদের তালিকা দিতে গিয়ে বলেছে —

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যাবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরো শাখা দৃষ্টা পুংসোহল্পমেধসঃ॥ ২১

— নিজের বই-এ নিজেকে কেউ 'অবতার' বলে না, নিশ্চয়ই ব্যাসদেবও আত্মপ্রচারধর্মী ছিলেন না! ব্যাসদেবেরও নিশ্চয়ই অবতার সাজবার সখ ছিল না! ভাগবতে বলা হয়েছে পরশুরামের পরে রামের আগে ব্যাসের জন্ম।

খ) তার পরের শ্লোকেই আছে —

নরদেবত্বমাপন্ন সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া। সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যান্যতঃপরম্॥

এখানে 'অতঃপরম' থাকায় স্পষ্টই বলা হচ্ছে , ব্যাসের পর রামাবতার। একথা ঠিক কি? রাম তো ত্রেতায়, ব্যাস তো দ্বাপরে। তাই না?

গ) দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয় যুগ পর্য্যায়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী ব্যাসব্যাং কলয়ে হরেঃ॥ (ঐ, ১।৪।১৫)

— 'যুগে পরিবর্ত্তের নিয়মক্রমে দ্বাপর নামক তৃতীয় যুগ উপস্থিত হলে অর্থাৎ দ্বাপরের আদিতে ব্যাসের জন্ম'—

ঘ) 'আবির্হিতস্তনুযুগং স হি সত্যবত্যাম' (ঐ, ২।৭।৩৬)

— এখানে বলা হল কৃষ্ণ অবতারের পরে, কল্কি অবতারের পূর্বে ব্যাসের আবির্ভাব....

— বাহবা! 'ভুলভুলাইয়া'!! এমন গোলকধাঁধা কি ব্যাসের বর্ণনা?

৪। ভাগবতের ১স্ক। ৩ অধ্যায়ে অবতারদের যে তালিকা আছে এবং ২ স্ক। ৭ অধ্যায়ে অবতারদের যে তালিকা আছে, এ দুই এর মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। সেখানে কি বলবেন, ব্যাসের স্মৃতিবিভ্রম?

৫। 'ধন্বন্তরিরিতিখ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্' (ঐ, স্ক ৮। অ ৮) — এখানে আয়ুর্বেদাচার্য্য ধন্বন্তরী সমুদ্র মন্থনের পর সমুদ্র থেকে উঠেছেন লেখা হল। কিন্তু স্ক ৯।১৭ অধ্যায়ে লেখা রয়েছে — 'ধন্বন্তরি দৈর্ঘ্যতম — আয়ুর্বেদপ্রবর্ত্তকঃ' — অর্থাৎ ধন্বন্তরী বৈদ্যরাজ ক্ষত্র বৃদ্ধবংশী দীর্ঘতমার পুত্র! সুতরাং ভাগবত সর্বত্র বেদব্যাসে রচিত নয়।

৬। হরিবংশে আছে — 'দশাযুত সমাখ্যাতা বাসুদেবস্য বৈ সুতাঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণের পুত্র সংখ্যা = ১০০০০×১০=একলক্ষ।

ভাগবত লিখেছে (১০। ৬১ অ),— 'একেক শস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রাণ্ দশ — দশাবলাং', অর্থাৎ এক একজন কৃষ্ণপত্নীর ১০টি করে ছেলে হয়েছিল। 'মাতবঃ কৃষ্ণজাতানাং সহস্রানি চ যোড়শঃ' ॥১৯॥ — কৃষ্ণপুত্রদের ১৬০০০ মা ছিলেন। কাজেই ভাগবত মতে কৃষ্ণপুত্রের সংখ্যা = ১৬০০০×১০= ১ লক্ষ ৬০ হাজার! কী রকম Contradiction দেখুন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে উভয় গ্রন্থের লেখক একজন নন। মহাভারতের অংশ হরিবংশ ব্যাসের লিখিত। কাজেই ভাগবতই ব্যাসের লেখা নয়।

৭। ভাগবতের সূচনাতেই দেখিয়েছি, উল্লেখ আছে — বেদের চারিভাগ করার পর ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত গীতা রচনার পর নাকি বেদব্যাস নারদের উপদেশে হরিলীলাপূর্ণ এই ভাগবত রচনা করেছিলেন! কিন্তু মহাভারতে আছে —

অষ্টাদশ পুরাণনি কৃত্বা সত্যবতী সুতঃ।<br>পশ্চাদ্ ভারতমাখ্যানং চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥

অর্থাৎ ব্যাসের সকল রচনার মধ্যে শেষ রচনা ভারত (মহাভারত)। কাজেই ব্যাসদেব ভাগবত রচয়িতা হলে, সকলের শেষে ভাগবত লিখেছেন — একথা বলতে পারেন না। অর্থাৎ মহাভারতকার ভাগবত লেখেন নি।

৮। ভাগবতকারের ভূগোল-জ্ঞানের নমুনা দেখলে চমকে উঠবেন!

ক) 'সমুদ্রাদর্ণবাদধি' খ) 'সরিতঃ সাগরাণ্ শৈলান' — এই সকল শ্রুতি স্মৃতিবাক্যে সমুদ্রকে সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন বলা হয়েছে। কিন্তু ভাগবতে আছে — প্রিয়ব্রত রাজার রথের চাকার দাগ থেকেই নাকি সমুদ্রের উৎপত্তি!! ঐ. রকম উদ্ভট কাহিনী বেদব্যাসের লেখা বলে মনে হয়?

৯। ভাগবতের স্ক৫।১৬ অধ্যায়ে আছে — 'জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন। দৈর্ঘ্য নিযুত যোজন। তার মধ্যে যে সুমেরু পর্বত আছে তার উচ্চতা এক লক্ষ যোজন। মন্দার বলে একটি পর্বত আছে — তাতে দেবচূত নামে একটি বৃক্ষ আছে, তার উচ্চতা ১১০০ যোজন! ঐ বৃক্ষ থেকে পর্বত শিখরের মত মোটা মোটা আম ফলে; সেই আম গলে গলে পড়ার ফলেই অরুণোদা নামক নদীর উৎপত্তি!! ঐরকম জাম গাছও আছে, হাতীর মত বড় বড় জাম হয়, সেই জামগুলি গলেই জম্বুনদের উৎপত্তি!!! ইত্যাদি। (এক যোজন = ৮ মাইল)। ঐ সব আজগুবি রূপকথার রচয়িতা ব্যাসদেব নন, তা বলাই বাহুল্য।

১০। হিরণ্যাক্ষ বধ প্রসঙ্গে ভাগবত বলছে, সে নাকি পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় জড়িয়ে উপাধান করে শুয়ে ছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে, তার মাথায় নিম্নদিক দিয়ে পৃথিবীকে মুখ দিয়ে শূন্যে তুলে ধরলেন ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন, পৃথিবী কি গোলাকার বা মাদুরের ন্যায় চতুষ্কোণ বিশিষ্ট!! পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে এখনকার একজন বৈজ্ঞানিক যা জানেন, ব্যাসদেব যদি ঐ গ্রন্থের রচয়িতা হতেন, তাহলে তাঁর মত দ্রষ্টা পুরুষের তা কি অজানা থাকার কথা? মনে রাখবেন ব্যাস প্রভৃতি সেযুগের ঋষিদের কাছে পৃথিবীর আকৃতি, পৃথিবীর গতিশীলতা এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তথ্য অজানা ছিল না —

ক) 'কপিত্থ ফল বৎ বিশ্বং'

খ) 'চলা পৃথ্বী, স্থিরা ভাতি বোম্নি সচলঃ তিষ্ঠন্তি।'

গ) 'অকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী যৎ স্বাভিমুখং (towards its centre) স্বশক্ত্যা........' (with force) ইত্যাদি।

১১। ভাগবতকার লিখেছে, পুতনার শরীর ছয়ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় লম্বা ছিল। কৃষ্ণ নাকি পুতনাকে বধ করে মথুরা ও গোকুলের মাঝখানে ফেলে দিয়েছিলেন। 'পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তর দ্রুমান চূর্ণয়ামাসয়াজেন্দ্র! মহদাসীৎ তদদ্ভুতং (১০ ৬ ১৪)!! মনে রাখবেন মথুরা আর গোকুলের দূরত্ব চার পাঁচ মাইলের বেশী নয়!!!

১২। বলরাম এবং কৃষ্ণকে আনবার জন্য কংস যখন অক্রুরকে পাঠালেন, তখন তিনি 'রথেন বায়ুবেগেন' বায়ুবেগগামী রথে চড়ে, মহামতি অক্রুর সেই রাত্রি মধুপুরীতে কাটিয়ে প্রাতঃকালে গোকুল যাত্রা করলেন, 'অক্রুরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপূর্য্যাং মহামতিঃ উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম' (ভাগ) এবং বায়ুবেগে রথ চালিয়ে (!!!) সূর্য্যাস্তকালে, গোকুলে এসে পৌঁছলেন! 'রথেন গোকুলং প্রাপ্ত সূর্য্যশ্চাস্ত গিরিং নৃপ! (শুকবাক্য!)' (ভাগ ১০, ৩৮, ২৪) তারপর অক্রুর যখন প্রাতঃকালে বলরাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুল থেকে start করলেন স্ত্রীলোকগণ কাঁদতে লাগলেন, 'স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনাম্ উদিতে সবিতর্য্যথ', বায়ুবেগে রথ চালিয়ে যমুনা অতিক্রম করে, 'রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্', সন্ধ্যাকালে বলরাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরাতে পৌঁছে গেলেন, 'মথুরামনয়ৎ রামং কৃষ্ণঞ্চৈব দিনত্যয়ে' (ভাগ ১০, ৪১, ৬)!!!

ঐরকম অবাস্তব অযৌক্তিক কথা কি শুকবাক্য হতে পারে? ঐরকম হাস্যকর কথা ব্যাসদেবের লেখা নয়।

১৩। পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে যাওয়ার সময় দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছলেন, এমন কি কুকুর একটিও তাঁদের সঙ্গে ছিল।

'ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ।
আত্মনা সপ্তমো রাজা নির্যযৌ গজসাহ্বয়াৎ।।' (মহাভারত)

তারপর মেরুপর্বতের শিখরদেশে এসে 'যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগী নিপপাত মহীতলে'। (মহা) কিন্তু ভাগবতে কি লেখা আছে দেখুন। মহাভারত যিনি লিখেছেন। সেই একই লোক বেদব্যাস যদি ভাগবত গ্রন্থের রচয়িতা হতেন, তাহলে এই রকম একটি ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর-বিরুদ্ধে কথা লিখতে পারতেন না —

কৃষ্ণের তিরোভাবের সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতাসহ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করলেন। কুরুকুলদেবী দ্রৌপদী দেখলেন পতিগত কেউ কারও জন্য বা তাঁর জন্যও অপেক্ষা করলেন না! তখন তিনিও বাসুদেবে উপগত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

'দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্।
বাসুদেবে ভগবতিহ্যেকান্ত মতিরাপতম্।। (ভাগবত ১, ১৫, ৫০)

১৪। দশম স্কন্ধে রাসলীলা বর্ণনাদি প্রসঙ্গে এমন সব প্রলাপোক্তি, অশ্লীল বর্ণনাদি আছে, যা মনে হয় ভাগবতকার একেবারে রসোন্মত্ত অবস্থায় লিখে ফেলেছেন। দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আছে, হেমন্তকালের প্রথম মাসে অর্থাৎ কার্তিক মাসে গোপকুমারীগণ, হবিষ্য ভোজনসহকারে, ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করল।

'হেমন্ত প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যাং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়নার্চন ব্রতম।।' ১

দেবী কাত্যায়নীর কাছে তারা বর চাইল, 'নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥৫॥, কৃষ্ণই আমাদের পতি হউন'। গোপিনীরা এই সময় পূর্ণ যুবতী কুমারী, কৃষ্ণের বয়স সাত বছর। এই ব্রত পালনকালেই কৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করলেন। বস্ত্র হরণকালে ভাগবতকারের বর্ণনা, 'গোপিনীরা উলঙ্গ অবস্থায় উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্বক বস্ত্র চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ঈষৎ অক্ষত যোনি দর্শন করিয়া প্রীত হলেন।'

'ততো জলাশয়াৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোক্তেরুঃ শীতকর্শিত্যঃ।
ভগবানাহতাবীক্ষ্য ....................................।।' (১০, ২২, ১৭-১৮০)

এদিকে বলা হল অবিবাহিতা কুমারী, তাদের আবার ঈষৎ অক্ষত যোনি অর্থাৎ সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল না

— এ কথায় প্রমাণ হয়, তারা বিবাহিত নতুবা ব্যাভিচারিণী ছিল! কিন্তু 'কুমারী' কথাটি থাকায় এবং কাত্যায়নীর নিকট 'কৃষ্ণই আমাদের পতি হউন' এই বর চাওয়ায় তারা যে বিবাহিত ছিল না এটা মানতেই হবে!! আশা করি অসামঞ্জস্য বুঝতে পারছেন কিন্তু এহ বাহ্য আগে বাঢ় আর —

তারপর শরৎকালে রাসলীলা সুরু হল। গোপকুমারীদেরকে কৃষ্ণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,

'যাতাবালা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চনং সতীঃ॥' (১০, ২২, ২৭)

হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে গমন কর, সিদ্ধ হয়েছ; অগামিনী যামিনীতে তোমরা আমার সঙ্গে বিহার করতে পারবে ....... ইত্যাদি।"

তদনুযায়ী, শারদোৎফুল্ল অপূর্ব শোভাময়ী পূর্ণ জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রিতে (ভাগ ১০, ২৯, ১), কৃষ্ণ একদিন গোপিনীদের সঙ্গে বিহার করবার ইচ্ছায় তাঁর মধুর বাঁশী বাজালেন! ব্যাস, কৃষ্ণের সেই, 'নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং' কাম বর্ধক গান শুনে গোপিনীরা এমন অধীরা উদ্বেলা হয়ে উঠল যে, যে যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই কৃষ্ণের কাছে ছুটে যেতে লাগল। 'তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ' — পতি (!!!) পিতা, ভ্রাতা বন্ধুগণের বারণ সত্ত্বেও ছুটে যেতে লাগল সব ফেলে রেখে!

'পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥' (১০, ২৯-৬)

যে শিশুদিগকে স্তন্য পান করাচ্ছিল, সে শিশুকে স্তনদান ছাড়িয়ে, যে স্বামী সেবা করছিল, সে সেই সেবা ত্যাগ করে ছুটে যেতে লাগল কৃষ্ণের নিকট! ভাগবতকারের এই বর্ণনানুযায়ী তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণপানে ধাবিতা এই গোপিনীরা পতিপুত্রবতী? কী ভীষণ প্রহেলিকা বুঝে দেখুন, মাত্র এক বছর আগে যারা 'কুমারী' ঈষৎ অক্ষত যোনি' ছিল, 'কৃষ্ণই আমাদের পতি হউন' এই যাদের বর প্রার্থনা ছিল, মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তাদের পতিপুত্র সব হয়ে গেল? তাহলে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তাদের তপস্যা এবং কাত্যায়নীর বরদান রইল কোথায়? তারপর রাসলীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগবতকার এমন সব যৌনক্রিয়া এবং নর্মলীলার বর্ণনা দিয়েছে যে, যে সমস্ত প্রভুপাদ ব্যাকরণের প্যাঁচ কযে কযে রাস পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলির দ্ব্যর্থবোধক গভীর রস ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করেন; তাঁদের টেনে বুনে অর্থ করার পণ্ডিতী প্যাঁচও ব্যর্থ এবং স্তব্ধ হয়ে যায়, প্রভৃতি আদিরসাত্মক শ্লোকগুলিতে!!

'বাহু প্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরুনীবীস্তনালভন নর্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণাম্, উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥' (ভাগবত, ১০, ২৯, ৪৬)

যাইহোক, গোপিনীরা যখন পতিপুত্রবতী, কৃষ্ণের সঙ্গে নিশ্চয়ই তারা উপপত্নীরূপে বিহার করেছিল। অনেকে বলেন, যৌনক্রিয়ার বর্ণনা থাকলেও কৃষ্ণের সঙ্গে গোপিনীদের কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিল না, যা কিছু ঘটেছিল সব 'অপ্রাকৃত' দিব্যদেহে! কিন্তু ঐ ভাগবতেই দশম স্কন্ধের বিরাশী অধ্যায়ে পাই, কুরুক্ষেত্রে একসময় সূর্যগ্রহণকালে সকল যাদব এবং পাণ্ডবগণ মিলিত হয়েছিলেন, গোপিনীরাও এসেছিল। তারা বহুকাল পরে কৃষ্ণকে পেয়ে অনিমেষ নেত্রে তাঁকে দেখতে দেখতে হৃদয় মধ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন সুখে তন্ময় হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাদেরকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করে সহাস্যে বললেন, 'সখীগণ স্বগণের প্রযোজন সিদ্ধির জন্য শত্রুদমনে ব্যস্ত থেকে আমি বহুকাল তোমাদের নিকট হতে দূরে আছি।'

যদি দৈহিক সম্পর্কই না ছিল তবে, গোপিনীরা ত মনে মনে আলিঙ্গন সুখ উপভোগ করছিল, কৃষ্ণও 'দিব্যদেহে' আলিঙ্গন দিতে পারতেন! কিন্তু মূঢ় ভাগবতকার বর্ণনা দিচ্ছে, কৃষ্ণ তাঁদেরকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে ........ ইত্যাদি। দৈহিক সম্পর্ক না হলে নিভৃত নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? আমি কৃষ্ণচরিত্রে দোষারোপ করবার জন্য এই quotation-গুলি দিচ্ছি না। মূঢ় ভাগবতকার কিভাবে কৃষ্ণচরিত্রকে হেয় করেছে, তা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। বেদব্যাস যে এই রকম অশ্লীল এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা লিখতে পারেন না, ভাগবত যে তাঁর লেখা নয়, এইটে যাতে বুঝতে পারেন এজন্যই ভাগবতের কাণ্ডকারখানাগুলি দেখাচ্ছি।

রাসলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত যৌনক্রিয়ার বর্ণনা আছে, অনেকে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেয়, বলে ও সমস্ত 'অপ্রাকৃত লীলা'। কিন্তু তা যে নয় তা তেত্রিশ অধ্যায়ে শুকমুখে প্রকাশ পেয়েছে, — 'মহারাজ!

সত্যসংকল্প শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে শুক্র অবরুদ্ধ করে গোপিনীদেরকে সম্ভোগ করেছিলেন'। রাজা পরীক্ষিৎও শুকমুখে ঐ সমস্ত অশ্লীল যৌনক্রিয়ার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন 'ব্রহ্মন! তিনি ধর্মসেতুর বক্তা, কর্তা এবং রক্ষক হয়ে কি করে পরদার সম্ভোগরূপ অধর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন?'

অনেক কথাই আমরা দ্ব্যর্থবোধক ভাবে বলি। কিন্তু বক্তার expression এবং বক্তব্য থেকেই শ্রোতা impression পায়, বক্তার মনোভাব কি, বক্তব্যই বা কি। পরীক্ষিত এমন কিছু 'কচি খোকা' বা অল্পজ্ঞ ছিলেন না। তিনি শুকদেবের মুখ থেকে রাসলীলার বর্ণনা শুনে 'পরদার সম্ভোগরূপ অধর্ম অনুষ্ঠানেই Bad Smelling পেয়েছিলেন বলেই না প্রশ্ন করেছিলেন —

স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মণ পরদারভিমর্শনম?

বর্তমানে গোপীপদরেণু আকাঙ্ক্ষী প্রভুপাদগণ এর আধ্যাত্মিক 'অপ্রাকৃত' ব্যাখ্যা আরোপ করবার চেষ্টা করলেও, ভাগবতকার কিন্তু শুকমুখে এই পরদার সম্ভোগের কোন আধ্যাত্মিক অর্থ দেন নি! শুকদেব উত্তর দিলেন —

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥ (ভাগবত ১০, ৩৩, ২৯)

'ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিগণের কখনও কখনও ধর্মে ও ব্যবহারে ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু অগ্নি যেমন সমস্ত দ্রব্য ভোজন করেও পবিত্র থাকেন, তদ্রূপ যাঁরা তেজস্বী ব্যক্তি তাঁরা সর্বপ্রকার কাজ করেও পবিত্রই থেকে যান, তাতে তাঁদের কোন দোষ স্পর্শ করে না।' অর্থাৎ ভাগবতের শুক বাক্যানুযায়ী (!) বোঝা যাচ্ছে; ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি যে কোন অনাচার ভ্রষ্টাচার করতে পারে!!

ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি তো সত্যস্বরূপ, বেদময়, পুণ্যময় হন, তাঁর পক্ষে কি কায়েন মনসা বাচা কোন রকমের অনাচার করা সম্ভব? 'ধর্মে ও ব্যবহারে' তাঁদের কোন রকম 'ব্যতিক্রমও কি সম্ভব? ভাগবতকারের কি সুন্দর Logic !

আর যদি তাই হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিকে যদি কোন দোষ স্পর্শ না করে থাকে, এই যদি ভাগবতকারের অভিমত হয়, তাহলে তৃতীয় স্কন্দে দ্বাদশ অধ্যায়ে সে কি করে লেখে, সৃষ্টিকালে স্রষ্টা ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হয়ে আপন কন্যা বাকের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তরপর মরীচি আদি পুত্রদের ভর্ৎসনায় লজ্জায় তিনি শরীর ত্যাগ করলেন! ব্রহ্মা কি ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি নন? স্থূলদেহধারী কৃষ্ণের চেয়ে সূক্ষ্মদেহধারী ব্রহ্মা কি শ্রেষ্ঠতর ছিলেন না? তা ছাড়াও, ভাগবতকারের আর একটি প্রলাপ — 'বাচং দুহিতরং তন্বী স্বয়ম্ভুর্হরতীং মনঃ ..... তমধর্মেকৃতমতিং বিলোক্য — পিতরং সূতা।' (ভাগবত স্ক ৩। অ।২৮ - ২৯) — স্রষ্টা ব্রহ্মা হলেন কামমোহিত তাও কন্যাকে দেখে! প্রজাপতি ব্রহ্মা কামজয়ী নন! সামান্য মানুষ একটা যত বড় লম্পট এবং পাষাণ্ড হোক্ কন্যাকে দেখে তার কোন পাপ লালসা জাগে না। কিন্তু ভাগবতকার ব্রহ্মাকেও এক কুৎসিত চরিত্ররূপে প্রকাশ করে স্রষ্টারই দেহান্ত ঘটিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! কথায় আছে, মূঢ়, দাম্ভিক, চপলমতি কোন মাতালের হাতে ধারালো তরবারি থাকলে তাতে যেমন অনর্থ ঘটে, তেমনি কৃষ্ণগুণানুবাদের রসকথায় রসোন্মত্ত ভাগবতকারও 'mighter than the sword' লেখনী মুখে কী অনর্থ ঘটিয়েছে দেখুন। দোহাই আপনাদের, আর যাই করুন, বিচার করে বুঝতে চেষ্টা করুন, এই ভাগবত আর যারই লেখা হোক, সর্বজ্ঞ ব্যাসদেব এর লেখক নন, মহাযোগেশ্বর শুকদেবও এর বক্তা নন।

১৫। ভাগবতের নবম স্কন্দের প্রথম অধ্যায় আছে — একদিন শিবের কোলে বিবস্ত্রা দুর্গা বসেছিলেন, এমন সময় ঋষিরা শিবদর্শনে এলেন। দুর্গা বিষম লজ্জায় পড়ে গেলেন। দুর্গাকে শান্ত করার জন্য বললেন — আজ থেকে কোনও পুরুষ এখানে এলেই সে স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। এই জন্যই না জেনে রাজা সুদ্যুম্ন সেই বনে ঢুকে যাওয়ায় তিনি নারী হয়ে গেলেন!! ঐ স্ত্রীবেশী সুদ্যুম্নের প্রেমে বুধ পড়লেন, তাঁদের একটি ছেলেও হল, নাম পুরুরবা। পরে সুদ্যুম্নের কুলাচার্য্য বশিষ্ট মহাদেবের স্তব স্তুতি করায় মহাদেব বর দিলেন — 'সুদ্যুম্ন একমাস স্ত্রীলোক আর একমাস পুরুষ থাকবে। 'মাসং পুমান্ স ভবিতা, মাসং স্ত্রী তবগোত্রজঃ।' শিবদুর্গার এরকম কদর্য্য চরিত্র চিত্রণ কি ব্যাসের পক্ষে সম্ভব?

১৬। ভাগবতের (স্ক ১০।অ ৫৫।৪০) শ্লোকটি হল —

যং ধে মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবাস্তন্মাতরো যদভজনরহরূঢ় ভাবাঃ
চিত্রং ন তৎ খলু রমাসুদবিম্ববিম্বেকামেস্মরেহক্ষবিষয়ে — কিমুতান্যনার্য্যঃ॥

অর্থাৎ প্রদ্যুম্নের রূপ শ্রীকৃষ্ণের সমান ছিল সেই জন্য মাতারাও তাঁকে আত্মীয় এবং ভর্তা জেনে অনুরক্ত হয়ে তাঁকে ভজনা করতেন।

ব্যাসের নাম দিয়ে চলে অপর একটি পুরাণে পাই — প্রদ্যুম্ন মায়েদের ঐ কদর্য ভাব দেখে তিরস্কার করছেন —

মাতৃভাবং পরিত্যাজ্য কিমেবং বর্ত্তসেহন্যথা।
অহো! দুষ্টস্বভাবোহতি স্ত্রীত্বে চাপল্যমানসা॥

যারা ঐ কদর্য্য লেখাকে ব্যাসের নাম দিয়ে চালায়, কৃষ্ণ এবং পত্নীদের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক কালি ছিটায় তারা কি হিন্দুধর্মের শত্রু নয়?

১৭। ভাগবতের অষ্টম স্কন্দের দ্বাদশ অধ্যায় আছে —

তস্যানুধাবতোরেতশ্চ স্কন্দামোঘরেতসঃ॥ ৩২॥
যত্র যত্রাপতন্মহ্যাং রেতস্তস্য মহাত্মনঃ।
তানি রূপ্যস্য হেম্নশ্চ ক্ষেত্রন্যাসল মহীপতে॥ ৩৩॥

অর্থাৎ সমুদ্র মন্থনের পর মোহিনীরূপের কথা শুনে শিব বিষ্ণুকে মোহিনী দর্শনের জন্য অনুরোধ করলে বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করলেন। তাই দেখে শিব মোহিত হয়ে গেলেন, কামার্ত হয়ে মোহিনীকে সম্ভোগের জন্য দৌড়াতে লাগলেন। অবশেষে শিবের বীর্য্য স্খলন হয়ে গেল এবং সে বীর্য্য যে যে বন উপবন পাহাড়ে পড়ল তা সব সোনার খনি হয়ে গেল!!

বলাই বাহুল্য, এইসব কদর্য্য, আজগুবি রূপকথার রচয়িতা বেদব্যাস নন।

১৮। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্দে নবম অধ্যায়ে আছে শ্রীভাগবান ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ দিয়ে বর দিলেন, 'ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ — আপনি সৃষ্টি ও প্রলয়েও কখনও মোহপ্রাপ্ত হবেন না' (২, ৯, ৩৬)। অথচ দশম স্কন্ধে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে, কৃষ্ণ মহিমা বাড়াতে গিয়ে ভাগবতকার লিখল — ব্রহ্মামোহন অধ্যায়; ব্রহ্মা গোবৎস এবং গোপবালকগণকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর ত্রুটি কাল অর্থাৎ মানুষের সম্বৎসর পরেও এসে দেখলেন, যমুনা-পুলিনে গোবৎস গোপবালক সবই ঠিক আছে, শুধু তাই নয়, তিনি দেখলেন প্রত্যেক গোবৎসও বিষ্ণুমূর্তি! এইভাবে ব্রহ্মা যে মোহিত হয়েছিলেন তার বর্ণনা দেওয়া আছে। শ্রীভগবানের বর রইল কোথায়? এও এক প্রহেলিকা!

১৯। ভাগবতের (২, ৭, ৩৯) শ্লোকে আছে 'ভগবান বুদ্ধাবতার হয়ে পাষাণ্ড বেশে অসুরদিগকে নানা উপধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন।"

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মণি নিষ্ঠিতানাং পুর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতুর্ভিঃ।
লোকন্ ঘ্নত্যাং মতি বিমোহমতিপ্রলোভং বেষং বিধায় বহু ভাষ্যত — (ঔপর্ধম্যম্)

ভগবানও তাহলে 'পাষণ্ড বেশ' ধারণ করেন? বিভ্রান্ত করবার জন্য দয়াময় হরি ভুল শিক্ষা দিয়ে জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করেন?

ঐ ভাগবতকারই আবার চতুর্থ স্কন্ধের উনবিংশ অধ্যায়ে বলছে, 'পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাবার জন্য ঈন্দ্র যে যে বেশ ত্যাগ ও গ্রহণ করেছিল, তাতেই জৈন, বৌদ্ধ কাপালিক প্রভৃতি পাষণ্ড মত সৃষ্টি হয়েছিল।' একবার বলছে, ভগবানের 'পাষাণ্ড বেশ' বুদ্ধাবতারই বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক; আরেকবার বলছে বৌদ্ধধর্মের মূলে ইন্দ্রের ছদ্মবেশ গ্রহণ! ক্ষমা প্রেম দয়া মুদিতা করুণা মৈত্রী ধর্মের উদ্‌গাতা মানবদরদী অমিতাভ বুদ্ধ, ভাগবতকারের মতে পাষণ্ড! কি বাবাজী! 'এই স্বাদু স্বাদু পদে পদে' ভাগবত শুনে অশ্রু, পুলক, শিহরণ, লোমহর্ষণ, রোমাঞ্চ দেখা দিচ্ছে না কি? জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক ধর্মের উল্লেখ থাকতে বোঝা যাচ্ছে না কি যে ভারতে ঐ ধর্মগুলি প্রবর্তিত এবং প্রচারিত হওয়ার পর ভাগবত লেখা হয়েছে? ভাগবত যে বেদব্যাসের লেখা নয় তা কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?

২০। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন, ব্রজরাজ কৃষ্ণগোপিনীদের সঙ্গে যে লীলা করেছিলেন রসগত বিচারে তাই নাকি শ্রেষ্ঠ। 'পরকীয়া প্রেমে হয় রসের উল্লাস' (চৈতন্যচরিতামৃত)। তাই গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেম 'পরমোৎকর্ষতা' লাভ করেছিল। রুক্মিনী সত্যভামাদি কৃষ্ণমহিষীও তাই কৃষ্ণচন্দ্রের তত প্রিয় নন, এঁদের স্থানও রাসমণ্ডলে নেই, কিন্তু গোপিনীদের রাসমণ্ডলে পূর্ণ অধিকার। শুধু তাই নয়, 'রাসেশ্বরী' শ্রীরাধা সহ 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' যে রাসলীলা 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামে করেছিলেন এবং আজও নাকি করে চলেছেন, ঐ সব গোপিনীদের দয়া না হলে সে রাসস্থলীর নিত্যলীলা দর্শন কারও ভাগ্যে ঘটতে পারে না। তাই সখী অনুগত হয়ে কৃষ্ণভক্তগণ ভজন করেন। এই গোপিনীরা পতিপুত্র ত্যাগ করে এসে কৃষ্ণরূপে মোহিত হয়ে শারদোৎফুল্ল রজনীতে উপপত্নীভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনত্রিশ, তেত্রিশ অধ্যায়ে এই রাসলীলা বা যৌনলীলা যাই বলুন, তার বর্ণনা দিয়েছে —

'দ্বৌমাসৌ তত্র চাবাৎ সীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্।। ১৭
পূর্ণ চন্দ্রকলা মৃষ্টে কৌমুদী গন্ধ বায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগনৈবৃতঃ।। ১৮
উপগীয় নামে গন্ধর্বৈ বর্ণিতা শোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণূর্যথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ।। ২১
......... ......... ......... .........
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদ বিহ্বললোচনঃ।। ২৩

'বলরাম নিশাভাগে গোপিনীদের আসক্তি উৎপাদন করে, তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস বাস করলেন; পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে সমুজ্জ্বল, কুমুদ্বতীর গন্ধবহ বায়ু কর্তৃক সেবিত যমুনার উপবনে গোপিনীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। বারুণী মদ গোপিনীদের সঙ্গে পান করে, হলধর মদবিহ্বল আরক্তলোচন হয়ে, মাতঙ্গীদের সঙ্গে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, গোপিনীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন'। (ভাগ ১০, ৬৫, ১৭ - ২৩) এই গোপিনীরা যে অন্য গোপিনী নয়, কৃষ্ণেরই নর্ম সহচরী রাসলীলার গোপিনী তাও ঐ অধ্যায়েই উল্লেখ আছে। বলরাম উপস্থিত হওয়া মাত্রই এরা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কৃষ্ণ কি আমাদের সেবা স্মরণ করেন? তাঁহার কথা আমরা কেনই বা বলি? তিনি যদি আমাদিগকে ছাড়িয়ে থাকিতে পারেন, তবে আমারও পারিব।' তারপরেই পূর্ণিমার রাত্রিতে যমুনার উপবনে সুরাপানসহ মদমত্ত হলধরের সহিত রাসলীলা সুরু!!!

কৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলার যারা আধ্যাত্মিক বা 'অপ্রাকৃত' রাসালো ব্যাখ্যা দেয়, বলরামের সঙ্গে গোপিনীদের এই যৌনলীলার কি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবে? কৃষ্ণ নয়তো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে স্বয়ং ভগবান। গোপিনীরা তাঁদের 'অপ্রাকৃত' চোখ দিয়ে এই 'অপ্রাকৃত ভগবানকে বুঝে, তাঁর সঙ্গে অপ্রাকৃত লীলা করেছিল কিন্তু বলরামের সঙ্গেও কি তাই? আর ছোটভাই-এর যারা নর্ম সঙ্গিনী, তারাই আবার বড়ভাই-এর সঙ্গে বিহার করে? যে গোপিনীরা এক 'কৃষ্ণগত প্রাণা' — যাঁর জন্য পতিপুত্রপ্রিয়পরিজন ত্যাগ করে এসেছিল তারাই এবার কি করে বলরামের সঙ্গে রাসলীলায় প্রবৃত্ত হল? মানুষী চিত্তে ত বিকার আসারই কথা! তাদের 'অপ্রাকৃত' চিত্তে বুঝি কোন রসবৈগুণ্য ঘটে নি? যদি বলেন, তারা সবই কৃষ্ণময় দেখত, বলরামও কৃষ্ণের এক মূর্তি, তাই তারা বলরামের সঙ্গেও বিহার করেছিল। তাই যদি হয়, তাহলে স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই ত বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণের মতে কৃষ্ণের মূর্তি, কৃষ্ণময় চোখে তাহলে সকলকে কৃষ্ণময় দেখে, গোপিনীরা যাকেই দেখবে, তারই সঙ্গে কৃষ্ণজ্ঞানে ঐ ধরনের আদিরসাত্মক রাসলীলা করতে পারে? বেদব্যাস কখনও এরকম কুরুচিপূর্ণ কাহিনী কোন বইএ লিখতে পারেন না। ভাগবত তাঁর লেখা নয়। ভাগবতের বর্ণনাগুলি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ ভাগবতকার তার 'অপ্রাকৃত' চোখে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে গোপিনীদের রাসলীলা বা যৌন বিহার সত্য সত্যই দেখে থাকেন, তাহলে গোপিনীরা যে জাররতা বারাঙ্গনা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ গোপিনীদের বলেছিলেন, 'কুলকামিনীদের জার সেবন স্বর্গচ্যুতির প্রধান কারণ।' বৈষ্ণবদের এই 'পূর্ণ ভগবানের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে গোপিনীরা স্বর্গচ্যুতা, কোন নরকে কে জানে! এখন, গোপীপদরেণু প্রার্থীর দল, যারা সখী অনুগত হয়ে, গোপীকৃপাকণা লাভের দ্বারা 'ওঁ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট হওয়ার সাধ করেন, তাহলে তাঁদের গতি কি হবে?

২১। ভাগবতের বহু বিখ্যাত প্রহ্লাদের উপাখ্যানটিও একবার পর্যালোচনা করে দেখুন। নৃসিংহ মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর ভগবান প্রহ্লাদকে বললেন, 'বর প্রর্থনা কর'। প্রহ্লাদ পিতার সদ্‌গতি প্রর্থনা করলেন। নৃসিংহ বর দান করলেন, 'হে নিষ্পাপ, তুমি আমার সকল ভক্তের উপমাস্থল। তোমার পুণ্যফলেই তোমার পিতা ঊর্ধতন একবিংশতি পুরুষসহ উদ্ধার হয়ে গেছেন'।

' ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতাপুতঃ পিতৃভিঃ সহ তেহনঘ!
যৎ সাধোহস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবন।।' (ভাগবত অ/৭,১০)

প্রহ্লাদের ঊর্ধতন পুরুষের তালিকানুযায়ী প্রহ্লাদ পঞ্চম পুরুষ মাত্র।

প্রহ্লাদের একুশ পুরুষ কোথায় যে, একুশ পুরুষসহ হিরণ্যকশিপু উদ্ধার হয়ে গেলেন? ভগবান অর্ধেক নর, অর্ধেক পশুরূপ ধারণ করায় (ভাগবত মতে!) তাঁর কি বিমল বুদ্ধি লোপ পেল! কিংবা, হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধে গদাপ্রহারে জর্জরিত হয়ে সেই ঘোর রৌদ্র বীভৎস রস তাঁকে মিথ্যাবাদী ভাগবতের মতই বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল? অথচ বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয়ই নাকি সনকাদি ঋষির অভিশাপে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং তার পরজন্মে দন্তবক্র শিশুপালরূপে জন্মে শত্রুতা করে করে তিন জন্মে মুক্ত হয়েছিলেন — একথাও ভাগবতে আছে!! যদি নৃসিংহের বর অনুযায়ী প্রহ্লাদের পিতাসহ ঊর্ধতন একুশ পুরুষ উদ্ধারই হয়ে যায় তাহলে রাবণ কুম্ভকর্ণরূপে, পরে দন্তবক্র শিশুপালরূপে জন্মাল কারা? ভগবান কি বর দেওয়ার সময় এ সমস্ত ভুলে গেছলেন? ভগবানের ভ্রান্তি? না তাঁর বর মিথ্যা হল? এর কোনটা সত্য? একটা মিথ্যা হলে অপরটাও মিথ্যা হয়, এইভাবে দুটো ঘটনাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ভগবান, নৃসিংহও হন নি, এসব বলেনও নি, ব্যাসদেবও এইসব 'গঞ্জিকা' প্রণয়ন করে যান নি। এ সমস্তই ভাগবতকারের মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

২২। এই ভাগবত যে বেদব্যাসের লেখা নয় তা নিচের ভাগবতের (২, ৭, ৩৬) শ্লোকটি বিচার করলেই ধরা পড়ে —

'কালেনমীলিধিয়ামবমৃশ্য ণৃনাং স্তোকায়ুষাং স্বনিগমো বত দূর পারঃ।
আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাম্, বেদক্রমং বিটপশোবিভজিষ্যতি স্ম।।'

'অহো! যুগে যুগে কালবশে মানুষের বুদ্ধি সঙ্কুচিত এবং পরমায়ু অল্প হয়ে আসছে দেখে ভগবান ভাবলেন, 'মৎকৃত বেদের পার গমন করা তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠছে', তাই সেই ভগবানই সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে উৎপন্ন হয়ে বেদতরুর শাখা বিভাগ করেছিলেন।'

ভাগবত যদি বেদব্যসেরই রচিত হত, তিনি নিজেই কি নিজেকে ভগবানের এক অবতার বলে আত্মশ্লাঘা করতে পারেন?

বাবাজীরা তুষ্ণীম্ভূত হয়ে বসে থাকলেন। হরানন্দজী ও আমার অন্য সঙ্গীরা আমার হাত ধরে জমাতের বাইরে টেনে আনলেন।

প্রেমানন্দ বললেন — আপনি ঠিকই বলেছেন। সাধুর ভেষধারী এই সমস্ত লোকদের দেখলে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। একটা কথা আপনাকে বলার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ভয়ে বলতে পারছি না। রাগে আপনার মুখচোখ যেমন লাল হয়ে আছে! শেষে না আমাদের উপর রেগে আমাদেরই সঙ্গ ছেড়ে দেন।

আমি বললাম — বলে ফেলুন, অত রাখঢাক কেন?

— আপনার জন্যই আমরা চব্যচুষ্য লেহ্য পেয় দ্বিপ্রাহরিক আহার হারালাম। আপনার জন্যই আমরা নিরাশ্রয় হলাম।

আমি প্রত্যুত্তরে কিছু বলবার আগে প্রেমানন্দ হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন। প্রেমানন্দের রসিকতায় তখন আমরা সবাই হাসছি। বেলা ৯টা বাজতে আমরা প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলাম। এরপর ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে সমস্ত সাধুদের নমস্কার জানিয়ে ডানদিকে ঘুরে ধীরে ধীরে পর্বতের ঢাল লক্ষ্য করে নামতে লাগলাম। চারদিকেই বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির মেলা। পাহাড়ের উৎরাই ভাঙতে আমাদের প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগল। ক্রমেই বড় বড় গাছের জটলা ফাঁকা হয়ে আসছে। আলপথে বড় বড় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নানারকম ফল পেকে আছে। কাঁঠাল ও আম গাছও আছে অজস্র।

মহানন্দস্বামী বললেন — দেখ, দেখ প্রেমানন্দ বৈষ্ণব সাধুদের স্বাদিষ্ট আহার না পাওয়ার জন্য আক্ষেপ

করছিল। পরিক্রমাবাসীদের জন্য মা নর্মদা থরে থরে কেমন খাদ্য সম্ভার সাজিয়ে রেখেছেন!

হঠাৎ এদিক ওদিকে তাকিয়ে মহানন্দস্বামী প্রেমানন্দের খোঁজ করলেন। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালাম প্রেমানন্দ একটি আম গাছে উঠে পাকা আম ঝোলা ভর্তি করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রেমানন্দ গাছ থেকে নামলেন। ইতিমধ্যে হরানন্দজী অপর দুই সন্ন্যাসী ত্রিদিবানন্দ ও যতীশ্বরানন্দের সাথে প্রায় তিনফুট লম্বা ও পাশ বালিশের মত চওড়া এক কাঁঠাল নিয়ে এলেন। আমরা সেখানে বসে পেট ভরে আম কাঁঠাল খেয়ে যাত্রা শুরু করলাম। বেলা প্রায় তিনটা বাজতে যায়। ঘোর জঙ্গল ও পাহাড়ের দুর্গম পথে হেঁটে আমরা নর্মদাকেও দেখতে পেলাম পর্বতগাত্র ভেদ করে বয়ে চলেছেন। নর্মদা স্পর্শ করে স্পষ্টতঃ রেখাঙ্কিত পথরেখা ধরে হাঁটতে লাগলাম। পেট ভর্তি থাকায় আমাদের চলার গতি কমে গেছে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর পাহাড়ের ডানদিকে আর একটি ছায়াচ্ছন্ন পাকদণ্ডী দেখে সেইপথে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। দেখলাম একটি ছোট পাহাড়ী নদী ঝরণার আকারে এসে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম।

হরানন্দজী বলে উঠলেন — এজন্যই মা নর্মদা তপোভূমি। এখানে শুধু সাধু মহাত্মারাই তপস্যা করেন না। দেবতারাও তপস্যা করেন। চারিদিকে কেবল শিব আর শিব। এমন সময় নর্মদা ও পাহাড়ী নদীর সঙ্গমস্থলে একটি প্রাচীন শিব-মন্দির দেখতে পেলাম। মন্দিরের দেওয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে লেখা — সঙ্গমেশ্বর মহাদেব, শোকলপুর। মন্দিরের মাথায় ধ্বজা। মন্দিরে দরজা নেই বললেই চলে। হয়ত ছিল, কত যুগের মন্দির দরজা ভেঙ্গে গেছে। বহুদিন কেউ পূজা করেছেন বলে মনে হয় না। প্রায় দু'ফুট উঁচু শ্বেতবর্ণের শিবলিঙ্গ। আমি মন্দিরের বারান্দায় ঝোলা গাঁঠরী ফেলে রেখে নর্মদার জল কমণ্ডলু করে নিয়ে এসে লিঙ্গ গাত্র মার্জনা করতে লাগলাম। এই দুর্গম বনপথে চন্দন, বিল্বপত্র আর কোথায় পাব! প্রণামই আমাদের পূজা। প্রণাম করতে করতে বললাম —

ওঁ শম্ভো শিব শিবকান্ত শান্ত শ্রীকণ্ঠ শূলভৃৎ।
শশিভূষণ সর্বেশ শংকরেশ্বর ধূর্জটে॥
পিণাকপাণে গিরিশ শিতিকণ্ঠ সদাশিব।
মহাদেব নমস্তুভ্যং দেবদেব নমোঽস্তুতে॥
স্তুতিকর্তুং ন জানামি স্তুতিপ্রিয় মহেশ্বর।
তব পদাম্বুজ দ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু মে॥

হে শম্ভো! শিব, শিবকান্ত, শান্ত, শ্রীকণ্ঠ, শূলভৃৎ, শশিভূষণ, সর্বেশ, শংকরেশ্বর, ধূর্জটে, পিণাকপাণে, গিরিশ, শিতিকণ্ঠ, সদাশিব, হে মহাদেব! তোমাকে প্রণাম, হে দেবাদিদেব! তোমাকে প্রণাম। হে স্তুতিপ্রিয় মহেশ্বর! আমি স্তব করতে জানি না। হে ভগবান! তবুও আপনি যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে আপনার চরণকমলে আমার অবিচল ভক্তি উৎপন্ন হোক, এইমাত্র প্রার্থনা।

আমার প্রণাম-রূপ পূজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি চারিদিক নিথর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা। কেবল নাম না জানা নদীর স্ফটিক জল গর্জন করতে করতে নর্মদায় আছড়ে পড়ছে আর ফেনিয়ে উঠছে। সেই ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের একটানা গর্জন যেন সাতপুরার অট্টহাস্য। কোথা থেকে যেন সুগন্ধ ভেসে আসছে। ভাবলাম, কাছেই জঙ্গল, জঙ্গলে সুগন্ধি বনফুলের অভাব নেই। সেই গন্ধই হয়ত ভেসে আসছে! কিন্তু গন্ধ ক্রমশই উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে বসে থেকে সেই অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করে প্রেমানন্দ বললেন — আপনারা ভাবছেন, যে সুগন্ধি ভেসে আসছে তা হয়ত কোন বনফুলের কিন্তু তা নয়। এই সুগন্ধি ভেসে আসছে মন্দিরাভ্যন্তরের শিবলিঙ্গের গাত্র থেকে।

অল্প স্বল্প হিমেল বাতাস বইছে। মন্দিরের ভিতর গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম। প্রায় বার মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছি। ঘুম পাচ্ছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি তখন কত জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। গোটা মন্দির একটি সুগন্ধীতে ভরে আছে। বিছানায় উঠে বসলাম। দেখি, আমার অপর সঙ্গীরা তখন ঘুমে অচেতন। বসে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবছি — দু'ধারে অরণ্য শ্যামগম্ভীর পর্বতমালার মাঝখানে ভারত-ভূগোলের অতি আশ্চর্য সৃষ্টি এই নর্মদা উপত্যকা। মা নর্মদে, তুমি ঋষিদের চোখে সৃষ্টির পালয়িত্রী,

সভ্যতার লালয়িত্রী হয়েও তপস্যা বিধাত্রী বরদা। বরদে একই অঙ্গে তোমার কত রূপ! মাঝে মাঝে কোথাও অরণ্য সঙ্কুল, কোথাও রুক্ষ বন্ধুর — যেন রুদ্র সাজে সেজেছ। আবার তীরে তীরে তোমার কত শ্যামল বনানী, কত শস্যক্ষেত্র, কত গ্রাম, কত জনপদ, কত ঘাট, কত তীর্থ মন্দির — এই সকলের মধ্যে তোমার শিবময়ী কল্যাণী রূপটি ফুটে বেরিয়েছে। মা! ক্ষণেকের তরে, ক্ষণিকের তরে তোমার উর্জস্বল বিভূতি অপাবৃত কর।

আমি বিভোর হয়ে কলকণ্ঠে গেয়ে উঠলাম —

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পূণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে।।
লক্ষ্য-শূণ্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল-পাথারে।
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
(তব) শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর-সলিলে-গগনে,
আছ বিটপী-লতায়, জলদের গায়, শশী-তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরিব কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে। (কান্তকবি রজনীকান্ত)

হরানন্দজী উঠে দরজার ভাঙ্গা পাল্লাটি খুলে দিলেন। আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। আকাশে সূর্যোদয়ের আভাস লেগেছে। আমি প্রাতঃকৃত্য করতে বাইরে গেলাম। নর্মদায় মুখ হাত ধুয়ে সঙ্গমেশ্বরজীকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি সঙ্গীরা গতদিনের সংগৃহীত আম মহাদেবকে ভোগ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে মহানন্দস্বামী রেবাখণ্ড খুলে সঙ্গমেশ্বর তীর্থের বিবরণ খুঁজে বের করেছেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই তীর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন —

ততো গচ্ছেৎ পরং তীর্থং সঙ্গমেশ্বরমুত্তমম্।
নর্মদা দক্ষিণে কুলে সর্বপাপভয়ারহম্।।
বিন্ধ্য নির্জর নিষ্ক্রান্তে পুণ্যতোয়া সরিদ্‌বয়া।
প্রবিষ্টা নর্মদাতোয়ে সর্বপাপপ্রণাশনে।।
কৃষ্ণবর্ণা হি পাষাণা দৃশ্যন্তে স্ফটিকোজ্জ্বলাঃ।।
সঙ্গমে তত্র যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ সঙ্গমেশ্বরম্।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম।।

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সঙ্গমেশ্বর তীর্থে গমন করবে, সর্বপাপভয়হরণকারী এই সঙ্গমেশ্বর তীর্থ রেবার দক্ষিণতীরে বর্তমান। বিন্ধ্যের এই ঝরণাধারা পুণ্যতোয়া সর্বপাপনাশন নর্মদায় প্রবেশ করেছে। এর প্রভাবে উৎপন্ন কৃষ্ণবর্ণ পাথর স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল। এই সঙ্গমে স্নান করে সঙ্গমেশ্বরের পূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

যতীশ্বরানন্দ সকলের গাঁঠরী বেঁধে ফেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পুনরায় সঙ্গমেশ্বরজীকে প্রণাম জানিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম খোয়া এবং পাথর ফেলা একটা রাস্তা ধরে। পাহাড়ী ঝরণার ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের শিকরকণায় আমরা প্রায় ভিজে গেলাম। গাছপালা থেকে জল ঝরছে। এখন আমাদের লক্ষ্য — ব্রহ্মাণ-ঘাট তীর্থ।

ভেজা শরীরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম নর্মদা মাতার কোলে কোলে। পথ কঙ্করময় তবে মানুষ চলে চলে অনেকটা মসৃণ হয়েছে। নর্মদার এই উপত্যকা-অঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ বলে মনে হল। পাহাড়ের উপর দিকটা বনস্পতি সমাকীর্ণ হলেও উপত্যকার সমতলভাগ গম, বাজরা, অড়হর এবং আরো নানারকম শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ দেখছি। রাস্তার দুপাশে শাল, সেগুন, খয়ের, আমলকী, আম, কাঁঠাল ও হরিতকী গাছ। উত্তরতট পরিক্রমাকালে মুণ্ডমহারণ্য যেমন একটি শালের পরেই একটা সাজা গাছ দেখা যায় তেমনি দক্ষিণতটে এখানে একটি ধব গাছের পরেই একটি তিন্দুক গাছ দেখা যায়। মাঝে মাঝে পল্লী গড়ে উঠেছে। পাকা বাড়ী, কুঁড়েঘর, পাথরের ঘর সবই আছে। গোঁড়, রাজপুত, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের বসতি।

ধীরে ধীরে আমরা আরও ঘনঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। পথ ক্রমশই দুর্গম হয়ে উঠছে। পায়ের নীচে এবড়ো খেবড়ো পাথরের উপর হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ একটা চাপা গোঁ গোঁ ফোঁস ফোঁস শব্দ ক্ষীণভাবে ভেসে আসছে শুনতে পেলাম। বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। ক্রমশঃ গোঁ গোঁ ফোঁস ফোঁস শব্দ এগিয়ে আসছে বুঝতে পারলাম। একটু পরেই গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি, একদল বুনো মহিষ ছুটে আসছে। যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম সেই পথেই তারা ছুটে আসছে। সামনা সামনি হলে কি যে ঘটত তা একমাত্র মা নর্মদাই জানেন। তারা আশেপাশে কোনদিকে না তাকিয়ে হুড়হুড় করে সোঁ সোঁ শব্দে দৌড়ে গেল। চার পাঁচ হাত দূরে একটা তিন্দুক গাছের আড়ালে গাঁঠরী ও কমণ্ডলু পড়ে আছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। ঘেমে নেয়ে গেছি। প্রায় আধ ঘন্টা পরে আমরা কিছুটা সুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে সবাই হাঁটতে লাগলাম। সঙ্গমেশ্বর মন্দির থেকে সকাল সাতটায় যাত্রা করেছিলাম, এখন বেলা প্রায় ১২টা বাজতে যায়।

আমরা এক সার শিমূল গাছ ও জংলী গাছের জটলা পেরিয়ে কোঠিয়া ঘাটে এসে পৌঁছলাম। এখানকার শিমুল গাছগুলি যেমন কন্টকাকীর্ণ তেমনি লাল লাল ফুলে শোভিত।

বড় বড় পাথর ও কাঁটাগুল্মে ভরা দৈত্যাকৃতি বিশাল বিশাল গাছের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা মোটা লতা ও বনের ফুল। বন্য প্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, নিজের সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্যে যেন নিজেই মুগ্ধ, বাক্যহারা। পাহাড় ও অরণ্য ভেদ করে নর্মদা বয়ে চলেছেন ভীম গর্জনে।

প্রতি মুহূর্তে আশা করছি এই বুঝি কোন হিংস্রজন্তু ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি একটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ড। তাতে লেখা — নরসিংহপুর। এখান থেকে নরসিংহপুর জেলা আরম্ভ। মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পেলাম একজন সাধুমূর্তি হাসতে হাসতে আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঝোলানো আছে একটি রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে ত্রিপুণ্ড্র। হাতে কমণ্ডলু। বললেন — নরসিংহপুরের প্রধান শহর নরসিংহপুর। যেহেতু সিনোর নামে একটি ছোট নদী নর্মদাতে মিশেছে তাই এই মহল্লার নাম সিনোর। জব্বলপুর নর্মদার উত্তরতটে অবস্থিত বলে নরসিংহপুর থেকে জব্বলপুর যাবার কোন রাস্তা নেই। রেলপথে যাওয়াই সুবিধা। এখান থেকে মাইল দশ দূরে করেলি। করেলি থেকে উত্তরমুখী রাস্তায় নয়-দশ মাইল হেঁটে গেলেই নর্মদা তীরে পাবেন পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ তীর্থ। আপনারা ক্লান্ত। আজকের রাতটা আমার ঝোপড়ায় কাটিয়ে যান। নর্মদার পারে আমার কুটির আছে। একটাতে আমি থাকি। অপরটিতে মাঝে মাঝে পরিক্রমাবাসীরা এলে থাকেন। আপনাদের কোন কষ্ট হবে না।

কথা বলতে বলতে সিনোর মহল্লার ভিতর দিয়ে নর্মদার তীরে তাঁর কুটীরে নিয়ে এলেন। পিছনেই জঙ্গল। কুটীরগুলির চারপাশ তুলসীগাছ ও আকন্দ গাছে ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে পিছনের জঙ্গলের গাছে হনুমানের হুপ-হাপ শব্দ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা সেখানে গাঁঠরী আদি রেখে নিজেদের আসন বিছিয়ে নিলাম। একটু পরে সাধুজী আমাদের ঘরে একটি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গেলেন। আজ সারাদিনই কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে একটানা হেঁটে এসেছি, খুবই ক্লান্ত। আমাদের হাত পা টন্ টন্ করছে, ঘুম পাচ্ছে। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি সাধুজী মধুর সুরে গেয়ে চলেছেন —

ওঁ সর্বষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।
অসতো মা সদ্গময়॥
তমসো মা জ্যোতির্গময়॥
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।

অসত্যের পথ হতে হে দয়াল!
নিয়ে চল সদা সত্য পথে,
অবিদ্যা তিমির ভেদি
নিয়ে চল জ্যোতির সাক্ষাতে
মৃত্যু পথ হতে নিয়ে চল,

যেথা আছে অমৃতের ধাম।
হে সত্য! অমৃত জ্যোতিঃ!
লহ মোর প্রাণের প্রণাম॥

ওঁ হিরন্ময়েন পাত্রেন, সত্যস্যাপিহিতম্ মুখম্।
তৎ তং পুষণ্! অপাবৃণু, সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে সবিতা! তোমার কল্যাণতম রূপ,
করো অপাবৃত।
সেই দিব্য আবির্ভাবে হেরি আমি,
আপন আত্মারে,
মৃত্যুর অতীত॥

ওঁ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাহস্য জন্তো নির্হিতো গুহায়াম।
তম্ অক্রতুম্ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতু প্রসাদাৎ মহিমানম্ ঈশম্॥
বেদাহমেতম্ অজরং পুরাণম্, সর্বাত্মানম্ সর্বগতম্ বিভূত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য, আনন্দরূপপম্ অমৃতম্ যদ্ বিভাতি॥

ধূলির আসনে বসি,
ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে,
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান্
মহৎ হতে মহীয়ান্ —
ইন্দ্রিয়ের পারে তার
পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি —
দেহের ভেদিয়া যবনিকা।
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা॥

কোনদিকে দৃকপাত না করে হাততালি দিয়ে ছন্দে ছন্দে দোল খেতে খেতে তাঁর আলোকের আবাহনে আমরাও বিছানা ছেড়ে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালাম। তাঁর দরাজ গলার এইরকম ভাবগম্ভীর বন্দনা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আকাশে পূর্ণ সূর্যের উদয় হয়েছে। সাধুজী আমাদের নিয়ে চললেন নর্মদায় স্নান করতে। পথে যেতে যেতে সাধুজী বললেন — এই স্থান মহর্ষি ভৃগুর পিতা ঋষি বরুণের তপস্যাস্থল। এখানেই ভৃগু তপস্যার দ্বারা তাঁর পিতার কাছ হতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন। আমি বললাম — মহর্ষি ভৃগুর তপস্যার স্থল দেখে এসেছি অমরকন্টকে, যার নাম — ভৃগু কমণ্ডলু। যেখানে নর্মদা মিলিত হয়েছে সমুদ্রে, ভারোচের কাছাকাছি — সেখানকার নাম ভৃগুকচ্ছ। নর্মদার আদিতেও ভৃগু, অন্তেও ভৃগু। এখানেও যেমন এবং আরও বিভিন্ন স্থানে ভৃগুর তপোবহ্নি দেদীপ্যমান, তার মানে সমগ্র নর্মদা জুড়ে ভৃগুর প্রভাব।

সাধুজী — প্রাচীন ভারতের ঋষিবর্গের জীবন-নদী ছিল তপস্যামুখীন্। তপস্যার সেই প্রবাহ একটি নদীর মতই। নিত্য কাল ধরে প্রবহমানা, সমুদ্রে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নাই।

নর্মদার ঘাটে এক হাঁটু জলে নেমে স্নান ও তর্পণাদি সারলাম। স্নান শেষে করে ফিরে এলাম কুটীরে। আসতে আসতে সাধুজীকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করতেই বললেন — গুরুজীনে নাম দিয়া থা মাধবাচার্য। গাঁওকা আদমী মুঝে মাধব-বাবা বলকে পুকরতা হ্যায়।

আমরা মাধব-বাবাকে মহর্ষি ভৃগু কিভাবে ব্রহ্মবিদ্যা শিখে ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ হলেন সেই গল্প শোনাতে বলায় তিনি বললেন —

সে বহুকাল আগের কথা। একদিন পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য উপস্থিত হয়ে বললেন — 'অধীহি ভগবো ব্রহ্মাতি' অর্থাৎ ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন। পুত্রকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু দেখে

ঋষি-পিতা বললেন — ব্রহ্ম উপদেশের বিষয় নয়। মর্মে মর্মে অনুভূতির বিষয়। ব্রহ্মবিদ্যা অত্যন্ত কঠিন। ব্রহ্মবিদ্যা বুঝতে হলে আধ্যাত্মিক বুদ্ধি বিশেষভাবে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্ম যে বাক্য মনের অতীত। এই দেহ, এই দেহের অন্তর্ভুক্ত প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাগিন্দ্রিয় — সমস্তই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ।

শ্রুতি বলছেন —

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

অর্থাৎ যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না কিন্তু যাঁর দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়। তাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলে জেনো আর যাঁর বা যে সগুণ দেবতার পূজা করা হয় তা ব্রহ্ম নয়। অতঃপর মহর্ষি পুত্র ভৃগুকে ব্রহ্ম কি বুঝাতে গিয়ে বলছেন — যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি। অর্থাৎ যা হতে আপস্তম্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, যাঁর দ্বারা সমুৎপন্ন জীবসমূহ প্রাণধারণ করছে, এবং বিনাশকালে এই বিশ্ব যাতে প্রবেশ করে বা বিলীন হয়, তাঁকে বিশেষভাবে জানতে চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

পিতা পুত্রকে বললেন 'তুমি তপস্যা কর; সমস্ত তোমার অধিগত হবে।' এরপর ঋষি নীরব হলেন। অর্থাৎ উপলব্ধিতব্য বিষয় উপলব্ধি করবার পন্থাটি নির্দেশ করে পুত্রের হাতে ছেড়ে দিলেন।

এরপর ভৃগু তপস্যা শুরু করলেন। অনন্যকর্মা হয়ে একমনে ধ্যানস্থ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ক্রমশঃ দিন, মাস, বৎসর অতিক্রান্ত হল। কিন্তু সত্য যেন কিছুতেই উপলব্ধি হয় না। হঠাৎ, তাঁর মনে উদয় হল — অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন হতেই ভূতগণ জন্মে। তিনি পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা বললেন — অন্ন হতেই ভূতগণের উৎপত্তি। জীবগণ অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে। বিনাশকালে জীবগণ অন্নেই যায়। এই বিশ্ব অন্নময়। সব শুনে পিতা উত্তর দিলেন — তপসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্ব তপো ব্রহ্মেতি। অর্থাৎ তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভৃগু স্বস্থানে ফিরে এসে তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন।

আবার মাস, বৎসর অতিক্রান্ত হল। ভৃগু ভাবলেন — অন্ন ব্রহ্মের পূর্ণরূপ হতে পারে না। অন্নে আদ্যন্ত আছে। অন্নের পরিবর্তন ঘটে। তাহলে ব্রহ্ম অন্য কিছু। সহসা তাঁর মনে প্রতিভাত হল — ব্রহ্ম শুধু অন্নময় নয় পরন্তু তিনি প্রাণময়। অনু শরীরকে অর্থাৎ সমস্ত জড় বস্তুকে রক্ষা করে। কিন্তু জীবের ভিতর যে প্রক্রমণ শক্তি রয়েছে, তা ত অন্ন নয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে যা শাশ্বত রয়েছে, তা ত ব্রহ্মই। এই বিশ্বে যে একটি শাশ্বত বা অবিনশ্বর ভাব রয়েছে — যা প্রাণীকে প্রাণবন্ত করছে, তাও ব্রহ্ম। উহা ব্রহ্মের একটি পাদ। 'প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজসাৎ।' তিনি প্রাণকেই চৈতন্য শক্তিকেই ব্রহ্মের আর এক পাদ বলে জানলেন। কিন্তু তথাপি তাঁর মন প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত হল না। ভৃগু আবার গুরুর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্যার দ্বারা মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা যতটুকু বুঝেছেন তা বিবৃত করে বললেন — আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দান করুন। কিন্তু গুরুর মুখে সেই এক কথা — তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্ম অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে চেষ্টা কর। তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ভৃগু আর বাক্যব্যয় না করে পুনর্বার তপস্যায় রত হলেন।

এরপর ভৃগু বুঝলেন যে, মনই ব্রহ্মের আর একটি পাদ। কারণ মনই সব। মন দ্বারাই মনন ও নিদিধ্যাসন হয়। অতএব মনও ব্রহ্ম। কিন্তু এই ত সব নয়। এ জ্ঞানে ত্রুটি রয়েছে। ভৃগু আবার তাঁর পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হলেন। আবার সেই একই নিবেদন। কিন্তু পুনর্বার গুরুর সেই একই উত্তর। সুতরাং ভৃগুর আবার স্বস্থানে গমন। আবার সেই কঠোর তপস্যা। এইভাবে ভৃগু বিজ্ঞানকে এবং পরে আনন্দকে ব্রহ্ম বলে স্থির করলেন; এবং এবার ভৃগুও তাঁর জ্ঞাতব্য তথ্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন।

উপনিষদের এই বরুণ ভৃগু সংবাদ হতেই জানা যায় — সকল সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে নির্জনে আত্মচিন্তা। ইহাই তপস্যা। এই তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। 'অরণ্যগুহাপুলিনেষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ' ইহাই শাস্ত্রের কথা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে — এই তপস্যা কিরূপ তপস্যা? মনু বলেছেন — মানুষ নির্জন স্থানে বসে একান্ত মনে নিজ হিত বিষয় চিন্তা করবে। একাকী বসে চিন্তা করলেই সর্বপ্রধান শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

তপসা জীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্। (মুণ্ডক ১/৮)

সংসারে যা দুষ্কর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম এবং দুস্তর, তা সমস্তই তপস্যার দ্বারা লাভ হয়ে থাকে। তপস্যাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। একান্ত মনে চিন্তা করলে মন হতেই আপনা-আপনিই সেই সমস্যার সমাধান হয়। তবে সেই বিষয়ে মনকে এমনভাবে নিয়োজিত করতে হবে যে, মন মুহূর্তের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। মানুষের সকল জ্ঞানই ভিতর হতে বিকাশ লাভ করে।

এই আখ্যায়িকার মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট হচ্ছে যে ভৃগু লৌকিক বিদ্যা বা অপরা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভের পরই পিতার কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে এসেছিলেন। একেবারে বর্ণজ্ঞান অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা শিখতে আসেন নি। তপস্যা, দম, বেদ ও বেদের ছয় অঙ্গ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়, আর সত্যই আশ্রয়। নতুবা মহর্ষি বরুণ বর্ণজ্ঞানহীন বা শাস্ত্রজ্ঞানশূণ্য পুত্রকে এই দুরূহ বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য নির্জন স্থানে পাঠাতেন না। কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানকাণ্ড শিখতে হত। কারণ, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করা জ্ঞানহীনের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই বিশিষ্ট জ্ঞান, অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব জ্ঞানলাভ করা যায়, তার সম্বন্ধে যথাসম্ভব ভ্রম এবং প্রমাদ-পরিশূণ্য জ্ঞান। সংস্কৃত ভাষায় যাকে প্রমা বলে, সেই জ্ঞান।

সেইজন্য ভাষাতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, ভূতবিজ্ঞান, পুরুষ-পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত ও আপ্তবাক্য দর্শন, বেদ ইত্যাদি শিক্ষা করা আবশ্যক, নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে অপরা-বিদ্যা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

এরপর সাধুজী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন যুগ যুগ ধরে ভৃগু উপদিষ্ট সাধন পন্থায় আমরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের তপস্যা করে আসছি। আপনারা যদি পরিক্রমান্তে এস্থান থেকে ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনায় রত হন তাহলে ঋষি বরুণ ও তাঁর পুত্র ভৃগুর আশীর্বাদে আপনারা কৃত কৃতার্থ হয়ে যাবেন।

এবার আমাদের বিদায় নেবার পালা। আমরা মহর্ষিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সাধুকে নম নারায়ণায় জানিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম ব্রহ্মাণ তীর্থের পথে। সিনোর মহল্লার ভিতর দিয়ে আমরা বাঁদিকে বাঁক নিলাম। অশ্বত্থ, আমলকী, আম ও শিমূল গাছের তপোবন সদৃশ সুন্দর একটি বাগান অতিক্রম করে আমরা উঠে এলাম নর্মদারই তটে।

প্রায় এক মাইল রাস্তা হেঁটে এলাম। তটের গায়ে গায়ে মাঝে মাঝেই শাল অশ্বত্থ কোথাও বা আম ও আমলকী গাছ দেখতে পাচ্ছি। এই পথে অনেক পেঁপে এবং পেয়ারা গাছও আছে। জঙ্গলের তুলনায় এইসব পথকে বড়ই মনোরম লাগছে। নর্মদার কিনারে কিনারে হাঁটার ফলে পায়ের তলায় বালি এবং মাটিরও স্পর্শও পাচ্ছি। এইসব স্থানে যুগে যুগে কত যে ঋষি তপস্যা করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পথে অনেক মানুযজনেরও মুখ দেখা যাচ্ছে। আমাদের 'হর নর্মদে' ধ্বনি শুনে অনেক স্ত্রী পুরুষ গৃহ থেকে ছুটে এসে শঙ্খধ্বনি এবং 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে লাগলেন। পরিক্রমাবাসীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এটি একটি মহৎ রীতি।

আমরা সকাল আটটায় সিনোর হতে যাত্রা করেছিলাম। একটানা হেঁটে বেলা এগারটা সাড়ে এগারটা নাগাদ করেলিতে পৌঁছে গেলাম। নর্মদা তটের উপরেই এক শিবমন্দির। এই মন্দিরের মহাদেবের নাম সুযাড়েশ্বর। মন্দিরে তখন যজ্ঞ হচ্ছে। নিত্য বেদপাঠ এবং বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান এই মন্দিরের বিশেষত্ব। মন্দিরের পুরোহিতজী বললেন — ইয়ে সুযাড়েশ্বর মহাদেব বহুৎ প্রাচীন হৈ। ইয়ে নর্মদাতটকে বহুৎ, বহুৎ পুরাণা তপস্থলী হৈ। ক্রোড় মুনিনে ইধর তপস্যা করকে সিদ্ধি প্রাপ্ত হো চুকে।

শিবমন্দির হোমের গন্ধে সুরভিত। নর্মদা এখানে বেশ প্রশস্তা। পুরোহিতমশাই আমাদেরকে যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত করলেন এবং তিল কুশ যব শমী এবং রেবামন্ত্রে আহুতি প্রদান করে সুযাড়েশ্বরকে পুনরায় প্রণাম করে আবার নর্মদাতট ধরে হাঁটতে লাগলাম।

হরানন্দজী বললেন — নর্মদার ঘাটে ঘাটে তীর্থ। মার্কণ্ডেয় কি সাধে বলেছেন যে নর্মদায় কোটীতীর্থ বর্তমান। নর্মদা পরিক্রমা একটা কঠিন ব্রত। আমাদের ত্যাগ তপস্যাও নাই, সাধন-ভজনও নাই। প্রতি তীর্থে যদি শিবের চরণে মাথা লুটিয়ে যেতে না পারি, তাহলে শিবপুত্রী কি কৃপা করবেন।

নর্মদাতট ধরেই আমরা হাঁটছি। আমাদের ডানদিকে লোকালয় বামদিকে নর্মদাকে দর্শন করতে করতে যাচ্ছি। এই অঞ্চলে দেখছি ফলভারে বৃক্ষ নত বললেই হয়। উর্বর জমিতে নানা ধরনের ফসল হচ্ছে। বহুলোক

নর্মদায় স্নান করছেন, মুখে বলে চলেছেন হর নর্মদে, হর নর্মদে। এই অঞ্চলের সবাই নর্মদাকেই ধ্যান জ্ঞান করেন। নর্মদা যে মহাদেবের স্বেদসম্ভূতা দিব্যা দেবনদী এই জ্ঞান সকলেরই আছে। নর্মদাতটের সর্বত্র যে তপস্যাক্ষেত্র, মা যে তপস্যায় সিদ্ধিদায়িনী তা আবালবৃদ্ধবনিতা জানেন এবং সুখে দুঃখে সবাই অহরহ নর্মদার নাম গ্রহণ করে থাকেন।

আরও প্রায় তিন মাইল হেঁটে যাবার পর আমরা পৌঁছলাম নর্মদাতীরের পুরাণ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ তীর্থে।

আমি বললাম — উত্তরতট পরিক্রমাকালে আমি শুনে এসেছি ব্রহ্মাণ ব্রহ্মার তপস্যাক্ষেত্র। পৌষ সংক্রান্তির দিনে এখানে নদীর চড়ায় বিরাট মেলা বসে। সারা ভারতের সাধুসন্ত গৃহীরা এসে জমায়েত হন। কিন্তু আমার মতে, পুরাণে ব্রহ্মার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী থাকলেও বেদে বা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ব্রহ্মার নাম কোথাও শোনা যাবে না। বেদে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে। এক পুরাণের মতে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধাকরময় ছিল, তখন পরমব্রহ্ম সেই অন্ধকার দূর করলেন এবং তাতে সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করলেন। ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হল। অণ্ড মধ্যে সেই বিরাটপুরুষ নিজে ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মে আকার পড়ল, নির্গুণ নিরাকার স্বরাট্‌ ব্রহ্ম আকারিত বা মূর্ত হতে থাকলেন। অণ্ডটি তৎক্ষণাৎ দুভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ আকাশে এবং অন্যভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হল। এরপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ — এই দশজন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা নারদকে সমস্ত সৃষ্টির ভার নিতে বলেন কিন্তু ব্রহ্মসাধনায় বিঘ্ন হবে বলে নারদ সৃষ্টির ভার নিতে রাজী হলেন না। এইজন্য ব্রহ্মার শাপে তাঁকে গন্ধর্ব ও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন এবং রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মাথা ছিল কিন্তু একবার তিনি শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করায় ক্রুদ্ধ শিবের ললাট-নেত্র হতে উদ্ভূত অগ্নিতে তাঁর পঞ্চম মস্তক দগ্ধীভূত হয়। ব্রহ্মার বাহন হংস।

অন্য পুরাণের মতে, পরমব্রহ্মের যখন 'একোহহং বহুস্যাম' অর্থাৎ এক আছি, বহু হব — বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করব, এই ইচ্ছা জাগল তখন কারণার্নবশায়ী সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা চোখ মেলে দেখলেন চারিদিকে শুধু জল আর জল, অন্তহীন মহাসমুদ্রের মাঝখানে তিনি ভাসছেন। লক্ষ্য করতে তাঁর চোখে পড়ল তিনি একটি পদ্মের উপর বসে আছেন, সেই পদ্মের মৃণালটি একটি নীল জ্যোতির্ময় পুরুষের নাভিকুণ্ড থেকে উত্থিত হয়েছে। সেই পুরুষের মুখ থেকে দৈববাণী হল — তপঃ, তপঃ অর্থাৎ তপস্যা কর। স অতপাত। ব্রহ্মা তপস্যায় নিমগ্ন হলেন, তাঁর সেই তপস্যা হতেই এই জগতের সৃষ্টি।

আমি আরও শুনেছি — পিষাণ্‌হারী কোন দেবীর বিগ্রহ নয়, ইনি শিবই। তবে এই শিবের উৎপত্তি রহস্য বড় বিচিত্র। প্রায় দেড়শ বছর আগে এই কলিযুগেও নর্মদাতটে এক অদ্ভুত দৈবলীলা প্রকট হয়েছিল তারই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই পিষাণ্‌হারী। পিষাণ্‌হারী অতি সাধারণ একজন চাষীর বৌ। তার স্বামীর নাম ছিল রামদীন। সে অত্যন্ত অলস এবং নিষ্কর্মা প্রকৃতির লোক ছিল। সে 'ক্ষেতি-উতির' কাজ করত বটে কিন্তু সেদিকে তার মন ছিল না। 'ক্ষেতির' কাজ ছেড়ে দিয়ে 'ক্ষেতির' ধারে বসেই নাম জপ করত। বাড়ীর কোন কাজ করত না। সারাদিন এমনকি রাত্রেও সে নাম-কীর্তনে মেতে থাকত। অগত্যা এই অকর্মণ্য সংসার-উদাসীন স্বামী এবং নাবালক তিনটি ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিষাণ্‌হারীর উপরই পড়েছিল। সাধ্বী পিষাণ্‌হারী প্রতিবেশীদের গম বাজরা চাকীতে পিষে দিয়ে বিনিময়ে যা পেতেন, তাই দিয়ে স্বামী ও পুত্রদের মুখে অন্ন জোগাতেন। নিজের চাকীটি মাথায় নিয়ে পিষাণ্‌হারী প্রতিবেশীদের বাড়ীতে হাজির হতেন, গম বাজরা পিষতেন আর অহরহ নর্মদামায়ী ও মহাদেবের নাম জপ করতেন। কিন্তু এইটুকু সুখও তাঁর ভাগ্যে সইল না।

হঠাৎ একদিন ভাবাবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে রামদীন পাহাড়ের একটা টিলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। চেচক (বসন্তরোগ) হয়ে দুটো ছেলে অকালে প্রাণত্যাগ করল, ছোট ছেলেটিকে একরাত্রে কুটিরের দাওয়া থেকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল। শোকে দুঃখে হতভাগিনী পাগলের মত হয়ে গেলেন। ঘর থেকে আর বাইরে যেতেন না। চাকীটিকে বুকে নিয়েই কখনও আদর করতেন, কখন বা কেঁদে কেঁদে বলতেন — ভগবান! একে একে সবাইকেই ত তুলে নিয়েছ, এতকাল আমি যাদের জন্য পরিশ্রম করে এসেছি, তারা ত এখন আর নাই। আমি

ত মন্ত্রতন্ত্র জানিনা, এতকাল চাকী পিষে যাদের পূজা সেবা করতাম, তারা সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে। এখন আর কার সেবা করব? হে শিউজী, এখন তোমার আমার মাঝখানে এসে আর কেউ আড়াল করে দাঁড়াবে না! এই বলে চাকীটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিউজী, শিউজী বলে হাউ হাউ করে কাঁদতেন। চাকীটিই যেন তাঁর শিউজী! এইভাবে অর্ধোন্মাদ অবস্থাতেই একদিন চাকীটিকে বুকে জড়িয়েই পিষাণ্‌হারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রতিবেশীরা নর্মদার চড়ায় চাকীসহ পিষাণ্‌হারীকে সমাধিস্থ করে এল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেই চাকীটি একটি শিবলিঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে এবং নর্মদা পিষাণহারীর সেই সমাধিস্থল এবং শিবলিঙ্গকে মাঝখানে রেখে দুইদিকে দুইটি ধারায় বয়ে চলেছে! হতচকিত এবং বিস্মিত নর্মদার উভয়তটের অধিবাসীরা পিষাণ্‌হারীর সমাধিস্থলের সেই স্থানে ১৮৩২ সালে মহাদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করে তার নাম দিয়েছে — পিষাণ্‌হারী।

সেই থেকে পিষাণ্‌হারীর মন্দির তীর্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। নর্মদার প্রবল বন্যায় কতবার কত কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে কিন্তু পিষাণ্‌হারীর মন্দিরের কিছু ক্ষতি হয় নি। পিষাণ্‌হারীর চাকীর বিবর্তিত রূপ শিবলিঙ্গে বিরাজমান থেকে ভক্তবৎসল মহাদেব ভক্তদের অভীষ্ট পূরণ করে চলেছেন।

হরানন্দজী গেয়ে উঠলেন —

যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ
তবুও যদি না ছাড়ে পাশ, তখন হই দাসের দাস।।

ভক্তকী মহিমা ভগবানকী মহিমাসে জ্যায়দা হৈ। আমরা গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম ব্রহ্মাণ তীর্থে। একটানা হেঁটে পা'গুলো টেনে ধরেছে। সমস্ত শরীর অবসন্ন, ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। গাঁঠরী রেখে আমরা একটা শালগাছের তলায় পাথরের উপর বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানের জন্য একে একে নর্মদার ঘাটে নামলাম। ব্রহ্মাণ তীর্থের ঘাট বাঁধানো। ইন্দোরের হোলকার বংশের মহারাণী শিবতপস্বিনী অহল্যাবাঈ-এর দান। ঘাটের উপরেই ব্রহ্মার মন্দির। স্নান, তর্পণ সেরে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। একটু ঠেলতেই আবলুষ কাঠের বহু পুরাতন মোটা দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। মন্দির বেশ প্রশস্ত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক অপূর্ব সুঘ্রাণ। মন্দিরে বিরাজ করছেন পদ্মের উপর উপবিষ্ট ব্রহ্মার এক বিশাল মূর্তি।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখি একজন সৌম্যকান্তি পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন —

নর্মদাতটমাশ্রিতঃ অত্র তীর্থ ব্রহ্মালোক পিতামহঃ বিরাজিতঃ।
তন্যেষাং চৈব তীর্থানাং পরাৎপরতরং মহৎ।।

অর্থাৎ নর্মদাতটের এই তীর্থে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিরাজিত। এই তীর্থ অন্যান্য তীর্থ হতে শ্রেষ্ঠতর।

তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য স লভেৎ ফলমুত্তমম্‌।।

অর্থাৎ যিনি এই ব্রহ্মাণতীর্থে স্নান করে পিতৃপুরুষদের পূজা করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের উত্তম ফল লাভ করেন।

এরপর তিনি বলতে শুরু করলেন — আপনারা পরিক্রমাবাসী। আপনারা এই তীর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত। আপনাদের দেখে অভুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এখনও সন্ধ্যা হতে অনেক দেরী। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি বাড়ী থেকে আপনাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছি। এই বলেই ব্রাহ্মণ দৌড়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণ তাঁর গৃহ থেকে একটি মাটির কলসীতে করে ছাগলের দুধ নিয়ে এসে আমাদের ভোজনের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমরা দুধ পানে রাজী হতেই তিনি প্রত্যেকের কমণ্ডলুর অর্ধেক জল ফেলে দিয়ে তাতে প্রায় দেড় পো করে ছাগলের দুধ ঢেলে ভাল করে নেড়ে চেড়ে খেয়ে নিতে বললেন।

দু'দিন ধরে আমরা কিছু খাইনি, ক্ষুধার্তের আর বেশী কিছু চিন্তা করার সময় কোথায়! আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে দুগ্ধ পান করলাম। দুগ্ধ পানের পর ব্রাহ্মণ মন্দিরের পিছনে একটি ঘরে এনে আমাদের রাত্রিবাসের আয়োজন করে দিলেন।

তখন সূর্য অস্ত গেছে। নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেছে সমগ্র মহারণ্য, গাছপালা, নর্মদা, পাহাড়। কোন কিছুই আর চোখে পড়ছে না। আমরা যে যার আসনে বসে রয়েছি। বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম পরিক্রমা পথের নানা কথা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম।

একেবারে সকালে ঘুম ভাঙল। তখন দেখি মন্দিরদ্বারে ব্রাহ্মণ বসে আছেন। আমাকে দেখে আবেগের সঙ্গে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন —

অদৈব্য কুরু যৎ শ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বর্গাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে॥

— এখনই কর্মসাধনে লেগে যাও। বৃদ্ধ বয়সে যখন সকল ইন্দ্রিয় বিকল হবে, নিজের দেহের ভারই বোঝা হবে, তখন আর কি করে ভগবানকে ডাকবে?

আমি তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে নর্মদায় নামলাম স্পর্শ করতে। এ স্থানটি দেখছি প্রাচীন তপোবনের মত একটি সুন্দর তপোভূমি। এখানে নর্মদার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য মনকে মুগ্ধ করে। ভীমগতিতে বয়ে চলেছেন নর্মদা দু'ভাগে ভাগ হয়ে ধনুকাকার ধারণ করে। এরই মধ্যভাগে দণ্ডায়মান আছে পাথরের একটি বিশাল মন্দির।

পুরোহিতজী কখন যে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন — ঐটি পিষাণ্‌হারীর মন্দির। শত শত ভক্তের ভীড় সব সময়ই লেগে আছে। আপনাদের স্নান, পূজা হয়ে গেলে আমি আপনাদের সঙ্গে করে ঐ মন্দির দর্শন করিয়ে নিয়ে আসব।

ফিরে এলাম আশ্রয়স্থলে। ব্রাহ্মণ ফিরে গেলেন মন্দিরে। এসে দেখি আমারা সঙ্গীরাও উঠে পড়েছেন। শৌচাদি সেরে স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে আসার সময় দেখি প্রায় পনের কুড়িজন ভক্ত ভেট নিয়ে এই ব্রহ্মাণ তীর্থে এসেছেন। ব্রাহ্মণজী ভক্তদের আনা ফলমূল, বাজরা জোয়ার দুধ ইত্যাদি থেকে কিছু ফলমূল ও দুধ আমাদের উপযোগী রেখে দিয়ে বাকী সব প্রসাদ হিসাবে বিলিয়ে দিলেন। বুঝলাম নর্মদাশ্রয়ী সাধু হোন বা ব্রাহ্মণ হোন বা পুরোহিত হন তাঁদের কোন বস্তু সঞ্চয় করে রাখতে নাই। সেই বিধি তিনি কঠোরভাবে পালন করছেন।

মন্দিরের দরজা বন্ধ করে পুরোহিতজী আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন — দুপহরমেঁ ভোজনকে বাদ আপলোগকা সাথ পিষাণ্‌হারী দর্শনকে লিয়ে চলুঙ্গা। আপলোগ্ যো মান্যত করেংগে ওহি পূরণ হোগা। বচপনসে হাম ইহ্ বহুৎ দফে দেখ চুকা।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই ব্রাহ্মণ আমাদের ভোগ নিবেদন করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম পিষাণ্‌হারীর উদ্দেশ্যে। পিষাণ্‌হারীর গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম। নর্মদার এ অঞ্চলে বিরাট প্রসার। প্রায় দশ-পনের মাইল হেঁটে পৌঁছে গেলাম মন্দিরে। এই মন্দিরটি বিশাল। তার সুউচ্চ শীর্ষদেশে শোভা পাচ্ছে একটি বড় পিতলের কলস, সোনার মত ঝকঝক করছে। কলস ভেদ করে পিতলেরই এক ধ্বজাও দেখা যাচ্ছে। ভারী মনোরম দৃশ্য ও তার পরিবেশ। বিচিত্র শিবলিঙ্গ। আমরা সবাই কমণ্ডলুর জল ঢেলে পিষাণ্‌হারীর অর্চনা করার পর হর নর্মদে হর ধ্বনি দিতে দিতে মন্দির পরিক্রমা করতে লাগলাম। দেখলাম তিনজন স্ত্রীলোক আপন আপন মনস্কামনা পূরণের জন্য হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন। হরানন্দজী বললেন — যেখানে স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে সেখানে কি ভক্তের কোন অভাব হয়। বিশেষতঃ এখানে হিংস্র জন্তুর ভয় নাই বললেই চলে।

পিষাণ্‌হারীর মন্দিরে প্রণাম করে মা নর্মদার গতিপথের উপর লক্ষ্য করে আধমাইলটাক হেঁটে যাবার পরেই ব্রাহ্মণ বললেন — ইহাঁ শ্রী নর্মদাজীকী পর্বত পরসে কই ধারায়েঁ ঔর কই কুণ্ড হোগিয়া হ্যায়। জিনমেঁ সে ভীমকুণ্ড, অর্জুনকুণ্ড ঔর ব্রহ্মাকুণ্ড প্রধান হ্যায়। কুণ্ডমেঁ জল বহুত গহরা হ্যায়। ভীমকুণ্ডকে পাস ভীমজীকে পদ চিহ্ন ভী হ্যায়। ব্রহ্মাজীকা যজ্ঞসে ব্রহ্মকুণ্ড কা উৎপন্ন হুয়া। ইহ সব কুণ্ড দ্বীপমেঁ হোনে কা কারণ পরিক্রমাবাসীয়োঁ ইহাঁ নহী জা পাতে। জঙ্গলকা অন্দরমেঁ কৃষ্ণ মন্দির ভী হ্যায়।

সেখান থেকে আরো প্রায় আধ মাইলটাক হেঁটে আসার পর ব্রাহ্মণজী দেখালেন বরাহ ভগবানের দণ্ডায়মান বিশাল মূর্তি, যিনি নিজের দু দাঁতের সাহায্যে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। দর্শনীয় বস্তু সন্দেহ নাই, ফিরবার পথে দর্শন করলাম লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির।

পুরোহিতজীর সঙ্গে ফিরে এলাম ব্রহ্মাণ তীর্থের মন্দিরে। আসতে আসতে বললেন — নর্মদাতীরে কেবল

রেবা নাম জপ করলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মার্কণ্ডেয় পূজিত ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, শূলপাণীশ্বর, বিমলেশ্বর এবং রেবাসংগমে গেলেও সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পরিক্রমাকালে পরিক্রমাবাসী নর্মদাকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে পারুন বা না পারুন নর্মদামাতা তাঁর পরিক্রমাকারী সন্তানকে সব সময় চোখে চোখে রাখেন, মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করেন না। ব্রাহ্মণজী ধূপ, দীপ এবং কর্পূর জ্বালিয়ে ব্রহ্মার আরতি শুরু করলেন। তিনি গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন —

ওঁ হিমেনাকুলিতং বিশ্ব স্বরাত্যগ্নিং যথা তথা।
স্মরন্তি সততং ব্রহ্মা পিতৃ-দেবর্ষি মানবাঃ।

শীতে কাতর হলে বিশ্ববাসী যেমন অগ্নির শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ পিতৃগণ, দেবর্ষিগণ এবং মানবগণ ভগবান ব্রহ্মাকে স্মরণ করেন।

দূরস্থোহসি যথা গেহং, চাতকো জলদশ্ যথা।
হংসা মানসমিচ্ছন্তি ঋষয়ঃ স্মরণং হরেঃ।
ভক্তাশ্চ ভক্তিমিচ্ছন্তি তথা ব্রহ্মাদং স্মারম্যহম্।।

যে রূপ দুঃস্থ ব্যক্তি গৃহকে, চাতক যে রূপ মেঘকে, হংসসকল যে রূপ মানসসরোবরকে, ঋষিকুল যে রূপ শ্রীহরিকে, ভক্ত সকল যে রূপ ভক্তিকে ইচ্ছা করেন, আমিও তদ্রুপ ভগবান ব্রহ্মাকে স্মরণ করছি। হর নর্মদে, হর নর্মদে।

নর্মদা স্পর্শ করে আমরা যে যার আসনে বসে জপে মন দিলাম। পরদিন সকালে পুরোহিতজীকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। নর্মদার দু'পাড়েই লোকজনের বসতি যথেষ্ট, খুব সম্পন্ন গ্রাম। আকাশ পরিষ্কার, পথও মোটামুটি ভাল। কুড়ি পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর ক্রমশঃ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করলাম, পথ এবড়ো খেবড়ো, উঁচু-নিচু পাহাড়ী হলেও উপত্যকা অঞ্চল দিয়ে হেঁটে এসেছি।

চারদিক প্রভাত সূর্যের উদয় রশ্মিতে ঝলমল করছে। পথে পড়ল গরাড়ু গ্রাম। মন্দিরে রয়েছে শিবজী ও গরুড়ের বিশাল মূর্তি। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মশাই সেইমাত্র মন্দিরে এসে পৌঁচেছেন। মন্দিরের সামনেই স্থায়ী যজ্ঞকুণ্ড। মনে হয় এখানে নিত্য হোম হয়। নর্মদায় স্নান করে অর্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গকে পূজা ও প্রণাম করে আমরা এগিয়ে চললাম। পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম — ভেইয়া! পিপরিয়া ঘাট কিস তরফ যায়েঙ্গে? তিনি অঙ্গুলি সংকেতে বললেন — সিধা পাহাড়োঁকা তরফ যাইয়ে। চড়াই পড়েগা। চঁড়াই মে যাকর, যব্ উৎরাই শুরু হোগা, উধর দোনো পথকা সংযোগ দেখাই দেখা। সিধা চলনেসে সাঁকল, ঘানা, ঘুরবাড়া ঔর গুদড়ী গ্রাম হোতে হুয়ে পিপরিয়া ঘাট তক পৌঁছ যায়েগী। উঁহা করভেশ্বর মহাদেবজীকা মন্দির হ্যায়। শিবজীকা লিঙ্গমূর্তি পাঁচ ফুটসে ভী উঁচা ঔর বিশাল। রাতমেঁ উধার ঠারনেকা ইন্তেজাম হো যাবেগা।

লোকটির কথায় রাস্তার কোন স্পষ্ট ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠল না। মা নর্মদাকে স্মরণ করে হাঁটতে লাগলাম দ্রুতপদে, দ্রুততালে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম পাহাড়ের কোলে এক বিশাল শিবমন্দির। মন্দিরের রং বালিপাথরের লালচে আভাযুক্ত গৈরিক। মন্দিরের প্রবেশ পথে দেখলাম ষাঁড়ের এক বিশালকার মূর্তি বিরাজিত। মন্দিরে রয়েছেন পুরোহিতজী ও গোটা দুই তিন ভক্ত। আমরা পৌঁছতেই, আমাদের দলে দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন।

ভিতরে রয়েছে দেখবার মত শিবলিঙ্গ, করভেশ্বর। বিশাল, বিশাল শিবলিঙ্গ, ঘন কৃষ্ণবর্ণ। এত বিশাল কলেবর যে তিনজন লোক পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে ঘিরে ধরলেও শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করতে পারবে না। প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গের রূপ মনে ভয়ের উদ্রেক করে। মন্দিরের ভিতরটা অপূর্ব সুগন্ধিতে ভরপুর। শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য রয়েছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পাটাতন। আমরা প্রায় একসঙ্গে শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে দেখি দূরে একটি কামান রাখা আছে। পুরোহিতজী বললেন, কামানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ন'মিটার, নলের ব্যাস প্রায় বারো ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় সাড়ে তিনশ মণ। কামানটির কারুকার্যেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় মেলে। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে শিবের পূজা আরম্ভ

হয়। এখানকার গ্রামে বাইনদার আছে যারা বংশ পরম্পরায় এই কামানের জন্য গোলা প্রস্তুত করে। সেইসময় দূর দূরান্ত থেকে মানুষ নিজেদের কামনা পূরণের জন্য এখানে আসেন। আর নর্মদার এই ঘাটে নানা মজাদার বাজী তৈরী করে পোড়ানো হয়, যা দেখতেও বহু লোক সমাগম হয়। এরপর শিবমন্দিরের লাগোয়া ঘরের দরজা খুলতে খুলতে পুরোহিতজী আমাদেরকে এই শিবলিঙ্গের ইতিবৃত্ত শোনাতে লাগলেন। তিনি বললেন যে ইক্ষাকু বংশে বীরকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়া করতে বেরিয়ে এক করভকে বাণে বিদ্ধ করেন। কিন্তু তাতে করভের মৃত্যু হল না। বাণবিদ্ধ করভকে অনুসরণ করতে করতে রাজা বীরকেতু শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় মুনি ঋষভের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন এং ঋষভকে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেন। ঋষি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেন এই বাণবিদ্ধ করভ আর কেউ নন। ইনি হলেন হৈহয় কুলোদ্ভব শাপভ্রষ্ট রাজা ধর্মধ্বজ। যিনি একবার বদরিকাশ্রমের এক চির ও জিন পরিহিত এক কৃশ ব্রাহ্মণকে তাঁর কৃশ শরীর নিয়ে ব্যাঙ্গ করেন। এতে হতচকিত বিপ্র রাজাকে শাপ দেন যে, যেহেতু তুমি আমার কৃশ শরীর দেখে ব্যঙ্গ করলে, সেহেতু তুমি লম্বোষ্ঠ, লম্বদন্ত, বিস্বর, বিকৃতকার করভ বা উষ্ট্র হবে। অভিশপ্ত হয়ে রাজা ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ব্রাহ্মণ তুষ্ট হন এবং বলেন — আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হবার নয়। এক মাত্র রাজা বীরকেতুর বাণে বিদ্ধ হয়ে রেবাতটের মুণ্ডমহারণ্যে মহাদেবের আরাধনা করলে তবেই তাঁর মুক্তি হবে এবং রাজা বীরকেতু রাজচক্রবর্তী রাজাতে পরিণত হবেন। ঋষভ মুনি বীরকেতুকে একথা জানালে বীরকেতু মুণ্ডমহারণ্যের এই পিপরিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হন এবং দেখেন বাণবিদ্ধ করভ শিবের লিঙ্গ মূর্তিতে লীন হয়ে গেছেন এবং আশুতোষের লিঙ্গমূর্তি করভাকৃতি ধারণ করেছে। সেইসময় সেই লিঙ্গমূর্তি থেকে দৈববাণী হয় —

ভো ভো রাজেন্দ্র মাং পশ্য বিমানে চোদ্ধতে শুভে।
দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য প্রাপ্তা মে পরমা গতিঃ॥
ত্বয়া হতোহহং বাণেম তেনাহং ত্বাগতো বনে।
সমীপনস্য লিঙ্গস্য ত্বং মে বন্ধুঃ পরো যতঃ॥

হে রাজন! আকাশস্থ বিমানে আমাকে দর্শন করুন। এই শিবলিঙ্গ দর্শনের ফলে আমি পরমগতি লাভ করেছি। আপনিও পরমগতি লাভ করবেন। আপনার বাণদ্বারা বিদ্ধ না হলে আমি শাপমুক্ত হতাম না। আজ থেকে আমি আপনার বন্ধু হলাম।

সেই থেকে আশুতোষের এই লিঙ্গমূর্তি করভেশ্বর নামে খ্যাত। যে ব্যক্তি করভেশ্বর লিঙ্গ দর্শন এবং যা কামনা করেন তাঁর তাই লাভ হয় এবং অন্তে তার পরমগতি লাভ হয়।

সূর্য তখন পাটে বসেছেন। আমরা দল বেঁধে সবাই গেলাম নর্মদা স্পর্শ করতে। এখানে নর্মদা খুবই প্রশস্তা। অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ রশ্মি নর্মদার জলে পড়ে এক বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। ঝোড়ো বাতাস বইছে। মন্দিরে ফিরে দেখলাম পুরোহিতজী আরতির আয়োজন করছেন। গ্রামের কিছু লোকও উপস্থিত হয়েছেন। আমরা করভেশ্বরের আরতি দেখে ফিরে এলাম মন্দির সংলগ্ন ঘরে। আমার যে যার মত আসন শয্যা পেতে নিলাম। পুরোহিতজী ২টি হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়েছেন, একটা ঘরের ভিতরে এবং একটা বাইরে। আমাদের কাছে বসে তিনি কিছুক্ষণ গল্প করতে লাগলেন। বললেন — পূর্বে দেশীয় রাজারা নর্মদা পরিক্রমাকারীদের নানা ভাবে সেবা করতেন। কিন্তু বর্তমানে বহু জায়গায় সে ব্যবস্থা উঠে গেছে বা সেদিকে কারো কোনো লক্ষ্য নেই। কিন্তু মা নর্মদা পরিক্রমাসীকে সর্বদা রক্ষা করেন। এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলেই তিনি উঠে গেলেন।

আমরা সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসে গেলাম। রাত্রি দশটা নাগাদ জপ শেষ হতেই কম্বলে লুটিয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়েও আমার অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না। বাবাকে স্মরণ করতে করতে মন শেষ পর্যন্ত শান্ত হল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলাম, ভোরের মঙ্গল আরতি শেষ হয়ে গেছে। সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। হরানন্দজী উঠে পড়েছেন, তিনি জানালেন যে তাঁদের প্রাতঃকৃত্যও শেষ হয়ে গেছে। বললেন -- ভাই ! আজ খুব ঘুমিয়েছেন আপনি।

আমিও তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। আমরা যে যার ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে নিয়ে করভেশ্বরকে প্রণাম

করতে গেলাম। প্রণাম করতে গিয়ে বললাম — 'প্রভু আমি অতি অকিঞ্চন, সাধন-ভজন বা তপস্যা করার শক্তি আমার কোথায়? কেবল তোমার চরণে এই প্রার্থনা করছি —

'হে নাথ! অবজ্ঞা করি যেও নাকো ফিরে,
আমার এ ধূলিস্তুপ খেলাঘর দেখে।
খেলাঘরে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে যে চরণ-ধ্বনি
জগতের প্রতি বস্তু মাঝে যে সঙ্গীত রাজে
তাই যেন নিত্যকাল শুনি।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। সবাই বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। পুরোহিতজী স্বয়ং তাঁর পরিবারবর্গসহ করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। আমরা তাঁদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পুরোহিতমশাই আমাদের নর্মদার তট ধরে কতকটা পথ এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বাজতে যায়, আকাশে সূর্যের তেজ ক্রমশঃ প্রখর হচ্ছে। তবে পথের উপর বড় বড় পাথরের আধিক্য কম। পশ্চিমগামিনী নর্মদার শেষ প্রান্ত দেখা হয়ে গেছে। দেখা হয়ে গেছে নর্মদা কিভাবে অমরকন্টক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে এসে সাগরে লয়প্রাপ্ত হয়েছেন। এবার আমরা চলেছি মেকল পর্বতের উদ্‌গম মন্দিরের দিকে। আরও কতটা পথ অতিক্রম করতে হবে! মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম মনে মনে।

প্রায় মাইল পাঁচেক রাস্তা হাঁটা হয়ে গেল। আমাদের বামদিকে বয়ে চলেছেন নর্মদা। নর্মদার তটে তটে কয়েকটি শাল, আসান এবং কুসুম গাছ। দূরে দূরে আঁখ, গম ও জনারের গাছ। দূরে দূরে গরু মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। দু তিনটি বেলগাছও আছে। রাস্তায় চমৎকার আলোছায়ার খেলা। আপলোগ পরিক্রমাবাসী বা? পিছনদিক থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমরা চমকে উঠলাম। ঘাড় ঘোড়াতেই দেখলাম একজন বছর তিরিশের যুবক আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের অঙ্গুলি সংকেতে তাঁকে অনুসরণ করতে ঈঙ্গিত করলেন। ছেলেটি একটি সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে এল নর্মদার একটি ঘাটে। বলল — ইয়ে হ্যায় ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মাজীনে অন্য দেবতায়ো কে সাথ, ইধর তপ কিয়া থা। ঔর ইহ যো কুণ্ড দেখাই দেতা হ্যায় ইহ হ্যায় ব্রহ্মাজীকা যজ্ঞকুণ্ড। আভি ইস্ কুণ্ডকে অন্দর এক শিবলিঙ্গ হ্যায়। পরিক্রমাকী পথমেঁ ইহ স্থান অবশ্য দর্শন যোগ্য হ্যায়। ইহাঁ ভী যজ্ঞ, দান ঔর তপ কা বহুত ফল হোতা হ্যায়। যুবকটি নিজেই দৌড়ে গিয়ে নর্মদা থেকে ঘড়া করে জল এনে কুণ্ডস্থিত লিঙ্গের মাথায় জল ঢালতে অনুরোধ জানালেন। আমরা প্রত্যেকে মহাদেবের মাথায় জল ঢাললাম।

আমরা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে পাকা রাস্তার উপরে উঠে এলাম। প্রেমানন্দ আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন — শৈলেন্দ্রনারায়ণজী! কাল করভেশ্বর মন্দিরের কামানটি দেখে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে ঐ কামানটি আজ থেকে কত বছর আগে কে ঐস্থানে স্থাপন করেছেন তাতো পুরোহিতজী বলতে পারলেন না। সত্যি কী প্রাচীন ভারতীয়রা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণ কৌশল কিংবা সমর-বিজ্ঞানের উন্নত রীতিনীতি জানতেন? কিন্তু দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকরা এ সম্বন্ধে নানা মত পোষণ করেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত কী?

আমার মতে প্রাচীন ভারতীয়রা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ কৌশল কিংবা সমর বিজ্ঞানের উন্নত রীতিনীতি জানতেন। সেই সুদূর অতীত যুগে রাজায় রাজায় যে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধ বা মারামারি কাটাকাটি হত সেসব যুদ্ধ ছিল নেহাতই তীর ধনুকের খেলা ছিল না। আধুনিক যুগে যেমন ডিনামাইট, বন্দুক, কামান, মেশিনগান, স্টেনগান, ট্যাঙ্ক, রকেট, টর্পেডো বা অ্যাটম বোমার সর্বধ্বংসী বিভীষিকা দেখা যায় — পূর্বকালে এসব মারণাস্ত্রের ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয়রা জানতেন।

প্রাচীন ভারতীয়রা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যেমন উন্নত ছিলেন তেমনি সমর বিজ্ঞানেও যথেষ্ট উন্নত ছিলেন। অবশ্য একথা সত্য যে কত অল্পসময়ে কত বেশী লোককে একসঙ্গে মারা যায় — এইরকম মারণাস্ত্র আবিষ্কারই ভারতের জীবন ধারায় তার রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় কখনই স্থান পায় নি। ভারতীয়রা চিরকালই শান্তিবাদী — উন্নত জীবনাদর্শ, সংসারকে ব্রহ্মের পূজাঙ্গনরূপে দেখা এবং মানসিক মূল্যবোধ — প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ভারতীয়রা চিরকালই এই আদর্শ পালন করে এসেছেন।

কিন্তু যুদ্ধ আজও যেমন হয় — পূর্বেও তেমন যুদ্ধ হত। সংসারে বিভেদ এবং বৈষম্যের বীজ — আলো

আঁধারের মত একটা অনিবার্য পরিণাম। এই বিভেদ থেকেই বিবাদ। এই বিবাদ যখন ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, দেশগত গোষ্ঠীগত কিংবা জাতিগতভাবে তা যখন পরস্পর হানাহানি মারামারির মত রূপ নেয়, রক্তপাত ঘটে — তখনই তাকে আমরা যুদ্ধ বলি। রাম যুদ্ধ চায় না। শ্যাম যুদ্ধ চায় না, তারা শান্তিতে নির্বিবাদে থাকতে চায় কিন্তু যদু বা হরি যদি গায়ের জোরে রাম শ্যামের উপর হামলা করে তখন অন্ততঃ আত্মরক্ষার তাগিদেই রাম শ্যাম যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ঠিক এইভাবে নানা কারণে ভারতবর্ষে যুদ্ধ হয়েছে এবং তারফলে ভারতের ঋষি বিজ্ঞানীরা নানা যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

স্মরণাতীত কাল হতেই ভারতের যোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতেন। বেদে ইন্দ্রের অস্ত্রকে বজ্র নাম দেওয়া হয়েছে, বজ্রের বর্ণনায় বলা হয়েছে — বজ্র বিদ্যুৎমেঘের মত দ্রুতগতিতে লক্ষ্যবস্তুর উপর গিয়ে পড়ে এবং এর থেকে অগ্ন্যুৎগীরণ হয়। ভীষণ শব্দ হয়। এই বজ্রাস্তে বিশারদ হওয়ার ফলে ইন্দ্রকে সবাই ভয় করত। কিন্তু এই ইন্দ্রও বারবার অসুরদের কাছে পরাজিত হয়েছেন, রাজা নহুষ এবং সম্বরাসুর তাঁকে তাঁর স্বর্গরাজ্য হতে বিতাড়িত করেছিলেন। সম্বরাসুরের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি দশরথের সাহায্য চাইলে দশরথ সম্বরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁকে পরাজিত করেন। বজ্রধারী ইন্দ্রকে নিশ্চয়ই সম্বরাসুর কেবল তীর ধনুক দিয়ে হারান নি, নিশ্চয়ই তিনি বজ্রের চেয়ে আরও মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতেন। আবার সম্বরাসুর ব্যবহৃত সে হেন আগ্নেয়াস্ত্রকেও দশরথ ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই তীর ধনুক দিয়ে নয়।

রামায়ণ মহাভারতের এই কাহিনীকে কেউ হয়ত উপকথা বা গল্পকথা বলে উপহাস করতে পারেন। আপত্তি তুলতে পারেন যে ঐসব কথা ইতিহাস নয়। ইতি-হ-আস্ পূর্বে যা ঘটেছিল, তাই যদি ইতিহাস হয় তাহলে আমাদের রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে কেন ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া হবে না? অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের যে সব কাহিনীকে ইতিহাস বলা হয় এমন অনেক কাহিনীই তো সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণার ফলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ধরুন, মিন্‌হাজউদ্দিন লিখেছেন — মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে নাকি বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে গৌড় জয় করেছিল। কিন্তু আমাদের শত্রু রাজার বেতনভুক্ কর্মচারী মিন্‌হাজউদ্দিনের ঐ কাহিনী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা একথা আজ সকল জ্ঞানী লোকই মেনে নিয়েছেন। হলওয়েল লিখেছেন — ১৬' x ১৪'৮" একটি ঘরে সিরাজউদ্দৌল্লা নাকি ১৭৬ জন ইংরাজেকে বন্দী করে রেখেছিলেন। তার ফলেই তারা নাকি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার বহু অকাট্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন — হলওয়েল সাহেব ঘোরতর মিথ্যাবাদী। সে সময় কলকাতায় ৪৬ জনের বেশী ইংরাজ ছিল না। নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ লাগার আগেই অধিকাংশ ইংরাজরা ফলতায় পালিয়ে গেছল। ঐতিহাসিক হলওয়েলের ঐ বর্ণনাকে ঠাট্টা করে আচার্য যদুনাথ লিখেছেন — 'Geometry disproving arithmetic gave lie to thus story'. ঠিক এইরকম স্মিথের লেখা ভারতীয়দের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী নিরপেক্ষ গবেষণা এবং নির্ভুল প্রমাণপঞ্জী দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মতলববাজ, মিথ্যাবাদী, ইচ্ছা করে যারা সত্যকে বিকৃত করে, মিথ্যার বেসাতি করে — সেই ভারত বিদ্বেষী মিন্‌হাজউদ্দিন, হিন্দু বিদ্বেষী কাফী খাঁ, হলওয়েল বা স্মিথের কাহিনীকে ইতিহাস বলা হবে আর সত্যসন্ধ ঋষি ব্যাস বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ মহাভরতকে ইতিহাস বলা হবে না কেন? আমি বলতে চাই — আমাদের বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ আমাদের একাধারে অধ্যাত্মশাস্ত্রও বটে এবং ইতিহাসও বটে।

সুখের কথা, সর্বযুগে সব জাতিতেই প্রকৃত জ্ঞানী এবং সত্যনিষ্ঠ লোকের অভাব নাই। বহু ইংরাজ মনীষীকেই তাই দেখা যায়, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তার মহোত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করে নিয়েছেন। অধ্যাপক উইলসন্ এবং অধ্যাপক ক্যালহেড, আমি একটু আগে যে বজ্রের কথা বললাম সেই বজ্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন —

'Vajra was common weapon in India. Gun-powder has been known in Hindusthan, far beyond all periods of investigation. The word fire-arm is literally the Sanskrit Agni-astar i.e. a weapon of fire. Among several extra ordinary properties of this weapon, one was that often it had taken its flight, it divided into several separate streams of flame, each of which took effect and which when once kindled could not be extinguished but this kind of Agni astar is now lost.'

এখন lost হোক কিন্তু আগে যে তা ছিল, প্রাচীন ভারতীয়রা যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতেন — এই দুই মনীষী সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি এবং গবেষণা তার প্রমাণ।

মহাভারতের অংশ হরিবংশে এই আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ আছে। সেখানে পাই, তালজঙ্ঘ এবং হৈহয় নামে দুর্ধর্ষ অসুররা যখন ধার্মিক এবং নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো, সারা পৃথিবী জয়ের দুর্বার আকাঙ্খায় ঐ সাম্রাজ্যবাদী দুষ্টরা যখন দোষী নির্দোষ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে পীড়ন করতে লাগলো তখন ঋষি ভার্গব তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য সগর রাজাকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কৌশল শিখিয়ে দেন —

আগ্নেয় অস্ত্রম্ লব্ধা চ ভার্গবাৎ সাগরো নৃপঃ।
জিগায় পৃথিবীং হত্বা তালজঙ্ঘান হৈহয়ান্।।

লক্ষ্য করুন, আজকালকার মত সাম্রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন জাতিকে অস্ত্রবলে পদানত করে তাকে শাসন এবং শোষণ করার জন্য ঋষি সগরের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেন নি। হিটলারের ভয়ে আইনষ্টাইনের মত বিজ্ঞানীকে আমেরিকাতে পালাতে হয়েছিল, হিটলারের ভ্রূকুটিতে বাধ্য হয়ে আটোহ্যানকে অ্যাটম বোমা বানাতে হয়েছিল। কিন্তু সে যুগের বিজ্ঞানীদেরকে কোন রাষ্ট্রনায়কের অঙ্গুলি হেলনে চলতে হত না কিংবা তাদের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা করতে হত না। বরং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং নির্যাতনকে বন্ধ করার জন্যই, অত্যাচারীকে স্তব্ধ করার জন্যই ভীষণ ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সকল ব্যবহৃত হত।

ভার্গব সহসা সগররাজাকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখাননি, কিংবা ঔর্বও তাঁকে পররাজ্য গ্রাসের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখাননি। তাঁরা কখন দিলেন — না — যখন তালজঙ্ঘ এবং হৈহয় পৃথিবী জয় করতে চাইলো। 'জিগায় পৃথিবীং হত্বা' তারা যখন দুঃসহ অত্যাচার চালিয়ে রক্তস্রোত বহাতে লাগলো কেবলমাত্র তখনই সগররাজা ঋষিদের নির্দেশে ঐ অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। ঠিক এইভাবে তাড়কা রাক্ষসী কিংবা রাবণকে শাসন করার জন্যই সমর বিজ্ঞানী ঋষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে দিব্য দণ্ডচক্র, কালচক্র, বজ্র, সুরাবত, বিশ্ব-বিধ্বংসী অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, কঙ্কাল, কপাল নামক অগ্নিস্রাবী দুটি ভীষণ অস্ত্র, কিঙ্কিণী নামে ক্ষেপনাস্ত্র প্রভৃতি দান করেছিলেন। রামায়ণে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঋষি বাল্মীকি এ সবের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন — রণস্থলে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন, বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করেই সেইরূপ কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টি করা যেত। বায়বাস্ত্র নামে আর একরকমের অস্ত্র ছিল — তা ব্যবহার করে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি করাও সম্ভবপর হত।

রামায়ণ মহাভারতের কথা বাদ দিলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এইসব ঘটনাকে দেশী বিদেশী সবাই তর্কাতীতভাবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বলে accept করে নিয়েছে। সেই মধ্যযুগের দিকে তাকালেই যেকোন লোক বুঝতে পারবেন যে শৌর্য বীর্য কিংবা সমর কৌশলে অন্য যে কোন দেশের চেয়ে ভারতবাসী কম ছিল না। বিরাট বিরাট নৌবহর পাঠিয়ে ভারতীয়রা যে বালী, জাভা, সুমাত্রা, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ গড়েছিল, আজও যে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ভাষা এবং লিপিতে পুরোপুরি ভারতীয় সভ্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর আছে, বরবদুর বা আঙ্কোরভাটের মন্দিরে ভারতীয়দের যে বিস্ময়কর স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দেখতে পাচ্ছি সেইসব দেশে উপনিবেশ গড়তে গিয়ে ভারতীয়দেরকে অনেক সময় যুদ্ধও করতে হয়েছিল। সেসব যুদ্ধ কি নেহাৎই তীর ধনুক নিয়ে ছেলেখেলা ছিল বলে মনে হয়? ভারতীয়দের অস্ত্রসম্ভার এবং রণকৌশল দেখে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের পৃথিবী জয়ের সাধ মিটে গেছল সে কি কেবল মগধরাজের রাশি রাশি তীর ধনুক আছে শুধু এই সংবাদটুকু পেয়ে? অনেক ঐতিহাসিক বলেন — গ্রীকদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, ভারতীয়রা কামান বন্দুকের ব্যবহার জানতো না, তাঁদেরকে কি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি — সেলুকাস যে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে নিতান্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন — সেও কি কেবল তীর ধনুক বল্লম কুঠার আর গদার যুদ্ধ মাত্র ছিল?

আসলে এখন lost হলেও তখন পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহার ভারতবর্ষে লোপ পায় নি। ভারতীয় সৈন্যদের শৌর্যবীর্য ছাড়াও উন্নততর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েই আলেকজাণ্ডার এবং তার গ্রীকবীরদের হৃদকম্প উপস্থিত হয়েছিল। এ যে আমার কষ্ট কল্পনা নয় সে সম্বন্ধে কিছু authentic authority থেকে প্রমাণ দেই। থেমেষ্টিয়াস, ফিলাস্ট্রেটাসের মত গ্রীক ঐতিহাসিকরাই লিখেছেন — 'যদিও আলেকজাণ্ডার

সিন্ধু নদ অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু পুরুর সঙ্গে যুদ্ধের পর তিনি ভারতীয়দের যথেচ্ছ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার দেখে ভয় পেয়েছিলেন।

যদি কোন শত্রু ভারতের ঋষিকল্প ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করত, তাহলে তাঁরা বজ্র এবং বিষম ঝটিকা প্রবাহের দ্বারা শত্রুকে ধ্বংস করতেন। তখন মনে হত, যেন স্বর্গ হতে সেইসকল অস্ত্র পড়ছে। আলেকজাণ্ডার যে প্রথমে কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছিলেন তার কারণ ভারতবাসীরা প্রথম সেদিকে দৃষ্টি দেন নি, তাঁরা একতাবদ্ধ হন নি। বজ্র এবং অগ্নিময় ঘূর্ণিবায়ুর সাহায্যে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার সামর্থ্য তাঁদের ছিল। আলেকজাণ্ডার তাঁর গুরু অ্যারিষ্টটলকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তিনি স্পষ্টতই লিখেছিলেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যরা ভয়ানক অগ্নিবর্ষণ করেছিল।

ঐ অগ্নিময় ঘূর্ণিবায়ু এবং অগ্নিবর্ষণ সম্বন্ধে গ্রীক ঐতিহাসিক এবং আলেকজাণ্ডারের নিজস্ব স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও যদি কেউ বলেন যে ভারতীয়রা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতো না তাহলে বলতে হয় যে তিনি নিশ্চয় কোন মতলব নিয়ে বলেন বা সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলেন।

হূণ আক্রমণ ইউরোপকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করেছিলো কিন্তু গুপ্তরাজাদের প্রতাপে অল্পদিনের মধ্যেই বন্দুকধারী ঐ লুণ্ঠকের দলকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়। ভারতীয়রা শুধু যে সিংহল বালী সুমাত্রা আনাম কম্বোডিয়া জয় করেছিল তা নয়, একদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল নৌবহর পাঠিয়ে ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জয় করে নেন। ঐতিহাসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন — নরম্যাণ্ডির ডিউক্ উইলিয়ামের ঐ শতাব্দীতে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ড জয়ের কীর্ত্তির চেয়ে রাজেন্দ্র চোলের ব্রহ্ম অভিযানের কীর্ত্তি বড়।

তাহলে ঐ সব ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে প্রমাণিত হল যে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ভারতবর্ষের লোকেরা নৌযুদ্ধ এবং আগ্নেয়াস্ত্রে পটু ছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যখন পাঠান সৈন্যদের যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধেও যে ভারতীয় সৈন্যরা গোলাগুলি ব্যবহার করেছিল, 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ' নামক বই-এ সেই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। বইটি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িককালে পদ্য ছন্দে লেখা, এতে আছে —

নৃপ পংগ নখব ছুটে অরাব। কোটহ্ বংগুর চঢ়িচঢ়ি সিতাব।
জংবুর তোপ ছুটছি যুনংকি। দশকোশ জায় গোলা ভনংকি।
সিরদার ভার বারাহ রোহ। লংগি অভংগ বর ইনে কোহ।

কবি বর্ণনা করেছেন যে অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ সৈন্যরা যখন গোলাবর্ষণ করছিল তখন দশকোশ জায় গোলা ভনংকি' অর্থাৎ দশক্রোশ পর্যন্ত স্থান গোলার শব্দে কেঁপে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, অযোধ্যার রাজদরবারে রাজা কুন্দনলাল নামে এক ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি তাঁর বইতে অযোধ্যারাজের অধিকারে যে 'লিচনা' নামে এক মারাত্মক বৃহৎ কামান ছিল তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় আজমিঢ়াধিপতি মহারাজা পৃথ্বীরাজের সৈন্যদল যুদ্ধের সময় সেই কামান ব্যবহার করেছিলেন। 'Hindu Superiority' নামে ইংরাজ এবং 'মুনতাখাব-তফ্সী-উল-আখবার' নামক উর্দু গ্রন্থে ঐ কামানের বর্ণনা আছে। শেষোক্ত বইটিতে এ কথাও লেখা আছে যে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হতেই হাওয়াই এর মত একরকম বিচিত্র অস্ত্রের প্রচলন ছিল, সেই অস্ত্র আকাশে ছুঁড়লে আকাশ আগুনের তৈরী সাপে ছেয়ে যেত। অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছেন, যে রকেট বা হাওয়াই আকাশে উঠে ফেটে গেলে তা হতে নানা রকমের নানা আকারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় — সেগুলিকেই হয়ত অস্ত্রমুখে সাপ, বাঘ জাতীয় জন্তুর আবির্ভাব বলে কল্পনা করা হত। তবে তা যাই হোক না কেন — ভারতীয় যুদ্ধবিদ্যা সেই সুদূর অতীত যুগ হতেই যে যথেষ্ট উন্নত ছিল তাঁরা যে রকেটের ব্যবহার জানতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কর্ণেল অলকট পুরাণ ইতিহাস ছাড়াও অধুনালুপ্ত সংস্কৃতে লেখা অনেক হিন্দু বিজ্ঞানের বই consult করে ১৮৮১ সালে Theosophist পত্রিকাতে লেখেন —

The Astur Vidya, the most important scientific part of war is not known to the soldiers of our age. It consisted in annihiliating the hostile army by enveloping and suffocating it in different lay and masses of atmospheric air, charged and impregnated with different

substances. The army would find itself plunged in fiery, electric and watery element, in total thick darkness or surrounded by a poisonous smoky, plestilential atmosphere, sometimes full of savage and terror-striking animal forms and frightfull noises.

আমাদের সত্যিকারের জাতীয় ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত, গৃহ্যসূত্র ব্রাহ্মণাদি পুরাণগ্রন্থে যেসব বিস্ময়কর যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা আছে উপরোক্ত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণও নানাভাবে নানা অনুসন্ধান করে সে সব প্রাচীন অস্ত্রবিদ্যার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন — সেগুলিকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নাই। বরং সেই সুদূর অতীতকালে হিন্দুরা অঙ্কশাস্ত্র, ছন্দোগনিত (Differential & Integral Calculas) শূল্যসূত্র বা জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ করে রসায়নশাস্ত্রে যে আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন যা আজকাল পৃথিবীর সকল জাতির সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন। সেইসব কথা স্মরণ রেখে বলা যায় যে হিন্দুশাস্ত্রে ঐ সব অস্ত্রের ব্যবহারের বর্ণনা হিন্দুদের বিজ্ঞান প্রতিভার সঙ্গে বরং যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত History of Hindu Chemistry গ্রন্থে বহু প্রমাণ দিয়ে জগতের বৈজ্ঞানিকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে স্মরণাতীত কাল হতে হিন্দুরা কাঁচ থেকে বৃত্ত বা বর্ত্তন তাল (Spherical & Oral lenses) তৈরী করতে জানতেন। হিন্দুরা যে বৎসরের বৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্বাভাষ দেওয়ার জন্য বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করতেন, আকাশের বিভিন্ন প্রকারের মেঘ এবং বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য বিষয়ও যে তাঁরা জানতেন একথা আজ প্রমাণিত সত্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় — সীতাধ্যক্ষ অর্থাৎ কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ যিনি, তিনি যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের কোন জায়গায় কত বৃষ্টিপাত হয় তা পরিমাপ করতেন। বৃষ্টির পরিমাণ বুঝে কোন শস্য বপন করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়াই তাঁর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য ছিল।

প্রাকৃতিক রং সম্বন্ধে অদ্যাপিও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃত Arthur George Parkin তাঁর — The Natural Organic Colouring Matter নামক বই এ লিখেছেন প্রাচীন ভারতের আকরাধাক্ষরা শুধু শুল্বধাতু রসপাল মণিরাগঞ্জ অর্থাৎ পারদ পাতন এবং খনিজ পদার্থ পরীক্ষাতেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তাঁরা নীল ও মঞ্জিষ্ঠা দিয়ে পাকা নীল, লাল রং প্রভৃতি তৈরী করার বিচিত্র কৌশলেও ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর ভাষা হল — The achievement of the Hindus in different parts of chemistry is great and glorious. Dr. Parkins এর ঐ গবেষণা ছাড়াও সকলের চোখের সামনে যে অজন্তা ইলোরার অতুলনীয় ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন আছে তাই দেখে উন্নাসিকের দল একটু ভেবে দেখুন না যে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে অথচ ঐ সব পরমাশ্চর্য্য ছবির রং একটুও fade করে নি। কারিগরের হাতের বাটালি পাথর কেটে যে মূর্ত্তি ওখানে গড়েছে সেগুলিকে কি দেখে মনে হয় না যে — অতীত ইতিহাস ওখানে কথা বলছে। দিল্লীতে কুতুবমিনারের কাছে রাজা চন্দ্রের নির্মিত যে লৌহ স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে সে যুগে লোহা গালাই করে অতবড়, মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ করার মধ্যে কতখানি উন্নত বিজ্ঞান প্রতিভার দরকার হয় — তা কি কাউকে বলে বোঝাতে হবে? মরচেহীন লোহা তৈরীতে আধুনিক বিজ্ঞানীরা কতখানি successful হয়েছেন জানিনা, কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে হিন্দু বিজ্ঞানীরা সেই অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভব করে তুলেছিলেন। এতকাল রোদ বৃষ্টি পেয়েও ঐ স্তম্ভে এতটুকু মরচে ধরে নি। এ ছাড়া মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পাতে আবিষ্কৃত ৩৯´ x ৭৮´ বীম, বরগা বিহীন দালান, উন্নত সেচ প্রণালী দেখে আজকালকার প্রযুক্তিবিদ্‌রা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। আমি এই কথাই বলতে চাই ঐভাবে রসায়ণশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং পূর্তবিদ্যায় হিন্দু মনীষাকে যখন সবাই স্বীকার করেছেন তাহলে তাঁরা সমর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানতেন না এ কখনও হতে পারে?

কাজেই উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের কলা কৌশল সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যেসব কথা আছে তাঁদের ঐসব বিজ্ঞান জ্ঞানের সঙ্গে তা যথেষ্ঠ সঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের পূর্বপুরুষরা সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করে কাগজ খড় কিংবা আরও উন্নততর প্রয়োগ কৌশলে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও লক্ষ্যবস্তুতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারতেন। আলোক-রশ্মির বক্রন এবং প্রতিফলন সমন্ধেও তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দবিজ্ঞান এবং তার নানারকম ব্যবহারিক কৌশলকে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েও হিন্দুরা তাঁদের যুদ্ধ বিদ্যা উন্নত করেছিলেন। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা দর্শনে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে — পদার্থাৎ চ শক্তিঃ। পদার্থের অণুকে ভাঙলে

মহতী শক্তিমুপজায়তে — মহাশক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি কলোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো। এরফলে লোকক্ষয়কারী কালাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে পারা যায়।

প্রশ্ন হতে পারে প্রাচীন ভারতে এতই যদি যুদ্ধবিদ্যা উন্নত ছিল, এতই যদি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল তবে ভারত পরাধীন হল কেন? এর এককথায় উত্তর মধ্যযুগের একটি বিশেষ সময়ে ভারতীয় রাজারা ঋষির অনুশাসন এবং ত্যাগপূত জীবনাদর্শ থেকে সরে এসেছিল, তার ফলেই বিভেদ এবং অনৈক্যের যে বিষ বাষ্প জ্বলেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের অধঃপতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদি প্রশ্ন হয় — অস্ত্র তৈরীর practical demonstration কিভাবে নষ্ট হল? তার উত্তর — ভারতে বিদেশীদের বারংবার আক্রমণ। তুর্কী, পাঠান, মোঘল যে যখন পেরেছে তারা আমাদের সবচেয়ে সর্বনাশ করেছে আমাদের সংস্কৃতির আধার পট বিশ্ববিদ্যালয়, মন্দির এবং মন্দিরে রক্ষিত দুর্লভ পুঁথিপত্র নষ্ট করে দিয়ে, ১২০২ খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি বিহার জয় করে। ঐ সময় গোবিন্দলাল বিহারের রাজা ছিলেন। মহম্মদ শুধু জয় ও লুণ্ঠন করেন নি, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টিও ধ্বংস করে দেয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু শতাব্দী সঞ্চিত পুঁথিপত্র সমেত লাইব্রেরী, বহু বৌদ্ধ বিহার এবং সঙ্ঘারামকে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করে। পাঠানদের হাতেই বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অমূল্য পুস্তকগুলি নষ্ট হয়। সুলতান মামুদ, তৈমুরলঙ, আলাউদ্দিন খিলজী, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ প্রভৃতি সকল আক্রমণকারীদের হাতে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মণিপীঠগুলি বারবার ধ্বংস হয়। ঔরঙ্গজেবের তো লক্ষ্যই ছিল দার-উল-হার্ব অর্থাৎ হিন্দুদের দেশ ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ মুসলমানের দেশে পরিণত করা। তিনি তো বেছে বেছে হিন্দুধর্মের যত পুস্তক সবই ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সে সময় সুদূর তিব্বত এবং নেপালে পালিয়ে গিয়ে কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যাসীর দল কিছু পুঁথি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সর্বশেষে ইংরাজরা এদেশ থেকে অনেক দুর্লভ পুঁথিপত্র নিয়ে গেছে। বর্তমানে Practical demonstration অর্থাৎ অস্ত্র নির্মাণ কৌশল বিষয়ে কোন বই না পাওয়া বা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চা না হওয়ার এটাও কারণ। বোধহয় প্রধান কারণ।

এতৎ সত্ত্বেও যা আছে, সেইরকম দুই একখানি বই এর নাম করছি। যেমন ধরুন 'রসার্ণব', 'রসরত্নসমুচ্চয়', 'ধনুর্বেদ'। 'রসার্ণব' দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা। রসার্ণবে শুধু যে অস্ত্র নির্মাণের উপাদানসহ অন্যান্য বহু বিষয়ের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে তা নয়, সে সময়ে যে সব অস্ত্র ব্যবহৃত হত, তাতে তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। 'রসার্ণবে'র কিছু পরে লেখা 'রসরত্নসমুচ্চয়ে' কি রকম জায়গায় রসায়নাগার প্রস্তুত করতে হবে এবং কোথায় কোন যন্ত্র রাখতে হবে তারও নির্দেশ আছে। আজকালকার নূতন নূতন বিজ্ঞান প্রতিভা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যদি ঐ সব গ্রন্থের নির্দেশমত গবেষণা করেন, তাহলে আমার স্থির বিশ্বাস তাঁরা আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত বিস্ময়কর অস্ত্র উৎপাদন করতে পারবেন। তখন বুঝবেন যে আমাদের পূর্বপুরুষরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতেন কিংবা সেকালের যুদ্ধ সত্যই তীর ধনুকের খেলা ছিল না। 'ধনুর্বেদ' আমাদের যুদ্ধবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। কিন্তু এই ধনুর্বেদ নাম নিয়েই তো বড় বড় পণ্ডিতরা ভ্রমে ও বিভ্রাটে পড়েছেন! ধনু মানে যেহেতু ধনুক সেইজন্য কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্ত্যে অনেক পণ্ডিতই প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিদ্যাকে কেবলমাত্র তীর ধনুকেই সীমাবদ্ধ মনে করেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের দেশে অস্ত্রবিদ্যার অপর নাম 'ধনুর্বেদ' বা 'ধনুর্বিদ্যা। ধনুর্বেদে নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের যন্ত্র এবং তার প্রয়োগ বিধির উল্লেখ আছে। এমনকি যেভাবে এখন সৈন্য পরিচালনা করা হয় ধনুর্বেদে সেইরকম উন্নত সৈন্য পরিচালনা বিধিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, কৃষ্ণ যজুর্বেদ, শুক্রনীতি, মনু-সংহিতা নামক গ্রন্থে এমন সব উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের বর্ণনা আছে যা আলোচনা করলে বুঝতে পারবেন — প্রাচীন ভারতীয়রা সমর বিজ্ঞানে কতখানি সমুন্নত এবং অপরাজেয় ছিলেন।

রামায়ণ মহাভারতের কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। আমাদের ঐ সব প্রাচীন অস্ত্রের নাম ছিল নালিক, শতঘ্নী, জ্বলন্তী, স্থূণা, সূর্মী, বজ্র, লিচনা, শিখরী প্রভৃতি। নলের মধ্যে দিয়ে অগ্নিবর্ষী গোলা নিক্ষিপ্ত হত বলেই এক ধরণের আগ্নেয়াস্ত্রের নাম ছিল — নালিক। ঐ সকল যন্ত্র এবং অস্ত্র সম্বন্ধে আমি কৃষ্ণযজুর্বেদে প্রথম মণ্ডলের ৬ষ্ঠ সূক্তের ৫ থেকে ৭ নম্বর মন্ত্রটি এবং ভাব ব্যাখ্যা করছি তার থেকে আজকাল যে সব কামান বন্দুক মেসিনগানের পরিচয় পাওয়া তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন।

মন্ত্রটি হচ্ছে —

এষা বৈ সূর্মী কর্ণকাব্যত্যেতয়া হস্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শতর্তহা স্তৃংহন্তি॥

এর অর্থ হল — জ্বলন্ত লৌহময়ী স্থূণা, সূর্মী। সূর্মী লৌহ দিয়ে তৈরী তা জ্বলন্তী অর্থাৎ তা হতে অগ্নিবৃষ্টি হয়। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবর্তী অর্থাৎ তার টিপবার মত কর্ণ আছে এবং এই যন্ত্রে একটি ছিদ্র আছে। তৎসমানেয়মৃক। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরা — এর থেকে একবার অগ্নিবৃষ্টি করলে একসঙ্গে ১০০ জন লোক মারা যায়। সেইজন্যে এর নাম শতর্তহা অর্থাৎ শতংহন্তি। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ সর্মীযোদ্ধৃন্ যদি অসুররা সূর্মী অর্থাৎ একজন দুজনকে গুলি করে মারতে পারে এমন অস্ত্র সূর্মী ব্যবহার করতো তাহলে দেবতারা এতয়া অর্থাৎ ঐ শতর্তহা ব্যবহার করে তাদেরকে প্রহার করতো — এতয়া ঋচা দেবা হিংসন্তি। অনয়া সদাধেনন শতঘ্নীখেনাম্ ঋচং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং হন্তং প্রহরতি। অর্থাৎ ঐ শতর্তহার চেয়ে শক্তিশালিনী আর একরকম মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র যার নাম বজ্র তা ব্যবহার করে ইন্দ্র শত্রুদেরকে হত্যা করতেন।

ঋগ্বেদের ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মণ্ডলে আমরা একটা ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা পাই। এই যুদ্ধে শতর্তহা, শতঘ্নী, সূর্মী প্রভৃতি অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছিল। এই যুদ্ধ হয়েছিল যজ্বাবতী নদীর তীরে হরিযূপীয়া নামক একটি স্থানে। এই যুদ্ধে আর্যপক্ষের সেনাপতি ছিলেন দেবাবাতের পুত্র চায়মান। তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষ, যাঁদেরকে তাঁরা কখনও দাস, কখনও অজ্বা কখনও বা অসুর বলতেন সেই শত্রুপক্ষের সেনাপতির নাম ছিল বর্চিনদাস। এই বর্চিনদাসের পরিচালিত ব্যূহে এক লক্ষ ৫ জন যে সৈন্য ছিল বেদে তারও exact number উল্লেখ করা আছে। ঐ বর্চিনদাসের ব্যূহের অগ্রভাগে বরশিখ বংশীয় ৩ হাজার বৃচিবন জাতীয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। কিন্তু আর্য সেনাপতি চায়মান শতঘ্নী ও সূর্মী দিয়ে এমনই কৌশলে দাসদেরকে আক্রমণ করেছিল যে বৃচিবনরা ভগ্ন মৃৎপাত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছল। মন্ত্রটি হচ্ছে —

এতত্যত্ত ইন্দ্রিয়মচেতি যেনাবধীর্বরশিখস্য শেষঃ।
বজ্রস্য যত্তে নিহতস্য শুষ্মাৎস্বনাচ্চিদিন্দ্র পরমো দদার॥
বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোঽভ্যাবর্তিনে চায়মানয় শিক্ষন্।
বৃচীবতো যদ্ হরিযূপীয়ায়াম্ হন্ পূর্বে অর্ধে ভিয়সাপরো দর্তন॥ (ঋ ৬।২৭।৪,৫)

এখন আমি যদি বেদোক্ত ঐ যুদ্ধস্থলের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি তাহলে আশা করি বাকী অংশ অর্থাৎ যুদ্ধ এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারকে কেউ অবিশ্বাস করবেন না। আমি উপরোক্ত মন্ত্রটির অর্থ বলেছি যে যজ্বাবতী নদীর তীরে হরিযূপীয়াতে এই যুদ্ধ হয়েছিলো। –– বৃচিবতো যদ্ হরিযূপীয়ায়াম্। এখন যজ্বাবতী নদীটি কোথায়? শুনলে আশ্চর্য হবেন, বেদোক্ত ঐ যজ্বাবতী নদীই এখনকার ইরাবতী। যজ্ব শব্দটির প্রতিশব্দ হল হু-র। এর মানে কুণ্ডলী বা স্রোত। কাজেই যজ্বাবতীকে বলা হয় হু-র-ব-তী। সংস্কৃত কৃষ্ণ থেকে যেমন প্রাকৃতরূপ কাহ্ন, তার থেকে চলতি বাংলা কানু, হস্ত থেকে যেমন হত্থ তার থেকে যেমন হাত, তেমনি হু-র-ব-তী থেকেই ইরাবতী। আপনারা সবাই জানেন যে, এই ইরাবতী নদীর পশ্চিমতীরে বর্ত্তমানে মন্টগোমারী জেলায় হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখেই পৃথিবীর তাবৎ পণ্ডিতরা বলেছেন যে, এই হরপ্পা একসময় অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর ছিল। এখনকার মানুষের জীবনযাত্রা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানও যথেষ্ট উন্নত ছিল। আমি বলতে চাই বৈদিক যুগের হরিযূপীয়াকেই সেখানকার অধিবাসীরা হরপ্পা বলতেন, এখনও হরপ্পা বলে থাকেন। হরিযূপীয়াই যে হরপ্পা - এটা আমার কষ্ট কল্পনা নয়। কারণ তামিল ভাষায় 'লিঙ্গযূপীয়া' — এই original শব্দটি যদি লিঙ্গাপ্পা হয় তাহলে হরিযূপীয়া থেকে হরপ্পা হবে না কেন?

ইরাবতী যখন ভারতে প্রবহমান, তাহলে যজ্বাবতী নদীর পরিচয় পাওয়া গেল। হরপ্পা আবিষ্কৃত হওয়ায় বেদোক্ত হরিযূপীয়াও আমরা চিনলাম। তাহলে ঐ স্থলে যে যুদ্ধ হয়েছিল এবং মন্ত্রাংশের অবশিষ্টভাগে যে যুদ্ধে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের নাম করা হয়েছে তাকে অবিশ্বাস করা হবে কেন?

প্রাচীন ভারতীয়রা যে সীসক নির্মিত গোলক যুদ্ধকালে ব্যবহার করতেন, অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি পর্যালোচনা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলিতে দেখতে পাই আর্যরা তাঁদের শত্রুকে বলছেন ,'যদি তোমরা আমাদের গো অশ্বাদি লুণ্ঠন কর কিংবা আমাদের লোকজনদেরকে আক্রমণ কর তাহলে আমরা অগ্নিময় সীসক বা গোলা নিক্ষেপ করে তোমাদেরকে ধ্বংস করব'। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে লৌহ নির্মিত স্থূণা

অর্থাৎ খুঁটিতে সুষির বা ছিদ্র থাকত এবং তা হতে প্রজ্বলিত পদার্থ সীসক বের হত এবং তা দিয়ে শত শত শত্রুকে বিনাশ করা যেত। এইরকম বর্ণনা আজকালকার বন্দুক বা কামান ছাড়া আর কি অস্ত্রে হতে পারে?

আমাদের পূর্বপুরুষরা বন্দুক, কামান বা উন্নত আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন কিনা শুক্রনীতির মন্ত্রগুলি হতেই তা জানা যায়। তাঁরা বলেছেন নালিকং দ্বিবিধং প্রোক্তং অর্থাৎ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রভেদে নালিক যন্ত্র দুরকম — একটার নাম লঘু নালিক এবং আর একটার নাম বৃহন্নালিক। লঘু নালিকের লক্ষণ — তির্যগূর্ধ্বছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতাস্তিতম্ — পাঁচ বিতস্তি পরিমাণ অর্থাৎ এখনকার হিসাবে ৪ হাত লম্বা লোহার তৈরী একটা নল বা নাল। তার গোড়ার দিকে তির্যকভাবে অর্থাৎ আড়ভাবে একটা ছিদ্র থাকবে। মূল হতে উর্দ্ধ পর্যন্ত এতে একটা অন্তঃসুষির অর্থাৎ গর্ত আছে। মূল এবং অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করবার জন্য — মূলগ্রয়োল্লিক্ষ্যভেদী একটি তিলবিন্দু বা মাছি আছে। যন্ত্রে আঘাত লাগা মাত্র যাতে অগ্নি নির্গত হয় তার জন্য অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদের আধার স্বরূপ একটি কর্ণ আছে। এতে উত্তম কাঠের তৈরী উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরবার একটা মুঠ থাকে। এই নালিকের মধ্য গর্ত্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলি বিলাগুরম্ অর্থাৎ তর্জনী ঢোকার মত। এইরকম নলাস্ত্রের নাম লঘু নালিক। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যরাই কেবল এই অস্ত্র ব্যবহার করত।

আমাদের সমরতত্ত্ববিদ্ পূর্বপুরুষরা যার নাম দিয়েছিলন বৃহন্নালিক, তা ক্ষুদ্র নালিকের চেয়েও মারাত্মক। এর নালির গর্তও বড় এবং এই অস্ত্রের বহিরাবরণও প্রচণ্ড শক্ত। এর গোলা যতই বড় হবে ততই এটি দূরভেদী হবে — যথাদীর্ঘং গোলং দূরভেদী তথা তথা। এর মূলদেশে কীলক এবং কাষ্ঠবুধ্ন অর্থাৎ কাঠের তৈরী মুঠ নেই। শকট এবং উষ্ট্র দ্বারাই এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র বাহিত হয়। দুর্গ এবং প্রাসাদের উপর থেকে শক্তভাবে স্থাপন করলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে স্থাপিত হলে এই অস্ত্র সুযুক্তং বিজয়প্রদং — বিজয়প্রদ হয়।

এখন স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে এই ক্ষুদ্র নালিক এবং বৃহৎ নালিক বন্দুক এবং কামানের অনুরূপ। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিদ্যা যে কতটা উন্নত ছিল এগুলি তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু দুঃখের কথা তবুও একদল পণ্ডিত আছেন যাঁরা প্রাচীন ভারতে যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল তা স্বীকার করতে চান না। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর অগ্নিপুরাণের ভূমিকায় এবং Notices of Sanskrit Manuscript Vol. V (এই বইটি Asiatic Society তে আছে) গ্রন্থে এই বিষয় অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন অগ্নিপুরাণের ধর্নুবেদ প্রকরণে ২৪৯-২৫১ অধ্যায়ে ছাত্রকে অস্ত্র শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি আছে সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ নেই। শুক্রনীতি গ্রন্থে যেখানে বারুদ, কামান, বন্দুক প্রভৃতির উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন ওগুলি নাকি প্রক্ষিপ্ত। বাহবা! অর্বাচীন যুগের লেখা পুরাণ যেখানে আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ নাই, সেইটি তাঁর মতে প্রমাণ। আর শুক্রনীতি নামক প্রাচীনতর গ্রন্থে যেখানে আগ্নেয়াস্ত্রগুলির নিখুঁত বর্ণনা আছে সেগুলি তাঁর মতে প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ যাতে আমাদের গৌরবের হানি হয় সেটা গ্রহণযোগ্য আর যাতে আমাদের গৌরব বাড়ে সেটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নহে। এ এক আশ্চর্য্য মানসিকতা ও আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত বটে! এটা ঠিক যে এইরকম এশিয়াটিক সোসাইটির Journal এ (Journal of Asiatic Society, Vol XIV) Major General R. Maclagon এশিয়া মহাদেশের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে নালিক, বৃহন্নালিক, শতঘ্নী প্রভৃতির উল্লেখ করেও ঝটিতি মন্তব্য করেছেন — 'I don't think Indians knew the use of fire-arms'। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সাহেব কি think করেছেন তাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নেই তবে এই সাহেবের প্রবন্ধ অনুসরণ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত নমস্য ব্যক্তি যে মন্তব্য করেছেন সেটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। তিনি লিখেছেন — 'বাবরের পূর্বে এদেশে বারুদের প্রচলন ছিল না। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবর গোলাগুলির সাহায্যে কনৌজ প্রবেশের পথ পরিষ্কার করেছিলেন। ইহাই ভারতে প্রথম বারুদের ব্যবহার।'

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, শুক্রনীতি, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ছাড়াও আমি গ্রীক ঐতিহাসিকের প্রমাণ উল্লেখ করে দেখিয়েছি যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়েও এদেশে গোলা বারুদের ব্যবহার ছিল আলেকজাণ্ডার নিজেই অ্যারিষ্টটলের কাছে লেখা তাঁর ব্যক্তিগত পত্রে তার উল্লেখও করেছেন। একমাত্র দিবান্ধ ছাড়া এবং যাঁরা সব বুঝেও না বোঝার ভান করেন তাঁরা ছাড়া আশাকরি আর সবাই স্বীকার করবেন যে যুদ্ধ বিদ্যায় প্রাচীন ভারতীয়রা যথেষ্ট উন্নত ছিলেন। তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতেন। শুধু আগ্নেয়াস্ত্রেই নয় আমাদের শাস্ত্রে যুদ্ধের অত্যাবশ্যক অঙ্গ দুর্গ নির্মাণের কৌশলগুলিরও বর্ণনা আছে।

মনুসংহিতাতে এবং চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে দুর্গ নির্মাণ, দুর্গে প্রবেশ কৌশলেরও বর্ণনা আছে। অর্থশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ত্তব্য কার্য এবং ক্ষেত্রানুযায়ী কখন কীভাবে সৈন্য পরিচালনা করতে হবে তারও নির্দেশ আছে। মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, জলদুর্গ এবং গিরিদুর্গ প্রভৃতি ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গই শ্রেষ্ঠ।

আমরা নর্মদার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে একদিকে মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা পর্বতাঞ্চলের সৌন্দর্য্য এবং মাঝে মাঝে শস্যশ্যামলা ক্ষেত্র দেখতে দেখতে চলেছি। মনোরম পরিবেশ। অপরদিকে শাল ও আবলুষ কাঠের জঙ্গল, যদিও নিবিড় বলে মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে গাছের ডালপালা ভেদ করে সূর্যকিরণ এসে পড়ছে। নানা জাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ দেখে নর্মদাতট সত্যসত্যই যে তপোভূমি তা উপলব্ধি হচ্ছে। বড়ই শান্ত বাতাবরণ। প্রায় মাইল দুই এইভাবে হাঁটার পর আমরা এক সৌম্যকান্ত সাধুর সাক্ষাৎ পেলাম। বয়স বোধহয় পঞ্চাশ। গলায় রুদ্রাক্ষ এবং একটি শিবলিঙ্গ। নিবিড় জঙ্গলের ভিতর তপস্বীর পর্ণকুটীর। চারদিকে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরণের স্তব্ধতা। বাতাস বইছে তারও কোন শব্দ নেই! পাখীর কূজন বা মানুষের সাড়া ত নাই-ই, কোন জানোয়ারেরও ডাক নাই। সাধুজী আমাদের তাঁর কাছে এসে বসার ইঙ্গিত করলেন। বৃদ্ধ সাধু অস্ফুট কণ্ঠে 'রেবা রেবা' জপ করছেন। তাঁকে প্রণাম করে আধঘন্টা বসার পর সাধু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। পরিচয় পর্বের পর তিনি বলতে লাগলেন —

সমগ্র জগতের সুপ্রাচীন নগরের মধ্যে বারাণসী অন্যতম। যার উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে, পুরাণ সাহিত্যে, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে। রাষ্ট্রশক্তিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ধর্মচর্চায় শিল্পে বাণিজ্যে বারাণসী ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

বরুণা ও অসি এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলে এই নগরীর নাম বারাণসী। বামন পুরাণ মতে, কাশী রাজ্যের রাজধানী গঙ্গা ও গোমতী নদীর মোহনায় স্থাপিত ছিল। মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও বারাণসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে আয়ু বংশীয় সুহোত্র পুত্র কাশ প্রথম রাজা। তৎপুত্র কাশিরাজ বা কাশ্য। সেই কাশিরাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য কাশী নামে বিখ্যাত হয়। বারাণসীর আরও কয়েকটি নাম হল — সুরন্ধন, সুদর্শন, ব্রহ্মাদর্শন, পুষ্পবতী, রম্য।

২৭০০ খৃঃ পূঃ বৈদিক ধর্ম কাশীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ এবং কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে কাশী শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন সময় হতে কাশী বিস্তৃত জনপদ এবং পবিত্র যজ্ঞভূমি বলে পরিচিত। উপনিষদের যুগে বেদান্ত চর্চার পীঠস্থান ছিল বারাণসী। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল — একটি বারাণসীতে অপরটি তক্ষশীলায়।

চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং বারাণসীর পণ্ডিতগণের গভীর বিদ্যাবত্তায় মোহিত হয়েছিলেন।

বারাণসী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় বুদ্ধদেব এই স্থানকেই তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রধান স্থান হিসাবে নির্ধারণ করেন। কারণ সকল ধর্ম উপদেষ্টাই জানতেন যে বারাণসী যদি তাঁদের উপদেশ গ্রহণ না করে তাহলে সমগ্র দেশ তা গ্রহণ করবে না। এই কারণেই জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্মকে স্তব্ধ করে হিন্দু ধর্মের পুনর্জীবনের জন্য সুদূর মালাবার হতে সংস্কৃত শিক্ষার রাজধানী বারাণসীতে এসে তাঁর নূতন দর্শনে দেশবাসীকে চমৎকৃত করেছিলেন।

বৌদ্ধ প্লাবিত ভারতভূমিতে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের সীমান্ত প্রদেশগুলিতে প্রিয়দর্শী অশোক যেভাবে ধর্মপ্রচারের জন্য শিলালেখ ক্ষোদিত করেছিলেন সেইভাবে আচার্য শঙ্কর ভারতের চারকোণে চারটি মঠ স্থাপন করেন। সেগুলি হল পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ, দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিম সমুদ্রে দ্বারকা ক্ষেত্রে সারদা মঠ এবং হিমালয়ের মধ্য শিয়রে কেদারবদ্রী ক্ষেত্রে যোশী মঠ। এই মঠগুলির মাধ্যমে হিন্দুধর্মের পুনঃজীবন লাভের জন্য ঐ চারটি মঠে যথাক্রমে আচার্য্য হস্তামলক, আচার্য সুরেশ্বর, আচার্য্য পদ্মপাদ এবং আচার্য্য ত্রোটকাচার্যকে আচার্য পদে অভিষিক্ত করেন।

কিন্তু অনেকের অজানা যে পুণ্যতীর্থ কাশীর গণেশ মহল্লাতে ভগবান শঙ্কর সারদা মঠ নামে এক মঠ স্থাপন করেন যেখানে আজও তাঁর পাদুকা বর্তমান। যার নিত্য অর্চনা এবং গুরুপূর্ণিমাতে যোড়শোপচারে পূজা হয়। এই মঠের বৈশিষ্ট্য হল যে এই মঠটি বাঙালী পরিচালিত একমাত্র শঙ্করাচার্যের মঠ। কথিত আছে এই

মঠ প্রথমদিকে মহারাষ্ট্রীয় মহাপুরুষ দ্বারা পরিচালিত হলেও কালক্রমে তা অবলুপ্ত হতে বসে। তখন বাংলাদেশের সর্ববিদ্যার বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী মহাদেবানন্দ তীর্থ এই মঠের ভার নেন এবং মঠের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মঠের বর্তমান নাম রাজগুরু মঠ।

কিংবদন্তী আছে, মহাদেবানন্দ তীর্থের পর স্বয়ং প্রকাশানন্দ তীর্থ উগ্র তপস্যাবলে কাশী বিশ্বেশ্বরের কৃপায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি কাশী নরেশ মহারাজ চৈত সিং এর সমসাময়িক ছিলেন।

১৭৭৬ খৃঃ ওয়ারেন হেস্টিংস ইউরোপের যুদ্ধের জন্য চৈত সিং-এর কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। তখন হেস্টিংস কাশী আক্রমণ করলে চৈত সিং পলায়ন করেন। চৈত সিংকে ধরতে না পেরে ক্রোধোন্মত্ত হেস্টিংস মহারাজের সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে বন্দী করেন। মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মহিপনারায়ণ সিংও বন্দী হন। তিনি ছিলেন আমার গুরুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। মহিপনারায়ণকে বন্দী করে গোরা সৈন্য যখন ফিরছিল সেইসময় গুরুদেব গঙ্গায় স্নান করছিলেন। মহিপনারায়ণের বন্দীদশা দেখে গুরুদেব খুব ব্যথিত হন এবং তাকে অভয় দিয়ে বলেন — বৎস, তোমার কোন ভয় নাই। যদি দেবী অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর সত্য হন এবং গুরুপদে যদি তোমার আস্থা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমার প্রাণরক্ষা হবে এবং তুমিই হবে পরবর্তী কাশী নরেশ। বস্তুত তাই ঘটেছিল। চৈত সিং এর কন্যার অনুরোধে ১৭৮১ খৃঃ হেস্টিংস মহিপনারায়ণকে কাশীর রাজসিংহাসনে বসান। সেই মহিপনারায়ণের বংশধররাই বর্তমান কাশীর মহারাজা। সেই সময় থেকেই এই মঠ কাশী মহারাজের সেবা পেয়ে আসছে এবং মঠের সম্পত্তি ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মঠটি রাজগুরু মঠ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

স্বয়ং প্রকাশানন্দ যখন এই ভবিষ্যবাণী করেন তখন আমি ১৫ বৎসরের বালক। তাঁর কথা আমার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। আমি গুরুদেবের পিছন পিছন ঘুরতে লাগলাম। অবশেষে গুরুদেবের কৃপায় যে বৎসর মহিপনারায়ণ কাশীর সিংহাসনে আরোহন করলেন সেই বৎসর গুরুদেব আমাকে দীক্ষা দেন। নাম দেন অভেদানন্দ। দীক্ষার তৃতীয় দিনে গুরুদেব আমাকে ডেকে বললেন — অভেদানন্দ! তোমার সাধনার স্থান কাশী নয়; তুমি যথাবিহিত ভাবে নর্মদা পরিক্রমা কর। সেখানেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। আমাকে স্মরণ করলেই তুমি আমার দর্শন পাবে। গুরুদেবের আদেশ আমি পৌঁছি অমরকন্টকে। পরিক্রমাবাসী সাধুদের সঙ্গে নর্মদা পরিক্রমা শুরু করি। উভয়তট আমি তিনবার প্রদক্ষিণ করেছি। সেই থেকেই আমি নর্মদাতটবাসী। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর আমি এই স্থানেই আছি। নর্মদার মহিমার শেষ নেই। এই যুগেও তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে চলেছেন। পরিক্রমাবাসীর সাধনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন মা নর্মদা। দুশ্চর তপস্যায় যে বস্তু লাভ হয় তা সহজেই নর্মদা পরিক্রমার ফলে অধিগত হয়। দুঃখ, তাপ, ভয়, বিচ্ছেদ এবং কৃচ্ছ্রতাবরণের পুটপাকে নর্মদামায়ী তাঁর ভক্তের আধারকে যোগাগ্নি পরিপক্ক করে শিবচেতনার উপযোগী করে তোলেন। হঠাৎ আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন — পিতা হি পরমং তপঃ। পিতার আদেশ পালনেই শ্রেষ্ঠ তপস্যা যাতে নর্মদা ও নর্মদেশ্বর উভয়েই তুষ্ট হন। এই বলে সাধুজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন — আজ আপনারা আমার অতিথি। তিনি কুটীরের ভিতর উঠে গেলেন। হাতে করে নিয়ে এলেন বেশ কয়েকটি কন্দমূল। আমরা তা ভাগ করে আমাদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণ করলাম।

অভেদানন্দজীর কুটীরের দাওয়ায় আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল। ধীরে ধীরে সমগ্র বনভূমি অতলান্ত অন্ধকারে ঢেকে গেল। গাছপালা, নর্মদা, পাহাড় কোন কিছুই আর চোখে পড়ছে না। অভেদানন্দজী কুটীরের মধ্য থেকে একটি প্রদীপ এনে জ্বেলে দিয়ে কুটীরের ভিতর ঢুকে গেলেন। আমার সঙ্গীরা জপে বসলেন। আমার জপে মন বসল না। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম বৃদ্ধ সাধু একি কথা উচ্চারণ করলেন? এ আমি কি শুনলাম। একশ সত্তর বৎসরের অধিককাল ধরে সত্যাশ্রয়ী তপস্বী সাধু নর্মদাতটবাসী। নানা কথা মনের মধ্যে ভীড় করে এল। প্রদীপটির দিকে নজর পড়তেই মনে হল সাধু সূর্যনারায়ণজীর কথা। উত্তরতট পরিক্রমাকালে তিনিও রেড়ির তেল এনে যে প্রদীপটি জ্বেলেছিলেন সেই প্রদীপও দিনরাত্রি একইরকমভাবে আলো দিত। সাধুকে জিজ্ঞাসা করলে হয় উত্তর দেবেন.......। আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে অভেদানন্দজী বলে উঠলেন — সূর্যনারায়ণজী হ্যামারা দোস্ত হ্যায়। সদ্‌গুরুর কৃপা এবং সাহায্য ছাড়া এই অমৃত যাত্রা পরিক্রমা অতি কঠিন। গুরুই কৃপা করে শিষ্যকে এই পরম অবস্থা দান করেন।

শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। অরণ্য প্রকৃতির সোঁ সোঁ শব্দকে মনে হচ্ছে মহারণ্যের সঙ্গীতের মূর্ছনা। সঙ্গীতের মূর্ছনা ক্রমে ক্রমে ওঁকারনাদে পরিণত হয়ে গেল। জাগরণও নয়, নিদ্রাও নয় এমন একটা অবস্থার মধ্যে শুনতে পেলাম, বাবা বলছেন — গুরুর মহিমা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিবও জানেন না। সুর-নর-মুনিগণও গুরু সত্তার ইয়ত্তা পান না। সদ্‌গুরু হলেন আনন্দঘন শুদ্ধ জ্ঞানের মূর্তি। সদ্‌গুরুর শক্তি অমোঘ, তিনি সর্বব্যাপক পরমাত্মাকে অনুভব করিয়ে দেন। এঁর গতি অপ্রতিহত এবং যাঁর জীবনে এঁর অমৃতময় ছোঁয়া লাগে তিনি সার্থক জীবন লাভ করেন।

কারণ প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি, তিনি নিয়ত তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি দিয়ে শিষ্যকে করেন বোধিতে প্রতিষ্ঠিত — তিনি আলোকস্বরূপ, অমৃতপথের দিশারী; ত্রিতাপের জ্বালা, প্রারব্ধ কর্মের দাবদাহ থেকে তিনিই ভক্তকে করেন রক্ষা। মায়ের চেয়েও গভীরতম মমতা ও স্নেহ সংবেদনে পিতার মত গভীর প্রজ্ঞাময় অনুশাসনে, তিনি আশ্রিতজনকে কোলে করে রাখেন; ত্রাণ করেন যত কিছু অজ্ঞানতা কুসংস্কার, লাভ হয় অমৃত আনন্দের দিব্যধারা, সত্যের স্বধামে তিনিই করেন শিষ্যকে প্রতিষ্ঠিত।

গুরু শিষ্যকে আত্মস্বরূপ করে নেন। সদ্‌গুরু শিষ্যকে প্রতি মুহূর্তে ভরে তোলেন, প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর করে তোলেন দিব্য আনন্দে মুখর, সত্যজ্ঞান আর আনন্দের প্রকাশে বিকাশে করে তাঁকে পূর্ণ-পূর্ণতর-পূর্ণতম। তমঃ থেকে জ্যোতির পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে নিয়ে গিয়ে শিষ্যকে আপ্তকাম করে তোলেন বলেই, শিষ্য অপরোক্ষানুভূতি পেয়ে ক্রীতদাসবৎ কৃতজ্ঞ হয় প্রেমে ভক্তিতে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণতি জানায় তাঁর মহিমার কাছে। এখানে তার সত্তা অধীনতার নাগপাশে বাঁধা হয়ে গতি থেকে বঞ্চিত হয় না, বরং তার Being এবং Becoming প্রতি মুহূর্তে develope হয়ে চেতনাদীপ্ত হয়ে পরিশেষে হয় Intune with the Infinite ! গুরুর দয়ায় মায়িক আবরণ খসে পড়ে, খুলে পড়ে তার ছদ্মবেশ, সে আপন দিব্যসত্তার পরিচয় পেয়ে পূর্ণত্ব অর্জন করে।

একখণ্ড লোহা যখন পরশমণির সংস্পর্শে এসে পরিণত হয় সোনাতে, একখণ্ড কয়লা যখন প্রজ্বলিত হুতাশনের সংস্পর্শে এসে হয়ে যায় জ্বলন্ত অগ্নি তখন লোহার অসারত্ব, কয়লার কৃষ্ণত্ব ঘুচে যায় বটে, তাদের নামের রূপের ইতি হয় বটে, কিন্তু মহত্তর, অধিকতর মূল্যবান, সুন্দরতম জীবনলাভ করে; সদ্‌গুরুর দিব্য সংস্পর্শেও ঠিক এই রকম ভক্ত ধীরে ধীরে তার জৈবী সত্তা ত্যাগ করে দৈবী সত্তায় হয় প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে গুপ্ত এবং সুপ্ত অমূল্য ঐশী সত্তার ঘটে বোধন!

বিভ্রান্তি এবং কুহেলী অপসারিত করে প্রকট করে দেন তার মধ্যে উজ্জ্বল শৈবতেজ, ঐশী সত্তার দিব্য দীপ্তি! তিনি তাকে Complete করেন, fulfil করেন।

ধীরে ধীরে বাবার জ্যোতির্ময় দেহ যেন কোন পর্দার আড়ালে সরে গেল।

ধড়ফড় করে বিছানার উপর উঠে বসলাম। বাবার কণ্ঠস্বর তখনও কানে অনুরণন তুলেছে। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে। বসে বসে ভাবতে লাগলেন সত্যিই নানক, কবীর, রাধাস্বামী সাহেব থেকে শুরু করে বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দ-অবেস্তা, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান-বৌদ্ধ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই গুরুকে দণ্ডবৎ তন্‌মন্ দিয়ে তাঁরা সেবা করতে বলেছেন।

১। গুরু সমরথ গুরু নিরংকার, গুরু উচা অগম অপার
গুরু কি মহিমা অগম হৈ, ক্যা কথে কথনহার।
গুরু কী ভগতী করহি ক্যা প্রাণী, ব্রহ্মে ইন্দ্র মহেশ ন জানী।
তেরা অন্ত ন যাই লখা, অকথ ন যাই হর কথ্যা।
নানক জিনকো সতগুরু মিলিয়া। তিনকো লিখা নিবড়িয়া। (নানক)

২। গুরু কো কীজে দণ্ডবৎ কোটি কোটি পরনাম।
কীট ন জানে ভৃংগ কো, গুরু করলে আপ সমান॥
গুরু কো মানুষ জানতে, চরণামৃতকো পান (পানি)।
তে নর নরক যায়েঙ্গে জনম জনম হোয় খান (কুত্তা)॥
জা খোজত ব্রহ্মা থকে সুর নর মুনি দেবা।
কহে সুন সাধবা কর সত্‌গুরু সেবা॥

সাধ মিলে, সাহেব মিলে, অন্তর রহিন রেখ।
মনসা বাচা কর্মনা সাধু-সাহেব এক॥
অলখ পুরুষ কা আরসী সাধু হী কী দেহ।
লথা জো চাহে অলখ কো উনহীঁ লখ লেহ॥ (কবীর)

৩। গুরু কী কর হরদম পূজা, গুরু সমান কোই দেব ন দূজা।
গুরু চরণ সেব নিত করিয়ে। তন্ মন্ গুরু আগে ধরিয়ে॥
গুরু ব্রহ্মরূপ ধর আয়ে, গুরু পারব্রহ্ম গতি গায়ে।
গুরু সত্নাম পদখোলা, গুরু অলখ্ অগম কো তোলা।
গুরু রূপ ধরা রাধাস্বামী, গুরু সে বড় নহীঁ অনামী॥ (রাধাস্বামী সাহেব)

৪। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুদেব মহেশ্বরঃ।
গুরুদেব পরংব্রহ্মঃ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

৫। 'আপনি আসেন কৃষ্ণ গুরুচৈত্য রূপে।' (চৈতন্যচরিতামৃত)

৬। শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

৭। গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্মনা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ প্রসেব্যতে॥
গুরু প্রসাদতঃ সর্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমনথ্যা ন শুভং ভবেৎ। (শিবসংহিতা)

৮। ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোহপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্॥
ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্॥
একমেবাক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ॥ (জ্ঞান-সংকলনী)

৯। তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরু মেবাভি গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ (মুণ্ডক)

১০। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবা.' এবং সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি। (গীতা)

১১। ধ্যানমূলং গুরোমূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরুর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

১২। উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাৎ বন্ধ বিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োহবৃজিনোহকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ (বেদান্ত)

১৩। শঙ্করাচার্য সর্বত্র দ্বৈতদর্শন নিষেধ করলেও গুরুর সঙ্গে অদ্বৈত বোধ নিষেধ করেছেন — 'সর্বত্র অদ্বৈতং কুর্বীত, না দ্বৈতং গুরুণাসহ।'

১৪। ইনিই দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে গুরুকে লক্ষ্য করে বলেছেন —
ওঁ নমো প্রণবার্থায় শুদ্ধ জ্ঞানৈক মূর্তয়ে।
নির্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ॥
নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিনাম্।
গুরুবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ॥

১৫। 'To carry out the Commands of the Guru without list shadow of doubt of hesitation, is the secret of success in life and there is no other way to follow" [Vivekananda]

১৬। গুরুগীতাতেও আছে —

গুরোঃ পাদোদকং পানং গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজনম্।
গুরোমূর্ত্তিঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপঃ।।

১৭। অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য বলেছেন —

শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং।
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুলং।।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নম্।
ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

১৮। বৌদ্ধদেরও ঐ কথা —

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

১৯। Come unto me all... and I will give you rest. I am the way and the truth and the Life. No one cometh unto the Father but by Me. (Bible).

মুসলিম সাধক ফকির আউলিয়া এবং পয়গম্বররাও গুরুর মহিমা কীর্তন করেছেন।

২০। গুপ্ত্ পরগম্বর কি হক ফরমুদা অস্ত্, মন ন গুংজম হেচ দর বালা ব পস্ত্। দরজমিনো আস্মানো অর্শ নিজ। মন ন গুংজম্ ইং যকীং দাঁ এ অজীজ্। দরদিলে মোমিন্ বিগুংজম্ ইং অজব। গরমরা রব্বাহী অজাঁ দিল হা তলব।

'খোদা তালা বলছেন যে — আমি কোন উঁচু বা নীচুস্থানে থাকি না, আকাশের উপরেও না জমিনের উপরেও না। হে প্রিয়তম সন্তান, তুমি এই কথা সত্য বলে জান। মোমিন (ভক্ত) অর্থাৎ যে আমাকে জেনেছে, তার হৃদয়েই আমার সদা নিবাস। তুমি যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও, তাহলে তার খোঁজ কর তার কাছে যাও, অর্থাৎ মুর্শিদ বা সদ্গুরু বরণ কর।।'

২১। হেচ্ ন কুশদ্ ন ফস্ রা জুজ্ জিল্লে পীর। দামনে আঁ নফস্ কুশরা শখ্ত্ গীর। জিল্লে পীর অন্দর জমীং চুঁ কোহে কাফ্। রুহে উ সীমুর্গ ওয় বস্ আলী তোয়াফ্। পস্ বিরৌ খামোশ্ বাশ অজ অন্ কয়াদ্। জেরে জিল্লে অমরে শেখে ওস্তাদ্।

'সদ্গুরু শক্তি ছাড়া মনকে কোন মতেই নাশ করা যায় না। এইজন্য তোমার উচিত — মন মর্দনকারী সদ্গুরুর শ্রীচরণ দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করো। পর্বত যেমন মাটিতে থাকে, কিন্তু তার শীর্ষদেশ আকাশগামী — তেমনি সদ্গুরু মর্ত্যভূমিতে থাকলেও তাঁর মন সবসময় দিব্যভূমির দিকে; ঊর্ধচারী বিহঙ্গের মত সদ্গুরুর সুরত সবসময় দিব্যধামে বিচরণ করে থাকে। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে হলে তুমি এ হেন সদ্গুরুর আজ্ঞাকারী হও, তাঁর চরণে শরণ নাও।'

২২। পীর রা বিগুজ্ঞি কি বে পীর ইং সফর।
হস্ত্ পুর অজ্ ফিত্না ওয়্ খাফৌ খতর।।

সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ কর। সদ্গুরুর কৃপা এবং সাহায্য ছাড়া এই অমৃত যাত্রা পরিক্রমা অতি কঠিন, বাধাও অনেক।'

গুরুর মহিমা সম্বন্ধে সকল ধর্মমত সকল সম্প্রদায় একমত। গুরু ছাড়া অমৃততীর্থ পরিক্রমা আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ একেবারে অসম্ভব।

মগ্নচৈতন্যের ভূমি হতে জাগ্রত চেতনায় ফিরে এলাম। দেখলাম ভোর হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী সাধুরা গভীর নিদ্রামগ্ন। কুটীরের দরজায় দেখি সাধুজী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে একটি লাল কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে বললেন — এতে ঈশান, অঘোর বামদেব, সদ্যোজাত ও তৎপুরুষের লক্ষণযুক্ত পাঁচটি শিবলিঙ্গ আছে। শিব হলেন জগতের আদি এবং জগতের কারণ। তিনি সমস্ত ভয়নাশকারী। শিব হলেন পঞ্চবক্ত্র এবং ত্রিনেত্রং। এঁর উর্দ্ধ মুখের নাম 'ঈশান', এটি পূর্বদিকে অবস্থিত। দক্ষিণদিকস্থ মুখ 'অঘোর' নামে খ্যাত। উত্তরস্থ মুখ 'বামদেব' পশ্চিমমুখের নাম সদ্যোজাত এবং পূর্বমুখের নাম তৎপুরুষ। এগুলি তুমি তোমার ঝোলায় পুরে ফেল। কাউকে বলবার বা দেখাবার প্রয়োজনও নাই। প্রতি বৎসর দোল

পূর্ণিমার এই শিবলিঙ্গগুলি পঞ্চামৃতে ডুবিয়ে রাখলে এগুলির আকারের পরিবর্তন ঘটবে। এদের আকার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যতদিন এই লিঙ্গগুলি তুমি বা তোমার উত্তরপুরুষ সযত্নে রক্ষা করবে ততদিন মা নর্মদা ও মহেশ্বর তোমার গৃহে সদাই বিরাজমান থাকবেন। এই বলেই সাধু কুটীরের ভিতর ঢুকে গেলেন।

শিবলিঙ্গগুলি ঝোলায় ভিতর ঢুকিয়ে রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা অনেক আগেই উঠে পড়েছেন। তাঁদের অনেকের প্রাতঃকৃত্য সারা হয়ে গেছে। আমি প্রাতঃকৃত্য করতে চলে গেলাম। গত রাত্রির ঘটনা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

চারদিক বেশ ফাঁকা হয়ে উঠেছে বলে মনে হল। আকাশে সূর্যোদয় হয়ে গেছে কিন্তু জঙ্গলের পত্রান্তরাল ভেদ করে সমতল প্রান্তরে এখনও সূর্যরশ্মি এসে পড়ে নি। আমি নর্মদা তট থেকে যখন ফিরে এলাম, তখন সকলেই ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন রওনা হওয়ার জন্য। অভেদানন্দজী বললেন — আপনাদের পরিক্রমা পথেই পড়বে দুর্বাসার ঘাট। আপনারা ঋষি দুর্বাসা সম্বন্ধে কেউ কি কিছু জানেন? আমি বললাম — অত্রি অনুসূয়ার পুত্র দুর্বাসা হলেন মহাদেবের অংশজাত। বামদেবের প্রিয় শিষ্য দুর্বাসা কঠোর তপঃপ্রভাবে অতি তেজঃসম্পন্ন হলেও ছিলেন অত্যন্ত কোপণ স্বভাবের। এঁর সন্তোষে অনেকের সিদ্ধিলাভ ঘটলেও অত্যন্ত কোপণ স্বভাবের জন্য দেব-দেবী, রাজা, মহারাজা তাঁকে সর্বদা ভয় করতেন। একবার পাণ্ডব-জননী কুন্তীর সেবায় তুষ্ট দুর্বাসা তাঁকে আহ্বান মন্ত্র দান করেন, যার ফলে কুন্তী সূর্য, ধর্ম, পবন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করে যথাক্রমে কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বিভিন্ন পুরাণ, ভাগবত ও মহাভারতে তাঁর বিভিন্ন রূপের পরিচয় পাই। প্রেমানন্দ বললেন — বিষ্ণুপুরাণে পাই একবার এক বিদ্যাধরী নাম্নী অপ্সরা ঋষিকে এক সুগন্ধযুক্ত 'সন্তানক' পুষ্পমাল্য দান করেন। ঋষি ঐ মাল্য আবার ইন্দ্রকে দান করেন। কিন্তু ইন্দ্র ঐ মালার যথাযোগ্য মর্যাদা না দিয়ে ঐরাবতের মাথায় রাখেন। মাল্যের গন্ধে আকৃষ্ট ঐরাবত শুঁড়ের সাহায্যে তা ছিন্নভিন্ন করে নিক্ষেপ করলে ঋষি কুপিত হন এবং তাঁকে শাপ দেন — হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি আমার প্রদত্ত এই অপূর্ব মাল্যের অবমাননা করলে, একে তুমি ঋষির আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করলে না সেহেতু তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে।

এরপর ইন্দ্র ঋষিকে নানাভাবে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করলেও ঋষি প্রসন্ন না হয়ে বললেন —

নাহং কৃপালু হৃদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা।

আমি কৃপালু হৃদয়ের ঋষি নই যে তোমাকে ক্ষমা করব। আমাকে ক্ষমা ভজনা করে না।

অক্ষান্তিসারসর্বসং দুর্বাসসমবেহি মাম্।

ক্ষমা হীনত্বই যার সর্বস্য তাঁরা আমাকে সেই দুর্বাসা বলেই জানে।

জ্বলজটাকলাপস্য ভ্রূকুটি কুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভভম্॥

জ্বলৎ জটাকলাপযুক্ত আমার ভ্রূকুটি কুটিল মুখ দেখলে ত্রিভুবনের সকলেই ভয়প্রাপ্ত হয়। এরপরই ইন্দ্রের পতন হল। ইন্দ্র শ্রীহীন হলেন এবং দানবগণ কর্তৃক পরাজিত হন।

হরানন্দজী বললেন — ঋষি দুর্বাসা ঔর্ব মুনির জানুসম্ভূতা কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করেন এবং বিবাহকালে সংকল্প করেন, স্ত্রীর শত অপরাধ ক্ষমা করবেন তারপর তাকে ভস্ম করে ফেলবেন। শত অপরাধ ক্ষমা করার পর দুর্বাসার শাপে কন্দলীর মৃত্যু ঘটলে কন্যা শোকাতুর ঔর্ব ঋষিকে শাপ দেন — যে দর্পের জন্য আজ তিনি কন্যাহারা একদিন তাঁর সেই দর্প চূর্ণ হবেই। ঋষি ঔর্বের এই শাপ মিথ্যা হয় নি।

মহাশক্তিধর রাজা অম্বরীষ ছিলেন মহা বিষ্ণুভক্ত। তাঁর ভক্তিতে সন্তুষ্ট বিষ্ণু তাঁর রক্ষার্থে ভয়ঙ্কর চক্রকে নিয়োজিত করেন এবং বলেন —

তস্মা অদাদধরিশ্চক্রং প্রত্যনীক ভয়াবহম।
একান্ত ভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্॥

সেই রাজা অম্বরীষ সম্বৎসরব্যাপী দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ত্রিরাত্র উপবাসের পর রাজা ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেন। সেই ভোজসভায় দুর্বাসা উপস্থিত হয়ে আবশ্যক কাজ সম্পাদন করবার জন্য যমুনায় যান। কিন্তু ঋষি নদী তীরে ব্রহ্মধ্যানে নিবিষ্ট হন। রাজার পারণের কথা ভুলে যান।

এদিকে ঋষির বিলম্বে রাজার পারণের কাল গত হবার উপক্রম হয়। রাজা ব্যস্ত হয়ে পড়েন কারণ অতিথিকে ভোজন না করিয়ে নিজে ভোজন করলে অতিথির অবমাননা করা হয়। কিন্তু ঋষিরও দেখা নাই। তখন অন্যান্য উপস্থিত ব্রাহ্মণদের পরামর্শে রাজা একবিন্দু জল পান করলেন যাতে ব্রতের পারণ করা হবে কিন্তু ভোজন করা হবে না।

দুর্বাসা যমুনাকূল হতে ফিরে রাজার এই কার্যের কথা বুঝতে পেরে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন —

যো মামতিথিমায়াত্তমাতিহ্যেন নিমন্ত্র্য চ।
অদত্বা ভূক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্।

যে আমাকে অতিথি রূপে পেয়েও আতিথ্যানুসারে আমাকে ভোজন না করিয়ে নিজে ভোজন করে তাকে আমি উচিত শাস্তি দেব।

এই বলে দুর্বাসা নিজের জটা ছিন্ন করে রাজাকে ধ্বংস করার জন্য জ্বালাময়ী, অসিহস্তা, পদভরে কম্পিত এক কালানলোপম কৃত্যা নির্মাণ করলেন। কিন্তু সেই ভীষণ দর্শনা কৃত্যাকে দেখে রাজা ভীত হলেন না। রাজার রক্ষার্থে বিষ্ণুর চক্র সেই কৃত্যাকে ভস্মীভূত করে দুর্বাসার দিকে ধাবিত হল।

ঋষি বুঝতে পারলেন তাঁর দৈবশক্তি রাজার কাছে নিষ্ফল। তিনি প্রাণরক্ষার্থে সেই স্থান হতে পলায়ন করলেন।

যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র সুদর্শনং দুষ্প্রাসহং দর্দশ ।

কিন্তু ঋষি যেখানে যেখানে পলায়ন করলেন সেই চক্র তাঁকে সেই সেই স্থানে অনুসরণ করে চলল। তখন ঋষি ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মার শরণ নিলেন কিন্তু ব্রহ্মা তাঁকে রক্ষা করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর ঋষি কৈলাসে শিবের শরণাপন্ন হলে শিব তাঁকে বিষ্ণুর শরণ নিতে পরামর্শ দেন। দুর্বাসা বৈকুণ্ঠে হরির শরণ নিলে বিষ্ণু অম্বরীষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বলেন।

ঋষি অম্বরীষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে রাজা সুদর্শনের স্তবপাঠ শুরু করেন। বলেন —

যদি নো ভগবান্ প্রীতো একঃ সর্বগুণাশ্রয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ।

যদি আমার সর্বভূতাত্মভাবের দ্বারা এক সর্বগুণাশ্রয় ভগবান প্রীত থাকেন তবে ঋষি বিজ্বর হউন। দুর্বাসা রক্ষা পেলেন এবং তাঁর দর্প চূর্ণ হল।

মহানন্দস্বামী বললেন — মহাভারতে পাই মুনি দুর্বাসা তীর্থ ভ্রমণে বের হয়ে দুর্যোধনের অতিথি হবেন শুনে দুর্যোধন ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন দুর্বাসার শাপকে সুযোগে পরিণত করার জন্য এক ফন্দি আঁটেন। ভাবেন কোপণ স্বভাবের ঋষিকে সন্তুষ্ট করে যদি বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠানো যায় তবে যুধিষ্ঠির ঋষির যথাযোগ্য সৎকার করতে পারবেন না। ঋষির অভিশাপে যুধিষ্ঠিরের বনবাস আরও দীর্ঘায়িত হবে। যথাসময়ে দুর্বাসা তাঁর দশ সহস্র শিষ্য সমেত দুর্যোধন সমীপে উপস্থিত হন। মুনি কয়েকদিন হস্তিনাপুরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শকুনি, কর্ণ, দুর্যোধন ও দুঃশাসন ঋষির প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনের পর তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন।

নিজের স্বভাব অনুযায়ী যে কয়দিন ঋষি হস্তিনাপুরে থাকলেন সেই কয়দিনের কোনদিন স্নান করে আসছি, অন্ন প্রস্তুত কর বলে গেলেন কিন্তু ফিরে এলেন না। কোনদিন অতি বিলম্বে উপস্থিত হয়ে আজ ক্ষুধা নেই বলে কিছুই গ্রহণ করলেন না। আবার কোনদিন মধ্যরাতে উঠে সবাইকে গালাগাল দিয়ে তৎক্ষণাৎ অন্ন প্রস্তুত করার জন্য ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়লেন।

ঋষির এইরূপ ব্যবহারে দুর্যোধন মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও শকুনি ও কর্ণের পরামর্শে ঋষির প্রতি কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করলেন না। কয়েকদিন পরে অন্যত্র যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঋষি দুর্যোধনকে ডেকে বললেন — আমি তোমার সেবায় তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।

পূর্ব থেকে শকুনি ও কর্ণের মন্ত্রনানুসারে দুর্যোধন ঋষির পদতলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন — প্রভু! আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম ধার্মিক। তিনি পঞ্চ ভ্রাতাসহ বর্তমানে সমঙ্গা নদীর তীরবর্তী কোন স্থানে বনবাস জীবন যাপন করছেন। আমরা তাঁর এই কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। যদি আপনি সত্যই আমার সেবায় তুষ্ট

হয়ে থাকেন তবে আপনি তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁদেরকে আশীর্বাদ করুন। ঋষি দুর্যোধনের চালাকি বুঝতে পারলেন না। ঋষি 'তথাস্তু' বলে প্রস্থান করলেন।

বেশ কিছুদিন গত হবার পর ঋষি সমঙ্গা তট পরিক্রমাকালে যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ পেলেন। কিন্তু ঋষি যখন উপস্থিত হলেন তখন দ্রৌপদীর পাকভাণ্ড শূন্য।

এদিকে বনবাসকালে ঋষিদের পরামর্শে দ্রৌপদী সূর্যের আরাধনা শুরু করেন এবং সূর্যদেব তাঁর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে এক তাম্র ভাণ্ড দান করে বলেন দ্রৌপদী যতক্ষণ ভোজন করবেন না ততক্ষণ এই ভাণ্ড পূর্ণ থাকবে। অতিথি অভ্যাগত যত সহস্রই হোক না কেন; অন্নের অভাব হবে না। কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনের পর সেই তাম্র ভাণ্ডের কোন কার্যকারিতা থাকবে না। পরদিন রন্ধনের পর পাক করা খাদ্য তাতে রাখলে তবে তা কার্যকর হবে। কিন্তু দুর্বাসা যেদিন যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করলেন সেদিন পাণ্ডবগণসহ দ্রৌপদী ভোজনের পর বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ ঋষির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে তাঁর পাদ বন্দনা করে ঋষিকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করলেন।

ঋষি যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণের পর স্নান, আহ্নিক সমাপণের জন্য নর্মদায় গেলেন। আর দ্রৌপদীর উপর সশিষ্য ঋষির আহারাদির ব্যবস্থা করবার ভার পড়ল। দ্রৌপদী পড়লেন সমস্যায়। তাঁর দেবদত্ত তাম্রভাণ্ড তখন অপূর্ণ। এই বিপদে দ্রৌপদী অন্য উপায় না দেখে শ্রীকৃষ্ণের স্তব শুরু করলেন —

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দব্যয়।<br>
বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্ত্তিনাশনঃ।<br>
বিশ্বাত্মন বিশ্বজনক বিশ্বহর্ত্তঃ প্রভোহব্যয়ঃ।<br>
প্রণতপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর।

........................................................

সর্বাধ্যক্ষ পারধ্যক্ষ ত্বামহংশরণংগতা।<br>
পাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল।

স্তবে তুষ্ট অন্তরূপধারিণ, সর্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তির অধিকারী কেশব সেখানে উপস্থিত হলেন।

বাসুদেবকে উপস্থিত দেখে দ্রৌপদী বুকে বল পেলেন। তিনি পরমানন্দে বাসুদেবকে নমস্কার জানিয়ে মুনির আগমনে তিনি যে ভীষণ বিপদে পড়েছেন তার বৃত্তান্ত বললেন। কিন্তু বাসুদেব দ্রৌপদীর কথায় কোন কর্ণপাত না করে বললেন — আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধিত। শীঘ্রই আমাকে ভোজন করাও।

দ্রৌপদী বললেন —

সথাল্যাং ভাস্করদত্তায়ামন্নং মদ্ভোজনাবধি<br>
ভুক্তবত্যস্মহং দেব তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে।

ভাস্কর দত্ত তাম্রভাণ্ডে আমার ভোজন পর্যন্ত অন্ন থাকে। আমি ভোজন করেছি তাই আমার পাত্রে আর অন্ন নেই। আমি কোনমতেই আপনাকে ভোজন করাতে পারব না।

তা শুনে কেশব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন — এখন ঠাট্টা মস্করা করার সময় নয়। আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও। কৃষ্ণা তৎক্ষণাৎ তাঁর শূণ্য পাত্র কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত করায় কৃষ্ণ পাত্রের কণ্ঠসংলগ্ন সামান্য শাকান্ন গ্রহণ করে বললেন —

বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্তিতি যজ্ঞভূক্।

হে বিশ্বাত্মা যজ্ঞভূক দেব প্রীত হও ও তুষ্ট হও। 'তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টে'।

ভোজনের পর কৃষ্ণ দুর্বাসার দর্শনের আশায় বসে রইলেন।

স্নান করতে যাবার পর বহুক্ষণ কেটে গেছে। কিন্তু ঋষির দেখা নেই। তখন কৃষ্ণ ভীমকে ঋষির অনুসন্ধানে প্রেরণ করলেন। এদিকে দুর্বাসা ও অপর মুনিগণসহ শিষ্যরা স্নান করে উঠে নিজেদেরকে অত্যন্ত আহারে তৃপ্ত অনুভব করলেন। দুর্বাসা ভাবলেন — আমাদের আরও কিছু ভোজন করা অসম্ভব। যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে আহার প্রস্তুত করিয়ে ভোজন না করলে অপরাধ হবে। পাণ্ডবরা বীর, কৃতবিদ্য, ব্রত ও তপস্যাপরায়ণ ও কৃষ্ণসখা। আমরা ভোজন গ্রহণ না করলে পাণ্ডবরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন এবং তৃণবৎ আমাদের ভস্ম করে ফেলবেন।

সুতরাং তাদের সঙ্গে দেখা হবার পূর্বেই এই স্থান থেকে পলায়ন করা উচিত। গুরু ও শিষ্যগণ সকলেই দ্রুত পলায়ন করলেন।

কৃষ্ণের দয়ায় পাণ্ডবরা বিপদ থেকে মুক্ত হলেন।

অভেদানন্দজীর কাছে বিদায় নিয়ে নর্মদা মাতা ও নর্মদেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে রওনা হলাম। কোথাও ইউক্যালিপটাস, কোথাও শালবীথী, কোথাও বা সারি সারি আম গাছ। সব গাছের তলাতেই দেখছি বড় বড় কালো পাথরের চাঙড়। শস্যক্ষেত্র যেখানে, সেখানেও দেখছি বড় বড় পাথর। শস্যক্ষেত্রের উপর বকের সারি চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার দুপাশে পাথরগুলির ফাঁকে ফাঁকে নানাজাতীয় অজস্র গাছ। আমরা হাঁটছি চড়াই-এর পথে। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের নানা আকারের পাথরে নর্মদার বুক ভরে আছে। পথ কঙ্করময় হলেও, গাছপালা না থাকায় সাতপুরার প্রস্তরময় নগ্নরূপ বড় বেশী প্রকট হয়ে পড়ছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। বেশীক্ষণ কষ্ট করতে হল না, আমরা একটা ভালো পথের সন্ধান পেলাম। বেশ কিছু গোঁড় ও রাজপুতদের পল্লী অতিক্রম করে একটি সদাবর্ত পেলাম। এখানকার অধিবাসীরা যেমন সাদামাঠা জীবনযাপন করে তেমনি তাদের মনও সাদামাঠা। দুর্গম পার্বত্য বাধাকে হেলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পর্বতকে ভেদ করে দুর্দম বেগে ছুটে চলেছেন নর্মদা। আরও খানিকটা পথ অতিক্রম করে চতুর্দিকে শৈলমালা বেষ্টিত একটি সমতলভূমিতে এসে পৌঁছলাম। কোথাও কোন শব্দ নেই। অদ্ভুত এক ভাষাহীন আকুতিতে সমগ্র বনভূমি থমথম করছে। দূরে একদল চিতল হরিণ ঘুরে ঘুরে চরছে — নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে। আমরা বিশ্রামের জন্য পাথরের উপর বসলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পাহাড়ের ডানদিকে আর একটা পাকদণ্ডী দেখে সেই পথে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। আমরা চলার বেগ বাড়ালাম। কাঁটালতা জড়ানো একটা অশ্বত্থ গাছের ধার দিয়ে হেঁটে এসে এমন এক স্থানে পৌঁছলাম সেখান থেকে কিছুদূরে পর্বতের গা ঘেঁসে এক গৈরিক ধ্বজা উড্ডীয়মান দেখতে পেলাম।

প্রায় মাইলখানিক হেঁটে যখন সেই ধ্বজার কাছে পৌঁছলাম তখন বোধহয় বেলা দু'টা বেজে গেছে। একটি বিশাল একতলা পাথরের বাড়ী, পাথরের বাড়ীটিকে ঘিরে আছে সারি সারি সাদা সাদা শিমূল গাছ। কঙ্কর ও প্রস্তরময় প্রান্তরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম মঠ বাড়ীর ফাটকে। পাথরের বাড়ীর গায়ে লেখা 'আয়ুর্বেদচর্চা কেন্দ্র'। এক বিশাল প্রান্তরের কিছুটা অংশ, নর্মদার ধার ঘেঁসে ভূত-ভৈরবী গাছের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। সামনে বেড়ার যে পরিসীমা দেখা যাচ্ছে তা দেখে অনুমান করলাম তা প্রায় দু'হাজার ফুট লম্বা। কাঁটা গাছের জঙ্গল বিদীর্ণ করে কোন হিংস্র বন্য জন্তুর পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। মিনিট খানিক দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দেখলাম একজন নাগা সন্ন্যাসী এসে ফাটক খুলে দিলেন, আমরা ভিতরে ঢুকলাম। তিনি শশব্যস্তে আমাদের আগে আগে এসে দু'খানা কুটীর খুলে দিয়ে বললেন — ম্যায় হুঁ বিজ্ঞানানন্দ। আয়ুর্বেদাচার্য বিশোকানন্দজী মহারাজকী সেবক হুঁ। ইয়ে আপ্‌কা হৈ আস্তান হৈ। আপ্‌লোগ ইধর বিশ্রাম কিজিয়ে, ম্যায় ভোজনকা প্রবন্ধ করতা হুঁ।

এই বলে দ্রুত তিনি বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলেন। প্রায় আধঘন্টা পরে একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। আমাদের আসনের সামনে পাতা রেখে পরিবেশন করলেন দুখানি করে রুটি ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘন দুধ এবং ছোট বাটীর এক বাটি মধু।

আমাদের পরিক্রমা পথে কোন সাধুজী, কোন ভক্ত, গৃহী বা কোন পুরোহিতজী আমাদের মধু খেতে দেননি। তাই ভোজনের সঙ্গে মধু দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। বাবা বলতেন — মধুর ভেষজগুণ অতুলনীয়। বেশ কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে যখন মিশরে চিত্রলিপি বা 'হিয়েরোগ্লিক' এর সাহায্যে লেখার কাজ চলত, সেই সময়ের প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে মধুর স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ভেষজগুণের উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র খুবই উন্নত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পূর্ব হতেই ঐ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই মধুর গুণের উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুরাণ-কাহিনীতে মধুকে 'দেবতার খাদ্য' বলা হয়েছে। ভারতে যেমন সুশ্রুতকে বলা হয় 'আদি আয়ুর্বেদজ্ঞ, তেমনি গ্রীসের হিপোক্রেটিসকে বলা হয় 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক'। তিনি ১০৭ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর দীর্ঘায়ু লাভের রহস্যও নাকি মধু। তিনি প্রত্যহ সকালে আহারের সঙ্গে এক চামচ করে মধু খেতেন।

রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে মধু হল এক অতি জটিল জৈব রাসায়নিক তরল পদার্থ। হাজার হাজার ফুল, গাছগাছড়া আর ভেষজ উদ্ভিদ হতে সার সংগ্রহ করে মৌমাছি যেভাবে তাদের চাকে মধু তৈরী করে, তার কোন মানুষের তৈরী ল্যাবরেটরীতে করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এক আউন্স মধু তৈরী করার জন্য একটি মৌমাছিকে দশ হাজার হতে বার হাজার ফুলের পুষ্পসার আহরণ করতে হয়। এইভাবে একটি মৌমাছি পরিবার একটি ঋতুতে ১৫০ সের পর্যন্ত মধু তৈরী করে।

প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে মধু যত পুরানো হয় তার ততই গুণ বাড়ে। খাদ্য হিসাবে পুরানো মধুর খাদ্যগুণ বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না। ১৯২৩ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মিশরের পিরামিড হতে যখন ফারাও তুতেনখামেনের ৩৩০০ বছরের প্রাচীন মমি বা সংরক্ষিত শব উদ্ধার করেন, তখন তাঁরা একটি পাত্রে রাখা কয়েক সের মধুও পান। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এই ৩৩০০ বছরের পুরাতন মধু তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ খাদ্যোপযোগী রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এর কারণ হিসাবে বলেছেন — মধুর ভিতরেই রয়েছে অতি মূল্যবান কয়েকটি বীজানুনাশক গুণ। এই জন্যই আঘাত লাগার ফলে বা দগ্ধ স্থানে বা যে সব পুরাতন ঘা কিছুতেই সারানো যাচ্ছে না এবং অনবরত তা হতে পুঁজ নির্গত হচ্ছে, সেসব ক্ষেত্রে মধু লাগালে সুফল পাওয়া যায়। ফোঁড়ার উপর, পেশীর বেদনায় বা স্ফীত গ্রন্থির উপর চুন আর মধুর প্রলেপ লাগাবার ব্যবস্থা ভারতে বহু প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত আছে। তাছাড়া ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রত্যেক ঔষধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাবার রীতি চালু আছে। পাকস্থলীর ক্ষত বা গ্যাসটিক আলসার নিরাময়েও মধু বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ আহারের সঙ্গে অল্প পরিমাণে মধু গ্রহণ করলে পেটের যন্ত্রণা, বমির ভাব, বুক জ্বালার নিরাময় হয়।

যতক্ষণ আমাদের ভোজন পর্ব চলল ততক্ষণ বিজ্ঞানানন্দজী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আহারান্তে তিনি হাতজোড় করে বললেন — আজ গুরুজীকা সাথ ভেট নেহি হোগা। ম্যায় আপলোগোঁকা বাত গুরুজীকো বাতা দিয়া। কাল সুবে গুরুজীকা সাথ বাতচিৎ হোগা।

এই বলে বিজ্ঞানানন্দজী চলে গেলেন। সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী। আমরা কুটীরের দাওয়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমাদের কুটীর থেকে কিছু দূরে বিভিন্ন রকমের গাছের শিকড় রোদে শুকতে দেওয়া আছে। মনে হয় এই সমস্ত শিকড় বাকড় থেকে আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরী হয়। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শীতল বাতাস বয়ে আসছে নর্মদার দিক থেকে। দেখলাম চারজন ভীল বালক একপাল গরু নিয়ে মঠ-বাড়ীতে প্রবেশ করল। গরু বাছুর মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি। সূর্যাস্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একজন ব্রহ্মচারী এসে কুটীরের মধ্যে দুটি করে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে। আমরা যে যার আসনে বসে আছি। এমন সময় প্রেমানন্দ হরানন্দজীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন শিব পরমাত্মা বা ব্রহ্মের নামান্তর। তিনি বিশ্বদেব, বিশ্বরূপ, বিশ্বাতিগ, বিশ্বান্তর্যামী — আমরা শিবকে ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র, উগ্র, ভীম এবং মহাদেব এই আটটি নামে ডাকি কেন?

— এই নামগুলির প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য আছে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব সর্বত্র এবং সর্বদা তিনি বিদ্যমান বলে তিনি শাশ্বত পুরুষ, এজন্য তিনি 'ভব'। সকল বস্তুর নাশকর্তা তিনি। তাই তাঁকে বলা হয় 'শর্ব'। তিনি নিরুপারিধ পরমৈশ্বর্য্যবান, এজন্য তিনি 'ঈশান'। পশু অর্থাৎ সকল প্রাণীবর্গের এবং পাশের প্রভু, সেজন্য তাঁর নাম 'পশুপতি'। তিনি চিদচিতের নিয়ামক এবং সংসারের শোক বিদূরিত করেন বলে তাঁকে 'রুদ্র' বলা হয়। সকল বস্তু, তাঁর তেজে উদ্ভাসিত হয়, কেউই তাকে অভিভূত করতে পারে না, এজন্য তাঁর নাম 'উগ্র'। ভীষণতা ও ভয়ের আধার বলে তিনি 'ভীম'। সকলের শ্রেষ্ঠ বলে তিনি মহাদেব।

এইভাবে প্রত্যেক নামটির মধ্যে নিহিত রয়েছে এক একটি বিশিষ্ট গুণের পরিচয়। সকল কল্যাণগুণের আশ্রয় এই শিব। তিনিই চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম ভাবে পরিণত। তাঁর অনুগ্রহে জীব পুরুষার্থ লাভ করে। তাঁর প্রসাদেই জীব প্রায় সমানগুণতা প্রাপ্ত হন। এজন্যই আমরা কায়মনোবাক্যে সেই আনন্দরূপ এবং অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি।

প্রত্যেকেই আত্মকর্মে, ধ্যান জপে মন দিয়েছেন। চুপচাপ বসে আছি মা নর্মদার দিকে তাকিয়ে। উত্তরতটের দু'একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। ভাবতে লাগলাম এইরকমই কতই না জানি সিদ্ধ মহাযোগী নর্মদার উভয়তটে বাস করছেন।'রেবা রেবা' জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখি, গাছপালায় তখনও অন্ধকার আছে। সকাল হয়ে আসছে। দুটো ময়ূর 'কেকা কেকা' শব্দ করতে করতে সামনের উঠোনের বড় গাছটিতে উড়ে গিয়ে বসল। আমরা প্রায় সকলেই জেগে গেছি। আমরা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে 'আয়ুর্বেদচর্চা কেন্দ্রে' এর ফাটক পেরিয়ে নর্মদার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নর্মদায় স্নান করে মন প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে গেল।

স্নান সেরে উঠে নর্মদার তটে দাঁড়িয়ে বাবার কাছে শেখা রুদ্রসূক্ত উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করতে শুরু করলাম। মন্ত্রধ্বনিতে গম্‌গম্ করতে থাকল নর্মদার তট।

আশ্রয়স্থলে আসার জন্য ঘুরতেই দেখতে পেলাম বিজ্ঞানানন্দজী হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সবিনয়ে জানালেন — গুরুজী আপলোগকে সাথ ভেটকে লিয়ে পধারে হ্যায়। আমরা ত্রস্তব্যস্ত হয়ে কুঠিয়াতে ফিরে এসে দেখি সাধুজী আমাদের কুঠিয়ার উঠোনের উপরের বড় গাছটার তলায় বসে আছেন।

বিজ্ঞানানন্দজী ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে তাঁর গুরুজীকে প্রণাম করলেন। আমরাও সাষ্টাঙ্গ দিলাম। প্রণাম করে উঠেই দেখলাম — প্রায় ছয় ফুট লম্বা গৌরকান্তি তেজোদৃপ্ত মূর্তি। চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সারা শরীরে আনন্দ ও লাবণ্য যেন উছলে পড়ছে। একেবারে ধাবড়ী কুণ্ডের একলিঙ্গস্বামীর প্রতিমূর্তি যেন।

জীবনের ক্লেদ গ্লানি যাক্ ডুবে অনন্ত পাথারে
সুখ দুঃখ মৃত্যুভয় যাক্ ভেসে দূর দূরান্তরে
তোমার পরশে হল বোধির বোধন
প্রজ্ঞার প্রকাশ হল রসঘন আনন্দ দীপন
হে ব্রহ্মর্ষি, তব পদে নমি বারংবার।

— তুমলোগকো দেখ কর হম্ বহুৎ খুশ হুয়া। জিতা রহো। বিজ্ঞানানন্দ, তুমি ইন সাধুয়োঁকো এবং শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকো আচ্ছিতরেসে দেখভাল করনা। মহাত্মা একলিঙ্গস্বামী মুঝে Internal message ভেজা।

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — ম্যায় মহাত্মা একলিঙ্গস্বামীকে গুরুভাই হুঁ। আপকা বারে মেঁ হামকো সবকুছ মালুম হ্যায়। হর নর্মদে।

এইসব বলেই বিশোকানন্দজী নীরব হলেন। কিছুক্ষণ পরেই উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের তাঁকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা মঠবাড়ীতে প্রবেশ করলাম। বড় হলঘরে একটি কাঠের কারুকার্যখচিত সিংহাসনে বসে আমাদের সিংহাসনের সামনে পাতা ফরাসের উপর বসতে বলে বিশোকানন্দজী বলতে আরম্ভ করলেন — আমাদের এই আয়ুর্বেদ-চর্চা কেন্দ্র বহু প্রাচীন। আমরা এখানে কয়েকজন আয়ুর্বেদের মনন ও নিধিধ্যাসনে রত। অথর্ববেদের নানা মন্ত্রে ও স্তোত্রে শারীর স্থান, শারীরবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ের এবং এই বেদের দশম খণ্ডে মানুষের সৃষ্টির উল্লেখ আছে। ঋষি নারায়ণ আয়ুর্বেদোক্ত কতকগুলি প্রাচীনতম ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কর্তা। অথর্ববেদের অনেক পরে আত্রেয়-চরক সুশ্রুত প্রবর্তিত হিন্দু অ্যানাটমিতে উল্লিখিত অস্থি সংস্থানের সঙ্গে তার প্রভূত মিল আছে। নিম্নোক্ত তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই এই মিল দেখা যাবে। এই বলে তিনি একটি চার্ট খুলে দেখালেন। তাতে লেখা আছে —

| **অথর্ববেদ** | **আত্রেয়-চরক** | **শুশ্রুত** |
|---|---|---|
| পার্শান | পার্শানি | পার্শানি |
| গুলফ | গুল্‌ফ ও মণিক | গুল্‌ফ |
| অঙ্গুলি | অঙ্গুলি (নখসমেত) | অঙ্গুলি |
| উচলখ | শলাকা | তল |
| প্রতিষ্ঠা | অধিষ্ঠান | কূর্চ |
| অষ্ঠীবৎ বা জানু | জানু বা কপালিকা | জানু |
| জঙ্ঘা | জঙ্ঘা | জঙ্ঘা |
| শ্রোণি | শ্রোণিফল ভগসমেত | শ্রোণি |
| উরু | উরু নলক ও বাহু-নলক | উরু |
| উরস | উরস | উরস |

| অথর্ববেদ | আত্রেয়-চরক | শুশ্রুত |
|---|---|---|
| গ্রীবা | জত্রু (অথবা গ্রীবা) | কণ্ঠনাড়ী (অথবা জত্রু অথবা গ্রীবা) |
| স্তন | পার্শ্বক, স্থালক, অর্বুদ সমেত | পার্শ্ব |
| স্কন্ধ | গ্রীবা | গ্রীবা |
| পৃষ্টি | পৃষ্ঠাস্থি | পৃষ্ঠ |
| অংস | অক্ষক (অথবা অংস) | অক্ষক (অথবা অংস) |
| ললাট, ককাটিকা | নাসিক গণ্ডকূট-ললাট | নাসা, গণ্ড, |
| কপাল | কপাল, শঙ্খসমেত | অক্ষিকোষ কর্ণ কপাল, শঙ্খসমেত |

শল্যবিদ্যা, নানা সংক্রামক ব্যধির চিকিৎসা, স্ত্রীরোগে ঔষধ হিসাবে ভেষজের ব্যবহার, এমনকি গবাদি পশুর কয়েকটি রোগের উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায়। অশ্ব, গজ ও গবাদি প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসার জন্য কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২০০০ শ্লোক বিশিষ্ট এবং আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত অশ্বায়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত বা শালিহোত্র সংহিতা অশ্ব চিকিৎসার এক প্রামাণিক গ্রন্থ। চলিত কিংবদন্তী হল শালিহোত্র অশ্ব চিকিৎসার জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট লাভ করেছিলেন।

পালকাপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' হস্তি চিকিৎসার প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চার অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে আছে ১) মহারোগস্থান, ২) ক্ষুদ্র রোগস্থান, ৩) শল্যস্থান ও ৪) উত্তরস্থান। হস্তীর স্বভাব, বন্য হস্তী ধরবার ও পোষ মানাবার উপায় বর্ণনা করে নীলকণ্ঠ রচনা করেন 'মাতঙ্গলীলা'। যা প্রাচীন ভারতীয় প্রাণীবিদ্যার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

অথর্ববেদে 'জ্বর' বা তক্মন বলে একপ্রকার রোগের বর্ণনা আছে, যার সঙ্গে আধুনিককালের ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রভূত মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন হিন্দু ভিষকগণ এই রোগের কথা জানতেন। তক্মন ছাড়া আস্রাব (অতিসার বা পেটের অসুখ), কাসিকা (কাস্) বলাস বা যক্ষ্মা, জলোদর, অপোচিৎ (ক্ষত), বিদ্রধ (ফোড়া) কিলাস (কুষ্ঠ, চামড়ার রোগ) শীর্ষক্তি (শিরঃপীড়া), বিশল্যক (স্নায়ুবেদনা) অলজী (চক্ষুরোগ), বিলোহিত (রক্তস্রাব), অপস্মার গ্রাহি (ভূতে ধরা), অক্ষত (ব্রণ বা টিউমার) প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন রোগ যে বংশানুক্রমিক অথর্ববেদের ঋষিগণ তা অবগত ছিলেন। এই রোগদের বলা হত 'ক্ষেত্রীয়'। অথর্ববেদে ত্রিধাতুর উল্লেখ আছে। অথর্ববেদোক্ত শুষ্ক, সিক্ত ও সঞ্চারী শব্দত্রয় পরবর্তীকালের ত্রিধাতু বায়ু, পিত্ত ও কফকে বুঝায়, সায়ণাচার্য এরূপ মনে করেন। তবে শুষ্ক, সিক্ত ও সঞ্চারী নানাপ্রকার বিকৃতির ফলেই যে রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে এইরূপ মত সবসময় গৃহীত হত। অথর্ববেদের মতে বিভিন্ন জাতীয় ভূতবর্গের আক্রমণে শরীর ব্যধিগ্রস্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে অথর্ববেদ এই মতই প্রচার করেছে। এই সকল ভূত ও পিশাচ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যাতুবান, কিমীদিন, অমীবা, রক্ষ, অত্রিন, কণ্ব, দয়াবিন্, অলিংস, বৎসক, পলাল, শর্ক, কোক, মলিম্লুচ, পলীজক, বব্রীবাসস্, অশ্রৌষ, প্রমালিন ইত্যাদি প্রধান। সময় সময় দেবগণও মানবদেহ আশ্রয় করে নানা রোগের সৃষ্টি করেন। যেমন, জলোদরের কারণ স্বয়ং বরুণদেব। সুতরাং দেহকে রোগমুক্ত করতে হলে আক্রমণকারী এইসব ভূত, পিশাচ ও দেবতাদের বিতাড়ন করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অথর্ববেদে নানা প্রকার শান্তি স্বস্ত্যয়ণ ও কবচ ধারণের বিশেষ ব্যবস্থার বর্ণনা আছে।

অথর্ববেদে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্র ও কবচাদির বাহুল্য থাকলেও নানাবিধ ভেষজের অলৌকিক গুণের কথাও আছে। উদ্ভিদ ও ভেষজের ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ণনাগুলি থেকে মনে হয়, অথর্ববেদের সময় গাছ গাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসারও বিশেষ প্রচলন ছিল। এই শেষোক্ত উপায়ে যাঁরা রোগের চিকিৎসা করতেন, তাঁদের বলা হত ভিষক। এইরূপ শত শত ভিষক এবং সহস্র সহস্র ভেষজের উল্লেখ আমরা অথর্ববেদে পাই—

'শত হ্যস্য ভিষজঃ সহস্রম্ উত বীরুধঃ' — (অথর্ব ২/৯/৩)

অথর্ববেদের আমলে মন্ত্রবাদী ও ভেষজবাদীদের মধ্যে একটা বিরোধ থাকলেও, মানবদেহ ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকলে মন্ত্রবাদীদের প্রভাবও ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়। কৌশিক সূত্রে বহুবিধ উদ্ভিজ্জ ঔষধের নাম পাওয়া যায়, যেমন — পলাশ, কাম্পিল, বরণ,জঙ্গির, অর্জুন, বেতস, শমী, শমকা, দর্ভ, দুর্বা, যব, তিল, ইঙ্গিড়, তৈল, বীরিণ, উষীর, ক্ষদির, ত্রপুস, মুঞ্জ, ত্রিমুক, নত্রত্নী, জীবী, অলাকা, লাক্ষা, বিস, হরিদ্রা,

পিপুলী, অলাবু, খলতুল, করীর, শিগরু, বিভীতক্, শামীবিম্ব, শীর্ণপর্ণা, প্রিয়ঙ্গু, হরিতকী, পূতিকা ইত্যাদি। ক্ষতস্থানে জলৌকা এবং সর্পদষ্ট স্থান অগ্নিকর্ম দ্বারা পোড়াবার বিধি কৌশিকসূত্রে দেখা যায়। যুদ্ধে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হলে ধাতু অথবা কাষ্ঠনির্মিত কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের অশ্বিনীকুমার বিজ্জলার ছিন্নপদে একটি লৌহপদ জুড়ে দেন। তিনি ঋজাশ্ব, পরাবৃজ, কণ্ব ও কক্ষিবতের অন্ধত্ব দূর করেন; বহু বন্ধ্যা নারীকে সুপ্রজা করেন। এইসব কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি যাই হোক, বৈদিক যুগে চিকিৎসা ব্যাপারে প্রাচীন আর্য ঋষিদিগের শিক্ষায় ও লেখনীতে ব্যবহারিক ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ যে দেখতে পাওয়া যায় তাতে সন্দেহ নাই।

অথর্ববেদের উল্লিখিত শারীরবৃত্ত সম্প্রসারণ করে আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছিল। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদ (আয়ুর্বিদ্যা) অথর্ববেদেরই এক শাখা বিশেষ। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদেরই উপাঙ্গ এবং সহস্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে তা ব্রহ্মা রচনা করেছিলেন। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপবেদ বলেছেন। চরক ও ডহ্লনের মত মনীষীদের মতে আয়ুর্বেদ স্বতন্ত্র বেদ। ডহ্লণের মতে লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্বেদ, মাত্র ছয় হাজার মন্ত্রে সম্পন্ন অথর্ববেদের উপাঙ্গ হতে পারে না। তথাপি অথর্ববেদের সঙ্গে আয়ুর্বেদের নানা মিল ও নিবিড় সম্বন্ধ উপেক্ষণীয় নহে। এই বিশেষ যোগ বহু প্রাচীনকাল হতে বর্তমান।

আয়ুর্বেদের আলোচনা আটভাগে বিভক্ত ঃ (১) কায়তন্ত্র, (সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যা), ২) শল্যতন্ত্র (শল্যবিদা ও ধাত্রীবিদ্যা), ৩) শালাক্যতন্ত্র (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশের চিকিৎসা), ৪) ভূতবিদ্যা (মনোবিকার, বাতুলতা প্রভৃতি রোগের আলোচনা ও চিকিৎসা), ৫) কৌমারভৃত্য (শিশু চিকিৎসা), ৬) অগদতন্ত্র (বিষ ও বিষক্রিয়া প্রভৃতির আলোচনা), ৭) রসায়ণতন্ত্র (রসায়ন, বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি), এবং ৮) বাজীকরণতন্ত্র (কামজ পূর্ণযৌবন প্রদান প্রসঙ্গ)। প্রসঙ্গতঃ 'রসায়ন' শব্দটি অথর্ববেদোক্ত 'আয়য্যাণি' শব্দ হতে উদ্ভূত। 'আয়য্যাণির' অর্থ জীবন ও স্বাস্থ্য লাভের উপায়।

প্রাচীনকালে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের পূর্বে) সমগ্র শারীরবৃত্তের এত সুন্দর ও প্রণালীবদ্ধ আলোচনার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় না। তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষতঃ কায়তন্ত্র, কৌমারতন্ত্র, অগদতন্ত্র প্রভৃতি আয়ুর্বিদ্যার কয়েকটি বিভাগের বিষয়বস্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা বলতে অবশ্য আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা বলছি না। আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তিন হাজার বৎসর পূর্বের চিকিৎসক ও শারীরবৃত্ত বিশারদের জ্ঞান যাচাই করবার চেষ্টা অসঙ্গত। এই সময় বিভিন্ন দেশে সভ্য জাতির মধ্যে সাধারণতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানের যে উন্নতি দেখা যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদোক্ত জ্ঞান বিচার করলেই এর অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্য ও ভিষকদিগের আশ্চর্য প্রতিভা আপনা হতেই প্রকাশ পাবে।

আয়ুর্বেদ প্রথমে কে বা কারা রচনা করেছিলেন তার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী ধরে বহু চিকিৎসক ও শারীরবিদের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে এই শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর অনুরূপ সময়ে আমরা আত্রেয় ও সুশ্রুতের সাক্ষাৎ পাই। এই দুই চিকিৎসকই ঐতিহাসিক পুরুষ। তার পূর্বে যে সকল চিকিৎসক ও শারীরবিদদের নাম পাওয়া যায় যেমন — দক্ষ, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, ভৃগু, ধন্বন্তরি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে তাঁদের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। এ সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কিংবদন্তী ছাড়া অধিক কিছু বলা সম্ভবপর নয়। চরক-সংহিতায় উল্লিখিত এইরূপ একটি কিংবদন্তী অনুসারে ব্রহ্মা শারীরবৃত্তের জ্ঞান প্রথম দক্ষকে শেখান, দক্ষের নিকট হতে শিক্ষা করেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট এই জ্ঞান অবগত হয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজের নিকট তা প্রকাশ করেন। শেষে আত্রেয় ভরদ্বাজের কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। আত্রেয়ের ছয়জন সুযোগ্য শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষরপাণি হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অগ্নিবেশ চরকের গুরু। চরকের শিষ্য হলেন দৃঢ়বল। আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে কাশীরাজ ধন্বন্তরি এই জ্ঞান ইন্দ্রদেবের (বা তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজের) নিকট লাভ করে পরে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সুশ্রুতকে অর্পণ করেন। সুশ্রুত সেই বিদ্যা দান করেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য নাগার্জুনকে।

আত্রেয় ও সুশ্রুতের কাল হতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের সূত্রপাত। এই সময়

থেকে কোন ভারতীয় শারীরবিদ কখন কি কি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন ও চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীরবৃত্তের বিবর্তনে কার অবদান কতটুকু, তা মোটামুটিভাবে বলা চলে। আত্রেয় ও সুশ্রুত হতে স্বনামধন্য ভারতীয় চিকিৎসকগণ আর বিস্মৃত কিংবদন্তী যুগের মানুষ নন, ঐতিহাসিক নানা ঘটনাস্রোতের মধ্য হতে তাঁদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। ইতিহাসের দিক থেকে তাই আত্রেয় ও সুশ্রুতকে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্মদাতা মনে করা হয়।

অত্রির পুত্র আত্রেয় ঋষির সময়কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ। তাঁর পুরা নাম আত্রেয় পুণর্বসু বলা হল কারণ, বৈদিক যুগে বা বৌদ্ধযুগে আত্রেয় নামে একাধিক চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকের নজির হতে হোয়েৰ্ণল মনে করেন, আত্রেয় সম্ভবতঃ তক্ষশিলার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে বা তার কিছু আগে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তার মধ্যে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত আত্রেয় সংহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানাপ্রকার ব্যাধি, দ্রব্যগুণ, ভেষজ, চিকিৎসাবিধান ইত্যাদি এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আত্রেয় চিকিৎসাপদ্ধতির কথা আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর শিষ্যগণ। অগ্নিবেশ কর্তৃক রচিত অগ্নিবেশতন্ত্র অবলম্বনেই চরক ও দৃঢ়বল চরক-সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভেল ও হারীত সংহিতাও অতি মূল্যবান প্রাচীন চিকিৎসার গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থ হতে আত্রেয় চিকিৎসা পদ্ধতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

সুশ্রুত কবি বিশ্বামিত্রের পুত্র। জনশ্রুতি হল কাশীরাজ দিবোদাস বা ধন্বন্তরির নিকট তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেন, এইরূপ জনশ্রুতি। সম্ভবতঃ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। আত্রেয় ছিলেন প্রধানতঃ চিকিৎসাবিদ্যা বা কায়তন্ত্রে পারদর্শী, সুশ্রুত ছিলেন শল্যবিদ্যাবিশারদ। সুশ্রুতের কাল বৈদিক যুগের মাঝামাঝি বা শেষভাগ। সুশ্রুত আত্রেয়র উল্লেখ করেছেন, শতপথ ব্রাহ্মণে সুশ্রুতের মতামতের আলোচনা আছে। সুতরাং তিনি আত্রেয়ের পরবর্তী এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদি রচনাকালের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক।

আত্রেয় সংহিতার মত সুশ্রুত সংহিতার মৌলিক বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নি। সুশ্রুতের শিষ্য ঔপধেনব, ঔরভ্র ও পুষ্কলাবত এবং আরও পরে নাগার্জুন মৌলিক গ্রন্থের পরিবর্তন ও প্রতিসংস্কার করলেও, প্রাচীনকাল হতেই এই গ্রন্থের বিশ্বজোড়া খ্যাতির প্রমাণ ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ। অষ্টম শতকের শেষে এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত হয়। ইবন্ আবিল সৈবিয়াম এই গ্রন্থকে 'কিতাব-ই-সুসরুদ' নামে উল্লেখ করেছেন। আলরাজি সুশ্রুতকে শল্যবিদ্যার প্রামাণিক গ্রন্থ মনে করতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাটিন, জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় সুশ্রুত অনুদিত হয়।

জীবক কোমারভচ্চ ঃ সুশ্রুতের পর বুদ্ধের সমসাময়িক (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৬-৪৮৬) মগধাধিপতি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক কোমারভচ্চের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবকের জন্মস্থান রাজগৃহ। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সেই সময়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষার পীঠস্থান সুদূর তক্ষশীলায় তিনি সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। পুনর্বসু আত্রেয় ছাড়া কৃষ্ণাত্রেয় ও ভিক্ষু আত্রেয় নামে আরও দুইজন আত্রেয়র কথা জানা যায়, জীবক কোন আত্রেয়র শিষ্য ছিলেন তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

সমগ্র আয়ুর্বিজ্ঞানে জীবকের কিরূপ গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল সে সম্বন্ধে জাতকের একটি গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা সমাপনান্তে তক্ষশিলার এক বিখ্যাত আচার্য জীবক ও অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি খননযন্ত্র দিয়ে তক্ষশিলার চতুর্দিকে এক যোজনের মধ্যে নির্গুণ কোন উদ্ভিদ বা গুল্ম পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করতে আদেশ দেন। অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেকেই একাধিক উদ্ভিদ সংগ্রহ করে গুরুর নিকট জানালেন যে, ভেষজ হিসাবে এরা নির্গুণ, বহু বিলম্বে রিক্ত হস্তে ফিরলেন জীবক। ভেষজ হিসাবে সম্পূর্ণ নির্গুণ কোন উদ্ভিদই তাঁহার চোখে পড়ে নি। আচার্য বুঝলেন উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে জীবকের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে।

আত্রেয় প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে কায়চিকিৎসাই প্রধান স্থান অধিকার করে। কিন্তু জীবক শল্যচিকিৎসাতেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, অনেক স্থলেই তিনি মাথার করোটি কেটে তার ক্ষতস্থান হতে ক্রিমি বের করতেন এবং এইভাবে রোগীর শিরঃপীড়া দুর করতেন। রাজগৃহে এক ধনীর স্ত্রীর উদরে অস্ত্রোপ্রচার করে অন্ত্রগুলি তিনি বার করেন এবং তার মধ্যে যেগুলি গ্রন্থি পাকিয়ে গিয়েছিল সেগুলি উন্মোচন করে পুনরায় তাদের যথাস্থানে সংস্থাপন করেন। জীবকের এইরূপ আশ্চর্য

চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু কাহিনী বিবৃত আছে। ভগবান বুদ্ধকে কয়েকবার তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি হতে নীরোগ করেন। তাঁর চিকিৎসায় নৃপতি বিম্বিসারও কঠিন ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ করেন।

জীবকের চিকিৎসাখ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বৈশালী, বারাণসী, সাকেত এমনকি সুদূর উজ্জয়িনী হতে রোগীরা তাঁর নিকট চিকিৎসিত হতে মগধে আসত। চিকিৎসার জন্য তিনি মোটা অর্থ গ্রহণ করতেন। কথিত আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬,০০০ কার্যাপণও দর্শনী হিসাবে ধার্য হত।

শিশু চিকিৎসায় জীবক সে যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন। কাশ্যপ-সংহিতা নামে এক বিরাট চিকিৎসার গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। এর নয়টি অধ্যায় হল ঃ ১) সূত্রস্থান, ২) নিদানস্থান, ৩) বিমানস্থান, ৪) শারীরস্থান, ৫) ইন্দ্রিয়স্থান, ৬) চিকিৎসাস্থান, ৭) সিদ্ধিস্থান, ৮) কল্পস্থান, ৯) খিলস্থান।

চরক ঃ আত্রেয় প্রবর্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা চরক। তাঁহার প্রণীত চরক সংহিতা মুখ্যতঃ অগ্নিবেশ তন্ত্রের সম্প্রসারিত ও সংশোধিত সংস্করণ। এই সংস্কার সাধন তিনি একা করেন নি। দৃঢ়বল নামে আর একজন প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসক অগ্নিবেশ তন্ত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলির সংস্কার সাধন করেন। যা হোক, চরক আত্রেয় অগ্নিবেশের পরবর্তী। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ ত্রিপিটকে দেখা যায়, চরক খ্রীঃ প্রথম শতকে কণিষ্কের রাজত্বকালে রাজবৈদ্য ছিলেন। কণিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অবশ্য অনেক মতদ্বৈত আছে। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ঠিক কখন তিনি রাজত্ব করতেন তা নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নি। তারপর ত্রিপিটকের উল্লিখিত চরক এবং চরক সংহিতার প্রণেতা চরক এক ব্যক্তি কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। পাণিনী (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) ও পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) চরক-সংহিতার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ হতে খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দের অর্থাৎ ৮০০ বৎসরের কোনও সময়ে খুব সম্ভবত কাশ্মীরে চরক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের তারিখ সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা বিরক্তিকর। এইজন্য এইসব তারিখ সুনির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তৎপরতা বিচার-বিশ্লেষণে যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সুশ্রুত ও চরকের শল্যবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য তোমাদের শোনাই —

শল্যবিদ্যা ঃ অথর্ববেদে ও আয়ুর্বেদে শল্যতন্ত্রেরও আলোচনা আছে। সুশ্রুতের সময়ে এই বিদ্যার প্রভূত উন্নতি ঘটে। সুশ্রুত ছিলেন অস্ত্রচিকিৎসক; সুতরাং তাঁর সংহিতায় শল্যবিদ্যাকেই তিনি আলোচনার প্রধান বিষয় করেছেন।

অস্ত্র চিকিৎসার গোড়ার কথা হল নানাবিধ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার। প্রায় ১২১টি বিবিধ যন্ত্রপাতির উল্লেখ সুশ্রুতে আছে। যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; ১) যন্ত্র ও ২) শস্ত্র, প্রথমোক্তগুলির মুখ ভোঁতা, দ্বিতীয়োক্তের তীক্ষ্ণ ও ধারালো। যন্ত্রগুলির সংখ্যা প্রায় ১০১ এবং এগুলি ছয় রকমের ঃ— ১) স্বস্তিক — সাঁড়াশি, ফরসেপ ইত্যাদি; ২) সন্দংশ — চিমটা, সাঁড়াশি; ৩) তাল — একপ্রকার সাঁড়াশি বা চিমটা বিশেষ; ৪) নাড়ী — ক্যাথিটার, বিভিন্ন আকারের ও দৈর্ঘ্যের নল বিশেষ। ৫) শলাকা — শলাকা, দণ্ড ইত্যাদি ও ৬) উপযন্ত্র — উপরিউক্ত যন্ত্রের অনুষঙ্গ। তীক্ষ্ণধার শস্ত্র ২০ প্রকারের ঃ— ১) মণ্ডলাগ্র — গোলাকার ছুরি; ২) করপত্র — হাতের মত দেখতে করাত; ৩) বৃদ্ধিপত্র — ক্ষুর, ৪) নখ-শস্ত্র — নখের মত শস্ত্র, ৫) মুদ্রিকা — আঙ্গুলের মত ছুরি, ৬) উৎপলপত্র — পদ্মপত্রের মত ছুরি, ৭) অর্ধধার — ছুরিকা, এর ধার একদিকে, ৮) সূচী — ছুঁচ, ৯) কুশপত্র — ছুরির ফলা (ঘাসের মত), ১০) আতীমুখ — আতীপক্ষীর চঞ্চুর মত ছুরি, ১১) শররীমুখ — কাঁচি, শররী, পক্ষীর চঞ্চুর মত, ১২) অন্তর্মুখ — কাঁচি, ১৩) ত্রিকুর্চক — তিন ছুঁচ বিশিষ্ট শস্ত্র, ১৪) কুটারিকা — ক্ষুদ্র কুঠার, ১৫) ব্রীহিমুখ — ট্রোকার (ইংরেজী), ১৬) অরা, ১৭) বেতস্ পত্রক, ১৮) বাড়িশ-রড়শি, ১৯) দন্তশঙ্কু - দন্তোৎপাঠনী শস্ত্র, ২০) এষণি — ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষার তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা বিশেষ। ছাত্রদের চামড়ার থলি অথবা মাছের পটকা জলপূর্ণ করে তার উপর অস্ত্রোপচারের অভ্যাস করানো হত।

অতি জটিল ও কঠিন নানা ধরণের অস্ত্রোপচারে হিন্দু শল্যবিদ্‌রা যে কুশলী ও পারদর্শী ছিলেন, তা উপরিউক্ত যন্ত্র ও শস্ত্রের বহর হতেই সহজে বুঝা যায়। ভগন্দর (anal fistula) , টনসিল, চোখের ছানি,

দ্রূণ, হার্ণিয়া ইত্যাদি অস্ত্রোপচারের বিশদ বিবরণ সুশ্রুতে দেওয়া আছে। উদ্ভিদের আঁশ ও পশুর লোম দ্বারা অস্ত্রোপচার হত। দেহের বিভিন্ন স্থানে ফোঁড়ার অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে অতি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ফোঁড়ার গর্তের অভিমুখে ছুরিকা চালাতে হবে, চক্ষু, গণ্ড, অধর, ওষ্ঠ প্রভৃতি দেহের বিশেষ অংশে অস্ত্রোপচার তির্যকভাবে করা উচিত, হাত ও পায়ের পাতায় বৃত্তাকারে, ইত্যাদি, অস্ত্রোপচারের পর গরম জলে ক্ষতস্থানে ধোওয়া, কাপড়ের গজ ঢুকানো, পুলটিস দেওয়া পটি বাঁধা প্রভৃতির বিশদ নির্দেশগুলি পড়লে মনে হবে এটি যেন কোন আধুনিক শল্যবিদ্যার গ্রন্থ। হাড় ভেঙ্গে গেলে, চিড় ধরলে বা সরে গেলে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তা একটি পরিচ্ছেদে বিবৃত আছে।

রিণোপ্লাষ্টির নাম কি তোমরা শুনেছ? রিণোপ্ল্যাস্টি বা নবনাসিকা প্রস্তুত বিদ্যা প্রথম ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারি। মনু-সংহিতায় ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর নাক, কান কাটবার নির্দেশ ছিল। ক্যাবস্‌টিগ দেখিয়েছেন, অপরাধীর শাস্তিবিধান সম্পর্কে এই প্রকার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রিণোপ্লাস্টি আবিষ্কারের প্রধান কারণ। নব নাসিকা প্রস্তুত সম্বন্ধে সুশ্রুতের পরামর্শ অনুসারে গাছের পাতাকে প্রথমে কাটা নাকের সমান করে কেটে সেই পাতার মাপে গণ্ডদেশ হতে কিছুটা চামড়া বা কলা কেটে ফেলতে হবে। এখন এই কলা নাসিকার কাটা অংশের উপর সযত্নে বসিয়ে সেলাই করলেই তা ধীরে ধীরে দেহের সঙ্গে জুড়ে যাবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য নতুন নাকের ভিতর আবার দুটি নল ঢসাবার বিধান ছিল। এইভাবে গণ্ডদেশ হতে কিছুটা মাংস কেটে কাটা কানের জায়গায় নূতন কান তৈরী করা হত। রিণোপ্ল্যাস্টি ভারতবর্ষ হতে ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত হয়।

বার্লিনের সাঃ হির্শবের্গ এ সম্বন্ধে বলেছেন —

'...The whole plastic surgery in Europe had taken its new flight when these cunning devices of Indian workmen became known to us. The transplantation fo sensible skin flaps is also an entirely Indian method.' ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন গ্রীকদের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক স্থাপনের পর হতে শুরু হয়েছিল, এককালে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ তা সদর্পে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তাঁরা বরাবর গ্রীক হিপোক্রেটিস্ ও তাঁর শিষ্যগণকেই কৃতিত্ব দিয়ে এসেছেন। এখন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন, হিপোক্রেটিসের বহু পূর্বে ভারতীয় চিকিৎসকগণই শল্যবিদ্যায় আশ্চর্য উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁদের যেসব দুরূহ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী দেখা যায়, হিপোক্রেটিস ও তাঁহার শিষ্যবর্গের তা কল্পনাতীত ছিল।

ক্যাবস্‌টিগলিওনি লিখেছেন, — In it (surgery) we find proof of the priority of Indian to Hippocratic medicine. Indeed, operations are described in the Indian texts, such as that of anal fistula, which are not named in the Hippocratic writings.

বৈদিক যুগে শল্যবিদ্যার আদর ছিল, শল্য চিকিৎসক ছিলেন সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগে নানা কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে অস্ত্রচিকিৎসা ক্রমশ অতি হীন ও ঘৃণ্য ব্যবসা বলে পরিগণিত হয়। শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত ও পরিত্যাজ্য হয়ে অশিক্ষিত নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে শল্যবিদ্যা আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধদিগের অহিংসা ধর্মও শল্যবিদ্যার অগ্রগতির প্রতিকূল হয়েছিল। বৌদ্ধযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগে নানা উন্নতি সত্ত্বেও শল্যবিদ্যার দ্রুত অবনতি রোধ করা সম্ভবপর হয় নি।

ত্রিদোষবাদ ও চিকিৎসা পদ্ধতি ঃ বৈদিক চিকিৎসা একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কেবল অনুমান ও আন্দাজ হতে উদ্ভূত নয়। এই মতবাদের নাম ত্রিদোষবাদ, ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে এই ত্রিদোষবাদের আভাস পাওয়া যায়। বায়ু, পিত্ত, কফ্ তিন প্রকার দোষের মধ্যে সমতা রক্ষাই স্বাস্থ্যের কারণ, এই সমতা কোনও কারণে ব্যাহত হলে দেহে রোগের আবির্ভাব ঘটে। নাভি হতে পদতল পর্যন্ত দেহাংশে বায়ুর অবস্থান। নাভি হতে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পিত্তের, এবং হৃদপিণ্ড হতে মস্তক পর্যন্ত অংশে কফের রাজত্ব। এই তিন দোষ দেহকে পরিচালনা করে থাকে এবং তাদের তারতম্য হেতু বিভিন্ন আকৃতির, মেজাজের ও ব্যক্তিত্বের মানুষ আমরা দেখতে পাই। দেহরস (জীর্ণখাদ্য), রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি 'ধাতু'র সমন্বয় গঠিত। সাতটি ধাতু বায়ু, পিত্ত ও কফের দ্বারা প্রভাবিত। রস বা জীর্ণ খাদ্য হতে নানা প্রকার 'মল' নির্গত হয়ে

থাকে। যেমন মূত্র, মল, ঘর্ম, চুল, নখ ইত্যাদি। আয়ুর্বেদেতে, একমাত্র দোষ, ধাতু ও মল বিচারের দ্বারাই স্বাস্থ্য ও ব্যধির কারণ নির্ণয় করা সম্ভবপর এবং তার বিচার হতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যধি দুই প্রকারের — শারীরিক ও মানসিক। ব্যধির কারণও দুই প্রকার, ১) নিজ বা অন্তর্নিহিত, ২) আগন্তুক বা বহিরাগত। 'পূর্বরূপ' বা প্রাথমিক লক্ষণ , 'লিঙ্গৌ' বা রোগের আবির্ভাবের পর লক্ষণসমূহ ও 'উপচয়' বা রোগীর উপর খাদ্য ও ঔষধের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ব্যধির স্বরূপ জানতে হবে। রোগের লক্ষণসমূহের মধ্যে জ্বরের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। জ্বরের বহু প্রকার ভেদ হয়; ত্রিদোষের অল্পবিস্তর বিকৃতি হতে সাত প্রকার জ্বর, আঘাত ও ক্ষতজনিত একপ্রকার জ্বর হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষের বিকৃতিজনিত জ্বর অতি সাংঘাতিক ও দুরারোগ্য। ক্ষয়রোগ রাজরোগরূপে বর্ণিত। বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির জ্ঞান বর্তমান, কারণ বসন্তের গুটির অতি পরিষ্কার বর্ণনা দেখা যায়। এই গুটি হতে নির্গত রস টীকা হিসাবে ব্যবহার করে বসন্তের প্রতিষেধকের জ্ঞান প্রাচীন ভারতীয়দের ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও, জেনারের আবিষ্কারের বহু পূর্বে এদেশে একশ্রেণীর মেষ ও গোপালকের মধ্যে বসন্তের টীকার প্রচলন দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা অনেক পরবর্তী কালের আবিষ্কার। মশার সঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরের উল্লেখ সুশ্রুতে আছে। কোনও স্থানে অস্বাভাবিকভাবে ইঁদুর মরতে দেখলে সেই স্থান অচিরে পরিত্যাগ করা আবশ্যক, সুশ্রুতের এইরূপ আর একটি উপদেশ হতে প্রাচীন হিন্দুদের প্লেগ রোগের সহিত পরিচয় অনুমিত হয়। প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে ডায়াবেটিসের নাম 'মধুমেহ'।

অ্যানাটমি, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগের আলোচনায় আয়ুর্বেদ ও সুশ্রুত সমৃদ্ধ। যেটুকু বলা হল তা হতে প্রাচীন ভারতীয়দের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে কিরূপ উন্নত জ্ঞান ছিল, তা সহজেই প্রতীয়মান হবে। মানবদেহ ও তার বিকার বুঝবার চেষ্টায় বৈদিক হিন্দুগণ তিনহাজার বৎসর পূর্বে যেরূপ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অতি অল্প দেশেই দেখা যায়।

আয়ুর্বেদোত্তর কালে হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে নূতন জিনিসটি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা সহজ রসায়ন শাস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্বেদের এক অনুষঙ্গ হিসাবেই রসায়নের উদ্ভব। এই বিদ্যায় হিন্দুদের আশ্চর্য তৎপরতা ও স্বকীয়তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে রসায়নকে মিলন ঘটাবার বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় বৈদ্যরা এই অভিহিত মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাতে সমগ্র চিকিৎসাবিদ্যা এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করে, রোগ নিরাময়ে অপূর্ব ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রাপ্ত হয়। ইহা বড় কম শ্লাঘার কথা নয়। নাগার্জুন, বাঘভট্ট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্ত, ডহ্লন, শাঙ্গধর প্রমুখ আয়ুর্বেদোত্তর কালের দিক্‌পালগণ একদিকে যেমন সুচিকিৎসক ছিলেন, অন্যদিকে এদের হাতেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন হিন্দু রসায়ন। রোগ, শোক, জরা-জর্জ্জর মানুষের দুঃখে গভীর সমবেদনা এবং এই দুঃখ হতে মানুষকে মুক্ত করবার অটল সংকল্প হতে বুদ্ধ যে প্রজ্ঞালাভ ও যে মানবতার বাণী প্রচার করেন, তাই সর্বকালে ও সর্বদেশে চিকিৎসার মহান আদর্শ। বুদ্ধের 'চত্বারি আর্য সত্যানি' বা চারি মহাসত্য হল ঃ ১) দুঃখ আছে, ২) দুঃখের কারণ আছে, ৩) দুঃখের নিরোধ এবং ৪) এই দুঃখ নিরোধের পথও আছে। এই চারি মহাসত্য হিন্দু চিকিৎসকেরও প্রধান অবলম্বন। চিকিৎসা গ্রহণ করবার পূর্বে চিকিৎসককে প্রথমেই স্থির করতে হয়, রোগী সত্যই অসুস্থ না তার ব্যাধি কল্পিত, ব্যাধি সত্য হলে এর স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য। কারণ নির্ণীত হলে ব্যধির উপশম ও আরোগ্য সম্ভব কিনা চিকিৎসককে তা বিচার করতে হবে। যদি সম্ভবপর হয় চিকিৎসক তখন চতুর্থ প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্রস্তুত হবেন। অর্থাৎ কিরূপ চিকিৎসা প্রণালী এই রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নির্ণয় করবেন। চিকিৎসকের আদর্শের সহিত 'চত্বারি আর্য সত্যানির' এই মিল লক্ষ্য করে বুদ্ধকে অনেক সময় সমগ্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বা 'ভেষজ গুরু' বলে অভিহিত করা হয়। এই মহামানব যে দুঃখ ক্লিষ্ট মানুষের ভৈষজ্য গুরু ছিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি?

বৌদ্ধ যুগের অনুকূল দার্শনিক প্রভাব, মানবতা ও সেবাধর্মের আদর্শ মৌর্যযুগে ভারতের সর্বত্র ছোট-বড় নানা ধরণের হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশের মধ্যে সুপরিস্ফুট। চরক ও সুশ্রুতের যুগে এদেশে হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়, একেবারে ছিল না, তা অবশ্য বলা চলে না। রোগীর বাসের উপযোগী গৃহাদি কিরূপ ধরণের ও কিভাবে নির্মিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্থপতির

উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ আছে। প্রসূতি-ভবন, শিশু চিকিৎসালয় এবং অস্ত্রোপচার গৃহের কিরূপ নক্সা হওয়া প্রয়োজন এবং এইসব গৃহে কি ধরণের সরঞ্জাম থাকা উচিত, এইসব গ্রন্থে তারও অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই চিকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন করে হিন্দুদের রাসায়নিক সংক্রান্ত জ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। দুইটি পৃথক সূত্র হতে রসায়নের উদ্ভব। ১) মৃৎশিল্প, কাচ শিল্প, ধাতুশিল্প সংক্রান্ত কারিগরি বিদ্যা। ২। চিকিৎসাবিদ্যা। ভারতবর্ষে দুই বিদ্যারই অনুশীলন সুপ্রাচীন; সেই কারণে রসায়নের ইতিহাসও সুপ্রাচীনত্ব দাবী করতে পারে, মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার যে নিপুণ মৃৎশিল্পীরা নানা বর্ণের অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎপাত্র গড়েছিলেন, যারা চীনামাটি বা ফেইয়াঁসের পাত্র গড়তে অদ্বিতীয় ছিল, যে ধাতুশিল্পীদের গড়া অজস্র ধাতব দ্রব্য বর্তমানকালে প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। বলতে গেলে তারাই ভারতের প্রাচীনতম রাসায়নিক। তারপর হল আয়ুর্বেদের যুগ। সেই যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে একান্ত অনিবার্য কারণেই রসায়ণশাস্ত্র আত্মপ্রকাশ করল। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদের প্রয়োজনেই রসায়ন এবং এই শাস্ত্রের অনুষঙ্গ হিসাবেই আমরা রসায়নের উন্নতি লক্ষ্য করি। রসায়ন শব্দটিও অথর্ববেদোক্ত 'অয়য্যাণি' শব্দ হতে উদ্ভূত। 'অয়য্যাণি' শব্দের অর্থ দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্যলাভের উপায়।

চরক ও সুশ্রুত-সংহিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, টিন ও লৌহ এই ছয় ধাতু, কয়েক প্রকার লবণ, ক্ষার প্রস্তুতবিধি, সন্ধিত পানীয় (fermented drink) বা আসব এবং কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান সুপরিস্ফুট।

সপ্তম হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাগ্‌ভট্ট, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্ত প্রমুখ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ ধাতু ও খনিজের রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা যখন নূতন নূতন ধাতব যৌগিক আবিষ্কার করেছিলেন, বিশেষতঃ ঔষধ হিসাবে পারদ ও পারদঘটিত দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে মূল্যবান জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, তখন এক বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকরাও রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতীয় কিমিয়া প্রধানতঃ এই তন্ত্র সাধকদের সৃষ্টি। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের অবনতির যুগে তান্ত্রিকদের নানা ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং সমগ্র মধ্যযুগে ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে তা প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। সহজ মোক্ষ ও ধর্ম সাধনার নামে তান্ত্রিকদের নানারূপ কুসংস্কারকে প্রশয়দান, যাদুবিদ্যা ও ভোজবাজিতে বিশ্বাস, উদ্ভট, অশ্লীল ও নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপের আধিক্য ইত্যাদি ব্যাপারে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এযুগে আমাদের মন বিরূপ হয়ে উঠলেও এই উদ্ভট ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই কিমিয়ার চর্চা ও উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ এই যে, সুস্থ, নীরোগ ও দীর্ঘজীবন ছাড়া দুরূহ তন্ত্র সাধনার ক্লেশ ও কৃচ্ছ সহ্য করা সম্ভবপর ছিল না। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে দেহকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও নীরোগ রাখবার উপায় আয়ত্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তাই স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বিবিধ দ্রব্য সেবনে কিরূপে অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করা যায় তা আপনা হতে তান্ত্রিকদের অন্যতম গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই কার্যে পারদ ও পারদের আশ্চর্য গুণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব তান্ত্রিকদের প্রাপ্য। কালক্রমে পারদের মধ্যেই যে অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায় অন্তর্নিহিত এ বিশ্বাস তান্ত্রিকদের দৃঢ় হয় এবং তাদের অধিকাংশ রাসায়নিক গবেষণা পারদকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়। তান্ত্রিক কিমিয়ায় 'রস' শব্দের অর্থ পারদ। 'রসায়ন' পারদ বিজ্ঞান। তান্ত্রিক কিমিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হলেন 'লোহাশাস্ত্র', 'রসরত্নাকর', 'কক্ষপুটতন্ত্র', 'আরোগ্য মঞ্জরী' প্রভৃতি প্রণেতা গুর্জরের রাসায়নিক নাগার্জুন। মধ্যযুগে ভারতীয় তান্ত্রিক কিমিয়ার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল — গোবিন্দভাগবতের 'রসহৃদয়' (১১ শতাব্দী), রসার্ণব (১২শ শতাব্দী), সোমদেবের 'রসেন্দ্রচূড়ামণি' (১২শ কি ১৩ শ শতাব্দী), যশোধরের 'রসপ্রকাশ সুধাকর' (১৩শ শতাব্দী), 'রসকল্প' (১৩শ শতাব্দী) ও বিষ্ণুদেবের 'রসরাজলক্ষ্মী' (১৪শ শতাব্দী)। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে তান্ত্রিক ধর্ম ও শিবপূজার বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। 'সিওর' (সংস্কৃত 'সিদ্ধ') নামে এক শ্রেণীর তামিল তান্ত্রিকদের রচিত কাব্যগ্রন্থে কিমিয়া সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তান্ত্রিক কিমিয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল 'কাঞ্জুর' ও 'তাঞ্জুর' নামে দুই তিব্বতী বিশ্বকোষ। তিন শতাধিক বৃহৎ খণ্ডে বিশ্বকোষদ্বয় সম্পূর্ণ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহাত্মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন — কাল ফির মিলেঙ্গে। সিংহাসন থেকে উঠে 'শিবমস্তু' বলে ঢুকে গেলেন মঠবাড়ীর অন্দরে। আমরা ও আমাদের পাশে বসা আরো সন্ন্যাসীরা সকলেই তাঁর

চলার পথ অনুসরণ করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা নিজেদের কুঠিয়াতে ফিরে এসে ভোজন পর্ব সমাধা করলাম। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে মাহাত্মার আজকের ঘটনাগুলি মনে মনে স্মরণ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে উঠে বসে মহাত্মার সকল আলোচনা ডায়েরীতে টুকে নিলাম। সন্ধ্যার মুখে গরু-বাছুরের গলায় বাঁধা ঘন্টাধ্বনি শুনে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বাহিরে দাঁড়িয়ে মা নর্মদাকে দর্শন করলাম, প্রণাম করলাম। চারিদিকে অপূর্ব শোভা, আকাশের নীল আকাশ যেন সমগ্র পর্বত জুড়ে নীল বনানীর সঙ্গে কোলাকুলি করছে। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নর্মদাতে স্নান ও পূজা সেরে এসে আমরা মঠবাড়ীর ভিতরের হলঘরে বিশোকানন্দজীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই তিনি কাঠের সিংহাসনে এসে বসলেন। কেউ কোন কথা বলছেন না, সবাই করজোড়ে সসম্ভ্রমে বসে আছেন, তাঁদের মুখে চোখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। সবাই যেন তাঁর দর্শনে কৃতার্থ। কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — পরিক্রমাবাসীয়োঁকো দর্শনমে বৃহৎ আনন্দ হোতি হৈ। যিস্‌কা উপর মাতাজীকো কৃপা হোতী হ্যায়, কেবল ওহি মাতাজীকো পরকরমা কর্ সকতি হ্যায়। লেকিন ইহ হামারা ভী কর্তব্য হ্যায় — আপলোগোকে পাশ কুছ গুহ্য তত্ত্বকা উপর রোশনী ডালনা। প্রসন্ন মেজাজে মহাত্মা বলতে শুরু করলেন।

আমাদের অতুলনীয় সম্পদ নিগূঢ় বৈদিক তত্ত্ব ও সাধনা পুরাণকারদের কল্পনার ফানুসে আকাশে উড়ে অবশেষে বিচিত্র রং রূপ ও রসে কুসুমিত রসায়িত হয়ে অসার বাষ্পে পরিণত হয়েছে। মহা মহা তপস্বীর জীবনব্যাপী সার পদার্থ কিছু উর্বর মস্তিষ্কের পরিকল্পনায় কালের গর্ভে লীন হতে বসেছে! কল্পনার ফেনিল উচ্ছ্বাসে অজ্ঞদের শ্রুতি সুখকর রূপকথায় পরিণত হয়েছে সার তত্ত্ব। অজ্ঞরাও আবার সেই কাহিনীকে কুসুমিত পল্লবিত করে নিজ নিজ মনমত ধারণা সৃষ্টি করে মনঃকল্পিত রস ও ভাবের জগতে নেশাগ্রস্তের মত বুঁদ হয়ে রয়েছে। যেমন ধরুন, পুরাণকাহিনীতে এমন কি রামায়ণ মহাভারতেও দেখা যায় কোন রাজা, তিনি মানব-রাজাই হোন অপর দানব-রাজাই হোন, তাঁদের রাজত্বকালে বা তপস্যার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে পুরাণকাররা তাঁদের সময় ও কালকে সব সময়েই সহস্রগুণিতকে প্রকাশ করতে ভালবাসতেন। যেমন, দশরথ নাকি ৮০০০০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন, রাবণ ৬০০০০ বৎসর তপস্যা করেছিলেন। মহর্ষি ভৃগু ১০০০০ বৎসর তপস্যা করে মহাসিদ্ধ হয়েছিলেন। এর প্রকৃত অর্থ দশরথের মৃত্যু ৮০ বৎসর বয়সে। রাবণ ৬০ বৎসর ও ভৃগুমুনি মাত্র ১০ বৎসর সাধনা করে আপন আপন আকাঙ্খা অনুসারে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কোথায় ৮০ বৎসর কোথায় ৮০০০০ বৎসর। কোথায় ৬০, আর কোথায় ৬০০০০! কোথায় ১০ বৎসর আর কোথায় বা ১০ হাজার বৎসর! একেই বলে গগনচারী কল্পনার ফানুস! মূলে হয়ত কোন গভীর তত্ত্বকেই সাধারণের বোধগম্য করতে গিয়ে পুরাণকাররা তাকে রূপকের মোড়কে ভরে সহজ ও সহজতর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হায়! ফেনাতে ফেনাতে মূল বস্তু কখন যে তাঁদের অজান্তেই অতলতলে তলিয়ে গেছে তার সন্ধান পাওয়া ভার।

আচ্ছা, এতে কি শুধু পুরাণকারদেরই দোষ? তাঁরা নয়ত কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা পুরাবৃত্তকে আরব্যোপন্যাসে পরিণত করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ, মুষ্ঠিমেয় পুরাণকার তথা গল্প লিখিয়েদের বাইরে যে বিপুল বিশাল জনসাধারণ, সেখানে যখন দেখি ধর্মের দোহাই দিয়ে কাহিনীর প্রতিপাদ্য বস্তুকেই দেবতা বানিয়ে পূজা উৎসবে মেতে উঠে এক ভয় ভক্তি অশ্রুজলের উপচার সাজিয়ে সেই সব কাল্পনিক দেবতার পূজাকেই অবশ্য করণীয় ও পালনীয় প্রথা হিসাবে বংশ পরম্পরায় উত্তরপুরুষদের মধ্যেও তা প্রচলন করে যান, তখন তাঁদের কি এতে কোন দোষ নেই? ঔপন্যাসিক গল্প লেখেন, কিন্তু সেই গল্পকে কি কেউ বাস্তব বলে মনে করে? কিন্তু ধর্মীয় উপন্যাস অর্থাৎ পুরাণের বেলা? তার প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্বাস করাই যেন ধর্ম! ঋষি-সেবিত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চেতনা ও বিজ্ঞান চেতনাকে উপেক্ষা করে এই দেশের জনসাধারণ যে কিছু অভিসন্ধিপরায়ণ বামুন পুরুত বা পুরাণকারদের ভাষা ও ভাষ্যমত মূল সত্যকেই ধামাচাপা দিয়েছে — সেই তথাকথিত ধর্মভীরুদের কি কোন অপরাধ নাই? যারা সাংসারিক যেকোন ব্যাপারেই পরম পণ্ডিত ও চরম হিসাবী তাদের এতখানি চিন্তার দৈন্য কেন?

আমাদের দেশের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী ঋষিদের মহত্তম তত্ত্বানুভূতি ছাড়াও তাঁদের বিজ্ঞান চেতনাও ছিল বিস্ময়কর। বিষ্ণু যে সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তা জানলেও তাঁদের দৃষ্টিতে অর্থাৎ

বিজ্ঞান দৃষ্টিতে তাঁরা বুঝেছিলেন বিষ্ণু-বায়ু, ব্যোম ও জৈবিক তাড়িতের (বিদ্যুৎ শক্তির) দেবতা; ত্বষ্টা-তাপের অধিষ্ঠাতা, রজোগুণে রক্তবর্ণ প্রজাপতি — আর্ত্তব বা স্ত্রী বীর্যের প্রভু ; সূর্য — সর্বজীবে জীবনীশক্তির সঞ্চার করেন — তিনি পুষ্টিকারক, তাই তিনি 'পুষণ'। এই ব্রহ্মাণ্ড ওঁকার বা আদিম বিস্ফোরণের প্রসব। এই রকম জড়জগতের ঐষিকী, কৌষিকী, অপসর্পিনী শক্তি, আধ্যাত্মিক জগতের অনুরাগ বিরাগ সহৃদয়তা এবং দেহজগতের বায়ু-পিত্ত-কফ-সকল শক্তিকেই — সেই ভূ-ভুর্ব-স্ব-বসুর উপাসকগণ দেবতার সনন্দ প্রদান করেছিলেন। জীবন্ত সোমবিন্দুর অপূর্ব উচ্ছ্বাস দেখে, তপোবনের পর্ণকুটীর বাসিনী, মঙ্গল-দুকূল-ধারিণী আর্যবধূ — যেদিন শঙ্খনাদে সমগ্র আর্য উপনিবেশ কম্পিত করেছিলেন জগতে, সেইদিন রসায়ণে শাস্ত্রের জাতোৎসব সম্পন্ন হয়েছিল বলে আমি মনে করি।

বেদের যজ্ঞবহুল কর্মকাণ্ড, ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বাস্পর্শী গভীরতা, দর্শনের অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধান — হিন্দুর যা কিছু সর্বস্ব — সমস্ত অধিকারে পরিপূর্ণ। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শ্রমে আলস্যে, স্বাস্থ্যে রোগে দেবতাই হিন্দুর অবলম্বন। বিশুদ্ধ বায়ু , বিশুদ্ধ জল , বিশুদ্ধ সূর্যালোক — মর্ত্যে অমৃতের সহোদর; পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান এখন এই স্বাস্থ্যতত্ত্বের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করে মানুষকে অপমৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করছে; কিন্তু ৫ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের ভস্মধূসর পিঙ্গল কেশ ঋষি, জলবায়ু ও তাপকে দেবতা ভেবে যে আবাহনী ঋক্ উচ্চারণ করেছিলেন, এখনও নর্মদার কূলে কূলে সেই অপহিষ্ঠোনি' মহামন্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের যে অবশ্য করণীয় সান্ধ্যবিধি, আসলে ঐ স্বাস্থ্যতত্ত্বেরই মূল বার্ত্তিক। দেবভূমি ভারতের সর্বত্রই — দেবতার লীলা। ভারত কর্মভূমি হয়েও দেবভূমি। এখানের মাটির গুণে, মানসিকতার বিচিত্র প্রভাবে, স্মার্ত্ত পণ্ডিতকুল এবং পুরাণকারদের মহিমায় বেদের তেত্রিশ জন দেবতা তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হয়েছে; এই দেবতার দেশে জন্মেছি বলে আমরা নিজেরাই কত মানুষকে দেবতা করে তুলেছি। যেখানে দেবভাষা সংস্কৃতে রচিত কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা আছে, সে সব মন্ত্র বা মন্ত্রপ্রতিপাদিত তত্ত্বকে দেবতা আরাধনার মন্ত্র বানিয়ে তা নিত্যপূজার প্রকরণে পরিণত করে তুলেছি। এ বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের চেয়ে পুরাণকার ও তথাকথিত শাস্ত্রকারদের কল্পনা যে কত স্বেচ্ছাবিহারী ও গগনচারী, তা ভাবলে অবাক হব, না দুঃখ করবো — ভেবে পাই না। বৈদিক তত্ত্ব বা বিজ্ঞানতত্ত্বকে বিকৃত করা, কিংবা নূতন নূতন সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে ঋষিদের মূলগ্রন্থে তা প্রক্ষিপ্ত করায় ঐ সব কল্পনাপ্রবণ কাব্যকারদের জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। পরস্পর সামঞ্জস্যবিহীন ঐ সব পৌরাণিক লীলা খেলা এবং Interpolation এর ঘনঘটা, রুমালের বিড়াল ব্যাখ্যার অভিনব ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে আছে দেশের সর্বত্র। এখানে এই বিশেষ আলোচনাকালে হিন্দুর জীবন্ত বিজ্ঞান, চরক সুশ্রুত ধনন্তরী আদি ঋষিকল্প বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিভাবে শাস্ত্রকার পুরাণকার ও অন্ধবিশ্বাসী ধর্মভীরু জনসাধারণ — এই ত্রহ্যস্পর্শ যোগে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিভাবে তা ভয় ও ভ্রমের বিড়ম্বনায় সাতনকলে আসল খাস্তা দশা প্রাপ্ত হয়েছে — তার কিছু কিছু রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে চাই।

**যমের বাহন মহিষ ঃ** যমের বাহন মহিষ। যমের নামে সবাই থরহরি কম্পমান। মৃত্যুর দেবতা যম, যমদূতরা ভীষণ ভয়াল মূর্ত্তি ধরে মানুষের মৃত্যুকালে আসে, যমলোকে নিয়ে যায়। পুরাণকথাতে যম ও যমদূতের ভয়প্রদ বিষয়ও তো আছেই, শংকরাচার্যও তাঁর এক স্তোত্রে মহিষগলঘন্টানিনাদং শুনতে পাওয়ার বর্ণনা দিয়ে মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেছেন। রক্ষা কর মা রক্ষা কর — ক্ষন্তব্যোমেপরাধং প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে। এইসব কারণে মানুষের মনে যম সম্বন্ধে এক বীভৎস ধারণা দানা বেঁধে আছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল অন্ততঃ বেদ বলেছেন, যম অর্থে বায়ু। আয়ুর্বেদে শাস্ত্রানুসারে 'যম' শব্দটি বুঝতে গেলে আমরা দেখতে পাই 'যম' একটি রোগের নাম। 'যম' ত্রয়োদশ সন্নিপাতের অন্যতম। তার লক্ষণ,

হৃদয়ং দহ্যতে চাস্য যকৃৎ প্লীহান্ত্র ফুসফুসাঃ।
পচ্যতেত্যের্থ মূর্দ্ধাধিঃ পূয়ঃ শোণিত নির্গমঃ।।
শীর্ণ দনুশ্চ মৃত্যুশ্চ তত্রাপ্যেতদ্ বিশেষতঃ।
ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽহয়ং যমো নাম্না প্রকীর্ত্তিতঃ।। (বৈদ্যাঞ্জন)

অর্থাৎ যে রোগে হৃদয়ে প্রবল দাহ উপস্থিত হয়, যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র ও ফুস্‌ফুস পেকে উঠে, ঊর্ধ ও অধোদিক

দিয়ে পূঁজ ও রক্ত নির্গত হতে থাকে, দন্তরাজি শীর্ণ হয়ে পড়ে সেই নিদারুণ সন্নিপাত রোগগণ বৈদ্যগণ 'যম' নামে অভিহিত করেন। বলাবাহুল্য, এ রোগে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এ রোগের কোন নিশ্চিত নিরাময়কারী ঔষধের উল্লেখ নাই। কেবল রোগীর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য মহিষ-পিত্তের, অঞ্জনের ব্যবস্থা আছে — অঞ্জনং, স্যাৎ প্রবোধায় মহিষ পিত্ত সম্ভবং। আয়ুর্বেদের বিখ্যাত ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আর এক প্রকার সান্নিপাতিক জ্বরের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, তার নাম অন্তক, অন্তকের লক্ষণ —

সংপূর্যতে শরীরং গ্রন্থিভি রণ্ডিতঃ স্তথোদরং মরুতা।
শ্বাসাতুরস্য সততং বিচেতন স্যান্ত কার্ত্তস্য।

যে সন্নিপাত জ্বরে রোগীর সমস্ত দেহে গ্রন্থির ন্যায় জন্মে, উদর বায়ুতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং রোগী অচেতন অবস্থায় ঘনঘন শ্বাস ফেলতে থাকে তাকে অন্তক বলে। সকলেই জানেন অন্তক যমেরই একটি বিশেষণ, পর্যায়বাচী শব্দ। এই অন্তকের চিকিৎসা বিধি —

শোভাঞ্জন বীজং কৃষ্ণা রসং গন্ধং মনঃশিলা।
মাহিষ নবনীতেন মূর্দ্ধি লিম্পেৎ মুহুর্মুহু।

মহিষ-দুগ্ধ জাত মাখনের সঙ্গে সজিনার বীজ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও মনছালচূর্ণ রোগীর মস্তকে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে 'যম' নামক সন্নিপাত্র রোগের প্রশমনে মহিষপিত্ত এবং অন্তক নামক দ্বিতীয় প্রকারের সন্নিপাত রোগে মহিষদুগ্ধজাত মাখন প্রতিষেধক। এইটুকুই পুরাণকারদের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা যমকে মৃত্যুর দেবতা এবং মহিষকে কল্পনাপ্রবণ ও লৌকিক শাস্ত্রকারদের বাহন করে যথাবিধি মন্ত্রাদি ও কাহিনী রচনা করে অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছেন। রোগ নিরাময়ের বিজ্ঞান পরিণত হয়েছে অজ্ঞান সংস্কারে!

**ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা রহস্য ঃ** বেদে ইন্দ্রের অর্থ পরমাত্মা হলেও পুরাণে ইন্দ্র দেবতাদের রাজা বলে চিত্রিত। রাজা যখন তখন তাঁর একটি বাহনে চলবে কেন? পুরাণকাররা তাঁর জন্য দুটি বাহনের ব্যবস্থা করেছেন — ঐরাবত নামক হস্তী এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব। তাঁদের কল্পনা বল্গাহীন অশ্বের মত যে দৌড়েছে তার উৎসও আয়ুর্বেদে। কবিরাজী মতে মানুষের কেশমূলে মাখনের মত একপ্রকার কোমল পদার্থ থাকে, তার নাম 'ইন্দ্র'। অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে ঐ 'ইন্দ্র' নামক পদার্থ শুকিয়ে গেলে মাথার চুল উঠতে থাকে। এইজন্য এই টাকরোগের সংস্কৃত নাম — ইন্দ্ররোগ বা ইন্দ্রলুপ্ত। হস্তীর দন্ত এবং মাংস এবং ঘোটকের লালা — ঐ চুল উঠা বা ইন্দ্ররোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

গজমাংসং বচা দ্রাক্ষা সম্নগেভিঃ বিপাচিতং।
তৈলং অভ্যঞ্জনাৎ হন্যাৎ ইন্দ্ররোগনং সুদারুণং॥ (সারসংগ্রহ)

হস্তীর মাংস, বচ ও দ্রাক্ষার কল্ক দিয়ে তৈল পাক করে সেই তৈল মাথায় মাখলে ইন্দ্ররোগ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ চুল ওঠা রোগ নিরাময় হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

হস্তি-দন্তং মসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনং।
লোমাধি এতেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি॥

অর্থাৎ হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করে প্রলেপ দিলে নূতন চুল মাথায় গজিয়ে ওঠে।

এছাড়াও, তুরঙ্গ লালয়া পিষ্টং জাতিফলং প্রাযাজয়েৎ — ইন্দ্রলুপ্ত স্থানে অর্থাৎ যেখানে চুল উঠে গেছে, সেখানে জায়ফল ঘোড়ার লালায় বেটে প্রলেপ দিলে নূতন চুল নিশ্চিত গজিয়ে উঠবে। আপনারা জানেন, হস্তীর শুদ্ধ সংস্কৃত ঐরাবত এবং ঘোটক বা ঘোড়ার শুদ্ধ শব্দ — উচ্চৈঃশ্রবা। ইন্দ্রলুপ্ত শব্দে ইন্দ্র শব্দটি পুরাণকাররা পেয়ে গেছেন। কাজেই রেখে দিন বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের কথা। তাঁকে ইন্দ্রের জন্য ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা এইদুটি নির্ধারিত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

**অগ্নির বাহন ছাগ ঃ** অগ্নিপুরাণ, পুরোহিত দর্পণ, ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি প্রভৃতি পুস্তকে অগ্নিদেবতার বাহন হিসাবে ছাগলকে নির্বাচন করে ধ্যানমন্ত্র স্তোত্র প্রভৃতি রচিত। সর্বত্র গতিশীল এবং পরম পাবক তত্ত্ব হিসাবে বৈদিক ঋষিরা পরমাত্মাকে অগ্নি নামে অভিহিত করেছেন। স্থূলে অগ্নির বিশ্বদহন ক্ষমতা আছে তা সকলেরই

জানা জানা না থাকলে জ্বলন্ত অগ্নিকে একটি আঙ্গুল স্পর্শ করেই পরখ করে দেখতে পারেন। এ হেন অগ্নির বাহন ছাগল! আয়ুর্বেদে ঋষিরা অগ্নির সঙ্গে ছাগলকে যুক্ত করেছেন এই যুক্তিতে যে অগ্নি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাধি নিরাময়ের চমৎকার ক্ষমতা ছাগলে আছে। যেমন, তাঁরা বলেছেন, ছাগলের দুধ মাখিয়ে দিলে অগ্নিদাহ জনিত জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় —

অজাক্ষীরেণে দগ্ধাঙ্গং সদাহং সুখমশ্নুতে। ক্রিয়া কৌমুদী — প্রাচীন বৈদ্যগণ আবিষ্কার করেছিলেন যে, ছাগলের রক্তও অগ্নিদগ্ধ ক্ষতরোগের মহৌষধ — অগ্নিদগ্ধ প্রণং নশ্যেচ্ছাগেরক্তানুলপনাৎ॥

আয়ুর্বেদের বহুস্থলেই আগুনের প্রতিষেধক হিসাবে ছাগলের উপকারিতার বর্ণনা আছে। আধুনিক ভয়াবহ প্লেগ রোগ নামে যা পরিচিত, তাকেই কবিরাজগণ বলতেন 'অগ্নিরোহিনী'। এই রোগের চিকিৎসায় ছাগদুগ্ধের প্রয়োগ শুনুন —

পিত্তবিসর্প বিধিনা সাধায়েৎ অগ্নিরোহিনীং।
লেপঃ কার্যঃ প্রপুন্নাদ্রৈঃ ছাগক্ষীর প্রপেষিতৈঃ॥ (আময়াবলোকঃ)

অগ্নিরোহিনী অর্থাৎ প্লেগের চিকিৎসা পিত্তজ বিসর্পের চিকিৎসার মত। এই রোগে বেদনাযুক্ত স্থানে চাকুন্দার বীজ ছাগলের দুধের সঙ্গে বেটে প্রলেপ দিতে হয়। আয়ুর্বেদের জাঠরাগ্নি বিকার শীর্ষক অধ্যায়ে তীক্ষ্মাগ্নি নামক রোগের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই রোগের অপর নাম — 'অত্যগ্নি'। এতে রোগীর পাচকাগ্নি এতদূর বেড়ে যায় যে, প্রভুত পরিমাণে গুরুপক্ব খাদ্য উদরস্থ করেও ক্ষুধার শান্তি হয় না। প্রচুর পরিমাণে ভোজন ও পরিপাক করেও রোগী দিন দিন শীর্ণকায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কবিরাজদের বিধান — ছাগক্ষীরেণ মুষলীং পিবেদত্যগ্নি শান্তায়। অর্থাৎ ছাগদুগ্ধে তালমূলী বেটে ভক্ষণ করলে ঐ ব্যাধির নিবারণ (সারসংগ্রহ) অবশ্যম্ভাবী। বিখ্যাত ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের প্রণেতা বলেছেন,

সিততণ্ডুলসিত-কমলং ছাগক্ষীরেণ পায়সং সিদ্ধং।
ভুক্তা চ তেন পুরুষো দশদিবসাৎ তুচ্ছ ভোজন ভবতি।

আতপ চাল ও শ্বেতপদ্মের কেশর সমভাগে নিয়ে ছাগদুগ্ধের পায়েস প্রস্তুত করে খেলে তীক্ষাগ্নি বা অত্যগ্নি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ১০ দিনের মধ্যেও কিছু খেতে চাইবে না।

ছাগলের দুধে যে ঘি তৈরী হয়, সেই ঘি অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধি। আজম আজ্যম করোতি অগ্নিং (ভাবপ্রকাশ)

চিতামূলের সংস্কৃত নাম — অগ্নি। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত বহু ব্যাধিতেই চিতামূল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই চিতামূল শরীরের অভ্যন্তরে ক্ষত সৃষ্টি করে, চিতামূলকে ছাগলের দুধে সিদ্ধ করে নিলে তার ক্ষত উৎপাদিকা পুষ্ট হয়। বিভিন্ন রোগের প্রতিকার হিসাবে তা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়।

ছাগদুগ্ধে বহ্নিমূলং পচেদ্ যামং প্রযত্নতঃ।
দোলাযন্ত্রেরণ শুদ্ধঃ স্যাৎ ততঃ কার্যেষু যোজয়েৎ॥

পুরাণকারদের এ সব বিজ্ঞান বুঝা বা লোককল্যাণে প্রচার করার প্রয়োজন নাই। অগ্নির বাহন হিসাবে ছাগলকে চিহ্নিত করে তার পূজাবিধি প্রচলন করাতেই তাঁদের ধর্মকার্য সমাপ্ত।

**মনসার বাহন সর্প ঃ** এইবার আসুন মা মনসার কথায়। তাঁর বাহন সাপ, কাউকে সাপে কামড়ালে মনসা পূজার ব্যবস্থা। কথায় বলে, যার নামটি বিষহরি, তার পূজাটি অগ্রে করি। মনসামঙ্গল নামক মঙ্গলকাব্যে মনসাকে না মেনে চাঁদসদাগরের দুর্দশা, তাঁর পুত্র লখিন্দরকে লোহার বাসর ঘরে মনসার ইঙ্গিতে কালনাগিনীর দংশন ও মৃত্যু, পরে সতী বেহুলা কিভাবে মনসাকে তুষ্ট করে দেবসভা থেকে মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করলেন তার রসালো কাহিনী বাঙালী মাত্রেরই মুখে মুখে। পল্লীগ্রামে দেখেছি সর্পপূজার ঘটা। কিন্তু এই মনসা নামটি এল কোথা হতে? মনসার বাহন যে সর্পরূপে চিহ্নিত হল তারই বা উৎস কি ? কিভাবে পঞ্জিকাতে মনসা পূজার জন্য একটি বিশেষ তিথি ও মান নির্দিষ্ট হল? কেনই বা মনসা পূজোর দিনে মাটিতে একটি মনসাগাছের ডাল পুঁতে তাতে কাঁচা দুধ ঢেলে পূজা করার নিয়ম? অনুসন্ধানী মন নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, এখানেও সেই একই tragedy — বিজ্ঞানের বেদীতে কুসংস্কারের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আয়ুর্বেদ মতে 'মনসা' একপ্রকার উৎকট ব্যাধি। শৈবসিদ্ধান্ততন্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানী পণ্ডিত বর্ণনা করেছেন —

জিহ্বা মৌঢ্য-শিরোদাহ-ভ্রমোন্মাদ্-অরুচি জ্বরৈঃ।
শ্বাস-হিক্কাক্ষিতাপৈশ্চ দানীয়াৎ মনসাং ভিষক্॥

যে রোগে জিহ্বার স্বাদগ্রহণ নষ্ট হয় এবং শিরোদাহ, ভ্রম, উন্মত্ততা, অরুচি, জ্বর, শ্বাস, হিক্কা ও অক্ষিতাপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় সেই সেই মারাত্মক মহারোগের নাম — 'মনসা'। মনসা রোগে রোগীর গৃহে সর্পের খোলস দ্বারা ধূপ প্রদানের ব্যবস্থা আছে —

সর্পত্বক লশুনং মূর্বা সর্ষপারিষ্ট পল্লিবৈঃ।
খ্যাতঃ মনসা জুষ্টস্য ধূপোইয়ং পর্বতাত্মজে॥

হে পার্বতী! মনসা ব্যাধির প্রতিকারের জন্য সাপের খোলস, রসোন্, মূর্বা, সরিষা ও নিমপাতার ধূপ অত্যন্ত প্রশস্ত।

এছাড়া সর্পদংশনের যত রকম ঔষধ ও ইনজেকশন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ অব্যর্থ ঔষধ — যা আমি নিজেও ২১টি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখেছি, তা হল, যে কোন মারাত্মক বিষধর সাপ কামড়াক না কেন, মনসা গাছের সরু সরু ৮৪টি শিকড় ৭টি গোলমরিচের সঙ্গে বেটে ২১টি ছোট বড়ি প্রস্তুত করে ৩ মিনিট ছাড়া ছাড়া রোগীকে সেবন করালে, আর যে ব্যাধিতেই সে পরে মরুক না কেন, সর্পদংশনে মৃত্যু অসম্ভব। মনসা গাছের শিকড়ের এই বিষঘ্ন ও জীবনদায়ী প্রয়োগ লোককে না জানিয়ে যারা মনসা পূজা এবং সর্পপূজার প্রচলন করেছে, তাদেরকে সমগ্র জাতির কাছে অপরাধী বলে আমি মনে করি। মনসাদেবী সম্বন্ধে অলীক ভয়প্রদ গল্প প্রচার করে মানুষের অনুসন্ধানী মন ও প্রাচীন গবেষক মুনিদের বিজ্ঞান সাধনাকে তারা স্তব্ধ করে দিয়েছে।

**ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল ঃ** ষষ্ঠী দেবীর উপর আমাদের কুললক্ষ্মীদের অসীম ভক্তি। ষষ্ঠীপূজোই তাঁদের অন্তঃপুরের মহামহোৎসব। ষষ্ঠীর খাতিরে হিন্দুর সংসারে বিড়ালেরও অক্ষুণ্ণ প্রভাব! সোনার চাঁদের পাত হতে মাছ চুরি করলেও বিড়ালকে প্রহার করতে মা-লক্ষ্মীদের সংস্কারে বাধে। ভয়, পাছে ষষ্ঠী দেবী ক্রুদ্ধ হন, বাছার কোন অনিষ্ট হয়। বিধবাদের কাছে বিড়ালের আদর কদর আরও বেশী। অথচ এটি বিড়ালের লালা সংক্রামক ডিপথেরিয়া রোগ উৎপন্ন করে। সোনার বাছা ডিপথেরিয়া রোগে মরুক, তবুও বিড়ালকে তাড়না করা চলবে না। কারণ, পুরোহিত তন্ত্রের কৃপায় নীলবসনা যুবতীই হোক আর পদী পিসীর মত বৃদ্ধাই হউক, তাঁদের মনে ষষ্ঠীদেবীর বিরূপতার ভয় বড় বেশী।

হিন্দু রমনী এইভাবে ষষ্ঠীকে দেবতা বলে বিশ্বাস করেন, নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠী দেবীর পূজার ব্যবস্থা, সেই দিন নাকি বিধাতা পুরুষ স্বয়ং এসে নবজাতকের ললাটে ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান। সেইজন্য পুরোহিত-ঠাকুরের নির্দেশে ষষ্ঠীপূজার উপচারের সঙ্গে কালি কলমও পবিত্র ভাবে রাখতে হয়। অথচ এই 'ষষ্ঠী' বাধক রোগের একটি নাম। বৈদ্যামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

নেত্রে হস্তে ভবেৎ জ্বালা কোনো চৈব বিশেষতঃ।
লালা সংযুক্ত রক্তঞ্চ ষষ্ঠী কা বাধকঃ স্মৃতঃ॥
মানদ্বয়ং এয়ং বাপি ঋতুহীনা ভবেৎ যদি।
কৃশাঙ্গী ষষ্ঠীদোষেণ জায়তে ফলহীনতা॥

শ্লোক দুটির অর্থ খুব স্পষ্ট। এর প্রতিষেধক হিসাবে প্রাচীন কবিরাজী শাস্ত্র ক্রিয়াকৌমুদী গ্রন্থে ব্যবস্থা আছে,

পুটদগ্ধ মার্জারর্সস্থ মেষশৃঙ্গী বচা মধু।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং শূলং বস্তি ঋতূদ্ভবং॥

অন্তর্ধূমে দগ্ধ বিড়ালের অস্থি, মেষশৃঙ্গী, বচ ও মধু সমপরিমাণে নিয়ে ঘৃতের সঙ্গে অবলেহ অর্থাৎ চেঁটে খেলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা দূর হয়।

বিড়ালস্পর্শ বাধক ব্যাধিগ্রস্তা সধবা বা বিধবা উভয়ের পক্ষে উপকারী। শিশুর পক্ষে মারাত্মক হলেও তাঁদের গর্ভাশয়ের অবরুদ্ধ আর্তব নিঃসৃত হয়ে যায়। বিড়ালের দুধ যে চেষ্টরজঃ বা যোনি ব্যাপৎ রোগের মহৌষধ, ক্লার্ক সাহেব তাঁর Dictionary of Homopathic Materia Medica নামক গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। যে সকল কারণ সন্তানোৎপত্তির অন্তরায়, সে সকল কারণ দূর করার শক্তি বিড়ালের দেহে বর্তমান।

যাঁরা Frictional Electricity পড়েছেন, বিড়ালস্পর্শের এই মহিমা তাঁরা কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না।

কোন সেই সুদূর অতীতে কবিরাজী নিদান হিসাবে বাধকরোগের নাম ষষ্ঠী এবং ঋতুঘটিত ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে বিড়ালের উপযোগিতা বিজ্ঞানী বৈদ্য আবিষ্কার করেছিলেন, সেই বিজ্ঞান রহস্য প্রচার না করে প্রতিগ্রাহী যাজক ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীকে দেবীরূপে এবং বিড়ালকে তাঁর বাহনরূপে পূজা প্রচলন করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কায়েমী স্বার্থ মিটিয়ে নিচ্ছেন।

**বায়ুর বাহন মৃগ ঃ** বায়ু বৈদিক অর্থ পরমাত্মা। কিন্তু বেদশাস্ত্রে পুরাণকাররা বায়ুকে তেত্রিশকোটির দেবতার মধ্যে এক দেবতা ধরে তাঁর বাহন হিসাবে হরিণকে নির্বাচিত করে ফেলেছেন। বায়ুপুরাণে বায়ু দেবতার কত যে কল্পিত কাহিনী প্রচারিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। অত্যন্ত দ্রুত গতির জন্য হয়ত মৃগকে বায়ুর বাহন হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। সৌভাগ্যের কথা, বায়ুদেবতার মূর্ত্তি গড়ে পূজার ব্যবস্থা আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। পুরোহিত সম্প্রদায় কেন যে হরিণের উপর বায়ুদেবতার মূর্ত্তি গড়ে সর্বজনীন পূজার ব্যবস্থা করেন নি, মাঝে মাঝে তাই ভাবি। সংস্কৃতে কিন্তু কল্পিত মন্ত্রতন্ত্র গড়ে শিববাক্য বলে চালু করলেই বায়ুদেবতা তাঁদের কিছু কিছু অর্থোপার্জনের সহায়তা করতেন। যাই হোক, বায়ুর বাহন হিসাবে হরিণ কল্পনার মধ্যেও বৈজ্ঞানিক রহস্য আছে। কিন্তু সে রহস্য ঘনিষ্ঠ বাহন সম্বন্ধ সূচিত করে না, সূচনা করে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠে জানা যায়, হরিণের বায়ুনাশক শক্তি আছে। হরিণের মাংস শৃঙ্গ ও চর্ম বাতজ ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয় — বাতঘ্নং হরিণং মাংসং — দ্রব্যগুণ। সাধু সন্ন্যাসীরা যে মৃগচর্মে উপবেশন করেন, এটিও একটি কারণ।

হরিণের শিংকে পুড়িয়ে ঘি এর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বায়ুজনিত হৃৎশূল পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগ নিরাময় হয় —

মৃগশৃঙ্গম অগ্নিদগ্ধং গব্যাদ্যম্ সমন্বিতং
পীতং হৃৎপৃষ্ঠ শূলানাং ভবেৎনাশকরং সদা।।

বায়ুকুপিত হলে শূলরোগ উৎপন্ন হয়। মৃগমাংসের স্বেদ অর্থাৎ ভাপ্ লাগালে তৎক্ষণাৎ বাতজ শূলের যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। আসল কথা এই গবেষণা লব্ধ বিজ্ঞান রহস্য জানা। হরিণের উপর বায়ুদেবতা বসে আছেন বা হরিণে চড়ে বায়ুদেবতা রাক্ষস ও দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন এইসব কবি-কল্পনার কী মূল্য?

**কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর ঃ** কার্ত্তিক হলেন ভগবান সনৎকুমার। ইনি ব্রহ্মবিদ্যার জীবন্ত বিগ্রহ। দেবর্ষি নারদ এরই কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন। উপনিষদের এই মহান তত্ত্বস্বরূপকে পুরাণকাররা শিবর্দুগার সন্তান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। শিবের স্খলিত বীর্য শরবনে পড়ে যাওয়ায় এঁর জন্ম হয় বলে পুরাণকাররা স্কন্দ পুরাণে বর্ণনা করেছেন। পুরাণকারদের শিক্ষায় অজ্ঞ জনসাধারণ জেনেছে ইনি দেবসেনাপতি এবং এঁর বাহন হল ময়ূর। হায় হায় বর্তমান যুগের হেলিকপ্টার বা শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন Mig প্রভৃতি বিমানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কি করে যে ইনি ময়ূরপাখী চড়ে দেবতাদের সৈনাপত্য করে থাকেন বা মুহূর্তে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল পরিভ্রমণ করেন, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। আমাদের বোধগম্য হোক আর না হোক, পুরোহিত মশাইরা তো তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না। তাঁরা কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজার ব্যবস্থাপত্র হিন্দু সমাজকে লিখে দিয়েছেন এবং তদনুযায়ী বহু পরিবারে বর্তমানে আবার সর্বজনীন পূজামণ্ডপে বেচারা কার্ত্তিক ঠাকুরকে জনপ্রিয় অভিনেতার নব সংস্করণ বানিয়ে জামাই জামাই রূপে পূজা করার ধূম পড়ে গেছে! এই কার্ত্তিক ঠাকুরের পৌরাণিক নাম স্কন্দ। স্কন্দ কে বা কি ? আয়ুর্বেদে আমরা পাই, স্কন্দ এক প্রকারের শিশুঘাতী রোগ। সুশ্রুত বলেছেন —

স্রস্তাঙ্গঃ ক্ষতজঃ সগন্ধিক স্তন দ্বিট্।
বক্রাস্যো হত চরণৈকঃ পক্ষ নেত্রঃ।
উদ্বিগ্নঃ স সলিলঃ চক্ষুরল্পরোদী
স্কন্দার্ত্তো ভবতি চ গাঢ় মুষ্ঠিবন্ধঃ।

অর্থাৎ ভোগে শিশুর অঙ্গসকল শিথিল হয় শরীরের স্থানে স্থানে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত জন্মে, স্তন্যপানের প্রবৃত্তি থাকে না, মুখমণ্ডল বক্রভাব ধারণ করে। একটি চোখ, একটি পা ও একটি হাত শক্তিহীন হয়ে পড়ে, বালক ব্যাকুলভাবে অল্প অল্প রোদন করতে থাকে, চক্ষু দিয়ে অনবরত জল পড়ে, হাত দৃঢ়ভাবে মুষ্ঠিবদ্ধ থাকে, তার নাম স্কন্দ রোগ। এই রোগের আর একটি সংজ্ঞা — কুমার। এরই প্রকারভেদকে গুহ নামেও অভিহিত করা

হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্যরাজ সুশ্রুত বলেছেন —

সর্দ্দি মূর্চ্ছা জ্বরঃ কম্প, শেথাদীন্ অসুখ ভৃশং
অনিচ্ছা স্তনপানেষ তথা গুহস্য লক্ষণং।

স্কন্দ, গুহ্যকুমার — এই তিনটিই কার্ত্তিকের নাম। সুশ্রুত এই রোগের প্রতিবিধানের জন্য শিশুর গৃহে ময়ূর মাংসের ধোঁয়া দিবার কথা বলেছেন। তাঁর মতে,

শিখিপুচ্ছং প্রিয়ঙ্গু চ শৃঙ্গী মরিচ মাক্ষিকৈঃ।
ধূপো স্কন্দ গ্রহান্ হন্তি এতন্মন্ত্রেণ মন্ত্রিতঃ।

ময়ূর পুচ্ছের ভস্ম, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, মাক্ষিক প্রভৃতির সঙ্গে মেখে শিশুকে খাওয়ালে শিশু স্কন্দ গুহ বা কুমার রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা পায়। স্কন্দ নাম, তৎসহ ময়ূর এই উভয়কে মিলিয়ে মূর্তি পূজকরা ময়ূর বাহন কার্ত্তিকের কল্পনা করেছে।

**শীতলার বাহন গর্দভ** ঃ এইবার যে দেবীর নাম শুনলেই সবাই কম্পিত কলেবর হয়ে যাবেন, আপনাদের মধ্যেই হয়ত কেউ কেউ মনে মনে দণ্ডবৎ জানাবেন, বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে যাঁর অখণ্ড প্রভাব, সেই ভীষণাতি ভীষণা শীতলাদেবী এবং তাঁর গর্দভ বাহনের রহস্য ব্যক্ত করে এই প্রসঙ্গে ইতি টানতে চাই। গ্রামে গঞ্জে বা শহরে যাতায়াত করার পথে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শীতলাদেবীর মন্দিরে ভক্তবিটেলদের আর্ত্তি, মা মা ডাকে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখর। পথচারীরা যাতায়াতের পথে ভয়ে ভয়ে ভক্তি নিবেদন করে চলেছে। শীতলার কোপে পড়লে বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয়, জনপদ শ্মশান হয়ে যায়। শীতলার পূজা ও তাঁর তুষ্টি বিধান করলে তবেই সব রক্ষা। শীতলামঙ্গলে শীতলার প্রচণ্ড প্রভাব ও মহিমার কথা গ্রাম্য কবি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিভাবে বিরাট রাজার কাছ হতে, বসন্তরোগে তাঁর পুত্রদের মৃত্যু ঘটিয়ে পূজা আদায় করেছিলেন, সে কাহিনী বোধহয় অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। বসন্তরোগ দেখা দিলেই শীতলা পূজার ধূম পড়ে যায়। মঙ্গলকাব্যের কবি বিরাট রাজার গানটি গেয়েছেন মহাভারত হতে আর শীতলা নামটি ? আর তার বাহন হিসাবে গর্দভটি ? এই দুটি কোনমতে শুনে নিয়েছেন কোন প্রাজ্ঞ কবিরাজের বৈঠকে। ব্যস্, এইটুকুই যথেষ্ট, নিজের কল্পনা শক্তির অভাব নাই, সেই কল্পনা প্রসাদাৎ তিনি রচনা করেছেন মা শীতলার নির্দয় লীলা খেলার বর্ণনা, সমাজের তথাকথিত হিতকারী পুরোহিত সম্প্রদায় সম্মার্জনা অর্থাৎ ঝাঁটাধারিণী, গর্দভ বাহিনীর শীতলা পূজার মন্ত্র তন্ত্র রচনা করে স্বার্থসিদ্ধির মহৎকাজে আত্মনিয়োগ করেছেন! একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। এই শীতলা কে ? শীতলা নামটির উৎস কি ? মসূর্যেব হি শীতলা — ভাবপ্রকাশের মতে বসন্তরোগের অপর নাম শীতলা? সম্ভবতঃ বসন্তরোগী শীতল উপচার ভালবাসে তাই বসন্তরোগের নামকরণ করছে — শীতলা। গাধার দুধ শীতলা রোগের প্রধান প্রতিষেধক। ইংরাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানীও একথা স্বীকার করেন। প্রাচীন বৈদ্যরাজ গয়দাসের মতে — আদৌ যে পিবন্তি খরনাদঃ পয়ঃ তেষাং ন ভবন্তি কদাচিৎ অপি ইহ দেহে শীতলিকা বিকারাঃ। অর্থাৎ শীতলারোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর হওয়া মাত্র যারা গর্দভদুগ্ধ পান করে তাদের দেহে কখনও স্ফোটক বের হয় না। যদি বা স্ফোটক বের হয় সে অবস্থায়ও গর্দভ দুগ্ধ উপকারী। রাসভস্য পয়ঃ পীতং শীতলাজ্বর নাশনং। অর্থাৎ বসন্তরোগী গর্দভদুগ্ধ পান করলে তার জ্বর নষ্ট হয়।

শীতলা রোগ হতে এইভাবে শীতলা নামের উৎপত্তি, শীতলার বাহন হিসাবে গর্দভকে জুড়ে দেওয়ার মূলেও এই রহস্য।

অজ্ঞতার পাষাণ ফলকে বিজ্ঞান রহস্য কিভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে — তারই একটি রেখাচিত্র এঁকে রেখে গেলাম ভবিষ্যৎ সত্যসন্ধানীদের জন্য। অলম্ ইতি।

তৃতীয়দিনের বৈঠকের পর মহাত্মা উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন — আমি জানি তোমরা পুনরায় পথে বেড়িয়ে পড়বার জন্য অস্থির হয়েছ। কাল সোমবার, শুভ দিন, শিবের বার। তোমরা যাত্রা করতে পার। আশীর্বাদ করছি তোমরা যেন মা নর্মদার নিত্য সান্নিধ্য লাভ করতে পার। হর নর্মদে। তিনি ধীর লয়ে মঠবাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে আমরা সকলেই নর্মদার ঘাটে সান্ধ্যক্রিয়া করতে গেলাম। অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিমাভ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে নিকটস্থ পাহাড় ও গাছপালায়। বহমানা নর্মদায় সেই রশ্মিচ্ছটা পড়ে এক

অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। ইচ্ছে ছিল এই অপরূপ দৃশ্য প্রাণভরে দেখি কিন্তু জংলী জানোয়ারদের ভয়ে বিজ্ঞানানন্দজীর তাড়ায় আমরা আমাদের কুঠীয়াতে ফিরে এলাম।

মহাদেবানন্দ বললেন — কাল পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। অমরকন্টকে পৌঁছাতে এখনও দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হবে। অন্ততঃ আর একটা দিন থেকে গেলে মহাত্মার কাছ থেকে হিন্দুদের রাশিচক্র, গ্রহ-সংক্রান্ত জ্ঞান, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করা যেত।

পরদিন সকালে উঠে বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে নর্মদায় স্নান ও পূজা করে এলাম। বিশোকানন্দজীর মূল্যবান আলোচনা থেকে আমি অনেক কিছু জেনেছি ও শিখেছি। এই স্থানের আশ্রমিক পরিবেশ সত্যই অতুলনীয়। আমি তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে হাতে দণ্ড, কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে এলাম। একে একে সঙ্গীরাও উপস্থিত হলেন। একটু পরেই বিশোকানন্দজী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে মন আনন্দে ভরে উঠল। বললেন — কাল পর্যন্ত যা আলোচনা করেছিলাম, আশা করি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ। হিন্দুদের রাশিচক্র, গ্রহ-সংক্রান্ত জ্ঞান, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন বিষয়ে আরোও কিছু কথা তোমাদের বলার আছে। সেগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আমার মুখ থেকে শুনে নাও।

তিনি শুরু করলেন — ঋগ্বেদে আকাশ-পথে সূর্যের আপাত গতিকে বারটি পাকযুক্ত চাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার ৩৬০টি দাঁত আছে। টীকাকার সায়নের মতে, চাকার বারটি পাক রাশিচক্রের বারটি প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের দ্বাদশ আদিত্য রবিমার্গের বা ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) দ্বাদশ বিভক্তি বা দ্বাদশ রাশিকেই নির্দেশ করছে।

প্রাচীন ব্যবিলনীয় ও মিশরীয় জ্যোতির্বিদেরাও সূর্যের আপাত গতিপথকে বিশিষ্ট তারা ও তারামণ্ডলের দ্বারা চিহ্নিত করে রাশিচক্র রচনা করতেন, বার মাস বছরকে ভাগ করবার জন্য রাশিচক্রকেও তারা বার ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রাচীন চৈনিক জ্যোতিষেও রাশিচক্রের উল্লেখ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ব্যবিলনীয়রা রাশিচক্রের আবিষ্কারক, কিন্তু এই আবিষ্কারের অগ্রাধীকার নির্ণয় করা সুকঠিন। সূর্যসিদ্ধান্তের অনুবাদক মিঃ ই. বার্গেস্ বলেন, রাশিচক্র সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান সেই সময়ের যে কোন প্রাচীন জাতি অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। অন্যান্য জাতির অন্ততঃ কয়েকশত বৎসর পূর্বে ভারতীয়রা রাশিচক্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছিল।

সূর্যের আপাত গতি অনুসরণের জন্য রাশিচক্রও তার বারটি বিভাগের পরিকল্পনা এবং চন্দ্রের আপাত গতি নির্ধারণের জন্যও অতি প্রাচীনকাল হতে জ্যোতির্বিদরা রাশিচক্রের ও ক্রান্তিবৃত্তের সাহায্য নিতেন। খগোলে (celestial sphere) সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমণ পথ প্রায় একই বৃত্ত; সুতরাং ক্রান্তিবৃত্তের অর্থাৎ রাশিচক্রের অন্তর্গত নক্ষত্রদের সাহায্যে আকাশ পথে চন্দ্রের গতি অতি সহজে নির্ণয় করা যায়। বৈদিক হিন্দুরা রাশিচক্রকে ২৭টি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাহায্যে ২৭ ভাগে ভাগ করেছিলেন। এই ২৭টি নক্ষত্র যথাক্রমে — অশ্বিনী, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরবর্ত্তী জ্যোতিষীর গ্রন্থে সেই নামগুলি উল্লিখিত হয়েছে। চন্দ্রচক্র নির্দেশের জন্য অভিজিৎ নক্ষত্রেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়, চন্দ্রের পর্য্যায়কাল আরও সঠিকভাবে চিহ্নিত করবার উদ্দেশ্যে এই নক্ষত্রের অবতারণা করা হয়েছিল।

হিন্দুরা খগোলে ক্রান্তিবৃত্ত পথে ও তার অদূরে উত্তরে ও দক্ষিণে যেসব উজ্জল নক্ষত্র দেখা যায় তাদের প্রতি এবং সেই সঙ্গে অবশ্য উত্তর দিগদর্শী ধ্রুব নক্ষত্র ও আশেপাশের নক্ষত্রগুলির প্রতি যুগের পর যুগ হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। আকাশে সূর্য, চন্দ্র, অথবা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহদের প্রত্যেকের গতি মোটামুটিভাবে রবিমার্গকেই অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং রবিমার্গের অন্তর্গত নক্ষত্রের অবস্থান একবার ভালভাবে জানা হয়ে গেলে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গতি পর্যবেক্ষণ করবার আর কোন অসুবিধা হয় না। কাল নির্ণয় ও পঞ্জিকা প্রণয়ন এবং গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ হতে মানুষের ভাগ্যগণনা ছিল হিন্দু জ্যোতিষের প্রধান লক্ষ্য। রাশিচক্র সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই দুই ব্যাপারেই হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা ও জ্যোতিষীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

বৈদিকযুগে পূর্ণিমার পরের দিন হতে এক একটি চান্দ্রমাসের সূচনা করা হত। যে নক্ষত্রের সাধারণতঃ পূর্ণিমান্ত হয়, তার নামানুসারে মাসের নাম নির্ধারিত হত। যেমন বিশাখা নক্ষত্রের পূর্ণিমান্ত হবার পর যে মাস আরম্ভ হয়, তার নাম বৈশাখ, কৃত্তিকা নক্ষত্রের পূর্ণিমান্ত হলে নূতন মাসের নাম কার্ত্তিক, ইত্যাদি। পরবর্তীকালে চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাসের প্রবর্ত্তন হলে বিভিন্ন রাশিতে সূর্যের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন মাসের গণনা আরম্ভ হল বটে কিন্তু চান্দ্রমাসের নামগুলির আর কোন পরিবর্তন করা হল না। আমরা জানি, পূর্ণিমার সময়ে সূর্য রাশিচক্রে চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। সুতরাং বিশাখা নক্ষত্রে যখন পূর্ণিমার উদয় হচ্ছে, সূর্য তখন মেরুরাশিতে প্রবেশ করতে উদ্যত। সেইজন্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্তে সূর্যের অবস্থিতি তুলারাশিতে। তাই যে নক্ষত্র হতে প্রথমে চান্দ্রমাসের নামকরণ হয়েছিল, রাশিচক্রে সেই নক্ষত্রের বিপরীত দিকে সেই মাস দেখানো হয়েছে।

ঋগ্বেদের কাল হতে ভারতীয়রা ৭টি গ্রহ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিল। এদের কোন কোনটির বর্তমান ভারতীয় নাম ঋগ্বেদের আমল থেকেই প্রচলিত হয়ে এসেছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র এদের মধ্যে অন্যতম। ঋগ্বেদে উল্লিখিত অশ্বের ৩৪টি পঞ্জর ও ৩৪টি জ্যোতিষ্কের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুডউইক ও জিমার অনুমান করেন, এর দ্বারা সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি পাঁচটি গ্রহ ও ২৭টি নক্ষত্র বোঝাত। চন্দ্রে যে নিজস্ব দ্যুতি নেই, তা সূর্যালোকে ভাস্বর, এই জ্ঞান বৈদিক যুগে ছিল। বেদে অন্ততঃ চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের একাধিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে, শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'পরিমণ্ডল' বলে বর্ণনা করতে দেখে অনেকে মনে করেন, বৈদিক হিন্দুরা পৃথিবীকে একটি গোলক হিসাবে জ্ঞান করত। বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিমত, প্রাচীন হিন্দুরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি অনুমান করেছিলেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষ (খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হতে খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত) প্রাচীন হিন্দুদের জ্যোতিষীয় জ্ঞানের অতি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বৈদিক যুগের এক পঞ্জিকা বিশেষ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল হতে হিন্দুরা ৩৬৬ দিনে বৎসরের হিসাব রাখতে আরম্ভ করে। এতে একটি পঞ্চবার্ষিক চান্দ্র-সৌর পর্যায়কালের উল্লেখ আছে। এই পর্যায়কালের মধ্যে কতকগুলি সাবন দিন, নক্ষত্র দিন, সৌর দিন, চান্দ্র-যুতি, সূর্যের ও চন্দ্রের পূর্ণ পরিক্রমণ সম্পাদিত হয়, তার নিম্নোক্ত হিসাব লিপিবদ্ধ হয়েছে —

সাবন দিন (civil days) — ১৮৩০
নক্ষত্র দিন (sireal days) — ১৮৩৫
সৌর দিন (solar days) — ১৮০০
চান্দ্রযুতি (synodic month) — ৬২
সূর্যের পূর্ণ পরিক্রমণ (sun's revolution) — ৫
চন্দ্রের পূর্ণ পরিক্রমণ (moon's revolution) — ৬৭

এই হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাই এক বৎসরের ৩৬৬ দিন (১৮৩০/৫) এবং এক চান্দ্রযুতিতে ২৯+১৬/৩১ (১৮৩০/৬২) হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় শীত ও গ্রীষ্মকালীন অয়ন-বিন্দুতে অশ্লেষা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অবস্থান ছিল তার উল্লেখ আছে। গ্রহদের সম্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞানও ছিল অনেক উন্নত। গ্রহ ও নক্ষত্র যে এক জাতের জ্যোতিষ্ক নয়, তা উপলব্ধ হয়। কিন্তু গ্রহদের পর্য্যায়কাল বা বৎসর সম্বন্ধে বোধহয় কোন তথ্য তখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

ব্যাবিলনীয় কিদিন্নু ও গ্রীক হিপার্কাস্ স্বতন্ত্রভাবে ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন চলনের মত গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও বৈদিক জ্যোতির্বিদ্‌দের ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা ও বিতর্ক আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক জায়গায় আছে, পুনর্বসু নক্ষত্রে সূর্যদেব অদিতি যেদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন সেইদিন থেকে যাগ-যজ্ঞাদি শুরু করবার প্রকৃষ্ট সময়। বলা বাহুল্য, এইদিন মহাবিষুবের (vernal equinox) কথাই প্রকাশ করছে, পরবর্তীকালে মহা-বিষুব ক্রমশ মৃগশিরা, রোহিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের দিকে সরে যায়।

বৈদিক উপাখ্যানে একটি গল্প আছে যে, মহা-বিষুবের অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রজাপতি নাকি একবার তার কন্যা রোহিনীর পশ্চাদ্ধাধন করেছিলেন এবং এরূপ অবৈধ আচরণের জন্য দেবতাদের নিকট তাকে যথেষ্ট নিন্দার্হ

ও হেয় হতে হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন রূপকের আকারে লিখিত হলেও এর দ্বারা হিন্দুদের অয়ন-চলনের জ্ঞানকেই বোঝাচ্ছে। শিবমস্তু! ওঁ স্বস্তি।

তিনি আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগলেন মঠবাড়ীর দিকে। স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যুক্তকরে প্রণাম নিবেদন করলাম মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছে। উপস্থিত বিজ্ঞানানন্দজী ও কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেদের গাঁঠরী ইত্যাদি তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম আয়ুর্বেদচর্চা কেন্দ্রের মূল ফাটকের দিকে।

গেটের কাছে এসে দেখি তাঁরাও আর দাঁড়িয়ে নেই। নর্মদা স্পর্শ করে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে নামতে লাগলাম উৎরাই-এর পথে।

হরানন্দজী বললেন — নর্মদার তটে তটে উৎরাইয়ের পথে আরো চার মাইল গেলে আমরা নরসিংহপুর জেলা অতিক্রম করে জব্বলপুর জেলায় প্রবেশ করব। বেলখেড়ী নরসিংহপুর জেলার শেষ সীমা। বেলখেড়ী থেকে অমরকন্টকের দূরত্ব প্রায় ২২০ মাইল।

কয়েকদিন না হাঁটায় পা দুটো যেন ভারী হয়ে উঠেছে। দ্রুত হাঁটতে পারছি না। নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হাঁটছি। বেলা বারোটা নাগাদ বেলখেড়ী ঘাটে এসে পৌঁছালাম। নর্মদার নেমে গায়ে হাতে মাথায় নর্মদার জল দিলাম। শরীর জুড়াল।

আসার আগে বিজ্ঞানানন্দজী আমাদের ঝোলায় পেয়ারা, খোয়া এবং কিছুটা করে মধু দিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা তা দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারলাম।

মধ্যাহ্নভোজনের পর প্রেমানন্দ মহানন্দস্বামীকে প্রশ্ন করলেন — পঞ্চ পাণ্ডব অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হবার কতকাল পরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন? এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

মহানন্দস্বামী — মহাভারতে পাই, কৌরবরা যখন পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাস অনুসন্ধান করছিলেন তখন কিন্তু ধর্মরাজের আশীর্বাদে পাণ্ডবদের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারছিলেন না। হঠাৎ দূত মারফৎ কীচক বধের সংবাদ পেলে দুর্যোধন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি মনে মনে গণনা করেন যে, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় চলছে, আর মাত্র অল্প কিছুকাল হয়ত বাকী আছে। এই সময়ে কীচকের মত বীর যোদ্ধাকে একমাত্র ভীম ছাড়া কারো পক্ষে বধ করা সম্ভব নয়! হয়ত পাণ্ডবরা বিরাট রাজার আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস যাপন করছে। তিনি পাণ্ডবদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বিরাট দেশে গোপনে দূত প্রেরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু কর্ণ পরামর্শ দেন — দূত প্রেরণ না করে বরং বিরাট রাজ্য লুণ্ঠন ও গোধন-হরণ করা হোক। যদি বিরাট-রাজার রক্ষার্থে পঞ্চ পাণ্ডব আত্মপ্রকাশ করে তবে পুনরায় পাণ্ডবদের বনবাসে প্রেরণ করা যাবে। সেই মত ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর অপরাহ্নে সসৈন্যে বিরাট রাজ্য লুণ্ঠন করতে যাত্রা করলেন (৩০ অঃ) । পরদিন কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে কৌরবরা সদলবলে গোধন হরণ করতে গেলেন (৩৭ অঃ) । কিন্তু বৃহন্নলাবেশী অর্জুন গোধন রক্ষায় অবতীর্ণ হলেন এবং তাঁর গাণ্ডীব টঙ্কারে কৌরবরা পরাজিত হলেন। পলায়নপর কৌরবদের অর্জুনকে দেখে সন্দেহের উদ্রেক হলেও ভাবলেন — লোকটি দেখতে অর্জুন, অথচ ক্লীব! হয়তলোভের বশবর্তী হয়ে সময় অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে! তাই দুর্যোধন মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। পিতামহ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাত সময় সম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন ভেবে ভীষ্মকে দুর্যোধন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে ভীষ্ম তার উত্তরে (বিরাট,৫২ অধ্যায়) দুর্যোধনের ভ্রম দূর করে বললেন —

পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপচীয়তঃ ॥ ৩॥

এষামপ্যধিকাঃ মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশক্ষপাঃ

ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ততে মতি ॥ ৪॥

অর্থাৎ – পঞ্চম পঞ্চম বর্ষে (প্রতি পঞ্চ বর্ষাত্মক যুগে) দুই (চান্দ্র) মাস বৃদ্ধি হয়। পাণ্ডবদেরও ত্রয়োদশ বর্ষের অধিক পাঁচ মাস বার রাত্রি হয়েছে।

যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৃষ্ণ দশমীতে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশ করলেন (৭০অঃ)। কিন্তু আমার মনে হয় এই গণনায় কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে। কারণ অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবরা এত সুখে ছিলেন না যে প্রতিজ্ঞা পূরণের পরেও পাঁচ মাস বার রাত্রির পর তাঁরা আত্মপ্রকাশ করবেন।

একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। ভাবুন, কোন জ্যোতিষী এক রাজাকে বলল, আজ হতে ঠিক তিন বৎসর পর তুমি তোমার হৃত রাজ্য ফিরে পাবে। সেইমত সেই রাজা ৩৬৫ দিনে বর্ষ ধরে একটি পাত্রে রোজ একটি করে পাথর রাখতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ ৩ x ৩৬৫ = ১০৯৫ টি পাথর যখন হল সে তখন বুঝল যে তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। আর এক ব্যক্তি এত কষ্টে না গিয়ে সে দিনের মাস ও তিথি গণনা করতে লাগল। সে জানত যে তিথি থেকে সে গণনা শুরু করেছে সেই তিথি পুনর্বার আসতে ৩৫৪ দিন লাগে। সুতরাং বর্ষে বর্ষে ১১ তিথি কমতে থাকে। সে সেই তিথি ৩ বার গণনা করে ৩ x ৩৫৪ = ১০৬২ পেল এবং তাতে ৩ x ১১ = ৩৩ তিথি যোগ করে ১০৬২ + ৩৩ = ১০৯৫ ফল্‌ই পেল।

ভীষ্ম এরূপই গণনা করেছিলেন। তিনি ৩৫৪ দিনে ১২ টি পূর্ণিমা অর্থাৎ এক চন্দ্র বৎসর এবং ৩৬৬ দিনে এব সৌর বৎসর ধরেছিলেন। সেকালের পাঁজিতে ৩৬৬ দিনে সৌরবর্ষ ধরা হত। অতএব, এক সৌরবর্ষ পেতে হলে এক চান্দ্রবর্ষে ১২ তিথি যোগ করতে হত। এরূপে ৫ সৌরবর্ষে ৫ x ১২ = ৬০ তিথি অর্থাৎ ২ চান্দ্র মাস অধিক গণনা করতে হত। অতএব ১৩ সৌরবর্ষে ১৩ চান্দ্রবর্ষ এবং (১৩ x ২) ÷৫ = ৫ চান্দ্র মাস ৬ তিথি হবে। ভীষ্ম দেখলেন ৫ চান্দ্র মাস ১২ তিথি অধিক হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডবদের দর্শন দিবসে ১৩ সৌরবর্ষ পূর্ণ হয়ে ৬ তিথি অধিক হয়েছিল।

অর্জুন এক কৃষ্ণ-অষ্টমীতে বিরাট-গোগৃহে কৌরবদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই দিন ৬ তিথি অধিক হয়েছিল। অতএব তৎপূর্বে কৃষ্ণ-দ্বিতীয়াতে প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছিল। দ্রৌপদী এই তিথি জানতেন বলেই কীচক-বধের পর ভীত বিরাট রাজা দ্রৌপদীকে অন্যত্র চলে যেতে বললে দ্রৌপদী বিরাট রাজমহিষীর নিকট ১৩ দিন সময় অর্থাৎ শুক্ল-পঞ্চমী পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর গন্ধর্বপতি এসে তাঁকে নিয়ে যাবেন। শুক্ল-চতুর্থীতে কীচক বধ হয়েছিল, শুক্ল তৃতীয়ায় এক পর্ব পড়েছিল।

কি হেতু এই পর্ব? কোন মাসে? এই দুই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে হলে ভীষ্ম যে পঞ্জিকার সাহায্যে গণনা করেছিলেন তা দেখতে হবে। ঐ সময় বৈদিক যজ্ঞ কর্মের তিথি নির্ণয় নিমিত্ত এক বৈদিক পঞ্জিকা ব্যবহৃত হত। তার আধার 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এতে ৩৫৪ দিনে চান্দ্রবর্ষ এবং ৩৬৬ দিনে সৌরবর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। এরূপ ৫ সৌরবর্ষে এক যুগ ধরা হয়েছে। সেই পাঁচ বর্ষের পাঁচ নাম ছিল। মহাভারত ও কোন কোন পুরাণে এই যুগের ও পঞ্চ বর্ষের উল্লেখ আছে। কোন্ বর্ষে কোন্ তিথিতে বিষুব, অয়ন, ঋতু আরম্ভ তা গণনা করা হত। এক যুগ গতে অন্য যুগ আসত। কিন্তু এক পাঁজিই চলত। উত্তরায়ণের পরদিন নববর্ষ আরম্ভ হত।

এই পঞ্চবর্ষের নাম ও তিথিগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

| বর্ষ | উত্তরায়ণ | মহাবিষুব |
|---|---|---|
| সংবৎসর | পৌষ অমাবস্যা | বৈশাখ শুক্ল-তৃতীয়া |
| পরিবৎসর | মাঘ শুক্ল দ্বাদশী | বৈশাখ পূর্ণিমা |
| ইদাবৎসর | মাঘ কৃষ্ণ নবমী | বৈশাখ কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| অনুবৎসর | মাঘ শুক্ল ষষ্ঠী | বৈশাখ শুক্ল নবমী |
| ইদ্বৎসর | মাঘ কৃষ্ণ তৃতীয়া | বৈশাখ কৃষ্ণ ষষ্ঠী |

বস্তুতঃ সংবৎসরের তিথি জানলেই তাতে ১২ তিথি যোগ ও মলমাস ত্যাগ করলে পর পর বৎসর জানা যেত। পাঁজি সহজ করার জন্য ১২ তিথি ধরা হত। বস্তুতঃ ১১ তিথি। এই হেতু বর্ষে বর্ষে ১ তিথি বেশী হত এবং ৩০ বর্ষে ১ মাসের পার্থক্য থাকত। মনে হয়, সেই অধিক মাস ত্যাগ করা হত। তাই পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞাত ১৩ বর্ষে ১৩ দিন অধিক ধরা হয়েছিল। নতুবা পর্ব দিবসেই তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণ হত। দেখা যাচ্ছে, পর্বটি সংবৎসর বর্ষের বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া ও মহাবিষুব দিবস।

এর থেকেই কোন্ বর্ষের কবে বনবাস আরম্ভ এবং কোন বর্ষের কবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয় তা গণনা করা যায়। মহাবিষুব হতে মহাবিষুব এক সৌরবর্ষ। সংবৎসরের মহাবিষুব দিনে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হয়। এর ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে মহাবিষুব দিনে দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, সে বৎসর ইদাবৎসর ছিল এবং বৈশাখ কৃষ্ণ দ্বাদশীতে মহাবিষুব পড়েছিল। মনে হয় সেই বর্ষের বৈশাখ-পূর্ণিমায় রাজসূয় যজ্ঞ হয়েছিল এবং এগার দিন পরে কৃষ্ণ দ্বাদশীতে বা ত্রয়োদশীতে দ্যূতক্রীড়া হয়। মনে হয়, দুর্যোধন এই তিথি স্মরণে রেখে মনে করেছিলেন এই তিথিতে

অথবা এরও ১৩ তিথি পরে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হবে। তিনি কৃষ্ণ অষ্টমীতে অর্জুনকে দেখে পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস প্রেরণের আশা করেছিলেন। পিতামহ ভীষ্মই তাঁর ভ্রম দূর করেন।

বৈশাখ কৃষ্ণাষ্টমীর তৃতীয় দিবসে কৃষ্ণ দশমীতে বিরাট সভায় পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার পর নবম দিনে। এরপর অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ, রাজ্যলাভের মন্ত্রণা ও সন্ধির জন্য দূতের গমনাগমন এবং দুই পক্ষে সেনা সংগ্রহ চলতেই লাগল। সে যুগে হেমন্ত ও বসন্ত, এই দুই ঋতুতে যুদ্ধ যাত্রা করা হত। সংবৎসরের কার্তিক শুক্ল নবমীতে জলবিষুব এবং এরপর মার্গশীর্ষ শুক্ল একাদশীতে হেমন্ত আরম্ভ। তাই মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একাদশীর পূর্বে আরম্ভ হয় নি।

এখন বৈদিক পঞ্জিকাগত ফল একত্রে করলে দাঁড়ায় —

ইদাবৎসরের মাঘ কৃষ্ণ নবমী — উত্তরায়ন, পরদিন নববর্ষ, ইদাবৎসর বৈশাখ পূর্ণিমা — রাজসূয় যজ্ঞ, ইদাবৎসরের বৈশাখ কৃষ্ণ দ্বাদশী — দ্যূতক্রীড়া ও বনবাস আরম্ভ।

পরিবৎসরের, কার্তিক — জরাসন্ধ বধ, পরিবৎসরের, অগ্রহায়ণ পৌষ — দিগ্বিজয়।

সংবৎসরের বৈশাখ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া — ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ। সংবৎসরের বৈশাখ কৃষ্ণ দশমী — বিরাট রাজসভায় পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ। সংবৎসর অগ্রহায়ণ শুক্ল একাদশীতে — কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ।

পরিবৎসরের মাঘ শুক্ল দ্বাদশী — উত্তরায়ণ।

মহানন্দস্বামীর আলোচনা শেষ হতেই হরানন্দজী পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য তাড়া লাগালেন।

আলোচনা ও বিশ্রামের পর আমাদের চলা শুরু হল। কাছাকাছি সব বন চোখে পড়ছে। পুষ্প পল্লবে শোভিত সেইসব গাছের আভা দেখে চমকে যাচ্ছি। হাঁটতে লাগলাম পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। সমতল অঞ্চলে দ্রুতবেগে হাঁটছি। এখানে নর্মদার বিচিত্র গতিপথ। কোথাও সাতপুরার ঢাল ছুঁয়ে কোথাও বা একটু দূরে রেখে, কোথাও বা অদৃশ্যভাবে পাথরের তলা দিয়ে বয়ে চলেছেন। আমলকী এবং বহেড়ার গাছ বোধহয় সর্বত্র; এখানে জঙ্গলের বিভীষিকা নাই বললেই চলে। আরো কিছুটা হাঁটার পর নজরে এল পথের ধারের এক পর্ণকুটীর। পর্ণকুটীরের দাওয়ায় বসে আছেন শতছিন্ন কালো পোষাক পরিহিত পাগল চেহারার এক শীর্ণকায় সাধু। মাথা ও দাড়িতে কাঁচা পাকা চুল। দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে সে উন্মাদবৎ হাসতে লাগল। তার ব্যাঙ্গাত্মক হাসি আমাদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। আমরা কাছাকাছি হয়ে তাঁকে 'নম নারায়ণায়' জানাতেই সেই সাধু বলতে লাগলেন —

ফুট গয়া আসমান, শবদকী ধমক মেঁ।<br>
লগী গগন মেঁ আগ, সুরতকী চমক মেঁ॥

— অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দের তোড়ে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আত্মজ্যোতি ঝলসে উঠায় মনে হচ্ছে আকাশে আগুন লেগেছে।

'জপ মরে, অজপা মরে, অনহদ্ ভী মর যায়,<br>
সুরত সমানি শব্দ মেঁ, তাঁহি কাল ন খায়॥

অর্থাৎ এই ঘটে অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে শব্দ ঝঙ্কৃত হয় গুরু কৃপায়, অর্থাৎ জীবাত্মাকে সেই ধ্বনের ডুরি বা দিব্য শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত করলে, তবে সে অমৃতের সন্ধান পাবে।

হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের আল্লা, আর খ্রীষ্টানের গড্, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি! এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর আর তাঁর বাণীকে মানতে রাজী নয়। পুরোহিত-সাধু-সন্ন্যাসী, মোল্লা-মৌলানা এবং পোপ-পাদ্রীদের কেরামতিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং হাজার কুসংস্কাররূপ হলাহলের দিয়েছে জন্ম। তাই দাদূ দুঃখ করে বলছেন —

'খংড খংড করি ব্রহ্মকৌ পখি পখি লিয়া বাঁটি<br>
দাদু পূরণ ব্রহ্ম ত্যজি বংধে ভবমে কী গাঁঠি।'

ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করে দলে উপদলে নিয়েছে ভাগ করে; হে দাদু! পূর্ণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করে মানুষ বদ্ধ হয়েছে ভ্রমের গ্রন্থিতে। সেই অলখ ইলাহীই একমাত্র জগদ্গুরু — দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

এই অলখ পুরুষ দাতাদয়ালকে বারব্রত-আচার-অনুষ্ঠান, প্রাণায়াম মুদ্রাদি External বা Internal exercise

এ পাওয়া যাবে না। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, চাতুর্মাস্য ব্রত বা মঠ মন্দিরে গিয়ে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে, শঙ্খ ঘন্টা খোল করতালের কররোলসহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলেও হবে না। ঐ বাহ্যিক সংকীর্তনে কোন পরামার্থ লাভ হবে না। অন্তরী কীর্তনেই সেই পরমার্থ লাভ হয়।

বাহ্যিরি কীর্তন ঘটবা ফিরে কাল মজাসে খায়
অন্তরী কীর্তনসে যো জোতে দয়াল গোদ পৌঁছায়।

তারপর একইরকম ভাবে দোল খেতে খেতে উন্মাদবৎ হাসতে লাগলেন।

বেলা ৪টা বেজে গেছে। আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। তাঁকে সকলে 'হর নর্মদে' বলে অভিবাদন জানিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। তিনি আমাদের প্রত্যাভিবাদন করলেনই না। পথের দাগ ধরে পূর্ব মুখে যেতে যেতে তাঁর কথাই আমরা আলোচনা করতে লাগলাম।

আমি বললাম — নর্মদায় কে কী রূপে থাকেন তা একমাত্র মা নর্মদাই জানেন। নর্মদা তটে কোন মহাত্মাকে প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলা দুষ্কর। তাঁরা নিজে ধরা না দিলে, তাঁদেরকে ধরা এবং চেনা কখনই সম্ভব নয়। উত্তরতট পরিক্রমাকালে বরুয়া গ্রামে ঋনমোচন তীর্থে আমি এরকমই এক কঙ্কালসার বৃদ্ধ সাধুর দর্শন পেয়েছিলাম যাঁর সুরেলা কন্ঠের যাদুতে মোহিত হয়ে গেছলাম। আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর গায়ের শতছিন্ন কাঁথা এবং খঞ্জনী ফেলে দিয়ে নিজের পেট চাপড়াতে চাপড়াতে বিরাট 'হাঁ' দেখিয়ে বলেছিলেন — 'ম্যয় ভূখা হুঁ'। তারপর তিনি একে একে আমাদের আটজনের আট ডজন বড় বড় কলা ও আটটি নারকেল খেয়ে নিয়ে গাছতলায় রাখা একটি মাটির ভাঁড়ে হাত মুখ ধুয়ে বলেছিলেন — প্রীতোহস্মি, প্রীতোহস্মি।

তারপরই আমাদের দিকে পিছন ফিরে খঞ্জনী হাতে গান গাইতে লাগলেন —

মেরে আখন কে দৌ তারে
রেবা শিবম্, শিবম্ রেবা
ইয়হ দৌ রূপ উজারে।

অর্থাৎ আমার চোখের দুই তারা শিব এবং রেবা মায়ের রূপ সর্বদাই দেখুক। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হল, তিনি বোধহয় আমাদেরকে চেননই না। তবে ঐ ক্ষুধার্ত সাধু খাওয়ার পর 'প্রীতোহস্মি' বলার পরেই মনে হয়েছিল আমরা আটজনেই যেন আকণ্ঠ ভোজন করেছি।

বেলখেড়ী গ্রাম অতিক্রম করে আরও প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে আমরা বিক্রমপুর গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। এই গ্রামটি যেন ঠিক তপোবন। গ্রামের মুখেই চার-পাঁচটা বিশাল বনস্পতি, আমলকী গাছ, তরল বাঁশের ঝাড়, রামদাঁতনের কাঁটালতা, শূণ্যে ঝোলা আরও কিছু লতা। লজ্জাবতী ফুলের মত বনফুল, দু'তিনটি চাঁপা গাছ। সব মিলিয়ে যেন কোন চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি যেন। গ্রামের পথ আরও কিছুটা হাঁটার পর আমরা একটি শিব মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। এখানকার মন্দিরে লিঙ্গেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। মন্দিরে দু'জন সাধু বসে রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করছেন।

আমাদের পরিক্রমাবাসী দেখে তাঁরা মালা জপ বন্ধ করে 'হর নর্মদে' ধ্বনিতে আমাদের স্বাগত জানালেন। মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে তাঁরা জানালেন — এই লিঙ্গেশ্বর তীর্থে পূজা, জপ, পুরশ্চরণ ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করলে মানুষের বাচিক, মানস ও কর্মজ পাপ বিনষ্ট হয়। এই মহাদেব এখানে এক এক মাসে এক নামে পূজিত হন। বৈশাখে মধুনাশী, জৈষ্ঠ্যে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন, শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে হৃষীকেশ, আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর, অগ্রহায়ণে কেশব, পৌষে নারায়ণ, মাঘে মাধব, ফাল্গুনে গোবিন্দ, চৈত্রে বিষ্ণু।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন সন্ধ্যারতি করতে। আমরা মন্দিরের ভিতর নিজের নিজের আসন বিছিয়ে বসলাম। সন্ধ্যারতি সেরে যাবার আগে বৃদ্ধ পুরোহিতজী বললেন — নর্মদার ঘাটে ঘাটে তীর্থ। প্রতি তীর্থেই যুগ যুগ ধরে কত দেবতা, কত ব্রহ্মর্ষি এবং মহর্ষিরা তপস্যা করে গেছেন। তাঁরা অপ্রকট হলেও তাঁদের সেই হৃদস্পন্দন তাঁদের ধ্যানশক্তি, মননশক্তি চিৎকণা এখনও বিদ্যমান। এ জিনিষ ধ্বংস হবার নয়। তোমরা কত কষ্ট করে তপোভূমি নর্মদার কোলে এসে পৌঁছেছ। মা নর্মদার কৃপা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে। মা নর্মদার সদাজাগ্রত দৃষ্টিপথে তোমরা আছ এবং থাকবে। 'হর নর্মদে' বলে তিনি আমাদের কাছ হতে বিদায় নিলেন।

মন্দিরের আরতির ঘন্টাধ্বনিতে এবং বাজনার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। একে একে সবাই জেগে উঠলেন। বিছানায় বসে বসে বৃদ্ধ পুরোহিতের প্রাণঢালা আরতি দেখতে লাগলাম। বৃদ্ধের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে শুধু লিঙ্গেশ্বরেরই রূপের বদল ঘটছে না, মন্দির গর্ভে একটা অশ্রুতপূর্ব রাগিনীর মধুর ঝঙ্কার এক অপূর্ব তান লয়ে ঝংকৃত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, লিঙ্গগাত্র থেকে উদ্ভূত হচ্ছে বম্-বম্-ববম্-বম্। আমি তন্ময় হয়ে গেলাম, আমার দেহকোষের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের ঢল নেমেছে আমার প্রতিটি রোমকূপে, আমি মজে গেলাম, গলে গেলাম।

যখন ধাতস্থ হলাম তখন আমার অন্য সঙ্গীরা ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে নর্মদায় গেছে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে। আমিও ধীরে ধীরে নর্মদায় গিয়ে স্নান, তর্পণাদি সেরে এসে লিঙ্গেশ্বরজীকে প্রণাম করে পুরোহিতমশাইকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন পুরোহিতমশাই এবং আরো তিনজন। প্রত্যেকের হাতেই বড় বড় লাঠি। জঙ্গলখণ্ডে চলতে গেলে দেহাতী লোকেরা প্রত্যেকেই সঙ্গে লাঠি রাখে।

প্রায় দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে আসার পর পুরোহিতজী পাহাড়ের উপর দিকে একটা জলধারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন — ওহী হ্যায় সিনিয়র নদী। পাহাড়ী ঝোরা। বর্ষাৎকে সময় বহুত পানী রহতা হ্যায়। অভি ঐ ঝোরা সে ক্ষীণধারা নিকলতী হুই নর্মদাকে সাথ সঙ্গম হুয়া। এই সংগমকা পানীমেঁ নাহানেসে চর্মরোগ ঔর পিনেসে অম্বল, গ্যাস আদি রোগ দূরীভূত হোতী হ্যায়।

এখানেই দেখলাম একটি মাইল পোস্টে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে — নরসিংহপুর জেলা সমাপ্ত। জব্বলপুর জেলা প্রারম্ভ। পুরোহিতজী বললেন — যেহেতু জব্বলপুর শহর নর্মদার উত্তরতীরে, নরসিংহপুর শহর নর্মদার দক্ষিণতীরে তাই রেলপথে যাওয়া সুবিধা। এই বিক্রমপুর আর ভিটোনি স্টেশনের মাঝখানে রেলওয়ে সেতু আছে। সেই সেতু দিয়ে নর্মদার পারাপার।

পথে চলতে চলতেই তাঁদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পুরোহিতমশাইকে কয়েকবার ফিরে যাবার অনুরোধ জানালেও তিনি জানালেন তিনি আমাদের সঙ্গে রামঘাট-পিপরিয়া পর্যন্ত যাবেন সেখানে তাঁর কিছু জমিজমা আছে, তা দেখভালের জন্য মাঝে মাঝেই তিনি এই পথে যাওয়া আসা করেন। রামঘাট নর্মদার দক্ষিণতটে এবং পিপরিয়া নর্মদার উত্তরতটে।

আমরা গল্প করতে করতে প্রায় পনের মাইল রাস্তা হেঁটে বেলা দেড়টা নাগাদ রামঘাটের রামকুণ্ড তীর্থে এসে হাজির হলাম। কুণ্ডে প্রচুর স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করছে। তার জলপান করে দেখলাম — যেমন মিষ্টি, তেমনি শীতল। কুণ্ডের শোভা ভারী মনোরম। কুণ্ডকে ঘিরে আছে বেল, আমলকী, আমরুদ ও আম-কাঁঠালের জঙ্গল। কুণ্ডের ধারে পরিক্রমাবাসী বা দর্শনার্থী যাত্রীদের জন্য দরজাবিহীন থাকার ঘর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী মনোরম। দূরে মানুষজন ক্ষেতে কাজ করছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিত্বে চমৎকৃত হয়ে আমরা সেই ভাঙা ঘরেই থাকবো বলে মনস্থ করলাম। রামঘাটে এসে যা আমাদের সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে তা হল এত জঙ্গল, পাহাড় ও প্রকৃতির ভয়াবহতা অতিক্রম করার পর এই কুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কোনদিকেই আর পাহাড় জঙ্গল আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আমরা সমতলের উপর দাঁড়িয়ে আছি। মা নর্মদা কলকলনাদে বয়ে যাচ্ছেন, তাঁর সেই নাদধ্বনিকে মনে হচ্ছে বীণার টঙ্কার।

ক্রমশ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা নির্ভয়ে নর্মদা স্পর্শ করে নর্মদাতটে বসলাম। নর্মদা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এই কুণ্ড। মনে হয় কুণ্ডের গভীর নীল জলের সঙ্গে নীলাক্ষি মা নর্মদার সঙ্গে এর কোন আভ্যন্তরিক যোগাযোগ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে জমাট হয়ে গেল। প্রায় লক্ষ যোজন দূরে আকাশের বুকে দু'একটা নক্ষত্র চোখে পড়ছে। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। এই অন্ধকার ও মা নর্মদার কুলুকুলু তান মনে এক বিচিত্র অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে। শিলাসনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি।

হরানন্দজী নীরবতা ভঙ্গ করে মহানন্দস্বামীকে বললেন — একবার কাম্যকবনে অবস্থিতিকালে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন —

ইহ বৈকস্য, নামুত্র, অমুত্রৈকস্য নো ইহ।<br>
ইহ চামুত্র চৈকস্য, নামুত্রৈকস্য নো ইহ॥

অর্থাৎ এখানে আছে, সেখানে নেই। সেখানে আছে, এখানে নেই। এখানেও আছে, সেখানেও আছে। এখানেও নাই, সেখানেই নাই। এর নিগূঢ় অর্থ কি ?

মহানন্দস্বামী —

বনানি যেষাং বিপুলানি সন্তি, নিত্যং রমন্তে সুবিভূষিতাঙ্গাঃ।
তেষাময়ং শত্রুবরঘ্নলোকো, নাসৌ সদা দেহসুখ রতানাম॥

যে ইহলোকে আহার-বিহারাদি বিষয়ে পরম সুখভোগ করে। নিরন্তর বাসনাসক্ত হওয়ায়, ধনমদে মত্ত থাকে সে পরলোকে কোন সুখ পাবে না। অর্থাৎ এখানে আছে, সেখানে নাই। উদাহরণ — রাজপুত্র চিরং জীব।

যে যোগযুক্তাস্তপসি প্রসক্তাঃ, সাধ্যায়শীলা জরয়ান্তি দেহান্।
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তা, স্তেষামসৌ নায়মরিঘ্নলোকঃ॥

যে ইহলোকে ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানের জন্য কষ্ট ভোগ করে সে পরলোকে পরম সুখভোগ করে। অর্থাৎ সেখানে আছে, এখানে নেই। উদাহরণ — মা জীব মুনিপুত্রক।

যে ধর্মমেব প্রথমং চরন্তি, ধর্মেণ লব্ধা চ ধনানি কালে।
দারানবাপ্য ক্রতুভির্যতন্তে, তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ॥

যে ইহলোকে বিবিধ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে পরম সুখভোগ করে সে পরলোকে অক্ষয় সুখভোগ করে। অর্থাৎ এখানেও আছে, সেখানেও আছে। উদাহরণ — জীব বা মর বা সাধো, সাধুর কাছে বাঁচা বা মরা দুই সমান।

যে নৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানং, ন তচাপি মূঢাঃ প্রজনে যতন্তি।
ন চানুগচ্ছন্তি সুখান্ ন ভোগান্, তেষাময়ং নৈব পরশ্চ লোকঃ॥

যে যাবজ্জীবন মৃগয়া কার্য্যে ব্যাপৃত থেকে সমস্ত দিন অনশনে অরণ্য-ভ্রমণ করে জীবহিংসার অনুষ্ঠান করে, ইহলোকে অশেষ ক্লেশভোগ করে সে পরলোকেও অনন্ত দুর্গতি ভোগ করবে। অর্থাৎ এখানেও নেই, সেখানেও নাই। উদাহরণ — ব্যাধ মা জীর মা মর। ব্যাধের বেঁচেও কাজ নেই; মরেও কাজ নেই।

শিবময়ী নর্মদাতীর্থে মহানন্দস্বামীর মুখে মহাভারতের কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে হল যেন আমার স্নায়ুশিরা মাংসপেশী সব আলগা হয়ে গেছে। আমি যেন আমাতে নেই। সহসা চোখের সামনে এক নূতন দৃশ্যপট ভেসে উঠল — আকাশ পটে দাঁড়িয়ে আছেন প্রলয়দাসজী। তাঁর দেহ থেকে তর্‌তর্ করে গড়িয়ে পড়ছে জ্যোতিজড়িত জলের ধারা। চারদিকে জ্যোতির সমুদ্র। সেই জ্যোতি ভূলোক, দ্যুলোক ব্যাপ্ত করে যেন নর্মদার পাশে পাশে ধেয়ে চলেছে। নর্মদার দিকে তাকিয়ে দেখি আলোর মত একটা আলো আকাশ চিরে নর্মদার বুকে পড়ল। আমি একদৃষ্টে সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে গেছে জানিনা। হঠাৎ কানে এল যতীশ্বরানন্দ বলছেন — উঠয়ে জী, আভি হামলোগ চল পড়ে। আমি জেগে উঠলাম। ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানালাম মহাত্মাকে। চোখের জল কিছুতেই বাগ মানছে না। বুকের ভিতরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

যতীশ্বরানন্দের হাত ধরে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছি আমাদের আশ্রয়স্থলের দিকে। কুণ্ডের চারিদিকে ঘিরে থাকা গাছগুলি থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে রাত জাগা পাখীর বিচিত্র ডাক। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হয়ে গেছে। ভাবছি, সার্থক হয়েছে আমার নর্মদা তীর্থে আসা। যতীশ্বরানন্দের সঙ্গে আশ্রয়স্থলে পৌঁছে গড়িয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়।

যাইহোক, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি! ঘুম ভাঙল যখন, তখন সমগ্র অরণ্যপ্রান্তর সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। সর্বাঙ্গ শিথিল। লাঠিটা আমার বিছানার পাশেই ছিল। কোনমতে লাঠিটা ধরে উঠে দাঁড়ালাম। নিজেই নিজের হাত পা দলে নিয়ে লাঠি ধরে ধরে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

হরানন্দজী ছাড়া আমার সকল সঙ্গীরা নর্মদায় গেছেন স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে। আমাকে দেখেই হরানন্দজী বললেন — কি শরীর খারাপ নাকি ? অনেক বেলা হল। সকাল নয়টা বেজে গেছে। তিনি উঠে এসে আমার গা মাথায় হাত দিয়ে দেখতে লাগলেন।

আমি বললাম — আমার শরীর খারাপ লাগছে। আজ পরিক্রমায় বেরোতে ইচ্ছে করছে না। একদিন বিশ্রাম করতে চাই।

একে একে সকলেই ফিরে এসে হরানন্দজীর মুখে আমার শরীর খারাপের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আমি তাদের আশ্বস্ত করে বললাম একদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর সকলেই যে যার নিত্যকর্মে মন দিলেন। বেলা এগারটা নাগাদ আমিও লাঠি ধরে ধরে নর্মদাতে স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। হাতে পায়ের শিথিলতা এখন নেই বললেই চলে। শরীর বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে। বেলা বারোটা নাগাদ এক দেহাতী দম্পতি আমাদের জন্য নিয়ে এলেন পুরী, সব্জী ও দুধ। খুবই তৃপ্তির সঙ্গে আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাপ্ত হল। আহারান্তে শুয়ে পড়লাম আমি। কিন্তু ঘুম এল না। বাইরে বেরিয়ে দেখি সকলেই স্রোতস্বিনী নর্মদার প্রবাহের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। আমি তাঁদের পাশে গিয়ে বসলাম।

আমাকে দেখেই নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে প্রেমানন্দ বললেন — আজ আমরা নর্মদা-পরিক্রমার শেষ লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা নর্মদা পরিক্রমা করতে করতে উপলব্ধি করেছি যুগে যুগে সহস্র সহস্র পরিক্রমাকারীরা যেমন মা নর্মদার কৃপায় জীব-জীবন হতে শিব-জীবনে উত্তরণ ঘটেছে তেমনি আমরাও মর্ত্তজীবনে অমর্ত্তজীবনের সন্ধান পাচ্ছি ও পাবো। আটশ তের মাইল দীর্ঘ নর্মদার পার্বত্যভূমির বন্ধুরতা, উগ্র গরম, হিমশীতল শৈত্য, ভয়ঙ্কর শ্বাপদগোষ্ঠী এবং দুর্দান্ত আদিবাসীদের উপদ্রব সহ্য করে আমরা ভয়ঙ্করে মধ্য দিয়ে অভয়ঙ্করের প্রসাদ লাভ করেছি পদে পদে। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যে প্রবাহিত এই নর্মদাতটই হল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জীবন্ত ইতিহাস। দেশ-বিদেশের বহু গবেষক নর্মদার প্রাক-ইতিহাস, ভূতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে বহু অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। নর্মদাবাসী সন্ন্যাসীরা যেমন আধ্যাত্মিক পথে মহাসিদ্ধির নানাবিধ স্তর উদ্‌ঘাটনে ব্রতী তেমনি ঐতিহাসিক, ভূ-তাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন নর্মদার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন। নর্মদা-তীরের মানব-সভ্যতা প্রায় পাঁচ লক্ষ বছরের পুরাতন। এই উপত্যকা পুরাপুলীয় মানব-সভ্যতার এক বিশিষ্ট আধার। মধ্য ভারতের এই নর্মদা তীরেই মূর্ত হয়েছে বিশ্ব-মানব সভ্যতা।

উন্নাসিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই। তাঁরা নাকি এমন কথাও বলছেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে প্রকৃত কোন ঐতিহাসিকও জন্মান নি। বলা বাহুল্য, এ সব কথা একদেশদর্শী। কারণ বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের যে রকম অধ্যবসায় এবং নিরলস নিষ্ঠা দেখি, তাতে আমাদের প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণগুলির মধ্যে যে ইতিহাস ছড়িয়ে আছেন, তা তাঁদের অজানা থাকার কথা নয়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে রচিত আমাদের প্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১।২) আছে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করেন — কোন্ কোন্ শাস্ত্র তুমি অধ্যয়ন করেছ? নারদ তদুত্তরে তাঁর অধীত বিদ্যার এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করে বলেন —

ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথবর্ণং
চতুর্থমিতিহাসপুরাণম্ পঞ্চমং বেদানাং বেদম্ পিত্রম্ রাশিং দৈবং নিধিং
বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষবিদ্যাং
নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতাং ভগবোহধ্যেমি॥

নারদের এই উক্তিতে চতুর্বেদের পরেই ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে এবং বাকোবাক্য তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা (বিজ্ঞান), রাশি (গণিত) প্রভৃতির উপরেই ইতিহাসকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের দেশে চিরকালই ইতিহাসের উচ্চ স্থান ছিল, ইতিহাসের চর্চাও হত। তবুও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমাদের অবদানকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, মন্তব্য করতেন, 'ভারতীয়রা ইতিহাস-বিমুখ জাতি'।

আমি প্রাচীন ভারতের প্রজাশাসন পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বর্ণনা, প্রাচীন ভারতের নৌশক্তি, হিন্দুদের রাষ্ট্রবোধ ও স্বদেশ-চেতনা সম্বন্ধে অনেক দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকের বই পড়লেও বেদ, পাণিনি,

মহাভারতাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকায় তা থেকে এই সমস্ত বিষয়ে কোন মর্ম উদ্ধার করতে পারি নি। আপনি যেহেতু এই সমস্ত শাস্ত্র বিষয়ে অবহিত তাই আপনার মুখ থেকে এই সমস্ত বিষয়ে জানতে চাই।

আমি — সংস্কৃত কলেজের বেদ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও পরিভাষা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ছিলেন আমার শিক্ষক। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট আমি শ্রীগুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যভাষ্য এবং বৃহদারণ্যকের পাঠ নিয়েছি। তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমনই ছিল যে তিনি কখনও অধ্যাপকের উচ্চভূমি থেকে ছাত্রের স্বাধীন বিচারধারা ও নিঃসঙ্কোচ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তির মুখে পাথর চাপা দিতেন না। তাঁর স্নেহময় মূর্তি কখনও ভুলবো না।

একদিন তাঁকে আপনার প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করায় তিনি উঠে গিয়ে আলমারী থেকে একটি রেক্সিন বাঁধাই বই আমার সামনে রেখে বলতে লাগলেন — ১৯১২ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক Longmans, Green & Co. জনৈক ভারতীয় লেখকের একখানি বই প্রকাশ করলেন। লণ্ডনের বিখ্যাত The Shipping World নামক পত্রিকা এই বইটি সম্বন্ধে সারা দুনিয়াতে প্রচার করলেন, 'This is a book to be read from cover to cover.' বই পড়ে বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক Vincent Smith উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'This book is a 'possession which deserves to be treasured.' ভারতের প্রথিতযশা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দেবদত্ত ভাণ্ডারকার অভিমত দিলেন — 'This work is an exceedingly valuable production and certainly worthy of Savants'. সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের মত লোকও ( যাঁর ভারত প্রেমিক বলে কোন অপযশ ছিল না!) এই ভারতীয় লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন — 'It is a subject well worthy of treatment which seems to have escaped the notice of previous students and I congratulate you on having made so useful contribution to our knowledge of India.'

সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, সকলের প্রশস্তি ধন্য ঐ বইটির নাম 'A HISTORY OF INDIAN SHIPPING' এবং তার অমর লেখকই হলেন ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়* — ভারতবাসীর গর্ব এবং গৌরব। তাঁর হাতে পড়েই আমাদের মুক অতীত মুখর হয়ে উঠেছে। আমরা চিনেছি আমাদের মহৎ উত্তরাধিকারকে।

এই বইতে তিনি আমদের জন্য এক বিরাট ঐশ্বর্য্য রেখে গেছেন। এই বই-এ তিনি প্রাচীন ভারতের নৌশক্তি এবং জাহাজ নির্মাণাদির কলাকৌশলের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন (A history of the Sea-borne trade and maritime activity of the Indians from the earliest time's)। বইটিতে প্রাচীন ভারতীয় জাহাজ ও নৌকার ছবি আছে ৩২টি। এর বস্তুগত এবং পুঁথিগত উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি সারা ভারতবর্ষ, মিশর, আরবদেশে, জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ সর্বত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মৌর্যযুগ, বৌদ্ধযুগ, কুশাণযুগ যাবতীয় চিত্রলিপি (Hieroglyphic) সাঁচী স্তূপ, অজন্তা, ইলোরা, বরোবুদুর প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্র (Fresco-Painting) ও মন্দির চিত্র, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত যাবতীয় রেখাচিত্র (Pictograms) বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রা, স্তম্ভলিপি এবং শিলালিপি — সব কিছু থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত-বাদন-কল্পলতা, ভিক্ষুনী নিদানা, বাবেরু জাতক, অঙ্গুত্তর নিকায়, সংস্কৃত কলেজে সুরক্ষিত ভোজরাজার আমলে রচিত 'যুক্তিকল্পতরু' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি, আসাম গেজেটিয়ার, Asiatique Journals, British Museum এবং এখানকার Archives-I রক্ষিত মোঘল যুগের যাবতীয় সাময়িক কাগজ পত্র, Indian Antiquary, আরবী ভাষায় লিখিত তারিখ-ই ফিরোজশাহী, তারিখ-ই-মাসুমী, শিহাবুদ্দিন তালিশ রচিত পাণ্ডুলিপি, আল বিলাদুরি, আল-ইদ্রিশী, ফতিহা ইব্রিহা (Fathiyyah-i-Ibriyyah), Fou-koue-ki প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থ, প্লিনির Natural History, The Periplus of the Erythroean Sea এমন কি টলেমির Geography প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে অজস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষ নানাবিধ নৌকা, সমুদ্রগামী জাহাজ এবং রণতরী নির্মাণে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। তিনি 'রাজবল্লীয়' 'জনক-

* পরিশিষ্ট দেখুন।

জাতক' এবং 'মহাজনক-জাতক' প্রভৃতি পুস্তক হতে অনেকগুলি সমুদ্রগামী জাহাজের ছবি দিয়ে প্রাচীন ভারতের নৌশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। জনক-জাতকে আছে বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে যখন অবতীর্ণ হন (In his previous incarnation) সেই সময় সমুদ্রে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়। যে জাহাজে এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেই জাহাজটি এতবড় ছিল যে তাতে ৭০০ জন যাত্রী ছিল। ৫০০ জন যাত্রীর বহন ক্ষমতা আছে, এমন একটি জাহাজের ছবি এবং বর্ণনা তিনি 'বলাহস্‌স জাতক' (Valahassa Jatak) থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। যুক্তিসিদ্ধ তথ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, যুবরাজ বিজয়সিংহ (543 B.C) যে জাহাজে চড়ে সিংহল অভিযান করেছিলেন তাতে ৭০০ জন যোদ্ধা ছাড়াও তাঁদের স্ত্রীপুত্রকন্যা এবং প্রয়োজনীয় রসদ পত্র ছিল (Rajaavliiya)। 'সমুদ্র বাণিজ্য জাতক' নামক গ্রন্থ হতে পাতার পর পাতা উদ্ধৃত করে জাহাজের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন যে, অতীত ভারতে এমন জাহাজও তৈরি হত যাতে হাজার লোকের বাস আছে এমন একটা গোটা গ্রামই তাতে চড়ে সমুদ্র যাত্রা করতে পারত।

ভারতমাতার সুসন্তান ডঃ রাধাকুমুদই সর্বপ্রথম আমাদের প্রাচীন নৌশিল্প শাস্ত্র 'যুক্তিকল্পতরু' নামক গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করেন যে, সেকালে ভারতীয়রা 'সর্ববাতসহামনোমারুতগামিনী যন্ত্রযুক্ত পতাকিনীপোত' নির্মাণে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিল। সেই জাহাজগুলি ছিল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত — সামান্য ও বিশেষ — সামান্যশ্চ বিশেষশ্চ নৌকায়া লক্ষণদ্বয়ম্। সাধারণতঃ সামান্য শ্রেণীর নৌকাগুলি নদীপথে এবং বিশেষ শ্রেণীর নৌকা বা জাহাজগুলি সমুদ্রপথে যাতায়াত করত। আকার ও আয়তানানুসারে সামান্য শ্রেণীভুক্ত নৌকাগুলি ছিল দশরকম। তাদের নাম ছিল, যথা — ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুট, গর্ভরা ও মন্থরা। 'মন্থরা' গুলি সমুদ্র গমনেও উপযোগী ছিল — মন্থরা পরতো যাস্তু তাসামেবাম্বুধৌ গতিঃ।

আর বিশেষ শ্রেণীর জাহাজগুলির মোটামুটি দুটি বিভাগ ঃ দীর্ঘা ও উন্নতা — 'দীর্ঘা চৈবোন্নতা চেতি বিশেষ দ্বিবিধা ভিদা'। এগুলিরও বিভিন্ন নাম ঃ

দীর্ঘিকা তরণির্লোলা গত্বরা গামিনী তরিঃ।
জঙ্ঘালা প্লাবিনী চৈব ধারিনী বেগিনী তথা।। (যুক্তিকল্পতরু)

তিনি এই বইয়ে 'অগ্রমন্দিরা' নামের আর এক শ্রেণীর জাহাজের পরিচয় দিয়েছেন যেগুলি যুদ্ধকালে ব্যবহৃত হত — 'চিপ্রবাস যাত্রায়াং রণে কালে বণাত্যয়ে'। এই বই এরই ভূমিকাতে সর্বজনমান্য জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে লিখেছেন —

'Here for the first time, fragmentary and scattered records and evidences are collected and compared in a systematic survey of the entire field; and one broad historical generalisation stands out clearly and convincingly, of which all historics of world culture will do well to take note, viz. the central position of India in the orient world for well high two thousand years, not merely in a social, a moral, a spirital or an artistic reference, but also and equally in respect of colonizing and maritime activity, and of commercial and manufacturing interests.'

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গবেষণার অভাবে প্রাচীন ভারতের অনেক ঘটনাই ছিল তমসাচ্ছন্ন। সত্য বটে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করে আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিক প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের নিরলস চেষ্টার ফলে লুপ্ত ইতিহাসের অনেকখানি অধ্যায় উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু ডঃ রাধাকুমুদের মত আর কেউ আমাদের প্রাচীন পুঁথির সাংকেতিক শ্লোক গুলির পাঠ উদ্ধার করে সেগুলিকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নাই। শাস্ত্রের বাহ্যার্থ এবং গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণ করে তৎকালীন মুদ্রা শিলালিপি এবং প্রশস্তির সঙ্গে (Inscriptions) সেগুলিকে মিলিয়ে মিলিয়ে তিনি যেভাবে অতীত ভারতকে আবিষ্কার করেছেন, তা এক কথায় তুলনাহীন।

সাধারণতঃ দেখা গেছে, মধ্যযুগে বিশেষতঃ বিদেশী শাসনের যুগে যে সমস্ত কাহিনী বা ইতিবৃত্তকে দেশের রাজন্যবর্গ এবং তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট পণ্ডিতের দল জনসমাজে প্রচার যোগ্য বলে মনে করতেন, ঐতিহাসিকরা

তাই লিপিবদ্ধ করে তার নাম দিতেন 'ইতিহাস'। বর্তমান যুগে রাজা নাই, আছেন রাষ্ট্রনেতা। তাঁদের অনুগৃহীত অনেক ঐতিহাসিক ঐ যুগে ঐ রাষ্ট্রনেতা এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুকূলে ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, অনিবার্য কারণে তাঁরা সত্যের বিকৃতিও ঘটান। তাই দেখা যায় আমরা বিদেশী শাসনের যুগে যে সমস্ত বই পড়েছি, তা প্রধানতঃ কেবল রাজারাজড়াদেরই ইতিহাস। এরফলে যা হবার তাই হয়েছে। দেশের অধিকাংশ লোকেরা রাজা জেমস্ বা আকবরের উর্ধতন পুরুষদের নাম মুখস্ত আছে, কিন্তু তারা নিজেদের প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম জানে না। মস্কো বা মাদাগাস্কারে একশ বছর আগে কি ঘটেছিল ইতিহাসের ছাত্রদের তা নখদর্পণে কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাস তাদের জানা নাই। এই দুঃসহ অবস্থার অবসানকল্পে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক টয়েনবি ইতিহাসে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করে বললেন, রাজারাজড়াদের কুর্শীনামাই একটা দেশের ইতিহাস হতে পারে না। একটি যুগে একটি শুধু রাজারাজড়াই বাস করেন না। রাজা বা শাসক বাদে দেশের অগণিত জনসাধারণ — যারা সমাজের বৃহত্তম অংশ — তাদের আশা-আকাঙ্খা এবং উত্থান পতনের কাহিনী যদি লিপিবদ্ধ না হয়, তাহলে তাকে ইতিহাস বলা যায় না। টয়েনবির ঐ ধারা অনুসরণ করে বর্তমান যুগে দেখছি, অনেক ঐতিহাসিক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সমকালীন সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিকে তাঁদের রচিত ইতিহাসে স্থান দিচ্ছেন। কিন্তু রাজারাজড়া, রাষ্ট্রনেতা এবং জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে সমাজনীতি ও অর্থনীতি ক্রমবিবর্তনের পথে দেশে যে ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিটি জন্ম নেয়, তার মূল সুরটি ব্যাখ্যা করে সেইটির উজ্জ্বল রূপ তুলে ধরেছেন খুব কম ঐতিহাসিক। সেই সব বিরল ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডঃ রাধাকুমুদ একটি আশ্চর্য এবং স্মরণীয় নাম।

তিনি ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে এক একটা যুগকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তাঁর সেই ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে অতীত ভারতের উজ্জ্বল মূর্ত্তিটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তাঁর গবেষণা এবং রচনার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে যেটি ধরা পড়েছে, সেটি হল তাঁর ভারত-বোধ। ইতিহাসের যদি কোন দর্শন থাকে, তাহলে রাধাকুমুদ রচিত ইতিহাসের দর্শন হল এই ভারত বোধ তথা ভারত জিজ্ঞাসা। তাঁর প্রত্যেকটি বই-ই ছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে। ভারতই ছিল তাঁর ধ্যানের ধন। ভারত-মন্ত্রেই ধ্যানস্থ হয়ে এই ঋষি ভারতের অতীত ইতিহাস মন্থন করে তার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে গেছেন।

মৌলিক গবেষণা সমৃদ্ধ তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে স্বদেশ প্রেম, পুরাতত্বের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতিতে গভীর জ্ঞান — এই চারের সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁকে বলতে শুনেছি — 'বিধাতা যদি ভারতীয় ইতিহাস সাধকের জন্য কোন বিশেষ তীর্থ নির্দিষ্টি করে থাকেন, তবে ঐ চতুর্বেণী সঙ্গমই হল সেই মহাতীর্থ।'

সত্যানুসন্ধানের উপযোগী মন, সত্য আবিষ্কারের যোগ্য বিশ্লেষণী প্রতিভা এবং একান্ত নিরাসক্তির সঙ্গে নির্বিকার কৌতূহলে সব কিছু বিচার করে দেখে নেওয়ার মত নিরপেক্ষ দৃষ্টি — সব কিছুরই অধিকারী ছিলেন ডঃ রাধাকুমুদ।

ফলে তাঁর লেখায় উপকরণের সঙ্গে উপাদান, প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ, বিশ্লেষণের সঙ্গে সংশ্লেষণ, সমীক্ষা-সমীকরণের সঙ্গে সমন্বয় ও সমীকরণ, বুদ্ধির সঙ্গে বোধির সাযুজ্য ঘটেছে। প্রকৃত তথ্যের অতিরঞ্জন, অনুরঞ্জন এবং কুশ্রী অপজননের হাত থেকে থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন তিনি।

দেশের সর্বত্র তিনি ছাত্র ও যুবসমাজ তথা সারস্বত সমাজকে বলে বেড়িয়েছেন — 'প্রাচীন ভারতের মহিমময়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস আমাদের ভালভাবে জানার প্রয়োজন। কারণ আমাদের বর্তমান সমাজ প্রাচীন সমাজ-বৃক্ষেরই ফল। বর্তমান সমাজ ইচ্ছা করলেও অতীতের প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে না। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে সংস্কার করতে হলে একটি আদর্শের প্রয়োজন এবং তার উপায়ও জানা চাই। অতীতে কি কি সংস্কার হয়েছিল এবং তাতে আমরা কি ফল লাভ করেছি, কিভাবে সভ্যতার ক্রমবিবর্তন ঘটছে তা যদি না জানি তাহলে কি ভাবে অগ্রগতি সম্ভব? অন্ধকারে পদক্ষেপ করলে পদস্খলনের সম্ভাবনা। আলোকে দৃঢ় ও স্থির পদক্ষেপই আমাদের কাম্য। অন্যদেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা চক্ষুষ্মান্ হতে পারি সত্যি কিন্তু তা হতে আমরা জীবনের সন্ধান পেতে পারি না। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা, আমাদের বেদবেদান্ত শিক্ষা দিয়েছে

সমাজে মৈত্রী, রাষ্ট্রে শান্তি, সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি মানবতাবাদ। যদিও আন্তর সুখ এবং 'চরৈবেতি' অর্থাৎ পূর্ণের দিকে এগিয়ে চলাই আমাদের মূল লক্ষ্য, তবুও জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধিকেও কখনও তুচ্ছ মনে করি নি। আমাদের ঋষিরা ছিলেন একাধারে ব্রহ্মবাদী ও জীবনবাদী। তাই শুধু ধর্ম নয়, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সর্ববিষয়েই ভারতবর্ষের যথেষ্ট সমুন্নতি ঘটেছিল। ঋষিদের ধ্যানলব্ধ সত্যের আলোকে আমরা বরাবর চেয়েছি — সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি আমরা মিত্রবৎ আচরণ করব, বিশ্ববাসীও আমাদের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করুক। আমাদের সেই চেষ্টার পথে বাহির ও অভ্যন্তর হতে কত বাধা এসেছিল, আমরা সেই বাধাগুলি কতদূর অতিক্রম করতে পেরেছিলাম, যদি বিফল হয়ে থাকি তার কারণই বা কি — এই সব ব্যবহারিক দোষগুণের পরিচয় জানার জন্যই অতীতকে জানা দরকার, জানা দরকার বর্তমানকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনেই। ইতিহাস হল ঐ অতীত এবং বর্তমানের সংযোগ সূত্র। মিশরের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ Breasted একটি খাঁটি কথা বলেছেন যে ইতিহাসের ধারা এখনও প্রবহমান, আমাদের উপনিষদের ভাষায় 'অনাদ্যন্তবান্' — একটা unfinished process. এ শুধু অতীত এবং বর্তমানকেই নিয়েই তৃপ্ত হতে পারে না, ভবিষ্যতের বীজ, অনাগত দিনের রূপও এর মধ্যে উপ্ত এবং প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সনাতন মেতামাহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ — ইনিই সনাতন, ইনিই পুনরায় নূতন। পরস্পর আদান প্রদানের ফলে জন্ম হয় নবজাতকের, কাজেই 'সংগচ্ছধ্বং সংবদ্ধ্বং, সংবো মনাংসি জানতাম্'। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যে এক বিরাট সমন্বয় এবং সমীকরণের মূল সুরটি রয়েছে তা জানার জন্যই যথোচিত ভাবে ইতিহাস চর্চা ও গবেষণা করা প্রয়োজন।'

কিন্তু এহ বাহ্য। রাধাকুমুদের প্রকৃত পরিচয় তিনি শুধু 'ইতিহাস শিরোমণি' নন, তিনি ছিলেন যুগ-ব্যাখ্যাতা — আমাদের ঋষিকুল বর্ণিত ইতিহাস রূপ পঞ্চম বেদের নব সংহিতাকার। প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল আয়তনেত্র, উন্নতনাসা, নাতিদীর্ঘ এই মানুষটির সামনে গেলেই মনে হত এমন একজন ঋষির কাছে এসেছি যিনি একাধারে যতাত্মা এবং যতব্রত। তাঁর প্রশস্ত ললাট একদিকে যেমন ছিল ঋজুশুভ্র জীবনের মহিমায় দেদীপ্যমান , তেমনি অন্যদিকে তাঁর মুখে চোখেও ছিল প্রতিভার হিরণ্যদ্যুতি। তাঁর এই প্রতিভা দেশে দেশে নন্দিত হয়েছে এবং আমাদের সৌভাগ্য, বিশ্বজোড়া যশের এই হিরণ্যরথে চড়েই তিনি একের পর এক ভারতের হিরন্ময় ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করে গেছেন।

আচার্য দুর্গামোহনের সঙ্গে এইরকম অভ্রংলিহ প্রতিভা এবং বহুধা বিস্তৃত কর্মজীবনের অধিকারী রাধাকুমুদের ছিল প্রীতির সম্পর্ক। উভয়ই উভয়কে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

একবার আমার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত দুর্গামোহনের সঙ্গে পূর্বপক্ষ হিসাবে আমি যখন শাস্ত্রতত্ত্ব নিয়ে বিচার করছিলাম সেইসময় তিনি হঠাৎই এসে উপস্থিত হন। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। বহুবার তাঁর কলিকাতাস্থিত একডালিয়া রোডের বাসায় গিয়েছি। যখনই যা জানতে চেয়েছি তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এতে আমার জ্ঞানের সীমা বেড়েছে।

'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'— বিদ্যা ও বিনয়ের দুর্লভ মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সংসারে এমন এক একজন লোক আছেন যাঁদের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বললেই মনে হয় সুগন্ধি ফুলের আঘ্রাণ নিলাম। পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন স্বভাবে ছাত্র ডঃ রাধাকুমুদ ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেন — প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে গণতন্ত্র বা প্রজামণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত এক অভিনব শাসনতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। একথা সত্য যে সেযুগেও রাজতন্ত্র ছিল কিন্তু স্বৈরাচার ছিল না। ধর্মনীতি অনুসারে প্রজার কল্যাণ সাধনই ছিল রাজার মুখ্য কর্তব্য, পাশাপাশি যে গণতন্ত্রেরও বিকাশ ঘটেছিল শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

বেদে 'সভা' ও 'সমিতি' এই দুইটি শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দেখে সেই স্মরণাতীত যুগেও যে জনশক্তির প্রাধান্য ছিল তা বিশ্বাস করতে হয়। সভা শব্দের অর্থ যেখানে কতিপয় লোক একত্র হয়ে দীপ্তি প্রদান করে — সহ ধর্মেণ সঙ্ঘভির্বা ভাতীতি সভা (Jayarama : Paraskara Grihya III 13.1)

'সভা' ছিল খুব জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। এর আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা কারো ছিল না। সভার প্রধানকে বলা হত 'সভাপতি'। অন্যান্য কর্তব্যসূচী ব্যতীত সভার বিশেষ করণীয় কার্য ছিল বিচারকার্য নির্বাহ (Atharva V viii 10.5. Sukla Yajur Veda 30.67)। সুবিচার প্রাপ্তির আশায় কোন্ ব্যক্তি সভায় আগমন করলে তাকে 'ধর্মায় সমাচরম্' বলে সম্বোধন করা হত। বৈদিক যুগে জনমত ও জনশক্তি প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল 'সমিতি'। সমিতি কথাটির অর্থ একত্র মিলিত বা সমবেত হওয়া (সম+ ইতি)। এক মন, এক consensus এবং একই সিদ্ধান্তে সম অর্থাৎ সহমত হওয়াই ছিল সমিতির আদর্শ। রাজ্যের সকল ব্যক্তিই (বিশঃ) এতে যোগদান করতে পারতেন। রাজা নির্বাচন, পুনঃনির্বাচন প্রভৃতি ছিল এর বহুমুখী কার্যতালিকার একটি অংশ মাত্র। কালক্রমে 'সমিতির'র ক্ষমতা প্রভূত বর্দ্ধিত হয়েছিল। গ্রামের প্রধান 'গ্রামণী' ছিলেন সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত গ্রামের মুখপাত্র।

সভা ও সমিতিই পরবর্তী যুগের 'গণ' ও সঙ্ঘ' নামক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রদূত। 'গণ' অর্থ গণতন্ত্র। গণ শব্দ Republic বাচক। বৌদ্ধ জাতকে, উপনিষদের ব্রাহ্মণভাগে, কঠোপনিষদ প্রভৃতিতে গণ ও সঙ্ঘ শব্দের সন্ধান পাবেন। Term গণ signifies a form of Government , সঙ্ঘ signifies a form of State. অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মের বিধিব্যবস্থা বুঝাবার জন্যেই হয়ত বা সঙ্ঘ শব্দটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। রাষ্ট্রতন্ত্র বিষয়ে সঙ্ঘ শব্দের ব্যবহার বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বহুভাবে উল্লেখিত সঙ্ঘ শব্দটি গ্রহণ করে বুদ্ধদেবই যে তা তাঁর ধর্মব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োগ করেছিলেন, বৌদ্ধ ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হতে ভারতের নানা স্থানে বহু শক্তিশালী গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থে প্রজা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'গণ' ও 'সঙ্ঘ' বলা হয়েছে। গণ ও সঙ্ঘগুলি সচরাচর একটি 'পরিষার' অধীনে থেকে তার পরামর্শানুসারে পরিচালিত হত। পরিষা সংস্কৃত 'পরিষদ' শব্দের নামান্তর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সমিতিকে পরিষদ নাম দেওয়া হয়েছে। পরিষদের ক্ষমতা এমনই সুদূর প্রসারী ছিল যে একবার সম্রাট অশোক লিখিত আদেশের পরিবর্তে মৌখিক ভাবে কোন আজ্ঞা প্রচার করায় পরিষদ তা বাতিল করে দেন (Indian Antiquary 1913)। পরিষদের সভ্যদের রাজনৈতিক স্বাধীনতায় Executive বিভাগের হস্তক্ষেপ চলত না। সেখানে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করতে পারতেন।

রাজ্যে পরিষা ভিন্ন আর একটি শাসন বিভাগের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঐ বিভাগের কার্য পরিচালনা করতেন, তাঁদেরকে 'মহল্লক' নামে অভিহিত করা হত। এথেন্সের Areopagus (Highest Judicial Court), স্পার্টার Gerousia (The Council of Elders) এবং Anglo Saxon যুগের Witenagemot (Anglo-Saxon National Council or Parliament) সভার সঙ্গে এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত গণ ও সঙ্ঘগুলিকে কোনমতেই একতন্ত্র অর্থাৎ Monarchy বলা যায় না। কারণ গণ মানে সংখ্যা অর্থাৎ বহুর শাসন (Maha Maggo ii.18 Translation by Rhys Davids & Olden Berg in SB.E. XIII) । পাণিনির মতে সঙ্ঘ গণ শব্দের তুল্যার্থক — সংঘোদ্ধৌ গণ প্রশংসয়োঃ (অষ্টাধ্যায়ী ৩।৩।৮৩)। অবদানশতক হতে জানা যায় বুদ্ধদেবের সময় কয়েকজন বণিক মধ্যদেশ হতে দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য ব্যপদেশে গমন করেছিলেন। উক্ত দেশের রাজা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন — 'বণিক মহোদয়গণ, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আপনাদের দেশের রাজা?' তদুত্তরে বণিকগণ বলেন — 'মহারাজ উত্তর প্রদেশের কতকগুলি দেশে রাজতন্ত্র আর কতকগুলি দেশে গণ অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র প্রচলিত।'

সুতরাং সে যুগে যে Royal বা রাজকীয় এবং Republican বা প্রজাতান্ত্রিক এই উভয় প্রকার শাসনতন্ত্র বর্ত্তমান ছিল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট প্রভেদও ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না (see Ed. Speyer, Pelrograd 1902)।

তবে এই উভয় প্রকার শাসন পদ্ধতির মধ্যে গণশাসনই ছিল আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তা ছিল জনসাধারণের মনঃপুত। ফলে সেই যুগে বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে আমরা এইরূপ ১৬টি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্ধান পাই, যথা — অঙ্গা, মগধা, কাশী, কৌশলা, বজ্জী, মল্লা, চেতি, বংশা, কুরু, পঞ্চালা, মচ্ছা (মৎসা), সুরসেনা, অস্সকা (অশ্মক), অবন্তী, গন্ধারা এবং কম্বোজা (Anguttar Nikaya I, IV)

'দীর্ঘনিকায়' নামক পালিগ্রন্থেও সাতটি প্রধান নগরের উল্লেখ আছে, সেগুলিও ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যথা দন্তপুর (কলিঙ্গদের), পোতন (অশ্মকদের), মাহিষ্মতী (অবন্তীদের), রোরুক (সৌবীরগণের), মিথিলা (বিদেহদের), চম্পা (অঙ্গ-দের) এবং বারাণসী (কাশীদের)। দীর্ঘনিকায়ে ঐ সাতজাতির সাতজন রাজা বা প্রেসিডেন্টের নামও পাওয়া যায়। তাঁদেরকে বলা হত সপ্তভারত - সত্তভু, ব্রহ্মদত্ত, বেস্সভু, ভরত, রেণু, এং দুইজন ধটরটট্ (ধৃতরাষ্ট্র)।

এ ছাড়াও প্রাচীন পালি গ্রন্থে নিম্নলিখিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিরও বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

| **গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র** | **রাজধানী** |
|---|---|
| শাক্যগণ | কপিলাবৎথু (কপিলাবস্তু) |
| বুলি | অল্লকল্প |
| কালাম | কেশপুত্ত |
| ভগ্গ (ভগ্য) | সুসুংমার পর্বত |
| কোলিয় | রায়গাম |
| মল্লগণ | পাবা ও কুশীনগর |
| মোরীয় | পিপ্পলীবন |
| বিদেহ | মিথিলা |
| লিচ্ছবী | বৈশালী |

মহর্ষি পাণিনিও কতকগুলি তৎকালীন প্রজাশাসিত রাজ্যের নাম করেছেন, যথা — বহ্লীক, দামান, ত্রিগর্ত, শান্তা, দাণ্ডকী, কৌশকী ইত্যাদি। ঐ রাজ্যগুলিতে সকল বর্ণের লোকের স্ব স্ব সমান অধিকার স্বীকৃত হত।

উপরিলিখিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর কথঞ্চিৎ বিবরণ দিলেই তাদের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যশাসনের সমুদয় কার্য একটি সাধারণ সভার দ্বারা পরিচালিত হত। যে গৃহে এই সাধারণ সভার অধিবেশন বসত, তার নাম ছিল — সন্থাগার (সংস্কৃত সংস্থাগার)। একজনকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হত, তিনি সভায় কার্যের বিবরণ প্রকাশ করবার পর সকলে সেই সেই বিষয়ে নিজ নিজ মন্তব্য রাখতে পারতেন। পরিশেষে সকলে লিখে অনুমোদন করতেন, তাই গ্রাহ্য হত। সে যুগে বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে ভোট গ্রহণ করবার বিধান না থাকলেও প্রত্যেকে স্ব স্ব মত এক একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠশলাকার উপর লিখে সভা কর্তৃক নিযুক্ত এক ব্যক্তির হস্তে তা অর্পণ করতেন। গ্রামের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার 'গ্রাম পঞ্চায়েত' এর উপর অর্পিত ছিল। ঐ পঞ্চায়েত এর আদেশ কার্যকরী করতে রাজকর্মচারীগণ বাধ্য থাকতেন।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিচ্ছবী জাতি অধ্যুষিত বজ্জী নামে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ছিল, তার রাজধানী ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈশালী নগরী। General Cunnninghman এর মতে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মজঃফরপুর জেলায় তিরহুতের নিকটবর্তী বাসার বা বসাঢ় গ্রাম এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলই ছিল প্রাচীন বৈশালী। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ Dr. Bloch বাসার গ্রাম খনন করে বৈশালী নগরীর অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। সেখানে একটি মৃত্তিকা স্তূপ খনন করবার সময় বহুমূল্য দ্রব্য ছাড়াও 'রাজা বিশাল কা গড়' নামে একটি প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈশালীর অর্থ বৃহৎ নগরী। সেখানে ৭৭২টি সাততলা এবং ৭৭৩২ টি একতলা বিশিষ্ট অট্টালিকা ছিল। মহর্ষি বাল্মিকীর মতে বজ্জী পূর্বে বিদেহ নামে পরিচিত ছিল। সূর্যবংশের রাজা ইক্ষাকুর বিশাল নামে এক পুত্র এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, তাই এর নাম হয় বৈশালী। বুদ্ধদেবের জীবনী হতে জানা যায়, তিনি ঐ স্থানে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। লিচ্ছবীরা এমনই পরাক্রান্ত ছিল যে, রাজা বিম্বিসারের পুত্র শক্তিশালী অজাতশত্রুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ভীত হয়েছিলেন। এইখানে বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় 'সঙ্গীতি' আহূত হয়েছিল। এই বিশাল নগরী তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরগুলি পারস্পরিক ব্যবধান ছিল অর্দ্ধ মাইল। নগরীতে যাতায়াতের জন্য অনেকগুলি সুদৃশ্য তোরণ বা বিস্তৃত রাজপথ ছিল। প্রাচীরগাত্র হতে সামান্য ব্যবধানে অনেকগুলি দুর্গও লিচ্ছবীরা নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে সদা সর্বদা লিচ্ছবী সৈন্য পাহারা দিত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে এই নগরীর উন্নত শাসন ব্যবস্থা এবং

সমৃদ্ধি বিষয়ে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাঙ্ ভারতে এসে এই নগর দেখে মুগ্ধ হন। তিনি লিখেছেন — 'এইরূপ সুন্দর নগর ভারতের আর কোথাও দেখি নাই। লিচ্ছবীদের স্বর্ণ সম্পদ প্রচুর। তাদের সাজসজ্জা স্বর্ণখচিত। হাতীর হাওদা, ছত্র প্রভৃতি এমনকি তাদের অট্টালিকার চূড়াগুলিও স্বর্ণখচিত'। এই দুই জন চীন দেশীয় পরিব্রাজকের বিবরণ ছাড়াও 'ললিতবিস্তারের' তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত বিবরণ থেকেও লিচ্ছবী শাসনতন্ত্রের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়।

বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, বিপন্নকে সাহায্য দান, রোগীর সেবা, অতিথি আপ্যায়ন, সর্বোপরি পারস্পরিক ঐক্যই ছিল লিচ্ছবী জাতির বৈশিষ্ট্য। এই লিচ্ছবীদের দেশ বজ্জী তথা প্রাচীন বিদেহ নগরেই ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সর্বপ্রথম যজুর্বেদের মন্ত্র প্রচার করেছিলেন।

লিচ্ছবীদের নৈতিক চরিত্রও ছিল অত্যন্ত উন্নত। কেউ অন্যায় করলে কৃতকর্মের জন্য শাস্তি তারা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিত। নারীর মর্যাদা রক্ষায় লিচ্ছবীরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। শিক্ষালাভের প্রতিও ছিল তাদের অসীম আগ্রহ। প্রতি পরিবারের সন্তানই বিদ্যালাভের জন্য তক্ষশীলায় গমন করত।

তারা নিজেদের মধ্যে যে সঙ্ঘ স্থাপন করেছিল তাকে গণসভাও বলা চলে। বৈশালীর ৯,৬৮,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৭৭০৭ জন গণসভার সভ্য ছিলেন। প্রত্যেকেরই সভায় বক্তৃতা ও মতামত জ্ঞাপনের সমান অধিকার ছিল এবং প্রত্যেকেই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট বা রাজা হবার স্বপ্ন দেখতেন (গণশাসন ব্যবস্থার প্রেসিডেন্টকেই রাজা বলা হত)। এর থেকেই প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র কিরূপ বিকাশ লাভ করেছিল তা অনুমান করা যায়।

বৈশালীতে নগরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সভা সমিতি করবার অধিকার এত বেশী ছিল যে বর্তমান যুগেও তা অনেক রাষ্ট্রেই কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যে সভাগৃহে বসে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করত তারও নাম ছিল সন্থাগার বা সংস্থাগার। শাসন মহাসভার অধিবেশনের পূর্বে সর্বত্র ঘন্টাধ্বনি করে সেই সংবাদ নগরবাসীগণকে জ্ঞাপন করা হত। [J. Trisakuniya : Maha Vastu (Ed. Senart)] । সভায় আলোচ্য বিষয়ের নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত থাকত। সন্থাগারে কোন আইন পাশ করাতে হলে তিনবার প্রস্তাব করতে হত। যিনি প্রস্তাব করতেন, তিনি প্রস্তাবের শেষে ঘোষণা করতেন, যাঁরা এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক নিস্তব্ধ থাকবেন। মতদ্বৈত হলে প্রত্যেকে তাঁর মতামত কাষ্ঠশলাকার উপর লিখে এই সভা হতে নির্বাচিত কোন প্রবীণ ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবেন।

মহাসভায় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় ছাড়াও কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যারও আলোচনা হত। মহাবংশে উল্লিখিত আছে, সমগ্র বৈশালী নগরের অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রে দূত প্রেরণের ব্যবস্থাও লিচ্ছবীরা করেছিল।

তাদের বিচার ব্যবস্থাও ছিল অভিনব। তা আপাতদৃষ্টিতে একটু জটিল বলে মনে হলেও তার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। কেউ অপরাধ করলে তা অনুসন্ধান করবার জন্য 'বিনিশ্চয় মহাপাত্র' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর দায়িত্ব থাকত। কিন্তু বিনিশ্চয় মহাপাত্রের অনুসন্ধানে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হলেও তিনি তাকে সহসা শাস্তি দিতে পারবেন না। তিনি তাঁর তদন্তের রিপোর্ট বোহারিক বা ব্যবহারিক (Lawyer Judges) নামক আর এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট পাঠাতে বাধ্য থাকতেন (Vide Arthashastra BK I, Ch 12, 8, Ch. 2, 91)। ব্যবহারিকের রিপোর্ট আবার সূত্তধার বা সূত্রাধার নামক আর এক শ্রেণীর কর্মচারী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করে দেখতেন, পরে তা 'অষ্টকুলক' নামে আর এক শ্রেণীর কর্মচারীর নিকট প্রেরিত হত। আটটি ভিন্ন কুল বা গোত্রের লোক নিয়ে গঠিত এই 'অষ্টকুলকের' একটি স্বতন্ত্র বিচারশালা ছিল, তা কতকাংশে বর্তমান যুগের High Court এর মত। ঐতিহাসিক Turnour এর মতে, ঐ প্রকার আদালতকে High Court না বলে A Federal Court of Appeal বলাই সঙ্গত (Turnour : J A. S. B. 1838 I)।

যাই হোক এইভাবে সকল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মচারীগণ অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে একমত হলে তবেই দোষী ব্যক্তির সাজা হত। কিন্তু যে কোন একটি বিভাগ আপত্তি উত্থাপন করলে অপরাধীকে তদ্দণ্ডে মুক্তি দেওয়া হত, ফলে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে বিচার বিভ্রাটের জন্য অযথা কোন শাস্তি ভোগ করতে হত না (Turnour : J. A. S. B. VII)।

লিচ্ছবী গণতন্ত্র ছাড়াও বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হতেই আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র বর্তমান ছিল, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'বৈরাজ্য' শব্দটি তার অকাট্য প্রমাণ। বৈরাজ্য শব্দের একটি অর্থ 'উজ্জ্বল অবস্থা' হলেও তার আর একটি অর্থ রাজা বিহীন শাসনতন্ত্র — 'জনপদা উত্তরকুরু উত্তরমুদ্রা ইতি বৈরাজ্যা যৈবতেহভিষিচ্যন্তে' (Aitareya Brahman VIII, 14)। পাণিনির কাল হতেই মদ্রগণ যে প্রজাতন্ত্রী ছিল এবং সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে তাদের ক্ষমতার হ্রাস হয় নি, গুপ্ত সম্রাটের কতকগুলি পাঠে তা অবগত হওয়া যায় (Fleet : Gupta Inscription)। শাকল বা শিয়ালকোট জেলা ছিল উক্ত মদ্রদের রাজধানী (Panini & Mahabharat, Kama-Parvam chs XI X LIV)।

এই প্রসঙ্গে বৈত্যহার্য্যগণের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের রাজ্যের আয়তন ছিল বিরাট। বৈত্যহার্যগণের মধ্যে যে সাম্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল পাণিনি তা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন। তাঁর লিখিত ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্রে 'পুগ', 'বার্ত্তা', 'আয়ুধ' এবং 'শাস্ত্রোপজ্জীবিন্‌-সঙ্ঘ' প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায় ধারণা করা যায় যে খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দী হতেই ভারতবর্ষে সঙ্ঘ'নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্বে এবং বৃহস্পতির ধর্মশাস্ত্রে এই জাতীয় শাসনতন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তক্ষশীলা, পাবা, কুশীনগর প্রভৃতি নগরে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও ছিল লিচ্ছবীদের মত সুসংগঠিত। আকার, আয়তন এবং শাসন পদ্ধতিতে এই সকল প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে জার্মানি ডাচি (Duchy) পুঞ্জের অথবা এ্যাংলো-স্যাক্সন ইংলণ্ডের সপ্তরাজ্য Heptarchy এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সকল প্রজাতন্ত্রের স্ব স্ব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকলেও এদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল একথা বলা যায় না। আলেজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে অশ্মক, নাইসা, পুষ্করাবতী, অভিসারপ্রস্থ, শ্লোকানিকয়, কাথাইওয়ত্র, সৌভূতি, শিবি, মালয়, রুদ্রক, পাত্তাল এবং মুসিকানি প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্রমাগত অন্তর্বিপ্লব ও ষড়যন্ত্র লেগে থাকলেও তারা যে হীনবল হয়ে পড়েছিল এটাও ঐতিহাসিক সত্য। Mc. Gindle এর Invasion of India by Alexander the Great নাম পুস্তকে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান লিপিবদ্ধ আছে।

এই শ্রেণীর গণরাষ্ট্রগুলি সাধারণতঃ এক একজন কুলপতি বা গোত্রপতির অধীনে থেকে, কোথাও বা কতকগুলি কুল ও গোত্র একত্র হয়ে স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করত, যেমন — পূর্বোক্ত বজ্জীতে। আবার কোন কোন স্থানে দুইজন প্রধান একত্র হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, যথা — সিন্ধুনদ বিধৌত ভূভাগের মধ্যবর্তী অঞ্চল পাত্তাল বা পাতালেন। গ্রীসদেশে স্পার্টা নামক রাজ্যের ন্যায় ঐ প্রধান যুগলকে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য পাত্তালে রাজ্যের জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা সংগঠিত হত। এদের সঙ্গে প্রাচীন রাইন্‌ উপত্যকার সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ অথবা গ্রীসের ডিলস বা এটোলিয় জাতিগোষ্ঠীর তুলনা করা যেতে পারে।

সেযুগে আর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল শাক্য প্রজাতন্ত্র। বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত কপিলাবস্তু মহকুমা ছিল শাক্যদের রাজধানী। ভগবান বুদ্ধদেব ছিলেন এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি শুদ্ধোধনের পুত্র। শুদ্ধোধন বলতে অনেকেই মনে করেন যে, রাজা শুদ্ধোধন। ইহা সত্য নয়। গণেশ বা গণপতির অর্থ যেমন— যিনি গণকে পরিচালিত করেন, তেমনি শুদ্ধোধন ছিলেন সেইরূপ সভাপতি অর্থাৎ President of the Republic of the Sakyas. জাতকে কোন কোন স্থানে তাঁকে সাধারণ নাগরিক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায়, গণশাসিত রাষ্ট্রে 'একচ্ছত্র অধিপতি' অর্থে 'রাজা' শব্দ প্রয়োগ হত না। কয়েকটি গণরাষ্ট্রের নির্বাচিত 'সভাপতিদের' মধ্যে কেউ কেউ 'রাজা' বা 'রাজন' ব্যবহার করতেন বটে, (Arthashastra by Kautilya), তবে গণশাসনে এইরূপ রাজার অবস্থা ছিল যে তিনি কখনও ordinary citizen , কখনও বা President অর্থাৎ সভাপতি। সভাপতিরূপে নির্বাচিত হবার পরেও মন্ত্রণাসভার প্রতিটি সভ্যে সমর্থন না করলে তাঁর পক্ষে কোন বিশেষ আইন বা নিয়ম রাজ্য মধ্যে প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল না। গণতন্ত্র সে যুগে কতখানি বিকাশ লাভ করেছিল এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শাক্যদেরও শাসন ও বিচারকার্য সাধারণ সমিতিতে নির্ধারিত হত। প্রায় পাঁচশত সভ্য নিয়ে তাদের পরামর্শ সভা (সন্‌থাগার) গঠিত ছিল। যে কোন বিষয়ে গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সভার পূর্ণাঙ্গ

অধিবেশন আবাহন করে সভ্যদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ছিল তাদের রীতি। সভার অধিবেশনকালে একজনকে প্রধান সভাপতিরূপে নির্বাচন করা হত (Mahaparinibbana Suttanta)। তিনিই সভায় নায়কত্ব করতেন। তাঁর পদমর্যাদা অনেকাংশে Roman Consul অথবা Greek Archon এর অনুরূপ ছিল।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা এবং অনুশাসন লিপি হতে ঐ সময়ে ভারতে যুধেয় বা যোধেয় নামে আর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জাতি যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ ছিল। রোটকে এদের সুঙ্গযুগের যে মুদ্রা-গৃহ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কতিপয় মুদ্রা এবং উজ্জয়িনীর বিখ্যাত শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর গিরণার লিপি হতে জানা যায় যুধেয়গণ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বয়ং রুদ্রদামনও এদেরকে পরাজিত করতে পারেন নি (See J.B.O.R.S., 1936 Vol xxii, A.S.B. 1884)। ভরতপুর রাজ্যে এদের একটি অতীব সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত যে অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে লিখিত আছে —

'সর্বক্ষেত্রাবিষ্কৃত-বীরশব্দ জাতোৎসেকাবিধেয়ানাং যৌধেয়ানাম্।'

যে সকল স্থানে এই জাতীয় মুদ্রা বা মৃত্তিকা ফলক পাওয়া গেছে, তাদের বিষয় আলোচনা করলে যুধেয় প্রজাতন্ত্রের সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে আমরা কতকটা ধারণা করতে পারি। পাঞ্জাবের পূর্বাংশ হতে শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ তাদের অধীনে ছিল। ইদানীং দিল্লী ও কর্ণালের মধ্যস্থিত শোনপথ নামক স্থানে যুধেয়দের দুটি টঙ্কশালার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেকে অনুমান করেন যে এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডও যুধেয়দের করতলগত হয়েছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই যুধেয় জাতির এক শাখা রাজপুতানার পশ্চিম অংশে গমন করতে বাধ্য হয় এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে শকরাজা রুদ্রাদমনের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। অবশিষ্টাংশ কুষাণ যুগ পর্যন্ত যে অপ্রতিহতভাবে আপন ক্ষমতা রক্ষা করতে পেরেছিল তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে (V, Smith-Catalogue of Coins in Indian Museum Vol. 1)।

মুদ্রাতত্ত্বের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যুধেয়গণ তৎকালে একটি শ্রেষ্ঠ রণকুশল জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এদের একপ্রকার মুদ্রার উপরিভাগে কার্ত্তিকেয়ের নাম ও মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায় (J.B.O.R.S. XXII)। এতে মনে হয়, কার্ত্তিকেয় ছিলেন তাদের উপাস্য দেবতা। যুধেয়দের আর একশ্রেণীর মুদ্রা পাওয়া গেছে যার একদিকে একজন যোদ্ধার মূর্ত্তি কিন্তু অপর দিকে 'যুধেয় গণস্য জয়' নামক বাক্যটি ক্ষোদিত আছে। বিজয়গড় প্রস্তর অনুশাসন লিপিতেও লেখা আছে যে, যুধেয় প্রজাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন নির্বাচিত সভাপতি। হোসিয়ারপুর হতে যে সমস্ত মুদ্রা ও শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির অধিকাংশের উপরিভাগে যুধেয় মন্ত্রণাসভা অথবা রাষ্ট্রের উচ্চতম কার্যনির্বাহক সভার নাম ক্ষোদিত আছে।

পূর্বেই বলেছি যে রাজনীতির দিক দিয়ে মল্ল এবং বিদেহ (বৃজী বা বজ্জী) ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী। পাণিনি এবং কৌটিল্য উভয়েই ঐ দুইটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও এই প্রসঙ্গে ভগ্ন (ভগ্‌গ), বুলি এবং মালব প্রজাতন্ত্রের নামোল্লেখ করাও উচিত মনে করছি। কৌশাম্বীর বৎস জাতি ছিল ভগ্‌গ বা ভর্গদের নিকটতম প্রতিবেশী। মীর্জাপুর জেলার কোন পার্বত্যদুর্গে সিংসুমার পর্বতে এদের শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। (উক্ত জেলার চুণারগড়কে অনেকে সিংসুমার পর্বত বলে মনে করেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য আমি এখন পর্যন্ত দেখি নি)। তবে ভর্গরা যে প্রজাতন্ত্রী ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ স্বয়ং পাণিনি স্বীকার করেছেন যে, এরা সমগ্র পূর্বদেশীয় প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব করবার যোগ্য ছিল।

মালব প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল পাঞ্জাবে। পাণিনি বলেছেন এই রাজ্যের অধিবাসীরা যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিল, অস্ত্রবিদ্যার সাহায্যেই এরা আপন আপন জীবিকা নির্বাহ করত। রাবি উপত্যকার নিম্নাঞ্চলের নিকটবর্তী ঝাঙ্গ জেলার দক্ষিণভাগে এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি অবস্থিত ছিল। যুধেয়গণের ন্যায় মালববাসীরাও শকজাতির সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে বাধ্য হত। দুঃখের বিষয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মালব প্রজাতন্ত্র লুপ্ত হয়।

এইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ মৌর্যবংশের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে উত্তর ভারতের নানা স্থানে যে রাজতন্ত্রের পাশাপাশি বহু প্রজাশাসিত রাষ্ট্রেরও বিকাশ ঘটেছিল তার বহু নিদর্শন বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের

হস্তগত হয়েছে। গ্রীক পর্যটকগণও অতি স্পষ্ট ভাষায় তা স্বীকার করে গিয়েছেন। মেগাস্থিনিস্ রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এই উভয় প্রকার শাসনপদ্ধতির আলোচনা করে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠতর বলে প্রশংসা করেছেন। কার্সিয়াসও মেগাস্থিনিসের এই মত সমর্থন করে আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, শিবয় (শিবি), অক্সিড্রাকয় (ক্ষুদ্রক), প্রভৃতি ভারতীয় জাতিগণ সাম্যতন্ত্রেরই সমধিক পক্ষপাতী ছিল, রাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিকে তারা পছন্দ করত না। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে যে সব রাজ্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন সেগুলির প্রায় অধিকাংশই ছিল সাধারণতন্ত্রী। চাণক্য এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। চন্দ্রগুপ্তের সহায়তায় বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকালে প্রথম সুযোগেই তিনি এইরূপ কয়েকটি রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছিলেন বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা যায় না, চাণক্যও শত চেষ্টাতেও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারেন নি। তাই দেখা যায়, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের পরে মৌর্য সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ হল, তখন পুনরায় উত্তর ভারতে নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল।

বর্তমান যুগে খননকার্যের ফলে এমন অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, যেগুলির উপর 'জন' শব্দটি ছাড়াও এমন অনেক তথ্য পাওয়া গিয়াছে যে, মুদ্রাতত্ত্বের সেই সব প্রমাণ গ্রাহ্য হলে এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে যুধেয়, মালব, অর্জুনায়ন, কলিঙ্গ এবং শিবি প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রসমূহ ঐ সময় পুনর্বার আপনাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল।

শেষে বলেন, আমি যে সব Reference Book এর উল্লেখ করেছি, তুমি সেই মূলগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করলে প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত তথ্য জানতে পারবে।

আমি — ঐতিহাসিক মাত্রেই বস্তুগত উপকরণের উপর নির্ভর করে বই লেখেন, অতীত কালের পুরাবৃত্ত রচনায় এ ছাড়া উপায়ও নাই কিন্তু ঐ বস্তুগত উপকরণ যখন পুঁথিগত উপকরণের দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই তা অধিকতর প্রামাণ্য হয়ে ওঠে। আপনার বলার বৈশিষ্ট্য এমনই যে তাতে পুঁথিগত উপকরণই বেশী, বস্তুগত উপকরণও আছে - প্রচুর আছে - তবে তা পুঁথিগত উপকরণের সহকারী প্রমাণ হিসাবে। কাজেই আমার মত আপনার ছাত্রতুল্যের পক্ষে ভাল লাগার কথা জানানই প্রগলভতা মাত্র। তবু আপনার প্রদত্ত উপদেশকে ছাত্র যেমন ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে মনন করে তেমনি মননের ছলেই কিছু কিন্তু বিনম্রভাবে নিবেদন করছি। বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আমার বক্তব্য শোনার জন্য উৎসুক মুখে তাকাতেই আমি শুরু করলাম —

ঐতিহাসিকের অধ্যবসায় এবং বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কোন কথা বলাটাও আমার পক্ষে 'অব্যাপারেষু ব্যাপারং'। খননকার্যের ফলে ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত অতীত যুগের মৃৎপাত্র কঙ্কাল মূর্তি আদি যা পাওয়া যায় তা যদি তৎকালীন পুঁথিগত প্রমাণের সঙ্গে মিলে যায় তাহলেই তা বিশ্বাসযোগ্য। অর্থাৎ আমি ইতিহাস রচনায় বস্তুগত উপকরণকে পুঁথিগত উপকরণের সহায়ক ও সমর্থক হিসাবেই মূল্য দিই। একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করতে পারব। যদি কোনদিন এমন হয় যে আণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার বেপরোয়া আক্রমণে বর্তমান যুগের শহরাদি সহ সভ্যতার সকল নিদর্শন ধ্বংস হয় আর জঙ্গল বা গিরিগুহায় কিছু অসভ্য এবং অর্ধসভ্য মানুষ যদি কোনক্রমে বেঁচে থাকে, কালক্রমে তাদেরই বংশধররা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে — একথা সহজেই ধারণা করা চলে। মনে করা যাক্ ঐসব অসভ্যদের মধ্যে কয়েকজন লেখাপড়ায় উন্নত হয়ে একদিন দেশবিদেশের পুরাবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হলেন। আধুনিক সভ্যসমাজ বিলুপ্ত হওয়ার হাজার বছর পরে তাঁরা যদি আধুনিক কলিকাতা শহর যেখানে, সেখানে খনন কার্য চালান এবং অপরিমিত বাসনপত্র, মূর্তি, ঘোড়ার গাড়ীর চাকা, ট্রামের পাত ইত্যাদি পান, তাহলে তার উপর নির্ভর করে ঐ নবজাতির পণ্ডিতরা যত চেষ্টা করুন না কেন, তাঁদের পক্ষে কোনমতেই এই যুগের এই সুসভ্য জাতির রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক বা সামাজিক কার্যাবলী এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনই ধারণা করা সম্ভব হবে না। কলিকাতা শহরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাঁরা যদি সহসা ইংরাজীতে লেখা কয়েকটি নামের প্লেট এবং সাইনবোর্ড পান, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? যদি কোন গতিকে তাঁরা সেগুলির পাঠ উদ্ধার করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা ধারণা করে বসবেন যে বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষাভাষী এক জাতি বঙ্গদেশে বাস করতেন। আবার এখানকার গবেষণা কাজ শেষ করে সেই পণ্ডিতের দল যদি বর্তমান ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানেও ইংরাজীর

নিদর্শন পান তাহলে তাঁরা পুনরায় সিদ্ধান্ত করে বসবেন যে বঙ্গদেশ হতে একদল ইংরাজ ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইংরাজী ভাষাভাষী করে তুলেছিলেন!!

কিন্তু যদি ঐ সব অনুসন্ধানকারী গবেষণাকারীর দল খনন কার্য করতে করতে সহসা কলিকাতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোন লাইব্রেরী ঘরের ভগ্নস্তূপ হতে বেদ উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট প্রভৃতির পুস্তক কিংবা আচার্য যদুনাথ, স্মিথ সাহেব, পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল ও কোন প্রথিতযশা ঐতিহাসিকের বই পান, তাহলে তাঁরা অতীত ভারত তথা বঙ্গদেশের যে গৌরবময় চিত্র পাবেন তা কি প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে শত সহস্র প্রকার বস্তুগত উপকরণের চেয়ে বেশী মূল্যবান নয়? সত্যকার ছবি কোন্‌টিতে বেশী অঙ্কিত? শত শত জীব কঙ্কাল, রাশি রাশি তৈজসপত্র, গাড়ীর চাকা, সাইনবোর্ড এবং নামের প্লেটের স্তূপ প্রভৃতির গহন অরণ্যে পুরাতত্ত্বসন্ধানী যখন দিশেহারা হয়ে পড়বেন, তখন ঐ সব গ্রন্থের একটি বাক্য কিংবা অনুচ্ছেদ কি বস্তুগত উপকরণের চেয়ে বেশী মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে না? কিন্তু আমি কিছু কিছু ঐতিহাসিকের অতিরিক্ত বস্তুগত উপকরণ প্রিয়তা দেখে তাজ্জব হয়ে যাই।

যাইহোক, যে সব ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে ভারতে চিরকাল স্বৈরশাসন প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি নাকি কেবল স্বেচ্ছাচারী রাজাদের কীর্তি কাহিনীতে পূর্ণ, তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত ভুল — তার প্রমাণ পেলাম। বৈদিক ভারতে কোথাও কোথাও রাজতন্ত্র থাকলেও সেযুগে অনেক রাজ্যেই যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল এবং গণশাসনই ছিল ভারতবাসীদের অধিকতর মনঃপুত। আমার বেশ মনে পড়ে, বেদাধ্যয়ন কালে আমরা অনেক মন্ত্র পেয়েছি, যেখানে স্পষ্টতই বুঝা যায়, সে যুগে রাজতন্ত্র থাকলেও রাজার পক্ষে কোন মতে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার উপায় ছিল না, কারণ, রাজারা প্রজাদের দ্বারাই নির্বাচিত হতেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তের প্রথম ঋক্‌টিতে পাই —

আ ত্বাহার্ষমন্তরোধ ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশ্বস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রংশৎ॥

— এখানে ব্যক্তিবিশেষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রজাবর্গ তাঁকে আহ্বান করছেন। মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে — বিশ্বস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু অর্থাৎ সর্বা বিশঃ, সকল প্রজাই আপনাকে চাচ্ছে। এর পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি। সেখানে প্রজাদের উক্তি, 'পঞ্চগ্রামের সকলে মিলিত হয়ে আপনাকেই রাজপদে নির্বাচন করতে সম্মত হয়েছেন। আপনি সুনিয়মে অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত ও ধর্মসঙ্গত বিধান অনুসারে প্রজাপালন করতে থাকুন —

ধ্রুবো দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ ধ্রুবো রাজা বিশাময়দ্॥ (ঋ ১০/১৭৩/৪)

বেদের এই প্রামাণ্য উক্তিই প্রমাণ করে যে রাজন্যবর্গকে প্রজাপুঞ্জের শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে চলতে হত। যাঁকে অপরের শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয়, তার পক্ষে স্বৈরাচারী হবার সুযোগ কোথায়?

কাজেই যাঁরা আমাদের দেশে পূর্বে কেবল রাজাদেরই আধিপত্য ছিল বলে প্রচার করেন, তাঁদের বুঝা উচিত যে কোথাও কোথাও রাজতন্ত্র থাকলেও রাজা ছিলেন বর্তমান যুগের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মত একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। রাজা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হল, যিনি প্রজারঞ্জন করেন। তাঁকে আবার নির্বাচিত হতে হত, কাজেই স্বৈরাচারের কোন কথাই উঠতে পারে না।

আপনি উত্তরকুরু উত্তরমদ্র প্রভৃতি স্থানে 'বৈরাজ্য' অর্থাৎ রাজাবিহীন শাসনতন্ত্রের (অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার) পরিচয় দিতে গিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের Reference দিয়েছেন। ঐ ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই পাওয়া যায়, ভারতীয় রাজাদেরকে অভিষেকের সময় উপস্থিত প্রজাবৃন্দের কাছে শপথ করে বলতে হত — 'যাঞ্চ রাত্রিমজায়েহং যাঞ্চ প্রেত্যাস্মি পূর্তং মে লোকং সুকৃতমায়ুঃ প্রজাং বৃঞ্জীথাঃ। তদুভয়মন্তরেনেষ্টা যদি তে দ্রুহ্যেয়ামীতি — অর্থাৎ যে রাত্রিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর যে রাত্রিতে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব, এই উভয়কালের মধ্যে আমি যা কিছু সুকৃত কর্মের অনুষ্ঠান করি না কেন, আমার সারাজীবনের সেই সুকৃত কর্মের ফল আর আমার পরলোক এবং সন্তান সন্ততি সব কিছু হতেই আমি যেন বঞ্চিত হই যদি আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করি।'

ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকরা স্বীকার না করলেও, কিন্তু আমরা জানি যে বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিল। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখছি, রাজার কর্তব্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আছে —

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতং।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্।।

অর্থাৎ প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার হিতেই রাজার হিত। কোন ব্যক্তিগত প্রিয় জিনিস বা প্রিয়কর কার্যকে হিত বলে মনে করা চলবে না। প্রজার পক্ষে হিতকর এবং প্রিয়কর কার্যকেই তিনি হিত বলে জ্ঞান করবেন।

এই হল প্রাচীন রাজাদের আদর্শ। ভারতবর্ষে রাজাকে রাজত্ব লাভ করার পর (অর্থাৎ তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান রূপে প্রজাদের দ্বারা বৃত হবার পর) মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শানুসারে রাজকার্য পরিচালনা করতে হত। শুক্রনীতি বা কামন্দক নীতিসার নামক দুখানি গ্রন্থের স্পষ্ট অনুশাসন, রাজা যদি সর্ববিদ্যায় কুশলী এবং সুমন্ত্রবিদ্‌ও হন, তথাপি তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়া একাকী রাজকার্য পরিচালনা করবেন না। এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা স্বতন্ত্রলাভের ইচ্ছা করলে তাঁর অনর্থই ঘটবে।

তদ্বিধো কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ।
আত্মানাং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্মতিঃ।। (রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ডম্, ৩৭ সর্গ)

অর্থাৎ যে রাজা দুঃশীল, দুর্বুদ্ধি ও কামচারী (যে ইচ্ছামত কার্য করে) এবং পাপীলোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করে, সেই রাজা রাজ্যসহ স্বজন এবং নিজেকে বিনষ্ট করে।

শুধু তাই নয়, রাজা তাঁর পছন্দমত কাউকে মন্ত্রীপদেও নিযুক্ত করতে পারতেন না। যে সকল লোক পৌর ও জনপদবাসীর আস্থাভাজন, একাধারে যোদ্ধা, নীতিজ্ঞ এবং পণ্ডিত, এমন ব্যক্তিই মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন —

পৌর জনপদা যস্মিন্ বিশ্বাসং ধর্মতাং গতাঃ।
যোদ্ধা নয় বিপশ্চিচ্চ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি।। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৮৩অ, ৪৪)

কোন্ কার্য করা সংগত, কোনটি অসংগত, যে ব্যক্তি তা রাজার মুখের উপর বলতে পারতেন, শান্ত দান্ত গুণসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ, উদারপ্রাণ সরল ব্যক্তিই মন্ত্রী হতে পারতেন —

হ্রীণি সেব্যস্তথা দান্তাঃ সত্যার্জবসমন্বিতাঃ।
শক্তা কথায়িতুং সম্যক্ তে তব স্যুঃ সভাসদঃ।।

রাজাকে শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে চলতে হত এবং এই শাস্ত্রে নির্দেশ হল, সর্বাবস্থায় রাজাকে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে হবে, কারণ মন্ত্রণাই বিজয়ের মূল —

মন্ত্রমূলক বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ। (রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ডম্, ৬ষ্ঠ সর্গ)

রামায়ণ ও মহাভারত — এই দুটি মহাকাব্য ভারতীয়দের শুধু জীবন বেদ নয়, এই দুই মহাগ্রন্থে তৎকালীন সমাজচিত্র সহ ইতিহাসের বহু নির্ভরযোগ্য উপাদান আছে। মহাভারত বর্ণনা করেছেন, রাজার শাসন-পরিষদে চারজন বেদজ্ঞ পূতাচারী ব্রাহ্মণ, আটজন সমরবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় বীর, একুশজন বিত্তশালী বৈশ্য, তিনজন নিত্য কর্মরত পবিত্র চরিত্র বিনীত শূদ্র এবং একজন সর্বপ্রকার ব্যসনবর্জিত দূতসহ মোট সাঁইত্রিশ জন সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক (শান্তিপর্ব, ৮৩ অ, ৭-১১, ২৬-২৭, ৪৭ শ্লোক)।

মহাভারতের ঐ কথারই প্রতিধ্বনি পাই অর্থশাস্ত্রে। কৌটিল্যও বলেছেন, আত্যয়িক বা বিশেষ কার্যের জন্য মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তদনুসারে কাজ করা রাজার পক্ষে আবশ্যিক ছিল।

আপনি Indian Antiquary (1913) এর Reference দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সম্রাট অশোকের আদেশ সত্ত্বেও মন্ত্রী রাধাগুপ্ত তাঁর বৌদ্ধসঙ্ঘে দানের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ শাসনকার্য তো দূরের কথা রাজার খেয়ালখুশীমত কাউকে রাজকোষ হতে অর্থদানেরও ক্ষমতা ছিল না। এইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা, অমাত্য এবং প্রজা এই তিনজনের মতামতের সামঞ্জস্য বিধানই ছিল শাসনতন্ত্রের মূলকথা। Absolute Monarchy বা Oligarchy তো দূরের কথা, শাস্ত্রমুখে আমরা এমনও ঐতিহাসিক তথ্য পাই যে,

রাজা ছিলেন বেতনভোগী, ঠিক যেন প্রজাদের একজন কর্মচারী! এই সম্বন্ধে একটি প্রাচীন উক্তিতে পাই, রাজা সৈন্যদেরকে বলছেন — 'তুল্য বেতনোঽস্মি ভবদ্ভিঃ সহ ভোগ্যমিদং রাজ্যম্'। 'আমিও তোমাদের মত বেতনভোগী। আমার সঙ্গে তোমাদেরও এই রাজ্য ভোগ করার সমান অধিকার রয়েছে।' মনুর বিধানে রাজার অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। যে অপরাধ করলে সাধারণ লোকের এক পণ অর্থদণ্ড হয়, সেই অপরাধে রাজাকে সহস্র পণ অর্থদণ্ড দিতে হত।

যেখানে এইরকম অবস্থা এবং ব্যবস্থা — ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা যতই রটনা করুন — সেখানে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ছিল একথা কিভাবে বলা যায়? প্রকৃত রাজতন্ত্রে ক্ষমতাশালী রাজা কি কখনও প্রজাদের ইচ্ছা এবং পরামর্শানুসারে কাজ করেন?

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা কেবল পাথুরে প্রমাণকে সম্বল করে যা তা মন্তব্য করে থাকেন, তাঁদের শাস্ত্রদৃষ্টি থাকলে বুঝতেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ছিল কল্যাণব্রতী, তা কোনমতেই প্রজাপীড়নের যন্ত্র ছিল না। কৌটিল্য রাষ্ট্রতন্ত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন — যে চাপ্যসম্বন্ধিনোঽবশ্যভর্তব্যাস্তে — যারা সম্বন্ধহীন, মাতাপিতৃহীন অনাথ তাদের ভরণপোষণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ভেবে আশ্চর্য হই, এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সম্বন্ধহীনের জন্য কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই, তাদের অনেককেই ভিখারী ভবঘুরে রূপে (Vagrants) পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয় কিন্তু সে যুগে রাষ্ট্র তাদের ভার নিয়েছিল। কৌটিল্য আরও বর্ণনা করেছেন সূত্রাধ্যক্ষের (সূতা ও বস্ত্রবিভাগের কর্ত্তা) উপর নির্দেশ ছিল, যারা 'নিষ্কাষিণ্য' অর্থাৎ গৃহ হতে বের হন না, বিধবার কিংবা প্রোষিতভর্তৃকা এবং অঙ্গহীন এইরূপ মহিলাদেরকে যদি নিজের ভরণপোষণের জন্য কাজ করতে হয়, তাহলে সূত্রাধ্যক্ষ — 'স্বদাসীভিরনুসার্য সোপগ্রহং কর্মকরয়িতব্যা' — নিজ বিভাগের দাসী দ্বারা তাঁদের অনুসন্ধানপূর্বক যথেষ্ট সম্মান ও বিনয় সহকারে তাঁদেরকে ভরণপোষণের উপযোগী কার্য দিতে বাধ্য থাকবেন।

এমন প্রাণের পরশ এবং মমতা যে রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ছিল, তাকে একমাত্র অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া আর কারও পক্ষে 'স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র' বলে নাসিকা কুঞ্চন করা সম্ভব নয়। যিনি ব্যবসা বাণিজ্যের দপ্তর পরিচালনা করতেন সেই 'পণ্যাধ্যক্ষের' উপর নির্দেশ ছিল — উভয়ং চ প্রজানামনুগ্রহেণ বিক্রাপয়েৎ। স্থূলমপি চলাভং প্রজানামোপঘাতিকং বায়য়েৎ — অর্থাৎ স্বভূমিজ ও পরভূমিজ এই উভয় প্রকারের দ্রব্যই যাতে যথোচিত মূল্যে ক্রয়বিক্রয় হয়, তার ব্যবস্থা করবেন পণ্যাধ্যক্ষ। যে পরিমাণে অতিরিক্ত লাভ করতে প্রজাবর্গের কষ্ট হয়, তা করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। এইভাবে প্রজার সার্বিক কল্যাণ বিধানই ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল লক্ষ্য। প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত 'রাজা' আখ্যাধারী নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ব্রতই ছিল প্রজাদের মঙ্গলসাধন — রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্বে তেন রাজেতি শব্দ্যতে (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৫৯ অ)।

অথর্ববেদের তৃতীয় কাণ্ডের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে রাজা নির্বাচনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে — 'ত্বাং বিনো বৃণতাং রাজ্যায়'। এখানে 'বৃ' ধাতুর অর্থ বরণ বা নির্বাচন করা। ঐ অথর্ববেদেরই তৃতীয় কাণ্ডের চতুর্থ সূক্তে 'বরুণৈঃ সংবিদানঃ' (৭ম মন্ত্র) এবং 'সর্বাঃ সংগত্য বরায়ন্তে অক্রণ্ (৮ম মন্ত্র) দ্বারা প্রজামণ্ডলী ঐক্যমত হয়ে রাজা নির্বাচন করছেন, এ চিত্র সুপরিস্ফুট —

> পথ্যা রেবতোর্বহুধা বিরূপাঃ সর্বাঃ সগত্য বরায়ন্তে অক্রণ্।
> তাস্ত্বা সর্বাঃ সংবিদানা হ্বয়ন্তু দশমীমুগ্রঃ সুমনা বশেহ॥

এই মন্ত্রে 'দশমীমুগ্রঃ সুমনা বশেহ' দ্বারা রাজাকে যে মাত্র দশ বৎসরের জন্য নির্বাচন করা হত, তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এইভাবে একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য রাজা নির্বাচনের ইঙ্গিত থাকায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিকযুগে রাজপদ কতকাংশে সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট পদের মত নির্বাচন মূলক ছিল। প্রজার সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া কেউ যে রাজপদে নির্বাচিত হতে পারতেন না, তার প্রমাণ রামায়ণেও আছে। রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার পূর্বে প্রবল প্রতাপান্বিত দশরথের মত লোকও পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের অনুমোদন নিতে বাধ্য হয়েছিলেন —

> নানানগরবাস্তব্যান্ পৃথগজানপদানপি।
> সমানিনায় মেদিন্যাঃ প্রধানন্ পৃথিবীপতিঃ॥ (অযোধ্যাকাণ্ডম্, ১ম সর্গ, ৪৬ শ্লোক)

ঐ সভায় ব্রাহ্মণগণ, দেশনায়কগণ, পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা যে একমত হয়ে রাজা দশরথের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন তা 'সমানিনায়' পদের দ্বারা সূচিত হচ্ছে।

সকলে সম্মতি দেওয়ার পরও দশরথ সমবেত প্রজাবর্গকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা সত্য সত্যই মনে প্রাণে রামকে চান, না কেবল আমার অনুরোধেই তাঁকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করতে চাচ্ছেন?

যদিদং মেহনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্। ভবন্তং মেহনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্॥ ১৫
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্য দ্বিচিন্ত্যতাম্। অন্য মধ্যস্থ চিন্তা তু বিমর্দাভ্যধিকোদয়া॥ ১৬

(অযোধ্যাকাণ্ডম্, ২য় সর্গ)

দশরথের এই উক্তিতে স্পষ্টভাবেই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে পুরাকালে আমাদের দেশে কি রাজপদ প্রাপ্তি, কি শাসনকার্য পরিচালনা, যে কোন বিষয়ে কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলেই রাজা প্রজাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকতেন। রাজা অত্যাচারী কিংবা উন্মার্গগামী হলে তাকে বিতাড়িত করার অধিকারও প্রজাদের ছিল। এর উদাহরণ — রাজা বেণের উপাখ্যান। মহাভারতে শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে দেখা যায় যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করছেন — 'রাজা শব্দের উৎপত্তি বা রাজপদের সৃষ্টি কি ভাবে হল? অন্য লোকের মত রাজারও দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু আছে। যে কোন লোক হতে রাজার বুদ্ধিও যে সব সময় বেশী হবে এমন কোন কথা নাই। তবে তিনি অন্যের উপর শাসনদণ্ড চালাবার অধিকার পেলেন কিভাবে?'

ভীষ্ম তার উত্তরে বললেন — 'সত্যযুগে রাজা ছিল না। লোক স্বাধীনভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ এবং ধর্মাচারণ করত। কিন্তু পরে মানুষ লোভ, ক্রোধ এবং কামনার বশবর্তী হয়ে ধর্মপথ ত্যাগ করতে শুরু করায় মানবসমাজে পীড়িত হতে থাকল। তখনই দণ্ডনীতির সৃষ্টি হল এবং অনঙ্গ পৃথিবীর প্রথম রাজা হলেন। তাঁর পুত্র অতিবল দণ্ডনীতি অনুসারে রাজত্ব করার পর অতিবলের পুত্র বেন রাজা হন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যাচারী। প্রজাদের ইচ্ছাক্রমে ঋষিরা বেণকে বিতাড়িত এবং পরে হত্যা করেন। বেণের পর রাজা হলেন পৃথু। তিনি ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর সময় থেকেই শাসকদেরকে রাজা নামে অভিহিত করা হতে থাকে। রাজা শব্দের অর্থই হল যিনি প্রজারঞ্জন করেন — রঞ্জিতাশ্চ প্রজা সর্বে তেন রাজেতি শব্দ্যতে।'

ভীষ্ম প্রদত্ত ঐ বিবরণের সারমর্ম গ্রহণ করে আমাদের ভেবে দেখা উচিত, সে যুগে রাজতন্ত্র থাকলেও তা কি ধরণের রাজতন্ত্র — যেখানে রাজাকে প্রতিনিয়ত প্রজাদের শুভ ইচ্ছা ও করুণার উপর নির্ভর করে চলতে হয়? ধর্মনীতি, প্রজাকল্যাণের ব্রত এবং মানবিক নীতি থেকে বিন্দুমাত্র স্খলন ঘটলেই যেখানে রাজপদ চলে যায়, প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হতে তা কোন অংশে হেয়? ঐ রকম রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ কতটুকু ? একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে প্রজাতন্ত্রই সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা, ভারতবর্ষে আদর্শ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনেক ছিল, আমি কেবল বলতে চাই যে, সে যুগে রাজতন্ত্র থাকলেও প্রজাদের স্বাধীনতা এবং অধিকার এমনই নিরঙ্কুশ ছিল যে রাজার পক্ষে কোনমতেই Dictator তো দূরের কথা Benevolent Dictator এর ভূমিকা গ্রহণও সম্ভব ছিল না। প্রজাবর্গ জার (Czar) জারিণা, নীরো, হেরোড বা অষ্টম হেনরী জাতীয় কোন স্বৈরাচারী রাজার চরণে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলে উঠতে বসতে কুর্ণিশ করছে, তাদের ধনপ্রাণ তাঁর কৃপাকটাক্ষের উপর নির্ভর করছে, এমন দৃশ্য বৈদিক ভারতে অকল্পনীয় ছিল। Monarchy থাকলেও তা ছিল সম্পূর্ণত Constitutional Monarchy — সংক্ষেপে এই হল আমার বক্তব্য। প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল না ঠিক জানিনা তবে শাস্ত্রচর্চা এবং আপনার প্রদত্ত পুঁথিগত উপকরণের সূত্র ধরেই আমি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

যে সব ঐতিহাসিক গ্রীস ব্যাবিলনের মাটির নীচে কিংবা মিশরের নীলনদের তীরে এক টুকরো পাথর, মৃৎফলক বা ধাতুপাত্র পেয়ে ভারতের ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত কোন বস্তুর তুলনামূলক বিচার করে এই সুপ্রাচীন ভারতীয় জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বেপরোয়া মন্তব্য করতে বসে যান, তাঁদের বিরুদ্ধেই আমার ক্ষোভ এবং অভিযোগ। সম্প্রতি ইউনেস্কোর (UNESCO) উদ্যোগে Prof. Lucien Febre, Dr. Francis Crouget এবং Dr. Guy S. Metraux প্রভৃতি দ্বারা সম্পাদিত 'Journal of World History' নামে কয়েকখণ্ড ম্যাগাজিন-এ ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁরা পুঁথিগত উপকরণের কোন মূল্য দিয়েছেন বলে মনে হল না। যেখানে যেখানে বেদ বেদান্ত পুরাণ ও মহাভারতাদির কিছু Reference দিয়েছেন, সেখানেও তার ভুল ও বিকৃত অর্থ করেছেন। খনন কার্যের ফলে কোথায় কি বস্তুগত উপকরণ পাওয়া গেছে তারই নিরিখে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধাত্রীস্বরূপা এই মহান্ দেশের অবমূল্যায়নেই দেখছি তাঁদের উৎসাহটা বেশী।

সাল তারিখ, শিলালিপি, প্রাচীন মৃৎফলক, যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজবংশ ইত্যাদির তালিকা ইতিহাস গঠনের মালমশলা বটে, কিন্তু ইতিহাসের যা প্রাণ তা যে এইগুলির মধ্যে যথার্থভাবে ধরা পড়ে না, একথা ইউরোপ আমেরিকার বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কেন যে বুঝতে চান না, তা আমার কিছুতেই বোধগম্য হয় না। একটি বিরাট জাতির আশা আকাঙ্খা এবং মহত্তম চিন্তাধারা ত তার ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্যের মধ্যেই বিধৃত থাকে, কেন না সেইগুলিই হল যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর। তাই আমার মতে, প্রকৃত ইতিহাস হল, মানবজীবনের বিভিন্নমুখী প্রকাশের কাহিনী — Life of man in all its manifestations. যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে মানব চিত্তের এই যে বিকাশ ও ঋদ্ধির প্রকাশ সেগুলির যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নই ইতিহাসের মূল উপাদান। তাই সাহিত্য শিল্প কারুকলা ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসকেই আমি কোন সমাজ ও দেশের সত্য ইতিহাস বলে মনে করি; সেগুলির মধ্য দিয়েই কোন জাতি বা দেশের শাশ্বত ও সনাতন রূপটি প্রকাশ পায়। সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রগঠনে, কর্মপ্রচেষ্টায়, ধর্মসংগঠনে জাতির অন্তর্নিহিত যে গূঢ় ভাবধারা রূপে ও রসে রূপায়িত হয়ে ওঠে তা যদি কারও রচিত ইতিহাসে না থাকে, কেবল স্থূল বস্তু নির্ভর কতকগুলি data এবং সিদ্ধান্তে তা যদি কন্টকিত হয়, তাহলে তাকে কি ইতিহাস বলা যায়? কেউ যদি মানব জাতির ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বৈদিক ঋষিদের উপলব্ধ সত্য, কালিদাস ভবভূতি এবং রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কাব্য . সম্পদ, বিটোফেনের সঙ্গীত, মোজার্টের সুর, প্যালিডস্কির গান, অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের চিত্র বা উদয়শঙ্করের নৃত্যকলার মোহনীয় বৈশিষ্ট্যকে উহ্য রাখে, তাহলে তা কি ইতিহাস পদবাচ্য হবে? কিভাবে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন মুখী গতির দ্বারা মানবাত্মার প্রকাশকে সার্থক করে তুলছে, তাম্রশাসন বা শিলালিপি প্রভৃতি বস্তুগত উপকরণের দ্বারা সেই গতিশীল সত্যকে কিছুতেই ধরা যায় না। কারণ ঐ সব বাহ্যিক উপকরণ শুধু দেশ ও কালের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সত্যের একটা খণ্ড রূপ মাত্রকেই প্রকাশ করে।

তাই বলছিলাম, পাথুরে প্রমাণের উপর নির্ভর করে চললে, কেবল অনুমান নির্ভর বিচার বা গবেষণা দ্বারা একটা জাতির প্রবহমান ভাবধারাকে কিছুতে ধরা যাবে না। যে দৃষ্টিভঙ্গী ও যে অনুভূতি থাকলে জাতির অখণ্ড সত্তার সাক্ষাৎ লাভ হয়, তা আয়ত্ত করতে হলে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে উদার, নিরপেক্ষ এবং সুদূরপ্রসারী করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমরা যখন আমাদের দেশের সারনাথ, সাঁচী, অজন্তা, ইলোরা বা কোণারকের মন্দির দেখি, যখন পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা বা মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ হতে ভারতের অতীত ঐশ্বর্যের কথা কল্পনা করি, যখন ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্ত পাঠ করি বা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের শিল্পীদের মনন করি, যখন দেখি ভগবান তথাগতের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি — অমরসাধক শিল্পীদের সেই পরম সাধনালব্ধ 'সহস্র রম্যহস্তের স্পন্দন', সেই অপূর্ব রসবস্তু — যা রূপ ও অরূপের মিলনে এক অপরূপকে প্রকাশ করেছে, যখন ভাস, কালিদাস বা ভবভূতির কাব্যরসের মাধুর্য আস্বাদন করি, তখন দেখি একটা বিরাট জাতির ইতিহাস তার মধ্যেই মূর্ত ও প্রকট হয়ে উঠেছে। এর তুলনায় সাল তারিখের data, মৃত্তিকাফলক, ধাতুপাত্র, তাম্রশাসন প্রভৃতি বস্তুগত উপকরণ ও উপাচারের মূল্য নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর।

ভারতবর্ষের অমূল্য ভাবৈশ্বর্যকে বাদ দিয়ে যে সব ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেছেন, তার পূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করে 'স্বদেশ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একসময় যা বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন — প্রচলিত ইতিহাস ভারতবর্ষের 'নির্জীব' কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র', কেবল মারামারি কাটাকাটির বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই 'রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্ত্তমান স্বপ্ন দৃশ্যপটের অন্তরালে' — 'সেই ধূলি সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে, পল্লীর গৃহে গৃহে যে চেষ্টার তরঙ্গ নানক চৈতন্য তুকারাম — এঁদের জন্ম দিয়েছিল, তার সম্মিলিত রূপই ভারতবর্ষের সত্যকার ছবি। যার দ্বারা আমরা ভারতবর্ষের সেই মূলভাব ও আদর্শটিকে বুঝতে পারব, তাই হবে ভারতবর্ষের সত্যকার ইতিহাস'।

পরম আনন্দের কথা এই যে, কবিগুরু বর্ণিত ভারতবর্ষের সেই সত্যকার ইতিহাসকে রূপ দিয়েছেন আপনি। তাই আপনি আমাদের নমস্য।

— তুমি যা বললে তার কিছু কিছু অংশ বিষয়ে সকলে একমত হতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে জানবে, গণতন্ত্রে যেমন জনকল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেরূপ প্রাচীন রাজন্যবর্গের শাসন প্রণালীতে প্রজাকল্যাণই প্রধান লক্ষ্য হলেও বৈদিক যুগে যে প্রজাতন্ত্র বর্তমান ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

যে সকল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলেন যে দেশাত্মবোধ হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বিদেশের ভাবধারা হতে উদ্ভব ঘটেছে, তাঁরা সত্য কথা বলেন না। তাঁদের মন্তব্যে সকল হিন্দুই ক্ষুব্ধ হবেন এটা স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, উক্ত বিদেশী পণ্ডিতগণ সজ্ঞানেই এইরূপ প্রমাদ সৃষ্টি করেছেন।

আবহমান কাল হতেই হিন্দু এই সুবিশাল দেশকে নানাভাবে গড়ে তুলেছে। সেই গঠন শুধু প্রাকৃতিক নয়। উহার অধিকাংশই বৈদিক ও আধ্যাত্মিক। হিন্দু দেশকে প্রাকৃতিক সীমায় পরিচ্ছন্ন করে রাখে নি। তার দেশ তার নিজস্ব সংস্কৃতির রূপ অসীম অরূপের অভিব্যক্তি। যেখানে তার সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানই তার দেশ। দেশ তার কাছে জড় বা নির্জীব পদার্থ নয়। উহা তার জাতীয় আত্মার বাহ্য অভিব্যক্তি বা প্রকাশ, যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অশরীরী আত্মা বা মন ব্যক্তিগত শরীর অবলম্বন করে নিজেকে প্রকাশ করে।

সভ্যতার প্রথম উন্মেষে হিন্দুর দেশ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তখন ভারতবর্ষের যতটুকু জানা ছিল তা ঋগ্বেদে 'সপ্তসিন্ধবঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যে দেশ সপ্তনদী ধারার দ্বারা বিমণ্ডিত ও বিধৌত। পঞ্জাবের পঞ্চনদ ও আরও দুইটি নদী নিয়ে এই সাতটি নদী। শেষ দুইটি নদী অনেকের মতে গঙ্গা ও যমুনা কিংবা সরস্বতী। কিন্তু হিন্দুর জাতীয় হৃদয় এই সঙ্কীর্ণ দেশ নিয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারে নি। হৃদয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের প্রসার সঙ্ঘটিত হয়েছে। একথা এস্থানেও বলে রাখা উচিত যে আদিমকালে বহির্জগৎ ভারতবর্ষকে ঋগ্বেদোক্ত সপ্তসিন্ধু নামে অভিহিত করেছিল। কিন্তু আমাদের প্রত্যন্ত প্রতিবেশী ইরাণীগণ সপ্তসিন্ধু শব্দটিকে সঠিক উচ্চারণ করত না পেরে 'হপ্তহন্দু' বলে উচ্চারণ করতেন এবং আরও পশ্চিমস্থিত তৎকালীন আইয়োনিয়ান গ্রীকগণ সিন্দু হিন্দুকে 'ইন্দস্' বলে উচ্চারণ করতেন। এ হতেই ভারতবর্ষের নাম 'ইণ্ডিয়া' বলে বহির্জগতে গৃহীত ও প্রচারিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, হিন্দু শব্দটি আদৌ ধর্মসূচক নয়; একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রসূচক শব্দ। হিন্দুয়ানীতে (যাকে এখন আমরা Hinduism বলি) ধর্মের কোন গন্ধই ছিল না, অথচ এই হিন্দু ও হিন্দুয়ানী নিয়ে বর্তমানে এত সংঘর্ষ, বিরোধ ও মারামারি।

হিন্দুর দেশ হিন্দুর সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুগে যুগে প্রভাবিত হয়ে আসছে। সেই প্রসারণের প্রত্যেক অবস্থারই প্রতীক স্বরূপ তার অনুরূপ স্বতন্ত্র নামকরণ সম্পাদিত হয়েছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত হতে আরম্ভ করে হিন্দুর দেশ বর্দ্ধিত আকারে তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে ব্রহ্মর্ষিদেশ, তারপর মধ্যদেশ, তদন্তর আর্যাবর্ত্ত এবং সর্বশেষে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হয়েছিল। কিন্তু সকল অবস্থাতেই দেশ সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার রূপ বলে পূজিত হয়ে আসছিল। উক্ত নামধেয় দেশভাগের মধ্যে যা সর্বাপেক্ষা পুণ্য বা ধর্মের ক্ষেত্র তাই অগ্রে উল্লিখিত। সুমন্ত বলেছেন —

ব্রহ্মাবর্ত্তঃ পরোদেশ ঋষিদেশস্থনন্তরঃ।
মধ্যদেশস্ততো ন্যূন আর্যাবর্ত্তেস্ততঃ পরঃ॥

— ব্রহ্মাবর্ত্তই প্রধান পুণ্যদেশ, তার পর ঋষিদেশ, তদপেক্ষা ন্যূন মধ্যদেশ ও সর্বশেষ আর্যাবর্ত্ত।

সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশই তার আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা পরিচিত ও পূজিত হত। হিন্দু শুধু মাটি জয় করবার জন্য ব্যস্ত ছিল না। মৃৎকে চিৎশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সংশোধিত করে দেশমাতৃকারূপে প্রতিষ্ঠিত করা তার জাতীয় আদর্শ। তার সনাতন জাতীয় আদর্শ, জড়ে জীবনের আরোপ করা — পৌত্তলিক প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাকে দেবতা বলে পূজা করা।

ভারতবর্ষ যখন আর্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত হয়েছিল, সে আর্যাবর্ত্তের সীমা ছিল মাত্র হিমালয় হতে বিন্ধ্যগিরি পর্যন্ত। তখন সমগ্র ভারতভূমি দুইভাগে বিভক্ত ছিল — আর্যাবর্ত্ত ও ম্লেচ্ছদেশ। স্মৃতি ও পুরাণে হিন্দুর দেশ আর্যাবর্ত্ত নামেই পরিচিত ছিল। আর্যাবর্ত্ত নামেই বুঝা যায় যে দেশ শব্দটি ধর্মবাচক প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক সীমাসূচক নহে। শাস্ত্রে আর্যাবর্ত্তের গুণগান নানাভাবেই করা হয়েছে। কয়েকটি শ্লোকে তা উদ্ধৃত করা হল ঃ—

১) কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশঃ ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥ (মনুস্মৃতি)

২) চাতুর্বর্ণ্যং ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ।। (বিষ্ণুস্মৃতি)

৩) কৃষ্ণসারৈর্যো বৈ দর্ভৈশ্চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমৈস্তথা।
সমৃদ্ধে ধর্মদেশঃ স্যাদাশ্রয়েরপি পশ্চিতঃ।। (আদিপুরাণ)

৪) স্বভাবাদ্ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদামগৃঃ।
ধর্মদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্মসাধনং॥ (সম্বর্ত্তপুরাণ)

এই কয়েকটি শ্লোকে আর্যাবর্তের নানারূপ লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। আর্যাবর্ত্তকে যথাক্রমে যজ্ঞীয় দেশ, ধর্মদেশ, বর্ণাশ্রম-ধর্মের দেশ বলা হয়েছে — যে দেশের পবিত্রতা কৃষ্ণসার মৃগ এবং উদ্ভিদ দুর্বাদল ঘোষণা করে। এই আর্যাবর্ত্তের বহির্গত ভারতভূমিকে তখনকার সামাজিক অবস্থায় অধর্মদেশ বলা হয়েছে। আর্যের পক্ষে অধর্মদেশে যাওয়া কিংবা কোনরূপ ধর্মকার্য অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ ছিল — 'ন ম্লেচ্ছবিষয়ে শ্রাদ্ধং কূর্য্যান্ন গচ্ছেত্তং বিষয়ম্'।

আর্যধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্ধমদেশের বিস্তৃতি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন শাস্ত্রে এই বিশেষ সত্যটির ভূয়িষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। বৌধায়ন (যাঁর কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০) তাঁর ধর্মসূত্রে নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিকে অপবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

(১) আনর্ত (গুজরাট ও কাথিয়াবাদ) ২) অঙ্গ (৩) মগধ ৪) সৌরাষ্ট্র ৫) সিন্ধু - সৌবীর (৬) দক্ষিণাপথ। ব্যাসের সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্রদেশ পর্যন্ত অশুদ্ধ ম্লেচ্ছদেশ বলে পরিগণিত হয়েছিল। আদিপুরাণে আরও অন্যান্য দেশ ম্লেচ্ছদেশ বলে উল্লিখিত হয়েছে, যথা — অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র, মগধ, চেদী, অবন্তী, কেরল ইত্যাদি।

বাস্তবিক, দেশগুলির মধ্যে তারতম্য বিচার ও শ্রেণীবিভাগ প্রত্যেক দেশের আচার ব্যবহারের উপর নির্ভর করত; কেবলমাত্র ভৌগোলিক সংস্থিতির উপর তা নির্ভর করত না। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে যে শুধু বিন্ধ্যগিরির ভৌগোলিক ব্যবধান বর্তমান ছিল তা নয়। তার উপর গড়ে উঠেছিল সামাজিক ব্যবধান যাহা পরস্পরের লঙ্ঘন করা অদ্যাবধি সুকঠিন। উত্তর ভারতের দূষিত আচার ব্যবহারের মধ্যে ধর্মসূত্রকার বৌধায়ন এই কয়টি নির্দেশ করেছেন ঃ—

১) ঊর্ণাবিক্রয় (মেষপালন ও তজ্জাত পশম বিক্রয় দ্বিজোচিত কর্ম নয়)
২) সীধুপান (মদ্যপান)
৩) উভয়তোর্দদ্ভির্ব্যবহার (দুইটি পংক্তি দন্তবিশিষ্ট প্রাণীর ব্যবসা করা)
৪) আয়ুধীয়ক (অস্ত্র ব্যবসা)
৫) সমুদ্রযানম্ (সমুদ্র যাত্রা)

পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতেরও নিম্নলিখিত আচার ব্যবহার দূষিত বলে পরিগণিত হয়েছে —

১) অনুপনীতের সহিত ভোজন (যথা সস্ত্রীক ভোজন)
২) পর্যুসিত ভোজন (অর্থাৎ বাসি ভোজ)
৩) মাতুল কন্যা ও পিতৃস্বসৃকন্যার সঙ্গে বিবাহ।

বৃহস্পতি, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, মধ্য ভারত এবং পূর্বভারতকে তৎ তৎ প্রদেশীয় আচার ব্যবহার অবলম্বনে ভাগ করেছেন। দাক্ষিণাত্যে দ্বিজগণ মাতুল সুতা বিবাহ করতেন। মধ্যদেশের লোকেরা অধিকাংশই কারুজীবী এবং মাংসভোজী ছিলেন। পূর্বভারতের লোকেরা মৎস্যভোজী এবং তথায় স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত স্বৈরিণী বলে বর্ণিত হয়েছে। উত্তরতম ভারতে স্ত্রীগণ মদ্যপায়ী ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠের বিধবা স্ত্রীকে কনিষ্ঠ বিবাহ করতে পারতেন।

ঐতিহাসিক কিন্তু লক্ষ্য করবেন যে বিভিন্ন দেশের এই ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার ও সামাজিক বিধানের ব্যবধান অতিক্রম করে, এই বিভিন্নতাকে ভেদ করে, তার মধ্য দিয়েই একটি বিশাল ভারত যুগে যুগে গড়ে উঠেছিল। হিন্দু চিরকালই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ভেদের ভিতর দিয়েই অভেদের অনুসন্ধান করে আসছে। সেই মানসিক গতির বলে জাতীয় জীবনের উপাদানস্বরূপ কাশ্মীর হতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র দেশটিকেই হিন্দু নিজস্ব দেশরূপে গঠন করে নিতে পেরেছিল। পুরাতন আর্যাবর্তের সীমা অতিক্রম করে আর্য সভ্যতা বিন্ধ্যগিরি লঙ্ঘন করে অচিরে আসমুদ্র সমগ্র ভারতভূমিতে যখন প্রসারিত হয়ে পড়ল, সেই দিগ্বিজয়ের পরিচয় পরবর্তীকালের শাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে নানাবিধ শ্লোকের দ্বারা হিন্দুমাত্রেরই অখণ্ড মাতৃভূমি দেশমাতৃকার বিরাট মূর্তি স্বরূপ পরিকল্পিত করা হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ —

১) গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতি। •
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।
২) মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমান্ ঋক্ষ পর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ।।
৩) অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।।

এই সমস্ত শ্লোক ধার্মিক হিন্দুমাত্রেই প্রতিদিন উপাসনার সময়ে আবৃত্তি করেন এবং এই আবৃত্তি প্রণোদিত ধ্যানের দ্বারা তাঁর মানস ফলকে স্বদেশের রূপচ্ছবি সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়। দেশাত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করবার এমন সহজ সরল উপায় খুব কম ধর্মে বা শাস্ত্রে উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রথমোক্ত শ্লোকের মর্ম ধারণা দ্বারা উত্তর পশ্চিমে সিন্ধুনদ তীরবাসী পাঞ্জাবী, মধ্যভারতে গঙ্গা-কালিন্দী তটবাসী এবং সুদূর দক্ষিণে কাবেরী বা তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত মাদ্রাজী ভারতবাসী সকলেই একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অখণ্ড বিশাল ভারতের ঐক্য সূত্রে গ্রথিত হয়ে স্ব স্ব প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার ব্যবধান অতিক্রম করতে সমর্থ হন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী বা মাদ্রাজী জ্ঞান না করে ভারতের সন্তান বলে মনে করেন। হিন্দুধর্ম এই ভাবেই যুগে যুগে ভারতের জাতীয় জীবনের পুষ্টি সাধন করে আসছে।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ শুধু যে দেশমাতৃকার বিরাট দেহ নানা মন্ত্রে অঙ্কিত করেছে তা নয়। শুধু জননী জন্মভূমির ধ্যান কিংবা 'বন্দেমাতরম্' গান করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। ধর্মের অনুষ্ঠান ও অঙ্গস্বরূপ তীর্থ-পর্যটন প্রবর্তন করে কি উত্তরে, কি দক্ষিণে, কি পূর্বে কি পশ্চিমে প্রত্যেক ভারতবাসীকেই স্বকীয় মাতৃভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করবার অবসর ও সুযোগ দিয়েছেন। হিন্দুমাত্রের 'চারধাম' করে আসা ধর্মজীবনের একটি গৌরবের বিষয়। শঙ্করাচার্যও তাঁর দার্শনিক বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত করলেন যে এই চার ধামেই তাঁহার ধর্মমতের কেন্দ্রস্বরূপ চারিটি মঠ পূর্বে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকার সারদা মঠ এবং উত্তরে কেদার-বদরীর নিকট যোশী মঠ, দক্ষিণে রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ ভারতবর্ষের নানা দিক হতে তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করে থাকে। সেইরূপ দক্ষিণী হিন্দু যেরূপ বারাণসী, পুষ্কর, হরিদ্বার বা অমরনাথকে সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র ধর্মক্ষেত্র বলে স্বীকার করবার জন্য সর্বদা আকুল হয়ে থাকেন। এ ছাড়া আবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক তীর্থ তালিকা নির্দিষ্ট হয়েছে। শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবের আপন আপন বিশেষ তীর্থক্ষেত্র নির্দিষ্ট রয়েছে। শৈবের কাশী-বিশ্বনাথের অনুরূপ বৈষ্ণবের মথুরা-বৃন্দাবন এবং শাক্তের খণ্ডিত সতীদেহ বিজড়িত ৫১ পীঠস্থান। বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে যেরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ তালিকা সন্নিবিষ্ট রয়েছে, তাতে মনে হয় যে আমাদের জন্মভূমি ভারতভূমির প্রত্যেক অংশই একটি তীর্থস্থান, তার প্রত্যেক নদনদী গিরিকন্দর সবই পূর্ণভূমি। স্বদেশ প্রেম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ একত্রে একই ভাবে মিশে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রত্যেক রমণীয় স্থানকে পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করেছে। তাই আজ হিন্দুর চরম তীর্থস্থান তুষার ধবল হিমালয়ের অগম্য চূড়া অথবা গহন কাননের নিবিড় ছায়া — যেখানে প্রকৃতিদেবীর বিপুল সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণভাবে বিকশিত হবার অবকাশ পেয়েছে। হিন্দুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের প্রণালীও স্বতন্ত্র। হিন্দু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বহির্মুখী ভাবের উদ্দীপনা অনুসন্ধান করে না। তাই ত্রিবেণী সঙ্গমে, প্রয়াগে, পুষ্করে, হরিদ্বারে, জলবিধৌত বীচিমালা বিক্ষুব্ধ জগন্নাথধামে প্রকৃতির লীলানিকেতনে আমরা দেখতে পাই অগণিত মন্দির, সাধকদল, বৈরাগী সন্ন্যাসী নিবৃত্তিমার্গের অসংখ্য পথিক। সেখানে দুর্লভ দৃশ্য — সংসারের উন্মাদনা, প্রবৃত্তি তাড়িত দৈহিক ভোগলিপ্সু প্রমোদ বিহারের উৎসব। এখানে দেখা যায় হোটেলের বদলে পদে পদে দেবালয়, তপস্বীর কুটীর, সংযত জীবন গৃহস্থের ধর্মশালা। এখানে উপবাসের অবসর, ভোগবিলাসের উপকরণ নেই। যা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ও বিপরীত। বিরাট মাতৃদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, লোমকূপ, স্বদেশের ধূলিকণা পর্যন্ত পবিত্র, স্বর্ণরেণুর ন্যায় আদরণীয়। এর ফলে সমগ্র মহাদেশটি একটি বিরাট তীর্থক্ষেত্র হয়ে হিন্দুর দেশাত্মবোধকে প্রবুদ্ধ করে রেখেছে। একেই বলে জড়ের উপর, বাস্তবের উপর আত্মার আধিপত্য, ভাবের উপর ভবের অনুশাসন। স্বদেশপ্রেমের এরূপ পূর্ণ প্রকাশ পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয় নি। হিন্দুর স্বদেশপ্রেম সাময়িক ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে নয়, তা তার সনাতন ধর্মের অঙ্গস্বরূপ। এই ভাবেরই চরম প্রকাশ নিম্নলিখিত চরণে পাওয়া যায় ঃ—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।

এইভাবে প্রণোদিত হয়েই মনু নিজের দেশকে 'দেবনির্মিত স্থান' বলে বর্ণনা করেছেন, আর শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ ভারতবর্ষকে দেবদূর্লভ পবিত্র ক্ষেত্র 'ভারতাজির' (ভারতবর্ষই বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ) বলে উল্লেখ করেছেন, যেখানে জন্মগ্রহণ করবার জন্য দেবতারাও লালায়িত। কারণ ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করলে ধর্মের অনুকূল আবেষ্টনের প্রভাবে বদ্ধজীব মানুষ অপরিসীম আত্মোন্নতি সম্পাদন করে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ব্রহ্মে বিলীন হয়। সুতরাং হিন্দু অন্যান্য জাতির মতো তার জন্মভূমির বাইরে কোন তীর্থস্থান স্থাপন বা স্বীকার করে নি। হিন্দু তার রাজনীতিকেও ধর্মের দ্বারা শাসিত করে এসেছে।

নবযুগে হিন্দু স্বদেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও মুক্তিসাধনকল্পে অযথা বিজাতীয় পন্থা প্রণালী অবলম্বন করতে গিয়ে স্বধর্মদ্রোহী ও আত্মঘাতী না হয়ে পড়ে, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

উপসংহারে আর একটি কথা বলি যে হিন্দুর স্বদেশের বিস্তৃতি ও তার চিরপ্রসারণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে ধারণা শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে তার মূলে একটি বিশেষ উদারতার বিধি বিদ্যমান ছিল। এই উদারনীতি অবলম্বন করলে প্রাদেশিকতার ও জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ সীমা অপসারিত হয়ে সমগ্র পৃথিবী ও মানবসমাজ ভেদবিহীন সমষ্টিতে পরিণত হতে পারে — যে আদর্শ নিয়ে পূর্বে আন্তর্জাতিক পরিষদ (লীগ অব নেশনস্) এবং বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার সমবেত চেষ্টা ও বুদ্ধির প্রয়োগ ও প্রচেষ্টা এত দিন ধরে করে আসছে; এই সম্বন্ধে বেশী শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত না করে আমি মনুর একমাত্র বিধান উল্লেখ করছি এবং সেই বচন অবলম্বন করে হিন্দুর প্রসিদ্ধ আইনগ্রন্থ স্মৃতি চন্দ্রিকা যে ব্যাপক ব্যবহারের নির্দেশ করেছেন তাও বললাম। এই বিধানগুলি হতে প্রতীত হবে যে হিন্দু বহু দেশকে এক অনুশাসনের অন্তর্গত করে যে বিরাট ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে গঠন করতে পেরেছিল, তার প্রধান কারণ যে হিন্দু বিভিন্ন প্রদেশ ও জাতির নানাবিধ আচার ব্যবহার, সাময়িক রীতি নীতি যতদূর সম্ভব স্বীকার করে নিতে পেরেছিল। এই স্বীকরণের সীমা ছিল যে এই সমস্ত দেশাচার ধর্মবিরুদ্ধ না হয়। এই মর্মে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বুঝতে হবে ঃ—

জাতি জানপদান্ ধর্মান্ শ্রেণী ধর্মাংশ্চ ধর্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্মাংশ্চ সধর্মং প্রতিপাদয়েৎ।। (মনু)
যেষু দেশেষু যে দেবাঃ যেষু দেশেষু যে দ্বিজাঃ।
যেষু দেশেষু যত্তোয়ং যা চ যত্রৈব মৃত্তিকা।।
যেষু স্থানেষু যৎ শৌচং ধর্মাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তান্নাবমন্যেত ধর্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ।।
যস্মিন্ দেশে পুরে গ্রামে ত্রৈবিদ্য নগরেঽপি বা।
যো যত্র বিহিতোধর্মস্তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ।। (স্মৃতিচন্দ্রিকা)

এই সকল শ্লোকে বলা হয়েছে যে রাজাকে প্রত্যেক কুল, জাতি, শ্রেণী (অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসায়-সঙ্ঘ) ও জনগণের নিজ নিজ ধর্ম বা বিধান, সমগ্র রাষ্ট্রীয় বিধান সমর্থন করতে হবে। এই মর্ম স্মৃতিচন্দ্রিকা আরও বিবৃত করে বলেছেন, যে দেশের যে দেবতা, যে দ্বি-জাতি, যা জল, যা মাটি, যে স্থানের যা শৌচ ও ধর্মাচার, সেই সকল স্থানের তাই মান্য। যে দেশে, যে নগরে, যে গ্রামে যা প্রচলিত ধর্ম তাই তৎ তৎ দেশের ধর্ম। এই ঔদার্য নীতি, যার দ্বারা একটা বিরাট দেশ ও বিপুল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার একমাত্র সীমা ছিল যে উহা ধর্ম বা নীতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না। বেদবিরুদ্ধ দেশাচার অগ্রাহ্য এবং তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ শাস্ত্রে এইগুলি উল্লিখিত হয়েছে ঃ—

১) স্বমাতুলসুতোদ্বাহমাতৃবন্ধুত্বে দূষিতঃ দাক্ষিণাত্যে।।
— মাতুল কন্যা বিবাহ মাতৃসম্বন্ধ দূষিত, সেইজন্য উহা পরিহার্য। এই প্রথা কিন্তু এখন পর্যন্তও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত।

২) অভর্তৃক ভ্রাতৃভার্যা গ্রহণং চাতি দূষিতম্।
— ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা অতি দূষিত।

৩) কুলে কন্যা প্রদানং চ দেশেষন্যেষু দৃশ্যতে।
— স্ব-গোত্রে বিবাহ নিন্দনীয়।

৪) তথা ভ্রাতৃ - বিবহোহপি পারসীকেষু দৃশ্যতে।

— পারস্য দেশে তৎকাল প্রচলিত ভগিনীর ভ্রাতৃ বিবাহ ভারতবর্ষে কখনও প্রচলিত হয় নি। এর পরে নিন্দনীয় সামাজিক আচার ব্যবহার ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অর্থলিপ্সা প্রণোদিত কয়েকটি প্রথা নীতিবিরুদ্ধ বলে আইনবিরুদ্ধ বলে নির্দেশিত হয়েছে। যথা ঃ—

১) দত্ত্বা ধান্যং বসন্তেহন্যে শরদি দ্বিগুণং পুনঃ।

— বসন্তে ধার দেওয়া ধান্য শরৎকালে দ্বিগুণ দাবী করা অর্থাৎ শতকরা দুই শত টাকা সুদ লওয়া আইন অনুমোদিত নয়।

২) গৃহ্নন্তি বন্ধুক্ষেত্রং চ প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে।
ভুজ্যতেহন্যৈরপ্রবিষ্টে মূলে তচ্চ বিকথ্যতে॥

— গচ্ছিত জমির উপর ধার দেওয়া, মূলধন সুদে আসলে দ্বিগুণ হলে ধার শোধের জন্য গচ্ছিত জমি অপহরণ আইন বিরুদ্ধ।

ভারতবর্ষের এই চিরন্তন উদারনীতি অগ্রাহ্য করে পাশ্চাত্ত্য জগতে কতিপয় প্রবল প্রতাপান্বিত জাতি স্বকীয় সংস্কৃতি সজোরে আসুরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যান্য দেশ ও জাতির উপর আরোপিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। এই দুর্নীতির তাড়নায় আজ বসুধা বিধ্বস্ত, সমগ্র মানবভূমি বিকম্পিত। এই সকল জাতির প্রত্যেকেই মনে করছে যে তার নিজের সভ্যতা ও আদর্শ একমাত্র চরম সত্য ও সমগ্র মানবসমাজের পরিণতির পরিচায়ক। অতএব সেই আদর্শ সমগ্র জগতে জোর করে প্রচার করা তাদের ধর্ম। এই প্রণালীতে সৃষ্টির স্থিতি নেই। সৃষ্টির প্রলয় হবে। এটা সভ্যতার নামে এক বিরাট অসত্যের টানে মানব জাতির বহুদিনের সাধনালব্ধ সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আদর্শই মানবের একমাত্র আশা। সেই আশার একটি উদার বাণী উদ্ধৃত করে বললাম ঃ—

মাতা চ পার্বতী গৌরী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতারো মানবাঃ সর্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

— বিশ্বজননী পার্বতী গৌরী আমার মাতা, বিশ্বপিতা মহেশ্বর আমার পিতা, সকল মানব আমার ভ্রাতা আর ত্রিভুবন (স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল) আমার স্বদেশ।

হিন্দুর ধর্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তা এইভাবে যুগে যুগে প্রসারিত হয়ে তাকে বিশ্ববোধের উদার ক্ষেত্রে উন্নীত করেছে। সহজাত ধর্মবোধের মত দেশমাতৃকার প্রতি হিন্দুর মমত্ববোধ তার জাতীয় জীবনের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ, ইহা বিদেশাগত নয়, ইহা তার স্বভাবজাত।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পল্লীর দূর-দূরান্ত থেকে শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে। বনফুলের মিষ্ট গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। আমরা সকলে নর্মদা স্পর্শ করে সান্ধ্যক্রিয়ায় মন দিলাম। এই ঘোর নির্জন শান্ত বাতাবরণ তপস্যার অনুকূল সন্দেহ নাই। মন স্বতঃই এখানে শান্ত ও স্থির হয়ে যায়। জপ ক্রিয়াদি সেরে রাত্রি ১০টায় আমরা শুয়ে পড়লাম। অল্প অল্প শীত অনুভূত হচ্ছে বটে কিন্তু তাতে কোন কষ্ট অনুভূত হচ্ছে না। ঘুমিয়ে পড়লাম।

'অনেক বেলা হল', সকাল আটটা বেজে গেছে। — হরানন্দজীর ডাকে আমি বিছানায় উঠে বসলাম। সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমিও ঝোলা-গাঁঠরী গুছিয়ে নিলাম। চড়াই উৎরাই পথে পাথর ডিঙিয়ে হেঁটে চলেছি। চারদিকে শাল, সাজা, সেগুণ সালাই, বুনোনিম এবং বেলগাছের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। যা পথের শোভা বৃদ্ধি করছে। এখানের পার্বত্য ঢাল যা প্রায় সমতল ভূমির মত, স্বচ্ছন্দে হাঁটা যাচ্ছে। লতাগুল্মে জড়াজড়ি কোন সংকটজনক ঝোপঝাড়ও নাই। অল্প দূরেই নর্মদার কাকচক্ষু জলে ঢেউয়ের খেলা চলছে। দূরে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালে স্পষ্টই দেখা যায় যে সুস্পষ্টভাবে দুটি পার্বত্যধারা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে গেছে। বেলা বারটা নাগাদ আমরা একস্থানে একটি শিবমন্দির দেখে মন্দিরের বারান্দায় গাঁঠরী ফেলে স্নান সেরে নিলাম। কমণ্ডলু ভরে জল এনে শিবের মাথায় ঢাললাম, প্রণামাদি সেরে আমাদের পথ চলা শুরু হল। আজ আমাদের ঝুলি শূন্য। বেলা তিনটা সাড়ে তিনটা নাগাদ আমরা লমেটাঘাটে পৌঁছে গেলাম। তখনও অনেক বেলা আছে, আরও কিছুটা এগিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকলেও সারাদিন হেঁটে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত থাকায় আমরা

সেখানেই বিশ্রাম করতে মনস্থ করলাম। তটের উপরেই মাতা নর্মদা, ইন্দ্রেশ্বর, পিপ্পলেশ্বরের মন্দির। এছাড়াও রয়েছে শনিদেবের মন্দির এবং ধর্মশালা। আমরা পিপ্পলাদ ঋষি স্থাপিত পিপ্পলেশ্বর মন্দিরেই আশ্রয় নিলাম। শিবলিঙ্গকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করার পরই হরানন্দজী চিৎকার করে বললেন — নর্মদামাতা তাঁর পরিক্রমাকারী সন্তানকে চোখে চোখে রাখেন — একথা খাঁটি কথা, প্রাণের কথা, ধ্রুব সত্য কথা। এ যে সত্য সূর্য্য অপেক্ষাও ভাস্বর, যে সত্যের গতি অপ্রতিরোধ্য। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি মন্দিরের এক কোণে তিন ফেনা কলা রাখা আছে। আমরা তা ভাগ করে খেয়ে পেট পুরে নর্মদার জল খেলাম। সূর্যাস্ত হয়ে আসছে। দুই ধারের পাহাড় কোথাও নীল, কোথাও সবুজ, কোথাও বা হলুদ। সূর্যাস্তের আভা মার্বেল পাথরে পড়ে সৃষ্টি করছে অপরূপ সৌন্দর্যের ভুবন ভুলানো নন্দনলোক। এখানে নর্মদার জল এতই স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ যে স্নান করতে লোভ হয়।

এমনসময় 'হর নর্মদে হর' ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করে পুরোহিতজী এসে উপস্থিত হলেন। অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদনের পর পুরোহিতজী সান্ধ্য আরতির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিঙা, ভেরী ও শঙ্খনাদের মধ্য দিয়ে মহাদেবের আরতি শুরু হল। তিনি বিভোর হয়ে পাঠ করছেন —

আগধিতা পরিপধিতা যা কোশীকেব জঙ্গহে।
দদাতি মহ্যং যাদুরী যা শূনাং শতা॥ (ঋ ১/১২৬/৬)

দরবিগলিত ধারায় কাঁদতে কাঁদতে মহাত্মা বলছেন — 'হে প্রভু! অন্তরস্থ দুই খল (ষড়রিপু) বশীভূত করে তোমার সমীপস্থ হওয়া দুঃসাধ্য। তুমিই কৃপা করে আমার হৃদয়ে প্রকাশ হও। তোমার দিব্য চিদ্‌জ্যোতির ধারা আমার মনকে স্পর্শ করুন।

আরতি শেষে পুরোহিতজী আমাদের কাছে এসে বসলেন। বললেন — আপনারা মা নর্মদার দক্ষিণতটের এক অনুত্তম তীর্থে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই তীর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

ততো গচ্ছেতু রাজেন্দ্র পিপ্পলেশ্বরমুত্তমম্।
যত্র সিদ্ধো মহাযোগী পিপুলাদো মহাতপাঃ॥

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম পিপ্পলেশ্বর তীর্থে গমন করবে। এই তীর্থে মহাযোগী মহাতপা পিপ্পলাদ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্যের ভগিনী হলেন মহর্ষি পিপ্পলাদের জননী। পিপ্পলাদের জন্মের পর তাঁর জননী তাঁকে নর্মদাতটের এই বিশাল অশ্বত্থ তরুর ছায়ায় পরিত্যাগ করে বললেন —

যানি সত্বানি লোকেষু স্থাবরানি চরানি চ।
তানি সর্বানি রক্ষন্তু ত্যক্তং বৈ বারকংময়॥

— আমি এস্থানে এই শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করলাম। ত্রিলোক, স্থাবর ও চরে যে সকল প্রাণী আছে , তারা সকলেই একে রক্ষা করুন।

জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত শিশু কিছুকাল পরে ক্ষুধায় কাতর হলে ক্রন্দন শুরু করলে এই অশ্বথ বৃক্ষ স্বীয় নির্যাস ক্ষরিত করে শিশুকে পান করায়। সেই বৃক্ষ সুধা পান করে শিশু যৌবনে উপনীত হয়। নাম হয় পিপ্পলাদ।

পিপ্পলাদ একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে স্তবে তুষ্ট করে মহামুনিতে পরিণত হলেন। মহেশ্বর পিপ্পলাদকে বরদান করতে চাইলে মহর্ষি বললেন —

যদি মে ভগবাস্তুষ্টৌ যদি দেয়ো বরো মম।
অত্র সন্নিহিতো দেব তীর্থে ভব মহেশ্বর॥

হে মহেশ, যদি আমার প্রতি প্রীত হয়ে থাকেন আর আমাকে যদি বরদানের যোগ্য বলে মনে করেন, তবে এই স্থানে এই তীর্থে আপনি আবির্ভূত হন। মহামুনি পিপ্পলাদের প্রার্থনায় মহাদেব 'তথাস্তু' বলে এই তীর্থে এই স্থানে পিপ্পলেশ্বর নামে আবির্ভূত হলেন। আজ পরিক্রমা পথে আপনারা যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এই তীর্থে স্নান, দান, দেব-পিতৃগণের তর্পণ ও মহেশ্বরের অর্চনা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এখন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে তিনবার করে বলুন — 'হর নর্মদে হর'। 'জয় পিপ্পলেশ্বর মহাদেবকী

জয়', এরপর মহাত্মা আমাদেরকে সকলকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে ফিরে গেলেন। শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে চারদিক উদ্ভাসিত। আমরা মন্দিরের বিস্তৃত বারান্দায় বসে নিত্যকর্মে মন দিলাম।

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ পুরোহিতজী এসে আগে আমাদেরকে দিয়ে পিপ্পলেশ্বর মহাদেবের পূজা করালেন। যাত্রার পূর্বে মহাদেবানন্দের প্রশ্নের উত্তরে পুরোহিতজী বললেন — উস্‌পার যো ঘাট দেখাই দেতা হ্যায়, উহ হ্যায় গোপালপুর ঘাট। উহ তেঁবর গ্রামমেঁ হ্যায়। প্রাচীনকাল মেঁ তেঁবর গ্রামকো ত্রিপুরী কহলাতো থা। ত্রিপুরী কলচুরী ঘরানে কী রাজধানী থী। এগারই শতাব্দীকে সর্বশ্রেষ্ঠ কলচুরী রাজা কর্ণদেবনে (উনকো চেদী কর্ণদেব ভী কহা যাতা হ্যায়) ভারত কা অধিকাংশ ভাগ আপনে অধীন কিয়া থা। অভী কর্ণপুরী নাম কী নগরী রাজপ্রাসাদ, মন্দির ঔর মণ্ডপগৃহকা খণ্ডহর দেখাই দেতা হ্যায়। গোপালপুরমেঁ অব পুরানী সমৃদ্ধিকা কোঈ চিহ্ন নহী দেখাই দেতা। পরন্তু ঐহী ঘাটসে মার্বল রকস্‌কা দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর দীখতা হ্যায়।

পুরোহিতজী আরো বললেন — আউর দো মীল জানেসে আপলোগ নর্মদাজীকা ত্রিশূল ভেদ তীর্থ মেঁ পৌঁছেঙ্গে। উহ গ্রামকা নাম হ্যা সিবনী। উঁহা নর্মদাজীকা ধারা পর্বতকো বিদীর্ণ করকে ত্রিশূলকে সমান বহতী হ্যায়। উসে ভগবান তীর্থ ঔর বরাহ তীর্থ ভী কহা যাতা হ্যায়।

তীর্থ মহিমা শোনার পর নমস্কারান্তে আমরা দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের ডানদিকে নর্মদা বয়ে চলেছেন। বামদিকে শাল, মহুল, হরিতকী, বাঁশ, পিয়াল, বেল, বট, কদম্ব প্রভৃতি গাছের সারি। গ্রামের মধ্যে কোঠাবাড়ীও দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাঠে ধান, জোয়ার ও ভুট্টার চাষ হয়েছে। স্বচ্ছতোয়া খরস্রোতা নর্মদার শোভাও যেমন সুন্দর লাগছে তেমনি ঐসব গাছের সৌন্দর্যও যেন কেবল মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এইসব স্থান সত্যই তপস্যার উপযুক্ত। বেলা বারটা নাগাদ আমরা সমৃদ্ধ গ্রাম সিবনীতে এসে পৌঁছলাম। নর্মদাতটে একটি সুদৃশ্য মন্দিরও চোখে পড়ল। এখানে আরো চোখে পড়ল নর্মদার গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল পাহাড়। আর সেই পাহাড়কে ত্রিশূলের তিনটি ফলা দিয়ে ভেদ করে ত্রিশূল আকৃতিতে নর্মদা কিছুদূর বয়ে নিয়ে এক হয়ে গেছেন। এরকম দৃশ্য আমরা আমাদের গোটা পরিক্রমা পথে কোথাও দেখিনি। আমরা সবকিছু ভুলে গিয়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ সেই দৃশ্যই দেখতে লাগলাম।

কতক্ষণ যে সেইদিকে তাকিয়ে ছিলাম তা খেয়াল ছিল না। সম্বিৎ ফিরতে পিছন ঘুরে দেখি শিখা উপবীতধারী এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বেশভূষা দেখে বুঝলাম, বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি চোস্ত হিন্দীতে বললেন — আপনারা সিবনী মহল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন আর ঐ যে মন্দির দেখছেন ওটি বরাহ-অবতারের। আপনারা স্বচ্ছন্দে ঐ মন্দিরে রাত্রিবাস করতে পারবেন। কথায় কথায় তিনি আরো জানালেন — দেবতাদের সহস্র প্রেম প্রার্থনা যখন বিফল হল তখন দেবতারা স্থির করলেন শক্তির দ্বারা তাঁরা জয় করবেন কুমারীকে। তখন তাঁদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে চকিতে নদীরূপে গহন কান্তারের মধ্য দিয়ে পর্বতগাত্রের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে চললেন কুমারী। তখন এই স্থানে এই পর্বত তাঁর গতিরোধ করলে নীলকণ্ঠ তাঁর ত্রিশূল প্রহারে পর্বত গাত্র ভেদ করে আপন কন্যার গতিপথকে করলেন মুক্ত। পরম পরিতৃপ্তি বিধায়িনী, পরম সুখ ও আনন্দদায়িনী মহাকুমারী শক্তি নর্মদাকে বর দিলেন —

গর্ভে তব বসিস্যামি পুত্রোভূত্বা শিবাত্মজে
মম ত্বম্ অপরামূর্ত্তিঃ খ্যাতা জলময়ী শিবা॥

অর্থাৎ হে শিবাত্মজে, তুমি জলময়ী শিবা। তোমার পুত্র হয়ে তোমার কোলে নিত্যকাল ধরে বিরাজ করব। কল্পতরু নীলকণ্ঠ আরও বর দিলেন —

অপরং বরঃ দাস্যামি পশ্য দেবি মহৎতেজা।
লিঙ্গরূপেন সুচিরং প্লবয়ামি তব ক্রোড়ে॥

— হে মহাতেজস্বিনী কন্যা, এই দেখ আমি এখন থেকেই তোমার কোলে, তোমার জলে চিন্ময়শক্তিসম্পন্ন শিবলিঙ্গরূপে চিরকাল ভেসে বেড়াব। আজ থেকে তুমিই হবে আমার আনন্দ বিলাসের ক্ষেত্র।

আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, এরপর থেকে পশ্চিমগামিনী নর্মদার বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে গেছে। নর্মদার তটে তটে নর্মদার গর্ভে শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি। নর্মদাকে সঙ্কর সবহি শঙ্কর। এখান থেকে অমরকন্টকের পথে নর্মদার তটে কিংবা গর্ভে খুব কমই শিবলিঙ্গের দর্শন পাবেন। এর পর মহাত্মা আমাদেরকে বরাহ মন্দিরে

নিয়ে এলেন। মন্দিরের দরজা খোলা। মন্দিরের চারপাশে প্রশস্ত চওড়া বারান্দা। মহাত্মা আমাদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মহাত্মার সরল ও সহৃদয় ব্যবহার আমাদেরকে মুগ্ধ করল। মন্দিরের মধ্যে একে একে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিজের নিজের গাঁঠরী খুলে বিছিয়ে ফেললাম।

মন্দিরের বারান্দা থেকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ছড়ানো ছিঠানো দু'চারটে জংলী কুটীর। নর্মদার উত্তরতট নিবিড় অরণ্যে ঢাকা।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েছে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে এই সুন্দর পরিবেশে সবাই যেন একটা অলৌকিক আবেশের ঘোরে রয়েছেন। আমি মহর্ষি তণ্ডিকৃত শিবস্তব আবৃত্তি করতে লাগলাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। খুব ভোরে ময়ূরের কেকা ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সাতপুরার শীর্ষদেশ অতিক্রম করে সূর্যরশ্মির প্লাবন জেগেছে। আমি বললাম বৈদিক ঋষিরা জড় সূর্যের অন্তরালে যে হিরন্ময় ভর্গজ্যোতিঃর উপাসনা করতেন, আসুন, সেইরকম আমরাও এই তপোভূমিতে দাঁড়িয়ে উদীয়মান সূর্যের আবাহনী স্তুতি গাই। আমার সাথীরা আমাকে বেষ্টন করে যুক্ত করে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। আমি উদাত্ত কণ্ঠে জাগতী ছন্দে ও সুরে পাঠ করতে লাগলাম—

আ কৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্তীং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ (ঋ ১/৩৫/২)

অগ্নি উজল সুবর্ণরথ দীপ্ত কিরণে ভরি
হের নভে ঐ উদিছে সবিতা তমসা ছিন্ন করি।
জাগিয়া উঠিল বিশ্বভুবন কল্যাণকর লাগি
জাগিল অমর, তাহারি সঙ্গে মরলোক উঠে জাগি।।

উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু দুর্দিঃ প্র দেবি গোমতীরিষঃ। (ঋ ১/৪৮/১৫)

পোহলে নিবিড় তিমির রজনী ঘুচিল অন্ধকার।
হে উষা তোমার আলোক রশ্মি খুলিল স্বর্গদ্বার।।

অপ ত্যে তায়বো যথ নক্ষত্রা যন্তক্তুভিঃ। সুরায় বিশ্বচক্ষায় (ঋ ১/৫০/২)

তিমির মোচন বিশ্বলোচন মেলিলে আলোক-আঁখি
নিশীথের তারা তস্কর সম আপনারে ফেলে ঢাকি।।

বি বাতজুতো অতসেসু তিষ্ঠতে বৃথা জুহূভিঃ সৃণ্যা তুবিত্বণিঃ।
তৃর্যু যদগ্নে বনিনো বৃষায়সে কৃষ্ণং ত এম রুশদূর্মে অজর॥ (ঋ ১/৫৮/৪)

ঝঞ্ঝার বায়ে ক্ষিপ্ত অগ্নি দীপ্ত আভায় ফোটে,
গর্জিত শিখা ঘেরিয়া মহীরূহ পরে ওঠে।
নাহি তার জরা, বৃষভের মত ধায় সে তীব্রবেগে
পুড়ে হয় কালো শ্যামল-বনানী বহ্নি পরশ লেগে।

জিহ্মশ্যেচরিতরে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বম।
দ্রভং পশ্যদ্ভ্য উর্বিয়া বিচক্ষ উষা অজীগ র্ভুবনানি বিশ্বা।।
ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ।
বিসদৃশ জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা অজীগ র্ভুবনানি বিশ্বা॥ (ঋ ১/১১৩/৫-৬)

শুয়ে ছিল যারা সংকোচে ভয়ে উষার আভাষ লেগে
নয়ন মেলিয়া একে একে তারা উঠিল সকলে জেগে।
কেহ চাহে শুধু রাশি রাশি ধন কেহ চাহে শুধু সুখ।
কারো বা বক্ষে ত্যাগের তন্ত্রী ঝঙ্কারে উন্মুখ।
চক্ষের কালো উষাই ঘুচালে তমোরাশি দূরে ঠেলি।
আলোকে রচিয়া নূতন ভুবন সম্মুখে দিল মেলি।

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসা।
বিশ্বস্যেসানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ।। (ঋ ১/১১৩/৭)

অন্তবিহীনী যৌবন তব হে উষা স্বরগকন্যা
হরিও আঁধার, শুক্লবসনা প্রবাহি আলোক-বন্যা।
আজিকে জগৎ তমসামগ্ন, আতঙ্কে কাঁপে প্রাণ।
বিশ্বলক্ষ্মী, দাও উদ্‌বারি তব আলোকের দান।

উদ্দীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি
আরেক্পন্থাং সতবে সূর্যায়াগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ।। (ঋ ১/১১৩/১৬)

উঠ জাগো, জীবনদায়িনী উষা এল হাসি হাসি
অরুণ ঝলকে মিলাল পলকে রজনীর তমোরাশি।
উষা সবিতার আগমন পথ মুক্ত করি আনে।
চল সেই পথে, হিরণ্য রথে অমৃতের সন্ধানে।

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যোদর্শি জ্যোতির্বসানো সমনা পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনতি।। (ঋ ১/১২৪/৩)

ঐ আসে উষা জ্যোতির কন্যা জ্যোতির বসন পরি,
বৈভবে তার সাধক চিত্ত বিস্ময়ে ওঠে ভরি।
উষা আসে সদা সূর্যের সাথে জ্ঞাত সে সকল প্রগনিত
দণ্ড ও পল সাধক লগ্নে, কভু না ঘটায় ভ্রান্তি।

যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা।
তেনাস্মদ্বিমনিরামনাহু তিমপামীবামন দুঃস্বপ্নাং সুর। (ঋ ১০/৩৭/৪)

হে সূর্য! তব কোন্ সে আলোকে ঘুচাও সবার ভয়
কোন্ সেই জ্যোতি যাতে মধু ক্ষরে? আনন্দ অক্ষয়?
(আবার) কোন্ সে আলোকে প্রকাশ বিশ্ব? এই জাগে বিস্ময়?

বন্দনা শেষ হল, আমাদের হাঁটাও শুরু হল। কিন্তু এই বেদধ্বনিতে নর্মদাতটে এক অপূর্ব ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হল। পাহাড়ী পথ জোরে হাঁটা যায় না। দুর্গম পথে হেঁটে আমাদের ঘর্মাক্ত কলেবর অবস্থা। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে জল খেলাম। কমণ্ডলুতে নর্মদার জল ভরে নিলাম। ইতিমধ্যে আমরা ঘনসৌর ঘাট, তৈমর সংগম অতিক্রম করে ঘুঘরী গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু এই দক্ষিণতটে বন ও নির্জনতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। আর মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দু' একটা করে শিবমন্দির। নর্মদায় স্নান-তর্পন সেরে আমরা কমণ্ডলুতে জল ভরে ঘুঘরী গ্রামের ছোট পাথরের তৈরী শিবমন্দিরে গেলাম পূজা করতে। মন্দিরে ঢুকে দেখি শিবলিঙ্গ নানারকম বনফুলে ঢাকা পড়ে গেছেন। হয়ত পল্লীবাসীদের কেউ পূজা করে গেছেন। একমাত্র শিবসুন্দর ছাড়া এমন দেবতা কে আছেন যাঁর কাছে শুচি অশুচি নেই।

অনুমান করলাম — বেলা একটা বেজেছে। হরানন্দজী বললেন — আরো কিছুটা রাস্তা আজ অতিক্রম করতে পারলে ভালো হয়। তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললাম। বিকাল চারটে নাগাদ পৌঁছে গেলাম বংশীতে। এখান থেকে সিবনী জেলা শুরু। জব্বলপুর জেলা শেষ। নর্মদার তটের উপরই বাঁধানো ঘাট। আমরা তটের উপরেই যে যার কম্বল বিছিয়ে নর্মদামুখী হয়ে জপে বসলাম। অদূরেই ঘন বন থাকলেও তা উত্তরতটের মত ভীতিপ্রদ নয়। নিমেষে রাত্রির অন্ধকার চারদিক ঢেকে ফেলল। পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলের গাছপালাও দেখা যাচ্ছে না। ঘন অন্ধকারে সামনে পিছনে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আমি চুপচাপ বসে আছি নর্মদার দিকে তাকিয়ে। ভাবছি আর সামান্য কিছু পথ অতিক্রম করতে পারলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। আমার বাবার ইচ্ছা বা আদেশ পূর্ণ হবে।

মাতাপিতার আদেশ পালন চলায় ফিরায় জপ,
যথাসাধ্য তাঁদের আদেশ মূর্ত করাই তপ।

তাঁদের প্রতি টান না হলে জপ করিস্ বা কি?
জনমভোর করলেও জপ লাভ হবে ফাঁকি।

যাইহোক, বাবার কথা, মায়ের কথা, নর্মদা-শঙ্করের করুণার কথা চিন্তা করতে করতে মন শান্ত হল। আমি শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলাম ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পাহাড়, জঙ্গল, নর্মদার তট সব জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত। আমার সঙ্গীরা সব ঘুমে অচৈতন্য। তাদের নাকের বিচিত্র শব্দ ঐকতানে বেজে চলেছে। রাত্রি কত হয়েছে বুঝতে পারলাম না। বাতাসের সোঁ সোঁ সাঁ সাঁ শব্দের সঙ্গে বনের বিচিত্র শব্দ মিশে সমগ্র বনভূমি যেন মুখর হয়ে উঠেছে। প্রস্রাব করে এসে আবার শুয়ে পড়লাম। বিচিত্র শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি সকাল হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি গাঁঠরী বেঁধে নর্মদায় গেলাম স্নান করতে। স্নান ও সূর্যার্ঘ্যাদি সেরে মা নর্মদার বন্দনা-আরতি সেরে আমরা রওনা হলাম। হেঁটে চলেছি মনের আনন্দে; সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের সুন্দর রমনীয় সৃষ্টি চোখ ভরে এবং মন ভরে দেখতে দেখতে।

হরানন্দজী একজন গ্রাম্য লোককে জিজ্ঞাসা করে জানালেন — বীজাসেন। প্রায় দেড় ঘন্টায় আমরা চার মাইল রাস্তা হেঁটে ফেললাম। পথ ঘনঘোর জঙ্গলে পুর্ণ থাকলেও কোন বন্য জন্তু দেখলাম না। সেই লোকটির সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা বামদিকে খাড়া দক্ষিণে চড়াই-এর পথ ধরলাম। আমরা ক্রমশঃ পাহাড়ের উপর উঠছি। জঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠছে। পাহাড়ী পথে প্রায় ছয় মাইল চড়াই পথে হেঁটে কঁরৈয়া ঘাট নামক এক ভীল পল্লীতে উপস্থিত হলাম। পাহাড়ের উপর যথেষ্ট আলো থাকলেও পাহাড়ের নীচের অংশ ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যার মুখে ভীল-পল্লীতে আমাদের মত পরিক্রমাকারীদের দেখে সশস্ত্র ভীল সর্দার তাদের ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জড়ো হওয়া নারী-পুরুষদের কিছু নির্দেশ দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান চোহারার কয়েকজন ভীল আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে খাটিয়া নিয়ে এল। সঙ্গে দিল মুখ হাত ধোয়ার জন্য লতাপাতা মিশানো এক হাঁড়ি করে গরমজল। সেই জলে হাত-পা মুখ ধুয়ে শরীরকে সতেজ বলে মনে হল। প্রেমানন্দ বললেন — এই সরলপ্রাণ পাহাড়ীরা স্ত্রী পুত্র পরিজন সহ এই ঘনঘোর জঙ্গলে বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করে ফল-মূল কান্দা খেয়ে জীবন ধারণ করে। একথা ভাবতেই গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সর্দার করজোড়ে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে গাছের শিকড় চিবিয়ে জল দিয়ে খেয়ে নিতে অনুরোধ জানাল। আমরা তা খেয়ে কমণ্ডলুস্থিত নর্মদার জল দর্শন করে খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিলাম।

সকালে উঠে গাঁঠরী বেঁধে আমরা ভীল সর্দারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাত্রার অনুমতি চাইলাম। এক বৃদ্ধা ভীল রমনী মাটির ঘটিতে করে এক ঘটি করে ভেড়ার দুধ খেতে দিল। আমাদের কারো হাতে সুপক্ক মহুয়া, কারো হাতে পাকা কেঁদ আর কারো হাতে কন্দমূল দিল।

হরানন্দজী বললেন — আমরা আকাশবৃত্তিধারী। মা নর্মদার কাছে এদের মঙ্গল কামনা করা ছাড়া এদেরকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। ভীল-পল্লীর নারী পুরুষ হাসিমুখে দণ্ডবৎ জানাল আমাদের। এরপর সর্দার একজন সশস্ত্র ভীলকে সঙ্গে দিল সহজতর জঙ্গলপথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসতে।

এখন আমরা উৎরাই-এর পথে নামছি। কয়েকটি বন্য খরগোসকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। মুখ দিয়ে যেন স্বতঃই বেরিয়ে আসছে — রেবা, রেবা। আমাদের চলার পথে বিশাল বিশাল বনস্পতি পরস্পর জড়াজড়ি করে দুর্ভেদ্য ও অন্ধকারময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক থাকায় আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলছি। সে একটি ঝর্ণা দেখিয়ে বলল — মছুরিয়া, মছুরিয়া। বুঝলাম, আমাদেরকে ঐ ঝর্ণা পেরিয়ে যেতে হবে। ঝর্ণাটি পেরোবার পর আরও দু' মাইল রাস্তা আসার পর লোকটি বামদিকের একটি জংলীপথ দেখিয়ে বলল — এই পথে গেলে মেড়া ঘাটে আমরা নর্মদাতটে পৌঁছে যাব। লোকটিকে বিদায় জানিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। মাত্র এক মাইল রাস্তা হেঁটে এসে একটা বাঁক ঘুরতেই আমরা মায়ের দর্শন পেলাম। ঘাটে নর্মদা স্পর্শ করে ভীল রমণী প্রদত্ত ফলমূল ভাগ করে খেয়ে নর্মদার জল পান করলাম। আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলাম বেলা একটা কিংবা দেড়টা হবে। মাথার উপর তখনও বেশ চনমনে রোদ আছে। এবার আমরা ডানদিকে ঘুরলাম। ক্রমশঃই নীচের দিকে নামছি। অপূর্ব এই বনস্থলীকে তপোবনের মতই দেখাচ্ছে। নর্মদা পর্বতাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছেন। এখানে ধাওয়া মেহরীন ও মোটা মোটা মহুয়া গাছই

বেশী। আমরা নীরবেই হাঁটছিলাম প্রস্তরময় নর্মদার তটের উপর। দূর থেকে নজরে এল একটা শিবমন্দিরের ধ্বজা এবং মন্দির থেকে সামান্য কিছু দূরে পাথরের দেওয়ালের একটি একতলা বাড়ী। দূরে দূরে স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরবাড়ীও দেখা যাচ্ছে। আমরা শিবমন্দিরে প্রণাম করে ধর্মশালায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক সরযু শ্রীবাস্তব আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলেন। অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে আমাদের নিয়ে গিয়ে ধর্মশালার একটি বড় ঘর খুলে দিলেন। সরযু বলল — ইস স্থানকা নাম হ্যায় ঘেরোয়া বা বুধরী ঘাট। বুধরী ঘাট সিবনী জিলা কী লখনদীন তহসীলমেঁ হ্যায়। ইঁহা সে বংসী তক নর্মদাজী মণ্ডলা ঔর সিবনী জিলাকী সরহদ (সীমান্ত) পর বহতী হ্যায়। আমরা যে যার গাঁঠরী খুলে শয্যাসন পাতলাম। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় পর্বত, অরণ্য, বৃক্ষরাজি এক অদ্ভুত সাজে সেজেছে। লোকটি ঘর আলো করার জন্য রেড়ীর তেলের দুটি কুপী এনে জ্বেলে দিয়ে দণ্ডবৎ জানিয়ে চলে গেল। জপ সেরে বাইরে এসে একবার নর্মদার দিকে, একবার পাহাড়ের দিকে তাকালাম। নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রিতে অমল ধবল জ্যোৎস্না বিধৌত এই তীর্থ যেন কোন সূক্ষ্মালোকের স্তর — আমাদের পৃথিবীর কোন ভূভাগ নয়।

হরানন্দজীকে বললাম — সন্ধ্যা থেকেই 'ঐ স্থানকা নাম হ্যায় ঘেরোয়া' — সরযুর মুখের এই কথা আমার মনে তোলপাড় করছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। হঠাৎ স্মৃতির মণিকোঠায় ভেসে উঠল জগৎগুরু ব্রহ্মানন্দ তীর্থজীর কথা। আসুন, এই রাত্রিতে তাঁর পুণ্য জীবন-চরিত অনুধ্যান করি।

আমি শুরু করলাম —

জ্যোতির্মঠো মঠাণাঞ্চ বনানাং বদরীবনম্
জগৎগুরুণাঞ্চ গুরু ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।

বর্তমান যুগের পরমসন্ত প্রাতঃস্মরণীয় ভগবদ্ পূজ্যপাদ জগদগুরু শঙ্করাচার্য শ্রীজ্যোতিষ্পীঠাধীশ্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ ছিলেন নির্মল জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের আধার; তাঁকে দূর হতে দর্শন করলেও মনে অপার শান্তি আসত। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যার সাকার বিগ্রহ। তপ, যোগ ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সেই বিগ্রহকে জ্যোতির্ময় করে রেখেছিল। তাঁর এই অনুপম বিগ্রহে তপস্বীরা দেখেছিলেন তপশ্চর্যার প্রত্যক্ষ রূপ, জ্ঞানীরা দেখেছিলেন জ্ঞানগরিমার অসীম আধার, যোগীরা দেখেছিলেন যোগকলার দিব্য প্রস্ফুটন, চিরশান্ত-মনস্ক সমাহিতচিত্ত মহাত্মারা পেয়েছিলেন পরম শান্তির চিরনিকেতন, বৈরাগীরা দেখেছিলেন নিবৃত্তিমার্গের আদর্শপথ।

১৯২৮ বিক্রম সংবতে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে অযোধ্যায় এক সম্পন্ন সুশিক্ষিত ও সম্মানিত ব্রাহ্মণকুলে জগদ্‌গুরু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নয় বৎসর বয়সে এই সুকোমলকান্তি কিশোরের মনে শুকদেবের মত বৈরাগ্য দেখা দিল। তিনি গৃহত্যাগ করে উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে যান। তাঁর এই সময়ের ধ্রুব নিষ্ঠা, অখণ্ড বৈরাগ্য ও অপরিসীম নিস্পৃহতা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

গৃহত্যাগের পর সদ্‌গুরুর সন্ধানে তাঁহার প্রায় পাঁচ বৎসর কেটে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি তাঁকেই গুরু বলে বরণ করব, যাঁর মধ্যে গুরুর সমুদয় শাস্ত্রীয় লক্ষণ বর্তমান অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর গুরু হবেন শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং সেইসঙ্গে বালব্রহ্মচারী। এই পূর্ণগুরু লাভে তাঁর বহু বিলম্ব ঘটল বটে, কিন্তু নিষ্ঠা ও ধৈর্যের তিনি সার্থক ফল পেলেন। হিমালয়ের মধ্যে উত্তর কাশীতে তিনি যোগনিষ্ঠ পরম তপস্বী বালব্রহ্মচারী শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ দণ্ডিস্বামী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁর পদপ্রান্তে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা নিয়ে তিনি দ্বাদশ বৎসর ধরে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করলেন।

তিনি সর্বদা জগৎপ্রপঞ্চ হতে দূরে নিঃসঙ্গভাবে থাকতেন। 'বুধো জড়ো বদাচরেৎ', তেমনি তিনি জ্ঞানের আড়ম্বর কোনদিন করেন নাই। নিজেকে তিনি গোপনই রাখতেন। কিন্তু জড়বৎ আচরণ করলে কি হবে, তাঁর ব্যক্তিত্বের তেজোময় আভা সমস্ত গোপনীয়তার আবরণ ভেদ করে দিল যাঁর দেহ হতে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের অপূর্ব তেজ ও ব্রহ্মবিদ্যার দিব্য প্রকাশ হয়, তিনি কিরূপে নিজেকে গোপন রাখবেন? তিনি ছিলেন জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন, কিন্তু জগৎ তাঁর সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহশীল হয়ে উঠল।

জগৎবাসী যে দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে বিচার করুক না কেন, সেদিকে তাঁর দৃকপাত ছিল না। তিনি সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তামসিক সংসারীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি শুধু নির্লিপ্ত সাধু, কিন্তু ব্রহ্মচারীর নিকট তিনি

প্রতিভাত হলেন অচ্যুতবীর্য অখণ্ড ব্রহ্মচারীরূপে, মুমুক্ষুর নিকট জ্ঞানী মহাত্মারূপে আর মহাত্মার নিকটে সিদ্ধপুরুষরূপে, বহির্জগতে তাঁর অদ্বিতীয় সমাধিনিষ্ঠার প্রচার হয়ে গেল।

এই সময় অগণিত ভক্ত তাঁর নিকট আসতে লাগলেন। তিনিও শান্তমধুর বচনে ও উপদেশে তাদেরকে প্রীত করলেন।

তারপর ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে শ্রীগুরুজীর সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত ও দণ্ডী সন্ন্যাসী হয়ে পুনরায় নির্জনবাস করতে লাগলেন হিমালয়ে।

আত্মনিষ্ঠ হয়ে এরপর গুরুর নির্দেশে তিনি হিমালয় হতে মধ্যভারতের তপোভূমি বিন্ধ্যগিরি ও অমরকন্টকের নির্জন ঘনঘোর অরণ্যময় পর্বতে চলে আসেন। এই ঘনান্ধকার অরণ্যে কখনও সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে না। এ স্থানই ছিল তাঁর উপযুক্ত সাধনাশ্রম। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী চতুর্দিকে গর্জন করে বিচরণ করত আর তিনি নিশ্চিন্তমনে সেখানে আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকতেন।

১৯০৮ সাল। পটভূমি — বিন্ধ্যগিরি পর্বতের কোলে জব্বলপুর এবং অমরকন্টকের মধ্যবর্তী দুর্ভেদ্য 'ঘেরোয়া' জঙ্গল। জিম করবেট বর্ণিত কুমায়ুনের বিখ্যাত নরখাদকের মত রক্তপিপাসু এক দুর্দান্ত বাঘের আক্রমণে অমরকন্টক পাহাড়ের তলদেশে সমস্ত পাহাড়ীয়াদের জীবনে বিভীষিকা দেখা দিয়েছে। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে এই বাঘের কবলে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় একশতটি লোক, নেপালের শ্রীসামশেরজঙ্গ বাহাদুর রাণা (পরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী) এসেছেন সেই বাঘ শিকার করতে। অনেক প্রতীক্ষার পর তিনি সেই বাঘকে গুলি করতে সমর্থ হন। কিন্তু সেই দুর্দান্ত বাঘ গুলি খেয়েও গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায়। লোকজন সহ পশ্চাদ্‌ধাবন করতে করতে গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তাঁরা একস্থানে দেখেন যে, এক সন্ন্যাসীর পদতলে বাঘটি লুটিয়ে পড়ে আছে। সন্ন্যাসীর হেমকান্ত বরতনু ঘিরে জ্যোতির আভা; সন্ন্যাসী বাঘের ক্ষতস্থানে কমণ্ডলুর জল সেচন করতে করতে অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতভাবে বলে চলেছেন, 'হিংসা ছোড় দো বাচ্চা, শান্ত হো যা, আনন্দমেঁ রহো।'

রাণা এবং তাঁর লোকজন এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। দেখলেন বাঘটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং একবার সন্ন্যাসীর দিকে, একবার তাঁদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল বনের মধ্যে। অভিভূত রাণা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সন্ন্যাসীর কাছে ; ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন কিন্তু অনেক অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না।

রাণা ফিরে গেলেন নেপালে। এই ঘটনার একমাস পর তিনি আবার ফিরে এলেন অমরকন্টকের জঙ্গলে। এইবার তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন নেপালের রাজগুরু অগ্নিহোত্রী পণ্ডিত হেমরাজকে। তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসী এইবার তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন। 'নেপাল সমাচার' নামক পত্রিকায় পণ্ডিত হেমরাজ স্বয়ং এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। পণ্ডিত হেমরাজ লিখেছেন — 'আমার শাস্ত্রচর্চার জীবনে চল্লিশটি দার্শনিক শঙ্কা (Philisophical Riddle) ছিল, সারা জীবন শাস্ত্রচর্চা এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গ করেও তার সমাধান হয়নি। কল্যাণীয় রাণার সঙ্গে ঘেরোয়া জঙ্গলে এই মহাত্মার সমীপস্থ হয়ে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একে একে বিনা প্রশ্নেই সেই শঙ্কাগুলি নিরসন করে দিলেন। এই মহাত্মাই হলেন উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত দণ্ডীস্বামী — কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর মন্ত্র শিষ্য জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।

ঘেরোয়ার জঙ্গল হতে ফিরে এসে বিস্ময় বিমুগ্ধ রাণা এবং পণ্ডিত হেমরাজ এই আশ্চর্য তপঃসিদ্ধ সন্ন্যাসীর বিবরণ দিয়ে (কাশীস্থ ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলে পত্রটি সুরক্ষিত আছে।) কাশীতে চিঠি লিখলেন সনাতন ধর্মের মর্যাদা স্থাপনে চির উৎসাহী, ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজকে। পণ্ডিত হেমরাজ লিখলেন — পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে — অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ — অর্থাৎ মনে প্রাণে যিনি অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হন তাঁর নিকটস্থ হলে ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীও হিংসা ত্যাগ করে। মহাত্মা ব্রহ্মানন্দজীর মধ্যে রাণা এই মন্ত্রের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি অনুভব করেছি তিনি পাতঞ্জলের নির্বিচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ মন্ত্রটিরও জীবন্ত ভাষ্য। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে সেই যোগীশ্বরের মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন স্তরেই প্রজ্ঞালোক নিত্যই উদ্ভাসিত থাকে। আপনারা আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠের উপযুক্ত আচার্য অন্বেষণ করছেন। এঁকে দর্শন করে আসতে পারেন।'

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পণ্ডিত হেমরাজের এই পত্র লেখার একটি কারণ ছিল। আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত প্রধান চারটি মঠের অন্যতম জ্যোর্তিমঠ জগদ্‌গুরু স্বামী রামতীর্থজীর দেহান্তের পর হতে প্রায় দীর্ঘ ১৬৫ বৎসর যাবৎ আচার্য-শূণ্য অবস্থায় পড়েছিল। দেবাতাত্মা হিমালয়ের উপর জ্ঞান ও তপশ্চরণের প্রধানক্ষেত্র হল বদরী, এজন্য বদরীকে বলা হয় তপোভূমি। উদ্ধবকে শেষ উপদেশ দেওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বদরী যেতে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন — বদর্যাখ্যাম্ মমাশ্রমম্। অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের জন্য আচার্য শঙ্কর বদরীকে মঠকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবং তদনুযায়ী শ্রীবদরীনারায়ণ মন্দিরের আঠারো মাইল দক্ষিণে এই মহাপীঠটি স্থাপন করেন। কালক্রমে এই জ্যোতির্মঠের নামানুসারে স্থানটির নাম হয়েছে জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ। শাস্ত্রে আছে, আচার্য শঙ্কর বলতেন,

অস্তি গুপ্তমিদং তীর্থং জ্যোতির্মঠপ্রদীপিতম্।
জ্যোতীরাজতে ত্বত্র ভক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্॥

অর্থাৎ জ্যোতির্মঠ নামে প্রসিদ্ধ একটি গুপ্ততীর্থ আছে, যেখানে ভক্তি ও মুক্তিপ্রদানকারী জ্যোতিঃ নিত্য বিরাজমান।

তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য তোটকাচার্যকে এই মঠের প্রথম জগদগুরু শঙ্করাচার্য পদে নির্বাচিত করে যান। আচার্য শঙ্কর এই মঠেরই একটি কীম বা সহতুঁতবৃক্ষের তলদেশস্থ গুহায় বসে বারটি উপনিষদের ভাষ্য লিখেছিলেন। উপরোক্ত নানা কারণে সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্মজগতে এই জ্যোতির্মঠটি একটি অসাধারণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এইরকম একটি মঠকে লুপ্তপ্রায় হতে দেখে ধার্মিক জনতার মনে বেদনার অন্ত ছিল না। স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে ভারতের বিখ্যাত সন্ন্যাসী এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে মঠটি পুনরুদ্ধারের জন্য সেই সময় নানারূপ আলাপ-আলোচনা চলছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা ঐ মঠের যোগ্য, একাধারে যোগসিদ্ধ এবং জ্ঞানসিদ্ধ মহাত্মার সন্ধান পাচ্ছিলেন না। এই মঠ সম্বন্ধে আচার্য শঙ্করের অনুশাসন ছিল,

শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো বেদ-বেদাঙ্গাদি বিশারদঃ।
যোগজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ স মদাস্থানমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ শুদ্ধাচারী, জিতেন্দ্রিয়, বেদ-বেদাঙ্গ বিশারদ সর্বশাস্ত্রবিদ, যোগীন্দ্রই আমার এই আসনে বসবার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।

অস্মৎ পীঠসমারূঢ়ঃ পরিব্রাড়ুক্তলক্ষণঃ।
অহমেবেতি বিজ্ঞেয়ো যস্য দেবে ইতি শ্রুতেঃ॥

— উক্ত লক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসী আমার পীঠে অধিষ্ঠিত হলে তাঁকে আমার স্বরূপ বলেই জানবে।

কাজেই পণ্ডিত হেমরাজের পত্র পাওয়া মাত্রই স্বামী জ্ঞানানন্দ দারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং এবং কাশী নরেশকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন অমরকন্টকে। কিন্তু তাঁরা সেখানে এই যোগীরাজের দর্শন পেলেন না। বৎসরাধিক অনুসন্ধানের পর বিন্ধ্যগিরির তপোভূমি বেধকের ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কিন্তু মহাত্মার সমাধি কিছুতেই ভাঙে না। কয়েকদিন পরে তিনি সমাধি হতে বুত্থিত হওয়ার পর তাঁরা আচার্য শঙ্করের পুনঃ পুনঃ দোহাই দিয়ে জ্যোতির্মঠ উদ্ধারের জন্য কয়েকবার আবেদন নিবেদন করার পর অবশেষে মহাত্মা কোনমতে সম্মতি দিলেন। ভারতের ধর্মসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁকে মধ্য ভারতের তপোভূমি বিন্ধ্যগিরির কন্দর হতে বাইরে এনে ভারতের ধর্ম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন। তদনুযায়ী ১৯৬৮ বিক্রম সংবতে কাশীস্থ সিদ্ধগিরিবাগে ১৯১১ সালে অখিল ভারতীয় সনাতন ধর্ম সম্মেলনের নবম অধিবেশনে শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পর ভারতের সন্ন্যাসী সঙ্ঘ, ব্রহ্মানন্দজীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তিনি সমাসীন হলেন জ্যোতির্মঠের জগদগুরু শঙ্করাচার্যের পরম পবিত্র আসনে।

ব্রহ্মানন্দজী জ্যোতিষ্পীঠে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষতঃ উত্তরাখণ্ডের ধর্মজীবনে এক নতুন উজ্জীবনের স্রোত বইতে থাকে। জ্যোতির্মঠ সংস্কার, খননকার্যের দ্বারা প্রস্তরাচ্ছাদিত তোটকাচার্যের গুহাবিষ্কার, শঙ্করপূজিত জ্যোতির্লিঙ্গ এবং তাঁর ধ্যানগুহার উপর মন্দিরাদি নির্মাণ তাঁর দ্বারাই সম্পাদিত হয়। মূল মঠ-ভবনের দেওয়ালে তাঁর একটি নির্দেশ আজও লিপিবদ্ধ আছে —ইধর কুছ দ্রব্য চঢ়ানা নিষিদ্ধ হৈ। কুছ দক্ষিণা দেওগে তো তুমহারা দুর্গুণ পাপাদিকা থলিয়া মুঝে সমর্পণ করকে চলা যাও।

শঙ্করাচার্য পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর প্রথম তিনি যেদিন জ্যোতির্মঠে এসে শিবির স্থাপন করলেন, সেদিন এই নূতন মঠাধীশকে দেখার জন্য হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষের জমায়েত হয়েছিল। আচার্যপাদের প্রিয় শিষ্য সংস্কৃতের বিখ্যাত বাগ্মী স্বামী হরিহরানন্দ সরস্বতী (ভারত প্রসিদ্ধ করপাত্রীজী) এবং উত্তর ভারত সংস্কৃতসেবী সঙ্ঘের উদ্যোগে চারদিন যাবৎ অধিবেশন বসে। সেই জমায়েতে তিনি যোগী গৃহী এবং পণ্ডিতবর্গকে আলাদা আলাদাভাবে যে উপদেশ দেন, তা নানাদিক দিয়ে স্মরণীয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে মঠের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদিগকে তিনি বলেন —'মনে রেখো আমাদের সম্প্রদায়ের নাম আনন্দবার। সম্প্রদায় বলতে দল নয়। সংসারের ভোগ সুখ পরিত্যাগ করে ভূমানন্দের সন্ধানে আত্মোৎসর্গ করার আদর্শ যাঁরা গ্রহণ করেছেন, আচার্য শঙ্করের মতে তাঁরাই হলেন আনন্দবার। এই মঠের ব্রহ্মচারীদের 'আনন্দাখ্য' নামকরণ করা হয়, কারণ সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তরূপ ব্রহ্মের নিত্য ধ্যান করে আত্মানন্দে সদা বিহার বা বিচরণ করাই এই শ্রেণীর ব্রহ্মচারীদের আদর্শ।'

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সাধারণ জনতাকে সম্বোধন করে আচার্যপাদ বললেন,

১) শক্তি চাহতে হো, তো শক্তিকে কেন্দ্রসে সম্বন্ধ জোড়ো। থোড়া থোড়া নিত্য ভগবানকে ভজন কা অভ্যাস করকে চলো। বুঁদ বুঁদসে ঘড়া ভরতা হৈ।

২) সংসারতো কজ্জল কী কোঠরী হৈ। ইসকা জিতনা জ্যাদা সম্পর্ক বঢ়াওগে, উতনী হী কালিমা লাগেগী।

৩) সংসার কী সুন্দরতা ঐসী হে, জৈসে শ্বশুরাল কী গালী। গালী তো গালী হী হৈ পর উসমেঁ আচ্ছী ভাবনা করলী গই হৈ। সংসার মেঁ কুছু সুন্দর হৈ নহী পরন্তু ইসে সুন্দর মান লিয়া গয়া হৈ।

৪) মনতো বালু কা ভিত্ হৈ — জরা দো বুঁদ পানী পড়া কি খিস্‌কী। ইসমেঁ পরমাত্মারূপী সিমেন্ট কা থোড়া যোগ দে দিয়া জায়, তো ফির বহুৎ মজবুত হো জায়গী।

৫) অনেক বাসনা-সূত্রঁকো এক্কেঠা করকে ভগবৎ বাসনারূপী মোটী রস্‌সী তৈয়ার করো, ঔর উসীকে সহারে ভবকূপসে বাহর নিকল যাও।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনটির নাম ছিল যোগী-সম্মেলন। দুর্ভেদ্য গিরিকন্দরের গুহাভ্যন্তর থেকে যে সব যোগী এবং যোগাভ্যাসী সেদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদেরকে যোগতত্ত্ব বিষয়ে পৃথকভাবে নানা নিগূঢ় উপদেশ দেওয়ার পর তিনি বলেন —

১) সংসার মেঁ আয়ে হো — ঐসী চাতুরী সে কাম লো, কি ফির লৌট কর্ মলমূত্রকে ভাণ্ডমেঁ না আনা পড়া।

২) ভগবানকী ধ্যানমেঁ লগ্ন ঔর মগ্ন হো যাও। জিতাজিত্ মুক্তি হাসিল করনা চাহিয়ে।

৩) যব গুরুকা অনুগ্রহ হোতা হৈ, তব শিষ্যকী চেতনা-শক্তিকা আরোহ হোতা হৈ। গুরুকা অবতরণ ঔর শিষ্যকা আরোহ, গুরুকী অনুকম্পা ঔর শিষ্যকী শুশ্রুষা পরস্পর উপকারক হৈ। ইস্ প্রকার কা অবরোহ ঔর আরোহ ক্রমকা অনুবর্তন প্রত্যক্ষ সূর্য ঔর পৃথ্বীপরকে ভূতগ্রাম মেঁ দৃষ্টিগোচর হোতা হৈ।

৪) জীব ঔর পরমাত্মা মেঁ যো ভেদ দিখাই দেতা হৈ, বহ্, ঐসা হৈ যৈসা ধান ঔর চাবল (চাউল) কা ভেদ। জীব যব তক কর্মবন্ধনমে পড়া হৈ, তব তক পরমাত্মসে ভিন্ন হৈ। কর্মবন্ধন নষ্ট হোনে পর উহ্ পরমাত্মা হি হৈ।

৫) ভগবান দীনদয়ালু হৈ, দুঃখদয়ালু নঁহী। যো দীন হৈ, উসকে লিয়ে পরমাত্মা দয়ালু হৈ। দীনতা কা অর্থ বিনম্র আত্মসমর্পণম্। আত্মসমর্পণ হী ভাগবৎ চেতনা লাভ করনে কো লিয়ে কুঞ্জী হৈ।

চতুর্থ দিনের অধিবেশনে শ্রীকরপাত্রীজীর পৌরোহিত্যে সমগ্র উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সম্মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের নানা তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয়। আচার্যপাদ দ্বারভাঙ্গা, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়ে বলেন — 'সংস্কৃত হী ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষকা বীজক হৈ। বীজক কী রক্ষা আবশ্যক হৈ, অপনে ঘর কী নিধি সে লাভ উঠাও।' আবেগ দীপ্ত কণ্ঠে তিনি সেদিন সকলকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন — স্মরণ রক্‌খো কি তুম ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা আদি সমর্থ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিয়োঁ কী সন্তান হো, অভী তক্ উন্‌হীকে নাম সে তুম্‌হারে গোত্র চলে আ রহে হৈ — তো কম সে কম উনকী তো ইজ্জৎ বাঁচাও। ঋষিকুমার হোকর,

রাজকুমার হোকর দরবাজে দরবাজে ধক্কা খায়ে বহ্ তো শোভা নহী দেতা। ব্রাহ্মণ হোকর সাধু হোকর ভগবানকে কহলাকর দুকড়ো কে লিয়ে ধক্কা খানা বড়ী মন্দী বাত হৈ। ব্রাহ্মণোঁ সাধুয়োঁকা — 'তৃণবন্মন্যতে জগৎ' হোনা চাহিয়ে,

লক্ষ্মী সমাবিশতু, গচ্ছেতু বা যথেষ্টম্।

— লক্ষ্মী কী হাজার বার গরজ হো তো আয়ে, নলী তো চলী জায়ে, হমেঁ ইস্‌কে লিয়ে দীন নহী হোনা হৈ। লক্ষ্মীপতি ভগবান হমারে বনে রহেঁ ঔর হমেঁ কুছ নহী চাহিয়ে — য়হ্ বৃত্তি ব্রাহ্মণোঁ সাধুয়োঁ কী হোনা চাহিয়ে।

মানুষের বাণীই যদি জীবনী হয়, তাহলে আচার্যপাদের উপরিলিখিত ছোট ছোট বাণী তাঁর জীবনগত উপলব্ধির সত্যিকথা বলতে কি, তাঁর প্রত্যেকটি কথাই ছিল মধুক্ষরা, অজস্র উপখ্যানের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যকে অত্যন্ত রস-মধুর করে তুলতেন। তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী সোজাসুজি অন্তর স্পর্শ করত, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনধারায় এনে দিত শুভ পরিবর্তন। তিনি নিজে আচরণ করে শিষ্য ও ভক্তদের সামনে এমন দৃষ্টান্ত প্রতি মুহূর্তে স্থাপন করতেন যে, প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই অনুভব করেছিলেন যে, এই বরেণ্য আচার্যের বাণীই শুধু জীবনী নয়, তাঁর জীবনই ছিল বাণী — মুখর ও মূর্তবাণী।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা সাধারণতঃ কোনও মহাপুরুষের জীবন আলোচনাকালে তাঁদের যোগজ সিদ্ধি ও বিভূতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করি এবং সেইসব অলৌকিক বিভূতির মানদণ্ডেই সাধুর গুরুত্ব বিচার করে থাকি। বলা বাহুল্য, আমাদের এই বিচার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসে কতজন অপরোক্ষানুভূতি লাভ করে পূর্ণকাম হয়েছেন, সেই পরম সিদ্ধির মধ্যেই মহাপুরুষের মহিমা প্রকৃতভাবে ব্যক্ত হয়। একজন মহৎ শিক্ষকের শিক্ষাধীনে কতজন ছাত্র সাফল্য লাভ করেছে, কতজন কৃতী হয়ে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, তা বিচার করেই আমরা যেমন ঐ শিক্ষকের কৃতিত্ব এবং গৌরব বিচার করি, তেমনি সিদ্ধকাম শিষ্যের সংখ্যা থেকেই মহাপুরুষের গৌরব বা মহত্ব নির্ণীত হওয়া উচিত। সেইখানেই মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব। এই মানদণ্ডে বিচার করলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এদিক দিয়ে আচার্যপাদের গৌরব অতুলনীয়। তাঁর প্রিয়শিষ্য ব্রহ্মচারী মহেশ বর্তমানে মহর্ষি মহেশযোগী নামে জগৎ প্রসিদ্ধ। সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভারতীয় যোগপদ্ধতির অনুরাগী হয়েছেন। আমেরিকার মত বিলাস-বহুল ভোগাসক্ত জীবনে কী প্রচণ্ড প্রভাব ও সম্ভ্রমবোধ জাগাতে পারলে তবে একটি যোগপদ্ধতি স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তা সহজেই অনুমেয়। মহেশ যোগীর এই কৃতিত্ব আমাদের পক্ষে যথেষ্ট গর্ব এবং গৌরবের সন্দেহ নাই। কিন্তু আচার্যপাদের শিষ্যমাত্রেই মহেশযোগী কথিত Transcendental Meditation , এর গুপ্ত পদ্ধতিটি অবগত আছেন। গৃহী যোগী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই যাতে ধ্যানানন্দ আস্বাদন করতে পারেন, এজন্য আচার্যপাদ দীক্ষাকালেই প্রাথমিক স্তরেই ঐ যোগ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, 'ভোজনকালে যেমন প্রতি গ্রাসে গ্রাসেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তেমনি ভজনাকালেও যদি ধ্যানাসনে বসে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, গুরু প্রদর্শিত পথে নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি আছে। মহর্ষি মহেশযোগী ঐ মহাপুরুষের উদ্ভাবিত পন্থাকে জগৎময় জনপ্রিয় করে তুলেছেন এতে আমরা আনন্দিত সন্দেহ নাই। তবে সত্যের খাতিরে কোন তুলনামূলক বিচার না করেই বলতে চাই যে, মহর্ষি মহেশ যোগীরও নমস্য, আরও উচ্চতর কোটির অনেক জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দজীর কৃপায় ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। ব্রহ্মানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে উত্তরাখণ্ডের লোকসংগ্রহী বাবা, স্বামী অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী, উত্তরকাশীর স্বামী কেশবানন্দ পরমহংস, গঙ্গোত্রীর স্বামী সত্যানন্দ পরমহংস, সিদ্ধযোগী স্বামী মগ্নানন্দ সরস্বতী, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ সরস্বতী, বর্তমান জ্যোতির্মঠাধীশ জগদ্‌গুরু শান্তানন্দজী, মহাযোগী পরমানন্দ সরস্বতী এবং শুক্ল সন্ন্যাসী দ্বারিকা প্রসাদ ত্রিপাঠী শাস্ত্রীজী প্রভৃতি সমগ্র সন্ন্যাসী জগতে ব্রহ্মবিদ্ ঋষিরূপে পূজিত।

আচার্যপাদ স্বয়ং অষ্টসিদ্ধি বা অষ্টাদশ সিদ্ধির কোন মূল্য দিতেন না, তাঁর ঐ সব ভারত পূজ্য শ্রেষ্ঠ যোগী শিষ্যরাও কোন মূল্য দেননি। তাঁদের মতে, যোগের যা শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি — জ্যোতিস্মতী ও মধুমতী প্রজ্ঞা — তারও পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল তাঁদের সাক্ষাৎ তপোমূর্তি গুরুদেবের মধ্যে।

এইজন্য ইংরেজী ১৯২৭ সালে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত পূর্ণকুম্ভমেলায় ভারতের শ্রেষ্ঠ যোগী এবং সন্ন্যাসীরা তাঁকে 'অনন্তশ্রী বিভূষিত' উপাধিতে ভূষিত করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রহ্মানন্দ সর্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করেন। ভারতের সন্ন্যাসীরা সর্বসম্মতিক্রমে অনেক চিন্তাভাবনার পর একটি নিগুঢ় অর্থেই তাঁকে এই আখ্যা দিয়েছিলেন। আর কারো এই উপাধি ব্যবহার করার অধিকার নাই। অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত ভারতের মণ্ডলেশ্বর মহামণ্ডলেশ্বরাদি প্রধান সন্ন্যাসীরা আর কাউকে এই আখ্যা দেন নি।

আচার্যপাদের যে বৈশিষ্ট্য সকলকে মুগ্ধ এবং চমৎকৃত করত তা হল তাঁর জ্ঞানসিদ্ধি। তিনি বিনা প্রশ্নে জিজ্ঞাসুর সকল প্রশ্নের সমাধান করতেন। তাঁর প্রবচন কালে হাজার লোক উপস্থিত থাকলেও তাঁর একটি মাত্র প্রবচনের মাধ্যমে হাজার লোকের হাজার রকম প্রশ্নের সমাধান স্বতঃই হয়ে যেত। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

১৯৪৫ সালে তিনি যখন এলাহাবাদে আলোপীবাগের নিকটস্থ 'শ্রীব্রহ্মনিবাসঃ' আশ্রমে চাতুর্মাস্য করছিলেন, সেসময় তাঁর ভক্ত বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল এম. এস. আনে এবং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের আগ্রহে মহাত্মা গান্ধী এবং মহাদেব দেশাই তাঁকে দর্শন করতে যান। গান্ধীজী রাস্তায় যেতে যেতে মহাদেব দেশাইকে বলেছিলেন, 'এই সব মহাত্মারা নিজেদের মোক্ষ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এঁরাও দেশের কাজে মন দিলে দেশের স্বাধীনতা আরও তরান্বিত হত'। আশ্রমে গিয়ে তাঁরা যথারীতি প্রণাম ও অভিবাদনের পরেই আচার্যপাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে থাকেন, দেশের সাধু মহাত্মারাও তাঁদের স্ব স্ব ভূমি থেকে দেশের কাজ করে থাকেন। যেমন ধরুন, রাস্তার ধারে একজন মৃতপ্রায় কলেরা রোগীকে দেখে কেউ তাঁর মলমূত্র পরিস্কার করলেন, কেউ ডাক্তার ডেকে আনলেন, কেউ বা একটু তাঁর মুখে জল এবং ঔষধ দিলেন, আবার কেউ বা তাঁকে সর্বরোগহর ভগবানের নাম শোনাতে লাগলেন। বিচার করে দেখুন, প্রত্যেকেই ঐ রোগীর কল্যাণকামী, প্রত্যেকেই তাঁর নিজ নিজ ভূমি থেকে তাঁর উপকার করবার চেষ্টা করছেন। একজন ধ্যানসিদ্ধ যোগী তাঁর ধ্যানপ্রভাবে দেশের সমষ্টি মনকে সৎ প্রেরণা দান করেন। সূক্ষ্মাকাশে চিদ্‌বাণীর হিল্লোল তুলে প্রজ্ঞাবাণীর স্ফূরণকে সুগম করে দেন। যোগীর শুদ্ধ ইচ্ছাই আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্রনায়ক চিন্তানায়ক এবং বিজ্ঞান সাধকের মধ্যে। কাজেই সাধুরাও দেশজননীর সেবক। বলা বাহুল্য আচার্যপাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি শুনেই গান্ধীজী বিস্মিত হন, বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি গান্ধীজীকে আরও বলেছিলেন,

অহিংসা পরমোধর্ম ইহোক্ত পূর্বসুরিভিঃ।
ন হিংসা সদৃশং পাপং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥

— অহিংসা পরমধর্ম, হিংসার মত জগতে আর কোন পাপ নেই, এ সব কথা আমাদের পূর্বাচার্যগণ বলে গেছেন বটে কিন্তু এ যুগে আপনি বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই আদর্শকে প্রয়োগ করেছেন, এইখানেই আপনার অসাধারণত্ব। শ্রী ভগবান আপনার সহায় হোন।

এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের ঘটনা ব্রহ্মচারী মহেশ (মহর্ষি মহেশযোগী) তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীশঙ্করাচার্য উপদেশ' নামক জ্যোতির্মঠের মুখপত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বস্তুতঃ এই মহাযোগীর এইরকম জ্ঞানসিদ্ধির ঘটনা ভারতের সাধুসমাজে প্রবাদবাক্যের মতই প্রচলিত আছে। ১৯৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় এসে তিনি যখন লেকের ধারে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর প্রবচনকালে এই জ্ঞানসিদ্ধির (বিনা প্রশ্নেই একটি ভাষণের মাধ্যমে হাজার লোকের হাজার প্রশ্নের সমাধান) পরিচয় কলিকাতাবাসী অনেক সৌভাগ্যবান শ্রোতাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ঐ সময় আচার্যপাদের উপস্থিতিতে অখিল ভারতীয় দার্শনিক পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ আচার্যপাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই ধর্মসম্রাটকে লক্ষ্য করে বলেন,

'The precept of Sri Sri Shankaracharya is the key note of world peace. We should follow His advice.' এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তিনি কলকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে শেষ ভাষণে বলেছিলেন, — অধ্যাত্ম ভারতের কৌস্তুভমণি সদৃশ মহাগ্রন্থ 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' প্রণেতা, দ্বিতীয় শঙ্করতুল্য শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীর জন্মভূমি এই বাংলাদেশ আমার কাছে তীর্থস্বরূপ। এখানে আমার দেহান্ত হলে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীতে নির্বাণ প্রাপ্তির মতই পবিত্র বলে মনে করব।'

ওঁ সমাধিসিদ্ধয়ে সমিদ্ধতেজসে সৌম্যায় সম্যঙ্ মুনয়ে নতোহস্মি।

— সমাধিসিদ্ধ দিব্যতেজা এই মুনিবরকে প্রণাম জানাই।

পরমাশ্চর্যের কথা, তাঁর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী মর্মান্তিক ভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ১৩৬০ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতাতেই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ তাঁর এক ভক্তের বাসভবনে তিনি পূর্বঘোষিত তিথি ও লগ্নে যোগস্থ হয়ে দেহরক্ষা করেন। আমি এই দুঃসংবাদ পাই নর্মদার দক্ষিণতট পরিক্রমাকালে ওঁকারেশ্বরে এসে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানিনা ওঁকারেশ্বরে আমরা যে সাধু সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম সেই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পৌরহিত্য করেছিলেন শ্রীমৎ স্বামী করপাত্রী মহারাজ। তাঁর মুখ থেকেই আমি এই মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানের সংবাদ পাই। তাঁর মুখেই শুনি দেহান্তের আধঘন্টা পূর্বে তিনি তার প্রিয় শিষ্য দ্বারিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী, স্বামী পরমানন্দ, করপাত্রীজী এবং ব্রহ্মচারী মহেশ প্রভৃতিকে ডেকে বললেন এখন আমার স্বরূপস্থিতির লগ্ন এসেছে। তোমরা কাতর হয়ো না। আমার স্থূলদেহটা কাশীতে নিয়ে গিয়ে সলিল সমাধি দিও। সেখানে অনেকেই কাতরভাবে শেষ দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাদেরকে আমি কঠোপনিষদের প্রসিদ্ধ কারিকাতে পড়িয়েছিলাম;

শতঞ্চৈকা প্রসৃতাস্তস্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধ্বাণভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষভঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

— সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে আছে একশত একটি নাড়ী, তার মধ্যে একটি মূর্ধাস্থলে সংলগ্ন। এই নাড়ীপথে প্রাণের উৎক্রমণ ঘটলে যোগী অমৃতত্ব লাভ করেন। এই ঋষিবাক্য সত্য, শাস্ত্রবাক্য সত্য। তোমরা দেখ, আমি সেই পথ দিয়েই যাচ্ছি।' এই বলে বদ্ধ পদ্মাসনে ঋজু ও আয়তদেহে যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন এ যুগের সাক্ষাৎ শাস্ত্রমূর্তি ধর্ম সম্রাট স্বামী ব্রহ্মানন্দজী। ইচ্ছামৃত্যু শান্তনু-নন্দন গাঙ্গেয় ভীষ্ম হতে উত্তরায়ণের পথে উত্তরণের যে শাশ্বতধারা পরম্পরাক্রমে চলে আসছে, সেই দিব্যধারা আশ্রয় করেই তিনি চলে গেলেন ব্রহ্মর্ষিদের পরম বাঞ্ছিত অমৃতলোকে।

— নারায়ণ! নারায়ণ! আপনে বহুৎ আচ্ছিতরেসে জগৎগুরুকা মহিমা বর্ণন কিয়া।

মহাদেবানন্দের উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ শেষ হলে প্রেমানন্দ বললেন — কাল হামলোগ ইধর ঠারেঙ্গে। এক রোজ ইধার মাইয়াকো স্মরণ-মনন, হোম, পুরশ্চরণ করকে তব যাত্রা করেঙ্গে। কমণ্ডলুর নর্মদাজল দর্শন ও স্পর্শ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে সকলে যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য উঠে গেছে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম পাথর ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। স্নান করে এসে দেখলাম মহাদেবানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ, ত্রিদিবানন্দ, যতীশ্বরানন্দের পূজা হয়ে গেছে। হরানন্দজী, প্রেমানন্দ ও আমি পূজা সেরে সকলেই মন্দিরস্থিত পাথরের হোমকুণ্ডকে বেষ্টন করে বসলাম। প্রেমানন্দ আগে থেকেই আচার্যকে দিয়ে হোমের সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

আমরা একত্রে যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে বিনম্রভাবে নমস্কারের ভঙ্গীতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র মধুছন্দা দৃষ্ট ঋগ্বেদের আগ্নেয় সুক্তের অন্তর্গত প্রথম মণ্ডলান্তর্গত মন্ত্রগুলি একে একে উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞকাষ্ঠের উপর এক এক কষায় ঘৃত সিঞ্চন করতে থাকলাম। আমাদের কণ্ঠে গায়ত্রী ছন্দে উদ্‌গীত হতে থাকল —

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১

বন্দনা করি উজ্জ্বলশিখা অগ্নি দিব্যজ্যোতি
যজ্ঞ পুরোধা, হোতা ঋত্বিক, দিব্যানন্দপতি।

অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবা এহ বক্ষতি॥ ২

পূজিল অগ্নি অতীতে ঋষিরা পূজিছে বর্তমানে
অগ্নি সে হোতা সর্বদেবতা মর্ত্তে প্রবাহি আনে।

অগ্নিনা রয়িমশ্রবৎ পোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম॥ ৩

পূত উজ্জ্বল পাবকসহায়ে দিনে দিনে পলে পলে
লভিব পুষ্টি খ্যাতি ও বিজয় জগতে বীর্যবলে।

অগেন যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছাতি।। ৪

বিশ্ব ঘেরিয়া যজ্ঞ তোমার হে দেব বৈশ্বানর

সর্ব দেবতা সংকাশে গতি সর্বশক্তিধর।

অগ্নি র্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরা গমৎ॥ ৫

হোতা হুতাশন, দিব্য শ্রবণ, দিব্য নয়নধারী

লয়ে দেবগণ, উজলি গগন, আগমন হোক তাঁরি।

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ।। ৬

অগ্নি তোমারে পূজে যেই জন কল্যাণ কর তার

হে তপোদেবতা, দাও উদ্‌বারি সত্য সে আপনার।

উপত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষংবস্ত র্ধিয়া বয়ম। নমো ভরন্ত এমসি॥ ৭

তমোঘ্ন, তব করি আরাধনা যুগযুগান্ত ধরি,

দুর্যোগে সুখে চেতনা-আলোকে তোমারে প্রণাম করি।

রজন্তমধ্বরণাং গোপামৃতস্য দীদিরিম্। বর্ধমানং স্বে দমে।। ৮

সক্রিয় যাগে রক্ষক তুমি, হে দেব জ্যোতিষ্মান্

ক্রমবর্ধনে ব্যাপিলে তোমার দিব্য অধিষ্ঠান।

স নঃ পিতেব সূণ বেহগ্নে সূপায়নো তভব। সশ্বে নঃ স্বস্তয়ে।। ৯

পুণ্যপাবক, পিতৃতুল্য, তোমারেই যেন পাই,

তব সন্তান কল্যাণ লাগি সমীপে সর্বদাই।

সকলে সমবেতভাবে 'ওঁ অগ্নেয় স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি দেওয়ার পর অন্তে পূর্ণাহুতি দিলাম। মন্দিরের বাইরে তাকিয়ে দেখি গ্রামের বহু লোক করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ হোমের গন্ধে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সরযূ আমাদের সামনে সামনে এসে সকলকে সরিয়ে আমাদের ধর্মশালায় নিয়ে এলেন। গ্রামের কিছু লোক পিছন পিছন এলেও হরানন্দজী হাত তুলে তাদের নিরস্ত করলেন। বেলা তিনটে নাগাদ আচার্য্যজী ও তাঁর ধর্মপত্নী পবিত্র পট্টবস্ত্রে ঢেকে আমাদের জন্য ভিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হলেন। রুটি, সব্জী পরমান্ন আমাদেরকে যত্ন করে খাইয়ে দম্পতি ফিরে গেলেন নিজেদের গৃহে।

আমরা ধর্মশালায় নিজেদের আসনে শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। বাইরে তখনও বেশ রোদ আছে। এতদ্ অঞ্চলে ছটা সাড়ে ছটার আগে সূর্য অস্ত যায় না। এমন সময় আচার্য্যজী এসে আমাদের ঘরে উঁকি মারলেন। আমরা তাঁকে ডাকতেই তিনি হাতজোড় করে বললেন — এখান থেকে একমাইল দক্ষিণে এক সিদ্ধ মহাত্মার বেদী ও বেলগাছ আছে। আপনারা দেখতে চাইলে আমি নিয়ে যেতে পারি। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসব। আমরা তার কথায় সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে যেতে যেতে আচার্যজী বলতে আরম্ভ করলেন — আপনাদের যে মহাত্মার স্থানে নিয়ে যাচ্ছি তাঁকে আমি খুব ছোট অবস্থায় দেখেছি। এই নাগা বাবা ছিলেন মণ্ডলার অধীনস্থ এক তহশীলদার। ব্রাহ্মণকুলে জাত এই তহশীলদার ছিলেন দয়ালু, ধার্মিক ও প্রজাবৎসল। প্রজাদের কোনরকম অভাবের কথা শুনলেই তাদের মুক্ত হস্তে দান করতেন। প্রজারাও তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। পরিক্রমাপথে কোন পরিক্রমাবাসী সাধুর সাক্ষাৎ পেলেই বলতেন —

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুধশ্চিদত্র কবীদ্ পৃচ্ছামি দ্বিনে ন বিদ্বান। (ঋ১/১১৬/৬)

অর্থাৎ আমি জ্ঞানহীন, কিছু জানি না বলেই আপনাদের কাছে সেই পরম পুরুষের রস আস্বাদন করতে চাই। এইভাবে দীর্ঘ দিন কেটে গেল। অবশেষে সেই তহশীলদার সাক্ষাৎ পেলেন এক ব্রহ্মর্ষি মহাত্মার। তিনি বললেন —

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্।।

অর্থাৎ যা কিছু শ্রীমৎ, বিভূতিমৎ ও বলবৎ তা আমার অংশসম্ভূত বলে জ্ঞান করবে।

মহর্ষি অন্তর্হিত হলেন। জ্ঞানযোগের কৃপায় তহশীলদারের ধীরে ধীরে প্রজ্ঞার উন্মেষ হতে লাগল। তিনি জানলেন — সেই পরমাত্মা যিনি, তিনি অণু হতেও অণু, মহৎ হতেও মহৎ। তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রস্ফুটিত হল —

মহথঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনি পরমাগতি। তাঁর জন্ম-মৃত্যু নাই। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ।

এরপর সেই মহর্ষির পুনরায় উদয় হল তহশীলদারের জীবনে। তিনি তাঁকে বললেন —

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরা পশ্চ পৃথিবী বিশ্ববারিনী।।

অর্থাৎ এই পুরুষ হতেই প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল ও তাদের বিষয় আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং বিশ্বের ধারণকর্ত্রী পৃথিবী জন্মগ্রহণ করেছেন।

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।

অর্থাৎ আত্মা সর্বব্যাপী হলেও মায়াতে আচ্ছন্ন থাকায় অজ্ঞানীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন না। সূক্ষ্মদর্শিরা সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে দর্শন করেন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভুয়ো ন কায়তে।।

অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানবান এবং সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র তিনিই সেই পদই প্রাপ্ত হন যা হতে আর পুনর্জন্ম হয় না।

এরপর সেই মহর্ষি তাঁকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন মণ্ডলা হতে পাঁচ মাইল দূরে এই গ্রামের উপান্তে এক মরা বেলগাছ আছে। তার তলায় আছে এক পাথরের বেদী। সেখানেই আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। একদিন গভীর রাত্রে সংসার পরিজন ত্যাগ করে তহশীলদার এখানে এসে উপস্থিত হলেন। গ্রামের মানুষ দেখলেন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় নাগাবাবা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। কেউ কাছে গেলেই তিনি পাথর ছুঁড়ে মারতেন। আর বলতেন — আমার গুরুজী আমাকে এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। সব দূর হঠো, সব দূর হঠো। দিন, মাস, বৎসর অতিক্রান্ত হল। নাগাবাবার গুরুজীকে দেখা গেল না। কোন গুরুজীরও আবির্ভাব ঘটল না। নাগাবাবা একইভাবে মরা বেলগাছের তলায় ধ্যানাবিষ্ট। সহসা একদিন নাগাবাবা চিৎকার করে বলতে লাগলেন — মেরে গুরুজী আ গয়া। মেরে গুরুজী আ গয়া। কিন্তু কাউকে দেখা না গেলেও দেখা গেল মরা বেলগাছটিতে পত্রোদ্গম হচ্ছে। এরও কিছুদিন পর থেকে দেখা যেত নাগাবাবা নর্মদায় স্নান করে এখানকার শিবমন্দিরে সকাল ও সন্ধ্যা পূজা করতেন। তারপর শিবপূজার মন্ত্রে বেলগাছটিরও পূজা করতেন। দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করলেই সকলের চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ হয়ে যেত।

আচার্য্যজীর মুখে নাগাবাবার গল্প শুনতে শুনতে সেই বিশাল বেলগাছ ও বেদীমূলে উপস্থিত হলাম। সেই বেদীতে প্রণাম করার পর দেখলাম বেলগাছের গায়ে টিনের পাতে লেখা আছে —

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গ নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।

যিনি কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করে নিত্যতৃপ্ত থাকেন, তিনি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্মে সম্যক প্রবৃত্ত হলেও তাঁর কিছুমাত্র কর্ম করা হয় না।

আমাদের সঙ্গী আচার্য্যজী বেদীমূল মাথা ঠুকতে ঠুকতে অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা করছেন —

ববন্দে দেবকীং শৌরির্যশোদাঙ্কমধিষ্ঠিতঃ।
জন্মভূস্ত্বাং তথা বন্দে নর্মপা রজসি শায়িতঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার কোলে বসে যেমন দেবকীর বন্দনা করেছিলেন, তেমনি আমিও নর্মদার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে তোমার বন্দনা করছি।

নাগাবাবার সিদ্ধ তপস্থলী দর্শন করে ধর্মশালার দিকে আসতে আসতে বললাম — প্রাচীনকালে ভারতীয়দের জীবন-নদী ছিল তপস্যামুখী। সমুদ্রে মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বস্তি নাই। ধর্মশালায় যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সমগ্র পর্বতাঞ্চল ঢেকে গেছে নিথর অন্ধকারে। আচার্য্যজী সান্ধ্য আরতির জন্য মন্দিরে গেলেন।

আমি বললাম — মেদিনীপুরে আমি এমনই এক জীবন্মুক্ত মহাপুরষের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। তাঁর জীবন-কথা ও নাগা-বাবার জীবন কথা যেন একসূত্রে গাঁথা।

প্রেমানন্দ বললেন — আপনি তাঁর গল্প বলুন। আমরা শুনি।

আমি — স্থানীয় জনসাধারণ দেখতেন প্রতিদিন সন্ধ্যার কিছু আগে এক শুভ্রকেশ শ্যামলকান্তি বৃদ্ধ কখন রিক্সায় কখন বা পায়ে হেঁটে গোপ পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মেদিনীপুর-শহরের উপান্তে এই জঙ্গল — চিতা বাঘ এবং পাইথনে সমাকীর্ণ। কিংবদন্তী এই যে, পূর্বে এখানে বিরাট রাজার গোশালা ছিল। অতীতের সাক্ষী হিসাবে এখনও সেখানে কতকগুলো অট্টালিকার জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। কিছু উৎসাহী লোক শীঘ্রই এঁর পরিচয় বের করে ফেললেন। ঐ রহস্যময় মানুষটি মেদিনীপুর জেলার অধীন কেশপুর থানার অন্তর্গত হারাতলা গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার, নাড়াজোলের দেশপ্রেমিক রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁনের বন্ধু শ্রী নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। এক মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে এঁর জীবনে দিব্য পরিবর্তন ঘটেছে। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের সময়ে ইনিই ক্ষুধার্ত জনতাকে পাঁচ হাজার মণ ধান বিলিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ছয়মাসকাল প্রায় দশখানা গ্রামের মানুষকে প্রতিপালন করেছেন, অনাহারে কাউকে মরতে দেননি। গুণমুগ্ধ গ্রামবাসী তাই এঁর জীবদ্দশাতেই হারাতলার পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাঞ্চনতলাতে স্কুল স্থাপন করেন।

যুগপৎ সম্ভ্রম ও কৌতূহল বশে কিছু সাহসী লোক গোপনে অনুসন্ধান ও অনুসরণ করে আবিষ্কার করলো যে, ঐ বিচিত্র মানুষটি প্রতিদিন জঙ্গলে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পদ্মাসনে বসে থাকেন, নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত। মাথার উপরে কোন আচ্ছাদন নাই, গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষার প্রকোপ, শীতের হিম ও শিশির— জঙ্গলের সাপ ও বাঘ — কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তিনি শহরে তাঁর জেষ্ঠপুত্রের বাড়ীতে ফিরে যান। ক্রমে তিনি একটি কাঠের মাচা এবং বেদী তৈরী করালেন।

যাঁরা সাহস করে তাঁর ঐ রহস্যময় কার্যকলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদের তিনি বলতেন, 'আমার গুরুর আদেশ। তিনি এখানে আসবেন। তিনি এই মাচাতে থাকবেন, বেদীটিতে বসবেন।'

'কই মাসের পর মাস তো কেটে গেল আপনার গুরুকে তো দেখলাম না।' স্মিতহাস্যে নলিনীকান্ত জবাব দেন — 'তিনি তো বিজ্ঞাপন দিয়ে আসবেন না'। যে দিন তিনি আসবেন আপনারা দেখবেন — ঐ যে শুকনো বেলগাছটা দাঁড়িয়ে আছে ঐটি সহসা মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে।'

গোপের সন্নিহিত অঞ্চলের বাসিন্দারা একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, সত্য সত্যই মরা বেলগাছটা বেঁচে উঠেছে। নলিনীকান্তের গুরু এসেছেন। তিনি মাচার মধ্যেই থাকেন — নলিনীকান্ত আর শহরের বাড়ীতে যান না, দিবারাত্র গোপের জঙ্গলেই বেদীর উপর পড়ে থাকেন। যে কেউ গেলে দেখতে পাবেন, গোপের জঙ্গলে সেই বেদী এবং বিল্ববৃক্ষ নলিনীকান্তের রহস্যাবৃত দিব্যজীবনের সাক্ষ্য হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

নলিনীকান্ত ছিলেন সহজ সরল শান্ত প্রকৃতির অমায়িক মানুষ। তাঁর হৃদয়টি ছিল প্রেমিকের হৃদয়। তাঁর গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি প্রতিদিন পাহাড় থেকে নেমে, তাঁতা বালির উপর খালি পায়ে হেঁটে গিয়ে সিকি মাইল দূরবর্তী কাঁসাই নদী থেকে গুরুর জন্য জল বয়ে আনতেন। এই জঙ্গলেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। যোগের অপরিহার্য ফলশ্রুতি হিসাবে এই সময় নলিনীকান্তের অনেক যোগৈশ্বর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং যথারীতি মধুলোভী ভৃঙ্গের দল ভীড় করতে থাকে। তারা ভাবত যেহেতু তিনি নির্জন পাহাড়ে বাস করেন তাহলে তিনি যোগী এবং যোগী হলেই তাঁর কাছে সাংসারিক মুশকিল আসানের যোগ বিভূতি থাকবে। এই বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচতে তিনি বেদী হতে বহুদূরে একটা গাছে একটি কবিতা লিখে ঝুলিয়ে রাখতেন —

সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে

ক্রন্দনের নাহি অবসান।
অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ,
একটি আলোক শিখা সম্মুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।

সহসা গুরু আদেশ করলেন — নলিনীকান্ত ভক্ত হবি তো গুপ্ত হ।
গভীর প্রেমের স্বভাব গোপন,
গোপন হলেই মধুর মোহন॥

যোগীর তিনটি অবস্থা — সাধারণ, অসাধারণ, সাধারণের সাধারণ। অসাধারণত্ব ফুটেছে বলেই, তা হজম করে সাধারণ হয়ে যাও। প্রারব্ধ কর্মানুসারে এই ভোগায়তন দেহ। দেহের বিনাশকাল পর্যন্ত অতঃপর তুমি গৃহে গিয়ে নিরাসক্তভাবে সাধারণ জীবন যাপন কর। সংসারের তাপ হাসি মুখে সহ্য কর। তপস্যার অর্থই হল তাপ-সহা।

গুরুর আদেশ পাওয়া মাত্রই নলিনীকান্ত দণ্ড কমণ্ডলু এবং গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ করে সাধারণ বেশে বাড়ী ফিরে গেলেন। এই যে হঠাৎ সন্ন্যাসীর সাজ খুলে ফেলে গৃহীর বেশ ধারণ তাতে নিন্দুকের রসনায় তো কত কথা ফেনিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু নলিনীকান্ত তা গ্রাহ্য করলেন না। কারণ এ যে তাঁর গুরুর আদেশ।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।

'শ্রদ্ধা দ্বারাই অগ্নি (ব্রহ্মবর্চ্চস্) প্রজ্বলিত হয়, শ্রদ্ধা দ্বারাই হয় হবন কার্য। শ্রদ্ধাই জীবনের হবি।' এই শ্রদ্ধাই ছিল নলিনীকান্তের জীবন দর্শনের মূলমন্ত্র।

এইবার গুরু কথিত সেই তাপ সহার পালা। তাঁর জীবনের উপর দিয়ে যেন ফুটন্ত লাভা স্রোত বয়ে চলতে লাগলো। আদরিণী কন্যার মৃত্যু, জমিদারী বিলোপ, বিষয় নিয়ে দুই পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিষয়ের বিষ যেন গর্জে ফুঁসে উথলে উঠে তাঁকে গ্রাস করতে চাইল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি উভয় পুত্রের জমিদারী বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আমল থেকে কাজ করেছিলেন, সেই সব দরিদ্র কর্মচারী এবং শ্রমিকদের বংশধরদেরকে পর্যন্ত তিনি ডেকে জমি দান করেছিলেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'ঋণ মুক্তি মহোৎসব।' পড়েছিল কেবল দেবোত্তর সম্পত্তি, তার কোন ব্যবস্থা তিনি করে যেতে পারেন নি। এইবার বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সেবায়েৎ নিযুক্ত করে একেবারে দায়মুক্ত হতে চাইলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের তা সহ্য হল না। জোর করে দলিলে সই করাবার জন্য কপাট বন্ধ করে ঐ নরপিশাচ, বৃদ্ধ পিতার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে লাগল। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিল। এক কালের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল নলিনীকান্ত কোন বাধা দিলেন না, কারও কাছে কোন অভিযোগও করলেন না। মাথায় রক্ত ঝরে পড়ছে আর তিনি মৃদু কণ্ঠে বলে চলেছেন —

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু।
অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু। সর্বাণি ভূতাণি মধু॥ (বৃহদারণ্যক ২/৫/১)

জ্যেষ্ঠ পুত্র সংবাদ পেয়ে যখন সদলবলে রুদ্র মূর্তিতে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলেন, তখন তিনি তাঁর হাত দুটি ধরে বললেন — লক্ষ্মী সোনা, ছোট ভাইকে ক্ষমা কর। গুরু আমাকে পরীক্ষা করছেন — কত তাপ সইতে পারি।

মাসখানিকও গত হল না, ঐ নরপশাচ পুত্রটি মৃগী রোগে বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। আজও সে তার বিকলাঙ্গ পাপ দেহ নিয়ে বেঁচে আছে, কৃতকর্মের ফলভোগ করছে। ঐ ঘটনার এক বৎসরের মধ্যে কংসাবতীর সর্বগ্রাসী বন্যায় তাঁর হামার, খামার কাছারীবাড়ী এমনকি বাস্তুভিটাও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আর নলিনীকান্ত সেই শ্মশানে বসেই দুঃখ জয়ের অভয় মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করলেন।

যখন যা ঘটতো, তিনি সহাস্যে বলতেন — 'মালিকের মৌজ! সর্বাণি ভূতাণি মধু!' প্রতিদিন সকালে ঠাকুরঘরে ঈশোপনিষদ খুলে বসতেন, উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন

ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'

ব্যস্, ঐ একটি মাত্র পংক্তিই তিনি উচ্চারণ করতে পারতেন, দ্বিতীয় পংক্তিটি পড়বার অবকাশ পেতেন না। অন্তরঙ্গজন মাত্র দেখেছেন, আমিও দেখেছি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সারা শরীরে কম্পন দেখা দিত। চোখের জলে ভেসে যেত বুক। মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়তো দিব্য আনন্দের জ্যোতি। সাধারণে মন্ত্রপাঠ করেন, কেউ কেউ মনন ও স্বাধ্যায় করেন কিন্তু নলিনীকান্তজী মন্ত্র দর্শন করতেন।

সৎসঙ্গকালে উচ্চারিত একটি শ্লোক এখনও আমার কানে বাজে,

'অদৈব্য কুরু যৎ শ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে॥

— এখনই ধর্মসাধনে লেগে যাও। বৃদ্ধ বয়সে যখন সকল ইন্দ্রিয় বিকল হবে, নিজের দেহের ভারই বোঝা হবে, তখন আর কি করে ভগবানকে ডাকবে?' কথাগুলি তিনি এমন আবেগের সঙ্গে গদগদ কণ্ঠে বলতেন যে, তা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত হয়ে যেত।

তিনি আরও বলতেন — শুনেছি, মরুভূমিতে একপ্রকার কন্টকময় তৃণগুল্ম জন্মে, তা খেতে গিয়ে উটের মুখ রক্তাক্ত হয়ে যায়, তবুও পরমানন্দে তারা তা চিবাতে থাকে। সংসারী লোকের দশাও তাই। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে ভগবান বেদব্যাস বলেছিলেন,

ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে
ধর্মাৎ অর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেবতে॥

— আমি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে চিৎকার করে বলছি যে, ধর্মই অর্থ ও ভোগের কারণ, অতএব তোমরা কেন ধর্মের সেবা করছ না, কিন্তু কেউই আমার কথা শুনছে না। আমি অতি অকিঞ্চন, সাধন-ভজন বা তপস্যা করার শক্তি আমার কোথায়? কেবলই প্রভুর চরণে এই যাজ্ঞা করছি,

মধুবাতা ঋতায়তে। মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ।
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিংব রজঃ। মধু দৌরস্তনঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনসুতির্মধুমানস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভান্ত নঃ॥ (বৃহদারণ্যক ২/৫/১১)

বাতাসে জাগে মধুধারা, নদী স্রোতে বহে মধুধারা, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ওষধি নিচয়, তা মধুময় হোক। মধুময় হোক রাত্রি, মধুভরা হোক উষসী। পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা মধুময় হোক। আমাদের প্রতিপালক দ্যুলোক প্রতিনিয়ত পুষ্টির জন্য মধুবর্ষণ করুক। রসময় হোক বনস্পতি। আকাশের সবিতৃদেব মধুর কিরণ ঢালুন। চারিদিকে আমাদের জন্য মধুতে ভরে উঠুক।

অবশেষে উত্তরায়ণের পুণ্য লগ্নে এই বীতরাগ মানুষটি সংসার রূপ শবের উপর বসে শ্মশান সাধনা করতে করতেই, সন্ন্যাসীর সাজ, সংসারীর সাজ, অসাধারণের সাজ — সব সাজ খুলে ফেলে দিব্য নন্দনলোকে যাত্রা করলেন। এতদিনে হল তপস্যা বা তাপ-সহার পূর্ণাহুতি।

তাঁর অমর আত্মার প্রতি প্রার্থনা জানাই —

নিষ্ঠার অম্লান পুষ্প। হেরি ঐ দুঃখ দীর্ণ
তপোমূর্তি — মনে হয় নীলকণ্ঠ গিলেছে গরল
সংসারের সমুদ্র-মন্থনে।

সন্ধ্যা আরতির পর আচার্য্যজী আমাদের কাছে এসে বসলেন। বললেন — সারাজীবন এই নর্মদাকে ধ্যান-জ্ঞান করে কাটাচ্ছি। নর্মদার কলকল-ধ্বনি আমার কানে আমার মা-এর ডাক বলে মনে হয়। নর্মদাকে না দেখে প্রাণে স্বস্তি পাই না। নির্নিমেষে নেত্রে মা-এর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আমি মার অপার সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। আশা করি, আপনাদেরও এই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। মা নর্মদা আমার কাছে —

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি॥

মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছা করে না। বহু বইতে কেদার - বদ্রীর কথা পড়লেও আজ পর্যন্ত এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি, যিনি নিজে কেদার-বদ্রী দর্শন করেছেন। তাঁর মুখ হতে ঐ স্থানের বর্ণনা শোনার আশা আমার বহু দিনের। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কি কেউ কেদার-বদ্রী দর্শন করেছেন?

হরানন্দজী — শৈলেন্দ্রনারায়ণ কেদার-বদ্রী দর্শন করেছে।

আচার্য্যজী — আমার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললেন — যদি আপত্তি না থাকে তবে আমাদের আপনি ঐ যাত্রা পথের বর্ণনা শোনান। খুবই আনন্দ পাব। আমার আশাও পূর্ণ হবে।

আমি — ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম বাবা আমায় হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বার-হৃষিকেশ-কেদারনাথ-বদ্রীনাথ দর্শনে পাঠিয়েছিলেন। বাবা বলতেন, এতদ্‌ঞ্চল হল মর্ত্যভূমের স্বর্গ, দেবতার বাস। ফুলে ফুলে ভরা সবুজে ছাওয়া এ যেন স্বর্গের নন্দনকানন! সাধু-সন্তের লীলাভূমি হিমালয়ের হিম সৌন্দর্য, নিবিড় অরণ্যানী, ঝরণার সুমধুর তান তোকে মোহিত করে দেবে।

যথাসময়ে ডুন এক্সপ্রেসে চড়ে শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশ হতে ৩০০মি উচুঁতে হরির দ্বার হরিদ্বারে পৌঁছালাম। দেবভূমি হিমালয়ের প্রবেশদ্বার পুরাণের মায়াপুরী হরিদ্বারে (অতীত নাম কপিলাস্থান) অজস্র মন্দির, আশ্রম, পুণ্যতোয়া গঙ্গা এবং জয় জয় গঙ্গা মাতা ধ্বনি ও ভজনের তালে তালে গঙ্গার স্রোতে প্রদীপের ভাসান আমি প্রাণভরে উপভোগ করে চতুর্থ দিনে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে সমবেত পাণ্ডাদের ঐকতান ও মন্ত্রের স্পষ্ট উচ্চারণে মধুস্রাবী গঙ্গা বন্দনা শুনতে শুনতে উত্তরাখণ্ডের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হরিদ্বার ত্যাগ করে যাত্রা করলাম হৃষীকেশের পথে। হৃষীকেশ সত্য সত্যই হৃষীকেশের প্রিয়-নিকেতন। হরিদ্বার যদি হয় তীর্থস্থান তবে হৃষীকেশ হল তার সাধনস্থান। হরিদ্বার তীর্থ হলেও শহর। হৃষীকেশ হল তপোবন। দিন নেই, রাত্রি নেই অবিশ্রান্ত ভাবে পতিতপাবনীর কলনাদিনীর আহ্বান ধ্বনির মাঝে হিমালয় ধ্যানমগ্ন তাপসের ন্যায় অটল অচঞ্চল। একমাত্র এখানেই গঙ্গা ও হিমালয়ের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। আত্মোপলব্ধির শ্রেষ্ঠস্থান এই হিমালয়। পথে দেখলাম একজন সাধু আপনমনে ভজন গাইছেন। সাধুকে কিছু দিতে গেলে সাধু হিন্দীতে বললেন —

চা গিয়া ত চিন্তা গেয়ী মন্‌মে নেই প্রবাহ
যিসকা হৃদে সন্তোষ রাজে উহি শাহানশাহ।

হৃষীকেশে একদিন কাটিয়ে লছমনঝোলা হয়ে যাত্রা করলাম বদরী নারায়ণের পথে। লছমনঝোলার সেতু পেরিয়ে তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'জয় বদরিবিশাল কি জয়'! পথের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য অতুলনীয়।

এক সন্ন্যাসী গাইতে গাইতে চলেছেন —

পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী গঙ্গে, খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে
অলকানন্দে পরমানন্দে কুরুময়ী করুণাং কাতর বন্দে
নাহং জানে তা মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং ॥

'অজ্ঞানম' বা মিথ্যাজ্ঞান নিবারণের পরশমণির উদ্দেশ্যে, আচার্য শঙ্কর অলকানন্দার ধারাপথে ছুটেছিলেন হিমালয়ের নিভৃত আন্তঃরাজ্যে । মহামুনি ব্যাসও ছুটেছিলেন। ছুটেছিলেন আরও আরও বহু মহাপুরুষ। ফিরেছিলেন সত্যজ্ঞানের অমৃতধারা নিয়ে। হিমালয়ের ক্রোড়ে বদ্রীক্ষেত্রে যুগে যুগে মুনি ঋষিরা লাভ করছিলেন আদি ও শেষ, অনাদি ও অনন্ত সত্যের সূত্র — ব্রহ্মসূত্র । হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন জ্ঞানের, সত্যের আলোক -বর্তিকা হাতে। তাঁরা হয়ে এসেছেন দ্রষ্টা। যুগে যুগে যাঁরা হিমালয়ের কোলে তপস্যা করেছেন, জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন, তাঁরা তা পেয়েছেন নিজেদের মধ্যেই। পরমব্রহ্ম, হিরন্ময় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন নি; জিজ্ঞাসুরা উত্তর পেয়েছেন নিজেদের মনে। মনই, অন্তঃকরণই পুরুষোত্তম স্বয়ং।

বিশাল সুউচ্চ পর্বতের প্রাচীর ঘেরা, নির্জনতার রাজ্য, হিমালয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশকারীর মন আপনা হতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে এক নির্দিষ্ট চিন্তায়। চিত্তের ভাবনা ও বিক্ষেপ কমে আসে। সংসারের ক্ষুধিত-তৃষিত কোলাহল কঠিন পর্বতাবরণ ভেদ করে এই শান্তিধামে প্রবেশ করতে পারে না। নীচতার ধূলি ও হিংসা দ্বেষের জ্বালাময় বায়ুপ্রবাহ এই পবিত্র তীর্থকে কলুষিত করতে পারে নি। বিলাস-প্রিয়তা এবং পার্থিব লালসার এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এখানে উপস্থিত হলেই বহু প্রাচীন নিষ্কলঙ্ক, মঙ্গল কিরণানুরঞ্জিত শান্ত জীবনের এক সুকোমল পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। হিমালয়ের স্পর্শ মানুষের মনে প্রশ্ন ছড়িয়ে দেয়, উত্তরও দেয় জানিয়ে।

খুব ভোরে উঠে বাসে চড়ে রওনা হলাম ব্রহ্মার তপস্যাক্ষেত্র দেবপ্রয়াগের দিকে। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলিত সলিলে গোমুখ থেকে আসা ভাগীরথীর মিলন ঘটেছে দেবপ্রয়াগে। গঙ্গা নামের উৎপত্তিও ত্রিধারার মিলনে দেবপ্রয়াগে। আজকের চড়াই পথের দৃশ্য একেবারে নূতন! যতই উপরে উঠছি, ততই দেখছি পুঞ্জীভূত

তুষাররাশি যেন জমে জমে সমগ্র পাহাড়কে ঢেকে ফেলেছে। বুঝলাম, এই নব নব দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যই তীর্থযাত্রীরা সহজে আকৃষ্ট হয়ে অসীম ক্লেশ উপেক্ষা করে থাকে। পথে এক স্থানে এক পাল মেষকে চরে বেড়াতে দেখলাম। তাদের কালো লোমের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুষারকণা ঝক্-ঝক্ করছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষার-সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। চতুর্দিকেই শ্বেতশুভ্র তুষার-কিরীট। মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেবদারু, পাইন, চীর। শ্বেতবর্ণের মাঝখানে কালো বর্ণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির রাজ্যে একি কেবল বিরাট তুষারের সৃষ্টি! এক রাত্রির বৃষ্টিতে কালো পাহাড় ক্রমশই যেন ছায়াবাজীর মত হঠাৎ একদিনে সাদা হয়ে গেছে। উপত্যকার আশপাশ নিম্নদিকে যতদূর চোখ যায়, পাহাড়ের সর্বত্র যেন শুভ্র বস্ত্রে একেবারে ঢাকা। একদিকে তুষারের এই উঁচু নীচু চমৎকার দৃশ্য, অন্যদিকে পূর্বভাগ থেকে উত্তরভাগ পর্যন্ত অভ্রভেদী তুষার শৃঙ্গের দিকে চোখ ফেরালে স্বর্গের সম্পদ-সুষমাই প্রত্যেককে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। স্বপ্ন ও জাগ্রত সাধনার একত্র সমাবেশ ঘটেছে এই পথে। প্রকৃতির আপাত-মনোহর উজ্জ্বলতার মাঝে আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তুষার-সমুদ্র মন্থন করতে করতে বেলা দশটা নাগাদ পৌঁছলাম শ্রীনগরে। বাসের কণ্ডাক্টর মনের আনন্দে গান ধরল —

সাধু চলে নঙ্গা ধড়াঙ্গা চিম্‌টা বজায়কে,
শেঠ চলে হাথী ঘোড়া পাল্কী মঙ্গায়কে,
বদরী-নারায়ণকে রাস্তে মে নহী রোষ গোমান্,
আগে চলে বুড্ঢা আদ্‌মী, পাছে চলে জোয়ন্।।

বাস এখানে বেশ কিছুক্ষণ থামল। বাসের যাত্রীরা সহ আমি এখানে বেথিয়া শাক, রোটী ও নেবুর আচার সহযোগে আহারাদি সারলাম। বিকালের দিকে আমরা পৌঁছলাম অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল রুদ্রপ্রয়াগে। অপার্থিব অনুভূতিতে মুগ্ধ হল মন! এখান থেকেই একদিকে গেছে বদ্রীনাথের পথ, অন্যদিকে কেদার ক্ষেত্র।

এখানেই আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল। ছোট সরু দরজার মধ্য দিয়ে একখানি ঘরে আমার আশ্রয় জুটল। ঘরে জানলা বলতে কিছুই নেই। ঘরের মধ্যে মেঝেতে তক্তা বিছিয়ে তার উপর খড় বিছিয়ে, তার উপর লম্বা লম্বা চাটাই বেছানো রয়েছে। বেলা যতই শেষ হয়ে আসছে ততই ভীষণ শীত অনুভূত হতে থাকল। সন্ধ্যার মুখেই ঘন মেঘের সঞ্চার করে বর্ষণ শুরু হল। এতদ্ঞ্চলের মজা হল সূর্য যতই পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে ততই যেন প্রকৃতি-রাণীর মুখ গম্ভীর ও ভার হয়ে ওঠে।

কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে সারারাত্রি বিশ্রামের পর পরদিন প্রত্যূষে আবার যাত্রা শুরু হল। বিরাটকায় পাহাড়গুলি একবারেই তুষারমণ্ডিত থাকায়, রৌদ্রকিরণে সর্বদাই যেন চোখের সামনে হীরকের মত ঝলমল করছে। এরূপ অপরূপ বিচিত্র দৃশ্যের মধ্য দিয়ে উৎরাই-এর পথে বাস চলল। বেলা এগারটা নাগাদ পৌঁছলাম কর্ণপ্রয়াগে। অলকানন্দা ও পিণ্ডার গঙ্গার মিলনস্থান। অলকানন্দার প্রচণ্ড গর্জন ও ঝিঁ ঝিঁর একটানা কলতান শুনতে শুনতে কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করে পৌঁছলাম নন্দ রাজার যজ্ঞস্থল নন্দপ্রয়াগে। বদ্রীক্ষেত্রের শুরু এখান থেকে। এরপর এল চামোলী। তারপর পিপলকোঠী, তারপর একে একে গরুড়-গঙ্গা, পাতাল-গঙ্গা অতিক্রম করে বিকাল তিনটা নাগাদ পৌঁছলাম জোশীমঠে। বাস স্টপেজের কাছেই সৈন্যদের তাঁবু পড়েছে। এতে হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য, ধ্যানমগ্নভাব ও শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। বাস থেকে নেমেই জোশীমঠের নৃসিংহ মন্দির দেখতে গেলাম। শীতের ছ'মাস যখন বদ্রীনাথের মন্দির বরফে ঢাকা থাকে তখন তাঁর পূজা হয় এই নৃসিংহ মূর্তিতে। ফিরে এসে এক সর্দারজীর হোটেলে পাওয়া গেল দুধ ও রোটী। এই কয়েকদিনের কঠিন যাত্রায়, অর্ধাহারে, শীতে ও বাসের ঝাঁকুনিতে শরীর প্রায় বিকল হতে বসেছিল। যা পাওয়া গেল তাই গোগ্রাসে উদরস্ত করে ফেললাম। মনে ভয় হল, যদি এই বিদেশ বিভূঁইতে অসুস্থ হয়ে পড়ি তবে তো আমার বদ্রী দর্শন হবে না। মনে বল পেলাম এই ভেবে যে বাবা যখন পাঠিয়েছেন তখন কোন বাধাই আমার পথ রোধ করতে পারবে না!

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। চোখ খুলতেই ছোট জানলাটা দিয়ে দেখতে পেলাম বিশাল কালো পাহাড়টার পিছনে ফেকাশে আকাশ আর নিষ্প্রভ দু'একটা তারা। সকাল হচ্ছে। বাইরে এসে দেখি আলো ফুটেছে। যাত্রার জন্য তৈরী হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটলাম প্রাতঃকৃত্য সারতে।

অনেকক্ষণ পরে মনে পড়ল আগের দিনের অসুস্থতার কথা। কিন্তু শরীর ও মন এতই চাঙ্গা হয়ে গেছে যে বুঝলাম বদ্রীনাথজী আমায় ডাকছেন!

সকাল হতে বাস ফিরে যাচ্ছে হৃষিকেশের দিকে। ড্রাইভার আমাকে বলল, আজ জোশীমঠে বিশ্রাম করুন। কয়েকদিন পরে যাত্রা করবেন, কাল আপনার শরীর অসুস্থ ছিল। আপনি জোশীমঠ থেকে হাঁটতে পারবেন না। রাস্তা অত সহজ নয়। বদ্রীনাথ এগার হাজার ফুট উঁচু। শেষের সাত মাইল চড়াই ঠেলে উঠতে সমতলের মানুষদের দু'দিন লাগে।

দমে গেলাম। আমার সঙ্গী সাধুকে প্রশ্ন করলাম — আপনি বলুন, আমি পৌঁছতে পারব তো? সাধু প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন — তুমি যখন যাবে মনস্থ করেছ তখন তো আর কোন সংশয় নাই । তুমি নিশ্চয় যেতে পারবে।

জিজ্ঞাসা করলাম— আপনিও তো বদরিকাশ্রমেই যাচ্ছেন? রাস্তায় কোন ভয় নেই তো?

— না। তবে সতর্ক হয়ে পাথুরে পথে চলবে। আমি কয়েকদিন জোশীমঠে থেকে তবে বদরী যাব।

হিমালয়ের বিপুল বিশাল বৈচিত্র্যের আকর্ষণে আমার একা একা পথ চলা শুরু। রাস্তাঘাট চিনিনা বলে চিন্তা হল। পথে এক পাহাড়ীর সঙ্গে পরিচয় হল। সে বলল, 'চিন্তার কোন কারণ নেই। এধারে চোর ডাকাত বলতে কিছু নাই। হাঁটা পথ একটাই। সে কিছুদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসে পথ দেখিয়ে দিল।

জোশীমঠের অনেক নীচুতে, খাদের মত একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে নদী। আর সেই নদীর গা থেকে একটা সরু পথ উঠে পাশের পাহাড়টার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাহাড়ের আড়ালে কি আছে তা দেখার বা জানার উপায় নাই। নিঝুম, নিস্তব্ধ, জনমানবহীন সেই খাদের মধ্যে যে পথের শুরু হল ওই হল বদ্রীধামের পথ। আসল হিমালয়ের স্পর্শ ওখান থেকেই শুরু। পাহাড়ী লোকটি ফিরে গেল।

আমি নামতে লাগলাম, প্রায় এক ঘন্টা উতরাই ভাঙ্গার পর নদীর সেই পাড় এল। কিন্তু পাড় বলতে যা বুঝায় তা নেই, আর নদীও একটা নয়। দুই নদীর সঙ্গম হয়েছে। অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গা বা ধবল-গঙ্গার পূত মিলনস্থল বিষ্ণুপ্রয়াগ নাম গ্রহণ করেছে।

বিষ্ণুপ্রয়াগের উপর একটা ছোট পুল আছে। পুল পার হলেই দু'চারটে দোকান। আমি তাদের কাছে পাণ্ডুকেশ্বরের পথ নির্দেশ জানতে চাইলে একজন বলল — চলুন, আমিও পাণ্ডুকেশ্বর যাব। আমার বাড়ী পাণ্ডুকেশ্বরেই। পথে একজন সঙ্গী জুটে গেল। বুঝলাম, জীবের অসুবিধা হলেই শিব ছুটে আসেন।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম— সন্ধ্যের আগে আমরা পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছতে পারব তো?

— নিশ্চয়!

পাহাড়ের ছেলে। সে যত তাড়াতাড়ি চড়াই পথ চলতে পারে, আমি তা পারি না। কাজেই বারবার পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। বেলা ক্রমশ গড়িয়ে পড়ছে। আমাদের চলার পথে পাহাড়ের ছায়া , দু'টি প্রাণী পাহাড়ের পথ ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছি।

হঠাৎ যেন বাজ পড়ার শব্দ আর তারপরই হুড়মুড় শব্দ। আমি ভয় পেয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলাম।

ছেলেটি বলল — সরকারী লোকেরা পাথর ফাটাচ্ছে। আমাদের সাবধানে দেখেশুনে যেতে হবে। মাথায় পাথর পড়ার ভয় আছে।

মাইল দেড়েক যাওয়ার পর পাহাড় ফাটানো দলের দেখা পেলাম। আমাদের পায় চলার পথটির থেকে দু'তিনশ ফুট উঁচু দিয়ে মোটর যাবার একটা রাস্তা তৈরী হচ্ছে। রাস্তাটা বদ্রীনাথ পর্যন্ত্য যাবে। দু'বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। যাত্রীরা হৃষিকেশ হতে বদ্রীনাথ পর্যন্ত সমস্ত পথটাই যাতে মোটরে যেতে পারেন তার জন্য ও সৈন্য চলাচলের জন্য। শুনলাম, বদ্রীনাথ থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরেই বসে আছে চীনা সেনা।

ছেলেটি বলল — মহাভারতে পাবেন, পঞ্চ পাণ্ডবগণ অস্ত্র সংবরণ করার অনতিবিলম্বে পীত দস্যুগণ (চীনারা) হানা দেয় ও গোধন হরণ করে। এই চীনা হানাদারদের উৎপাতেই বহু শত বৎসর আগে বদ্রীনাথের পূজারী বদ্রীনাথজীর বিগ্রহ নারদকুণ্ডের জলে ফেলে দেন। আচার্য্য শঙ্কর যোগবলে মূর্তির অধিষ্ঠানস্থলটি জানতে পারেন এবং মূর্তিটি উদ্ধার করেন। বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে মাইল পাঁচেকের মাথায় গোবিন্দঘাট। পাহাড় ফাটানোর ফলে পায়ে চলা পথটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাশি রাশি পাথর পড়ে এমনভাবে পথকে অবরুদ্ধ করেছে যে সেই পাথরের স্তূপ পার হওয়া প্রায় অসম্ভব হচ্ছিল। কেবল পাহাড়ী সঙ্গীর সাহায্যে তা অতিক্রম করলাম।

জোশীমঠ থেকে পাণ্ডুকেশ্বরের দূরত্ব সওয়া আট মাইল । উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ ফুট। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই ছেলেটি একটি কাঠের দোতলা বাড়ীতে আমাকে নিয়ে এল। চারদিকে আরও অনেক বাড়ী ও ধর্মশালাগুলি হানাবাড়ীর মত পড়ে আছে। ছেলেটি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে উধাও হয়ে গেল। এমন সময় চোখে পড়ল বাড়ীটির রোয়াকের উপর কম্বল গায়ে একজন বসে। কাছে যেতেই লোকটি আমাকে প্রশ্ন করল — আপ কঁহা যাইয়েগা ?

বললাম — বদ্রীনাথজী। আপ ?

সাধুজী কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — বাঙালী! বেশ। বদ্রীনারায়ণের দরজা যতদিন খোলা থাকে ততদিন ঐখানেই থাকি। বাকী দিনগুলি নিচে ঘুরে বেড়াই। তিন দিন আগে অক্ষয়-তৃতীয়ায় মন্দির খুলেছে।

প্রশ্ন করলাম — খানা মিলেগী ? তিনি হেসে উত্তর দিলেন — কুছ ভি নহী।

শুনে হতাশ হয়ে পড়লাম। বোধ হচ্ছিল আবার জ্বর এসেছে। একলোটা জল খেয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। এমন সময় পথপ্রদর্শক ছেলেটি ঘরে এসে ঢুকল। সঙ্গে আলু, ডাল, চাল, তেল, নুন এবং কেরোসিনের কূপী। প্রথমেই সে কেরোসিনের কূপী জ্বালাল। ঘরে আলো-আঁধারিতে এক ভূতুড়েপরিবেশ সৃষ্টি হল। তারপরই গাড়োয়ালি ছেলেটি বলল — ভাববেন না, আমি খাবার বানাবো। তার কথায় যেন অমৃতের স্বাদ পেলাম!

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী হল চমৎকার খিঁচুড়ী। তাই দিয়ে তিনজনের নৈশভোজন সমাধা হল। নানা আলোচনার পর শুয়ে পড়লাম।

সকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙল। দেখলাম পূর্বদিনের অসুস্থতা সম্পূর্ণ উধাও । শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে।

ঠিক ছ'টার সময় পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে এগিয়ে চললাম। দেখলাম আমাদের আগে আগে কিছু ছাগী চালের বস্তা নিয়ে চলেছে। আস্তে আস্তে এ অঞ্চল ক্রমশঃ জেগে উঠছে। উল্টো দিক্ থেকে দু'জন গেরুয়াধারী বদ্রীনারায়ণ দর্শন সেরে ফিরছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই তাঁরা 'জয় বদ্রীনাথজী কী জয়' বলে রব তুললেন। আমরাও প্রত্যাভিবাদন জানালাম। দু'দিকে অচেনা মানুষ দেখে ছাগীগুলি শিং বাগিয়ে থমকে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের মালিক এসে তাদের সরিয়ে আমাদের চলার পথ সুগম করে দিল।

প্রায় এক ঘন্টা চলার পর শেষ ধারা পার হয়ে গেলাম। আর পৌনে দু'ঘন্টার মাথায় পড়ল লামব্‌গড়। এখানে একটি চটি ছাড়াও সাহেবদের তৈরী রেস্ট হাউস আছে। লাম্‌বগড় ছেড়ে যতই যেতে লাগলাম ততই শৈত্যপ্রবাহ বাড়তে লাগল। গ্রীষ্মকাল এসে পড়লেও পাহাড়গুলি বরফের মুকুট পরে আছে। বোধ হয় মার্তণ্ডদেব পৃথিবীর আরো কাছে এলে তারা সসম্মানে তখন তাদের মুকুট খুলবে।

লামব্‌গড় থেকে হনুমান চটি চার মাইল। এতটা পথের মধ্যে শুধু এক জায়গায় পাঁচ সাত খানা চালা ঘর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। মানুষ, পশু, পক্ষী মায় কাক পর্যন্ত এখানে বিরল। তবে, প্রকৃতি এখানে অপূর্ব সুন্দরী। তাই যাত্রী নিঃসঙ্গ হলেই বরং তার রূপসুধার ষোল আনাই উপভোগ করতে পারবে। পথ ক্রমশই ঊর্দ্ধগামী । দৈহিক কষ্ট যতই বাড়তে থাকে, জাগতিক বস্তু চিন্তা যেন ততই উবে যেতে থাকে।

চারদিকেই নয় দশ হাজার ফুট পাহাড়ে বেড়া, চির, কেলু ও ফার্ণ-এর ভিড়। শুধু পথের বাঁ দিকে নীচু দিয়ে অতি বেগে বয়ে যাচ্ছে অলকানন্দা । সবই স্থিতিশীল, নিশ্চল। শুধু গতিশীল আমরা তিনজন এবং অলকানন্দা । তাই স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল নদীও প্রাণময়ী, জীবন্ত। মনে হল, আমরা চলেছি, আর ধ্যান গম্ভীর পর্বত খাড়া হয়ে তা নিরীক্ষণ করছে। আমরা চলেছি উপরে, নদী নীচে। পর্বত যেন ধ্যানমগ্ন ঋষির মত শান্ত, সমাহিত। অলকানন্দা কোলাহলময়ী। সে কোথাও পাহাড়ের বুক থেকে লাফিয়ে পড়ছে, কখন শিলাখণ্ডের তলায় লুকাচ্ছে, আবার কোথাও বা আবর্তের সৃষ্টি করছে। নেচে গেয়ে কলহাস্যে অপ্সরা যেন ধ্যানমগ্ন ঋষির ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

পথপ্রদর্শক ছেলেটি জানাল, গরমের হাওয়া লেগে বেশীর ভাগ বরাঁশ ফুল ঝরে গেলেও, স্থানে স্থানে তাদের সে কি উজ্জল সমারোহ! পাহাড়ের বুকের সব কিছুই যখন বরফের চাদরের নীচে ঘুমায় তখন গাঢ় রক্তবর্ণের বরাঁশই শুধু জেগে থাগে। লিচু পাতার মত ছোট এর পাতা আর কলকে ফুলের মত উঁচু গাছের বুক ভর্তি টকটকে লালফুল — বরাঁশ। এই ফুল সর্বরোগহর। বরাঁশ কেবল ফুল নয়, এ হল বদরী নারায়ণের বর, প্রসাদ।

একটা চির গাছের কুঞ্জ পার হলাম। নদী এখন অনেক নীচ দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর গর্জন প্রায় শোনা যাচ্ছে না। বন

এখানে বেশ ঘন। কোথাও থেকে কোন লুকানো ফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। সেই গন্ধে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে মুছে শরীরকে সতেজ করে তুলেছে। সেই ফুলের সৌরভ মহা আনন্দের আর সেই আনন্দলোকের অনুভূতি অবিস্মরণীয়। তাই জানার মাঝে সেই অজানার প্রভাব, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞতার মিশ্রণে, অজ্ঞতা ও আনন্দের অবকাশ ও স্পর্শেই সৃষ্টি হচ্ছে, সৃষ্টি চলেছে। সেই জ্ঞানাতীত, বোধাতীতকে অপেক্ষা করেই সব ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের চক্রটিকে যিনি ধারণ করে আছেন, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই বদ্রীনাথ, তিনিই ওই হঠাৎ আসা আনন্দের আসল কারণ, ফুলের গন্ধটা নয়।

আরো মাইল খানিক যাবার পর যতই বদ্রীক্ষেত্রের কাছাকাছি হচ্ছি ততই দৈহিক কষ্ট তীব্রতর হতে লাগল। মনের গতি প্রকৃতিও যেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে উঠল। আবার আমরা নৃত্য-চঞ্চলা অলকানন্দার গা ঘেঁসে যেতে লাগলাম। এবার মনে হল না অলকানন্দা বিঘ্নোৎপাদিকা বরং জলকণাগুলি যেন মাথা তুলে বলছে — দাঁড়িও না। দেখ আমিও দাঁড়াচ্ছি না তুমিও দাঁড়িয়ো না, এগিয়ে চলো গন্তব্যের দিকে।

চলতে চলতে এক সময় এমন জায়গায় পৌঁছলাম মনে হল, সেখানটার মত নিভৃত নিঝুম স্থল আর কোথাও নেই। সেখানের ছোট ছোট গাছগুলি মৃদু হাওয়ার ঢেউ তুলে যেন কিছু বলতে চাইছে! শ্বাসকষ্ট ও ভয়ানক ক্লান্তিতে এক শিলাখণ্ডে ঝপ করে বসে পড়লাম। এখানে কোন সরব ভাষা নেই। তবু মন যেন কথা কয় সব মূকের সঙ্গে, সব নীরবই যেন কথা কয় মনের সঙ্গে। পাথর, মাটি, নদীর জলকণা, ঘাস-পাতা — সবের ভাষাই যেন মন বুঝতে পারে।

বেলা এগারটা নাগাদ হনুমান চটিতে পৌঁছলাম। এটাই এ পথের শেষ চটি। দোকান ও ধর্মশালাগুলিতে লোক নেই বললেই চলে। ক্রমশঃ পাহাড়ীরা তাদের ঘরে ফিরছে। এখনও অনেকে আসে নি। যারা এসেছে তারা ঘরের চালে বরফ পড়ে যে ক্ষতি হয়েছে তা মেরামতি করতেই ব্যস্ত। সঙ্গী ছেলেটি আমার ও সাধুজীর জন্য এক লোটা গরম চা নিয়ে এল। চা খেয়ে প্রাণ জুড়াল।

সঙ্গী সাধুজী জানাল — আরো তিন মাইল পথ বাকী। এখান থেকে রাস্তা আরো ঊর্ধমুখী এবং চড়াই বেশ কষ্টকর। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে আর এগিয়ে কাজ নেই। সমতলের মানুষদের পক্ষে এই চড়াইতে শ্বাসকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হনুমান চটিতে আধঘন্টা কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। সাধুজীর কথাই সত্যি। দশ মিনিট হাঁটি আর বিশ্রাম নেই। একটা বাঁক ঘুরতেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ল। সমস্ত পথটাই তুষারাবৃত এবং তাতে সূর্যের আলো পড়ে এক জায়গায় ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করেছে। প্রথমে এই বরফ ঢাকা পথ কিভাবে পার হব বলে ভয় হলেও কিন্তু তা আমার পথ রোধ করতে পারল না। দিব্যি সেই বরফ মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। দূর থেকে বরফ পিচ্ছিল বলে মনে হলেও তার বেশীর ভাগই আলগা বালির মত। মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হল। পথের ধারে একটা ঝোরায় জল খেয়ে পাথরে বসলাম। দেখলাম পথ আরোও উঁচুর দিকে চলেছে।

সঙ্গী দুজনকে জিজ্ঞাসা করলাম — মন্দির আর কিতনা দূর? দুজনেই সমস্বরে বললেন — নজদিক্।

মনে মনে উদীপ্ত হয়ে উঠলাম। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে হাঁটতে শুরু করলাম। আরো প্রায় দু'ঘন্টা হেঁটে অর্ধ মূর্ছিত অবস্থায় এক উপলখণ্ডের ধারে পৌঁছাতেই নজদিকের নাগাল পেলাম! বদ্রীনারায়ণজীর মন্দির ও বসতি দৃষ্টিগোচর হল। সাধুজী জানালেন — এই স্থানের উচ্চতা ১১০০০ ফুট।

সেই উপলখণ্ডের কাছ থেকে একটা উপত্যকা অঞ্চল দেখা যাচ্ছে। তার মাঝ দিয়ে নেবে আসছে অলকানন্দা। একটা সাঁকো পার হলেই ঘর-বাড়ীর ভিড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আমার ইপ্সিত মন্দির। যাঁর মধ্যে তিনি আছেন, আমাকে অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। যে ডাকে অনাদিকাল হতে কোটি কোটি মানুষ, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, শিষ্ট-দুষ্ট, রাজা-প্রজা, সাধু-তস্কর, গৃহী-সন্ন্যাসী দলে দলে ছুটে এসেছে এখানে। তাদের অন্তরের কামনা, বাসনা, ভক্তি, আনন্দ, অশ্রু, সুখ-দুঃখের ডালি নিবেদন করে গেছে এই মূর্তির পদতলে। যিনি সদা জাগ্রত তনুতে তনুতে, অনুতে অনুতে।

মনে হল আমার আশে পাশে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল — 'জয় বদরিবিশালজী কী জয়'। আমার মুখ দিয়েও অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল — 'জয় বদ্রীনারায়ণের জয়'।

বাবার আদেশ পূর্ণ করতে পারার আনন্দে আমার শরীর-মন উদ্বেল হয়ে উঠল। এই যাত্রার যে কষ্ট তা মুহূর্তে দূরীভূত হল।

মন্দিরের নীচেই তপ্তকুণ্ড। জল প্রায় ফুটন্ত গরম। অবগাহন স্নানে পথের সকল ক্লান্তি যেন মুহূর্তে জুড়িয়ে গেল। তপ্তকুণ্ডে'র ধার থেকেই মন্দিরের সিঁড়ি উঠেছে। সিঁড়ি পার হতে হতে সাধুজী আওড়াতে লাগলেন —

কৌন কারণ জগন্নাথ স্বামী, কৌন কারণ রামনাথ হৈ।
কৌন কারণ রণছোড় টিকম, কৌন কারণ বদ্রীনাথ হৈ।
ভোগ কারণ রণছোড় টিকম, তপ কারণ রামনাথ হৈ।
রাজ কারণ জগন্নাথ স্বামী, যোগ কারণ বদ্রীনাথ হৈ।

মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির পাদদেশে মাথা ছোঁয়ালাম। সাধুজী আমাকে উদ্দেশ্য করে অনর্গল বলে চলেছেন — ৩১৫৫ মি উচ্চে বিষ্ণুক্ষেত্র বদরীনারায়ণ। এস্থানে দেবী লক্ষ্মী বদরী অর্থাৎ কুল বৃক্ষরূপে ছত্রাকারে ছায়া দেন ধ্যানমগ্ন নারায়ণকে। ওই দেখুন, মন্দিরের সামনে শ্বেত-শুভ্র গাড়োয়াল-রাণী নীলকণ্ঠ পাহাড় (৬৫৯৫ মি)। মন্দিরের দু'পাশে নর ও নারায়ণ পর্বত। ৮ম শতকে আচার্য্যি শঙ্কর তপ্তকুণ্ডের কাছে গরুড় গুম্ফায় প্রতিষ্ঠা করেন ভগমান বিষ্ণুকে। আরও পরে গাড়োয়াল রাজ বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩ শতকে মন্দিরের চূড়াটি সোনায় মুড়ে দেন রাণী অহল্যাবাঈ। ১৮০৩ এর ভূমিকম্পে বিধ্বস্থ মন্দিরের সংস্কার করেন জয়পুরের মহারাজা। জনশ্রুতি হল মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজা পুরুরবা আর ভাস্কর্য স্বয়ং বিশ্বকর্মার। মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত — গর্ভগৃহ, দর্শনমণ্ডপ ও সভামণ্ডপ। উঁচু বেদীতে মণিমুক্তো ও অলঙ্কারে ভূষিত পদ্মাসনে কষ্টপাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণু। তাঁর এক হাতে সুদর্শন চক্র, দ্বিতীয় হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, তৃতীয় হাতে কৌমদকী গদা, চতুর্থ হাতে পদ্ম, মস্তকে রত্ন খচিত মুকুট, শিরোপরি স্বর্ণছাতা। কেয়ুরে কুণ্ডলে কঙ্কণে অপরূপ শোভা। বিষ্ণুর বামে নর ও নারায়ণ, ডানে কুবের। সামনে রূপোর গরুড় করজোড়ে সম্ভাষণরত। পূজারী হলেন রওয়াল নাম্বুদ্রি সম্প্রদায়।

পুজো সেরে মন্দির থেকে বেরোতেই ঝুরঝুর করে জমাট কুয়াশার মত অজস্র বরফের টুকরো আমাদের উপর পড়তে লাগল। মিনিট তিন-চার পরে বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

আমি সঙ্গী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম — অলকানন্দার জল কমে। সে জানাল — গরম এলে অলকানন্দায় যেই জল কমে, অমনি বরফ গলে নদীকে পুরো করে দেয়। এখানের এমনই মজা যে, সব চূড়ায় সব বরফ গলবার আগেই নূতন বরফ আসার সময় হয়ে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার আগেই সাধুজীর কুঠিয়াতে আস্তানা গাড়লাম। ঐ তুষারমণ্ডিত সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত অলকানন্দার শোভায় কত শান্তি, কত পবিত্রতা, সকাল হতে কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে দেখি আর একজন সাধু কুণ্ডের জলে হাত-মুখ ধুচ্ছেন।

মিটিমিটি হেঁসে আমাকে প্রশ্ন করলেন — দর্শন হুয়া।

উত্তর দিলাম — হুয়া।

— ক্যায়া মাঙ্গা।

— কুছ নহী।

— তব কেঁও আয়া?

— পিতাজীকে আদেশ পালন করনে কে লিয়ে ঔর ভগবানকে বাসস্থান দেখনে কে লিয়ে।

আমার কথায় সাধুর ভাবান্তর হল। চোখ দুটি চকচক করে উঠল। তিনি উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন — তেরা দর্শন সার্থক হুয়া। সাধুকে প্রণাম করে পুনরায় বদ্রীনাথজীকে দর্শন করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে হিমালয়ের দেবতাকে প্রণাম করে ফিরে চললাম জোশীমঠে।

বেলা একটায় জোশীমঠে পৌঁছলাম।

পরদিন সকালেই বদ্রীনাথ যাত্রার অসীম কষ্ট অগ্রাহ্য করে নব নব দৃশ্যের বিচিত্র দৃশ্যের লোভে, কেদারের পথে যাত্রা করলাম। জোশীমঠ থেকে বাসে রুদ্রপ্রয়াগে এসে সেখান থেকে চড়াই উৎরাই করতে করতে গুপ্তকাশী, রামপুর হয়ে গৌরীকুণ্ডের পথে যাত্রা করলাম। আমরা নীচের উৎরাই পথে ক্রমশই নেমে চললাম। কিছুদুর অগ্রসর হতে বাম দিক থেকে আসা বাসুকি-গঙ্গার কলকল ধ্বনি শুনতে পেলাম। বাসুকি গঙ্গার ওপারে বিশালকায় ধূম্র পাহাড়। তার পাশ হতে দুধ-গঙ্গা মিশ্রিত মন্দাকিনীর শ্বেতধারা প্রচণ্ড নিনাদে বাসুকি-গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

পুল পার হয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে ক্রমাগত চড়াই পথে উঠে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছলাম। এখানে অনেক দোকান ও চটী। উত্তরাখণ্ডে এই গৌরীকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে —

যত্র ত্বয়া মহেশানি মন্দাকিন্যাস্তটে পুরা।
ঋতু স্নানং কৃতং তদ্বৈ গৌরীতীর্থমিতি স্মৃতম্॥

অর্থাৎ এই মন্দাকিনীতটে কার্তিকেয়ের উৎপত্তি সময়ে গৌরীদেবী প্রথম ঋতু স্নান করেন।

এখানে তিনটি কুণ্ড এবং প্রত্যেক কুণ্ডে গোমুখ দিয়ে জলধারা বাইরে বেরিয়ে আসছে। কুণ্ড ছাড়াও তপ্তকুণ্ড আছে, পাশেই গোরক্ষনাথ মহাদেব ও পার্বতীদেবীর মন্দির। তৃতীয় কুণ্ডের নাম বিষ্ণুকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডে স্নান করে মহাদেবের পূজা করে এক বৃদ্ধ দোকানদারের অনুরোধে তাঁরই দোকানের উপরের ঘরে আশ্রয় নিলাম।

যাই হোক, কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে সাড়ে সাত মাইল দূরস্থ কেদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ডানদিকে মন্দাকিনীর নিরন্তর কল-কল শব্দ কানে বেজে চলেছে। প্রথমে জঙ্গল চটী তারপর রামবাড়া চটী অতিক্রম করতেই চোখের সামনে রজত-গিরির শ্বেত সৌন্দর্য ফুটে উঠল। হিমগিরির এই শুভ্র তুষারাচ্ছাদিত স্থানে যোগিজন-বাঞ্ছিত দেবাদিদেব স্বয়ম্ভু কেদারনাথ দর্শনের জন্য এক নিমেষে ছুটে যেতে ইচ্ছে হল! কিন্তু এই দুর্গম পথের শেষ কোথায়? লোকালয়হীন দুরধিগম্য পর্বতের চড়াই উৎরাই পথে কোথও জঙ্গল, কোথও নদী, কোথাও বা তুষারের চির পিচ্ছিল পথ। বিরাট বিশাল নব নব প্রকৃতি বৈচিত্র্যের মাঝখানে বিচিত্র রূপী লীলাময় মহাদেবের অবস্থান।

দু'তিনটি ঝর্ণা পার হবার পর দেখলাম আমাদের যাত্রাপথের উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারার মত একটি ঝর্ণা ঝরে পড়ছে। লাঠিতে ভর করে ভিজতে ভিজতে অতি সন্তর্পনে তা পার হলাম। মাঝে মাঝেই আমাদের চলার পথের ধারে জমে রয়েছে স্তূপীকৃত তুষার-রাশি। পথ ক্রমশ এঁকে বেঁকে চড়াই পথে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। যতই অগ্রসর হচ্ছি ততই তুষার-ক্ষেত্রের ব্যপ্তি বেড়ে চলেছে। সমস্ত পাহাড় জুড়ে শুভ্র সুন্দর উজ্জলতা। এখানের নূতনত্ব হল যে এখানকার দক্ষিণভাগের লম্বা পাহাড়টি তুষার-মণ্ডিত তবে তাতে উঁচু-নীচু অগণিত শৃঙ্গদেশ নেই। এই পাহাড়টিই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়ে চলল। আরো কিছুটা হাঁটার পরই দূর হতে যখন সেই আকাশ-চুম্বী, ঝলমল সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত সুবিশাল রজতগিরি চিত্র-বিচিত্র রূপে চোখের সম্মুখে হঠাৎ ঝলসিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সেই অমল-ধবল সৌন্দর্য্যের মাঝখানে হিমগিরির চির পবিত্র পীঠে গঠনশৈলী, স্বাতন্ত্র্য ও মাধুর্যে অনবদ্য কেদারনাথের সুশোভন মন্দির দৃষ্টিগোচর হল। তখন আনন্দ অধীর চিত্তে সেদিকেই দ্রুত হাঁটতে লাগলাম, মন আনন্দে ভরে উঠল। মনে হল, পৃথিবীর ধূলি-ধূসরিত বাসনা-পঙ্কিল স্থান যেন অতিক্রম করে সেই মুনি-দেব-গন্ধর্ব বাঞ্ছিত স্বর্গের সৌন্দর্য্য-নিকেতনে উপস্থিত হয়েছি। চারদিকে যেন বিরাজ করছে স্বর্গীয় পবিত্রতা ও চিরমধুর শুচিতা। বেলা দেড়টা নাগাদ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদার-তীর্থে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের চত্বর বেশ উঁচু। মহিষের পৃষ্ঠদেশরূপী পিরামিডধর্মী কেদারনাথ। গোটা গায়ে ঘি-এর প্রলেপ। প্রশান্ত ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সারা মন্দিরময়।

মন্দিরকে ঘিরে বহু ধর্মশালা ও যাত্রী-নিবাস দৃষ্টিগোচর হল। এমনসময় একজন আমারই সমবয়সী পাণ্ডা দৌড়ে এসে আমাকে নিয়ে বিকানীর মহারাজার ধর্মশালায় উপস্থিত হল। থাকার ব্যবস্থা ভালই। কিছুক্ষণ পরে সে গরম গরম পুরী সব্জী ও দুধ নিয়ে হাজির। তার আথিতেয়তায় আমি মুগ্ধ হলাম। খাওয়ার পর আমি পাণ্ডার সঙ্গে কেদার-তীর্থ দর্শনে বের হলাম। উত্তরদিক হতে মন্দিরের পশ্চিমদিকে মন্দাকিনী কুলুকুলু রবে নীচের দিকে বয়ে চলেছেন। দু'ধারের শুভ্র উজ্জ্বল স্তূপীকৃত বরফরাশি মন্দাকিনীকে অধিকতর মহিমমণ্ডিত করে তুলেছে। এই অমল-ধবল তুষার-বেষ্টিত মন্দাকিনীকে স্বর্গের ধারা বলেই মনে হচ্ছে। পাণ্ডার নির্দেশে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তা বার বার স্পর্শ করলাম। পূর্বদিক হতে আগত সরস্বতী নদী দক্ষিণাভিমুখী হয়ে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পশ্চিমদিকের পাহাড় হতে দুধ-গঙ্গা নেমে এসেছে। পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে এক ভৈরব-মূর্তি বিরাজ করছেন। দুধ-গঙ্গা, মধুগঙ্গা, স্বর্গদুয়ারী ও সরস্বতীর মিলন ঘটেছে মন্দাকিনীর সলিলে। দেখে মনে হয় কেদার পাহাড় যেন উপবীত ধারণ করেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কক্ষণে মন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় আচমন করে কেদার দর্শনের জন্য মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করলাম। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। কালো গ্রানাইট প্রস্তর নির্মিত সুশোভন মন্দিরের বামদিকে হনুমানজী, দক্ষিণে পরশুরাম ও মধ্যস্থলে সম্মুখে বিঘ্ন-বিনাশন গনেশজী। ভিতর ভাগে নাতি-প্রশস্ত অঙ্গন, যা

দেখতে অনেকটা নাটমন্দিরের মত। পদ্ম খোদিত গর্ভগৃহের ছাদ নাটমন্দিরের বাম ভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ, দক্ষিণে পার্বতী, মধ্যস্থলে নন্দীগণ ও বৃষমূর্তি। এই সব দর্শন করতে করতেই তুষারনাথ কেদারেশ্বরের সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গের সম্মুখে উপবিষ্ট হলাম। পাণ্ডার ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে...... মন্ত্রপাঠের মধ্যে আমি দর্শন করতে লাগলাম সেই হিম-গিরিশীর্ষ-শোভী তুষার প্রচ্ছন্ন কেদার-তীর্থকে, যা সুর-নর-মুনি বন্দিত জটাজূটধারী ত্র্যম্বকের অবিচল ধ্যান মূর্তি! যাঁর দর্শনের আশায় রাজ্য, সম্পদ, আত্মীয় স্বজন তুচ্ছ করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সহ পঞ্চ পাণ্ডব এই চির দুর্গম তুষার-পথের পথিক হয়েছিলেন! ধ্যাননিমীলিত নেত্রে মহাদেবের পূজার পর বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রণাম জানালাম আমার ঋষি-পিতাকে। যাঁর নির্দেশে আজ আমি এ স্থানে উপস্থিত হয়েছি। এই তীর্থ যাত্রায় যেন আমার সকল সাধনা সফল ও সম্পূর্ণ ।

পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। আমি তাকে দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করতে চাইলাম। কিন্তু পাণ্ডা ঠাকুর আমার ঘরে বসে পড়ে বলতে লাগলেন — আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। তাই যাবার আগে আপনাকে কেদারের এক গুপ্ত রহস্য বলে যাচ্ছি। উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত সুবিশাল কেদার-তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেরই দৃষ্টিতে অতুলনীয় হলেও জানবেন বাইরের প্রকৃতিতে যে ভাবে মন্দাকিনী, সরস্বতী, মধু-গঙ্গা, দুধ-গঙ্গা বয়ে এসেছে, ভৈরব মূর্তি পাহাড়ে যেভাবে যেস্থানে অবস্থান করছে তারই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হল এই মন্দিরস্থ প্রাণনাথ। বাইরে কেদারের যেমন বিশাল অচঞ্চল রূপ তেমনি ভিতরে তার ক্ষুদ্র সংস্করণ। কাল যাত্রার পূর্বে নিশ্চয় মন্দির দর্শন করতে যাবেন। আমি যা বলে গেলাম তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মিলিয়ে নেবেন।

তারপর আমাকে বাইরে যাবার ইঙ্গিত করে বললেন — আসুন, আপনাকে একটা মজার দৃশ্য দেখাই। আজ ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে এই জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় বাইরের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সমগ্র কেদার-খণ্ড যেন কাক-জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। মনে হবে পাহাড়ের মাথায় যেন লক্ষ ওয়াটের আলো জ্বালা হয়েছে আর তাতেই যেন সারা অঞ্চল আলোকিত হয়ে আছে। এখন মন্দির বন্ধ। কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত প্রাণনাথও এরকম উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় যা দিনেরবেলায় আলোর মধ্যে দেখা যায় না। লিঙ্গ গাত্রে কান পাতলে শুনবেন শঙ্খ-নিনাদ যা বাইরের নদীগুলির রবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'জয় কেদারনাথের জয়' বলতে বলতে তিনি আর এক মুহুর্তও থামলেন না। তাঁর চলে যাবার পর ঘরে এসে দেখি আমার প্রদত্ত দক্ষিণা পড়ে আছে আমার বিছানার পাশে। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আর পাণ্ডা ঠাকুরের হদিশ পেলাম না।

এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনের পর সারারাত্রি দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সকালে উঠে হিমশীতল ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের দরজা সবে খুলেছে। এক বৃদ্ধ পূজারী পূজার আয়োজন করছেন। আমাকে দেখেই বললেন — আ গিয়া। আমি তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে পাণ্ডা ঠাকুরের কথা অনুযায়ী কেদারনাথজীকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। লিঙ্গ গাত্রে কান পাততেই শুনতে পেলাম শত শত মৃদঙ্গের তালে তালে অপূর্ব মধুর বোল। বুঝলাম তাঁর কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি! আমি জ্ঞান হারালাম। অন্তর্চেতনায় শুধু মৃদঙ্গের তালে তালে বেজে চলেছে — পিতৃদত্ত মহামন্ত্রের ধ্বনি, তার মীড়ক ও মূর্ছনা! আধো ঘুম, আধো জাগরণে অর্থাৎ অর্ধস্ফুট চেতনায় যেন মনে হল বাবার কোলে মাথা দিয়ে পড়ে আছি।

পরে ধাতস্থ হয়ে ঐ পাণ্ডাঠাকুরের অনেক খোঁজ করলেও তাঁর দর্শন মেলে নি। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে করে, কেদারনাথকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে কেদারখণ্ড ত্যাগ করে ফিরে চললাম বাড়ীর পথে।

কেদার ছেড়ে যতই সমতলের দিকে নামতে লাগলাম, স্বস্থানের দিকে যতই এগোতে লাগলাম ততই নানা চিন্তা মনে ভীড় করতে লাগল। হিমালয়ের স্পর্শে জাগা সকল বোধ, সকল অনুভূতি যেন ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল।

মনে মনে গেয়ে উঠলাম —

আবার এরা ঘিরছে মোর মন।
আবার চোখে নামে যে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে
চিত্ত আমার নানা দিকে ভ্রমে ॥ শিবমস্তু, শিবমস্তু।

আমি বর্ণনা শেষ করে প্রণাম জানালাম মা নর্মদা, বাবা ও কেদার-বদ্রীর উদ্দেশ্যে। সকলকে বিদায় আশীর্বাদ জানিয়ে আচার্য্যজী ফিরে গেলেন। বাইরে বেরিয়ে দেখি সাতপুরার পর্বত চূড়ায় অর্ধচন্দ্রের উদয় হয়েছে, অসংখ্য তারা ঝিকমিক করে হাসছে। সামনের দিকে নর্মদার জল চিক্‌চিক্ করছে দেখতে পেলাম। মন্দিরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে নানা কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে চোখে ঘুম নেমে এসেছে জানি না।

সকলের সঙ্গে আমিও প্রাতঃকৃত্য, স্নানাদি সেরে নিজেদের গাঁঠরী বেঁধে পরদিন খুব ভোরেই যাত্রা করলাম নন্দিকেশ্বর অভিমুখে। বিপরীত তটে *লুকেশ্বর। নন্দিকেশ্বর ও লুকেশ্বর নর্মদা-তটের দুই প্রসিদ্ধ তীর্থ। আমরা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম। নর্মদা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণরূপ ধারণ করেছে। এখানে চোখে পড়ছে নর্মদার কল্যাণীরূপ, নর্মদার রূদ্ররূপ প্রায় নেই বললেই চলে। পথের ধারে ধারে বা কখনও দূরে দূরে চোখে পড়ছে গোঁড় ও হিন্দুদের সুখী ও স্বচ্ছল পরিবারের আভাষ। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছি। বহুদূর থেকে নজরে এল নন্দিকেশ্বরের স্বর্ণচূড়া। আমরা সকলেই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম।

নন্দিকেশ্বর ব্রহ্মার মানসপুত্র ধর্মের তপস্যাস্থল। বরাহপুরাণে আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করার মানসে যখন তপস্যায় নিমগ্ন হন, তখন তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ থেকে এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। ইনিই ধর্ম। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন — তুমি চতুষ্পদ ও বৃষভাকৃতি, তুমি বড় হয়ে প্রজাপালন কর। তখন ধর্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ। দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে একপাদ হয়ে ব্রহ্মাবিদ্ ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণরূপে, ক্ষত্রিয়দের তিনভাগে, বৈশ্যদের দুইভাগে এবং শূদ্রদের একভাগ দিয়ে রক্ষা ও পালন করতে থাকেন। গুণ দ্রব্য ক্রিয়া ও জাতি — এই চারটি ধর্মর পাদ। বামন পুরাণের মতে — ধর্মের স্ত্রী অহিংসা। এঁর চার পুত্র হল — সন্যকার, সনাতন, সনক ও সনন্দ। 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে প্রায় টানা ছয় ঘন্টা হেঁটে আমরা প্রায় চারটে নাগাদ নন্দিকেশ্বরে পৌঁছে গেলাম। এখানের ঘাটে জনসমাগম যথেষ্ট। অনেক সাধু সন্ন্যাসী বসে জপ করছেন। আমরা নন্দিকেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতেই এক জটাজূট মহাত্মা পিছনদিক থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘুরতেই দেখি সূর্যনারায়ণজী, সেই সৌম্যকান্তি চেহারা। গলায় রুদ্রাক্ষ এবং একটি শিবলিঙ্গ। পরিধানে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল। ত্রিশূলের সঙ্গে একটি টাঙ্গি দড়ি দিয়ে বাঁধা। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আমিও ঠিক থাকতে পারলাম না। দু-চোখ বেয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। উভয় উভয়কে জড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। সঙ্গীরাও হতবাক। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। আমরা নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করছি। সূর্যনারায়ণজীর ঠোঁট নড়ছে। অনবচ্ছিন্ন ধারায় তিনি রেবামন্ত্র জপ করে চলেছেন। হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে একটি পরিত্যক্ত মন্দিরে এনে আমাদের তুললেন। মন্দিরের পিছন থেকে ভেসে এল ব্যাঘ্র হুঙ্কার। আমরা ভয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। সাধুজী অভয় দিলেন — কৌই ডর নেহি, মুড়িয়া মহারণমেঁ এ্যায়সা হোতাই হৈ। এই বলে গাঁঠরী খুলে তিনি প্রত্যেকের আসন বিছিয়ে ফেললেন।

হরানন্দজী আমি ও অন্যান্যরা তাঁকে বারংবার বারণ করা সত্ত্বেও তিনি কারো কথা শুনলেন না। নিঃশব্দে সমস্ত কাজ সেরে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। বললেন — আভি লোটেঙ্গে। আমরা পথশ্রমে এতই ক্লান্ত ছিলাম যে ভাল আস্তানা পেয়ে মনে স্বস্তি বোধ করলাম।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সঙ্গীদের বললাম — উত্তরতটে পরিক্রমাকালে গঙ্গাবাহ ঘাটে এসে এই মহাত্মার দর্শন পাই। ইনি জঙ্গম সম্প্রদায়ের বীরশৈব। সেই থেকে তিনি লুকেশ্বর পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। খুবই উচ্চকোটির মহাত্মা। কথা বলেন কম, বিভূতির অন্ত নাই। এঁরই কৃপায় অমাবস্যার গভীর রাত্রে মধ্যাহ্নক্ষণে নর্মদার প্রবল স্রোতের মধ্যে মহাজাগ্রত মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গ লুকেশ্বরের দর্শনলাভ ঘটে। আমি মণিময় জ্যোতিলিঙ্গের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

এমন সময় সূর্যনারায়ণজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি গাইতে গাইতে আসছেন —

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভুজমুদিত্য বাচ্যতে
নদী চ নর্মদাতুল্যা ন লিঙ্গং নর্মদে বিনা।।

---

*১৯৮৩ সালে আমি পুত্র আনন্দমোহনকে নিয়ে লুকেশ্বরে যাই। সূর্যনারায়ণজীর পুনরায় দর্শন পাই। তিনি পুনরায় পিতা-পুত্রকে অমাবস্যার রাতে নর্মদা গর্ভে মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন করান। পরের বছর বৈশাখী পূর্ণিমাতে তাঁর দেহবসান ঘটে।

আমি উর্ধ্ববাহু হয়ে ত্রিসত্য করে বলছি এই পৃথিবীতে নর্মদা তুল্য নদী এবং নর্মদা লিঙ্গের মত লিঙ্গ নাই।

কাঁধের ঝুলি মন্দিরের এককোণে নামিয়ে রাখলেন। তাতে রয়েছে আটা, জল, নানাবিধ শব্জী, পেঁপে, কলা ইত্যাদি। তারপরই তিনি জপে বসলেন। আমরাও জপ সেরে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম তখনও দেখি তিনি সমকায়শিরোগ্রীব অবস্থায় আসনে উপবিষ্ট। গভীর রাত্রে হরানন্দজীর ঠেলায় ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। দেখলাম আমার অন্য সাথীরাও বিছানায় উঠে বসেছেন। হরানন্দজীর বিস্ফারিত দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি মন্দিরের মধ্যে মৃদু স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোতে ভরে গেছে। সূর্যনারায়ণজী পদ্মাসন অবস্থাতেই শূণ্যে ভাসছেন। আমি সূর্যনারায়ণজীর এরকম অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হলেও আমরা সাথীরা এইরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখেন নি। তাই তাঁদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। আমিও অপলক নেত্রে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি সূর্যনারায়ণজী জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে তেউড়ী সাজিয়ে খিঁচুড়ীর মত কোন বস্তু রান্না করছেন। আমাদের বললেন — নর্মদায় স্নান ও নন্দিকেশ্বর-এর পূজা করে আসতে। আরও জানালেন — তোমরা ফিরে এলে আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের মন্ত্রে হোম করব।

আমরা তাড়াতাড়ি স্নান প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নন্দিকেশ্বরের পূজা করতে এসে দেখি সূর্যনারায়ণজী কতকগুলি পাথরকে পরপর সাজিয়ে হোমকুণ্ড তৈরী করেছেন। পাশে একটি তাম্রপাত্রে ঘৃত, চন্দন, কর্পূর। হোমকুণ্ডকে ঘিরে রয়েছে সাতটি কুশাসন। তিনি আমাদের সকলকে আসন গ্রহণ করার ইঙ্গিত করলেন। হোমকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হল।

তিনি শুরু করলেন —

ওঁ বায়বা যাহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রুধী হবম॥ ১
এস হে মরুৎ, সুধা প্রস্তুত, ভক্তি সোম কর পান
দিকে দিকে তাই ঘোষিণু মোদের উৎসুক আহ্বান।

ওঁ বায় উক্থের্ভিজরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ। সুতসোমা অহর্বিদঃ॥ ২
হে পাবন, তব সুজ সোমগণ লভিয়া দিব্যালোক
পূজিছে তোমারে, সে মহামন্ত্রে সত্য প্রকাশ হোক।

ওঁ বায়ো তব প্রণৃঞ্চতী ধেনা জিগতি দাশুষে। উরচী সোমপীতয়ে॥ ৩
আপনারে যেবা শূণ্য করিল তারি পূর্ণতা তরে,
সোমরস ক্ষরে, তীব্র সাধনে সাধক সহস্রারে।

ওঁ ইন্দ্রবায়ু ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরা গতম। ইন্দবো বামুশন্তি হি॥ ৪
রস নিবেদন করিনু রচন, মোদের শ্রেষ্ঠ দান
এস হে ইন্দ্র, এস এস বায়ু, নিঃশেষে কর পান।

ওঁ ব্যয়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ। তবা ফতমূপ দ্রবৎ॥ ৫
এস বায়ু, তুমি এস হে বাসব, রসপানে উঠ জাগি,
বিপুল বিভবে দ্রুত এস তবে, জ্ঞানরস অনুরাগী।

ওঁ বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ যাদমুন নিষ্কৃতম। মণ্ডিকথা ধিয়া নরা॥ ৬
ইন্দ্র পবন! সুতসোমগণ আসব-ঘাম্য ভরি
রাখিল সাজায়ে, এস বিরদ্বয়, হেথা এস ত্বরা করি।

ওঁ মিত্রং হুবে নৃতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥ ৭
মিত্রে স্মরি যে সত্যদর্শী, বরুণ বৈরীঘাতী
লভিনু দোঁহার পুণ্য প্রসাদে স্বচ্ছ বিধির দ্যুতি।

ওঁ ঋতেম মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। ক্রতুং বৃহন্তমাথে॥ ৮
মিত্র বরুণ, সত্য ধর্মে সত্যে করিয়া বৃদ্ধি
সত্য পরশি, সাধিছে বিশ্বে, সুবৃহৎ তপে সিদ্ধি।

ওঁ কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসম্॥ ৯

সত্যদর্শী মিত্র বরুণ মেধা ও জ্যোতির ধারী

ব্যাপ্তি নিবাস চেতন ধর্মে পথ নির্দেশকারী।

এক একটি মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের অভ্যন্তরে দেখা দিল মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চমক। আর হোমকুণ্ডে চলতে চলতে লাগল অগ্নির নর্তনলীলা। এইভাবে প্রত্যেকটি মন্ত্র একে একে সাতজনকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে তিনি ঘৃতাহুতি দিলেন।

বিকাল চারটা নাগাদ আমাদের হোম-পর্ব সমাধা হল। সূর্যনারায়ণজী প্রত্যেককে শালপাতায় পরিবেশন করলেন সেই সকালের খিঁচুড়ী। আমাদের আহার পর্ব শেষে আমরা নর্মদা স্পর্শ করে ফিরে আসতেই সূর্যনারায়ণজী একটি ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। চারদিকে মহাজঙ্গল। আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম — সাধুজী কাল যে প্রদীপটি জ্বেলেছিলেন, সেই প্রদীপ দিনরাত্রি একইরকমভাবে জ্বলে যাচ্ছে, ' বিন তেল বিন বাতি '।

আমরা সূর্যনারায়ণজীর ঋদ্ধি সিদ্ধি ও বিভূতি প্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জপে বসলাম। গোটা মন্দির প্রাঙ্গণ হোমের সুগন্ধিতে ভরপুর। জপ যখন শেষ হল তখন মনে হল রাত্রি নয়টা বেজে গেছে। সূর্যনারায়ণজী তখনও ফেরেন নি।

হরানন্দজী বললেন — হয়ত সাধুজী ফিরবেন না, নয়ত তিনি আমাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙল সূর্যনারায়ণজীর কণ্ঠস্বরে। তিনি গাইছেন —

ফলৈর্মূলৈঃ কন্দৈঃ কৃতনিজশরীরং ধৃতবতে

মহা পুণ্যেহরণ্যে তব জননি তীরে স্থিতবতে॥

মুরারিত্যং দস্যে কৃতসলিলসেবায় বিদুষে

মহাভদ্রেহ দান্তে গিরিবিবর গুহ্যে তপয়তে॥

হে মাতা নর্মদা! হে শিবাত্মজে! তোমার তটস্থিত মহাপুণ্যময় অরণ্যে উৎপন্ন কন্দ, ফলমূল গ্রহণ করে যে জীবন-ধারণ করে, যে তোমার পবিত্র জল পান করে গিরি গুহায় তোমারই তপস্যা করে, তাদের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটবেই ঘটবে।

আমরা সকলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সূর্যনারায়ণজী বললেন — চলিয়ে অব নাহায়েঙ্গে। উসকে বাদ যাত্রা করেঙ্গে। বুঝলাম — মান্দালার পথে সাধুজী আমাদের সঙ্গে থাকবেন। পাহাড়ের উপর সূর্য উদিত হচ্ছেন। সমগ্র পাহাড় অরুণাভায়ে ভরে গেছে। সাতপুরা পর্বতের উপর যেন রামধনুর শোভা। নর্মদা স্নান ও শিবপূজার পর আমরা মান্দালা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

সূর্যনারায়ণজী চলেছেন আমাদের আগে আগে। পথ চিনতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। নর্মদা তীরে প্রাণের সাড়া জেগেছে। কিছু কিছু গোঁড় ও ব্রাহ্মণ গৃহী পরিবার নদী ঘাটে স্নান করতে নেমেছে। তিন-চারটি গোঁড় ও রাজপুতদের পল্লী অতিক্রম করলাম। সূর্যনারায়ণজী এ অঞ্চলে ভীষণভাবে পরিচিত। তাঁকে দেখতে পেয়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কাজ ছেড়ে এসে তাঁকে প্রণাম করছে। তিনি তাদের কুশলা-কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর চড়াই-এর পথে ঘনঘোর মুণ্ডমহারণ্যের শাল, সাজা, আবলুষ, বহেড়া, হরিতকীর পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা জটলার মধ্য দিয়ে, বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সূর্যনারায়ণজী বলছেন — আত্মাই হল সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। আত্মসত্যই জীবনের চরম ও পরম সত্য। মানুষের অন্তরাত্মাই হল বিশ্বব্যাপী ভালবাসার মূল। আত্মসাক্ষাৎকার হলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্মজ্ঞান ভয় দূর করে। চৈতন্যস্বরূপ সর্বব্যাপী ভূমাই আত্মা। আত্মাই শাশ্বত আশ্রয়। আত্মতত্ত্ব জানে না বলেই মানুষ বালির উপর ঘর বাঁধে। ভিখারীর মত কানাকড়ি ভিক্ষা করে রোগ, শোক, দুঃখে অভিভূত হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্ব লাভ করতে হলে চাই তপস্যা। এই তপস্যাবলেই সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষা করে থাকেন। তপস্যার মহিমা অপার। আর এই নর্মদাতটে তপস্যার ফলে আত্মা দেহমনযুক্ত ক্ষুদ্র আমি উর্ধে উত্থিত হয়। বেলা প্রায় বারটা নাগাদ একটি বিরাট জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। নদীর বিস্তৃত বুকের মাঝখানে পর্বতমালার আড়ালে। পর্বতমালার একদিকে আছড়ে

পড়ছে জলস্রোত। তারপর পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে গা বেয়ে সহস্র ক্ষীণ ধারায় ঝরণা হয়ে ঝরে পড়ছে।

আমরা সহস্রধারার দক্ষিণতটে এক মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু মন্দিরের এইরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ গঠনশৈলী নর্মদার অন্য কোন তটে দেখি নি। মন্দিরটি 'দ' আকৃতির। ভিতরে এক উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ শোভা পাচ্ছেন। সূর্যনারায়ণজী বললেন — আজ আমরা এই মন্দিরে থাকব। নর্মদার এই স্থানেই সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি শুধু তপস্যাই করেন নি, তিনি তাঁর তিন শিষ্যকে অধ্যাত্ম বিদ্যা দান করেছিলেন। এই তিন শিষ্য হলেন দেবতা, মানুষ ও অসুর।

একদিন দেবতা ঋষি প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা দান করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু প্রজাপতির উপদেশ দেওয়ার ধারা বিচিত্র। তিনি দেবতাকে 'দ' উচ্চারণ করে নিশ্চুপ হলেন। তাঁর ঐরূপ উচ্চারণের উদ্দেশ্য শিষ্যের শরীর মন তপস্যা দ্বারা যদি শুদ্ধ হয় তবে শব্দের আংশিক উচ্চারণেই বাকী অংশ হৃদয়ঙ্গম হবে। পরে জিজ্ঞাসা করলেন 'কি বুঝেছ বল?' দেবতা উত্তর দিল সংস্কৃত 'দম্যত' শব্দ দম্ ধাতু হতে উৎপন্ন। এর অর্থ দমন করা। অর্থাৎ আপনি আমাদের সংযম অভ্যাস করতে উপদেশ দিচ্ছেন। যাতে কোন অবস্থায় আমরা সংযমচ্যুত না হই। প্রজাপতি দেবতাদেরকে আশীর্বাদ করলেন।

অন্য একদিন মানুষ ঋষি প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য উপস্থিত হলেন। প্রজাপতি যেরূপ দেবতাদের বলেছিলেন সেরূপ একই পন্থায় 'দ' উচ্চারণ করে নিশ্চুপ হলেন। মানুষ উত্তর দিল — দয় ধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ দান করা। অর্থাৎ আপনি আমাদের দানবৃত্তির অনুশীলন করতে বলছেন। প্রজাপতির আশীর্বাদ নিয়ে মানুষ আশ্রম ত্যাগ করলেন।

এরপর অসুর ঋষি প্রজাপতির সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে দেবতা ও মানুষের মত তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপদেশ চাইলেন। ঋষিও পূর্বধারা অনুযায়ী 'দ' বলে মৌনাবলম্বন করলেন। অসুর উত্তর দিল — সংস্কৃত 'দয়ধ্বম' শব্দ দয় ধাতু হতে উৎপন্ন। এর অর্থ দয়া করা। অর্থাৎ আপনি আমাদের দয়াবৃত্তির অনুশীলন করতে বলছেন। আপনি বলছেন দয়াবৃত্তি না থাকলে জীবন পশুর মত। নিষ্ঠুরতা, পরপীড়ন আধ্যাত্মিকতার কন্টক। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা এবং দয়াবৃত্তিতে ঐ সমস্ত কন্টক দূর হয়। প্রজাপতি প্রাণভরে অসুরদের আশীর্বাদ করলেন।

এরপর সূর্যনারায়ণজী শিবলিঙ্গে প্রণিপাত করে বললেন — আকাশে যখন মৃদু মেঘ গর্জন হয় তখন বা সমুদ্রের গর্জনের ঐকতানেও দেখবে ধ্বনিত হয় 'দ', 'দ', 'দ'। এই সহস্রধারার জলের গর্জনেও ধ্বনিত হচ্ছে 'দ', 'দ', 'দ'। অর্থাৎ প্রকৃতি যেন সমস্ত জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিচ্ছে দমন কর, দান কর, দয়া কর। এই অনুশীলনই আত্মতত্ত্বলাভের প্রথম ধাপ। এর দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্মজ্ঞানেই মুক্তি। এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

সূর্যনারায়ণজী নীরব হলেন।

হরানন্দজী বললেন — স্বয়ং সম্পূর্ণ সাধনার পথ নর্মদা পরিক্রমায় এসে আরও একটা তত্ত্ব আমাদের সামনে উদ্ঘটিত হল। কোন অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির জন্য প্রাচীন ভারতের লোকেরা তপস্যাকে সর্ববস্তু প্রাপ্তির মূল উপায় বলে জানতেন।

মনোমুগ্ধকর সহস্রধারার বিপুল গর্জন শুনতে শুনতে আমরা জপে মন দিলাম।

পরদিন সকালে উঠে দেখি সূর্যনারায়ণজী প্রত্যেকের জন্য পাঁকা পেঁপে ও দুটি করে পেয়ারা কোথাও থেকে এনে রেখেছেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে এই বিচিত্র সাধুকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি প্রণাম করতে দিলেন না, হাতদুটে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বললেন — চলিয়ে নর্মদাকী পাশ। তিনি মা নর্মদার ধারার দিকে তাকিয়ে যুক্ত করে দরবিগলিত অশ্রু হয়ে সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করাতে লাগলেন —

আদৌ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে ত্রিভুবনবিবরে কল্পদা সা কুমারী
মধ্যাহ্নে শুদ্ধরেবা বহতি সুরনদী বেদকণ্ঠৌগ্রকণ্ঠৈঃ
শ্রীকণ্ঠে কন্যরূপা ললিতশিবজটা শাঙ্করী ব্রহ্মশাক্তিঃ
সা দেবী বেদগঙ্গা ঋষিকুলতরণে নর্মদা মাং পুণাতু॥
ধ্যায়ে শ্রীসিদ্ধনাথাং গণবহসরিতাং শর্মদাং ভক্তবর্গা

শ্যামা বালেব নীলাম্বরমুখনয়নাম্‌ভোজ যুগ্মেকমিষ্টু
চূড়াঞ্চাভীতিমালাং বরজলকরকাং হস্তযুগ্মদ্‌ধানাং
তীর্থানাং ছত্রহংসাং ক্ষরথনৃপগাং দেশিকস্যাসনাগ্রে।।

সূর্যনারায়ণজীর সুরের মাধুরী মনকে দোলা দিলেও, এই বৃদ্ধ সাধুর বৃদ্ধ বয়সের কণ্ঠস্বরে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং আর্তি জড়িয়ে আছে যে মনে হচ্ছে এ যেন তাঁর প্রাণের গান। মর্মদেশের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়ে তাঁর কান্না অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে মা নর্মদার চরণতলে।

মহাত্মা নীরব হলেন। কিন্তু তাঁর সুরসৃষ্টির উদ্বেল মূর্ছনায় আমার মন উথাল পাথাল করছে। সূর্যনারায়ণজী বললেন — আর মাত্র দেড়শ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারলেই অমরকন্টকে পৌঁছাবে। নর্মদামায়ী তুম্‌হারা আচ্ছাই করে গা। এরপর তিনি তাঁর ঝুলি থেকে ১০৮টি নীল স্ফটিকের একটি মালা আমার হাতে দিয়ে বললেন — মধুমঙ্গলজীর জপের মালা। তুমিই একে রক্ষা কর। তারপর আমাদের প্রত্যেকের ঝোলায় সংগৃহীত ফলমূল ঢেলে দিলেন। আমি বললাম — আপনার স্নেহ এবং করুণার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আশীর্বাদ করুন যাতে আমার ব্রত সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারি। সূর্যনারায়ণজী আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমরা পুনরায় প্রণাম করে জঙ্গল পথে নর্মদার তীর ঘেঁসে হাঁটতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর যাবার পর সূর্যনারায়ণজী পিছন দিক থেকে আমাকে ডাকলেন। তাঁর ডাকে আমার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি গাঁঠরী কমণ্ডুল ফেলে তাঁর কাছে দৌড়ে আসতেই বললেন — দিওয়ানাজী বলেছেন — অমরকন্টকে পৌঁছে তুমি পরিক্রমা সমাপ্ত করার পর পাঁচদিন থাকবে। সেই সময় তুমি পুষ্পদন্তকৃত শিবমহিম্নঃস্তোত্রম্ তোমার ভাষায় অনুবাদ করে মা নর্মদায় বিসর্জন দেবে, আর সেটাই হবে তাঁর প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য ..........................................................

আমি কাঁদতে কাঁদতে নর্মদাতে নামলাম। চোখ মুখ ধুয়ে স্মরণ করলাম সিদ্ধ মহাত্মা দিওয়ানাজীর স্নেহ ও করুণার কথা। হন্ হন্ করে হেঁটে সাথীদের কাছে ফিরে এলাম। কানে বাজছে দিওয়ানাজীর মধুর কণ্ঠস্বর —

তেরা হীরা হিরাইল বা কিচড়মেঁ।
কোঈ ঢুঁড়ে পূরব, কোঈ ঢুঁড়ে পছিম,
কোঈ ঢুঁড়ে পানি পত্থল মেঁ।
দিওয়ানা জো হীরাকো পরখেঁ বাঁধ লিয়া
জীয়রাকে আঁচলমেঁ।।

সাতপুরা পর্বতমালায় শীর্ষদেশ উদীয়মান সূর্যের লাল আভায় রঙীন হয়ে উঠছে। আমরা আর পিছনের দিকে তাকালাম না।

দিওয়ানাজীর চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি। মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠল উত্তরতটের মর্দানাঘাটের শিবমন্দিরে দিওয়ানাজী দিব্য অবস্থায় উপবিষ্ট। কচি শিশুর মত আধো আধো বুলিতে স্খলিত কণ্ঠে বিভোর হয়ে গাইছেন —

প্রীতম্‌কো পাতিয়া লিখুঁ, যো রহে বিদেশ।
তনমেঁ মনমেঁ নৈনমেঁ তাকৌ কহা সন্দেশ।।

— প্রিয়তম বিদেশে থাকলে তাঁকে চিঠি লিখতাম, কিন্তু তিনি যে শরীরে মনে, নয়নে সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন, আমাকে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে আর কোথায় খবর পাঠাব?

আমি চলতে চলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

হঠাৎ পাথরে ঠোক্কর খেয়ে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। আমি সজাগ হলাম। হরানন্দজী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

হরানন্দজী বললেন — সূর্যনারায়ণজীর কাছে বাকী জীবন কাটাতে পারলে আমার আধ্যাত্মিক মঙ্গল হত। কারো মুখে কোন কথা নাই। চর্তুদিকে ঘন জঙ্গল, নাম না জানা গাছের ভীড়। সব জড়াজড়ি করে রয়েছে, মাথার উপর জঙ্গলের চন্দ্রাতপ। কোথাও কোথাও সামান্য পাতার ফাঁক-ফোকর ভেদ করে ছিটে ফোঁটা সূর্যরশ্মি পড়েছে। এই ঘন জঙ্গলে সেই সূর্যকিরণটুকুই আমাদের পথ চলতে সাহায্য করছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্ণা তির্ তির্ করে বয়ে যাচ্ছে পথের উপর দিয়ে। নর্মদার জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পাহাড়ে ধাক্কা মারছে।

হঠাৎ দেখি আমাদের থেকে বেশ কিছুটা সামনে মাথায় শুকনো ডালপালার বোঝা মাথায় নিয়ে একটি লোক চলেছে। তাকে দেখাই যাচ্ছে না। আমরা আওয়াজ দিলাম — 'হর নর্মদে হর'। লোকটি ঘুরে আমাদের দেখে বলল — আলেকুম সালাম। হর নর্মদে। তার বিচিত্র সম্ভাষণে আমরা অবাক হয়েছি। লোকটি বলল — আমরা মুসলমান। সামনেই মহল্লা। আমাদের মহল্লা অতিক্রম করে তবেই আপনারা মান্দালায় পৌঁছাবেন। মান্দালা শহর নর্মদার উত্তরতটে। আপনারা রয়েছেন দক্ষিণতটে। এখানে আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাকি। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিয়ম অনুযায়ী ধর্মাচরণ করে। আমাদের কোন ভেদাভেদ নাই। মা নর্মদা আমাদের সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

তার কথা শেষ হতে না হতেই মুসলমান পল্লী থেকে ভেসে এল আজানের সুর। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাথার বোঝা পথের উপর ফেলে তার পাগড়ীটা খুলে পেতে প্রার্থনারত হল। আমরা এগিয়ে চললাম। আমি বললাম — শহরে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্য কূট অভিসন্ধি এবং সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি থাকে। এর ফলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষবুদ্ধি বেড়ে গেছে। কিন্তু তিনি নিত্য, সত্য, শাশ্বত, সদা বিদ্যমান, জ্যোতির্ময় এবং মহামহীয়ান। তাঁকে বেষ্টন করা যায় না। বিদ্যা দিয়ে তাঁকে অভিভূত করা যায় না। বুদ্ধি দিয়েও তাঁকে পরাজিত করা যায় না। তবুও অজ্ঞানী মানুষ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বাধিয়ে সেই অনাদি অনন্তকে হেয় করছে। কিন্তু এই নর্মদাতটে মা নর্মদার রাতুল চরণে এরা এক দেহ, এক প্রাণ।

যা আমাদের ধারণ করবে, যাকে অবলম্বন না করলে আমরা বাঁচার মত বাঁচতে পারি না, মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারি না, সেই জিনিষ বাদ দিয়ে শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষা আমাদের জীবনের পথে এগিয়ে দেবে, শরীর, মন, বুদ্ধির বিস্তার ঘটাবে। কিন্তু এই শিক্ষার ভিত যদি কাঁচা, কম-জোর হয়, তার উপর কোন স্থায়ী জিনিষ গড়ে উঠতে পারে না। ফলে আজকাল সমাজের সকল স্তরেই যে দুরবস্থা, দুর্নীতি দেখা দিয়েছে তা ধর্মহীন শিক্ষা পদ্ধতির অনিবার্য্য পরিণতি।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। কারণ আমাদের দেশে নানা ধর্মের লোক বাস করে তাই আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ আর ধর্মহীন এক কথা নয়। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হবে না ঠিকই তবে রাষ্ট্রের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষার ভিত্তি থাকবে না তা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

ভারতে মনীষার অভাব নাই। অভাব শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির, যার দ্বারা জাতি গঠন সম্ভব। তাই শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিত্তোনয়নের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যার ফলে ছাত্রদের প্রকৃতির পরিবর্তন হবে এবং তাদের জীবনের পরিধি বিস্তারিত হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে বিশেষ সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন।

আমি কোন বিশেষ ধর্মের শিক্ষার কথা বলছি না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের গোড়ায় এমন কতকগুলি নৈতিক বা মূল সত্য ও মান আছে যার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে এবং সেগুলিকে অবলম্বন করে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হলে সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে যাবে এ আশঙ্কা অমূলক। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কোন শিক্ষক তা তিনি হিন্দুই হন বা মুসলমান হন, তিনি তাঁর মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারেন। কিন্তু ধর্মশিক্ষার সুব্যবস্থা থাকলে ছাত্ররা নিজেরা বিভিন্ন ধর্মের উদার মত ও নীতি উপদেশ জানতে পারবে। সাম্প্রদায়িক বিষ তাদের স্পর্শ করবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন দেখবে তাদের পবিত্র কোরাণ বা বাইবেলের উপদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা পড়ছে তখন তারাও হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতার কথা শুনতে বা জানতে আগ্রহান্বিত হবে এবং ঐ সকল গ্রন্থের উপর শ্রদ্ধা পোষণ করবে।

গীতায় বলা হয়েছে —

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মাণি॥ (গীতা ২/৪৭)

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার কর্মফলের হেতু হয়ো না, অকর্মে তোমার আসক্তি না হোক। কর্মের ফলের দিকে তাকাতে হবে না।

অনুরূপে কোরাণে আছে —

ইল্লা হ্লাহা লা এ জিউ আজরাল মোহ সোনিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আছে —

সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়া-জয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যসি॥ (গীতা ২/৩৮)

অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ, লাভ বা ক্ষতি, জয় বা পরাজয় সমান মনে করে কর্ত্তব্য কর্ম করা উচিত। এ প্রকারে পাপ প্রাপ্ত হবে না।

আর এর পরেই বলা হয়েছে —

দুঃখেষুনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ (গীতা ২/৫৬)

অর্থাৎ যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, বা সুখেতেও তাঁর কোন স্পৃহা নাই। অনুরাগ ভয় ক্রোধ পরিত্যাগী স্থিতধীই হলেন মুনি।

বনী ইসরায়িলেও ঠিক এইরকম কথা পাওয়া যায়। তিনি বলছেন — 'মুসলেম সন্তান! সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতির বিচার করতে গেলে তোমার দ্বারা কোন কাজ হবে না। অতএব তুমি নিশ্চিন্তভাবে কাজ করে যাও ভবিষ্যতে তুমি ফল পাবেই। যদি বা ফল না পাও তাও তোমার মঙ্গলের জন্য জানবে।

গীতার ন্যায় অমূল্য গ্রন্থে ঐরূপ সর্বজনিন্ উপদেশ আরও অনেক আছে এবং তার অনুরূপ কথা অন্য ধর্মের মূল গ্রন্থেও পাওয়া যাবে।

উপনিষদে পাই, সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্' — অর্থাৎ সত্য ভিন্ন বলবে না, ধর্ম বা ন্যায়ের পথ ত্যাগ করবে না, যাতে তোমার কল্যাণ তা হতে বিচলিত হবে না।

আবার 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব — অর্থাৎ মাতার সেবাপরায়ণ হও, পিতার সেবাপরয়াণ হও, আচার্য্যের সেবাপরায়ণ হও, অতিথির সেবাপরায়ণ হও। অন্যধর্মে এর বিরোধী অনুশাসন থাকতেই পারে না।

সুরা-আনম ১১ আছে — পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং মিথ্যাবাদীদের পরিণাম অবলোকন কর।

সুরা-মায়েদা ১১৯ আছে — শেষ বিচারের দিনে সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট।

সুরা-তাওবা ১১৯ আছে — হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদী হও।

চোখে পড়ল নর্মদায় সওয়ারী নিয়ে নৌকা চলেছে এক ঘাট হতে অন্য ঘাটে। ইতিমধ্যে আমরা মুসলিম পল্লী অতিক্রম করে সমতল উপত্যকার উপর দিয়ে চলেছি। নজরে এল অর্ধচন্দ্রাকার মান্দালা শহর। দক্ষিণতট থেকে দেখা যাচ্ছে মান্দালার পাকা ঘাট। ঘাটে প্রচুর লোক। আমি বললাম — প্রায় ১৮৬০ খৃঃ রাজা নরেন্দ্র শাহ্ এই মান্দালা নগরীর পত্তন করেন। পরে এটি তাঁর রাজধানীতে পরিণত হয়। কথিত আছে মণ্ডন মিশ্র এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ এই স্থানেই হয়েছিল। উত্তরতট পরিক্রমাকালে মান্দালা দুর্গ, রাজরাজেশ্বরী মন্দির, ব্যাস-বেট আমি দেখে এসেছি।

অল্প অল্প শীত পড়ছে। বেলা ছোট হয়ে আসছে। বিকাল চারটা নাগাজ পৌঁছে গেলাম বনজা সঙ্গমে। এখানে বনজা নামক পাহাড়ী নদী নর্মদাতে এসে মিশেছে। সঙ্গমের উপরই অর্বুদেশ্বর শিবের মন্দির এবং সুন্দর বাঁধানো ঘাট। শাল, সেগুন, তেঁতুল এবং শীরিষ গাছে ঘেরা ধূসর রঙের মন্দিরটি। মন্দিরে দরজা নেই। কিন্তু মন্দিরের ভিতরটা বড় হলের মত। হলের মাঝখানে হরিদ্রা বর্ণের শিবলিঙ্গ। সর্বাঙ্গে রক্তচন্দনে র ছিটা। লিঙ্গের গা থেকে দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট। পাশে একটা বিরাট ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে। লিঙ্গের সামনেই বিশাল যজ্ঞকুণ্ড। লিঙ্গের রেতলালা এবং যজ্ঞকুণ্ডের ঘৃতধারার মুখ নর্মদায় গিয়ে মিশেছে। আমরা মন্দিরের এক কোণে গাঁঠরী রেখে নর্মদা স্পর্শ করতে গেলাম। ঘাট জনশূন্য; এমনকী দূরে দূরে কোন ঘরবাড়ীও দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকে নিবিড় অরণ্য।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা জপে বসলাম। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে।

জপ সেরে বাইরে তাকিয়ে দেখি পাতা হতে শিশির পড়ছে। মহাদেবানন্দ বললেন — একটু আগুন জ্বালাতে পারলে আরাম পেতাম। কিন্তু এখানে আগুন জ্বালানোর কোন সরঞ্জামই নেই। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কিছুতেই আসছে না। বিছানায় শুয়ে এদিক ওদিক করছি। মনে হল হরানন্দজী বিছানায় উঠে বসলেন। তারপর আওড়াতে লাগলেন —

পহেলা পহরমে সব কৌই জাগে।
দোসরা পহর মে ভোগী॥
তিস্‌রা পহর মেঁ তস্কর জাগে।
চৌথা পহর মে যোগী॥

আমার দিকে ঘুরে বললেন — ওহে বেদজ্ঞ। ঘুমালে নাকি। আমরা সবাই শীতে কাঁপছি। তোমার কি গরম করছে। আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। বিদেশী ম্লেচ্ছগুলো ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্র থেকে 'শিশ্নদেব' বলে একটি শব্দ বের করে তার টেনেবুনে অর্থ (কদর্থ) করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। বেটারা আমাদের শাস্ত্রকে কি করে ছোট করা যায় তার চিন্তায় বিভোর। এ সম্বন্ধে তোমার কী মত? অবশেষে আমি উঠে বসলাম। বললাম — ঠাণ্ডায় যখন ঘুমাতেই পারছি না তবে শাস্ত্র আলোচনা করেই গা গরম করা যাক।

আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে লিঙ্গ বা চিহ্ন দ্বারা নানা দেবদেবীর উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে লিঙ্গোপসনা প্রথাটি যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লিঙ্গ অর্থে কোন প্রাণী বা বস্তু পুং বা স্ত্রী বা ক্লীব তাকে বুঝায়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য কোন দেব-দেবীর লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয়কে বোঝায় না। ভারতীয়রা লিঙ্গ পূজা বলতে শিব-শক্তির উপাসানকে বুঝলেও, লিঙ্গোপসনা বাস্তবিক পক্ষে অতি ব্যাপক। ভারতে চিহ্ন বা প্রতীকোপসনার নানারূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিদেশী পণ্ডিতদের দল শিবলিঙ্গ উপাসনার প্রকৃত উৎস সন্ধানে ব্রতী হন। স্টিভেনশন্ ও ল্যাসেন প্রচার করেন যে শিবলিঙ্গ উপাসনার কথা ঋগ্বেদে নিন্দা করা হয়েছে এবং এটি আর্য প্রথা নয়। এটি সম্পূর্ণ রূপে অনার্য্য দেবতা। যদিও আর্য্য ও আনার্য্যদের মধ্যে শিবলিঙ্গের পূজা বহুল প্রচলিত। তাঁদের এই মহৎ চেষ্টার ফলস্বরূপ তাঁরা ঋগ্বেদে হতে দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করলেন যাতে 'শিশ্নদেবাঃ' নামক একটি পদ বর্তমান এবং ঐ ঋক্ মন্ত্র দুটিতে শিশ্নদেবগণের নিন্দা করা হয়েছে। সাহেবরা 'শিশ্নদেবাঃ' অর্থ করলেন শিশ্নো দেবো যেষাং তে শিশ্নদেবাঃ অর্থাৎ শিশ্ন বা জননেন্দ্রিয় যাদের দেবতা, তারা শিশ্নদেব।

পরবর্তীকালে এই ধরণের ঘৃণ্য প্রচারাভিযানে যোগদান করলেন এ্যালিং, মুর, বেবার, হপ্‌কিন্‌স, কীম প্রভৃতি মহারথীগণ। এই ভেজাল কারবারীদের অপপ্রচার বন্ধ করতে বা প্রাচীন বেদাচার্য্যরা এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি করেছেন তা তুলে ধরতে একজন পণ্ডিতও এগিয়ে এলেন না। কারণ আমাদের দেশের বর্তমান পণ্ডিতবর্গ সর্বদাই বিলাতী সাহেবদের চাটুকারিতায় নিজেদেরে মগ্ন রাখতে ভালবাসেন। মূলতঃ যা ভ্রান্ত ও অসত্য তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যই ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত বা মন্ত্রবিশেষের উল্লেখ থাকলেও কোথাও 'শিশ্নদেবাঃ' পদটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না বা লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয় উপাসক সম্বন্ধে কোন নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হয় নি। আচার্য বৌধায়নও এই পদের কোন কদর্থব্যাঞ্জক অর্থ করেন নি।

শিশ্নদেব কথাটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদে আক্ষরিক অর্থই একমাত্র অর্থ নয়। এর লাক্ষণিক অর্থও আছে। কোথায় কোন্ অভিপ্রায়ে শব্দ প্রযুক্ত হয় তা দেখা আবশ্যক। নাহলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। শব্দের অর্থ নির্ণয়ে আগম সম্প্রদায় বা গুরুশিষ্য পরম্পরাকে একেবারেই অবজ্ঞা করা চলে না। আগম অনুসরণ করলে দেখা যাচ্ছে আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (৪/১৯) এর অর্থ করেছেন 'অব্রহ্মচর্য্যাঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যহীন শ্রেণীর ব্যক্তি। নিরুক্তের প্রাচীনতম ভাষ্যকার স্কন্দস্বামীও এর একই অর্থ করেছেন। দেব শব্দের সঙ্গে সমাস করা হলে দেখা যাবে যাস্ক বা স্কন্দস্বামীর অর্থটিই একমাত্র অর্থ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের মন্ত্র দুটি হল —

ন যাতব ইন্দ্র জুজুবুর্ণো ন বন্দনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।
ন শর্ধদর্যো বিষূণস্য জনোতর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্খবৃতং নঃ॥ (ঋ৭।২১।৫)

হে বলশালী ইন্দ্র, রাক্ষসগণ যেন আমাদের হিংসা না করেন, প্রজাকুল হতে আমরা যেন বিচ্ছিন্ন না হই। আপনি এইসব লিঙ্গগুহ্যপরায়ণ ব্যক্তিদের বধ করুন। আমরা নির্বিঘ্নে যেন যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারি।

স বাজং যাতাপদুষ্পদা সন্ত্ সর্যাতা পরি যদৎ সধ্যিন্।
অর্ণবা যচ্ছতদুরস্য বেদোঘ্নঞ্ছিশ্নদোন্ অভি বর্পসা ভূৎ॥ (ঋ১০।৯৯।৩)

হে ইন্দ্র, আপনি দাতা এবং সকল কিছু দান করতে উদ্যত। আপনি ছন্দোবদ্ধ গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হতে সম্পদ সংগ্রহ করুন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদের নিজ তেজে পর্যুদস্ত করুন।

এখানে লক্ষণীয় যে, মন্ত্র দুটিতেই ইন্দ্রিপরায়ণ রাক্ষস এবং শত্রুভাবাপন্ন লম্পট ও দুর্বৃত্তগণকে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে, কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন-উপাসকগণের কথাই নাই। অতএব লিঙ্গ পূজা ঋগ্বেদে নিন্দিত হয় নি। অন্য কোন সংহিতা, ব্রাহ্মণ,আরণ্যক, উপনিষদ, শ্রৌত, গৃহ্যসূত্রেও এই লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয় উপাসনার কথা নেই। সাহেবদের এই ব্যাখ্যা মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

জগৎকারণ ভগবান মহেশ্বর ও জগন্মাতা মহেশ্বরী, উভয়েই অনার্য্য দেবতা, এই ভ্রান্তমতের সমর্থনসূচক কোন বেদমন্ত্র উদ্ধারের অপচেষ্টার ফলেই ঋগ্বেদ হতে মন্ত্র দুটি বেছে নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে দুরূহ বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হলে বিগত কয়েক সহস্র বৎসরে কয়েক সহস্র বেদভাষ্যকারের জন্ম হত। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নয়।

যদি বর্তমান বেদ গবেষকগণ এই ধরণের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরব হতেন তবে এই ভ্রান্ত মতবাদটি সুপ্রণালীতে নানা গবেষণামূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে সর্বজনিন্ প্রচারলাভে সক্ষম হত না।

মূল-সংহিতা পাঠ না করে বা কেবলমাত্র বৈদেশিক অনুবাদ বা বৈদিক শব্দসূচীর উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এদেশে ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছেন আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাঁরা মূল-সংহিতা পাঠ করে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন তাঁরা বিদেশী পণ্ডিতদের ভয়ে নীরব থেকেছেন।

ভারতীয় লিঙ্গোপাসনা মোটেই লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয়ের উপাসনা নয়, বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা বিভিন্ন দেবতার উপাসনার প্রচুর দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে আছে। একমাত্র অধ্যাপক Macdonell তাঁর Vedic Mythology তে যাস্কের মতকে সমর্থন করেছেন।

এইরূপে বহু ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও তৈত্তিরীয় সংহিতার (৭.১.৮২) শ্রদ্ধাদেব শব্দের অর্থ আলোচনা করলে দেখা যাবে জার্মান ভাষায় লেখা সংস্কৃত কোষের (Bohtlingk und St. Roth : Sanskrit Worterbuch, St. Petersburg) প্রণেতারা এর অর্থ করেছেন 'দেবতাবিশ্বাসী' (gott-vertrauend) । এগ্‌গেলিঙ্গ সাহেব এর অর্থ করেছেন 'দেবভীরু'। জানিনা, এইরূপ অর্থ কিরূপে হয়। আমাদের দেশের ভাষ্যকাররা এই শব্দটির অর্থ করেছেন 'শ্রদ্ধালু' বা 'শ্রদ্ধাবান'। সায়নাচার্য এর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন — 'যথা দেবতায়াম আদরস্তথা শ্রদ্ধায়াম্ ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ দেবতার যেমন আদর তেমনি শ্রদ্ধার।

আমার কথা শেষ হতেই মহাদেবানন্দ বললেন — আমরা যুগ যুগ ধরে কচ-দেবযানীর করুণ উপাখ্যান শুনে আসছি। কত ঘটনার আবর্তন চেষ্টা করেছে এই কাহিনীকে ডুবিয়ে দিতে। কত সমালোচকের আবিল কাহিনী একে কলুষিত করতে চেয়েছে। কত ঐতিহাসিকের জড় সমালোচনা এই উপাখ্যানের কল্পনা কিশলয়গুলিকে একটি একটি করে ছিন্ন করেছে। তবুও এই উপাখ্যান যুগ যুগ ধরে আমাদের মধ্যে জেগে রয়েছে। মহাভারতকার বেদব্যাস এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই কাহিনীর বর্ণিত বিষয় দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত।

আদি যুগ থেকে চলে আসছে যে দেবাসুরের যুদ্ধ আসলে তা আমাদের হৃদয় মধ্যস্থ সত্ত্বভাব ও রজোভাবের সংগ্রাম। আমাদের মনের সাত্ত্বিক ভাবগুলি হল দেব, যার বৃদ্ধিতে জেগে ওঠে দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, ধৃতি, তপস্যা প্রভৃতি দেবতা এবং রজো ভাবগুলি হল অসুর, যার ফলে মনের মধ্যে বর্ধিত হয় পারুষ্য, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, অধৈর্য্য প্রভৃতি অসুর। আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নিত্য যে সত্ত্বভাব ও রাজসিক ভাবের যুদ্ধ চলেছে, তাতে সত্ত্ব বহুবার পরাজিত হলেও অমর সত্ত্বের মৃত্যু হয় না। তার হস্ত, পদ ভগ্ন হলেও বিকৃত দেহে সে দাসত্ব করে রাজসিক ভাবের কাছে।

এই দেবাসুর অর্থাৎ সত্ত্ব-রজোগুণের সংগ্রামে পারুষ্যের নিকট দয়া পরাজিত, হিংসার কাছে মাথা নোয়ায়

অহিংসা। ক্রোধ ক্ষমাকে তাড়িয়ে দেয়, ধৃতি বদ্ধ হয় অধৈর্য্যের দ্বারে, লোভের কাছ থেকে তপস্যা সরে যায়। রজঃ-এর কাছে সত্ত্ব পরাজিত হয়। সত্ত্বরূপের বিকৃতি ঘটে তবুও সত্ত্বের মৃত্যু নাই। সত্ত্ব হয়ে পড়ে অকর্মণ্য যা মৃত্যুর সামিল। এই মৃত্যুকে সঞ্জীবিত করতে পারে একমাত্র মন্ত্র। কিন্তু এই মন্ত্র আছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের অধিকারে। এই শুক্রাচার্য্যেই হল শরীরের শুক্রধাতু, যা শক্তিহীন দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলের সঞ্জীবন সাধন করে।

জীবের শরীরে শুক্রশোণিতাদি যে সপ্তরস আছে তার মধ্যে প্রধান শুক্র। শুক্র ধারণে জীবন এবং তার অভাবেই মৃত্যু। যেহেতু শুক্রের বৃদ্ধিতে আসুরিক শক্তির বৃদ্ধি. তাই শুক্রাচার্য্য অসুরের গুরু। দীর্ঘ রোগে কিংবা কুচিন্তায় শরীরের যে ক্ষয় হয় তা পূর্ণ করে শুক্র ধাতু। মৃত অর্থাৎ শক্তিহীন দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সঞ্জীবন সাধন করে বলেই শুক্র মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের গুরু। পুরাণ বর্ণিত দেবযানী শুক্রাচার্যের কন্যা। ভাবরাজ্যের দেবযানী জীবের রাজসিক প্রকৃতি। রজঃ প্রকৃতির জন্ম দেহের শুক্রধাতু হতে। শুক্রধাতু যতই বৃদ্ধি হয়, রজঃ প্রকৃতিও ততই সৃষ্টি করে চাঞ্চল্যের। তাই কচের সঙ্গে প্রথম মিলনকালে দেবযানীর হৃদয়ে কামনার চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। এই চাঞ্চল্যেই দেবযানী নামের সার্থকতা। দেবের যান অর্থাৎ সত্ত্বগুণের গমনের শকটকে দেবযান বলে। স্ত্রীলিঙ্গ 'ঈপ' প্রত্যয়যোগে দেবযানী পদের সিদ্ধি। প্রকৃতির সঙ্গে তুলনীয় বলে দেবযানী এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সত্ত্বগুণের গমনের শকট অর্থ সত্ত্বগুণের তিরোধান। শকট যেমন আরোহীগণকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়, রজোগুণও তেমনি সত্ত্বগুণকে বিদূরিত করে। যা ধাতুর অর্থ গমন। যা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয়যোগে যান শব্দের ব্যুৎপত্তি।

পুরাণের কচ আমাদের শরীরে বুদ্ধিতত্ত্ব। কচ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়যোগে কচ শব্দের সৃষ্টি। কচ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। যে দীপ্ত করে অর্থাৎ জগৎকে প্রকাশ করে তার নাম কচ। এই কচ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের অবস্থান মুখমণ্ডলে। মুখবৃত্তেই চক্ষু. কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়।

কচের জনক বৃহস্পতির ক্ষেত্র হল মস্তিষ্ক বা ব্রহ্মরন্ধ্র। বৃহস্পতি অর্থাৎ বৃহৎপতি জীবের ভূমা চৈতন্য বা বিবেক ছাড়া কিছুই নয়। এই বিবেক বা পরমাত্মাই আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের উপর আধিপত্য করেন। বুদ্ধি বা জৈব প্রমা উৎপন্ন হয় বিবেক বা ঈশ্বর চৈতন্য হতে। জৈব প্রমা যদি কচ হয় তবে তাঁর জনক হবেন ঈশ্বরচৈতন্য বা বৃহস্পতি। এই বুদ্ধি বা কচকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল ভূলোক বা কোষ মধ্যে অর্থাৎ শুক্রক্ষেত্রে। কোষ মধ্যেই জীবের শুক্রধাতু সঞ্চিত থাকে এবং এই কোষের নামান্তর ভূলোক। শুদ্ধ কল্পনায় জীবের মন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাকে ভোগমার্গে নামতে হয়। আমাদের দেহের ইন্দ্রিয় প্রণালীগুলিই ভোগমার্গ। এই ইন্দ্রিয় প্রণালী দিয়ে যে বিষয়-রস অন্তরে প্রবেশ করে, মন তা গ্রহণ করবার সময়ে তদাকারে পরিণত হয়। তখন জীব বা প্রমা চৈতন্য মনের সঙ্গে ত্যদাত্ম্য-বোধে চিন্তা করে যে আমি এই বিষয় রস ভোগ করছি। ভোগ সাত্ত্বিক হলেও জীবের সাত্ত্বিক ভাবগুলি রাজসিক ভাবসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রমশ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তখনই ইন্দ্রিয় বৈকল্য ও শরীরের শীর্ণতা ঘটে। এই বৈকল্য বা শীর্ণতা দূর করবার জন্য আবশ্যক হয় শুক্র বৃদ্ধি বা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র। এই সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাবগণের পরস্পর যুদ্ধের নাম দেবাসুরের যুদ্ধ। অন্তর্জগতের এই দেবাসুর সংগ্রামে বলবান রজোরূপী অসুরের নিকট যখন সত্ত্বরূপ দেবের পরাজয় হয় তখন কাম, ক্রোধের আবির্ভাব হয়। হৃদয় হতে চলে যায় বৈরাগ্য, ক্ষমা. শান্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব। তখন স্বেচ্ছাচারের ফলে জীব মনে ও দেহে শীর্ণ হয়ে পড়ে। সেই সময় বুদ্ধিরূপ কচ বিবেকরূপ বৃহস্পতির আদেশে শুক্রের কাছে যান মৃতসঞ্জীবনের সন্ধানে পথে পড়ে রজঃ প্রকৃতিরূপিনী দেবযানীর বৈচিত্র্যময় মনোরম উদ্যান। রাজসিক প্রকৃতি আছেন স্বহস্ত রোপিত কামনা কুসুমলতা মধ্যে মণিপুর চক্রে। মণিপুর চক্রের সংশয় তুহিন কামনার কোমল লতাগুলিকে বর্ধিত হতে দিচ্ছে না। তাই বুদ্ধিরূপ কচকে যেতে হল রাজসিকী দেবযানীর কুসুমোদ্যানে। বুদ্ধির জ্যোতি সংশয় তুহিন অপসারিত করল। দেবযানীর কামনা কুসুমগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হল, তার সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হল। কিন্তু ভোগ করবে কে ?

কারণ বুদ্ধিরূপ কচ জড় শুক্রের মন্ত্র লাভ করে রজঃপ্রকৃতি শরীর পুষ্ট হলে মনের সাত্ত্বিক ভাবগুলিও পূর্ণতা লাভ করে এই আশাতেই বুদ্ধিরূপ কচ জড়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি চিরকাল জড়ের সংসর্গে

থাকতে চায় না। তাই কচ ফিরে গেলেন বৃহস্পতির কাছে। দেবযানীর উদ্দেশ্যে সফল হল না। তাঁর কুসুমের ভোক্তা মিলেও তাঁকে বঞ্চিত করলেন। তাই দেবযানীর বিরহ-বিধুর নয়নের অশ্রু শুকালো না, প্রবলবেগে নিম্নক্ষেত্রে নেমে তরঙ্গিনীর সৃষ্টি করল। এই তরঙ্গের আঘাতে বুদ্ধিরূপী কচের বক্ষস্থিত সযত্ন রক্ষিত মৃতসঞ্জীবনী সুধা পড়ে গেল। কিন্তু কচের হৃদয় তখন অমৃতময় হয়ে গেছে। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল সত্ত্বরূপী দেবগণের। রজঃ প্রকৃতিরূপা দেবযানীর নয়নসার যে তরঙ্গিণীর সৃষ্টি করেছিল, সে তরঙ্গিণী করুণ উচ্ছ্বাসে নিম্নক্ষেত্রের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। হর নর্মদে হর।

সমস্ত মন্দির চাঁপা ফুলের মিষ্টি সৌরভে ম ম করছে। আমরা প্রাণভরে শ্বাস টানতে লাগলাম। প্রেমানন্দজী অর্বুদেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে আমাদের কাছে ডাকলেন। দেখলাম লিঙ্গ গাত্র থেকে একরকম রসক্ষরণ হচ্ছে। তারই মিষ্টি গন্ধে সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ আমোদিত। বাইরে তাকিয়ে দেখি নীরন্ধ্র অন্ধকারের গভীরতা ততটা না থাকলেও শীত যেন আরও জাঁকিয়ে বসেছে। ভোর হয়ে আসছে। পূব আকাশ পরিষ্কার হলেও চাঁদকে পশ্চিম আকাশে দেখা যাচ্ছে। সূর্যোদয় হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। যে দুর্ভেদ্য মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের খরদীপ্তিও প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে মন্দিরে বসে প্রভাত সূর্যের প্রসন্ন কিরণ দেখতে পাবো তা আশা করা বৃথা। কিন্তু রাত্রির অবসানে প্রকৃতিতে যে স্বচ্ছ প্রকাশ দেখা যায়, সেই স্বচ্ছতা স্পষ্টতর হচ্ছে।

নর্মদা দর্শনের জন্য তৎপর হয়ে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বড় বড় গাছ ও পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নর্মদাকে স্পর্শ করলাম। পশ্চিমগামিনী নর্মদার বিস্তৃতি ক্রমশই ক্ষীণতর হচ্ছে। সারারাত্রি ঘুম না হলেও শিবের গাত্র-সৌরভ আমাদেরকে সতেজ রেখেছে। শরীরে কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই স্নান করে মহাদেবের পূজায় বসলাম। আরতি করতে করতে বললাম—

তবৈশ্চর্য্যং যত্নাদয়দুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল-মনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশি যৎ স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি॥

হে গিরিশ, (অনন্ত জ্যোতির্লিঙ্গরূপ) তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিস্বজর্ণ তোমার ঐশ্বর্যকে সযত্নে পরিমান করতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু উর্ধ ও অধোদিকে গমন করেও যদি অসমর্থ হলেও পরাভক্তিভরে স্তুতি করতে থাকলে (উক্ত ঐশ্বর্য) তাঁদের নিকট স্বয়ং প্রকটিত হয়েছিল ; সুতরাং তোমার সেবা ফলবতী হবে না কেন? গাঁঠরী কম্বল আগেই বেঁধে ফেলেছি। প্রাণভরে আমরা অর্বুদেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম অনির্দিষ্ট অজানা পথে। ভিজা শ্যাওলা পড়া পাথরের উপর আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর এক ভক্ত দম্পতির দেখা মিলল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম তারা চলেছে অর্বুদেশ্বরের পূজা করতে। আর সাত-আট মাইল রাস্তা অতিক্রম করলে তবেই মিলবে মধুপুরী ঘাট। এই পথে মানুষজনের দেখা না মিললেও এই পরিক্রমার পথ থেকে আধমাইল দূরে রয়েছে পাকা বাস রাস্তা। সেই পথেই মানুষজন বেশী চলাচল করে। স্থানে স্থানে ফেরীঘাট আছে। সাধারণ লোক নৌকায় নর্মদার এপার-ওপার যাতায়াত করে। তাঁরা প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন; আমরা কোনমতে তাদের নিরস্ত করে নর্মদা মায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে করতে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম মধুপুরী ঘাটের দিকে। কতকটা যাবার পর রোদের তাপে গা গরম হয়ে উঠেছে।

মুখে চোখে জল দেওয়ার জন্য নর্মদায় নামলাম। কমণ্ডলু জলে ভরে উঠে দাঁড়িয়েছি। দেখলাম একপাল নেকড়ে দৌড়ে গেল। মহাদেবানন্দ বললেন — আমাদের পথেই তো গেল। যদি ফিরে আসে তাহলে আমাদের মুখোমুখি হবে। এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এগোনো ভাল। হরানন্দজী বললেন — হ্যাঁ, ওরা তো মানুষের মত পথ ধরে চলে! আবারই একই পথে ফিরে আসবে! তবে তোমার ভয় নেই। তুমি আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে চল। যদি নেকড়ের দল ফিরে আসে তবে তোমার ও আমাদের কংকালসার চেহারা দেখে বুঝবে এদের চিবিয়ে কোন লাভ নাই।

— আপনার সব বিষয়ে রসিকতা ভাল লাগে না। উল্টে একথা যদি আমি বলতাম তাহলে তো চটে গিয়ে মুখে যা আসত তাই বলতেন।

যাইহোক আমরা তটে উঠে হাঁটতে লাগলাম। বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ দেখলাম একটি নাম না জানা পাহাড়ী নদী নর্মদায় এসে মিশেছে। এতদূর এলাম কোন মানুষজনও চেখে পড়ল না। জঙ্গল ক্রমেই ঘন হচ্ছে, আতঙ্কের মধ্যেই জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। কিছুটা যাবার পরই পেলাম একটি সাজানো কলা বাগান। কয়েকটি

গাছ থেকে কলা পেকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমরা প্রত্যেকেই বেশ কয়েকটা করে পাকা কলা কুড়িয়ে নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা স্থানে এসে পড়লাম যেখানে গাছের জটলা অপেক্ষাকৃত কম। দেখলাম মার্তণ্ডদেব আকাশে তির্যকভাবে কিরণ দিচ্ছে। অনুমান করলাম বেলা একটা বেজে গেছে। অন্যমনস্কভাবেই পথ চলছিলাম। হঠাৎ দেখি আমাদের পায়ের শব্দে ঝরা পাতার ভিতর থেকে দু'তিনটা সাপ দ্রুত অন্যদিকে সরে গেল। প্রত্যেকটি প্রায় তিন সাড়ে তিন ফুট করে লম্বা। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে চলার বেগ দ্রুত করলাম। আমরা ক্রমশঃ হেঁটে চলেছি নর্মদার উৎসের দিকে। চড়াই-উৎরাই করতে করতে প্রায় আধমাইল হাঁটার পর দুজন লোককে দেখতে পেলাম কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছে। প্রত্যেকের হাতে টাঙ্গি। ত্রিদিবানন্দ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন — মধুপুরী ঘাট কিধার থা?

তারা উত্তর দিল — মধুপুরী ঘাটমেঁ আপলোগ আগয়া। উসকো লোগ ঘোড়াঘাটভী কহতে হ্যায়। ইহাঁ পর শ্রীমার্কণ্ডেয় নে তপস্যা কী থী। ইহাঁ পর শ্রী মার্কণ্ডেশ্বরজীকা মন্দির ভী হ্যায়। আপলোগ উধার ঠার সাকতে হ্যায়। হম্‌লোগ গোঁড় হ্যায়।

তারাই আমাদের একটি শিবমন্দিরে নিয়ে এসে তুলল। কাঠের বোঝা মন্দির চত্বরে ফেলে দিয়ে তারা নিজেরাই নর্মদা থেকে জল এনে মন্দিরের ভিতর পরিষ্কার করল। মন্দিরের হোমকুণ্ডে নিজেদের নিয়ে আসা কাঠকুটো দিয়ে সাজিয়ে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করল। তারপর আমাদের হাতে আগুন জ্বালাবার জন্য একটি দিয়াশালাই বাক্স দিয়ে আমাদের দণ্ডবৎ জানাতে জানাতে ফিরে গেল নিজেদের গোঁড় পল্লীতে। মন্দিরের বাইরে এসে দেখলাম সূর্য পর্বতের আড়ালে চলে গেলেও তখনও দিনের আলো আছে। সূর্যাস্ত হয়নি।

অন্ধকার হয়ে আসতেই মন্দিরে ঢুকে মন্দিরের দরজা বন্ধ করলাম। হরানন্দজী মন্দিরের কুলঙ্গী থেকে একটি প্রদীপদানী বের করে শিবের সামনে জ্বাললেন। তারপর সবাই মিলে কাতর কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম —

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং,<br>
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম।<br>
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্ক বহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং।<br>
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্।।

শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে যে যার আসনে গিয়ে বসলাম। ত্রিদিবানন্দ আগুন জ্বাললেন। ঘর আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে। আজ সারাদিন খুব পরিশ্রম হয়েছে। আগের দিনের রাত্রি জাগরণের সঙ্গে পথের ক্লান্তি ছাড়াও আতঙ্ককর নেকড়ে ও সাপ যেভাবে চোখে পড়েছে তাতে আমরা সবাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল। আমার সাথীরা সব ঘুমে অচৈতন্য। প্রসাবের তাড়নায় দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। ঘরের আগুন নিভে এসেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও কুয়াশা চারিদিকে ছেয়ে আছে। শিশির পড়ছে টিপ্‌টিপ্ করে। আমি ঘরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। জ্যোতির্ময়ানন্দের ডাকে যখন উঠলাম তখন পাহাড়ের উপর সূর্যোদয় হচ্ছে, তার আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষীণভাবে পত্রান্তরাল ভেদ করে। যতীশ্বরানন্দ কমণ্ডলুর জল ঢেলে ঘরের আগুন নেভালেন।

আমরা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি পূর্বদিনের লোকদুটি মন্দিরের বাইরের চত্বরে বসে আছে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে শিবপূজার জন্য প্রচুর বুনোফুল। আমাদের মন্দিরের পিছনেই নর্মদা। দুই তটের পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছেন খরবেগে। আমরা এক হাঁটু জলে নেমে স্নান তর্পনাদি সেরে মার্কণ্ডেশ্বর শিবজীকে লোকদুটির আনা বুনোফুল দিয়ে পূজা করে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করতেই লোক দুটি হাতজোড় করে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলল — এই মন্দির থেকে দক্ষিণ দিশায় প্রায় তিন মাইল হেঁটে গেলে আমরা যোগিনী গুহা পাব। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যখন অশ্ব নর্মদার এই ঘাটে নেমে জল পান করেছিল তখন যোগিনী সেই অশ্বকে ঐ গুফায় লুকিয়ে রাখেন। পরে শত্রুঘ্ন তপস্যার দ্বারা যোগিনীকে তুষ্ট করলে যোগিনী সেই অশ্ব শত্রুঘ্নকে ফেরৎ দেন। পরিক্রমাবাসী সাধুরা এই মন্দিরে এসে অবস্থান করলে অবশ্যই ঐ গুহা দর্শন করতে যান। তাঁর কথা শুনে আমরাও যাব বলায় লোক দুটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

আমরা যাত্রা করলাম যোগিনী গুহার উদ্দেশ্যে। সামনে পথ দেখিয়ে চলেছে লোক দুটি। চারধারে বড় বড় গাছের মেলা আর সব গাছেরই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একরকমের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট

পাতা দিয়ে এমন নিবিড়ভাবে গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে যে গুঁড়িকেই দেখা যাচ্ছে না। আমি বললাম — এই গাছ আমি চিনি। উত্তরতটে দেখেছি। এইসব লতায় বর্ষাকালে একরকম ফুল ফোটে যার রঙ সোনালী। তার গন্ধে ঘুম পায়। রাস্তা এঁকেবেঁকে ঢালুর দিকে যাচ্ছে। ঢালু রাস্তায় আমাদের চলা ছন্দ বেড়ে গেছে। কথা বলতে বলতে বড় বড় গাছের জঙ্গল পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে যেখানে গাছপালা পাতলা, ঝোপঝাড়ও কম এমন স্থানে এসে পৌঁছিলাম। দেখলাম নর্মদার গা ঘেঁসে একটি পর্বতের বিশাল গুহা মুখ। সেই গুহামুখ ছাড়াও পাহাড় ভেদ করে ঝিরঝির করে জলের ধারা নর্মদায় এসে মিশেছে। সেই বিশাল গুহামুখে একটি সিন্দুর চর্চিত চোদ্দ পনের ফুট লোহার ত্রিশূল পোঁতা আছে। গুহামুখ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটি পথের উপরই উপুড় হল। আমার মন হল শিবভূমি নর্মদাতটের এই গুহামুখ মহানৃসিংহ বা মহাভৈরব। গুহামুখে প্রণাম করে একটি বিশাল সাজা গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলাম এই বিচিত্র গুহামুখের দিকে তাকিয়ে। সূর্যের ম্লান রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে সাতপুরা পর্বতের সর্বত্র। ঘন অরণ্যের সঙ্গে যেন কোলাকুলি করছে সেই রশ্মি। এক অবর্ণনীয় শোভা। শিবময়ী নর্মদা তীর্থের এই যোগিনী গুহার সামনে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হল আমি যেন আমাতে নেই। কানের মধ্যে অবিরাম বেজে চলেছে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়। আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্যোতির্ময়ানন্দ ও ত্রিদিবানন্দের চিৎকারে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার জ্ঞান ফিরল। আমি উঠে বসলাম। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হয়ে গেছে। ভূলুন্ঠিত হয়ে প্রণাম জানালাম যোগিনী গুহার উদ্দেশ্যে।

মন্দিরে যখন ফিরে এলাম তখন অনুমান করলাম দুটে বেজে গেছে। লোক দুটি আমাদের রেখে দৌড়ে ফিরে গেল নিজেদের মহল্লায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল আমাদের উপযোগী গরম গরম রুটি, অড়হর ডাল, গোটামটরের তরকারী এবং জলপাই-এর চাটনি নিয়ে। সঙ্গে প্রায় এক বালতি দুধ।

মহানন্দে আমাদের রাজকীয় ভোজন শুরু হল এবং শেষ হল। নর্মদায় যখন মুখ ধুয়ে এলাম তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখছি বিশাল সাতপুরা পর্বতমালা যেন ধাপে ধাপে উঠে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পর্বতের উচ্চতম শিখরাজি অস্তমান সূর্যের রঙীন আলোয় দেবলোকের কনক দেউলের মত বহুদূর নীলশূণ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই অপরূপ শোভা বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করতে করতে আমি গাইতে লাগলাম —

হে শিবসুন্দর, যুগযুগান্ত তোমার করুণাতলে
সসৃজন মরণ মরণ সৃজন আজো সেই পথে চলে।
তোমারে লভিতে করি জপ তপ ঢালি হৃদয়ের প্রীতি,
তবুও তো তুমি রয়েছে অধরা একি বল তব রীতি?
কিভাবে সাধিলে ধরা দিবে তুমি দেখিব নয়ন ভরে
কোন্ সে গোপন পন্থা বরিলে যাবো আলোকের দ্বারে?
বলে দাও সেই সিদ্ধমন্ত্র জীবনের রসায়ন,
বলে দাও সেই নিখিল প্রাণের অমৃত-উজ্জীবন।

ইতিমধ্যে লোক দুটি ফিরে এসে মন্দির ভাল করে পরিষ্কার করে ঘরে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে এসে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে জপে বসলাম।

ভোরেই ঘুম ভাঙল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা থাকলেও নর্মদায় স্নান করে উঠতেই গা গরম হয়ে উঠল। আমরা প্রত্যেকেই কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে মার্কণ্ডেশ্বরের মাথায় জল ঢাললাম। মহাদেবকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম আমাদের পরিচিত লোক দুটির সঙ্গে তাদের গ্রাম থেকে দশবারো জন দেহাতী নারী পুরুষ উপস্থিত হয়েছে আমাদের বিদায় জানাতে। হরানন্দজী প্রত্যেকের হাতে শিবের প্রসাদী ফুল দিয়ে অগ্নিকোণ ধরে হাঁটতে লাগলেন। তখন সাড়ে সাতটা বেজেছে। আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। নর্মদার কিনারা ঘেঁসে যে পথচিহ্ন গিয়েছে সেই এবড়ো খেবড়ো পার্বত্য পথে কখন দ্রুততালে কখনও বা ধীরগতিতে হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝেই পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা নেমে এসে নর্মদায় মিশেছে। নর্মদার কুলুকুলু ধ্বনিকে মনে হচ্ছে সঙ্গীতের মত। বন্যজন্তু অধ্যুষিত এই মহারণ্যেও আমাদের চারদিকে মোটা মোটা শাল, সালাই ছাড়া বেড়ী, লুদাস ও পানজন গাছ ঘিরে আছে। বেলা দু'টা,

আড়াইটা নাগাদ এক শিবমন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের চত্বরে গাঁঠরী ফেলে নর্মদার জলে শিবশঙ্করের পূজা সেরে মধুপুরী ঘাটের লোক দুটি প্রদত্ত বজরার রুটি ও খোয়া খেয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারলাম। এরপর এবড়ো খেবড়ো পথে হাঁটতে লাগলাম। এইভাবে মাইল তিনেক হাঁটার পর নর্মদাকে একটু দক্ষিণদিকে বেঁকে বইতে দেখলাম। এই পথে মাঝে মাঝেই পাহাড় থেকে ঝর্ণা নেমে আসায় পথ বেশ পিচ্ছিল। আরও আধঘন্টা ধরে জঙ্গলপথে হাঁটার পরে নর্মদা তীরেই এক জটাজুট ঋষির বিশাল প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত আছে দেখলাম। তিনি পায়ের উপর পা তুলে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। নর্মদা প্রবাহ তাঁর সম্মুখে প্রবাহিত। সেই ঋষির বেদীমূলে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে — মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার পটন। শিল্পীর গঠন পরিপাট্য এমনই যে কতশত বৎসর পূর্বে এই মূর্তি গড়া হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু এখনও মূর্তিটিকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। পাশেই একটি মন্দির। মন্দিরে শ্বেতশুভ্র নর্মদা-লিঙ্গ।

বিশ পঁচিশজন নারী পুরুষ ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখে তাঁরা সরে দাঁড়িয়ে নর্মদা লিঙ্গে জল ঢালার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা মন্দিরের বাইরে এসে সিঁড়িতে বসে বসে চারদিকের অপরূপ শোভা উপভোগ করছি, এমন সময় পুরোহিতজী সকলকে পূজা করিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন — নর্মদামায়ীকা চারো তরফ পাহাড় ঔর জঙ্গলমেঁ ঘেরা হুয়া হ্যায়। ওহি দূরীমেঁ যো নদী দেখাই দেতা হ্যায় ওহ হ্যায় সুরপান নদী। কালে কালে পত্থরো পর কই ধারামেঁ বহতী হ্যায়। নর্মদাকে সাথ সঙ্গত হুয়া 'ইহাঁসে মণ্ডলা — বিলাসপুর সড়ক দো মীল দূর হ্যায়। কার্তিকী পূর্ণিমাকো ইঁহা বড়া মেলা লাগতা হ্যায়। প্রাচীনকালমেঁ ইধার বাল্মীকি ঋষিকা তপোবন থা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম — ইস্ স্থানকা নাম হ্যায় সীতারপটন। সীতারপটনকা মতলব ক্যায় হ্যায়। ব্রাহ্মণজী বললেন — রামচন্দ্রজী যব সীতামায়ীকো বনবাসমেঁ ভেঝা থা তব সীতাজী নে ভী ইহাঁ পর বাল্মীকিজীকা পাস নিবাস কিয়া থা। উস্ সময় সীতা মায়ী নেঁ আপনে বালক কো ভোজন করায়া থা। যো পত্তলসে ভোজন করায়া থা অভী উহ পত্থর বন গয়া।

বলাবাহুল্য উত্তরতট পরিক্রমাকালে ধাবড়ী কুণ্ডের পথে সীতামায়ীর জঙ্গলে সীতার বনবাসিনী মূর্তি দেখে এসেছি। হয়ত সীতামাতা বনবাসকালে এখানেও এসেছিলেন। কিন্তু সীতার হাতের পড়া ভোজন পাত্র পাথররূপ ধারণ করেছে ব্রাহ্মণজীর বর্ণিত তীর্থকাহিনীর শেষ অংশ বিশ্বাস করতে পারলাম না। হয়ত সীতাজীর প্রতি ভক্তিবশতঃ এই গল্প যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আসলে বিন্ধ্য-সাতপুরা অঞ্চল লাভা গঠিত মালভূমি অঞ্চল। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় ১৩-১৪ কোটি বছর আগে লাভাস্রোত পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এই মালভূমি সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের উপরিভাগ টেবিলের মত এবং ক্রমশ ধাপে ধাপে নেমে গেছে বলে একে ডেকান ট্রাপও বলা হয়। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এই পাহাড়ের গায়ে গায়ে এমন সব চিহ্ন রয়েছে যাকে দেখলে মনে হবে কোনটি পাত্রের মত, কোনটি অশ্বক্ষুরের বা হাতীর পায়ের আকৃতিতে গড়া। এছাড়া নানা বিচিত্র চিহ্ন এই মালভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ব্যাসল্ট জাতীয় শিলায় এইরূপ চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। কালো কুচকুচে পাথরকে ঘি-মাখানো মসৃন বলে মনে হলেও তাতে পিচ্ছিলতা নাই।

কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণজী একটি টিনের চাল দেওয়া একটি ইষ্টক নির্মিত ঘরে এনে আমাদের তুললেন। ঘরের দু'দিকে দুটো জানালা খোলা রয়েছে। নর্মদার দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ব্রাহ্মণজী তা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের পাশেই বহু শুকনো কাঠ জড় করা রয়েছে তা দিয়ে ঘর গরম করবার ব্যবস্থা করে একটু দূরেই বাড়ী থেকে একটি বড় প্রদীপ নিয়ে এলেন ঘর আলো করার জন্য। তিনি আমাদের নম নারায়ণায় বলে চলে গেলেন।

সূর্যাস্ত হতেই আমরা নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। সবার সামনে চলেছেন হরানন্দজী। আজ দেখছি এই প্রেমিক সাধুর মনে খুশীর ছোঁয়া লেগেছে। তিনি গাইছেন —

অসীম আকাশ তোমারে মা জানায় নমস্কার।
বিপুলী ধরণী তোমার চরণে রাখিল প্রণতি তার।
দেবতা মানব সবার অর্ঘ্য সকলেরই বলিদান
মা, তোমার চরণে সঁপি যে একমন একপ্রাণ।।

আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিত্যকার জপে মন দিলাম। জপ সেরে সবাই শোবার তোড়জোড় করছি এমনসময় হরানন্দজী বললেন — বাল্মীকির মাতা প্রকৃতপক্ষে কে? আমি — এ বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। কথা প্রসঙ্গে ত্রিদিবানন্দ বললেন, ভাগবতের মতে বরুণের ঔরষে চর্বণীর গর্ভে বাল্মীকি ও ভৃগুর জন্ম। কারো কারো মতে চ্যবন ও শর্যাতি-কন্যা সুকন্যার গর্ভে মহামুনি বাল্মীকির জন্ম। মহাদেবানন্দ বললেন — বাল্মীকি চ্যবন মুনির পুত্র এই কথা মূল রামায়ণের কোথাও নেই। এটি কৃত্তিবাসের কবি-কল্পনা কিংবা তখনকার কিংবদন্তী হতে গৃহীত। মহাভারতের আদিপর্বে চ্যবন মুনির উল্লেখ থাকলেও সেই চ্যবন মুনির সঙ্গে বাল্মীকির কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি ভৃগু মুনির ঔরষে পুলোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পুত্রের নাম প্রমনিত। মূল রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ১০৯ স্বর্গে, ১৮ শ্লোকে বাল্মীকির আত্মপরিচয়ে আছে যে তিনি প্রচেতা ঋষির বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রচেতা হতে তিনি অধস্তন দশম পুরুষ।

আমি — বাল্মীকি চ্যবন মুনির পুত্র এ কথার প্রচারক কৃত্তিবাস এবং তাঁর ভাষা রামায়ণ। মানব সংহিতায় দেখা যায় মনুপুত্র দশজন প্রজাপতির মধ্যে সপ্তম প্রজাপতি প্রচেতা এবং নবম ভৃগু (১ম অঃ, ৩৫ শ্লোক)। প্রচেতা জ্যেষ্ঠ, ভৃগু কনিষ্ঠ। এঁরা দুজন পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। এই ভৃগুর পুত্র চ্যবন প্রচেতার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র।

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দেখা যায় রামের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে এই চ্যবন ও বাল্মীকি (১০৯ স্বর্গ, ৪র্থ শ্লোক) সশিষ্যে উপস্থিত ছিলেন। এই বাল্মীকি মুনিই রামকে সীতার পবিত্রতা এবং লব-কুশ যে সীতার গর্ভজাত রামেরই পুত্র তা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—'হে রঘুনন্দন রাম! আমি প্রচেতার দশম পুত্র কখনও মিথ্যা বলি না। আমি নিশ্চয় করে বলছি এই লব-কুশ তোমারই তনয়।

প্রচেতসোহহং দশমঃ পুতরো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ।।

দেখুন, এখানে বাল্মীকি নিজেই বলেছেন তিনি প্রচেতার দশম পুত্র। ভৃগু এই প্রচেতার কনিষ্ঠ সহোদর। সুতরাং ভৃগু, বাল্মীকির খুল্লতাত এবং ভৃগুর পুত্র চ্যবনমুনি বাল্মীকির খুল্লতাত ভ্রাতা। কৃত্তিবাস তাঁর ভাষা রামায়ণে বাল্মীকির এই খুল্লতাত ভ্রাতা চ্যবনকেই বাল্মীকির পিতা বলে অত্যন্ত গুরুতর ভুল করেছেন, যা আমরা যুগ যুগ ধরে অনুসরণ করে চলেছি। নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়।

ঘুম ভাঙল সকালেই। শঙ্খ-ঘন্টার ধ্বনিসহ মধুর রামনাম গানে চারিদিক মুখর হয়ে উঠেছে। দরজা খুলতেই মন্দির থেকে ব্রাহ্মণজী দৌড়ে এলেন। বললেন — আপলোগ পরিক্রমাকারী, আজ পহেলে পূজা আপলোগ করেঙ্গে। আপলোগ তৈয়ার হোকর মন্দিরমেঁ আইয়ে। পরিক্রমাবাসীয়োঁ কে লিয়ে ইধর পূজা কা এক রীত্ হ্যায়। আজ হম ঐ রীত্‌সে আপলোগোঁকো পূজা করায়েঙ্গে।

তাকিয়ে দেখি ইতিমধ্যে চার পাঁচজন ভক্ত পূজার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান, তর্পণ সেরে মন্দিরে আসতেই ব্রাহ্মণজী সকল ভক্তকে দেহাতী ভাষায় বাইরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে তিনি স্তবপাঠ করতে লাগলেন আর আমরা একে একে নর্মদা লিঙ্গের উপর কমণ্ডলুর জল ঢালতে লাগলাম।

ওঁ সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি।। ১
রূপস্রষ্টার আহুতি জানাই, রসিকের প্রেয় তিনি —
অবিচল যথা দোহনের কালে শান্ত পয়স্বিনী।
ওঁ উপঃ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। নোদা ইদ্রেবতো মদঃ।। ২
এস সুরেন্দ্র পরমানন্দ, আলোক-স্তম্ভ ভরি
এস কর পান রসের ভিয়ান নিমেষে ধন্য করি।
ওঁ অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং। মা নো অতি খ্য আ গহি।। ৩
এস নির্মল চেতনা আলোকে সকল কালিমা নাশি,
হে ধারণাতীত, এস পরিমিত আধারে, হৃদয়বাসী।

ওঁ পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং। যস্তে সখিভ্য আর বরম্॥ ৪

এস পার হও পন্থা সুধাও সুরেন্দ্র মহাশূরে,

আলোকলীলায় যে দিল বীলায়ে বরণীয় বস্তুরে।

ওঁ উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যশ্চিদারত। দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ॥ ৫

মোহ বন্ধনে বাঁধিয়াছে যারা উঠুক তাহারা গাহি

বজ্রী সহায় রণে হবে জয় জাগো বীর উৎসাহী।

ওঁ তৈ নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয় ঃ। স্যামেন্দ্রস্য শর্মাণি॥ ৬

বিশ্ব জুড়িয়া ঘোষণা করুক রণজয়ী কৃতবিদ্য

নন্দিত মোরা ইন্দ্র-শাসনে, সর্ব মানস সিদ্ধ।

ওঁ এমাশুমাশবে ভয় যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং। নতয়ন্মন্দ্রয়ত্সখং॥ ৭

যজ্ঞে জাত জ্ঞান সিদ্ধি বাসবেরে কর দান .

বাসবেরে কাছে সেই তে আসব শক্তি সে বেগবান।

ওঁ অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভভঃ। প্রাবো রাজেষু বাজিনম্॥ ৮

উগ্র এ রস করেছিলে পান হে শতকর্মী বীর

বৃত্রে নাশিয়া আনিলে বিশ্বে পূর্ণতা সিদ্ধির।

ওঁ তং ত্বা রাজেষু বাজিনং রাজয়ামঃ শতক্রতো। ধনা নামিন্দ্র সাতায়ে॥ ৯

সেই পূর্ণতা হে শতকর্মী দানিল মোদের ঋদ্ধি,

দেবেন্দ্র তব প্রসঙ্গে হউক সুখ সম্পদ বৃদ্ধি।

ওঁ যো রূয়োহবনির্মহান্তসুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত॥ ১০

পূর্ণ মহান যিনি লয়ে যান, পরপারে উত্তরি

রসিকজনের সুহৃৎ বাসব, তাঁরি জয়গান করি।

তাঁর স্তবপাঠ শেষ হতেই দেখলাম স্ফটিক লিঙ্গের উজ্জ্বলতা যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। পূজা শেষে আমরা মন্দিরের বাইরে এলাম। ব্রাহ্মণজী তাঁর দুই পুত্রকে উপস্থিত অন্য সকলকে পূজা করাবার অনুমতি দিয়ে আমাদের সঙ্গে কুঠিয়াতে এলেন। আগে থেকেই ব্রাহ্মণ-পুত্রকে দিয়ে আমাদের জন্য কুঠিয়াতে রেখে গেছেন দুধ ও প্রচুর ফলমূলাদি। ব্রাহ্মণজী প্রত্যেককে দুধ খেয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তারপর প্রত্যেকের ঝোলায় ফলমূলাদি ভরে দিলেন। নর্মদা তটের উপর সূর্যরশ্মির গতিপ্রকৃতি দেখে অনুমান করলাম বেলা নয়টা বেজে গেছে। আমরা যাত্রা শুরু করলাম। মিনিট দশেক হাঁটার পর ঘনঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। দিনের বেলাতেই ছায়াঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে অতিকষ্টে আকাশ দেখতে হচ্ছে। সব অন্ধকারে ঢাকা। সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দূরে একদল হরিণ দৌড়ে গেল। আরও কিছুটা হাঁটার পর দেখলাম কতকগুলো বুনো মহিষ শিং বাঁকিয়ে গর্জাতে গর্জাতে আমাদের থেকে কিছুটা দূর দিয়ে দৌড়ে গেল। আমার সঙ্গীরা সকলেই ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। আমি বললাম আজ যদি সোমানন্দজী আমাদের সঙ্গে থাকতেন তাহলে কোন একটা মহিষের শিং ধরে বলতেন — মরতে এ পথে যাচ্ছিস কেন ? ওরে আমার কালো বদন, কালো নয়ন মদনা। তুই যার বাহন সেই আঁত খালি যম বেটা তোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাঘের পেটে ঢুকাবে বলে!

সোমানন্দজীর নাম শুনেই সকলে তাঁর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে প্রণাম জানালাম। হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছে। ক্রমে পাহাড়ের উপর সংকীর্ণ পথরেখা ধরে উঠতে লাগলাম। উঠছি আর উঠছি। লতাপাতায় পা জড়িয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে পাথরে হোঁচট লেগে লেগে পা দুটো যেন ভেঙে পড়ছে। বন ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। জনমানবহীন নির্জন নিবিড় বনানী ক্রমোচ্চ পাহাড়ী পথের পাশে পাশে। এবার আমরা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে নিচের দিকে নামছি। আর নামছি। ক্রমে বন পাতলা হয়ে আসছে। পাহাড় বেয়ে কুল্‌কুল্‌ শব্দে একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। আরও আধ ঘন্টা হাঁটার পর সমতলে নেমে নর্মদার দর্শন পেলাম। নর্মদার কাকচক্ষু জলধারা বয়ে চলেছে। মনে স্বস্তি পেলাম। রেবা মায়ের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে এসে উপস্থিত হলাম রামনগর নামে এক গ্রামে। একে একে অতিক্রম করলাম বসনিয়া পকরিয়া

গ্রাম. গ্রামগুলির প্রান্তে রয়েছে রামজী, হনুমানজী ও শিবজীর মন্দির। মহারাণী দুর্গাবতীর একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদও নজরে এল। রাজপ্রাসাদের গায়ে একটি মার্বেল পাথরে ক্ষোদিত রয়েছে গোঁড় রাজাদের বাহান্ন পুরুষের নাম। রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হয়ে গেলেও রাজাদের বংশতালিকা জ্বলজ্বল করছে। আমাদের চলার পথের চারধারে বড় বড় পাহাড় মাথা তুলে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে নর্মদা তাঁর গতিপথও ঘন ঘন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। কিছুটা পশ্চিমগামিনী হয়ে হঠাৎ দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে আবার উত্তরবাহিনী হয়েছেন। কিছুটা পূর্ববাহিনী হয়েছেন। তারপর বয়ে চলেছেন সাগরের পথে। এই ঘোর জঙ্গলে পথের মাঝখানে একটা চটা ওঠা টিনের ফলকে দিক নির্দেশ রয়েছে — উপকৌশল। জঙ্গলের মধ্যেই পেলাম এক বিশাল মন্দির। হয়ত এটা শিবেরই মন্দির ছিল। কারণ একটা পাথরের ষাঁড় পড়ে আছে। কিন্তু শিবলিঙ্গ নেই। ঘরখানা খুব প্রশস্ত।

নর্মদাতে হাত পা ধুয়ে এসে আমরা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বিছানা পাতলাম। এই নর্মদার দক্ষিণতটে ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে হোমকুণ্ডে আগুন জ্বালালাম। কম্বল মুড়ি দিয়ে ভাবতে লাগলাম উপকৌশল নামটা শোনা। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অন্যান্য সঙ্গীদেরও জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরাও কোন উত্তর দিতে পারলেন না। হরানন্দজী বললেন — নর্মদার তটে শয়ে শয়ে গ্রাম পেরিয়ে এলাম। প্রত্যেক নামেরই কি তাৎপর্য্য আছে? এখনে আসা থেকেই দেখছি, তুমি নামটা শুনেই খুব চাপচাপ হয়ে গেছ। আজ সারাদিনের পরিশ্রমে গা হাত পা ব্যথা করছে, তার উপর শীতের জ্বালা। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তোমার যদি জেগে থাকতে ইচ্ছা করে তবে বসে বসে 'উপকৌশল' 'উপকৌশল' জপ কর। রাত্রি নেমে আসতেই এই নিবিড় অরণ্যের ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠল। বাইরে ছন্দে ছন্দে এক বিচিত্র তাল উঠছে। হঠাৎ সারাবন মুখর হয়ে উঠল এক বিচিত্র রহস্যময় শব্দে। এই শব্দের কারণ আমি অনুমান করতে পারলাম না। মনে হচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐকতান। এখন নিঃস্তব্ধ গহন গভীর রাত্রি, শ্বাসরোধকারী লোমহর্ষক পরিবেশ। ঘন জমাট থমথমে নিঃশব্দের মধ্যে প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। ঐভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এই শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। গায়ের আলখাল্লাটা ভিজে গেছে। উঠে বসলাম। মনে পড়ল সামবেদীয় ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে উপকৌশলের কথা আছে। কমল ঋষির পুত্র উপকৌশল। বেদবিদ্, ব্রহ্মবিদ গুরু সত্যকামের তিনি শিষ্য। ঋষি উপকৌশলকে শুভমুহূর্তে শাস্ত্রানুসারে সান্ধ্য-বন্দনা, বেদাধ্যয়ন ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান শিক্ষা দিলেন। এরূপে গুরুগৃহে দীর্ঘ বারো বৎসর অতিবাহিত হল। এই দীর্ঘ সময়ে বহু শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভ করে গৃহে ফিরে গেলেও গুরু কিন্তু তাঁকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন না। ঋষির হৃদয় ছিল আকাশের মত উদার, সমুদ্রের মত গভীর, পর্বতের ন্যায় উচ্চ। এরূপ গুরুর এই রকম উদাসীনতায় উপকৌশলের মন ও শরীর ভেঙে পড়ল, দিনে দিনে তিনি শীর্ণ থেকে শীর্ণকায় হয়ে গেলেন।

উপকৌশলের দুঃখে ব্যথিত হয়ে সত্যকাম-পত্নী আশ্রমমাতা সত্যকামকে তাঁর শিষ্যকে কৃপা করবার অনুরোধ জানালেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনুরোধেও ঋষি শিষ্যকে কৃপা করলেন না বা ব্রহ্মবিদ্যার কোন উপদেশও দিলেন না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শিষ্যের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্চালিত করে দেন, তাতে শিষ্যের ঘটে মহাচেতন সমুত্থান। পরন্তু গুরু তীর্থ পর্যটনে বের হলেন। যাবার সময় উপকৌশলকে দেখেও কোন আশীর্বাণীও উচ্চারণ করলেন না। পুত্রসম উপকৌশলের দুঃখে ঋষি-পত্নীর হৃদয় বিদীর্ণ হল।

কিছুদিন অতিবাহিত হল। একদিন যজ্ঞকালে অগ্নিদেবগণ অগ্নিসেবী উপকৌশলকে তার অন্তরের অভাব মেটানোর জন্য, তাঁকে অপার্থিব জগতের সন্ধান দিতে বললেন — বৎস! আমরা তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেব।

অগ্নিদেব উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন — তস্মৈ হোচুঃ — প্রাণো ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। অর্থাৎ প্রাণ ব্রহ্ম, 'ক' ব্রহ্ম, 'খ' ব্রহ্ম।

উপকৌশল বললেন — প্রাণ ব্রহ্ম বুঝলাম। কিন্তু 'ক' ব্রহ্ম, 'খ' ব্রহ্ম-এর তাৎপর্য্য বুঝলাম না। 'ক' বলতে যদি ইন্দ্রিয় সুখ বুঝায় তা তো ক্ষণস্থায়ী। কারণ ঐ সুখ কখনও পবিত্র, পূর্ণ ও স্থায়ী নয়। ক্ষণস্থায়ী সুখকে ব্রহ্ম বলা চলে না। পক্ষান্তরে 'খ' এর অর্থ সর্বব্যাপী আকাশ। অন্যান্য বস্তুর তুলনায় আকাশ স্থায়ী হলেও আকাশের চেতনা নাই। যা চেতনাহীন তা কখনই ব্রহ্ম হতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম সর্বদাই চেতনযুক্ত। সুতরাং 'ক' বা 'খ' কখনই অসীম নির্ভীক ও চেতন ব্রহ্ম হতে পারে না। স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম কং চ তু খং চ ন বিজানামীতি।

উপকৌশলের সন্দেহ দূর করবার জন্য অগ্নিদেবগণ বললেন — তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ। অর্থাৎ যা ক তাই খ অথবা যা খ তাই ক। তাঁরা ব্যাখা করলেন — ব্রহ্ম হৃদয়ে অবস্থিত, যা কার্য্যকারণ হতে পৃথক নয়। কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয়। কারণ ব্রহ্ম ও আনন্দ ব্রহ্মকে উপাসনা করতে হবে। প্রাণ আছে বলেই জীবন আছে। ব্রহ্মের সত্তাতেই প্রাণের সত্তা। সুতরাং প্রাণ ও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কারণ, প্রাণ কার্য্য।

ব্রহ্ম বিষয়ের ব্যাখ্যা দানের পর অগ্নিদেবগণের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি (যে অগ্নি গৃহস্থের ঘরে প্রজ্বলিত থাকে) উপকৌশলকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন — দেখ উপকৌশল! পৃথিবী, অগ্নি ও সূর্য হল আমার দেহ। সূর্যের অন্তরস্থিত দেবতাও আমি। পৃথিবী অন্ন, ভোগ্যবস্তু। সূর্য্য ও অগ্নি উভয়েই ভোক্তা। উদরাগ্নির বর্ধক এবং প্রকাশশীল বলে অভেদ। পৃথিবী ও অন্ন পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধযুক্ত।

যিনি ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মার সঙ্গে অভিন্নভাবে উপাসনা করেন তিনি মৃত্যুর পর পাপমুক্ত অবস্থায় অগ্নিলোকে যাত্রা করেন। আমিই তাঁকে ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করি।

এরূপে দক্ষিণাগ্নি (যাতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়) পৃথকভাবে উপকৌশলকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে দীক্ষা দিতে গিয়ে বললেন — জল, দিক্ সকল, নক্ষত্ররাজী ও চন্দ্র — এই চারটি আকার হল আমার শরীর। চন্দ্রের অন্তরস্থিত আত্মা আমা হতে পৃথক নয়। অগ্নি ও চন্দ্র উভয়েই উজ্জ্বল এবং অন্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় অভিন্ন। নক্ষত্রপুঞ্জ চন্দ্রের অন্ন এবং জল বলে দক্ষিণাগ্নির অন্ন। সুতরাং নক্ষত্রপুঞ্জ ও জল উভয়েই অন্ন। ব্রহ্মই দক্ষিণাগ্নিরূপে অন্ন ও অন্নভোক্তা হন বলে যিনি ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন রূপে উপাসনা করেন, তিনি পাপমুক্ত অবস্থায় অগ্নিলোকে যাত্রা করেন। আমি তাঁকে ইহকালে ও পরকালে রক্ষা করি।

অতঃপর আবহনীয় অগ্নি (যাতে দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়) উপকৌশলকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন — এই যে প্রাণ, আকাশ, অন্তরিক্ষ ও বিদ্যুৎ দেখছ, এ সকল আমারই দেহ। বিদ্যুতের অন্তরস্থিত আত্মা এবং আমার অন্তর্গত আত্মা একই। আবহনীয় অগ্নি ও বিদ্যুৎ উভয়েই উজ্জ্বল, সুতরাং অভিন্ন। এই অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয় তা রূপান্তরিত হয়ে অন্তরিক্ষ্যলোক ও আকাশের ভোজ্য হয়। ব্রহ্মই আবহনীয় অগ্নিরূপে অন্ন ও অন্নভোক্তা হন। এরূপ জেনে যিনি ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে উপাসনা করেন তাঁকে আমি সর্বসময় সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করি।

উপদেশ শুনবার পর উপকৌশলের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠায় তার হৃদয় শান্ত হল। জ্ঞানের দীপ্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল ভাস্বর হয়ে উঠল। তাঁর এতদিনের তপস্যা সার্থক হল। ইতিমধ্যে গুরু সত্যকাম তীর্থ ভ্রমণ শেষে আশ্রমে ফিরে এলেও উপকৌশলের জ্ঞানোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। কারণ তিনি জানেন একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভেই এরকম মুখচ্ছবি সম্ভব। তিনি উপকৌশলকে কিভাবে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হলেন তা জানাতে চাইলেন। অমৃত-আলোকের পথচারী উপকৌশল গুরুর নিকট কিছুই গোপন করলেন না। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন — অগ্নিদেবগণ আমাকে ব্রহ্মের লোক সম্বন্ধে উপদেশ দান করেছেন বটে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় আপনার কাছে শিক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন।

এরপর সত্যকাম ব্রাহ্ম মুহূর্তে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় বলতে গিয়ে বললেন — পরব্রহ্মকে জানলে উপাসক পদ্মপত্রে জল যেরূপ অবস্থা লাভ করে সেরূপ নির্লিপ্ত হন। পাপ তাকে কখনও স্পর্শ করে না। তিনি কখনও সংসারে আসক্ত হন না।

য এষোঽক্ষিনি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ ব্রহ্মেতি।

চক্ষুর অন্তরস্থ যে চৈতন্য, যাঁকে চক্ষুর চক্ষু বলা হয়, যাঁকে কখনও চক্ষু দেখতে পায় না এবং যাঁর শক্তি চক্ষু জানতেও পারে না তিনিই হলেন আত্মা। তিনি অমর, নির্ভীক, তিনিই ব্রহ্ম। চেতনা শ্চেতনানাং। যেমন জল বা ঘি চোখের মধ্যে লেগে গেলে বরং গড়িয়ে পড়ে। চোখের কোন ক্ষতি করে না তেমনি কর্ম বা কর্মফল আত্মার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করতে পারে না। আত্মা মহিমময়। আত্মা আনন্দঘন। এই আনন্দঘন ব্রহ্মকে ধ্যান করতে হবে। ঋষিরা তাকে সংযতবান বলে। কারণ এতং হি সর্বাণি বামন্যভিসংযন্তি যেহেতু সমস্ত বাম অর্থাৎ শোভন সুন্দর যা কিছু সবই একে আশ্রয় করে থাকে। সমস্ত কর্ম ও কর্মফল তাঁরই আশ্রিত। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। ইনিই সমস্ত পুণ্যকর্মের ফল দান করেন। আবার আপনার ধর্মরূপে বহনও করেন। তাই ইনি ভামনী

কারণ ইনিই সূর্যমণ্ডলাদি সমস্ত লোকে দীক্ষালাভ করেন। কেননা যেহেতু এই অক্ষিপুরুষই সমস্ত লোকে সূর্য চন্দ্র ও অগ্নি প্রকৃতিরূপে দীপ্তি পেয়ে থাকেন। ভাম সমূহ প্রাপ্ত করান বলে ভামনী সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যিনি তাঁকে ভামনী ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তিনি মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্বেষু লোকেষু ভাতি। সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ।

তাঁর দেহের সৎকার হোক বা না হোক তাতে কিছু ক্ষতি নাই। তাঁর সূক্ষ্ম আত্মা প্রথমে দেহাভিমানী দেবতা, পরে একে একে দিনাভিমানী দেবতা, সংবৎসরাভিমানী দেবতা, সূর্যাভিমানী দেবতা লাভ করে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। এই যে পথ তাই হল সগুণ ব্রহ্ম, দেবযান মার্গ যেখানে দেবতারা অধিষ্ঠিত থাকেন। এটিই ব্রহ্মালোকের শ্রেষ্ঠ পথ। এই পথ উপাসককে জন্ম মৃত্যু হতে রক্ষা করে। এই লোকে গতি হলে উপাসককে আর এই কল্পে বা কল্পান্তে জন্ম নিতে হবে না। যাঁরা তপস্যা প্রভাবে ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন তাঁরা শুভকর্মহেতু এবং ভগবানের কৃপায় জন্ম-মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা পান। তাঁদের আর পুনরাবর্তন হয় না। কিন্তু যাঁরা উপাসনারহিত কর্মাদি যথা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি এবং কঠোর তপস্যাদি দ্বারা ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন তাঁরা ঐ সমস্ত কর্মের ফল শেষ হলে কল্পান্তে আবার জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু উপকৌশল মহর্ষি সত্যকামের কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা — ঔপনিষদিক যুগের ঋষিদের অতি প্রিয় গুহ্যতত্ত্ব লাভ করে কৃতকৃত্য হলেন। উপকৌশল নর্মদা তটের এই পুণ্যভূমিতেই বসে যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন সেই গ্রামের নাম উপকৌশল।

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। গোটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে বসেই উপকৌশলের উপাখ্যান ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গেল। ঘুম না হওয়ায় শরীরে কোন অবসাদ নাই। কিন্তু আমার সঙ্গীরা তখনও ঘুমে অচেতন।

আমার যেন আনন্দ-ঘন সুষুপ্তি হতে জাগরণ ঘটল। গাছপালায় তখনও অন্ধকার আছে। আস্তে আস্তে সকলেই জেগে উঠলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সমস্ত জগৎ জুড়ে অসংখ্য শঙ্খ, ঘন্টা, ঝাঁঝ, ঢোল, খোল, করতাল, শিঙা বাঁশী বেজে চলেছে।

হরানন্দজী বললেন — আপনার মুখে চোখে খুব স্ফুর্তির ভাব দেখছি। উপকৌশলের তত্ত্ব কি উদ্ধার করতে পারলেন?

— উপকৌশল হলেন মহর্ষি সত্যকামের শিষ্য। তিনি এখানকার জঙ্গলেরই কোন স্থানে বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করেছিলেন। যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ পাই তবে তা আপনাদের বই খুলে দেখিয়ে দেব। আমি তাঁদের কাছে উপকৌশলের উপাখ্যান ব্যাখ্যা করলাম।

আমরা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নর্মদার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মন প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে আছে। নর্মদায় স্নান করে সেই তৃপ্তি আরও শতগুণে বেড়ে গেল। মন্দিরে ফিরে এসে দেখলাম একটি পুঁটলিতে আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে ফল রাখা হয়েছে। ফলে কামড় দিয়ে দেখলাম ফলটি যেমন মিষ্টি, তেমনি উপাদেয়। হরানন্দজী বললেন — মা তাঁর অভুক্ত সন্তানদের জন্য ফল রেখে গেছেন। তিনি নতজানু হয়ে যে স্থানে পুঁটলিটি রাখা ছিল সেই স্থানে ঘন ঘন মাথা ঠুকতে ঠুকতে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নার বিরাম নাই। আমরাও তাঁকে ঘিরে বসে নীরবে কাঁদতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে হরানন্দজী ধাতস্থ হলেন। আমরা জঙ্গলের পথে পা বাড়ালাম। হাঁটতে লাগলাম। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও সূর্যরশ্মি তির্যগভাবে এসে পড়েছে। ঘন বন। মোটা মোটা লতার শিকড় গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে উঠেছে। লতাগুলির পথরেখা ধরে রাস্তার দুদিকে ঘন ঘন লাঠি আছড়াতে আছড়াতে ক্রমশঃ উৎরাই-এর পথে উঠতে লাগলাম। শাল, সাজা, সালাই গাছই বেশী। প্রত্যেক গাছ এতই মোটা, যে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। আরও কতকটা চড়াই-এর পথে উঠলাম। পাহাড়ের একটা স্তর অতিক্রম করে আর একটা স্তরে উঠে এলাম। এভাবে দু'ঘন্টা হাঁটার পর বন পাতলা হয়ে এল। প্রায় কতকটা সমতল পথে এসে পৌঁচেছি। অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পার্বত্যপথের সুস্পষ্ট রেখাও চোখে পড়ল। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। পার্বত্যপথের পথচিহ্ন ধরে হাঁটতে লাগলাম। নাম না জানা কোন বুনোফুলের সুবাস ভেসে আসছে। যাইহোক এতক্ষণে এক দেহাতী বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলল — আপলোগ্ সক্কা গ্রামমেঁ পৌঁছ গিয়া হ্যায়। এ মুড়িয়া

মহারণ হ্যায়। সে আমাদের সঙ্গেই হাঁটতে লাগল। প্রায় ২০০ ফুট হেঁটে যেতেই দেখতে পেলাম, একটি ছোট জলধারা পাহাড় ভেদ করে পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের চলার পথের উপর দিয়ে নিজের দিকে ছুটে চলেছে। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে সেই জলসিক্ত পিচ্ছিল পথের উপর দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটবার উপক্রম করতেই লোকটি আমাদের বাধা দিয়ে বলল — এ হ্যায় খরমের নদী। আপলোক সামনেসে উতরঙ্গে ত আপলোগকা শরীর টুটি ফাটা হো জায়েগা। এ চড়াই উৎরানে কা তরিক্কা হ্যায়।

এই বলে সে আমাদের চড়াই-এর দিকে মুখ করে উৎরাই-এর দিকে পিছন করে নামবার পদ্ধতি দেখাল। তারই প্রদর্শিত পন্থায় আমরা লাঠি ঠুকে ঠুকে পিছন পানে হাঁটতে লাগলাম। লোকটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নামছে এবং মাঝে মাঝে রব তুলছে — সামালকে, সামালকে, হর নর্মদে। প্রায় শতখানিক ফুট নিচে নামবার পর দেখলাম সে মূল জলধারার সঙ্গে আরও দুটো সুতোর মত সরু জলধারা দুদিক থেকে এসে মিশেছে। এই ত্রিধারা একত্রিত হয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। জলের প্রবাহও প্রশস্ত হয়ে নিচের দিকে চলেছে। এইভাবে আরও বিশ ফুট নামার পর লোকটি আমাদের এক একজনের হাত ধরে প্রবহমান জলধারার পাশে পাশে একটি সংকীর্ণ যে রাস্তা তৈরী হয়েছে তার উপর নিয়ে এল। আমরা সেই পথ দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটতে লাগলাম। পথে পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পাথর পড়ে থাকলেও আমাদের হাঁটতে কোন অসুবিধা হল না। উপরদিকে তাকিয়ে গাছপালার শোভা দেখার বা অরণ্যের বিচিত্র পাখীদের কলরব শোনার আমাদের অবসর নাই। সন্তর্পণে পা ফেলার দিকে মন দেওয়া ছাড়া আমাদের কোন কাজ নেই। আমরা সন্ধ্যের মুখে মুখে নেমে এলাম পাহাড়ের তলদেশে। চর্তুদিকে শৈলমালা বেষ্টিত একটি সুন্দর সমতলভুমি। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

পিছন ফিরে দেখি পাহাড়ের দুর্মদ প্রাচীরের কিনার থেকে এই নদী ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে এক কুণ্ডে। লোকটির কথায় দেবকুণ্ড। দেবকুণ্ডের পাশে কয়েকটি গুফা রয়েছে। মনে হয় কোন তপস্বী প্রাচীনকালে এখানে বসে মা নর্মদার তপস্যা করেছিলেন। খরমের নদীর গর্জনে কানে তালা লাগার মত অবস্থা। এই পাহাড়ী নদীর ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের শীকরকণায় ভিজতে ভিজতে লোকটি আমাদের এক গুহার মুখে এনে উপস্থিত করল। সর্বাগ্রে লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। তার দেখাদেখি আমরাও ঢুকলাম। এরপর লোকটি বাইরে থেকে কিছু শুকনো ডালপালা এনে গুহার ভিতর আগুন জ্বালাল।

আগুনের আলোয় দেখলাম গুহাটি ১৫ ফুট × ১৫ ফুট। গুহাটি বেশ পরিষ্কার। আমরা হাত পা ছড়িয়ে বসলাম। লোকটি 'হর নর্মদে' জানিয়ে বিদায় নেবার সময় বলে গেল — ইধর জংলী জানোয়ারকো কোঈ ডর নেহি। কাল সুবে ম্যায় ফির আউঙ্গা।

হরানন্দজী বললেন — আজ মা নর্মদা আমাদের আবার রক্ষা করলেন। এই লোকটি না থাকলে হয়ত আমরা মৃত্যুমুখে পড়তাম, না হলে সঙ্গীহারা হতাম। দেখুন, গুহার মধ্যে থেকে জলপ্রপাতের গর্জন শোনাই যাচ্ছে না।

আজ সারাদিনের পথশ্রম ছাড়াও শেষ পর্বের প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক চাপে আমরা খুবই ক্লান্ত।

যে যার বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। সকলেই ঘুমে অচৈতন্য হয়ে গেলাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি গুহার মুখ জুড়ে যে অগ্নিকুণ্ড ছিল তা নিবে গেছে। গুহার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাহিরে এলাম। অনুমান করলাম, সাতটা বেজে গেছে। দেখি, লোকটি গুহার বাইরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে করে এনেছে একটি দশ বারো বছরের ফুটফুটে বালককে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই বলল — পোতা, পোতা। আমি ছেলেটির গাল টিপে দিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সারলাম।

নর্মদা দর্শনের জন্য হরানন্দজী ও আমি ব্যাগ্র হয়ে পড়ায় সঙ্গী লোকটি খরমের নদীর ধারে ধারে প্রায় দু'মাইল দূরের মালপুরে গ্রামে নিয়ে এলেন যেখানে খরমের নদীর সঙ্গে নর্মদার সঙ্গম হয়েছে। নর্মদার দুধারেই উত্তরতট ও দক্ষিণতটের বিন্ধ্য-সাতপুরার পর্বতশ্রেণী এগিয়ে এসেছে। চট্টানের উপর দিয়ে নর্মদার জল অত্যন্ত খরবেগে বয়ে চলেছে। আমরা এক হাঁটু জলে নেমে সাবধানে স্নান-পর্ব শেষ করলাম। দুই নদীর সঙ্গম হওয়ায় জলের প্রচণ্ড তোড়ে নর্মদায় দাঁড়ানোই দুষ্কর। আমাদের স্নান-পর্ব শেষ হতে দেখি লোকটি একটি ছোট্ট টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের ইঙ্গিতে টিলার উপর ডাকল। টিলায় উঠে দেখি নর্মদা 'Z' আকৃতিতে বয়ে চলেছেন। কখনও উত্তরে, কখনও পশ্চিমে আর কখনও দক্ষিণে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রলয়দাসজী প্রমুখ

মহর্ষি তণ্ডিকৃত হাজার আট শ্লোকরাজি পাঠ করতে লাগলাম। হরানন্দজী, প্রেমানন্দসহ অন্যান্যরা সেখানে জপে বসলেন। পাঠ ও জপ শেষে আমরা যখন 'দেবকুণ্ডের' গুহায় ফিরে এলাম তখন মার্তণ্ডদেব মধ্যগগণে বিরাজিত। লোকটির ছেলে ও বৌমা আমাদের ভোজনের জন্য নিয়ে এসেছে রুটি, গুড় ও ছাগলের দুধ। আমরা ভোজনে বসলাম। ভোজন-পর্ব শেষ হলে লোকটি জানাল — প্রায় এক বৎসর আগে একদল পরিক্রমাকারী এই গুহায় এসে অবস্থান করেছিল। তখন তার পোতার বয়স সাত বৎসর। সেই পরিক্রমাদলের নেতা তার পোতাকে দেখে বলে গেছেন — এ লেড়কা দো সাল জীবিত্ রহেগা। সেই থেকে আমরা খুব মনমরা অবস্থায় আছি। আপলোগ্ কৃপা করকে বাতায়গা এহী লড়কা জিন্দা রহেগা ঔর নহী। ছেলেটির ফুটফুটে মুখ ও অশ্রুসিক্ত মায়ের দিকে তাকিয়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম। হরানন্দজী বললেন — আমরা সাধু, ভাগ্য গণনা করতে জানি না। প্রার্থনা করি, মহাকালের কৃপায় তোমার পোতা দীর্ঘ জীবন লাভ করুক। হঠাৎ বাচ্চাটার মা আমার পা দুটো চেপে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। আমি আমার ঝোলা হাতড়িয়ে একটি পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ এবং শ্বেতবর্ণের নর্মদা লিঙ্গ দিয়ে বললাম — ছেলেটিকে এই রুদ্রাক্ষটি পরিয়ে দেবে। এটি একবৎসর পরে সশব্দে ফেটে যাবে। আর এই শিবলিঙ্গটি ছোট ছেলেটি ও তার মা সারাজীবন পূজা করবে। অন্য কেউ এই লিঙ্গের পূজা করবে না। এই সর্ব বিঘ্ন বিনাশন লিঙ্গের নিত্যপূজার পর বাচ্চাকে স্নানজল খাওয়াতে থাক। আশা করি তোমার পুত্রের সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। সে দীর্ঘজীবী হবে। এক বছর পর এই ফাটা রুদ্রাক্ষটি নিয়ে গিয়ে অমরকন্টকে কোটি তীর্থে বিসর্জন দেবে। মা নর্মদা তোমার পুত্রকে রক্ষা করবেন। তারা অত্যন্ত ভক্তিভরে দরবিগলিত অশ্রুসিক্ত অবস্থায় এই দৈব জিনিষগুলি বুকে চেপে নিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেল সক্কা গ্রামে। প্রার্থনা করলাম — হে শরণাগতের পালক এই মায়ীকে পুত্রহারা কোর না। তোমার স্নেহ দৃষ্টিতে বাচ্চাটির যেন পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। শিবলিঙ্গটি দিয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম। মা নর্মদার কাছে আমরা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। গায়ে অল্প অল্প রোদ এসে লাগছে। ভালই লাগছে। জলপ্রপাতের গর্জন একটানা বেজে চলেছে। নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হরানন্দজী বললেন — পরিক্রমাকারী বা সন্ন্যাসীদের দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হলেও এই জঙ্গলখণ্ডে পরিক্রমারত অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কখনও কখনও নিতান্ত শারীরিক কারণে আমরা এ নিয়ম ভাঙতে বাধ্য হয়েছি বটে, তাতে মা তাঁর সন্তানদের উপর বিরূপ হয়েছেন বলে মনে হয় না! আজ আমরা বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। গায়ে পায়ে ব্যথা থাকলেও এখন আমরা নানা সৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করে কাটাব। তোমরাই কোন প্রশ্নের অবতারণা কর। আমরা তাই আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

মিনিট খানিক চিন্তা করে জ্যোতির্ময়ানন্দ বললেন — মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে গীতা যে স্থানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে গীতাকে কী প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না?

আমি — আপনার এরকম উদ্ভট চিন্তার কারণ কী? চিন্তা করে দেখুন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরু-পাণ্ডব উভয়ই যুদ্ধ সজ্জায় উপস্থিত। ভীষ্ম কৌরব পক্ষের প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই অবস্থায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রথমে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কৌরব এবং পাণ্ডবরা কে কি করলেন, এই বর্ণনা থেকেই গীতার উৎপত্তি। গীতাকে কেন্দ্র করেই মহাভারতের উপাখ্যানগুলি গড়ে উঠেছে।

জ্যোতির্ময়ানন্দ — আচ্ছা আপনিই বিচার করে বলুন। দু'পক্ষের মহা মহা রথীরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয়। উভয় পক্ষই সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায়। এমত অবস্থায় পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সহায় কৃষ্ণ গীতা উচ্চারণ করতে লাগলেন আর প্রধান যোদ্ধা অর্জুন তা শুনতে লাগলেন। মহাযুদ্ধারম্ভে অধ্যাত্ম আলোচনা চলতে লাগল। এমন ঘটনা কী সম্ভব? বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই নিরুদ্বেগ অবস্থায় না থাকলে গীতার মত বিষয়ের আলোচনা হতেই পারে না। — দুর্যোধন বাল্যকাল হতেই বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বিষপ্রয়োগ, জলে নিক্ষেপ এবং অগ্নিদগ্ধ করে পাণ্ডবদের মারতে চেয়েছেন সেই খল দুর্যোধন কী কৃষ্ণ ও অর্জুনের অন্যমনস্কতার সুযোগে তাদের উপর আঘাত করতে উদ্যত হবেন না? এই সময়ে তাঁদের মত ধুরন্ধর ব্যক্তিদের অন্যমনস্ক হওয়া সাজে!

— ভীষ্ম পর্বের প্রথম অধ্যায় পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় — যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ শপথ নিয়ে নিয়ম তৈরী করেছিলেন —

যথাযোগং যথাকামং যথোৎসাহং যথাবলম্।

সমাভাষ্য প্রহর্ত্তব্যাং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে।।

অর্থাৎ যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে বিপক্ষের উপর প্রহার করব এবং কোন পক্ষ বিধ্বস্ত বা বিহ্বল হয়ে পড়লে তার উপর প্রহার করব না।

এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে অসাধারণ ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ ভীষ্ম ছিলেন কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি। তাঁর আদেশ ব্যতীত কারো কিছু করবার ছিল না। এছাড়া সবাই জানতেন অসাধারণ কূটনৈতিক বুদ্ধিধারী কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অর্জুনকে সংহার করা সহজ কার্য নয়।

বেদব্যাস শুধু মহাভারতের মত মহাকাব্যেরই রচয়িতা ছিলেন তা নয় তিনি অধ্যাত্ম-বিষয়ের আকর গ্রন্থ বেদান্ত-দর্শন এবং পাতঞ্জল ভাষ্যেরও রচয়িতা। এই মহাভারতেরই উদ্যোগপর্বে 'সনৎসুজাত' নামে অধ্যাত্মশাস্ত্র যদি বেদব্যাস রচনা করতে পারেন তবে তাঁর মত জ্ঞান গীতার মত অধ্যাত্ম্য-শাস্ত্রের রচনা করেছিলেন — এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

জ্যোতির্ময়ানন্দ — হিন্দু রাষ্ট্র জাভায় যে মহাভারত প্রচলিত আছে তাতে গীতা নেই। ভগবদ্‌গীতা যদি মহাভারতের মৌলিক অংশ হত তবে জাভা দ্বীপের মহাভারতে তা অবশ্যই থাকত।

আমি — জাভাদ্বীপবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল, পরে পরে বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। যখন তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল তখন সেই মহাভারতে গীতা অবশ্যই ছিল। তারপর তারা যখন বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম নিল তখন ঈশ্বরের মূর্তিবোধক অংশগুলি বাদ দিয়ে দিল। কেননা, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মতে ঈশ্বরের মূর্তি নাই। অথচ গীতায় কৃষ্ণ আপনাকে বহু স্থানে ঈশ্বর বলে প্রকাশ করেছেন এবং পার্থকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে তার প্রমাণ করেছেন। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের এই গীতার অংশ বিড়ম্বনার সৃষ্টি করবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। আর এক কথা, জাভাদ্বীপের ভাষায় সে দেশের মহাভারতের যখন অনুবাদ হয়েছিল তখন তাদের মহাভারতে বহু উপাখ্যান নূতনভাবে প্রবেশ করেছে, অনেক বিষয় বাদ গিয়েছে এবং বহু স্থান অত্যন্ত বিকৃত হয়েছে। এ অবস্থায় সে দেশের মহাভারতে গীতা না থাকলেও তাতে গীতার মৌলিকত্বা কোনমতেই ক্ষুণ্ণ হবে না।

আমি গীতার মৌলিকতা নিয়ে আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই।

প্রথমতঃ মহাভারতের পূর্বাপর স্থানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অন্যান্য স্থানে যেরূপ ভাষা, যেমন ভাব, যে প্রকার ছন্দ এবং যে জাতীয় আর্ষ প্রয়োগ আছে, গীতাতেও সে সমস্ত আছে। এ সমস্ত বিষয়ে আপনার শঙ্কা দূর না হলেও জানবেন, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতীর মত যোগী নিঃশঙ্কচিত্তে এই গীতার টীকা ও ভাষ্য রচনা করেছেন। এগুলি রচনা করতে গিয়ে তাঁদের হৃদয়ে গীতার মৌলিকতা নিয়ে কোন সংশয় জাগে নি। এতেই প্রমাণিত হয় তাঁদের সময়ে মহাভারতে গীতা ছিল।

এছাড়া গীতায় যে সকল আধ্যাত্মিক শ্লোক আছে, তার অনেক শ্লোকই মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

জ্যোতির্ময়ানন্দ — আমার মনে হয় মহাভারত রচনার পর কোন বিদ্বান ব্যক্তি মহাভারতের সেই সকল স্থান হতে আধ্যাত্মিক শ্লোকগুলি একত্র করে, মধ্যে মধ্যে নিজেও কিছু লিখে 'ভগবদ্‌গীতা' নাম দিয়ে ভীষ্মপর্বে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন।

মহাদেবানন্দ — তা হতেই পারে না। কারণ, মহাভারতের আদি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম — পর্বসংগ্রহ অধ্যায়। তাতে মহর্ষি বেদব্যাস সূচীপত্রের আকারে কোন পর্বে কতগুলি অধ্যায়, কতগুলি শ্লোক কতগুলি উপপর্ব এবং কি কি বৃত্তান্ত আছে, তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাতে দেখতে পাই পর্বোক্তং ভগবদ্‌গীতা পর্ব ভীষ্মবধস্ততঃ। এরপর আবার লেখা আছে —

কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।

মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ॥

তারপর আবার অশ্বমেধিকপর্বে অনুগীতা প্রকরণে স্বয়ং কৃষ্ণই অর্জুনের নিকট বলেছেন —

পূর্বমপেতে দেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে।

ময়া তবঁ মহাবাহো! তস্মাদত্র মনঃ কুরু॥

বেদব্যাস আদিপর্বে গীতাকে উপপর্ব বলেছেন এবং তার বৃত্তান্ত লিখেছেন। এ অবস্থায় গীতাকে কোন রূপেই মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

আমাদের আলোচনা-পর্বের মধ্যে লোকটি কখন ফিরে এসে কিছু শুকনো ডালপালা গুহামুখে জড় করে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা করে রেখেছে তা আমরা খেয়াল করিনি। হরানন্দজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখতে পেলাম সে আমাদের থেকে একটু দূরে বসে বসে আমাদের কথা শুনছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি প্রপাতের শীকরকণায় রামধনুর সৃষ্টি করেছে।

দেবকুণ্ডের জলে হাত পা ধুয়ে কমণ্ডলুর জলে নর্মদা দর্শন করে লোকটিকে বিদায় জানিয়ে আমরা গুহায় প্রবেশ করলাম। যে যার আসনে বসে জপে মন দিলাম। ভোর হতে না হতেই সকলে উঠে পড়লাম। হরানন্দজী বললেন — আজ আমরা ডিণ্ডোরী পর্যন্ত হাঁটব। দুর্গম জঙ্গলে কোথায় স্নানের সুযোগ পাব কিনা জানি না। কাজেই প্রাতঃকৃত্য সেরে এই দেবকুণ্ডের জলেই স্নানপর্ব সেরে নেব। তাঁর ইচ্ছানুসারেই দেবকুণ্ডের জলে স্নান সেরে এসে যে যার ঝোল-কম্বল গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় লোকটি তার পুরো পরিবার সমেত এসে উপস্থিত হল। তাদের সঙ্গে আরও দশ-বারোজন গ্রাম্য লোক সাধুদর্শনে এসেছে। লোকটির বৌমা আমাদের সকলের জন্য নিয়ে এসেছে রুটি, সব্জী, চাটনি এবং দুধ। সে আমাদের প্রত্যেকের ঝোলায় গাছের পাতা দিয়ে মুড়ে আহার্য ভরে দিল। তারপর মাটির পাত্রে দুধ ভরে আমাদের খেয়ে নেওয়ার জন্য বিনতী জানাল। মায়ীর অনুরোধে দুগ্ধ পানের পর মায়ীর চোখ দুটি আনন্দে চিক্‌চিক্ করে উঠল। ভাবলাম প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জননী শক্তি। সন্তানকে খাওয়াতেই যেন তাঁদের আনন্দ। কেউ তৃপ্তি সহকারে খেলেই তাঁদের মুখে চোখে ফুটে উঠে পরম পুরুষার্থতা লাভের আভাষ।

লোকটি জানাল — ডিণ্ডোরী তক রাস্তা কঁকরোলী পথরোলী হ্যায়। এই ভূমি পরিক্রমাবাসী কো বহুত কঠিনাইসে পার করনা পড়তা হ্যায়। হম্ আপলোগকা সাথ চলেঙ্গে।

আমি বললাম — নর্মদা মায়ী হামলোগকো খুদ সামহালেঙ্গে। তুমকো জানেকা জরুরৎ নেই। এই বলে তাদের বিদায় জানালাম। গ্রামবাসীদের তুমুল 'হর নর্মদে হর' ধ্বনির মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হল। প্রায় এক ঘন্টা ধরে পাহাড়ী চট্টানের উপর হেঁটে আমরা নর্মদার দর্শন পেলাম। ঝোলা গাঁঠরী ফেলে আমরা বুক ভরে নর্মদা জল পান করে, মুখে মাথায় নর্মদার জল দিয়ে তৃপ্তি বোধ করলাম। বেলা প্রায় নয়টা বাজতে যায় কিন্তু আমাদের চলার পথে আলো প্রবেশ না করলেও খরস্রোতা নর্মদার জলে আলো পড়ায় তা যেন হাসছে। এতক্ষণের মধ্যে মানুষ ত দূরস্থান, কোন বন্যজন্তুও চোখে পড়ল না। ক্রোমচ্চ পাহাড়ী পথের দু-ধারে শুধুই জঙ্গল। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গল পথে কর্কশ পার্বত্যপথে সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলেছি। আমরা খেয়ালই করিনি কখন আমরা নর্মদাতট ছেড়ে উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছি। জঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হতে লাগল। সূর্যদেব মাঝে মধ্যে দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় হরানন্দজী হোঁচট খেলেন। প্রেমানন্দ তাঁকে জাপটে ধরলেন। বাঁ পায়ে হোঁচট লাগলেও হরানন্দজী 'ও কিছুনা' বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। এইরকম ভাবে প্রায় দু'ঘন্টা হাঁটার পর জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। সূর্যদর্শন ঘটল। এতক্ষণ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আসায় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ইতিমধ্যে নর্মদাও তার সরল পশ্চিমাভিমুখী গতি ত্যাগ করে এঁকে বেঁকে পাহাড় ভেদ করে বয়ে চলেছেন উত্তরদিকে। আলোয় দেখলাম হরানন্দজীর পায়ের আঙুলগুলো বেশ ফুলে উঠেছে। উৎরাই পথে আমরা নর্মদার ধারে নেমে এলাম। আমাদের চলার পথের ধার দিয়ে ঝর্ণা বয়ে চলেছে। হঠাৎ মড় মড় করে ডাল ভাঙার আওয়াজ শুনে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি ভালুক মধু খাওয়ার জন্য গাছে উঠেছে। আর ভালুকের দেহের চাপে গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি তাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু তাতে ভালুকের কোন হেলদোল নেই। সে আবার গাছে ওঠার চেষ্টা করছে। ভালুক দেখেই সকলের মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। কারো মুখে সাড়া নেই। সবাই অস্ফুটস্বরে 'রেবা, রেবা' জপ করছেন। আমি মহাদেবানন্দের হাত ধরে টান দিয়ে বললাম — ভালুক অনেক উপরে আছে। এই খাড়া পাহাড় বেয়ে অত ভারী দেহ নিয়ে নেমে আসতে পারবে না। কোঈ ডর নেহি।

প্রেমানন্দ বললেন — ঠিকই বলেছেন। আমি এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমি ভালুকটির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। ও আমাদের দেখতে পায় নি। ওর লক্ষ্য ছিল মৌচাকের দিকে। আমরা ধীরে ধীরে হাঁটতে

লাগলাম। হরানন্দজীকে ধরে আছেন প্রেমানন্দ। অসাড় পা নিয়ে কোনমতে চলেছি। আর মাঝে মাঝে লক্ষ্য রেখেছি ভালুকটার দিকে। বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পর হঠাৎ হরানন্দজী দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন — ভালুক দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়লেও একমাত্র প্রেমানন্দই ভয় পাই নি। যদিও তার হাতের আঙ্গুলগুলি তখনও কাঁপছে। আরও দেখ, ও ওর ঝোলাটি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। তা দেখে সকলেই হো হো করে হাসতে লাগলাম। প্রেমানন্দ লজ্জা পেয়ে হরানন্দজীর কাছ থেকে ঝোলা নিয়ে নিজের কাঁধে রাখলেন। হরানন্দজীর পা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে! আমরাও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি।

সূর্যের আলো থাকায় এই রুক্ষ্ম পার্বত্য বনপথে কোনমতে চলতে পারছি। মাঝে মাঝে বড় বড় শালাই গাছ ছাড়া কোন ঝোপ-ঝাড় নেই। একটি শিবমন্দির দেখা গেল। আমাদের শারীরিক অবস্থা কাহিল। কোনমতে মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। বিরাট আকাশচুম্বী পাথরের মন্দির। মন্দির হতে কিছু দূরে নর্মদা বয়ে চলেছেন। নর্মদা স্পর্শ করে শিবের মাথায় জল ঢেলে মায়ীর দেওয়া আহার আমরা খুব পরিতৃপ্তি করে খেলাম। গা হাত - পায়ের ব্যথায় সবাই কাতরাচ্ছেন। মধ্যাহ্ন সূর্য একটু একটু করে পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু করেছে।

হরানন্দজীর তাড়ায় মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে পথে এসে দাঁড়ালাম। নর্মদাকে দর্শন করতে করতে পূর্বদিকে এগোতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঢাকা কঠিন পার্বত্যপথ। তবে এই পথে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না, কারণ সুঁচালো রুক্ষ্ম পাথরের পরিবর্তে এই পথের পাথর মসৃণ। প্রথমে উৎরাই-এর পথে উঠতে লাগলাম। কিছুটা উৎরাই-এর পর জঙ্গলাকীর্ণ সমতল অঞ্চল পেলাম। বড় বড় শাল, সেগুন গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথায় সূর্যের ম্লান আলো খেলে বেড়াচ্ছে। পায়ের ব্যথা ঝন্‌ঝন্ করছে, কট্‌কট্ করছে। তবু আমাদের থামলে চলবে না। এভাবে আরও ঘন্টাখানিক হাঁটার পর উৎরাই পথে নামতে শুরু করলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাহাড়ের ভিতর হতে জল পড়ার আওয়াজ পাচ্ছি। কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসায় তা দেখতে পাচ্ছি না। আমি বললাম — দক্ষিণতটের এই মুণ্ডমহারণ্যেও অসংখ্য পাহাড়ী নদী ঝরণার আকারে প্রবাহিত হয়ে নর্মদায় মিশেছে অথবা দু'তিনটি ঝরণা একত্রিত হয়ে নর্মদায় মিশেছে। আমাদের সে সব গবেষণার সময় কোথায়। আমাদের এখন প্রয়োজন রাত্রির আশ্রয়। দ্রুতবেগে উৎরাই পথে নামছি। পথ ভেজা ভেজা। আমরা নর্মদার ধারে এসে পৌঁছলাম। এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। মা নর্মদা রাত্রির আশ্রয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন কিনা? হঠাৎ চোখে পড়ল একটি বাঁধানো সিঁড়ি নর্মদার ঘাট থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে। উপরে আলো জ্বলছে। আমরা সেইপথে উঠতে লাগলাম। প্রায় তিরিশখানা সিঁড়ি পেরিয়ে একটি লোহার বন্ধ ফটকের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা 'হর নর্মদে' আওয়াজ দিতে এক ভীমকায় বন্দুকধারী সিপাই 'কৌন, কৌন' চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল। আমাদের পরিচয় দিতেই সে আমাদের দাঁড়াতে বলে কয়েক মিনিটের মধ্যে চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ভিতরে আহ্বান জানাল। বুঝলাম — এটি ডিণ্ডোরী থানা। থানার অন্যান্য সিপাইরা ও বড়বাবুও আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম — আমরা সারাদিন হেঁটে খুব ক্লান্ত। আমরা বিশ্রাম করতে চাই। এখানে কোন মন্দির, সদাব্রত বা ধর্মশালা থাকলে আমরা সেখানে রাত্রি কাটাতে চাই। থানার বড়বাবু বললেন — আপনারা এখানে সবই পাবেন। কিন্তু মন্দির ও ধর্মশালা এখান থেকে আরো দু' মাইল। আপনাদের শরীরের অবস্থা ভাল নয়। আপনারা বরং থানার পাশেই একটি পরিষ্কার ঘর আছে, সেখানেই বিশ্রাম করুন। কাল সকালে সেখানে চলে যাবেন।

বড়বাবুর কথায় সম্মতি জানাতেই তাঁরা আমাদের ২৫ ফুট ২০ ফুট একটা ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরে আলো জ্বলছে। বড়বাবুর হুকুমে একটি বড় কুঁদায় নর্মদার জল ভর্তি করা হল। ঘরের জানলা দিয়ে নর্মদা দেখা গেলেও সেদিকে দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসায় ত্রিদিবানন্দ তা বন্ধ করে দিলেন। বড়বাবুসহ থানার সিপাহীরা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

যে যার গাঁঠরী খুলে বিছানায় বসবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই ঘন ঘন হাই উঠতে লাগল। আমরা শুয়ে পড়লাম। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই দেখলাম হরানন্দজী অচৈতন্য অবস্থায় ভুল বকছেন। মাঝে মাঝেই চিৎকার করছেন — গুরুদেব রক্ষা কর। গুরুদেব রক্ষা কর। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখি গোটা গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আমি ও ত্রিদিবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গতকাল রাত্রে প্রথম যে সিপাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাকে

হরানন্দজীর কথা জানিয়ে একজন বৈদ্যজীর কথা বলতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল — আভি হম বৈদ্যজীকো বুলাতা হ্যায়।

মিনিট দশেকের মধ্যে বৈদ্যজী উপস্থিত হলেন। হরানন্দজীকে দেখে নিজের বাক্স খুলে ঔষধ তৈরী করে খাইয়ে দিলেন। বললেন — দু'তিন ঘন্টাকে অন্দর সাধুজী সুস্থ হো যাবেগা। তিনি আমাদের বাকী সকলকেও একটা করে পুরিয়া খেতে দিলেন। আমাদের দণ্ডবৎ জানাতে জানাতে বৈদ্যজী বিদায় নিলেন।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন করে ঘরের বাইরে রোদে বসে আছি। সিপাইজী গল্প করতে করতে বলছেন হামারা বড়বাবু বহুৎ সজ্জন হ্যায়। ইধার বহুৎ পরিক্রমাবাসী আতা হ্যায়। ইসলিয়ে উনোনেঁ সরকারী স্থানমেঁ সাধুয়োঁকে লিয়ে এ কোঠী বানায়া হ্যায়। ডিণ্ডৌরী এক বড়া গ্রাম হ্যায়। এহ মণ্ডলা জেলা কী ডিণ্ডৌরী-তহশীলকা মুখ্য স্থান। মণ্ডলাসে ইস স্থান তক্ পাক্কী সড়ক হ্যায়। ইহাঁ সে অমরকন্টক তক্ কচ্চী সড়ক গাই হ্যায়। এক সড়ক নর্মদাজীকে পার করতে হুয়ে জব্বলপুর তক গই হ্যায়। ইধার নর্মদা কিনারো চারঠো শিবালয় হ্যায়। ইঁহা ডাকবাংলো, পুলিশ থানা, ডাকঘর, সরকারী কার্যালয় ও হাঁসপাতাল ভী হ্যায়।

এমনসময় হরানন্দজীর গলার আওয়াজ শুনে সকলে ভিতরে গিয়ে দেখি, হরানন্দজী বিছানায় উঠে বসেছেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বর তখনও অল্প অল্প আছে। আমার কমণ্ডলু থেকে তাঁর মুখে একটু একটু করে জল দিলাম। তারপর শুইয়ে দিলাম।

মধ্যাহ্নকালে বড়বাবুর গৃহিনী আমাদের জন্য নিয়ে এলেন রোটী, সব্জী আর দুধ। তিনি নিজ হাতে আমাদের প্রত্যেককে খাবার পরিবেশনের পর হরানন্দজীকে ধরে ধরে বিছানায় বসিয়ে দিলেন। একটু একটু করে তাঁকে রোটী, সব্জী ও দুধ খাওয়ালেন। পরম যত্নে মুখ ধুইয়ে নর্মদার জল খাইয়ে আমাদের এঁটো পাতা বাইরে ফেলে ঘর ভাল করে পরিষ্কার করে ফিরে গেলেন। আমার মনে পড়ল উত্তরতটের শাহপুরার ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কথা, শ্বাশ্বতী মায়ের কথা। মায়েরা সর্ববস্থায় মা। মা নর্মদা যেন এসেছেন তাঁর আর্ত, অসহায় রোগ যন্ত্রণায় কাতর ছেলেদের দেখতে।

খাওয়ার পর শরীর ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি হরানন্দজীও বেশ চাঙ্গা হয়ে গেছেন। ঘরের সামনে পায়চারী করছেন। সঙ্গে রয়েছেন প্রেমানন্দ। আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন — জ্বর ছেড়ে গেছে। মাথাটা হালকা লাগছে, কিন্তু শরীরে কোন যন্ত্রনা নেই। তোমরা চাইলে কালই বেরিয়ে পড়তে পারি। আমরা সকলেই সমস্বরে তার প্রতিবাদ জানালাম। হরানন্দজী নর্মদা স্পর্শ করতে যেতে চাইলেন। পরিক্রমাকারী সাধুকে মায়ের দর্শন স্পর্শনে বাধা দেই কি ভাবে। ভাবছি কি বলব। গতকালের সিপাহজী আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন — কৌই হরজা নেই। ম্যায় আপকো নর্মদামেঁ লে চলুঙ্গা। এই বলেই সে হরানন্দজী কোলে তুলে নিলেন। হরানন্দজী সহ আমরা বাধা দেবার চেষ্টা করলেও সে কারো কথা শুনলো না। হরানন্দজী সিপাইজীর কোলে চড়ে নর্মদায় এলেন। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

নর্মদা স্পর্শের পর হরানন্দজী নর্মদার তটে বসে জপ সমাপ্ত করলেন এবং একইভাবে ফিরে এলেন আমাদের আবাস-স্থানে। সন্ধ্যাবেলায় বড়বাবু বৈদ্যজীকে নিয়ে এলেন। আমাদের সুস্থ দেখে তিনি আরও একটা করে পুরিয়া আমাদের খেতে দিলেন। সবাই ফিরে গেলে আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। আজ নর্মদার দিক থেকে বাতাস না আসায় জানলা খোলাই রয়েছে। নীরন্ধ্র অন্ধকারে নর্মদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হরানন্দজী বললেন — আজ তোমাদের এমন একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত শুনাবো যিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জগতের মূল বস্তু যদি মিথ্যা হয়, জগতের মূল কারণকে যদি অলীক মনে করা হয়, তবে জগতের মানুষগুলি মিথ্যা। অসন্ন এব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেদ। অর্থাৎ যে বলে ব্রহ্ম অলীক, সে নিজেও অলীক।

এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের নাম হল প্রেমানন্দ তীর্থ। এই প্রচ্ছন্ন যোগী সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন — মহাত্মা প্রেমানন্দ গুপ্তযোগী ছিলেন এবং গুপ্ত থাকতেই ভালবাসতেন। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল হরিদেব ভট্টাচার্য্য। ১৮৭১ খৃঃ বরিশালের বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা — বিখ্যাত

নৈয়ায়িক মহেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। মাতা — চন্দ্রমুখী দেবী। পূর্বজন্মের সংস্কার ও সুকৃতিবশে তিনি শিশুকাল হতেই ভগবানের নাম ভজন করতে ভালবাসতেন। হরিদেবের ৮/৯ বৎসর বয়সকালে তাঁর পিতা কাশীর যাওয়ার প্রাক্কালে হরিদেবকে ডেকে বলেন — 'আমি এক সন্ন্যাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তুমি সন্ন্যাসী হবে। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোর। আশ্রমের মোহান্ত হয়ে গাঁজা খেয়ে জীবন যাপন কোর না। নিজ সুখস্পৃহা ত্যাগ করে, জীবের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। ছোপানো কাপড়, বিভূতি, জটাই যেন তোমার সন্ন্যাসের উপকরণ না হয়। জ্ঞান প্রেম সর্বজীবে প্রীতি যেন তোমার সন্ন্যাসের লক্ষণ হয়।

কাশী পৌঁছানোর তিন দিন পরে তাঁর পিতার দেহান্ত হয়। ১৮৯৯ খৃঃ বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর পিতার আদেশে 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বম্ আনশুঃ' অর্থাৎ 'ত্যাগই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র পথ' শিরোধার্য করে সংসার ত্যাগ করলেন। বন-জঙ্গল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত এবং ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে কাশীতে এসে পৌঁছান। সাক্ষাৎ ঘটে গুরু রামানন্দ তীর্থের। ১৯০৪ খৃঃ সন্ন্যাস দানের পর গুরু রামানন্দ তাঁকে বললেন — বহু জন্মের সুকৃতিবশে যখন তুমি কামরূপ মঠ হতে সন্ন্যাস পেলে, তখন আমার একান্ত বিশ্বাস তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হবে না।

কায়েন মনসা বাচা ন কুর্যাৎ প্রাণিপীড়নং।
সর্বভূতময়ো হরিঃ সর্বং হরিময়ং জগৎ॥

আশা করব, তুমি কথাগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। বলাবাহুল্য, প্রেমানন্দজী এই গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রেমানন্দজী বলতেন — সংসারে বৈরাগ্য, গৃহস্থাশ্রমে বিতৃষ্ণা, কারো উপর বিরক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠার মোহ, আমার সন্ন্যাসের কারণ নয়। আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেছি শুধু পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য। এর অন্য কোন কারণ ছিল না।

একদিকে সৌজন্য এবং বিনয় যেমন প্রেমানন্দজীর স্বাভাবিক গুণ ছিল তেমনি অন্যদিকে তেজস্বিতায় তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একবার কাশীতে ভাস্করানন্দের আশ্রমে দেখেন ভাস্করানন্দের সাক্ষাৎ-প্রার্থী যে সমস্ত বিদেশী এসেছেন, ভাস্করানন্দের একজন প্রধান শিষ্য একটি খাতায় তাদের নামধাম টুকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। তিনি সর্বসমক্ষে ভাস্করানন্দকে বলেন — সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছেন। কেবল কি এই সার্টিফিকেটের খাতায় লোভ ত্যাগ করতে পারেন নি। ভাস্করানন্দ আসন ছেড়ে উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করেন।

একবার পণ্ডিতসমাজে আলোচনার পর স্বামীজী গোধূলিয়ার মোড় থেকে মঠে ফিরেছিলেন। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন হঠাৎ স্বামীজী এক মদ্যপায়ীর গলা জড়িয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে চলেছেন। কয়েকজন পণ্ডিত অভিমানভরে তাঁর এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলেন — মলত্যাগের জন্য পায়খানায় যেতে হয়। বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ভোগ করতে হয়, তথাপি না গেলে চলে না। তাই মদ্যপায়ীর সঙ্গ যতই অসহ্য হোক তাকে ত্যাগ করা চলে না। তার সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। পরে সেই মদ্যপায়ী মদ্যপান ত্যাগ করে। তিনি বলতেন — শৈবসাধনার মূল কথা হল — প্রণষ্ট শ্বাশতঃ ধর্মঃ সদাচারেণ মোহিতঃ অর্থাৎ কেন একটা বিশিষ্ট আচারকে অপরিহার্য বলে মনে করলেই ধর্ম নষ্ট হয়। ভগবানকে ভুলে লোক আচার পালনেই বিব্রত হয়ে পড়ে 'সোনা থুয়ে কেবল আঁচলে গিরাই সার।'

তাঁর প্রেমঘন আনন্দমূর্তি যখনই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। যিনিই তাঁর সামনে আসতেন তা তিনি সাধুমূর্তি হন বা গৃহী হোন তাকে চাঁছাছোলা ভাষায় সে কি উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এসেছেন তা তাকে মুখের উপর বলে দিতেন। এতে কেউ যেমন খুশী হতেন তেমনি কেউ হতেন রুষ্ট।

জালালুদ্দীন রুমি বলেছেন—

আজ একে কুজা দিহ্দ জহর ও আছল
হর একেরা দস্ত্-এ এক ইজ্জ্ ও জ্জল॥

পরমেশ্বরের মঙ্গলহস্ত একই কূজা হতে প্রত্যেকেই দেন — কাউকে দেন জহর (বিষ), কাউকে দেন আছল (মধু)।

একবার সূর্যাস্তকালে প্রেমানন্দজী দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে সূর্যাস্ত দেখছিলেন। হঠাৎ এক জার্মান পর্যটক তাঁর

সামনে এসে বললেন — আমি একজন জড়বাদী। আপনার কাছ হতে কোন ধর্মোপদেশ শুনতে আসিনি। শুনলাম, আপনি একজন ভাল সাধু। তাই আপনাকে দেখতে এসেছি। স্বামীজী বললেন — তোমাকে দর্শনেই পুণ্য। আমি ত পাঁচ সাত বৎসর ধরে খুব চেষ্টা করেও জড়বাদী হতে পারি নি। জড়ই সব। মন কিছু নয়। বড়জোর মনটা জড়-মস্তিষ্কের একটি সাময়িক তরঙ্গমাত্র। যেমন — বেহালার ঝঙ্কার তার তারের একটি সাময়িক কম্পন মাত্র। তার না থাকলে ঝঙ্কার থাকে না। দেহ না থাকলে মন থাকে না। মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। একেই বলে জড়বাদ। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। যেমন না থাকলে, জড় যে আছে তার উপলব্ধি কে করাবে? ব্রহ্মাণ্ডে অন্ততঃ একটা মন চাই যা জড়কে জড় বলে মনের করে। তাই মন না থাকলে জড় থাকে না। হয়ত বলবে, জড় থাকে, তার উপলব্ধি থাকে না। জড়ের সংজ্ঞা কী? পূর্বে বলা হত বিস্তৃতি অর্থাৎ একটা পরমাণু যে স্থান জুড়ে থাকে সে স্থানে অন্য একটা পরমাণু বসতে পারে না। অপরকে সে বাধা দেয় এবং তার অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য করে। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ পরমাণু ভেঙে ফেলেছেন তাঁদের মনে পরমাণুও শেষ তত্ত্ব নয়। প্রত্যেকটি পরমাণু ইলেকট্রন ও প্রোটিন দিয়ে তৈরী। অর্থাৎ একটি প্রোটনের চারদিকে কতকগুলি ইলেকট্রন নেচে বেড়াচ্ছে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের কোন ঘনত্ব নাই। এগুলি শক্তিপ্রবাহ মাত্র। একটি ধনাত্মক ও অপরটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ স্রোত। এগুলি বস্তু নয়, শক্তি মাত্র। বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু শক্তি ইন্দ্রিগ্রাহ্য নয়। নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যা। শক্তির স্বরূপ কি তা আমরা জানি না। তার ফলটাকে দেখি মাত্র। দাহিকা শক্তিকে আমরা দেখি না কেবল অনুমান করি। যেমন অগ্নিও দেখি, দগ্ধ তৃণকেও দেখি। এই অনুমানকে বোঝার জন্য দরকার মন। মন না থাকলে অনুমান থাকে না। সুতরাং মন না থাকলে শক্তি যে আছে, তাকে কে বলে দেবে?

Atom কে চূড়ান্ত পদার্থ বলে গণ্য না করে শক্তিকে চূড়ান্ত পদার্থ বলে গণ্য করলে মনকে অস্বীকার করার হেতু নেই। কারণ মনও চিন্তাশক্তি মাত্র — শক্তিরই একটি প্রকার ভেদ। একথাও বলা যেতে পারে শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব। তার এক কোটিতে আছে জড় আর অপর কোটিতে আছে চৈতন্য। দেহ ও মন এই দুই তত্ত্ব নিয়েই জগৎ গঠিত। কিন্তু এদের অতিরিক্ত, এদের মূল স্বরূপ আর একটি তত্ত্ব আছে। তা হল — তস্মিংস ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরং চ (শ্বেতাশ্বতর) অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব।

বহু চেষ্টা করেও এই শক্তিতত্ত্বকে আমি অস্বীকার করতে পারি নি। তাই জড়বাদী হতে পারি নি। পরন্তু এই অনন্ত শক্তিকে চিন্ময় বলে তৃপ্ত হতে পারি নি। তাকে মঙ্গলময় ও আনন্দময় বলেও মনে হয়। কারণ মঙ্গল ও আনন্দের উৎস খুঁজে পাই নি। তাই জড় থাকতে চেষ্টা করেও জড় থাকতে পারি না। জড় চিতির অন্তরাল হতে ব্রহ্ম সর্বদাই উঁকি দেন।

জার্মান পর্যটক এই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর কথায় বিচলিত হয়ে বলেন — 'Swamiji, where you have bought me ?' স্বামীজী বললেন — আমি আনি নি, তুমিই এসেছ? গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে যাবার আগে পর্যটককে বললেন — জানবে কানে ফুঁ দেওয়ার নাম দীক্ষা নয়। ভগবানের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসের নাম দীক্ষা। বাকী সব গুরু করেন। তা আপনা আপনি হয়। দুঃখময় সংসারকে আনন্দ-কাননে পরিণত করার জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কাশীর পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'সরস্বতীর বরপুত্র' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা পুরুষোত্তম তত্ত্ব, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য, নাদবিন্দুতত্ত্ব প্রভৃতি বিখ্যাত পুস্তক।

আর একটা ঘটনা উল্লেখ করে এই মহাপুরুষের জীবন কাহিনী শেষ করব। স্বামীজী কাশীতে থাকাকালে তত্ত্ববেত্তা মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজকে অনুরোধ করেছিলেন নিত্য মননের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব লিখে দিতে। মহানিশায় নিত্যক্রিয়া সমাপনের পর গোপীনাথ যোগাসনে বসেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলে যেতেন এবং সদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে স্বামীজীর এক শিষ্য তা খাতায় লিখে যেতেন। নর্মদা তীরে তীরে হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে এরূপ সিদ্ধ মহাত্মা অনেক আছেন কিন্তু লোকালয়ে এরূপ মহাযোগী সুদুর্লভ।

হরানন্দজী নীরব হলেন। আমরা প্রেমানন্দজীর পুণ্য জীবন-চরিত অনুধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে আমরা আমাদের ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে থানার লোকদের কাছে বিদায় নিলাম। আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে লাগলাম তাদের সঙ্গে। সামনে দেখা যাচ্ছে নর্মদা। হরানন্দজী হাতজোড় করে শুরু করলেন —

পুরাণম্ ওকঃ সখ্যম্ শিং বাম যুবোর্ নরা দ্রবিনং জহ্নাব্যাম্।<br>
পুনঃ কৃণ্বানা সখ্যা শিবানি মধ্বা মদেম সহ ন সুমানা (ঋ ৩।৫৮।৬)

হে শিব ও বিষ্ণু! তোমরা আমাদের চিরন্তন আশ্রয়স্থল। তোমরা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। নর্মদার তটভূমিই তোমাদের আবাস। তোমাদের কৃপাপূর্ণ (কৃপা) দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আমাদের রক্ষা করে চলেছে বলেই আমরা তোমার সঙ্গে একত্রে মধুপানের রস আস্বাদন করতে পারছি।

বড়বাবু ও থানার অন্যান্য সিপাইরা আমাদের সঙ্গে চললেন নর্মদার ধার পর্যন্ত্য। নর্মদার উৎস মুখের দিকে আমরা হাঁটতে লাগলাম। শীত আসছে। গাছপালা সব ধীরে ধীরে জীর্ণ রূপ ধারণ করছে। পাতা ঝরে পড়ছে। পথে কতকগুলি গরু মহিষ চরছিল। তাদেরকে কাটিয়ে হাঁটতে লাগলাম। দূর থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠল এক পল্লী-গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ী ঝরণা কোতরাল ঝিরঝির করে বয়ে এসে নর্মদায় মিশেছে। গ্রামের নাম বিছিয়া। নর্মদার কলতান কানে বাদ্যযন্ত্রের মধুর রস ঢালছে। নর্মদাকে চোখে চোখ রেখে এগিয়ে চললাম। চলার আনন্দ আমাদের পেয়ে বসেছে। কারণ যতই পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছি ততই আমরা অমরকন্টকের নিকটবর্তী হচ্ছি। পাহাড়ের গায়ে সেগুন গাছেরই আধিক্য বেশী। নর্মদার দু'পাড়েই চোখে পড়ছে বহু মন্দির। কোন কোনটি ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে পা দিলাম। মধ্যাহ্নকালই হয়নি। কিন্তু বনের মধ্যস্থলে যেন আবছা গোধূলি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে কখনও এঁকে কখনও বেঁকে, কখন মাথা সোজা রেখে, কখনও বা মাথা নুইয়ে ছোট বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। প্রায় দু'-আড়াই ঘন্টা ধরে এক নাগাড়ে হেঁটে চলেছি। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে এসে গাছপালার আড়ালে শিবমন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম।

মহাদেবানন্দ বললেন — সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন আমরা এখানে স্নান তর্পণ পূজা সেরে নেব। পরে এই সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে। সকলেই তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে ঝোলা গাঁঠরী ফেলে নর্মদায় নামলাম। নর্মদা বেশ খরস্রোতা। এমন সময় ত্রিদিবানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন — ঐ দেখুন। নর্মদায় নারকেল ভেসে যাচ্ছে। এই বলেই তিনি নর্মদায় নেমে সেটি সংগ্রহ করলেন। এরপর তাকিয়ে দেখি পরপর আরও ছটা নারকেল ভেসে আসছে। আমরা তা সংগ্রহ করে মার আশীর্বাদ স্মরণ করে ভোজনে রত হলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বাবা ও মা নর্মদাকে প্রণাম নিবেদন করে হাঁটতে শুরু করলাম। আবার ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। জঙ্গলপথে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

হরানন্দজী বললেন — পরিক্রমা সমাপ্তির যে আনন্দ মনকে চঞ্চল করে তুলছে তা পথের কষ্টে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম — ইহ মুণ্ডমহারণ কা ঝাড়ি হ্যায়। মা কী গোদ নেহী। সকলেরই পা ব্যাথায় টনটন করছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

মহাদেবানন্দ বললেন— এই ঘনঘোর জঙ্গলে রাত্রির আশ্রয় জুটবে কিনা জানি না। কেবল মা নর্মদাই আমাদের ভরসা। বহু দূর থেকে বাঘের ডাক ভেসে আসায় যতীশ্বরানন্দ বললেন — মনে হয় সামনে ব্যাঘ্র মহারাজ ফুল-মালা নিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এবার জঙ্গলের মধ্যে চড়াই শুরু হল। প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর আমরা এক বিস্তৃত মালভূমি অঞ্চলে উঠে এলাম। জঙ্গল নিচের দিকে নেমে গেছে। মাঝে মাঝে বন্য কুকর ও শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। দেখলাম মালভূমির ঠিক মাঝখানে একটা আটচালা রয়েছে। মনে হয় কোনকালে হয়ত কোন সাধু, বা পরিক্রমাকারীরা এটা তৈরী করেছিলেন বিশ্রামের জন্য।

হরানন্দজী বললেন — মায়ী আমাদের রাত্রিবাসের জন্য এটি তৈরী করে রেখেছেন। আজ আমরা এখানেই রাত্রিবাস করব। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেও সন্ধ্যা হতে তখনও বেশ দেরী আছে। আমরা আটচালায় গাঁঠরী ফেলে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

এমনসময় কানে এল কেউ গাইতে গাইতে আসছেন —

> ন ভূর্মিন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু, র্ন চাকাশমাস্তে নত তন্দ্রা ন নিদ্রা।
> ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো, ন যস্যাস্তি মূর্তিস্ত্রিমূর্তিং তমীড়ে॥

যিনি ভূমি নন, জল নন, অগ্নি নন, বায়ু নন, আকাশ নন; যাঁর নিদ্রা নাই, তন্দ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, গৃহ নাই, মূর্তি নাই সেই ত্রিমূর্তি ধারীকেই আমি পূজা করি।

কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মন্ত্রের অনুরণন বাতাসে ভেসেই বেড়াচ্ছে। আমরা একবার পূর্বদিকে, একবার পশ্চিমদিকে বা উত্তর ও দক্ষিণে দেখছি।

আবার উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল —

বশিষ্ঠ কুম্ভোদ্ভব গৌতমার্য্য মুনীন্দ্র-বর্য্যার্চিত শেখরায়।
চন্দ্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায় তস্মৈ বা কারায় নমঃ শিবায়॥

যাঁরা বশিষ্ঠ অগস্ত্য গৌতম প্রভৃতি আর্যবংশীয় মুনীন্দ্রদের দ্বারা ও দেবতাদের দ্বারা পূজিত হন; তাঁদের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি যাঁর তিনটি চক্ষু, সেই ব-কার রূপী শিবকে নমস্কার।

দেখলাম উত্তরদিকের ঢাল থেকে এক জটাজুট মহাত্মা হাতে কমণ্ডলুতে জল নিয়ে উঠে আসছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন — ক্যয়া আপলোগ আগয়ে। হমলোগ মিলকে ইস আকাশতলমেঁ রাত বিতায়েঙ্গে। ইধর কোঈ ডর নেহি। জোরসে বলিয়ে — হর নর্মদে হর। জয় মহাকালেশ্বর। আমরা তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি করলাম।

প্রেমানন্দ ফিস্‌ফিস্ করে বললেন — মহাত্মা যেন আমাদের আসার অপেক্ষাতেই এই স্থানে প্রতীক্ষা করছিলেন। একটা জিনিষ লক্ষ্য করুন গত কয়েকদিন ধরে ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল আজ তা বইছে না। মুক্ত আকাশের তলায় তেমন শীতও লাগছে না।

হঠাৎ সাধুজী প্রেমানন্দের দিকে ঘুরে বললেন — এ সবই সর্বানন্দকী তপস্যাকে প্রভাব সে। বুঝলাম — সাধুর নাম সর্বানন্দ। এঁর কাছে কোন কথা ফিসফিস করে অথবা মনে মনে চিন্তা করলেই ইনি তাঁর উত্তর দেবেন। সবাই চুপ করেই বসে আছি। চারিদিক সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল। আকাশে একটা একটা করে গ্রহ নক্ষত্র ফুটে উঠছে। সাধুজী বিজন কান্তারে মুক্ত আকাশতলে বসে নক্ষত্রমণ্ডলকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন — ঐ যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখছ, তার মধ্যে অন্যতম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ লোকপাবন ঋষি বশিষ্ঠ। আর ঐ বশিষ্ঠ নক্ষত্রের পাশে আরও একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে তার নাম অরুন্ধতী। লোকজননী। বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী কথার অর্থ হল — ন রুদ্ধতি অর্থাৎ যাঁর অপ্রতিহত গতি, যাঁকে রুদ্ধ করা যায় না। কর্দম প্রজাপতির ঔরষে দেবহুতির গর্ভে জন্ম। অতীব বিদূষী। পতিভক্তি ও পাতিব্রত্য ধর্মের আদর্শ। কঠোর তপশ্চর্চার ফলে আধ্যাত্মিক শক্তির চরমে উঠেছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে আছে — পতিসেবারূপ ধর্ম পথ যে নারী অনুসরণ করেন, তিনি অরুন্ধতীর মতই স্বর্গেও পূজিত হন। তাই তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থিত বশিষ্ঠ নক্ষত্রের পাশেই বিরাজিত। লোকপ্রবাদ আছে — যিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখতে পান না তার আয়ুকাল শেষ। এর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। তবে বিবাহের কুশণ্ডিকার সময়ে নববধূকে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে অবশ্যই অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দর্শন করানো উচিত।

গোভিল গৃহ্য সূত্রে আছে — বর বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করিয়ে বলবেন — অরুন্ধতীং পশ্য। তার উত্তরে বধূ বলবেন — পশ্যামি॥ ওঁ॥ অরুন্ধতী অসি রুদ্ধাহমস্মি।

আমি বললাম — বশিষ্ঠের পুণ্যজীবন অনুধ্যান করেই আমরা আজকের রাত্রিটা কাটাতে চাই। সাধুজী বললেন — ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশকালে বলেছিলেন — ধর্মো বিবর্দ্ধতি ভৃগোঃ পরিকীর্তনেন বীর্যং বিবর্দ্ধতি বশিষ্ঠ নমো নতেন॥ ভৃগুর নাম কীর্তনে করলে ধর্ম বৃদ্ধি হয়, বশিষ্ঠকে প্রণাম করলে তপোবল বৃদ্ধি হয়।

তিনি যুধিষ্ঠিরকে আরো বলেছিলেন —

উত্তরাং দিশমাশ্রিত্য য এধন্তে নিবোষ তান্‌।
অত্রিবশিষ্ঠঃ শক্তিশ্চ পারাশর্যশ্চ বীর্যবান্‌।
বিশ্রামিত্রো ভরদ্বাজো জমদগ্নিস্তথৈব চ॥

চারটি প্রধান দিকের এক একটি আশ্রয় করে যে সমস্ত দিব্যতেজা ঋষিগণ নিত্য বিরাজিত, তাঁদের মধ্যে যাঁরা উত্তরদিককে রক্ষা করেন অর্থাৎ উত্তরায়ণের পথকে নির্বিঘ্ন করেন, সাধকের তপোবলের বৃদ্ধি করেন, তাঁদের মধ্যে বশিষ্ঠের নাম সর্বাগ্রে। তাই নর্মদার উত্তরতট পরিক্রমা এত পুণ্যের। বায়ু কার্তবীর্যার্জ্জুনকে উপদেশকালে বলেছিলেন—

নত্বং মূঢ় বীজানীষে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়াচ্চবম্ স হি তু ব্রাহ্মনেন ইহ ক্ষত্রিয়ঃ শাস্তি বৈ প্রজাঃ।

মূঢ়! ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তুমি তা জান না। কারণ, সেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রজা শাসন করে।

বায়ু একে একে কশ্যপ, আঙ্গিরা, উতথ্য, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও লোকচমৎকারী অত্যাশ্চর্য তপোবলের বর্ণনা দিয়ে বশিষ্ঠের মহিমা বলতে গিয়ে বলেছিলেন 'শৃণু রাজন্। বশিষ্ঠস্য মুখ্যং কর্ম যশস্বিনঃ' — রাজা যশস্বী বশিষ্ঠের একটি প্রধান কর্মের কথা শুনুন।

একদা দেবতারা বশিষ্ঠের গুরুত্ব অনুধ্যান্ করে মানস-সরোবরের তীরে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

আদিত্যা সত্রমাসন্ত সরো বৈ মানসং প্রতি
বশিষ্ঠং মনসা গত্বা তত্ত্বসা গৌরবম্॥

সেই যজ্ঞ করে দেবতারা কৃশ ও দুর্বল হয়ে গেলে খলি নামক দানবগণ ঋষিদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়।

যজনানাংস্তুত তান্ দৃষ্ট্বা সর্বান্ দীক্ষানুকর্শিতান্।
হন্তুমিচ্ছন্ত শৈলাভাঃ খলিনোনাম দানবাঃ॥

ব্রহ্মা খলিকে বর দিয়েছিলেন যখন তার সঙ্গীরা নিহত হবে তখন তারা সরোবরে স্নান করলেই পুনর্জীবিত হবে। সেই আশীর্বাদে দানবরা যতই দেব কর্তৃক নিহত হতে থাকল খলি ততই তাদের সরোবরের জলে নিক্ষেপ করতে থাকলে দানবরা পুনঃ পুনঃ জীবিত হতে থাকল।

স চ তৈ ব্যথিতঃ শক্রো বশিষ্ঠং শরণং যযৌ।
ততো ভয়ং দদৌ তেভ্যো বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥
তদা তান দুঃখিতাং জ্ঞাত্বা অনেশংসাবাঁরো মুনিঃ।
অযত্নেনাদহৎ সর্বান্ খলিনঃ স্বেন তেজসা॥
কৈলাসং প্রস্থিতাঞ্চৈব নদীং নর্মদা মহাতপাঃ।
আনয়ওৎসরো দিব্যং তয়া ভিন্নঞ্চ তৎসরঃ॥

ইন্দ্রসহ দেবতাগণ পীড়িত হয়ে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হলেন। বশিষ্ঠ তাঁদেরকে অভয় দান করলেন। দেবগণের দুঃখে দুঃখিত বশিষ্ঠ অযত্নবশতঃ (অনায়াসেই) নিজ তেজে খলি নামক সমস্ত দানবকে দগ্ধীভূত করলেন। যে যুগে নর্মদা কৈলাস পর্বতের দিকে প্রবাহিত হত। কিন্তু মহাতপা বশিষ্ঠ তাঁকে মানস-সরোবরে এনে উপস্থিত করেন। তখন নর্মদা সেই দিব্য মানস-সরোবরের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলেন। সর্বানন্দজী নীরব হলেন। দেখি পূব আকাশে শুকতারার উদয় হয়েছে। অনেকক্ষণ সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম। অনুমান করলাম ভোর হতে বেশী দেরী নেই। শেষ প্রহরে একদল শিয়াল ডেকে উঠল। তারপরই ডেকে উঠল বন্য মোরগের দল। বনের পাখীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সমস্ত প্রাণীকুল সূর্যদেবের আগমনের প্রতীক্ষায়। বিচার করতে লাগলাম যে বৈদিককাল হতে নর্মদা তপস্যার কথা চলে আসছে। বিছানায় উঠে বসে জপ করতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে সর্বানন্দজী সকলকে পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করতে লাগলেন। সমস্ত মালভূমি অঞ্চলে সূর্যালোকের বান ডেকেছে। স্বস্তিবচন শেষে মহাত্মাজী সকলকে বসতে বলে বললেন — আর কিছুটা গেলেই অমরকন্টকে পৌঁছে যাবে। পরিক্রমা সমাপন্তে তোমার ফিরে যাবে মঠে আর শৈলেন্দ্রনারায়ণজী যাবেন মায়ের কাছে। কিন্তু জীবনে কোন অবস্থায় মা নর্মদাকে ভুলবেন না। অনন্যচিত্ত হয়ে মা-এর ধ্যানেই জীবন অতিবাহিত করবেন। সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে। মা নর্মদার রাতুল চরণে তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। জন্ম জন্মান্তরের কঠোর সাধনায় তোমাদের পরিক্রমা পরিপূর্ণতা লাভ করতে চলেছে। মা নর্মদার আশীর্বাদ না পেলে অতি বড় পণ্ডিতও মূর্খ ছাড়া কিছু না ।

দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু লোকের সংস্পর্শে আসবে যারা লেখাপড়া জেনেও মূর্খের মত আচরণ করে। স্কুল-কলেজের বিদ্যায় তারা বিদ্বান হলেও তারা কিন্তু সত্যকারের বিদ্বান নয়। তাদের আচার-আচরণও বিদ্বানের মত নয়। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার অহঙ্কারে তারা গর্বিত — 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করে। ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাস তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'দাসবোধ' মহাগ্রন্থে ঐ সকল মূর্খের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। আমি তোমাদের বলছি। তোমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবে। এই বলে তিনি যুক্ত করে আবৃত্তি করতে লাগলেন —

আপলেন জ্ঞাতেপনেঁঙ্গ সকলাঁম শব্দ ঠেবনেঁ। প্রাণীমাত্রাচেঁ পাহে উনেঁ। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ১
রজোগুণী তমোগুণী। কপটী কুটীল অংতঃ কর্মী। বৈভব দেখোন বা খানী। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ২
জ্ঞানপনেঁ ভরী ভরে। আলা ক্রোধ না বরে। ক্রিয়া শব্দাস অংতরে। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ৩

দোষ ঠেবী পুঢ়িলাঁসী। তেঁ চিন্তয়েং আপনানাসী। ঐসে কলেনা জয়াসী। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ৪
বর্ণী স্ত্রিয়াঁচে আবেব। নানা নাটকেঁ হাবভাব। দেবা বিসরে জো মানব। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ৫
ভরণ বৈভবাচে ভরীঁ জীব মাত্রাস তুচ্ছা করী। পাষাংড মত থাবরী। তা য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ৬
যেথার্থে সাঁডুম বচন। ঝো রক্ষুণে বোলে মন। জ্যাচেঁ জিনে পরাধেন। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ৭
জ্ঞান বোলোন করী স্বার্থ। কৃপনা-ঐসী সংচী অর্থ। অর্থাসাঠী লাবী পরমার্থ। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ৮
বর্তল্যা বীন সিকবী। ব্রহ্মজ্ঞান লাবনী লাবী। পরাধেন গোসাবী। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥ ৯

নিজ জ্ঞানের অভিমান যার ষোল আনা,
সকলের মাঝে দোষ খুঁজিতে সেয়ানা।
প্রাণী মাত্রেরই দোষ দেখিতে যে পায়,
লেখাপড়া জানা মূর্খ জানিও তাহায়।
রজোগুণী, তমোগুণী সাত্ত্বিকতা হীন,
কপট কুটিল আর অন্তরেতে দীন;
বৈভবশালী গুণ যেজন বাখানে
সেও এক মূর্খ, কিন্তু লেখাপড়া জানে॥
সবজান্তা বলি যার আছে অভিমান,
ক্রোধকালে থাকে না কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান;
কথা কাজে মিল যার নাহি কোনকালে
লেখাপড়া জানিলেও মূর্খ তারে বলে।
যেজন পরের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়,
আপনার ছিদ্র কিন্তু দেখিতে না পায়;
পড়াশুনা হয়ত সে করিয়াছে ঢের;
অতিবড় মূর্খ সে যে পায় না তা টের।
রমনীর রূপ আর নাটকীয় ভাব,
বর্ণনা করাই যার হয়েছে স্বভাব;
ঈশ্বরে, বিশ্বাস যার নাহি এক কণা,
লেখাপড়া জানিলেও মূর্খ সে জনা।
বৈভবের গরবে যে থাকে ভরপুর,
তুচ্ছজ্ঞানে জীব মাত্রে করে 'দূর দূর';
পাষণ্ডমতের করে পোষকতা,
লেখাপড়া জানিলেও যায়নি মূর্খতা।
যথার্থ বচন ছাড়ি অসত্য যে বলে,
যোগায় পরের মন অতি কুতূহলে;
জীবন যাপন করে পরাধীনতায়,
পড়াশুনা করিলেও মূর্খ বলে তায়।
জ্ঞানের বচন বলি স্বার্থসিদ্ধি করে,
কৃপণের মত যে ধনসঞ্চয় করে;
পরমার্থ প্রয়োগ যার অর্থলাভ তরে,
লেখাপড়া জানিয়াও মূর্খ নাম ধরে।
আপনার আচরণে যাহা নাহি আসে,
পরকে শিখাইতে তা চায় অনায়াসে;
ব্রহ্মজ্ঞান প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ,
লেখাপড়া জানা মূর্খ, নাহি পায় সুখ।

সর্বানন্দজীকে প্রণাম করে বিদায় চাইতেই তিনি আমাকে একটি *ছবি দিলেন। তাতে মানুষের মাথার সম্মুখদেশ, পশ্চাৎদেশ, পার্শ্বদেশ ও উপরের দৃশ্যের ছবি জ্যামিতিক আকারে অঙ্কিত রয়েছে। বললেন — বাড়ী গিয়ে আমাকে স্মরণ করে এর রসাস্বাদনের চেষ্টা করবে। ম নর্মদার কৃপায়, সর্বানন্দের আশীর্বাদে যে তোমার সম্মুখে যে উপস্থিত হবে তার মনোগত, আচরণগত সমস্ত ভাব তোমার তন্ত্রীতে সাড়া দেবে। তোমার মানুষকে জানতে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। আর একটা অনুরোধ তোমায় করব। তুমিই মা নর্মদার কৃপায় মার মহিমা বর্ণনার যে বই প্রকাশ করবে তাতে এই ছবিগুলি অবশ্যই দেবে কিন্তু তোমার অঙ্গে অঙ্গে যে জ্যোতির স্ফুরণ হবে তার কারণ অবশ্যই ব্যাখ্যা করবে না। পগ পগ চলতে রহো নর্মদাকে নাম রটতে রহো। এই বলে তিনি আমাদের যাত্রপথের পিছন দিকে চলতে শুরু করলেন।

তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম।

এবারে জঙ্গলের মধ্যে উৎরাই শুরু হল। ধীরে ধীরে উৎরাই পথে নামতে নামতে দেখলাম প্রায় এখনও দু-তিনশ ফুট নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদার জলস্রোত। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। মাঝে মাঝে গাঁছপালার ফাঁক দিয়ে নর্মদাকে দেখতে হচ্ছে। এক পাল হরিণকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। উৎরাই পথে আরও এক ঘন্টা হাঁটার পর নেমে এলাম নর্মদার তটে। তটের উপরেই বিশাল শিবমন্দির। মন্দিরের পিছনেই বিশাল প্রান্তর। শাল, সাজা, সালাই, নিমগাছ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। আমরা নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। স্নান তর্পণাদি করে মন্দিরে ঢুকলাম পূজা করতে। প্রায় তিনফুট উঁচু স্ফটিক শিবলিঙ্গ। লিঙ্গের সামনে সর্বানন্দজী ধ্যানমগ্ন। আমরা হকচকিয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাদের সঙ্গে তো মহাত্মা আসেন নি। তবে কোন পথে এলেন। খাড়া পাহাড়ে যে রাস্তায় আমরা এলাম সেই পথ ছাড়া অন্য কোন পথও নাই। পূজা সেরে বাইরে এলাম। মহাত্মা আমাদের সঙ্গে কোন বাক্যলাপ করলেন না। আমরা তাঁর ধ্যান ভাঙার জন্য অপেক্ষা করব, না যাত্রা করব ভাবছি এমন সময় মন্দিরাভ্যন্তর থেকে ভেসে এল — শিবমস্তু। শিবমস্তু। আমরা তাঁকে ও মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। জঙ্গল একবার ঘন হচ্ছে, একবার পাতলা হচ্ছে। নীল মেঘের মধ্যে দূরের পর্বতশ্রেণী অপূর্ব দৃশ্য রচনা করেছে। প্রায় ছয় সাত মাইল চড়াই উৎরাই করে পৌঁছে গেলাম লোটাটোলা গ্রামে। এখানেও এক পাহাড়ী নদীর সঙ্গে নর্মদার সঙ্গম হয়েছে। ছোট্ট গ্রাম। বড়জোর দশ বারটি কুঁড়েঘর রয়েছে।

আমরা এগিয়ে চললাম। এবার পথ ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। পাশাপাশি দুজনও এই খাড়া সংকীর্ণ পথে হাঁটতে পারব না। এই পাকদণ্ডী পথে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। নিচেই খরস্রোতা নর্মদা গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝেই বৈদূর্যপর্বতের ঝিকিমিকি চোখে পড়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উৎরাই। প্রায় মাইলখানিক হাঁটার পরেই দেখলাম একটি নদী এসে মিশেছে নর্মদার ধারার সঙ্গে। জলের ধারে নরম মাটিতে কয়েকটি পায়ের ছাপ দেখে অনুমান করলাম ওগুলো বাঘেরই পদচিহ্ন। কাঁপা কাঁপা গলায় সকলে বলে উঠলাম 'নর্মদা মাতা কি জয় হো'।

নর্মদা তার পথে বেয়ে চললেও আমাদেরকে এই দুর্গম পথে হাঁটতে হচ্ছে কখনও দু'তিনটি পাথরের মাথায় উঠে সেখান থেকে নিচের পাথরে পা ঝুলিয়ে বা কোন গাছের গুঁড়িকে আঁকড়ে ধরে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার মত অবস্থায়। সূর্যালোক দেখা না গেলেও অনুমান করলাম মধ্যাহ্নক্ষণ অনেক আগেই গত হয়েছে। এই অবস্থায় ঘন্টাখানিক হাঁটার পর একটি শিব-মন্দিরে পৌঁছানোয় ঝোলা-গাঁঠরী ফেলে আমরা হাঁপাতে লাগলাম। যত পূর্বমুখী হয়ে নর্মদা উদ্‌গম মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছি ততই নর্মদার খরস্রোতা বেগ বেড়ে চলেছে। হরানন্দজী বললেন — আজ এই পর্যন্ত।

এতদুর হেঁটে এলাম কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নাই। কোন দূর-দূরান্তে পল্লীরও নিশানা নেই। সূর্যের আলো না ঢোকায় মন্দির তখনই অন্ধকার ছেয়ে গেছে। যতীশ্বরানন্দ মন্দিরের ভিতর পরিষ্কার করে ফেললেন। মন্দিরের শিবলিঙ্গ ধুলায় ধূসরিত। বহুদিন কেউ তাঁর পূজা করেছে বলে মনে হয় না। আমরা কমণ্ডলুতে করে জল এনে শিবলিঙ্গ ধৌত করে তাঁর পূজা করলাম। পূজা শেষে যতীশ্বরানন্দ কিছু শুকনো ডালপালা রাত্রে জ্বালানোর জন্য মন্দিরের মধ্যে এনে জড়ো করলেন। আমরা মন্দিরের বাইরে কিছুক্ষণ বসে মন্দিরে ঢুকে দরজা অর্গলবদ্ধ করলাম। সকলের যখন জপ শেষ হল, তখন বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় এক ঘুমে সকাল। বাইরে বেরিয়ে দেখি হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। চারদিকে ঘোর কুয়াশা। পাহাড়ের কোলে শীত যেন জাঁকিয়ে বসেছে। যে যার গাঁঠরী কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে করে থপ থপ করে হাঁটতে লাগলাম। গভীর বনের ভিতর দিয়ে স্যাঁৎস্যাঁতে পিচ্ছিল পথ। পথে আরও একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে। একটি পাকদণ্ডী পথে আমরা নামতে লাগলাম। পাকদণ্ডের কোণে কোণে সূর্যকিরণ পড়ছে। হাতে পায়ে দারুণ ব্যথার জন্য কিছুতেই জোরে হাঁটতে পারছি না।

সূর্যরশ্মির তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম নর্মদার উপর যে কুয়াশার আস্তরণ ছিল তা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। বেলা এগারটা নাগাদ আমরা অতিক্রম করলাম হরাই টোলা। নর্মদায় স্নানরত এক যুবক জানাল আরও সাত মাইল রাস্তা অতিক্রম করলে তবে দমগড়ঘাটে আপনাদের রাত্রির আশ্রয় জুটবে। চোখের সামনে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ। ক্ষুধা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন খাদ্যই নেই। অবশেষে নর্মদার জলে স্নান করে নর্মদাবারী নর্মদা মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে তা পেটভরে খেয়ে নিলাম। আবার হাঁটতে লাগলাম সামনের পর্বত এবং গহন অরণ্য লক্ষ্য করে। আকাশচুম্বী সুবিশাল বৃক্ষের বলয় ক্রমশঃ আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলতে শুরু করেছে। অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় পার্বত্য অরণ্য, বৃক্ষরাজি এক অদ্ভুত সাজে সেজেছে। এঁকে বেঁকে গাছ ও পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে হেঁটে চলেছি। ঢুকে পড়লাম নিবিড় অরণ্যের গহ্বরে। আমাকে ঘিরে ধরেছে জমাট অন্ধকার।

মহাদেবানন্দ বললেন — এতো অন্ধকার রাস্তায় হাতড়ে হাতড়ে চলা দুষ্কর! সঙ্গে একটা টর্চ থাকলে ভালো হত। অনুমানের উপর ভর করে লাঠি ঠুকে ঠুকে 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। গা ছমছম করছে। আমরা ঘেমে নেয়ে উঠেছি। বারবার স্মরণ করতে লাগলাম বাবাকে, প্রলয়দাসজীকে, সোমানন্দজীকে। হঠাৎ অন্ধকারের প্রান্তে একটা আলোর রোশনাই দেখা গেল। আমরা সেই আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। আলোর প্রান্তে নজরে এল এক জীর্ণ পুরাতন শিবমন্দির। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠে এলাম। মন্দিরের ভিতরে বিরাজমান এক শিবলিঙ্গ। মন্দিরের দরজা এতই জীর্ণ যে বাঘ, চিতা, নেকড়ের এখানে দ্বার অবারিত। তবুও ঐ অন্ধকার রাজ্যের চেয়ে মন্দিরকেই বড় নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে মনে হল। মন্দিরে বিরাজমান শিবলিঙ্গই যেন আমাদের রক্ষক।

মন্দিরের ভিতর বিছানা বিছিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। সমস্ত জঙ্গলখণ্ড নিস্তব্ধ। আমি বললাম — এই শান্ত গম্ভীর স্তব্ধ পরিবেশ তপস্যার আদর্শস্থান। এত দীর্ঘ পথে মা নর্মদার কৃপার কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুমের মধ্যে শুনছি লখড়াকোটের জঙ্গলে পিতাপুত্রীর কণ্ঠস্বর 'হর নর্মদে হর'। কখন শুনতে পাচ্ছি মহাত্মা সোমানন্দের কণ্ঠস্বর 'ভাগ বেটারা ভাগ্। বামুনের মাংস তেতো হয় জানিস না? কামড় দিবি কি মরবি! পরক্ষণেই ভেসে উঠল প্রলয়দাসজীর মুখ। তিনি বলছেন 'মুঝে কঁহা ঢুঁড়েগা বাচ্চা, মৈঁ তো তেরে পাশমেঁ। দেখলাম বিরাট কলবরে করপাত্রীজীর শরীর রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। হুঙ্কার তুলছেন — অ-মুক্ রগড়্যা, অ-মুক্ রগড়্যা, অকাতে ভাগ বাকেকানা। এরপরই মহাত্মা নগেন্দ্রভারতীজী আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন আর বলছেন 'বাঙালী বাবা যা রহা হ্যায়, ঔর জিন্দেগীভর ভেট নেহী হোগা'। তাঁর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

হরানন্দজী আমাকে ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দিলেন। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। হরানন্দজী বললেন — স্বপ্ন দেখে কাঁদছিলেন। তাই উঠিয়ে দিলাম মুখে চোখে জল দিয়ে একটু জল খান। হরানন্দজীর চিৎকারে অন্যরাও উঠে পড়েছেন।

ভোর হয়ে আসছে। সমগ্র বনাঞ্চল কুয়াশায় ঢাকা থাকা সত্ত্বেও মন্দিরের বারান্দায় বসে ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির রূপের যে পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়নভরে দেখতে লাগলাম। সূর্যোদয় হতে প্রাতঃকৃত্যাদি, স্নান, তর্পন সেরে মহাদেবের পূজা করলাম। তারপর মহাদেবকে প্রণাম করে ঝোলা, গাঁঠরী নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম; পূর্বদিকের পথ ধরে। নর্মদার কিনারে কিনারে। আমরা সাতপুরার বিস্তৃত ঢালের মুখে এসে পৌঁছেছি। এতক্ষণ সমতলে হাঁটছিলাম। পথের দুধারে বড় বড় গাছের জটলা থাকলেও যে সব দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় জঙ্গল পেরিয়ে

এসেছি , তাদের তুলনায় একে জঙ্গলই বলা চলে না। আবার চড়াই শুরু হল। পথের একধারে আছে চারশ পাঁচশ ফুট গভীর খাদ। তার নীচে নালা। নালার গা থেকে উঠেছে আর একটা পাহাড়ের বিষম খাড়াই। বিশাল বিশাল সাজা এবং সালাই গাছও যেন পাহাড়ের উচ্চতা মাপার জন্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসলাম।

কিন্তু আমাদের বিশ্রাম বা প্রাকৃতিক শোভা দর্শনের অবসর কোথায়? আমরা পরিক্রমাবাসী, শখের ভ্রমণবিলাসী নই। পথের দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। খরস্রোতা নর্মদার বিস্তার পনের ফুটের বেশী হবে না। নর্মদা যে পথে বয়ে আসছেন, আমরা সেগুন গাছের ফাঁকে ফাঁকে সেই পথেই হেঁটে যেতে থাকলাম। ক্ষণে ক্ষণে নর্মদা যেমন তাঁর গতিপথকে বদলেছেন, তেমনি পার্বত্য প্রকৃতিও বদলে গেছে। এখন পথ কঙ্করময় হলেও এখানে পাহাড় জঙ্গলময় নয়। তবে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অজস্র বেলগাছ ঝুঁকে পড়েছে নর্মদার বুকে। আমাদের কখনও উৎরাই, কখনও চড়াই-এর পথে হাঁটতে হচ্ছে। জঙ্গল কম থাকায় তাই এখানে সূর্যালোক অবারিত। দেখলাম নর্মদার মাঝখানে একটি বিশাল পাথর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। তার গায়ে নর্মদা বাধা পেয়ে ছিটকে এসে পড়ছে আমাদের পথের উপর। অত্যন্ত সাবধানে ভিজা পাথরে পা টিপে টিপে আমরা চলতে থাকলাম। একবার পা পিছলোলে আর রক্ষা নাই। প্রায় আধ মাইলটাক রাস্তা পা টিপে টিপে হাঁটার ফলে পাগুলো সকলেরই ব্যথা ব্যথা করছে। মনে মনে ভাবছি এই পথের যেন শেষ নাই। এমনসময় দেখলাম, নর্মদা একটা পাহাড়কে দু-ভাগে ফাটিয়ে বয়ে এসেছেন। ফাটলের দৈর্ঘ্য বড়জোড় বিশ ফুট। সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে নর্মদার অপর প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। নর্মদার ক্ষীণকায় স্রোতে এখন তিরতির করে বইছে। হরানন্দজী বললেন — এই অবস্থায় আমাদের পাহাড়ে উঠে আবার ঐপাশে যেতে হবে। আমি বললাম — পায়ের ব্যথায় আমার পক্ষে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়। আমি ঐ টানেলের মধ্যে দিয়ে যাব। আমি গিয়ে অপেক্ষা করছি, আপনার পাহাড় ডিঙিয়ে আসুন। শেষ পর্যন্ত সকলেই সেই টানেলের মধ্যে দিয়ে চললাম। চারিদিকে অজস্র শিবলিঙ্গ ছড়িয়ে আছে। আমি ও হরানন্দজী দু-চারটে নিয়ে ঝোলায় পুরলাম। টানেলের বাইরে বেরিয়ে দেখি সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছেন। পাহাড়ের অন্য দিকে পূব আকাশ কালো রূপ ধারণ করেছে। আমাদের চলার পথের ধারে ধারে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে। দূরে একটা বাঘ আমাদের দিকে পিছন করে ঝর্ণার জল পান করছে। বাঘ দেখেই আমাদের মেরুদণ্ড দিয়ে হিমশীতল স্রোত বইছে। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি ফিসফিস করে বললাম — বসে পড়ুন। বসে পড়ুন। বাঘটা তাহলে আমাদের দেখতে পাবে না। বসে বসে লক্ষ্য করলাম, বাঘটি জল খেয়ে দুলকী চালে ঈশান কোণে চলে গেল; ঝর্ণাটিকে লাফ দিয়ে। ফিস্ ফিস্ করে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা সকলেই আমাদের অসাড় অঙ্গকে টেনে টেনে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে পাশের দিকে দেখছি। বাঘটা আবার ফিরে এল কিনা। শরীর সুস্থ থাকলে সকলেই দৌড়ে এ স্থান অতিক্রম করতাম সন্দেহ নাই। বাঘের গন্তব্যপথের দিকে লক্ষ্য রাখায় আমি একটি বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লাম। পাথরের উপর পড়ায় হাঁটু দুটো ছড়ে গেছে। ডান হাতের কনুইতেও চোট লেগেছে। প্রেমানন্দের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে হাঁটতে লাগলাম। সূর্যের আলো থাকায় পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে না। এই রুক্ষ পার্বত্য পথে ঝোপ-ঝাড় ছাড়া কোন বড় জঙ্গল নাই। এইভাবে চলতে চলতে আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল এক বিশাল ঘাস বন। কোথাও এক মানুষ কোথাও বা দু'তিন মানুষ উঁচু দুর্ভেদ্য ঘাসের প্রাচীর। তারমধ্যে পথরেখা খুঁজে খুঁজে বের করে হাঁটছি ত হাঁটছি। ঘাসবন আর শেষই হতে চায় না। প্রায় আধঘন্টা ধরে হাতড়ে হাতড়ে ঘাসবন পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় যখন এলাম চারদিক তখন অন্ধকারে ডেকে গেল। মহাদেবানন্দ বললেন — বোধহয় আজ আমাদের ফাঁকা মাঠেই রাত কাটাতে হবে। মার হয়ত তাই ইচ্ছা। অন্ধকারে আরও এক মাইল চড়াইপথে এগিয়ে যাবার পর মনে হল পায়ে লাগছে নরম মাটির স্পর্শ। তার মানে আমরা সমতল ভূমিতে উঠে এসেছি। এমন সময় কানে ভেসে এল কেউ যেন অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করছেন —

কবীর নিজ ঘর প্রেমকা সাগর অগম অগাধ
সীস উতারি পগতলি ধরে তব নিকটি প্রেমকা সাধ।

প্রেমের ঘরে পৌঁছতে হলে অগম্য অগাধ পথে চলতে হয়। যে নিজের মাথাটা প্রয়োজন হলে তাঁর চরণতলে, সত্যের বেদীমূলে ডালি দিতে পারে, সেই পায় প্রেমের স্বাদ।

সেই গলার স্বর শুনে শুনে আমরা এক কুঠিয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলাম।

পায়ের শব্দ পেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন — 'কৌন'?

আমরা সমস্বরে বললাম — পরিক্রমাবাসী বা! হর নর্মদে হর।

এক বৃদ্ধ একটি কুপী হাতে কুঠিয়ারে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আলোটি উঁচু করে আমাদের মুখের সামনে তুলে ধরতেই হরানন্দজী বললেন — আমরা দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা করতে করতে এই স্থানে এসে পৌঁচেছি। রাত্রের মত আশ্রয় চাই।

— জরুর, আপলোগ কবীর চবুতরা পৌঁছ গিয়া। আর তিন-মাইল রাস্তা জানেসে মায়ীকী মন্দরমেঁ পৌঁছ যাবেগা। পরিক্রমা সমর্পণ করনে পড়েগা। আজ ইধার ঠারিয়ে।

বৃদ্ধ সাধু একটি কুঁয়ার কাছে নিয়ে এসে হাত পা ধুয়ে নিতে বলে নিজেই কুঁয়া থেকে জল তুলে দিলেন। তারপর খুব আদরের সঙ্গে আমাদের কুঠিয়ার ভিতর নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। ঘর বেশ গরম। আরাম বোধ করলাম। নিজের নিজের গাঁঠরী খুলে বিছানা পাতলাম। প্রেমানন্দ বললেন — আর মাত্র তিন মাইল। এক্ষুণি দৌড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নিজের মনকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। গা পায়ের ব্যথা চলে গেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও কিছু নাই।

কবীরপন্থী সাধু বললেন — এত্না দিন পরিক্রমাকে বাদ যব পরিক্রমাকারী মায়ীকা পাশ লোটতা হ্যায়, তব উসকা মনকা হালৎ এ্যায়সাই হোতা হ্যায়।

হরানন্দজী বললেন — কবীরজী ইধর আয়ে থে?

— হাঁ জী, উধর উনোনে তপস্যা কিয়ে থে, ইধরই উনোনে চোলা ছোড় দিয়া। জঙ্গলকা তরফ এক বিরাট বট কি পেড় হ্যায়, হিঁয়াসে করীব আধমাইল হোগা। উসকা নাম কবীর বট। কবীর সাহেবকী মাজুন কাঠিসে উস্ পেড় পয়দা হুয়া। সারি হিন্দুস্থানমেঁ এতনা বড়া পেড় কভি নেহি দেখিয়েগা।

তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন — আপকো হম্ পয়ছান গিয়া। করীব পাঁচ/ছ' সাল পহেলে আপ শঙ্করনাথজীকে সাথ পরিক্রমা শুরু কিয়ে থা। মুঝে থোড়া থোড়া ইয়াদ হোতা হ্যায়। হামনে হী আপলোগ্‌কা সৎকার কিয়া থা। আপনে হী মেরে সাথ কবীর সাহেবকা বারে মেঁ তর্ক কিয়া থা। খ্যার, নর্মদামায়ী আপকা মনোবাসনা পূর্ণ কিয়া তো! মানে আপকো শায়েস্তা ভী কর দিয়া!

এই বলেই তিনি হাসতে লাগলেন।

আমিও হাসলাম।

প্রেমানন্দ বললেন — আপ কবীর সাহেবকা কাহিনী শুনায়ে। আজ হামলোগকা নিদ নাহী আয়েগী।

সাধুজী হো হো করে হাসতে লাগলেন। শুরু করলেন — আচারী সম্প্রদায়ের চতুর্থ (কারো কারো মতে ৫ম বা ৬ষ্ঠ) গুরু হন রামানন্দ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে প্রয়াগে দ্রাবিড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে রামানন্দের জন্ম হয়; তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল রামদত্ত; গুরুদত্ত নাম রামানন্দ।

গুরু রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের নাম রাখলেন 'অবধূত' অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত। গুরু রামানন্দ বাস্তবিক গুরু নামের যোগ্য; তিনি সত্যদ্রষ্টা, পতিতপাবন ছিলেন এবং গুরু রামানন্দের নীচ জাতীয় শিষ্যগণ স্ব স্ব জ্ঞান ভক্তি ও চরিত্রের দ্বারা ভারতবর্ষকে পবিত্র করে রেখেছেন। গুরু রামানন্দ এইরূপে ভারতে জাতীয় একতার মূল ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হয়েছেন কবীর। কবীরের জন্ম সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে। তন্মধ্যে বহু প্রচলিত জনশ্রুতি হল — কবীর কাশীর এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার পুত্র। ব্রাহ্মণ কন্যা আপনার কলঙ্কচিহ্ন সদ্যোজাত পুত্রকে কাশীর লহর তালাব নামক পুষ্করিণীতে একটি পদ্মপাতায় শুইয়ে ভাসিয়ে দেন। প্রভাতে নিমা নাম্নী একটি জোলা-জাতীয়া স্ত্রীলোক ও তার স্বামী নিরু বা নুর আলী ঐ স্থান দিয়ে বিবাহের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিল। নিমা তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে ঐ সরোবরে জলপান করতে গিয়ে দেখেন কমলপত্রে কোন্ কলঙ্কিনীর লজ্জা ও স্নেহবেদনার ধন সদ্যোজাত শিশু ভাসছে। শিশুর 'সুন্দর সুরত মোহন মুরত কমল-নৈন' (সুন্দর শ্রী মোহন মূর্ত্তি ও কমল নয়ন) দেখে মুগ্ধ ও স্নেহার্দ্র হয়ে নিঃসন্তান নিমা ঐ শিশুকে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৪৫৫ সংবতে (১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের সোমবারে পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাকাল প্রকট হয়েছিল, তখন মেঘ ডাকছিল, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল, ঝাড় হচ্ছিল। এমন সময়ে লহর-পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল কমলের মধ্যে কবীর-ভানু প্রকাশিত হয়েছিলেন।

লৈহর তালাব মে কমল খিলে তাঁহা কবীর-ভান প্রকাশ ভয়ে॥

জোলা দম্পতি শিশুকে গৃহে এনে নিজের পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন। তাঁরা শিশুর নামকরণের জন্য একজন কাজীকে ডেকে আনলেন। কাজী এসে কোরান্ খুলতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল কবীর শব্দের উপর। শিশু সেই নামেই পরিচিত হলেন।

কবীর আরবী শব্দ, তার অর্থ মহান, বৃহৎ বা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। কাশী হিন্দুপ্রধান স্থান। কবীরের পালক পিতা নিরু শেখের প্রতিবেশী প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। বালক কবীর হিন্দু বালকদের সঙ্গেই খেলা করতেন। তাঁর খেলা ছিল ভগবত পূজন ও ভগবানের নাম কীর্ত্তন। হিন্দু বালকদের সংসর্গে তিনি ভগবানের ভারতবর্ষীয় ভাষার নামই কীর্ত্তন করতেন।

কবীর জানতেন জোলা বলে লোকে তাঁকে উপহাস করে। তার উত্তরে কবীর বলেছিলেন —

কবীর তেরে জাত্ কো সব-কোই হাসনহার<br>
বলিহারী ওয়া জাত কো জো সিমরে সৃজনহার॥

ওরে কবীর, তোর জাতের জন্যে সবাই তোকে উপহাস করে। বলিহারী ঐ জাতের যে সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করে। কারণ স্বয়ং ভগবান একজন মহা তাঁতী —

ধরণী আকাশ-কী কারগাহ্ বানায়ী।<br>
চন্দ সুরজ দুই নাল চালায়ী॥

ধরণী ও আকাশকে কারখানা বানিয়ে তিনি চন্দ্র-সূর্য্য দুই মাকুকে হরদম চালাচ্ছেন।

কবীর প্রত্যহ একখানি মাত্র বস্ত্র বয়ন করতেন। এবং সেই বস্ত্র বিক্রয় করে যা পেতেন তা থেকে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ রেখে বাকী অর্থ দরিদ্র সেবায় দান করতেন।

কবীর সহজ ভক্তি ও নির্ম্মুক্ত জ্ঞান লাভ করলেও একজন সৎগুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হলেন।

কবীর রামানন্দের খ্যাতি শুনেছিলেন। কবীর তাঁর শরণাপন্ন হলেন।

ব্রাহ্মণ রামানন্দ স্বচ্ছন্দে মুসলমানকে শিষ্য বলে স্বীকার করেছিলেন একথা মেনে নিতে ছুঁৎমার্গী জাতওয়ালাদের মনে লাগে। তাই তারা গল্প রচনা করেছে যে রামানন্দ কবীরকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। কবীর অগত্যা গভীর রাত্রে রামানন্দের বাড়ীর দরজায় গিয়ে শুয়ে রইলেন, প্রত্যূষে রামানন্দ গঙ্গাস্নানে যাবার জন্য বাইরে পা দিতে গিয়ে কবীরের গায়ে পদার্পণ করেন। অজ্ঞাতসারে একজন লোকের গায়ে পা দিয়ে সঙ্কোচে রামানন্দ বলে ওঠেন 'রাম রাম'! এই গাত্রস্পর্শপূর্বক রাম-নাম উচ্চারণকেই কবীর রামানন্দের মন্ত্রদীক্ষা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

কবীর ভগবানকে রাম (আনন্দময়), প্রভু সাঁই (স্বামী), আল্লা, খোদা (স্বধা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা), পুরা সাহেব (অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম), অনগঢ়িয়া দেবা (অগঠিত বা স্বয়ম্ভু দেবতা) প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। যিনি নাম-রূপের অতীত সকল নাম-রূপ তাঁরই, এ কথা কবীর বুঝেছিলেন। তাই কবীর বারংবার বলেছেন —

অলখ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।<br>
রাম রহীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।<br>
কৃষ্ণ করীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।<br>
কাশী কাবা এক হ্যায়, এঁকৈ রাম রহীম!<br>
ময়দা এক, পকবান বহু, বৈঠি কবীরা জীম॥

অলখ ইলাহী, রাম রহিম, কৃষ্ণ করীম, কাশী কাবা সব এক — একেরই দুই নাম। যেমন ময়দা এক, কিন্তু ময়দা দিয়ে বহু পাক্কান্ন প্রস্তুত করা হয়, তেমনি। এই কথা জেনেই কবীর স্থির হয়ে বসেছেন।

যো খোদায় মস্‌জিদ্‌মে বসতু হ্যায় আউরমুলুক কেহি কেরা?<br>
তীরথ মূরত রাম-নিবাসী বাহর করে হো হেরা?

যদি খোদা কেবল মসজিদেই বাস করেন, তবে অন্য দেশগুলো কার? তীর্থের মধ্যে ও মূর্ত্তির মধ্যেই কেবল আনন্দময় বাস করেন? তবে বাহিরটাকে দেখে কে? কবীর লেখাপড়া জানতেন না; কিন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞানের ও মুক্ত বুদ্ধির বলে গভীর তত্ত্ব শাশ্বত সত্য ও মধুর কবিত্ব প্রকাশ করে গেছেন।

কবীরের সময়ে হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী হওয়াতে পরস্পরের ধর্মমতের প্রভাব পরস্পরের উপর পড়েছিল। কিন্তু মুসলমান তখন দেশের রাজা, তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ও গোঁড়ামির জোর রাজশক্তির সাহায্যে অত্যন্ত প্রবল। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদের আচার ও সামাজিক বিধি দৃঢ়তর নিয়মে বদ্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন। এই অতি কঠোর নিয়মের গণ্ডীতে সমাজের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। এই সময় রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ ধর্মবিপ্লব উপস্থিত করে সর্বধর্মসমন্বয় করবার মহৎ চেষ্টা করেছিলেন।

কবীরের প্রভাব তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু সাধু ভক্তের জীবনের উপর পড়েছে দেখা যায়। আহ্‌মদাবাদের দাদু কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এক কবীরপন্থী শিষ্য হয়েছিলেন। কাশীনিবাসী তুলসীদাসের উপরও তাঁর প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু তুলসীদাস অধিক হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। কবীরের মিত্র ছিলেন ভক্ত সাধু রুইদাস চামার। বৃন্দাবনবাসিনী মীরাবাঈ কবীরের ভক্তির কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুরু নানক দেশ পর্যটনে বের হয়ে কাশীতে এসে কবীরের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করেন। শিখ গ্রন্থসাহেব কবীরের বাণীতে পূর্ণ। গুরু নানকের প্রচারিত শিখ ধর্মকে কবীরের প্রচারিত ধর্মের ছায়া ও শাখা বলা যেতে পারে। ঐ দুই মহাপুরুষের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মসমন্বয় ও উভয়কে একই ভূমিকায় মিলিত করা এবং একেশ্বরবাদ ও সর্ব মানবের একজাতিত্ব প্রচার। অযোধ্যার জগজীবন দাস কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎনামী সম্প্রদায়, বীরভান সাধু সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, আলোয়ারের চরণদাস চরণদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে কবীরের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ করে গেছেন। এঁদের সকলের উপদেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কার যে কত কমেছে তা দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারা যায়।

মনকে নির্মল পবিত্র ঈশ্বরপরায়ণ না করে কেবল বাহ্য আচার অনুষ্ঠান পালনকে কবীর নিন্দা করেছেন।

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভয়া গলে লপটে সুত।<br>
ভক্তি ভাবকা মরম ন জানে য্যায়সী জঙ্গলী ভুত।

ব্রাহ্মণ হলো তো কি হলো, কেবল গলায় সুতাই লেপটাল; ভক্তি-ভাবের মর্ম সে জানে না, এমন সে জঙ্গলী ভূত।

তীরথ মে তো সব পানী হৈ, হোবৈ নহী কুছ হ্যায় দেখা।<br>
প্রতিমা সকল তো জয় হৈ, বোলে নহি বোলায় দেখা॥

তীর্থ তো কেবল জল, আমি স্নান করে দেখেছি তাতে কোনো ফল হয় না। প্রতিমা সকল তো জড় মাত্র, ডেকে দেখেছি সাড়া দেয় না।

পুরান কোরান সব বাত হৈ, য়া ঘটকা পরদা খোল দেখা।<br>
অনুভব কী বাত কবীর কহৈঁ রহ সব হৈ ঝুঠী পোল দেখা॥

পুরাণ কোরান সব তো কেবল মাত্র কথা, তাদের পর্দা খুলে আমি তাদের আসল রূপটি দেখে নিয়েছি। কবীর কেবল অনুভব করার কথা বলেছেন — আর সব মিথ্যা ভুল, তা তো অনুসন্ধান করে দেখা গেছে।

মুসলমানেরা কবীরের ব্যঙ্গবিদ্রুপ বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার কাছে নালিশ করলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন সিকন্দর শা লোদী (১৪৮৮-১৫১৭)। ১৪৯৫ সালে সিকন্দর শা কবীরকে গ্রেপ্তার করিয়ে জৌনপুরে দরবারে হাজির করলেন। কবীর সেখানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু রাজাকে সেলাম করলেন না। তোষামোদকারী সভাসদেরা বললেন — আরে কাফের, রাজা শ্রেষ্ঠ পীর, তাঁকে সেলাম করছ না কেন?

তখন কবীর বললেন —

কবীর তেই পীর হ্যায়, জে জানে পর-পীর<br>
জো পর-পীর ন জান হী, তে কাফের বে-পীর॥

হে কবীর, তিনিই পীর যিনি পরের পীড়া বা বেদনা অনুভব করেন; যে ব্যথিতের বেদনা অনুভব করতে পারে না সে ব্যক্তি কাফের।

তখন বাদশাহ্ কবীরকে প্রশ্ন করলেন — তুমি হিন্দু না মুসলমান?

কবীর উত্তর দিলেন —

হিন্দু কহুঁ তৌ ম্যায় নহীঁ, মুসলমান ভী নাহিঁ।
পাঁচ তত্ত্বকা পুতলা গৈবী গেলে মাহিঁ॥

আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চভূতাত্মক পুত্তলিকা আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্যের খেলা চলেছে।

হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা, মুসলমান হুঁ মসীত।
দাস কবীর তহাঁ ধ্যাবহী দোনকী পরতীত॥

হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যান করে, মুসলমান মসজিদে। দাস কবীর সেইখানে ধ্যান করে যেখানে দুজনেরই প্রতীতি। সিকন্দর লোদী শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি কবীরকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

মহানির্বাণ তন্ত্রে গৃহস্থের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে —

ব্রহ্মনিষ্ঠোঃ গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

কবীর এই লক্ষণান্বিত গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন।

কবীরের স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ। তিনি ছিলেন বনখণ্ডী বৈরাগীর পালিতা কন্যা। তাঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন।

কবীর হাটে কাপড় বেচে বাড়ী আসছিলেন। সন্ন্যাসী কবীরের ছেলে হয়েছে শুনে তাঁর প্রতি বিরক্ত ব্রাহ্মণ মোল্লা সবাই মিলে হাটের পথে এগিয়ে গিয়ে বিদ্রুপ করে কবীরকে বললে — কবীর, তোমার ছেলে হয়েছে। তারা ভেবেছিল কবীর এই সংবাদে লজ্জা পাবেন, কিন্তু কবীর ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রসন্ন মুখে এই সুন্দর বাণী উচ্চারণ করলেন —

অনহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরৌ মঙ্গল থার।
ঘর-অংগন কী কদর ভঈ হৈ রাহই হৈব গুলজার॥

অসীম পথের পথিক অতিথি হয়ে এসেছেন, মঙ্গল-থালা ধরে তাকে বরণ করি। আজ আমার ঘর ও অঙ্গনের আদর বাড়ল, আজ পথ হলো ফুলের বাগানের মতন উজ্জ্বল শোভাময়।

জনম-মরণ মেঁ কদম তুম্হারা অবস ভয়া হৈ কাল।
মেরা ঘর মেঁ ডেরা লগায়া পায়া হৈ হম্ কমাল॥

হে অসীমের মহাযাত্রী আমার পুত্র, জন্ম-মরণে ক্রমান্বয়ে তোমার দুই পদক্ষেপ চলছে, মহাকাল অবশ হয়ে ক্ষণকালের জন্য তোমাকে স্থির করেছে। তুমি আমার ঘরে ক্ষণিকের আশ্রয় নিয়েছ। আমি কমাল বা পরিপূর্ণতাকে পেয়েছি।

কামাল পিতার সাধনার ধারা নিজের সাধুজীবনে বহন করে অগ্রসর করে দিয়ে গেছেন। এখন কবীরপন্থীদের সংখ্যা ৪০-৫০ হাজারের কম নয়। কামালের পর কবীরের একটি কন্যা জন্মে। কবীর তাঁর নাম রাখেন কমালী। কমালী একদিন কূপ থেকে জল আনতে গিয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণের জলের কলসীতে কমালীর হাতের জলের ছিটা লাগে। ব্রাহ্মণের কলসী ছুঁৎ হয়ে যায় এবং ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে কবীরের কাছে নালিশ করে। কবীর সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিলেন —

পণ্ডিত বুঝ পিয় তুম পানী।
তোহে ছুত কহাঁ লপটানী।
জা মাটীকে ঘরমে বৈঠে তামে সৃষ্টি সমানী॥

হে পণ্ডিত, তুমি বুঝে সুঝে জল খেয়ো। এই জলে কোথা হতে ছুঁত লাগল? যে মাটির ঘরে তুমি বাস করো সেই মাটির সঙ্গে সকল পৃথিবীর মাটির তো সংযোগ রয়েছে।

এইরূপে পণ্ডিত ও মোল্লা উভয়কে তিরস্কার করে তিনি সকলকে দেশকালাতীত সত্য সনাতন ধর্ম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং দেশের সকল লোককে দেশকালের সংস্কার থেকে মুক্ত স্বাধীন নির্মল বুদ্ধিতে সব কিছুকে বিচার করে দেখতে বলেছিলেন।

হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা, মুসলমান রহিমানা।
আপস মেঁ দোউ লড়ে মরত হৈ, মরম কোই নাহি জানা॥

হিন্দু বলে আমার রাম, মুসলমান বলে আমার রহিম; পরস্পর দুজনে লড়াই করে মরছে কিন্তু ধর্মতত্ত্বটি কেউ বুঝল না।

কবীর প্রাণের জ্বালা জুড়াবার মতন লোকের সন্ধানে তিব্বত আফ্‌গানিস্তান তুর্কিস্থান খোরাসন বাল্‌খ্‌ বুখারা ইরাণ প্রভৃতি বহু দূর দূরান্তর দেশ পর্যটন করেন। অবশেষে গোরখপুরের নিকটে হিমালয়ের পাদমূলে মহগর গ্রামে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানেই নির্জ্জনবাসে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেন।

কাশীতে মরলে শিব হয় বলে লোকের যেমন ধারণা, তেমনি অন্ধবিশ্বাস আছে যে, ব্যাসকাশী ও মগহরে মরলে পর-জন্মে গাধা হয়। তাই কবীর কাশী ত্যাগ করে মগহরে বাস করবেন স্থির করলে তাঁর শত্রুরা যেমন খুশী হয়েছিল, ভক্ত শিষ্যগণ তেমনি দুঃখিত হয়েছিল।

কবীর ভক্তদের এই বলে বোঝালেন যে — হাম্‌ মুফ্‌ত মুক্তি নেহি লেঙ্গে — আমি বিনামূল্যে মুক্তি নেবো না। ভগবানের সাধন ভজন না করে কেবল কাশীতে দেহত্যাগ করে স্থান মাহাত্ম্যে মুক্তিলাভ আমি চাই না। যদি ভগবদ্‌ভক্তি থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে আমি মগহর থেকেই মুক্তি আদায় করে নেবো।

মগহরে কিছুদিন বাস করার পর কবীরের দেহ অপটু হয়ে এল। তখন তিনি বুঝলেন যে, তাঁর দেহের বিনাশ আসন্ন হয়ে এসেছে।

কবীর অমি নদীর তীরে পুষ্পশয্যায় শুয়ে শেষ গান গাইলেন —

গাউ গাউরী দুলহনী মঙ্গলচারা।
মেরে গৃহ আয়ে রাজা রাম ভতারা॥

হে কন্যাযামিনী সখীগণ, তোমরা আমার বিবাহের মঙ্গলাচারা গান কর। আমার ভর্ত্তা রাজা রাম আমার গৃহে এসেছেন।

কবীর নিজের শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করে বিদেহ হয়ে গেলেন। তারপর সেই দেহের সৎকার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ লাগল — হিন্দুরা বলে কবীর ছিলেন হিন্দু, তাঁর দেহ দাহ করতে হবে; মুসলমানেরা বলে কবীর ছিলেন মুসলমান, তাঁর দেহ সমাধিস্থ করতে হবে। কিংবদন্তী আছে যে, বস্ত্রাচ্ছাদন অপসারণ করে দেখা গেল কবীরের দেহ অন্তর্ধান করেছে, কেবল কতকগুলি ফুল পড়ে আছে। সেই ফুল ভাগ করে নিয়ে কতকগুলি ফুল হিন্দুগণ কাশীতে নিয়ে গিয়ে দাহ করে এবং বর্ত্তমান কবীর-চৌরা নামক স্থানে সেই ভস্ম সমাধিস্থ করে; এবং অর্ধেক ফুল মুসলমানেরা নিয়ে সেই মহগরে কবর দিয়ে রাখে। সেইজন্য কাশীর কবীর-চৌরা ও মগহরের কবর-স্থান উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের কাছে তীর্থ হয়ে আছে।

কবীরজীর 'বীজক' বা কামাল সাহেবের গ্রন্থে কবীরজীর নর্মদাবাসের কথা নেই। কিন্তু মগহরে দেহত্যাগের পর কবীরজী এই স্থানে এসে তপস্যা করেন এবং নর্মদা-তটের এই স্থানে তিনি ইষ্টপদে লীন হন। তাই এ স্থান তীর্থের মর্যাদা পেয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে কবীরের জন্ম ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে, এবং তাঁর মৃত্যু ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে। কবীর জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন। তিনি জন্ম-মৃত্যুকে বলেছেন ঝুলন বা দোলা আর মৃত্যুকে বলেছেন প্রিয় পতির সহিত মিলনের যাত্রা এবং জীবন হচ্ছে বিরহের অবস্থা।

ঈশ্বরের সহিত ভক্তের যোগকে কবীর পতির সহিত সতীর মিলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সে মিলন শুধু দুজনের; প্রগাঢ় মিলনের আনন্দ অপরকে লিখে বা বলে বুঝান যায় না এবং সেই আনন্দ মিলনের কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাইরে পড়ে থাকে।

লিখা লিখীকী বাত হৈ দেখা-দেখিকী বাত।
দুল্‌হা দুল্‌হিন মিলি গয়ে, ফীকি পীর বরাত॥

লেখালিখির কথা নয়, কেবল মাত্র অনুভবগম্য ঐ মিলন — বর আর বধূ মিলে গেল, আর বরযাত্রীরা সব নগন্য হয়ে পড়ল।

কবীরের জন্ম-মৃত্যুর ঝুলন কবিতাটি অতি চমৎকার সুন্দর, কিন্তু দীর্ঘ। তারই কয়েকটি কলি এখানে উদ্ধৃত করি—

গ্রহ চন্দ্রতপন জোত বরত হৈ, সুরত রাগ নিরত তার বাঁজে।
নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুন্নমেঁ কহৈঁ কবীর পিউ গগন গাঁজে।
সূর্য্য গ্রহ চন্দ্র তারা রশ্মিধারা বর্ষিছে,
গাহিছে গৃহী প্রেমের সুর, বাজায় তাল বৈরাগী;
শূণ্যতলে ধ্বনিছে সদা

Plato বলেছেন — A Practice of Dying। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কবীরের একটি অমৃতময়ী বাণী উদ্ধৃত করে কবীর-পরিচয় শেষ করি —

ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো, মৈঁ কেহি বিধি কহৌঁ গম্ভীরা লো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো।।

তিনি এমনও নন তিনি তেমনও নন; কেমন করে আমি সেই গভীর কথা বলব গো? যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন, তবে বিশ্বজগৎ লজ্জা পায়; যদি বলি তিনি বাহিরে তবে যে সে কথাও মিথ্যা হয়।

বাহর ভীতর সকল নিরন্তর, চিত অচিত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাতন কহা ন জাঈ লো।

বাহির ভিতর সকলের মধ্যেই নিরন্তর হয়ে তিনি বিরাজ করছেন, চেতন অচেতন দুটি তাঁর পাদপীঠ। তিনি দুষ্টও নন প্রচ্ছন্নও নন, তিনি প্রকটও নন অগোচরও নন, বাক্যে যে তাঁকে ব্যক্ত করা যায় না।

বাইরে তাকিয়ে দেখি সূর্যোদয়ের আভাষ জেগেছে। সাধুজীর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কুঁয়ার জলে মুখ হাত ধুয়ে কমণ্ডলুতে নর্মদার জল দর্শন ও স্পর্শ করে কমণ্ডলুর জল গলায় ঢেলে দিলাম। সাধুজী বললেন — ঔর তিন মাইল জানেসে অমরকন্টকমেঁ পৌঁছেগা। হম আপলোগকো এক বিচিত্র খেজুর গাছ দেখলায়েঙ্গে যো সূর্যোদয়কা সময় শো যাতা হ্যায় ঔর সূর্যাস্তকা সময় খাড়া হো যাতা হ্যায়।

আমরা সাধুজীর সঙ্গে সেই বিচিত্র খেজুর গাছ দেখতে চললাম। গাছ দেখে ফিরে আসতে আসতে আমি বললাম — ১৩২৫ সালে আষাঢ় মাসে লর্ড রোণাল্ডসের সভাপতিত্বে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঐ ধরণের Praying Palm বা উপাসনা পরায়ণ খেচুর গাছের বিবরণ দিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দান করেন। তিনি বলেন — ১৯১৬ সালে ফরিদপুর জেলায় বাঘিয়া গ্রামে একটি খেজুর গাছ সূর্যোদয়ের পরে একটু একটু করে নামাজের ভঙ্গীতে নুয়ে পড়তো, আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধরাশায়ী গাছ যথাপূর্বৎ খাড়া হয়ে উঠতো। এই অভিনব ঘটনা সে যুগে ঐ অঞ্চলে খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। জনসাধারণ তো বটেই এমন কি পূজনীয় অনেক শিক্ষিত পরমাত্মীয়ও এর নাম দিয়েছিলেন 'দেবাংশী খেজুরগাছ'। সর্বত্র যেমন ঘটে, যেমনভাবে অলৌকিকত্বের গল্প সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে ঐখানেও সবাই গাছটিতে দেবতা বা ভূতের ভর হয়েছে মনে করে গাছটিকে পূজা করতেন। কিন্তু আচার্যের বিজ্ঞানী মন ঐসব বিশ্বাস করতে পারেনি। তিনি তাঁরই নির্মিত একটি যন্ত্র দিয়ে ঐ গাছটি নিয়ে গবেষণা করেন এবং তার findings বিচার করে সিদ্ধান্তে আসেন যে ঐ রহস্যজনক ঘটনা আসলে 'Death dance of the Praying Palm', গাছটির মৃত্যু আসন্ন। সত্য সত্যই কিছুদিন পরেই গাছটি মারা যায়।

ফিরে এসে দেখি সাধুজীর এক সেবক আমাদের জন্য বজরার রুটি, অড়হর ডাল, গুড় ও দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরা মৃদু আপত্তি জানালেও বৃদ্ধ সাধুর মুখের উপর 'না' বলতে পারলাম না। তিনদিন অভুক্ত, খুবই তৃপ্তির সঙ্গে সাধুজী প্রদত্ত আহার গ্রহণ করে ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অমরকন্টকের উদ্দেশ্যে। মনে মনে মহাদেবের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে আর্তি জানালাম —

প্রভু ! দক্ষিণা লও আমারে
দিবার আমার নাই কিছুগো,
শুধু তুমি আছ মোর ভাণ্ডারে।

আর মাত্র তিন মাইল অতিক্রম করতে পারলেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের ঈপ্সিত স্থান শঙ্কর প্রিয়

মহাতীর্থ অমরকন্টকে। মনের মণিকোঠায় ভিড় করে আসছে নানা স্মৃতি। ১৩৫৯ সালে শংকরনাথজীর সঙ্গে যে পরিক্রমার শুরু তার সমাপ্তি ঘটবে ১৩৬৫ সালের আশ্বিন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জলবিষুব সংক্রান্তির দিনে কাশীর কামরূপ মঠের দণ্ডী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। আমাদের উল্লাস দেখে কে? আমরা সমবেত কণ্ঠে 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে দ্রুত হাঁটছি।

আজ পড়ছে মনে বারেবারে
যবে তুমি ডেকেছিলে মোরে
সেদিন সুপ্ত পাষাণ-প্রতিমারে চুমি
খেলার সাথী হয়ে তোমার সনে
ছিলেম এক অজানা দেশে
আনন্দময় সুরধুনীর আকুল কলতানে
বকুল কুঁড়ির মত তোমার সুতায় গাঁথা ছিলাম আমি।
শ্যামল বনে সন্ধ্যাছায়া নামত যখন ধীরে
পাখীরা সব একই সাথে ফিরত তখন নীড়ে
চাঁদের পানে নয়ন মেলে দূর-গগনে
তোমার-আমার মিলত দুটি হিয়া।
ওগো নর্মদেশ্বর, তব শুনি ডম্বরুর স্বর
নিয়েছ যে সব হরিয়া
বনপথে এসে ছেড়ে দিয়ে কর
কোথায় লুকালে, ওগো মনোহর
রাতের আঁধারে পথের মাঝারে
একা কোথা যাই বল না।

মা নর্মদাকী জয় হো। জয় অমরকণ্ঠেশ্বর ধ্বনি দিতে দিতে কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই কখনও আঁকাবাঁকা পাকদণ্ডী, অতলস্পর্শী খাদ অতিক্রম করে কলনাদিনী পতিত পাবনী মা নর্মদার আহ্বান ধ্বনি শুনতে শুনতে পৌঁছলাম ঋষ্য পর্বতে। নর্মদার উৎসস্থলে। অনুমান করলাম বেলা বারোটা বেজেছে।

আমাদের দেখতে পেয়ে কোটিতীর্থের ঘাটের সাধুরা শিঙা, তূরী, ভেরী বাজিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ঝোলা, গাঁঠরী নামিয়ে রেখে কোটী তীর্থের মাটি স্পর্শ করে লুটিয়ে লুটিয়ে প্রণাম করলাম মা নর্মদাকে, অমরকণ্ঠেশ্বর মহাদেবকে আর বাবাকে। নর্মদামায়ীর প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত রামাধীন দ্বিবেদীজী আমাদেরকে ঘিরে পূজার আয়োজন করলেন। পুরোহিতজী পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আমাদের সকলকে কোমর পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে প্রথমে করলেন মা নর্মদার পূজা ও আরতি। তারপর প্রত্যেকের হাতে কড়াই প্রসাদের পাত্র দিয়ে নিজে শাঁখ বাজাতে লাগলেন। এরপর কর্পূর জ্বেলে দু'হাতে ঘোরাতে ইঙ্গিত করে গাইতে লাগলেন।

জয় মাঁ রেবা মাতা ভবানী। মেকল কন্যা ভব দুখ হারণী।।
জয়তু নর্মদা লোক পাবনী। ভক্তজনোঁ কী তু হী জননী।।
রেবা মাঁ কী বহতো ধারা। পাপ কাটনে কা জস আরা।।
জপো নিরন্তর মন্ত্র মহান। মাত নর্মদাকা গুণগান।।
যোগাক্ষেম কো ছোড়ো চিন্তা। মজো নিরন্তর রেবা মাতা।।

আমরা সমস্বরে উদাত্তকণ্ঠে তারই পুনরাবৃত্তি করলাম। তারপর কড়াই প্রসাদ বিসর্জন দিলাম নর্মদার জলে। 'জয় রেবা, জয় নর্মদা-শংকর' জয়ধ্বনি দিতে দিতে উঠে এলাম ঘাটে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম মা নর্মদার দিকে। আমি নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি। ভাবছি বাবার কথা। বাবা বলেছিলেন — যদি কোনদিন শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ব্রতচারণের মত নর্মদার উভয়তট পরিক্রমা করতে পারিস তবে আমি বিদেহ অবস্থাতেও শান্তি পাব। নর্মদার তটে তটে ঘুরে বেড়ালেই বুঝতে পারবি, ভারতের মন যেন এক চির তীর্থযাত্রী। সত্যসন্ধানী। নর্মদার তটে তটে তপস্যার মন নিয়ে ঘুরে বেড়ালে মা নর্মদা তোর বুকের পাত্র ভরে তুলবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ব্যায়েদনিদ্রং কুশলং স্বস্থনোনুদেদজস্রং সকলাংশ্চ বিঘ্নান্
যোগেশ্বরো বৈ সুতমঙ্গলায় পিতেতি তত্ত্বং হৃদি তর্কয়ামঃ।।

আমার বাবাই আমার কাছে সাক্ষাৎ জনার্দন। তিনিই আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করে দিয়ে আমাকে দান করেছেন পূর্ণ মনুষ্যত্ব। পিতাই পরম ধর্ম, পরম তপস্যা এবং পরম পূজনী মহাত্মাস্বরূপ।

আমার জীবনে প্রেমের ফুল একবারই ফুটেছিল, নিরন্তর সুরভি বিলিয়ে সে ফুল ঝরে গেছে বটে কিন্তু অহরহ আমার অন্তর্সত্ত্বা ও বহির্সত্ত্বাকে ব্যপ্ত করে মর্মদেশের কোরকে তিনি জেগে রয়েছেন। তাঁকে প্রণাম। তর্পণ করতে নর্মদায় নামলাম।

নর্মদার স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শিহরণ খেলে গেল। ভাবছি মা নর্মদার অনন্ত মহিমা। ছয় বৎসরের অধিককাল উভয়তটের কূলে কূলে শ্বাপদ অধ্যুষিত ঘনঘোর জঙ্গলাকীর্ণ তটে পরিক্রমা করতে করতে বরাভয়দাতা তপস্বীদের করুণাঘন প্রেমমূর্তির পুণ্য সান্নিধ্যে এসে তোমাকে উপলব্ধি করেছি। নর্মদাতটে আমি যে অনেক পেয়েছি, তাঁর অহেতুকী করুণা ভুলবার নয়। মা নর্মদাকে বড় আপন করে নিয়েছি। নর্মদা পরিক্রমায় না এলে ভারত মহিমা এভাবে শতরূপে, বহুরূপে আমার কাছে ধরা পড়ত না। দু'চোখ ভরে যা দেখে এলাম, তাতে চোখ ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পেলাম না। নর্মদা তপোভূমি, নর্মদা শিবভূমি। স্মরণাতীত কাল হতে নর্মদা জ্বেলে রেখেছেন তপস্যার জ্যোতি।

হিন্দুর নিকট মা নর্মদা হলেন — What Rome is to the Romans, what Mecca is to the Mohammadans, and what Jerusalem is to the orthodox Christians and that or even more is Narmada to the Hindus............... the home of Indian philosophy.

মা নর্মদা! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ ভূলণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করছি — পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। মা, মাগো! মহামুনি মার্কণ্ডেয় থেকে অপরাপর ঋষিবর্গরা একবাক্যে বলে গেছেন যে তুমি দিব্যরূপা, তপস্যায় সিদ্ধদায়িনী শক্তি। তুমি নিরাকার ব্রহ্মের নীরাকার রূপ। তোমার ঐ বাহ্য রূপের অন্তরালে তোমার একটা তেজোময়ী জ্যোতির্ময়ী রূপও আছে। লাখড়াকোটের জঙ্গলে আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে শুনেছি তোমাদের কণ্ঠস্বর, বন্য আদিবাসীর ছদ্মাবরণে দেখেছি তোমাদের রূপভাস। উভয়তটের মহা মহা সংকটকালে প্রত্যক্ষ করেছি তোমারই দয়া। তুমিই আমাদের চলতে শিখিয়েছ আলোর পথে তুচ্ছ করে মরণ শতবার।

রসে ভরা মাতৃস্নেহ করি আস্বাদন
মাতৃনামে ঘুচে যায় জীবন মরণ।।

আমিও উর্ধ্বাবাহু হয়ে বলছি —

ন বেদ্মি মাতর্ভবতী কথম্বিধা মমাসি মিত্রম্ সচিবা হৃদ্যত্তমা,
গুরুগুরুণাং পরমং চ দৈবতম্ ন মীয়সে ত্বং সততং মহীয়সে।।

মাগো, যতই তোমার স্নেহ দয়ার কথা চিন্তা করি, তোমার মহিমার ইয়ত্তা পাই না। তুমিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠা শুভানুধ্যায়িনী। সম্পদে বিপদে পরামর্শদাত্রী, এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠা সুহৃদ। তুমি আমার মহাগুরু, পরম দেবতাস্বরূপ। তোমার মহিমা ও মহত্ত্বের কোন সীমা পরিসীমা নাই, যতই তোমার গুণের কথা চিন্তা করি ততই তোমার উত্তরোত্তর মহীয়সী রূপ ফুটে উঠে।

তাই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় সদম্ভে ঘোষণা করছি যে, নর্মদা সত্য। তাঁর দিব্যরূপ সত্য। যে সত্য সূর্য অপেক্ষাও ভাস্বর, যে সত্যের গতি অপ্রতিরোধ্য। সত্যই তিনি রুদ্রতেজাৎ সমদ্ভুতা, মর্ত্যজনের ক্লেশহারিণী, পাপতাপমোচনকারী দয়াময়ী মা।

মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে নর্মদার দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলাম। প্রথম উপলব্ধি করলাম, কান্নায় বুক হালকা হয়, মন তৃপ্ত হয়। দেখলাম — একটি বিমল জ্যোতি প্রবাহ বয়ে চলেছে পর্বত-কন্দর ভেদ করে। সেই জ্যোতির আলোয় উভয়তটের অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের মধ্যেও আলোর আভাষ দেখা যাচ্ছে। আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি পড়ে গেলাম।

কতক্ষণ যে এই অবস্থায় ছিলাম জানি না। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল। চোখ খুলে দেখি হরানন্দজী আমার পাশে বসে রয়েছেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হরানন্দজী বললেন — একসঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে পরিক্রমা করায় আমাদের মধ্যে কেমন যেন টান জন্মে গেছে। অনেক সময় হয়ত কারণে অকারণে আপনাকে বকাবকি করেছি, তা যেন মনে রাখবেন না। আবার কবে দেখা হবে, কি হবে না জানি না।

পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে খুব কাঁদলাম। দূরে দেখি অন্য সঙ্গীরাও দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরাও কাঁদছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এমন সময় পুরোহিতজী একটি তামার রেকাবীতে নিয়ে এলেন মা নর্মদার চরণে অর্পণের জন্য অতুলনীয় মনোলোভা সুগন্ধিযুক্ত গুলবকাগুলি ফুল এবং মহাদেবের জন্য ধুতুরা ফুলের মালা।

তিনি আমাদের একে একের মায়ের চরণে ও মহাদেবের মাথায় পুষ্পার্ঘ্য চাপিয়ে সান্ধ্য আরতির ব্যবস্থা শুরু করলেন।

কোটিতীর্থের ঘাটে বসে হাতজোড় করে বললাম —

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই —
যা দেখেছি যা জেনেছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃ সমুদ্র মাঝে, যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই —
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে
পরশ যাঁরে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি, শেষ করে দিন তাই —
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে দিয়ে যাই।

আমরা যা কিছু শিখেছি, যা কিছু হৃদয়ঙ্গম করেছি, দেশ হতে যা কিছু পেয়েছি, মা জননী নর্মদা আমাদের' যা কিছু দিয়েছেন সবই আবার দেশজননীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশ দীর্ঘকাল ধরে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল সন্দেহ নাই। মা নর্মদার শুধু পূজা করলেই কাজ শেষ হবে না। তিনি যেন আবার পূর্ব গৌরবে ফিরে আসতে পারেন তার চেষ্টাও করতে হবে। তা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা যা কিছু ভাল, যা কিছু সত্য, যা কিছু শিখেছি তা আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারব, যাতে দেশ আবার গতিশীল বিশ্বের পুরোভাগে স্থান অধিকার করতে পারে। তাই বলি, আবার বলি —

প্রদীপ-জ্বালাভির্দিবসকরণীরাজনবিধিঃ।

মা নর্মদার গরিমা প্রকাশের জন্য আমি যে চেষ্টা করব তা প্রদীপের সাহায্যে সূর্যের আলো দেখাবার সমতুল্য।

সুধাসুতেশ্চন্দ্রোপল — জললবেরর্ঘ্যরচনা
ইহা চন্দ্র প্রস্তরের কিরণের দ্বারা চন্দ্রের পূজার সমতুল্য ।
স্বকীয়ৈরম্ভোভির্সলিলনিধিসৌহিত্যকরণম্'।
ইহা সমুদ্র হতে জল তুলে সেই জলে সমুদ্রের পূজার সমতুল্য।'
ত্বদীয়াভির্বাগ্‌ভিস্তব জননি বাচস্তুতিরিয়ম্'
তোমার নিকট হতে যা পেয়েছি তার দ্বারাই তোমার অর্চনা করছি।

হঠাৎ চন্দ্রালোকিত আকাশে বিদ্যুতের চমকের মত মুহূর্তের জন্য আলোর ঝলসানি দেখতে পেলাম। আমি আবার একবার প্রণাম জানালাম তাঁকে মাতারূপে, একবার প্রণাম জানালাম তাঁকে পিতারূপে। নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত উর্ধগামী একাগ্র এই প্রণাম, অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মতো দশ দিগন্তব্যাপী বিপুল এই প্রণাম। হর নর্মদে।।

**।। দক্ষিণতট পরিক্রমা সমাপ্ত ।।**

## BOOK REVIEW AT FOREIGN MAGAZINE (U.K.)
### *For Bengali Books Tapobhumi Narmada*

### The Real Life Analysis of Vedic Knowledge, June, 2006

**Mr. Sailendra Narayan Ghoshal Shastri** was the director of The Vedic Research Institute, wrote **Tapobhumi Narmada** in eight volumes. Seven volumes are published and the other remained unpublished. The author died in 1987. I have read seven volumes of this book. I was stunned to observe that this should be the best book to reveal the utmost secrets of Hindu religion, the solution of all the mysteries hidden in the Vedas, the accurate meaning of the shlokas of Veda. During the author's visit to Narmada river.

Traditionally, in the Kali Yuga, the River Narmada the substiture of Ganga as the source of all merit. Besides the "Reba Khanda" of the Skanda Purana, a huge volume of data lies compiled in **Sailendra Narayan Ghoshal's** travelogue. **Tapobhumi Narmada**, recording the amazing variety and richness of India's pantheon enshrined along both banks of hte Narmada as a deeply lived and felt religion today.

He met with some best minds who had the true knowledge of divine existence. He learned from them the methods by which a man can obtain the infinite powers if he realized his soul. This book is supposed to be the Encyclopaedia of Yoga. Yoga means addition. It never means physical exercises of any form popularized today.

You will be able to learn what true Yoga is. I have read the whole work of Swami Vivekananda and many other religious scripts. But they never revealed the secrets and thus made the Hindu religion a matter of belief and not a practical knowledge like science which can be verified at any time at any place. Tapobhumi Narmada reveals everything.

—ঃ পরিশিষ্ট ঃ—

# মনীষী চিন্তানায়ক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
## পরিচিতি

মনীষী চিন্তানায়ক সৌমেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যারাই এসেছেন তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এই বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্ব ছিল সবদিক দিয়ে মহীরুহ তুল্য। তাঁর পরিশীলিত মানসিকতা এবং পরিপাটি বচন-বিন্যাসের এমনই একটা অননুকরণীয় ভঙ্গী বা স্টাইল ছিল যা মানুষ মাত্রকেই চুম্বকের মত আকর্ষণ করত।

আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁর ভালবাসা পেয়েছিলাম। কাশী এবং কলকাতায় বহুবার আমি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি। তিনি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ হলেও, রাজনীতি আমার বিষয় নয় বলে চিঠিপত্রে বা কথাবার্তায় তিনি কখনও আমার কাছে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস এবং সমকালীন যুগলক্ষণকে নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আপন নিরিখে তুলে ধরতেন। আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার সম্পর্কের জন্য তাঁর পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আমার কলম আড়ষ্ট হচ্ছে। পাছে আমার বর্ণনার দোষে তাঁর চরিত্র-গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে।

সবাই জানেন, সৌমেন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মেছিলেন, সেটা কোনমতেই আটপৌরে পরিবার ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষা সুরুচি এবং আভিজাত্যের অগ্রদূত হিসাবে বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সন্তান সুধীন্দ্রনাথের পুত্র, সৌমেন্দ্রনাথ ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আদরের নাতি।

তাঁর জীবন কাহিনী বৈচিত্র্যে ভরা। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদের সহপাঠী। ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে ইকনমিক্সে অনার্স সহ বি.এ. পাস করে, যখন ইউরোপে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, তখন দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ইউরোপে যাওয়া বন্ধ করে গণসমুদ্রের সেই ঢেউয়ের টানে — তরুণ সৌমেন্দ্রনাথ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আয়তচক্ষু, দীর্ঘনাসা, শালপ্রাংশু মহাভুজ, সুবর্ণকান্তি ঠাকুরবাড়ীর এক তরুণ নগ্নপদে এবং নগ্নগাত্রে চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে খদ্দর বিক্রী করছেন — বাংলাদেশে সে এক অকল্পনীয় দৃশ্য। এতকাল ঠাকুরবাড়ীর বিরাট পুরুষরা ভাবের রস দিয়ে, চিন্তার বীর্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন , জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধকে জাগ্রত করেছেন, কিন্তু কেউ কখন প্রত্যক্ষভাবে পলিটিক্যাল কর্মে নেমে আসেন নি। বিদ্রোহী সৌমেন্দ্রনাথই সেই প্রচলিত ধারা ভঙ্গ করে সাধারণ জনতার সুখ-দুঃখের সামিল হলেন। তাঁর দেহে মনে যেমন ছিল প্রচণ্ড শক্তি বিচারবুদ্ধিও ছিল তেমনি তারোয়ালের মত ধারালো। তরুণ বয়সেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সাধারণ মানুষের জীবনের কেন্দ্রে ঘন অন্ধকার বিরাজমান। সাম্রাজ্যবাদীর দম্ভ এবং নিপীড়নের বিষে মানুষের জীবন কালো হয়ে গেছে। আর্ত বঞ্চিত মানুষের চোখের জলে মানুষের জীবন যখন হয়ে গেছে পোড়া মাটি, তখন ভাবের 'ললিত ক্রোড়ে' কাব্য, গান আর সংস্কৃতির নামে মধুর ভাববিলাস নিয়ে রসের জগতে সাঁতার দেওয়াটাকে তাঁর মনে হল, জীবনের ব্যভিচার। তিনি সবরকম নিষেধের ভ্রূকুটি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিলেন। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশী দেরী হল না।

রাজনীতিকে তিনি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ হতে মুক্তি পাওয়ার হাতিয়ার বলেই মনে করতেন, তার বেশী কিছু নয়। রাজনীতির নামে আমরা অহরহ যে কুলটা বৃত্তি দেখি তাকে তিনি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। তাই দেখি, তিনি যখন বুঝলেন যে সে যুগের কংগ্রেসী রাজনীতি একটা আপোষনামা বা মধ্যবিত্ত বাবুদের বৈঠকখানার আড্ডাতে পরিণত হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। তাঁর মন যখন বিপ্লবমুখীন্ Social-ism এর দিকে আকৃষ্ট তখন বাংলাদেশে কাজী নজরুল, অতুল গুপ্ত, হেমন্ত সরকার, মজফ্ফর আমেদ প্রভৃতিদের গঠিত একটি দল ছিল, তার নাম কৃষক শ্রমিক পার্টি। সৌমেন্দ্রনাথ এই পার্টিতে যোগ দিয়ে ১৯২৭ সালে এর সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন এর কিছুদিন পরেই ডিসেম্বর মাসে তিনি ইউরোপে চলে গেলেন এবং ফ্রান্স ও জার্মানি ঘুরে রাশিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানে তিনি একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে কমিন্টার্নের অধিনায়ক পলিটব্যুরোর সদস্য বুখারিনের কাছে হাতে কলমে কম্যুনিজমের পাঠ নিতে শুরু করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'লেনিন কোর্স' অর্থাৎ লেনিন শিক্ষা নিকেতনেও ভর্তি হয়েছিলেন এইভাবে স্টালিন, ট্রটস্কি, ভরোশোলভ্, মলোটভ, পেত্রভস্কি প্রভৃতি বিখ্যাত সোভিয়েট নেতাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা ও চেনার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ১৯২৮ সালে মস্কোতে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের যে ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস হয়, বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সৌমেন্দ্রনাথও সেই সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

ইউরোপ সফরকালে ফ্রান্স জার্মানী সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করাই ছিল তখন তাঁর প্রধান কাজ। ১৯২৮ সালে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হলে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের সংঘাত ঘটে। তিনি আমৃত্যু নিজেকে খাঁটি কম্যুনিষ্ট বলে দাবী করলেও ভারতে যতরকমের কম্যুনিষ্ট পার্টি আছে তাদের কাউকেই তিনি প্রকৃত কম্যুনিষ্ট বলে মনে করতেন না। ১৯৪২ সালে ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে কম্যুনিষ্টদের ন্যক্কারজনক দেশদ্রোহী ভূমিকা দেখে তিনি তিক্ত বিরক্ত হয়ে নিজেই একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি পুনরায় চলে যান ইউরোপে। ঐ সময় 'আগুন' ও 'শৃঙ্খল' নামে বিশ্ববিখ্যাত দুটি বই-এর লেখক ফরাসী মনীষী আঁরি বার্বুসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইতিমধ্যে জার্মানীতে ফ্যাসিজম্ তথা হিটলারের অভ্যুদয় ঘটেছে। মানুষের সভ্যতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিজম্ যে একটা সর্বনাশা বর্বর অভিযান, সে সম্বন্ধে তিনি সমগ্র জার্মানীতে আগুনের ফুলকির মত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ফল হল এই যে, ক্রুদ্ধ হিটলার তাঁকে মিউনিখ জেলে আটক করলেন এবং পরে জার্মানি থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। সৌমেন্দ্রনাথ চলে গেলেন ফ্রান্সে।

জাঁ-ক্রিস্তোফার লেখক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মনীষী রোঁমা-রোঁলার সঙ্গে এই সময় তাঁর অন্তরঙ্গতা জন্মে। রোঁমা-রোঁলার সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি গান্ধীবাদের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, তাঁর সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী অখণ্ডনীয় যুক্তিজাল 'With Ramain Rolland on Gandhism' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের চেয়ে তাঁর সাংস্কৃতিক সত্তাও কম ভাস্বর ছিল না। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এবং বিপিন পালের পর বোধহয় তিনিই ছিলেন শেষ বাগ্মী। ১৪টি ভাষায় কৃতবিদ্য, একাধারে সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ্ সৌম্যেন্দ্রনাথের লেখা Hitlerism of the Aryan Rule, The Hour has Struck, French Revolution, United Front of Betrayal, People's front or the front against the people, Permanent Revolution, On self determination of Nations, Communism and Fetishisn, Tactics and strategy of Revolution, রোজা লুক্সেমবার্গ, কার্ল লিবক্নেখট, সোভিয়েট রিপাব্লিক প্রভৃতি অজস্র পুস্তক পুস্তিকা ছাড়া 'রাশিয়ার কবিতা', মশাল (কবিতা), হাইনারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, Universal Heroism of Rabindranath, যাত্রী, Against the Stream, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শরৎচন্দ্র ঃ দেশ ও সমাজ, কালিদাসের কাব্যে ফুল, Israil curio curlo, রামমোহন রায় — ব্রহ্মসভা না ব্রাহ্মসমাজ, ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের গান, যুক্তিবাদ, আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা প্রভৃতি বইগুলি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ।

বিশালধী সৌম্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য যেমন ছিল অসামান্য তেমনি কর্মক্ষেত্রও ছিল বহুধা বিস্তৃত। যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ফ্যাসীবাদী যে আন্দোলন এদেশে গড়ে ওঠে কিংবা ১৯৩৮ সালে জননায়ক শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি কমিটি হয় তিনিই ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রাশিয়া সফরকালে সৌম্যেন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহযাত্রী এবং সম্পাদক। তিনি আমৃত্যু রাজনীতি করলেও তাঁর একটি সংস্কৃতি-ঋদ্ধ মন ছিল। সেই মানসিকতা এবং মনস্বীতাই তাঁকে কোনদিন তথাকথিত রাজনীতিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারেনি। 'যাত্রী' নামক তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করেছেন — 'যাকে রাজনৈতিক ব্যক্তি বলা চলে সে লোক আমি নই। সাময়িক সাফল্যের অপদেবতার পায়ে আমার আদর্শকে বলি দিতে আমি কখনও রাজী হইনি। রাজনীতির হাটে চোরাকারবারীর অন্ত নেই। যে বাড়ীতে আমি জন্মেছিলুম সেখানে এমন সব লোক আমি দেখেছি আর তাঁরা তাঁদের জীবনের ছোঁয়া দিয়ে এমন কোরে আমার মনের তার বেঁধে দিয়েছেন যে, তার সুর নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। জীবনের কোনক্ষেত্রেই পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রয়োগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'রিয়্যাল পলিটিকার' অর্থাৎ কিনা বাস্তব রাজনীতির পাটোয়ারী, তা আমি কখনও হয়ে উঠতে পারলাম না।' এই হলেন আসল সৌম্যেন্দ্রনাথ। মনের আভিজাত্য, শালীনতা, সংযম জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুচিতাবোধ এবং অত্যন্ত উচ্চকোটির মননশীলতা হল সৌম্যেন্দ্রনাথের সহজাত গুণ। অসংযমের দ্বারা, অসৌজন্যের দ্বারা, কুটিলতার দ্বারা রসকে ঘেঁটে তার তলানি দিয়ে 'ভাবুনেগিরি' করা জোড়াসাঁকো বাড়ীর ধারা ছিল না। সৌম্যেন্দ্রনাথেরও ছিল না। শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, গান ও দর্শন থেকে সামগ্রিক রস গ্রহণ করার সামর্থ্যের মধ্যেই ছিল জীবন রসিক সৌম্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

ফলে, জীবনের সকল বিষয়কে নিজস্ব নিরিখে দেখা এবং বিচার করার একটা স্বতন্ত্র ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা সেই স্বাধীন চিন্তা ও বিচার ধারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করার মত দুর্লভ সৎসাহস তাঁর ছিল। তিনি

নিজেকে কম্যুনিস্ট বলে পরিচয় দিতে ভালবাসলেও কম্যুনিজমের নামে যে কাঠামোল্লাগিরি বা regimentation of thought, তা তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাই দেখি ১৯৩১ সালে ম্যাক্সিম গর্কির মত লোকের মুখের ওপর কম্যুনিজমের দোষগুলি অত্যন্ত তেজের সঙ্গে তিক্ত ভাষায় প্রকাশ করতে তাঁর কুণ্ঠা হয়নি। তাঁর লেখা 'ত্রয়ী' হতে সেই কথোপকথন তুলে দিচ্ছি তাতে স্বাধীনতার পূজারী সৌম্যেন্দ্রনাথকে চেনা এবং বোঝা সহজ হবে ঃ—

গর্কি — রাশিয়ায় আর কি তোমার ভালো লাগেনি?

সৌম্যেন্দ্রনাথ — মানুষেব চিন্তার স্বাধীনতাকে মেরে ধরে সংকুচিত করে সরকারী মতবাদের ফ্রেমের মধ্যে বাঁধবার জন্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান নেতারা লেনিনের নামের যে মর্মান্তিক অপব্যবহার করছেন সেটা আমার মনকে খুবই পীড়া দিয়েছে। প্রত্যেকটি চিন্তা প্রত্যেকটি মতবাদের বিচার হওয়া উচিত তার নিজস্ব মূল্যে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সেই বিচারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই কেউ কিছু বলে কিংবা লেখে অমনি সে বিষয়ে লেনিন কি বলেছেন সেইটে খুঁজে বের করতে মরীয়া হয়ে লেগে পড়ে, বড়ো ক্ষুদে মাঝারি টীকাকারের দল। যদি লেখক বা বক্তা ভাগ্যক্রমে সমর্থন পায় লেনিনের লেখা থেকে তবেই সে বাঁচে, নইলে তার দুর্দশার সীমা থাকে না। এইরকম করেই স্বাধীন চিন্তার ভ্রূণ হত্যা বহু যুগ হতে করে এসেছে ধর্মের পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের ও শাস্ত্রকারের দোহাই দিয়ে। সে একই হত্যাকাণ্ড চলেছে সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনকে শাস্ত্রকার আর লেনিনের লেখাকে শাস্ত্র বানিয়ে।

গর্কি — তবুও বিচার করতে গেলে একটা কিছুতো প্রামাণ্য বলে ধরে নিতে হবে, নইলে মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে কি করে?

সৌম্যেন্দ্রনাথ — প্রামাণ্য আমি স্বীকার করি, তবে সে প্রামাণ্য আমার চিন্তাকে, আমার মননশক্তিকে খর্ব করে দেওয়ার জন্যে নয়, আমার সৃজনশক্তি সন্দীপিত করবার জন্যে। প্রামাণ্য মুগুর নয় মানুষকে ভয় দেখিয়ে হতবুদ্ধি করার জন্যে, প্রামাণ্য হচ্ছে আলো — পথ দেখাবার জন্য! আপনাকে আর আপনার সৃষ্টিকে যাচিয়ে নেবে মানুষ সেই আলোতে। তাছাড়া এটা ভুললে চলবে না যে অতীতের কত অটল সিদ্ধান্ত টলে গেছে, যা একদা অনড় বলে মনে হয়েছে তা নড়েছে, ধুলোয় মিশেছে, মানুষ নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে। মানুষের বিচার বুদ্ধিকে তার সৃজনীশক্তিকে আমি কোন প্রামাণ্যের পায়ে বলি দিতে রাজী নই। এছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার এক নতুন ধরণের পেট্রিয়টিজম্ গজিয়ে উঠেছে — সেটাও আমি বরদাস্ত করতে পারিনে।

গর্কি — কি রকম পেট্রিয়টিজম্?

সৌম্যেন্দ্রনাথ — কবিতা শিল্প থেকে খাবার পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় যা কিছু তৈরী হচ্ছে, তার মত আর দুনিয়ায় কোথাও কিছু নেই, এই উৎকট পেট্রিয়টিজম্ এর গুটিতে সোভিয়েট নাগরিকের দেহ ভরে গেছে। মস্কোয় এক রুশীয় বন্ধু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, রুশীয় রান্না কেমন লাগছে? বললুম, মন্দ নয় তবে আহামরি কিছু নয়। বন্ধু খাপ্পা হয়ে উঠলেন। সে কি! রুশীয় রান্নার মত এমন রান্না দুনিয়ায় অছে? সাহিত্য আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, সোভিয়েট যুগের রুশীয় সাহিত্যের কিছু পড়েছি কিনা। বললুম হ্যাঁ পড়েছি কিছু কিছু যেমন গ্লাডকফ্, ত্রিচিকফ্, ডিমিয়ান্ বিয়েদ্‌নি প্রভৃতি। ডিমিয়ান্ বিয়েদ্‌নির কবিতা পড়েছি শুনে বন্ধু খুশী হলেন, বললেন — চমৎকার কবিতা লেখেন বিয়েদ্‌নি, নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লেগেছে তাঁর কবিতা? কত আর মিথ্যে বলা যায়, তাই মরীয়া হয়ে বললুম, আদবেই ভাল লাগেনি বিয়েদ্‌নির কবিতা — ওগুলো কবিতাই নয় — ওগুলো ইস্তেহার, ওতে না আছে ভাব না আছে রস।' আর যায় কোথা! সেদিন তপ্তবাক্যের যে লাভাস্রোত বন্ধুর ওষ্ঠ থেকে নির্গত হলো তাতে একবারে দগ্ধ হয়ে বাড়ী ফিরলুম।

গর্কি হাসতে লাগলেন। বড় মিষ্টি লাগলো তাঁর হাসি। মানুষের প্রতি গভীর দরদ সেই হাসিতে মাখানো ছিল।

এই নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতাই ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনের মূল সুরই ছিল সংগ্রামের সুর। মানুষের অধিকার কোথাও খর্ব হচ্ছে কিংবা কেউ মানুষের জীবন নিয়ে ডিপ্লোমেসি বা রাজনীতি করছে এ তিনি আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। তাই বিশ্ব-রাজনীতির আসরে হিউম্যানিষ্ট সেজে, যারা মানবতার বুলি আওড়ায় সেইসব ঝুটা মানবতাবাদীদের উদ্দেশ্যে তাঁর সাবধান বাণী —

'Humanists without humanism beware! Millions eyes are watching you. You are on trial!' (Treacherous Marsh)

মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সৌম্যেন্দ্রনাথ জীবনপাত করে গেছেন। মানুষই ছিল তাঁর জীবন দর্শনের শেষ কথা। মানুষের বন্ধু ছিলেন তিনি।

মানুষের বন্ধু মাত্রেই আমাদের নমস্য।

৪ নং এলগিন রোড,
কোলকাতা-২০

**শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল সমীপেষু,**
**সবিনয় নিবেদন,**

আপনার কার্ড পেয়ে আমার মনে হোল যে হয়ত বা আমি পরিষ্কার করে আমার বক্তব্যটি বলতে পারিনি আগের চিঠিতে। অবতারবাদ, মূর্তিপূজা ও সমন্বয় সাধনা সম্বন্ধে আপনার মতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। পরমহংসদেবের synthetic vision সম্বন্ধে এতোই মতলবী প্রচার চলছে যে, এই সময়ে সে সম্বন্ধে বুদ্ধিদীপ্ত বিচারের খুবই প্রয়োজন ছিল। আপনি সেই কাজ করে মহৎ উপকার করেছেন। যুদ্ধের পর থেকে গুরু-পঙ্গপালদের উৎপাত এতই বেড়ে চলেছে যে বাঙালীর মগজের ফসল রাখতে দিল না এরা। সব উজাড় করে খেয়ে গেলো এরা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেন্দ্র করে যে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি দানা বেঁধে উঠেছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে কিন্তু আমার মতে এর জন্যে পরমহংসদেব দায়ী নন, দায়ী স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী। পরমহংসদেবকে নিয়ে Neo-Hinduism এর revivalism এর সূত্রপাত করেন বিবেকানন্দ। আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে স্বামীজীই বাংলাদেশের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন কালীঘাটের দিকে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যে বিচারশীলতা ও যুক্তিবাদের ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন আমাদের দেশে তার স্রোত রুদ্ধ করে দেন বিবেকানন্দ Neo-Hinduism এর বালির বাঁধ খাড়া করে।

স্বামীজী সম্পূর্ণ split personality, তাঁর উক্তিগুলি contradiction এ ভরা। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মূর্তিপূজা মিলোবার অসাধ্য প্রয়াস করেছেন। যে অলস মনগুলো রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ধাক্কায় জেগে উঠছিলো, ভিতরে ভিতরে অসোয়াস্তি বোধ করছিলো সেগুলোকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে ঘেঁটু পূজার মধ্যেও সত্য আছে। অজ্ঞানরা এই আশ্বাস পেয়ে — যতো মত ততো পথ — আবার নিশ্চিত হয়ে ঘুম্যাতো লাগলো।

পরমহংসদেবের মুখে — যতো মত ততো পথ — Universalism এর বাণী, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের গালে চড়ের নামান্তর। ওটা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সত্যের একচেটিয়া দাবীর অধিকারকে অস্বীকার করা। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে যাঁর বিশ্বাস, তাঁর পক্ষে ইসলামীয় পন্থা, খৃষ্টান পন্থা গ্রহণ খুব সহজ নয়। একটা বিরাট catholicity র পরিচয় পাই, পরমহংসদেবের মুখের 'যতো মত ততো পথ' এর মধ্যে। ওটা তাঁর পক্ষে realisation এর কথা, সত্যসন্ধানীর ব্যাকুলতার পরিচয়। কিন্তু ঐ একই কথা বিবেকানন্দ প্রভৃতির মুখে ঘোর মিথ্যে। কেননা তাঁদের মুখে এই কথাটা সম্পূর্ণ intellectual sphere এর কথা। আর intellectual sphere থেকে বলেন নি, নিছক সত্যকে পাবার ব্যাকুলতা থেকে বলেছিলেন, আর সেই ব্যাকুলতায় পৌরাণিক হিন্দুয়ানির গোঁড়ামিকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন, সেই কারণে তাঁর মুখে ঐ কথাগুলির অর্থ সম্পূর্ণ যথার্থ। মতলববাজদের মুখে কথাগুলি সম্পূর্ণ ঝুটো। বিবেকানন্দ সাংঘাতিক ক্ষতি করেছেন আমাদের। তিনি রথের যাত্রাটিকে উল্টো রথের যাত্রা করে দিয়ে চলে গেলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেছেন বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছা আছে। জানিনা এবারেও আমার কথাটা পরিষ্কার করতে পারলুম কিনা। আপনি খুবই শক্ত কাজ হাতে নিয়েছেন। এ কাজে আপনি সফল হোন। তবে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যতোটা আইডিয়ার বিরুদ্ধে বলা যায় ততোই ভালো। ইতি।

ভবদীয়
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আউধগর্বী
বারাণসী

শ্রদ্ধেয়,

আপনার পত্র আসার আগেই আমি কাশী চলে এসেছি বিশেষ কাজে। যে শক্ত কাজে হাত দেওয়া হয়েছে তারই ফলে এই গরমে কিছুদিন কাশীতে আসতে বাধ্য হলাম। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভৃতি যে অগ্রগতির রথযাত্রকে উল্টোরথের যাত্রা করে দিয়ে গেছেন, আপনার এই সুচিন্তিত অভিমত আমার অন্তরে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে।

বিবেকানন্দের split personality সম্বন্ধে আপনার সাথে আমি একমত। ইষ্টকে ধ্যান করতে গিয়ে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের দুঃখজর্জর রোগক্লিষ্ট অভাবশীর্ণ রূপটির ছবি যাঁর সামনে নাকি প্রতিভাসিত হয়ে উঠত, 'স্বজাতি নিন্দিত বিজাতি-বিজিত এই হতভাগ্য জাতটার প্রতি মমতায় যাঁর নাকি আকুলতার অন্তঃ ছিল না, তাঁকেই আবার মঠমিশনের প্রচার প্রতিষ্ঠার খাতিরে তাঁর দেশবাসীকে পীড়নকারী সেই বিদেশী ধনীদের কাছে হাত বাড়াতে দেখি, অথচ ঐ মঠ মিশনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদেরও তাঁর বিরাম ছিল না, কায়েমী স্বার্থসন্ধানীদের মতলবী প্রচারের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের দলভারীর কাজেও তিনি সহায় হয়েছিলেন। আচার-আচরণে, কথায়-বক্তৃতায় এবং উদ্দেশ্য-উপায়ের মধ্যে তাঁর পরস্পর বিরোধী মনোবৃত্তি, এই অসঙ্গতি, এই contradiction ক্ষণে ক্ষণেই ফুটে উঠেছে, জাতির এ এক চরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের পথিকৃৎ যিনি, এই কর্মনাশা সর্বনাশা যজ্ঞের প্রধান হোতা সেই সরল সত্যনিষ্ঠ নিরীহ সাধু রামকৃষ্ণকেও ইতিহাস কখনও ক্ষমা করতে পারে না এবং এইখানেই আপনার সঙ্গে আমার difference of opinion হচ্ছে। আপনি বিবেকানন্দকে যে পরিমাণে দোষী করেছেন আমি রামকৃষ্ণকেও সমভাবে দোষী বলে ভাবি। রামকৃষ্ণ সরল সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলে, সত্যলাভের জন্য ব্যাকুলতা তাঁর ছিল বলে, আপনি রামকৃষ্ণের দোষকে লঘু করে দেখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু দয়া করে ভেবে দেখুন, দেশকে ঘেঁটু পূজো আর কালীঘাট মুখো করার, আবার একই কণ্ঠে অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ববিলাস করার জগাখিঁচুড়ি শিক্ষা বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের কাছেই পেয়েছিলেন। তাই আমার মতে রামকৃষ্ণেরই দায়দায়িত্ব বেশী, বিবেকানন্দ তাঁর প্রধান সহায়, দোসরমাত্র। রামকৃষ্ণের Realisation যে perfect realisation নয়, অন্যান্য সন্ত মহাপুরুষদের উচ্চতম অধ্যাত্ম্য অনুভূতির তুলনায় যে তা নিম্নস্তরের তা আমি আমার বই-এ আলোচনা করেছি। তাঁর সত্য লাভের ব্যাকুলতাকে অনেক সময় আমার লব্ধভূমিকত্বের অভাবে মত হতে মতান্তরে ছুটে বেড়ানোর প্রয়াস বলে মনে হয়েছে।

বিবেকানন্দের split personality সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কিন্তু বিবেকানন্দ নামক ব্যক্তিটির মাঝে যে সমস্ত অফুরন্ত উপাদান ছিল তাকে তো অস্বীকার করা যায় না — অস্বীকার করা যায় না সেগুলোর অপরিমেয় সম্ভাবনাকে। 'sceptic child ' নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বৈচিত্র্যের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তাকে বিরোধে রূপান্তরিত করে অসঙ্গতিতে ভরিয়ে তোলার পেছনে মূলতঃ দায়ী কে ? ঐ প্রচণ্ড প্রাণশক্তিকে বহুদিনের পুরোনো পচা স্রোতহীন এক অপরিসর খালের কুসংস্কার আর ভ্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মোহে গতিরুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী আমরা কাকে করবো ? একদিকে নিজের প্রাণশক্তির দুর্বার গতি, তৎকালীন দেশ বিদেশের বৈপ্লবিক ভাবধারার সংঘাত আর একদিকে গুরুর সেই সবভালো ভাব, সেই পাথর পূজা বহিরাচার, ভক্তিগদগদ ভাববিলাস, 'যত মত ততো পথ' নামে বিচিত্র আপোষ — সেই Theocrasia — এই দোটানার মাঝে বিবেকানন্দ পথ হারিয়ে, নিজের জ্ঞানবিচারের মুখে পাথর চাপা দিয়ে গুরুর psychic power এর কাছে মাথা নত করেছেন। তাই বিবেকানন্দকে সমালোচনার আগে আজ রামকৃষ্ণের প্রকৃত মূল্য নিরূপনই প্রধান প্রয়োজন। খাদমিশানো খণ্ড খণ্ড সোনার টুকরো দিয়ে সুন্দর অলঙ্কার গড়া যায় আর প্রকৃত শিল্পীর কৃতিত্বও সেইখানে। সত্যকে লাভ করার জন্য রামকৃষ্ণের হয়ত

ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে তাঁর কোন সঠিক জ্ঞান না থাকায় পথে বিপথে মাথা ঠুকেছেন — তাঁর সঠিক realisation হয়নি।

রামকৃষ্ণ নাকি ভাবদৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন যে বিবেকানন্দ হলেন 'অখণ্ডমণ্ডলের দিব্যজ্যোতিঘনতনু সপ্তর্ষির অন্যতম'। বিবেকানন্দের উপর রামকৃষ্ণের সদাসতর্ক দৃষ্টিও ছিল, তাঁকে তাহলে ঠিক পথে চালিত করার চেষ্টাও তিনি সাধ্যমত অবশ্যই করেছিলেন — একথা ধরে নেওয়া যায়। কাজে কর্মে, স্থানে অস্থানে বিবেকানন্দের চোখের সামনে গুরুর মূর্তি ভেসে ওঠার, গুরুর আদেশবাণী ধ্বনিত হওয়ার অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। তা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ ব্যর্থ হলেন; জাতির কাছে, সমাজের কাছে তাঁর দান Negative মুখী হয়ে রইল। কিন্তু কেন? এটা রামকৃষ্ণের অক্ষমতা বা অজ্ঞানতা নয়? এবং তা যদি হয়, তাহলে তাঁর যে সত্যিকার কোন Spiritual Realisation ছিল না — অন্ততঃ perfect নয় — একথা স্বীকার করতেই হয়। আর যদি ধরে নিই যে তাঁর Spritual Realisation ছিল সব কিছুতেই indulgence দিয়ে — যাঁর কার্যকলাপ পরে জাতিকে negative পথে পরিচালিত করবে — তাঁর সেই 'সহস্রদলপদ্ম' নরেনের আচার আচরণ তিনি কেবল শিশুর সারল্যে চোখ বুঁজেই উপেক্ষা করে গেছেন? কিন্তু তাঁর মত 'সরল মূর্খ' মানুষ কোন motive নিয়ে এসব করে গেছেন — এ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই ব্যাকুলতা সত্ত্বেও তিনি যে সত্যলাভ করতে পারেন নি, এই আমার ধারণা। ধূলিমুষ্ঠিকে স্বর্ণমুষ্টি ভেবে তিনি আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ আমাদের ঠকিয়েছেন। সর্ব ধর্ম পরীক্ষার যে ব্যর্থ প্রহসন, সে সম্বন্ধে তিনি মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে ভাবগৌরবে মণ্ডিত করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের কানে এই 'সব ভালোর' বাণী বড়ই মধুর শুনিয়েছে। তাই প্রচার প্রতিষ্ঠার মোহে, কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কাছে, কোলকাতার 'ইংরেজী জানা বাবুদের' কাছে, অপ্রত্যাশিত শ্রদ্ধা পূজা সম্মান পেয়ে তিনি মাথা ঘুলিয়ে ফেলেছেন। তাই জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় এক common patent mixture আবিষ্কার করে গেছলেন, আর সেই দাওয়াই এর প্রশংসাপত্র পাওয়া গেল বিবেকানন্দ বিদেশে জয়ঢাক পিটিয়ে আসার পর। নিজেকে অবতার বানাবার আর পরবর্ত্তী অনুচরদের কায়েমী গদী অটুট রাখার এ এক মোক্ষম ব্যবস্থা হল। রামকৃষ্ণকে কেউ 'অবতার' বললে, 'পূর্ণ ভগবান' বললে যে তিনি খুশী হতেন এর প্রমাণ আমি আলোক-তীর্থে দিয়েছি। সর্বধর্মের সমন্বয়সাধক বলে যাঁর এত খ্যাতি সেই রামকৃষ্ণই কিন্তু আবার মধুসূদনকে বিধর্মী বলে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন; জন্মদোষে দুষ্ট বলে নিরপরাধ যুবককে দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর বসার স্থানের মাটি পর্যন্ত কোদাল দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, সর্বভূতে মাতৃমূর্ত্তি দ্রষ্টার এ কি বিচিত্র বিভ্রম! এমনতরো হাজারো অসঙ্গতিতে রামকৃষ্ণের আচার আচরণ পরিপূর্ণ। সেগুলোকে 'পরমপুরুষের' নিছক লীলা জ্ঞানে উড়িয়ে দিতে না পারলে রামকৃষ্ণকেও split personality বলে অভিহিত করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই বিবেকানন্দ intellectual sphere থেকে বলেছেন আর রামকৃষ্ণ spiritual Realisation থেকে বলেছেন বলে রামকৃষ্ণের দায়িত্ব খালাস — একথা মানা আমার পক্ষে কঠিন।

মাটি, পাথর, ঘেঁটু পূজো, বারব্রত অনুষ্ঠান, ব্রতকথা শুনে আমলকী বৃক্ষের সিদ্ধিদায়কত্ব এবং গঙ্গাজলের মোক্ষদায়িকা শক্তি সবকিছুতেই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন। বৃহস্পতিবারের বারবেলা থেকে আরম্ভ করে ত্র্যহস্পর্শ, মঘা, পুষ্কর, কবচ-মাদুলী সব কিছুতেই রামকৃষ্ণের বিশ্বাস আমরণ অটুট ছিলো — তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কাজেই একটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ বাড়ীর ছেলে পুরোহিত তন্ত্রের ভুল বিধানে তৎকালীন সমাজে অপাঙক্তেয় মাহিষ্য বাড়ীতে পূজারী হয়ে এসেছেন বা হিন্দু আচার উপেক্ষা করে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন — এগুলো, 'পৌরাণিক হিন্দুধর্মের গালে চড়ের নামান্তর' নয়, এর মধ্যে কোন catholicity নেই। উদারপ্রাণ বিশালধী সৌম্যেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক চেতনা এবং catholicity ই এগুলোতে নিজের মনের প্রতিভাস আরোপ করেছেন।

'যত মত ততো পথ' নীতি গ্রহণযোগ্য নয় — একথা আপনিও স্বীকার করেছেন। যা সত্য নয় — সাধনপথের ঊর্ধ্বতর sphere এ তা আরও বেশী স্পষ্ট করে ধরা পড়ার কথা। Lower Region এ পথ অনেকগুলো —

সেইখানেই পথ ভুল হতে পারে কিন্তু Higher spritual plane এ যেখানে পথ একটাতে এসে শেষ হয়, পরিণতি লাভ করে এক নির্বিশেষ পরমতত্ত্বে — সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে — 'হিরন্ময়ে পরে কোষে' — অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের আলোয় 'যত মত তাতো পথ' বলা আরও বেশী ভ্রান্তি। হয় লব্ধভূমিকত্বের অভাব নয়ত অভিসন্ধিমূলক রটনা।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলে রাখি ব্যক্তির সাথে বিরোধে আমারও রুচি নেই, Idea' র বিরুদ্ধেই সংগ্রাম আমার, সংগ্রাম আমার মিথ্যার বিরুদ্ধে। কিন্তু যেখানে সমাজজীবনে জাতির মানসচেতনায় idea এ চেয়ে ব্যক্তির প্রভাবই বেশী দেখি, সেখানে ব্যক্তিকে অক্ষত রেখে idea নিয়েই নাড়াচাড়া করলে তার ফল খুব বেশী effective হবে কি ? এই ব্যক্তিপূজার দেশে, ব্যক্তির প্রভাব আমাদের মনের গোপন কোণে এমনই এক তীব্র কোমল মায়া বিছিয়ে রাখে যে সেখানে হাত পড়লেই সাধারণের মন বেদনায় অধীর হয়ে ওঠে। মনে ভাবে তার শ্রদ্ধা গেলে বুঝি সেও গেল। Idea কে ভালবেসে লোকে photo পূজো করে না, photo পূজা করে ঐ idea এর আধার ব্যক্তির মোহে পড়ে। তাই সমাজজীবনের ঘূণধরা পঙ্গুদেহে সত্যিই যদি আবার নূতন করে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করতে হয় — তাহলে ঐ মূল ধরেই নাড়া দিতে হবে। Idea সহ ব্যক্তিকেও নিয়ে সমালোচনার তাই প্রয়োজন আছে। তবে আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে idea নিয়ে বিশ্লেষণ করাই সবদিক দিয়ে শোভন এবং নিরাপদ।

সমালোচনায় হয়ত বা তিক্ত ও কঠোর হয়ে পড়েছি। কিন্তু এ আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার প্রশ্ন নয়; সত্য প্রতিষ্ঠার বাধা জঞ্জাল সরাতে গেলে নির্মম হতেই হবে।

আপনার পূর্ব পূর্ব পত্রে চিন্তার গভীরতা এবং মৌলিক দৃষ্টিকোণের ইঙ্গিত ইঙ্গিত পাওয়ার পর থেকে আপনার উপর অনুযোগ জমা হচ্ছিল। দেশের জনমানসে আপনার লেখার প্রভাবও প্রচুর। তবু এতদিন এ সম্বন্ধে কিছু লেখেননি কেন ? আপনি এ সম্বন্ধে কিছু লিখবেন জেনে আশ্বস্ত হলাম।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে।

বিনীত —

শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল

৪ নং এলগিন রোড, কলিকাতা-২০

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

কাশী থেকে লেখা আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। কাজের ঘূর্ণিতে দিশেহারা হয়ে থাকি তাই উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। আপনার চিঠি পড়ে মনে হল আমি বোধ হয় আমার কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারছি না। হতেও পারে আমার নিজের মনের মধ্যে কোথাও একটা জট থেকে গেছে সেটা ছাড়াতে পারছি নে, তাই সব তালগোল পাকিয়ে গেছে, পরিষ্কার করে ধরে দিতে পারছি নে। তবুও আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে আমার ধারণা যে তিনি সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ও ভগবৎ ব্যাকুলতা ও পিপাসা তাঁর অন্তরে ছিলো অসীম। আমি যখন তাঁকে আধ্যাত্মিক লোক বলি তখন তাঁর এই নিখাদ ভগবৎ ব্যাকুলতা ও পিপাসার কথা মনে করে বলি।

যিনি উপলব্ধির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত তিনি যেমন আধ্যাত্মিক, আমার মতে যে মানুষ সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপলব্ধির জন্যে চেষ্টা করছেন তিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আত্মিক গঠন আছে। সেই আত্মিক গঠনটি যদি ধরতে পারা যায় তো সেই মানুষটিকে তখন ঠিকভাবে বোঝা যায়। সেই মূল আত্মিক মানসিক গঠনের সঙ্গে অন্য অন্য শক্তির প্রকাশও এসে মেশে, কিন্তু আসল গঠনটি এদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না, অবগুণ্ঠিত হয় না। এটার সঙ্গে তুলনা চলে রাগ রাগিনীর গঠনের। অনেকে মনে করেন প্রত্যেক রাগের একটা মূল গঠন, মূল প্রকৃতি আছে, মূল স্বর বিন্যাস আছে। তারপরে তানের মধ্যে অন্য সুরের খেলা আছে, কিন্তু তান রাগের মূল গঠনকে অতিক্রম করে না, লঙ্ঘন করে না। এই মূল স্বরবিন্যাসের দ্বারা প্রতিটি রাগ স্বতন্ত্রতা, স্বকীয়তা লাভ করে। তেমনি প্রতিটি মানুষের একটি মূল সুর আছে। পরমহংসদেবের মূল সুরটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক। যেমন স্বামী বিবেকানন্দের মূল সুর হচ্ছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সুর, যদিও পরে জ্ঞান পাঁচমিশেলিতে ঘোলাটে হয়ে গেলো, তিনি প্রজ্ঞার শিখরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেন না। পরমহংসদেব উপলব্ধির শিখরে প্রতিষ্ঠিত উদ্ভাসিত চৈতন্য পুরুষ নন। তা হলো অদ্বৈতবাদের পরে আবার কালীর উপাসনা করতে পারতেন না। সেটা কখনো সম্ভব হতো না। পিপাসাটা আন্তরিক, জ্ঞান নেই, প্রজ্ঞাতো নেই-ই। তাই এই হাতড়ে ফেরার শেষ নেই। কখনো যোগেশ্বরীর দ্বারা প্রভাবান্বিত, কখনো তোতাপুরীর দ্বারা, কখনো কেশবচন্দ্রের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত। অবিশ্যি মঠের লোকেরা এ কথা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন, কেন না তাঁরা ইতিহাসকে বিকৃত করে, সত্যের মুখে প্রচারের গোময় লেপন করে প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংসকে গুরু ও অবতার বলে মেনেছিলেন। এটি সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও দুজনেই দুজনার সঙ্গলাভে উপকৃত হয়েছিলেন। পরমহংসদেব মূর্তিপূজো থেকে সরে যাচ্ছিলেন কেশবচন্দ্রের প্রভাবে। এর প্রমাণ আছে।

যাইহোক পরমহংসদেব আধ্যাত্মিক গঠনের পুরুষ, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বৌদ্ধিক গঠনের মানুষ। আমি স্বামীজীকে আধ্যাত্মিক গঠনের মানুষ বলে মনে করি নে অর্থাৎ তাঁর মূল সুরটি আধ্যাত্মিক নয়, বুদ্ধির সুর, সেই সুরের সঙ্গে তালের কাজে আধ্যাত্মিক সুর এসে লেগেছে। পরে বুদ্ধির জায়গাতেও খাদ এসে মিশেছে। তাই অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ঘেঁটুপূজো মেলাবার অসম্ভব চেষ্টা। 'বুদ্ধদেবের দাসানুদাস' বলে নিজেকে অভিহিত করবার পর কালী সেবকের ভক্ত বলে নিজেকে প্রচার করা, রামমোহনকে এযুগের শ্রেষ্ঠপুরুষ বলার পর রামমোহনের সমস্ত ধারণার বিপরীত মতগুলিকে সজোরে (আর তাঁর জোর প্রচণ্ড !) প্রচার করা — এসব পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণাগুলিকে নিয়ে থেৎলে মেশানোর প্রয়াস বিবেকানন্দ করেছেন।

তাঁর মধ্যে দুটি খণ্ড চেতনার ঝুটোপুটি হুরুদ্দুম লেগেই আছে। তাই এতো শক্তি ব্যর্থ হল। স্বামীজী সত্য অর্থে, বিরাট অর্থে tragic পুরুষ। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে tragedy-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। জানি না, এবারেও বোঝাতে পারলুম কিনা। নানা ভাব ও চিন্তা মনের ভিতর থেকে ঠেলে বের হতে চায়। কলম তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। আমিও নাকাল তাদের হাতে।

আজ তমলুক যাচ্ছি, কাল ফিরবো। আশাকরি ভালো আছেন। আমি ভালই, তবে ক্লান্ত।

প্রীতি-নমস্কার জানবেন।

ভবদীয়

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমীপেষু,
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনি ঠিকই লিখেছেন — 'ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে স্বামীজী একজন বিরাট Tragic' পুরুষ। অথচ বলিষ্ঠ পৌরুষ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ,- আরও কতো মহৎ সম্ভাবনাই না তাঁর মধ্যে ছিলো। স্বামীজী অন্য কোন Motive নিয়ে প্রথমে রামকৃষ্ণের কাছে আসেন নি — রামকৃষ্ণকে মহাপুরুষ জ্ঞানে, নিজে পূর্ণত্ব অর্জনের জন্যই তাঁর কাছে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। আজ বড় ক্ষোভের সঙ্গে ভাবি, রামকৃষ্ণের কাছে না এলে ঐ বিরাট ব্যক্তিটির সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ, যুগচেতনা এবং সমকালীন ইতিহাস এক অখণ্ড তাৎপর্য্যে বিধৃত হয়ে থাকতে পারতো।

আমি 'সরল' বলতে একটা মুক্তপ্রাণের ঔদার্য বুঝি। Simple এবং Simpleton এ প্রভেদ অনেক। বালকের সারল্য আর বালকের মত ভান করে 'বালকামি' এ দুটোরও আমি প্রভেদ স্বীকার করি। কারও বাড়ীতে গিয়ে চোখ উল্টিয়ে শিশুর আধো আধো বুলিতে 'জিলিপি খাবো' বলা আর তার পরক্ষণেই দক্ষিণেশ্বরে ফেরার সময় — ''কিরে হৃদু ব্যাটা গাড়ীভাড়াটা দিয়েছে ত ? — এ সব ঢং এর মধ্যেও প্রভেদ আছে। গান শুনতে শুনতে উলঙ্গ হয়ে কাপড় বগলে করা আর পরক্ষণেই নবাগতদের কে কে নাসিকা বা ভ্রূকুঞ্চিত করছে, তার জন্য ক্ষুণ্ণ হওয়া — এ দুটোই কি শিশুর সারল্য? পরমহংসদেবের শিশুসুলভ সারল্য এবং 'মা মা' বলে কালীমূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ ফোটাতে গিয়ে ছায়ানট গুরুদাস ছায়াচিত্রে যে 'বালকামি' ফুটিয়ে তোলেন — তা এক অর্থে যথাযথ এবং সার্থক বটে ! সত্যলাভের জন্য এক গুরু হতে অন্য গুরুর কাছে ছোটা, প্রত্যেক গুরুর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় সাধন করে নিজেকে পূর্ণকাম ভাবা, আবার অন্য গুরু এলে তাঁর কাছে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে সাধন করতে লেগে যাওয়া, যোগেশ্বরী যখন 'অবতার' বলে প্রমাণ করলেন তখন উল্লসিত হওয়া, পরে তোতাপুরীর কাছে নিজের অপূর্ণতা বুঝতে পেরে পুনরায় infant class থেকে শুরু করা, এগুলোর মধ্যে আর যিনি যাই খুঁজে পান না কেন — আমি এই এক একটা ব্যক্তির প্রভাবে ঝড়ের মুখে কুটো পাতার মত উড়ে যাওয়াকে অস্থির চিত্ততা, এবং অত্যন্ত ভাবতারল্য বলে মনে করি। আলোক তীর্থে — একেই আমি 'লব্ধভূমিকত্বের অভাব' এবং 'Reductis ad-absurdum of all religious values and Religions Loyalties' বলে উল্লেখ করেছি।

রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক গঠনের মানুষই ছিলেন — আপনার এই অভিমত নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত —

(১) আমার মতে, সত্য লাভের ব্যাকুলতা সত্য সত্যই যদি কারও অন্তহীন এবং genuine হয় তাহলে সত্যলাভে বাধা থাকে না, সত্যসন্ধানীকে সত্যই রক্ষা করেন। কেউ যদি ধূলিমুষ্ঠিকেই স্বর্ণমুষ্ঠি ভেবে নির্বোধের মত উল্লসিত না হয় বা সাধনার মাঝপথে মান-প্রতিষ্ঠার কুহকে পড়ে 'মায়ের কাছে চাপরাশ পেয়েছি' বলে গুরু সেজে না বসেন, তা হলে সত্যলাভ তাঁর হবেই। পরমেশ্বর জানেন কোন্ জীবের হৃদয়ে আবাহনী সুর ধ্বনিত হচ্ছে। আকুলিবিকুলি থাকলে যোগাযোগ ঘটে যায়। সেই জীবন-মহাশিল্পীর দিব্য বিধানে কোন অনিয়ম বা ছন্দোপতন দেখা যায় না।

(২) আপনি যে অর্থে আধ্যাত্মিক বলেছেন তা হয়ত ঠিক, কিন্তু আমি আধ্যাত্মিক বলতে আত্মার অধিরোহন, একটা প্রজ্ঞাদীপ্ত মহাচেতন সমুত্থানকে বুঝি। অর্থাৎ আমার মতে, যাঁর আত্মিক গঠন আধ্যাত্মিক হয়, তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞাহৃত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমূহ দিব্য উপাদান Latent থাকে এবং তা এক অন্তর্গূঢ় চৈত্যশক্তির উৎসমুখী স্ফূরণে বিকশিত হয়-ই।

(৩) ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ত্রিভুবনরূপ জগদ্গুলকে কোশরূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই কোশই 'বসুধান' অর্থাৎ প্রাণিগণের কর্মফল তাতে নিহিত থাকে। জীবের অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত কর্মের যে সব অনুভূতির ছাপ পড়ে, সেইগুলির নাম সংস্কার এবং এইসব সূক্ষ্ম সংস্কারের আধারের নাম কর্মাশয় বা বসুধান। এই 'বসুধান'

থেকেই প্রত্যেকের কর্ম, আচরণ, জীবনচর্চা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, এই হল ঋষিদের অভিমত। রামকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম, স্বপ্ন-সাধনা, কুপথে বিপথে ছোটাছুটি, সাধনার নামে জড় মাটি, কাঠ, পাথরের পূজায় প্রবৃত্তি, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্ররোচনায় সানন্দে নরমাংস ভক্ষণ, কুকুর শেয়ালের এঁটো খাওয়া, সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা নারীর যোনিমন্থন, হনুমানের মত কাঁচা ফল খাওয়া এবং বিঘূর্ণিত লোচনে শাখা-প্রশাখায় লাফিয়ে বেড়ানো, নারীবেশে সেজে থাকা — (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে, সাধক ভাব) কেশব সেন ও তোতাপুরীর শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েও পুনরায় জড় মাটি কাঠপাথরের পুতুল খেলায় আসক্তি, নানা বিরুদ্ধ উক্তি, নানা হিস্টিরিক হাবভাবের প্রতি একটা Impulse — সব কিছুকে বিচার করলে বোঝা যায়, রামকৃষ্ণের constitution এ কোন আধ্যাত্মিকতা ছিল না, তাই পূর্ব জন্মের 'বসুধান' কর্মাশয় অনুযায়ীই তিনি অকাজ-কুকাজ কুপথ-বিপথের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেয়েছেন মাত্র। প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু বালকের মনে যে ধর্মের সংস্কার, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বোধ থাকে তদ্‌তিরিক্ত যদি কিছু তাঁর মধ্যে Latent থাকতো তবে তা potent হতোই — যেমন করে সবকিছু বাধা সরিয়ে ভূগর্ভ থেকেও একটি বীজ সূর্যমুখী হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

(৪) যাঁর আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক হয়, তাঁর জীবন বুদ্ধের ভাষায় 'সোমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো ব চন্দ্রিমা'— তিনি অভ্রমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীকে প্রভাসিত করেন। এই রকম জীবনে 'চরৈবেতি' মহামন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁর নিজের জীবনেও যেমন শুভ্রনিরঞ্জন সত্যের প্রকাশ ঘটে তেমনি অন্যকেও অচির ও নাস্তির জগৎ হতে সুচির ও অস্তির জগতে উপনীত হওয়ার প্রেরণা দেন।

(৫) রামকৃষ্ণের জীবনে যাইহোক একটা আকুলতা আমরা লক্ষ্য করেছি। ঐ আকুলতা স্বত্ত্বেও তবুও তিনি উপলব্ধিরই স্থির চিদ্ ভূমিতে স্থিতি লাভ করতে পারলেন না কেন? কেন তাঁর প্রভাব জাতির জীবনে Negative বা কালীঘাট মুখো হয়ে রইলো? ঋষিরা বলেছেন, Purley Spiritual Region অর্থাৎ সেই ভূমাময় অধ্যাত্মভূমি থেকে Centripetal Force এর মতো এক দুর্নিবার দিব্য আকর্ষণ সকলের জীবনকে কেন্দ্রের মুখে সদাই টানছে। যাঁর আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক হয়, সেই মহৎজীবন এক দিব্য সমজাতীয় বস্তুর চৈতন্যময় আকর্ষণে অধ্যাত্মভূমিতে লব্ধভূমিকত্ব লাভ করেন। রামকৃষ্ণের জীবনে এর ব্যতিক্রম দেখি কেন?

(৬) একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন একটি পরিপূর্ণ সুন্দর art এর মত। প্রত্যেক সত্যকার art হলো আমার মতে আত্মার প্রকাশ (Expression of the soul)। তাই প্রত্যেক মহান শিল্প জীবনপ্রদ হয় (The art that gives life)। রামকৃষ্ণের জীবনকে যদি একটা art ধরি — তাহলে এই art মোটেই জীবনপ্রদ হয়নি। আত্মিক গঠন কারও আধ্যাত্মিক হলে তার বাহ্যিক কর্মে ও সাধনাতে shadow of the soul, পরম সত্তার প্রজ্ঞাময় ছায়া, অন্তঃশ্চৈতন্যের লীলাবিলাস, একটা চিন্ময় প্রতিফলন পড়বেই। কিন্তু হায় রামকৃষ্ণের জীবন? এ জীবন শ্লথ, শিথিল, ছন্দোহীন, কতকগুলো নেতিবাচক কর্মের বিভ্রম লহর মাত্র!

(৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দয়ানন্দ, যোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গস্বামী এবং তোতাপুরী — প্রভৃতি আলোক পুরুষদের সান্নিধ্যেও গিয়েও রামকৃষ্ণ উদ্ভাসিত চৈতন্যপুরুষ হতে পারলেন না, এও এক Tragedy! একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ আর একটি প্রজ্জ্বলিত করতে পারে, কিন্তু প্রদীপে তেল না থাকলে? রামকৃষ্ণের আত্মিক গঠন আধ্যাত্মিক ছিল না বলেই অনেক অধ্যাত্মপুরুষের সান্নিধ্যে তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, দীপ জ্বললো না, হৃদয় কমল প্রস্ফুটিত হল না।-

(৮) আত্মিক গঠন যাঁদের আধ্যাত্মিক ও প্রজ্ঞাদীপ্ত হয়, সে রকম দু'চারজন আলোকসামান্য পুরুষের জীবনচর্যা সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সামনেই রয়েছে, আমরা এই ভারতেই তাঁদেরকে সহস্রদলে প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত হতে দেখেছি। সমকালীন যুগ ও সমাজের পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সে সব ফুলকে শুকিয়ে ফেলতে পারে নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কবীর নানক প্রভৃতি সাধকরা অতি সামান্য ঘরেই জন্মেছিলেন, শিক্ষা-দীক্ষা, আভিজাত্য বা ঐতিহ্য বলতে কিছুই তাঁদের ছিল না। তৎকালীন সমাজে গতিহীন আচার শৃঙ্খল অক্টোপাসের মত তাঁদেরকে নিষ্পেষণ করেছে, কিন্তু তবুও তাঁরা বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঐ সব মহাপুরুষের বজ্রসার বাণীতে

সত্য ও প্রজ্ঞা, তপস্যা ও কল্যাণের চিন্ময় প্রকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের এই পরমাসিদ্ধির প্রধান কারণ, তাদের আত্মিক গঠনটি ছিল মূলতঃ আধ্যাত্মিক। বুদ্ধদেবের জীবনেও Feudalism তথা বুর্জোয়া পরিবেশের মিলিত চাপ ছিল অনেক বেশী। যে প্রতিষ্ঠা, সুখ ও সম্মানের প্রলোভন মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে, সেই অতুল ঐশ্বর্য ও বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়েও তিনি ব্যর্থ হন নি। তাঁর আত্মিক গঠনটি প্রকৃত আধ্যাত্মিক ছিলো বলে, ঊর্দ্ধের অভীপ্সা, শ্রেয়োলাভের আকুতি তাঁকে অধীর করে ছিলো। জীবের আর্ত্ত ব্যর্থ জীবনের হাহাকার তাঁকে গৃহছাড়া করলো। কোন বাধাই তাঁর আন্তর সাধনাকে বাধা দিতে পারলো না। মায়ের অর্থাৎ Negative Power এর আক্রমণ তাঁকে আরও অদম্য, আরও সত্যলাভের জন্য উন্মুখ করে তুলেছিলো, মৃত্যুর বজ্রমুষ্ঠি হতে তিনি অমৃতের ভাণ্ড ছিনিয়ে এনেছিলেন, আপন বীর্যে তিনি বুদ্ধ হলেন। তাঁর প্রেম মৈত্রী করুণার বাণী দুর্গত পথহারাকে দিল সত্যপথের নির্দেশ।

সবাই জানেন, বটগাছের বীজ পাখীর দ্বারা চর্বিত হয়ে পাথরে পড়লে বহুদিন পরে তা অঙ্কুরিত হয়। এর কারণ কি? এর কারণ ঐ বীজের আন্তরসত্তায় এমন এক বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা থাকে যে, কোন কিছুই তার গতিকে ব্যাহত করতে পারে না, তুলা বা মূলার বীজ হলে তা শুকিয়ে যেত। রামকৃষ্ণের জীবনকে আমার বটের বীজ বলে মনে হয় নি।

মোটকথা, আমার ধারণা — সেই মহান জীবন শিল্পী যাঁদের আত্মিক গঠনকে আধ্যাত্মিক করে পাঠান — তাদের আত্মার অধিরোহণই হয়, জীবন সমুন্নতিতে শ্রেয়োলাভে বোধিলাভে তা ভাস্বর হয়ে ওঠে। নিম্নে যতই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠুক, তিনি অন্ধকারের ওপারে ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান পাবেনই। বাহিরের ঘনঘটা তাঁর অন্তরে সেই অনির্বাণ দীপ জ্যোতিকে কখনই নিভিয়ে ফেলতে পারে না।

সেইযুগেরই যুগন্ধর পুরুষ রামমোহন বিদ্যাসাগরের জীবন দেখুন — সমগ্র যুগচেতনা তাঁদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ধর্ম, সমাজচেতনা, রাষ্ট্রনীতি, সকল aspect এরই কী পরমাশ্চর্য প্রকাশ — যা কিছু কুসংস্কার, যা কিছু জাতির পক্ষে আত্মক্ষয়ী সেগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের কী দুর্জয় আপোষহীন সংগ্রাম। তাঁদের আত্মিক গঠনটি বহ্নিময় প্রজ্ঞাময় ছিলো বলেই, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক মহাবিপ্লবের সেই বহ্নিবীজ কেমন সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছিল। তাঁদের জীবনে কোন এলায়িত-তেলায়িতভাব, কোন তারল্য, কোন বিভ্রান্তি, কোন জড় উপাসনার বালাই ছিলো না। পৌরাণিক অপধর্মের ঘূর্ণিপাকে যেখানে রামকৃষ্ণ ঘূর্ণমান, সেখানে তাঁরা বহুপূর্বেই ঐসব অপধর্ম এবং সামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিবান হেনেছিলেন। তাঁরা সেইযুগের সেই উদ্যত ফণা আশীবিষকে দুরন্ত বালকের মত বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে, তার মস্তকের মণি কেড়ে নিয়েছিলেন। নিজেরা তার বিষদংশনে জর্জরিত হয়েও সেই মণি তুলে দিয়েছেন সকলের হাতে। আর সেই মণি বিচ্ছুরিত জ্যোতি পথহারা আত্মবিস্মৃত জাতিকে দিয়েছে আলোর সন্ধান। যুগধর্মের বশে, যুগোচিত প্রেরণায় এই রকম প্রতিভার বিকাশ হয়। এ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁদের আত্মিক গঠনটি প্রজ্ঞাময় ছিলো বলেই তাঁরা সেই যুগের দাবী পুরণ করতে পেরেছিলেন। কামারপুকুর আর বীরসিংহের পারিপার্শ্বিক সেখানের বংশগত, সংস্কারগত তফাৎ-ই বা কতটুকু। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষা সংস্কার ও আচারে পুষ্ট হয়েও ভগবানের স্থানে মানুষকে বসিয়ে বিদ্যাসাগরের এই যে মানুষ পূজার প্রবৃত্তি, এই যে মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সবকিছু destructive element এর বিরুদ্ধে তাঁর সেই যে বিদ্রোহ এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কী থাকতে পারে!

আর অন্যদিকে রামকৃষ্ণের জীবন দেখুন, তিনি যখন এলেন তখন রামমোহন, বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক চেষ্টায় যুগপ্রবৃত্তির সকল লক্ষণ একটা বৃহত্তর সার্থকতার পথে, ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্যসমাজের উদার বেদান্তধর্ম, সমগ্র জাতিকে 'চরৈবেতি' ও অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষা, বিদ্যসাগেরর মানবসেবা, রাজেন্দ্রলাল মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞানচর্চা, আচার্য কৃষ্ণকমলের নিরীশ্বর জ্ঞানযোগ এবং মানবপূজার মন্ত্রজপ — এতগুলির মহৎ প্রভাবও রামকৃষ্ণের জীবনে ব্যর্থ হলো। সূর্যের আলোতে ভাস্বর হয়ে উঠলেন না, সংস্কারের অন্ধকূপে তিনি আবদ্ধই রয়ে গেলেন। তখন চারিদিকে আলো — প্রচুর আলো। ঐ নির্বোধ মানুষটির প্রতি অনুকম্পা জাগে। তাঁর আলোকলাভের ব্যাকুলতা

সত্ত্বেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যেও এসে তিনি সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। তাঁর আত্মিক গঠনটি যদি আধ্যাত্মিক হত — তা হলে তিনি ঐ সব মহোত্তম ভাবধারাতে পুষ্ট হয়ে যুগচেতনাকে আত্মসাৎ করে — আন্তর আলোকে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারতেন।

তাঁর আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক ছিল না বলেই, তাঁর জীবন — অত আকুলি বিকুলি সত্ত্বেও সমুদ্রের মত বিস্তার লাভ না করে, ক্ষুদ্র পল্বলে আবদ্ধ রয়ে গেল, আলোকের সাথে সমুদ্রের সাথে মিলিত হওয়ার মুখর আবাহন — যুগের সেই আলোক কল্লোল — এই নিরীহ মানুষটির পৌরাণিক অপধর্ম্মের ক্লেদে রুদ্ধ কর্ণপটহ ভেদ করে — তাঁর প্রাণমূলে — কোন সাড়াই জাগাতে পারলো না।

আপনার সঙ্গে রামকৃষ্ণ বিষয়ে সর্বাংশে একমত হয়ে পারছি না বলে দুঃখিত। আশা করি কিছু মনে করবেন না, আপনি রামকৃষ্ণের আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক বলায় আমি যে এখানে সমালোচনা করলুম তা নয়, 'আধ্যাত্মিক' বলতে আমি যা বুঝি সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা আলোচনা করলুম মাত্র।

আপনার বিরুদ্ধে আমার অনুযোগ করার অবশ্য সম্প্রতি একটু কারণ ঘটেছে। শ্রী মণি বাগচী প্রণীত 'নিবেদিতা' নামক একটি বই-এর ভূমিকায় শেষে আপনার নামের স্বাক্ষর দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। স্তম্ভিত হওয়ার কারণ, ভূমিকাটি আগাগোড়া বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তজনোচিত প্রশস্তি — যে বিবেকানন্দকে আপনি split personality এবং রেনেসাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাতকারী বলে মনে করেন। বিবেকানন্দের বহু দুর্লভ গুণ ছিলো মানি। কিন্তু তাই বলে তিনি যা ছিলেন বা তিনি যা করেন নি, ভূমিকাটিতে আপনি তাই লিখেছেন। ভূমিকাটি শেষে আপনার স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। তাই সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করে আপনার কাছে নিবেদন — সত্যই কি আপনি ঐ ভূমিকাটি লিখেছেন? না এর মূলে গ্রন্থকারের কোন কারসাজি আছে? আমাদের দেশে সবই সম্ভব কিনা না? তাই দয়া করে পত্রোত্তরে সংশয় দূর করলে বাধিত হব।

ইতি

বিনীত

শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল

**শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল সমীপেষু**

**সবিনয় নিবেদন,**

এতোদিনে ওরি মধ্যে একটু ফুরসৎ পেয়েছি। তাই চটচট দুটি কথা আপনাকে লিখে নিই। আধ্যাত্মিক পুরুষ অর্থ যদি হয় realised পুরুষ, তাহলে সে অর্থে রামকৃষ্ণ পরমহংস আমার মতে আধ্যাত্মিক পুরুষ নন। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্যাটার্নের লোক বলতে যা বোঝায় সেটি তিনি ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। মনের গঠন আধ্যাত্মিক যাঁর তিনিই realised হবেনই এমন ধারণা আমার নয়। ব্যক্তির জীবনের কিংবা সামাজিক জীবনের process টি teleological নয়। আমি ভগবানের অস্তিত্ব মানি না। ভগবান সব process টিকে চালিয়ে চলেছেন ও ধারণা করবার কোনো যুক্তি আমি পাই নি। একটি বিশেষ কার্যকারণের ধারায় অন্য হেতু এসে তার মোড় ফিরিয়ে দেয়। এটা মানুষের অভিজ্ঞতা। তাই সত্য আপনা আপনি উপলব্ধির ঘাটে পৌঁছে দেয় এ আমি বিশ্বাস করি না। নানা কারণে, পারিপার্শ্বিকতার ঘাতপ্রতিঘাতে বানচাল হয়ে যেতে পারে সত্য সাধনা। হয়েছেও বারে বারে সেটাও দেখা গেছে। একটি মানুষ সত্য সাধনার জন্য আকুলি বিকুলি করছে সারাজীবন অথচ উপলব্ধি হল না। তার কারণ হতে পারে অজ্ঞানতা, পারিপার্শ্বিকতা, সংস্কারবদ্ধতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সারাজীবন যে সেই ব্যক্তি সত্যকে বোঝাবার ও পাবার চেষ্টায় প্রাণপাত করলো তার থেকে কি এটা প্রমাণ হয় না যে তার মানসিক ও চারিত্রিক গঠন হচ্ছে আধ্যাত্মিক ? — ঠিক যেমন একটি লোক সারাজীবন খেলাধূলা নিয়ে মেতে রইলো অথচ কোনো খেলাই ভালো করে খেলতে পারলো না, বড় খেলোয়াড় হলো না বলে, তার মানসিক গঠন খেলোয়াড়ের বলতে তা বাধে না। কোন লোক সারাজীবন গান সাধনা করেও ওস্তাদ না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার মানসিক গঠন যে গাইয়ের তাতে সন্দেহ থাকবার কোনো হেতু দেখি না। প্রাণপণ করে গানের সাধনা করলেই গাইয়ে হওয়া যায় না, তার জন্য জ্ঞান চাই, বিচার চাই, বাছাই চাই, সহজাত চাই। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও তেমনি শুধু আন্তরিকতা, ব্যাকুলতা থাকলে চলে না; জ্ঞান চাই, বিচার চাই, বাছাই চাই। এই সবের অভাবে রামকৃষ্ণ পরমহংসে সারা জীবন ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে পরম ব্যাকুলতার সঙ্গে চেষ্টা করেও উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে সব ছেড়ে ভগবৎ উপলব্ধির জন্য পাগলের মতো হাতড়ে ফিরেছেন, এটা আমার কাছে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তাঁর মানসিক গঠন ছিল spiritual কিন্তু যেহেতু তিনি realised person নন তাই তাঁর মন spiritual realisation — এর শিখর ভূমিতে চিরবসতি লাভ করতে পারে নি। মন নেমেছে, উঠেছে পারার মত।

মণি বাগচীর লেখা 'নিবেদিতা' বইটির ভূমিকাটি পড়ে আমার উপরে রাগ করলে ঠিকই করা হবে। কিন্তু ঐ ভূমিকাটির একটু ইতিহাস আছে। মণি বাগচীর অনুরোধে আমি তাঁর বইটির ভূমিকা লিখতে সম্মত হই। আমি প্রায় কুড়ি পাতার একটি ভূমিকা লিখি। ভূমিকাটিতে আমি বাংলার রেনেসাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করি, আলোচনা করি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চিন্তাধারা নিয়ে। তারপরে আমি দেখাই যে স্বামী বিবেকানন্দ, সেই বীর্যবতী চিন্তাধারার স্রোত রুদ্ধ করেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে চাঙ্গা করে তোলেন। তিনি সেই দিক থেকে দেশের ক্ষতি করেছেন। কেন তিনি তা করেন তার কারণ আমি দর্শাই। আমার মতে স্বামীজির মানসিক কাঠামো ছিল রাজনীতিজ্ঞের কাঠামো, ন্যাশানালিষ্টের কাঠামো। মূলত তিনি ধার্মিক কাঠামোর লোক ছিলেন না। তাই প্রয়োজনের খাতিরে রাজনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে এমন সব জিনিসের উপর ঝোঁক দিয়েছিলেন তিনি, যেগুলি বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব ছিলো না। তিনি হয়ে দাঁড়ালেন split personality। তাঁর শিষ্যাও গুরুর কৃপায় হলেন split personality।

এই হলো অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য। মণি বাগচীকে আমি ভূমিকাটি পড়ে শোনাই। বলি তাঁকে — যদি পছন্দ না হয় তো বলুন, এটা ছাপাবেন না তা হলে। কিন্তু আমি বদল করতে দেব না, বাদ দিতেও দেবো না। তিনি বলেন তিনি আমার সঙ্গে একমত। বদলের কোন কারণ নেই। সবটা ছাপা হবে। আমি তাঁকে পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে দিই। কপি না রেখেই দিই। কলকাতার বাইরে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি 'নিবেদিতা' বইটি রয়েছে। খুলে দেখে হতভম্ব হই। আমার সেই ভূমিকা থেকে দেড় পাতা ছাপিয়ে সব বাদ দিয়েছে দেখলুম। এ ইতরতা যে কেউ করতে পারে তা কখনো কল্পনা করি নি। তারপরে মণি বাগচীকে চিঠির পর চিঠি লিখেছি, তিনি উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। যেটুকু বের করেছে সেটুকু পড়ে যাঁরা আমার মতামত শুনেছেন তাঁরা আমাকে দু-মুখো ভাবলে তাঁদের দোষ দিতে পারি নে। এই হল এই ভূমিকার ইতিহাস। ভূমিকার কপিও রাখিনি যে সেটা ছাপাতে পারি। নির্বুদ্ধিতার দাম দিচ্ছি।

'রামমোহন ইন্‌স্টিটিউট অফ্ কালচার' রেজিস্ট্রী করেছি। এবার তার তরফ থেকে কিছু বই ছাপাবার চেষ্টা করতে হবে ও বাংলার জেলায় জেলায় তার শাখা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মেদিনীপুরের জন্য বীরেন বাবুকে লিখেছি। আপনি কবে নাগাদ এ দিকে ফিরবেন ?

আশা করি ভালো আছেন। ইতি

**ভবদীয়**

**সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর**

**শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমীপেষু,**

**শ্রদ্ধাভাজনেষু,**

আপনার দু'খানা পত্রই পেয়েছি। আপনি ভগবান মানেন না কিন্তু আমি ভগবানের অস্তিত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী। 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ' —'আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্‌বিভাতি' — জ্যোতির্যস্য সদা ভাস্বৎ সর্বেষামুত্তাবো যতঃ'— ঋষিদের এই উপলব্ধিকে একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন হেতু দেখি না।

নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে বা পূর্ববর্ত্তীদের জীবনে অভিজ্ঞতার যদি কিছু মূল্য থাকে, তাহলে যাঁরা ঐ পরম সত্যকে উপলব্ধি করে — সত্য, প্রেম, ক্ষমা, দয়া, সাম্য ও মানব সেবার বিশ্বোদার দৃষ্টি প্রসারিত করে গেলেন — তাঁদের উপলব্ধি সেই পরম উপাদেয় তত্ত্বকে ছোট করে দেখব কেন? মানুষ কেবল জীবমাত্র নয়, সে ব্রহ্মৈব নাপরঃ — মানুষের মধ্যেই infinite personality, এক Potentiality আছে, এতবড় উদার আশ্বাসের কথা, যাঁরা শুনিয়ে গেলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্য বা কম কিসে? যা বীর্য, শ্রী, প্রজ্ঞার আধার, যা আনন্দের উৎস — মূর্ত নন্দন তত্ত্ব, তাকে ভগবান বলে অভিহিত করলে দোষ কি? সত্তার গভীরে যা আত্মসংবেদ্য 'রসো বৈ সঃ', সেই মহান্ অস্তিত্বে বিশ্বাস করার মধ্যে আমি ত অগৌরবের কিছু দেখিনা।

একথা অবশ্য স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ধর্ম ও ভগবান — এই দুটি তত্ত্ব নিয়ে অনেক গ্লানি কালক্রমে জমে উঠেছে এবং তার ফলে অনেক অশান্তি, অনেক কায়েমী স্বার্থও নানা ছদ্মবেশে দানা বেঁধেছে। মানুষের সত্য শিবসুন্দরের মহান্ সত্তার বন্দনাগীতি হয়েছে মসীলিপ্ত — বুদ্ধির দোষে মানুষ ধর্ম বলতে বুঝেছে বারব্রত বহিরাচারের অনুষ্ঠানকে আর ভগবান বলতে বুঝেছে এমন একজনকে যিনি নাকি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা — তিনি স্তাবকের উপর তুষ্ট, অভক্তের উপর রুষ্ট, স্বর্গ-নরকের যেন একজন সুবেদার মাত্র। কিন্তু এত হল সংস্কারবদ্ধ অজ্ঞানীদের কথা। এ সম্বন্ধে ঋষিবাক্য কি? যাঁরা Spiritual Realisation এর ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত চৈতন্য পুরুষ, সেই সব সন্ত মহাত্মারা ভগবান বলতে এমন এক Synthetic কল্যাণ তত্ত্বকে mean করেছেন — যা মানুষকে একটা humanitarian outlook, cosmopolitic love, এক অখণ্ড প্রজ্ঞার প্রকাশে বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত ভগবদ্ বিশ্বাস মানুষকে অভীঃ মন্ত্রে করে প্রতিষ্ঠিত, তাকে 'চরৈবেতির' পথে দেয় ডাক। বাহুতে বিপুল কর্মশক্তি, সর্বত্র একই সত্তার প্রকাশ বুঝে অখণ্ড সমদৃষ্টি, হৃদয়ে প্রেম — মস্তিষ্কে প্রজ্ঞা — intense activity with intense rest — এই তো হল ভগবদ্ দৃষ্টির ফল। জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে গিরিগুম্ফা আশ্রয়, কালী কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উর্ধ্ববাহু হয়ে নর্তন কুর্দন বা পরোপজীবী হয়ে জীবন যাপন এ সব তো ভগবদ্ অনুভূতির ফল নয়, অন্ততঃ জীবনবাদী তত্ত্বজ্ঞ বৈদিক ঋষিরা এ ধরণের উদ্ভট কর্মকে কখনই ভাগবত জীবন বলতেন না। তাঁদের স্পষ্ট ঘোষণা ঃ—

অপহায় নিজং কর্ম কৃষ্ণ কৃষ্ণেতিবাদিনঃ
তে হরের্দ্বেষিণঃ পাপী ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ।

'কাজ না করে — কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে যে কাল কাটায় সে হরিদ্বেষী, পাপী'।

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতেরতঃ
কায়েন মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাবালে।। (মহাভারত শান্তিপর্ব ২৬১/৯)

'যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের সুহৃৎ, যিনি সকলের মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত তিনিই ধার্মিক।' সত্তার জাগরণ বা মহাচেতন সমুত্থানই ভগবদ্ বিশ্বাসের ফল। সত্তার এই সমুত্থানই মানুষকে একটা গোটা মানুষে পরিণত করে, সে আলোতে ঝলমল করে — জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মনীষায় মানুষের অন্তরস্থ ভগবদ্ অনুভূতিই — (যা কোন ক্রিয়া-সাপেক্ষ, ধ্যান-ধারণা সাপেক্ষ নাও হতে পারে) তাকে Totality of vision দেয়, রাজনীতি, সমাজনীতি সংস্কৃতি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে সামগ্রিক দৃষ্টির অধিকারী করে। এই হল আমার সিদ্ধান্ত।

পান ও চুন খয়েরের সংমিশ্রণে একটা chemical action এ লাল পিক্ হওয়ার মতো একটা automatic chemical action এ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, জীবজগতের জীবনধারা চলছে, চারদিকে যে একটা cosmos, একটা system, একটা harmony দেখতে পাই সে কেবল কতকগুলো বিশেষ কার্যকারণের ধারাতেই — তার মূলে কোন সচ্চিদানন্দ শক্তির খেলা নেই, একটা বিকাশ নেই, একথা ষোল আনা মেনে নেওয়ার মূলে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

কেবল কতকগুলো 'কারণ ও পারিপার্শ্বিকতার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে' কারও সত্য সাধনা 'বানচাল' হয়ে যায় না। সাধারণ মানুষের হাততালি বা আপেক্ষিক হারজিৎ নিয়ে সত্য সাধনার মূল্য যাচাই হয় না। প্রকৃত সত্য সাধকের 'অজ্ঞানতা, সংস্কারবদ্ধতা' থাকে না। সত্য সাধনা সমকালীন মানুষের দ্বারা নন্দিত বা বন্দিত না হলেও তা পরিণামে অশেষ কল্যাণ ফল প্রসব করে।

ভগবদ্ অস্তিত্বের মত আমি জন্মান্তরেও বিশ্বাসী। আত্মা ও মনের মধ্যে আমি আকাশ পাতাল তফাৎ বুঝি। জন্মজন্মান্তরের পর যে বিশেষ গঠনটিতে একটা Totality of vision জন্মে, যেমনতর প্রজ্ঞাচেতনা, কর্মপ্রেমের বিকাশ হলে সত্যের প্রকাশ ঘটে, সিদ্ধিলাভ হয়, তাকেই আমি ত আত্মিক গঠন বলি। কারও আত্মিক গঠন আধ্যাত্মিক হলে তিনি সমকালীন যুগ ও জাতির আর্ত্তি আকাঙ্খা এবং দাবী পূরণ করে মহাকল্যাণের পথে অঙ্গুলি নির্দেশ করার মত প্রতিভা, কর্মশক্তি, প্রেম ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে জন্মান। এদিক দিয়ে কারণদেহের পূর্ণ, পূর্ণতর বিকাশের উপরেই কার আত্মিক গঠন কি রকম হবে তা নির্ভর করে। কারও আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক হলে তিনি অনুভূতির আলোকজ্জ্বল শিখরভূমিতে যেতে পারেন। কোনো খেলোয়াড় বা গাইয়ের আত্মিক গঠনটি খেলোয়াড় বা গায়কের মত হলে তার প্রথম থেকেই সেইরকম tendency, mental inclination, talent এবং aptitude দেখা যাবে। তাই যে খেলোয়াড় বা গায়ক অটুট নিষ্ঠায় খেলা বা গান অনুশীলন করে গেল, পূর্ণতা বা নৈপুণ্য অর্জন করতে পারলো না, তার মানসিক গঠন খেলোয়াড়ের বা গাইয়ের হতে পারে, কিন্তু তার আত্মিক গঠনটি খেলোয়াড় বা গাইয়ের মত নিশ্চয়ই নয়। ঠিক এই রকম, যে সাধক সত্যলাভের জন্য কেবল আকুলিবিকুলি করে গেলেন, কেবল পথে বিপথে হাতড়িয়ে বেড়ানই যাঁর সার হলো, তাঁর মানসিক গঠন যাইহোক না কেন তাঁর আত্মিক গঠনটিকে সত্যসাধকের কখনই বলা যায় না। অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর খেলত খেলতে, গানের সাধনা করতে করতে অভিজ্ঞতার নিত্যসঞ্চয়ে যে বিশেষ জন্মে এসে সেটি পরিণতি লাভ করে, বিচার শক্তি, রসজ্ঞান, মাত্রাজ্ঞান এবংধীশক্তির প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়, তখুনি তার আত্মিক গঠনটিকে আমি আত্মিক বলি। এই অবস্থায় তার পারিপার্শ্বিকও অনুকূল নয়, সংঘাত এলেও ওই চিন্ময় বজ্রগঠন সে ধাক্কা সামলিয়ে ওঠে, তিনি সফল হন; এ হেন লোকের মধ্যেই যুগচেতনা রূপ নেয় ইনিই পথিকৃৎ হন। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই আমি রামকৃষ্ণের আত্মিক গঠনটিকে আধ্যাত্মিক বলতে সম্মত নই।

তবে তাঁর মানসিক গঠনটিকে ধার্মিক এবং তাঁর যাবতীয় বহিরাচার, হনুমান সেজে গাছে উঠে তথাকথিত হনুমৎ সাধনা, মেয়ে সেজে ঋতুমতী হওয়া প্রভৃতি পাগলপনাকে যদি কেউ ধর্মাচরণ বলে — বলুন। বেদ-উপনিষদের তত্ত্বদৃষ্টিতে এতে কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। আপনি পূর্বের চিঠিতে রামকৃষ্ণের 'আত্মিক গঠনটি আধ্যাত্মিক' বলে উল্লেখ করেছিলেন, মানসিক গঠনের কথা বলেন নি। হয়তো আপনি আত্মা এবং মনের মধ্যে প্রভেদ দেখেন না, কিন্তু আমি প্রভেদ দেখি বলেই আত্মিক গঠন আর মানসিক গঠনকে সমার্থক বলে ভাবতে পারছি না। আপনার সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করতে ভালো লাগে, লাভ হয় — তাই এসব কথা লিখলাম, আশাকরি আপনি কিছু মনে করবেন না।

মণি বাগচী প্রণীত 'নিবেদিতা'তে আপনার ভূমিকা রহস্য জানতে পেরে আশ্বস্ত হয়েছি। আপনাকে যতটুকু দেশের লোক বোঝেন, তাতে তাঁরা কোনদিনই আপনাকে একমুখে দু'কথা বলার 'দুমুখো' লোক বলে ভুল করবেন না। আমি প্রথম থেকেই ওটিকে মণি বাগচীর কারসাজি বলে সন্দেহ করেছিলাম। আমার মতে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ 'ইতরামির' মুখোশ খুলে দেওয়া দরকার। আপনার জীবিতকালেই যদি তা না হয়, তাহলে আপনার একথা পরে কেউ জানবে না, স্বার্থসন্ধী রামকৃষ্ণাইটদের প্রচার কৌশলে, আগামীকালে অনেকেই হয়তো আপনাকে একটি নিরীহ বিবেকানন্দ ভক্ত বলেই জানবে। যেমনভাবে 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' বইটিতে জঘন্যভাবে কেশবচন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা বিজয়কৃষ্ণের মত লোককে রামকৃষ্ণের শিষ্য বলে দেখনো হয়েছে। এ চিঠি পরে প্রকাশ করতে পারি, আগে থেকে এ অনুমতি চেয়ে রাখছি।

'রামমোহন ইনষ্টিটিউট অফ্ কালচার' স্থাপন করে আপনি একটি বৃহৎ কাজে হাত দিয়েছেন, এর দ্বারা সংস্কৃতির উজ্জীবন সম্ভব হবে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি এবং মানবসেবার ক্ষেত্রে ঐ মহামনীষীর অবদান পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়ে দেশের মানুষ লাভবান হবে। আপনার এই মহৎব্রত সার্থক হোক। ইতি।

বিনীত

শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল

# পল্লী-কবির সঙ্গে লেখকের পত্রালাপ

কবির ও আমার বহু বিচিত্র পত্রালাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের আত্মিক সম্বন্ধ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। উভয় উভয়কে আরো কাছে টেনেছে। এখানে আমার পত্রের উত্তরে কবি যে কবিতাটি লিখে পাঠান সেই উদ্ধৃত কবিতার মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্রের মধ্যে সীমার মধ্যে যথাক্রমে বড়কে মহৎকে অসীমকে দ্যোতিত করার কবির যে স্বভাবসিদ্ধ মানসিকতা তা প্রত্যক্ষ করে পাঠক-পাঠিকা তৃপ্তি পাবেন। জানি না, এই কবিতা অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা। যদি প্রকাশিত না হয়ে থাকে, সেই আশঙ্কায় এটি প্রকাশ করা কর্তব্য বলে মনে করছি।

— লেখক

দিল্লী
ডিসেম্বর, ১৯৫৮

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক সমীপেষু,
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দিল্লীতে World Religious Conference-এ যোগ দিতে এসে এখন কিছুদিন দিল্লীতেই আছি। শীঘ্রই কালিয়াড়ায় ফিরে যাব। কেন্দুলীতে জয়দেবের মেলায় সাধুদের সম্বন্ধে আমার একটি মন্তব্যে আপনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গত নভেম্বর মাসে দিল্লীতে World Religious Conferene এ জৈন আচার্য সুশীল মুনির নিয়ামকত্বে ধর্মনেতাদের যে সম্মেলন হয়ে গেল তার বিবরণ নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছেন। এই সভার উদ্বোধন করেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সভাপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ। একজন আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে ঐ সভায় সবিস্ময়ে দেখলাম, কেন্দুলীতে আমার সেই শ্রুতিকটু মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। অন্যান্য গৃহী বক্তার চেয়ে সন্ন্যাসী বক্তারাই বরং অধিকতর উৎসাহে বললেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা সত্যকার সাধন-ভজন করেন তাঁরা ছাড়া অন্যান্য সাধুদের কর্তব্য সমাজের গঠনমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা। গত বৎসর পুনাতে ৬ নং টৌডিওয়ালা রোডে ৩০শে জানুয়ারী হতে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রী গুলজারিলাল নন্দের সভাপতিত্বে The Society of Servants of God নামক সংস্থার যে প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল তাতে অন্যে পরে কা কথা। স্বয়ং সাধুবাবারাই পণ্ডিত নেহেরুর প্রস্তাবের জয়ধ্বনি করেছেন। স্বয়ং ধর্মনেতারাই যদি তপস্যার গুহা ছেড়ে লোকারণ্যে মিশে যেতে চান বা সমাজসেবা বা দেশসেবাকেই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেন, অর্থাৎ আপনার ভাষায় শালগ্রাম শিলারাই যদি বাদাম ভাঙার বা মশারীর পেরেক পোতার কাজে ব্যবহৃত হতে চান, তাহলে বুঝতে হবে এঁদের মধ্যে শতচেষ্টা করেও আপনি আর কোন 'বামাক্ষেপাকে' খুঁজে পাবেন না। বামাক্ষেপারা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছেন কিংবা বিরল হতে বিরলতর হচ্ছেন এটি বাস্তব সত্য। ইত্যাদি।

নমস্কারান্তে।

আপনার স্নেহের
শৈলেন।

জানুয়ারী, ১৯৫৯

স্নেহের বাবাজীবন,

১

সাধুদি'কে কাজে লাগাইতে হবে — সাধু কি অসাধু এ মতিগতি ?
দেশ জাতি নয় - এতে হতে পারে, জগৎ এবং জীবের ক্ষতি।
কয়লাখনিতে জন্মেছে বলে, হীরাকে পুড়িতে পোড়াতে হবে,
সপ্তরঙের রঙ্গমঞ্চে গেরুয়া কেন বা সরিয়া রবে?
চন্দন হবে ইন্ধন হতে — কর্মক্ষেত্রে স্বদলবলে —
পদ্মকে হতে হবে ফুলকপি - রাঙাপদে থাকা আর কি চলে?
অক্ষয়বট বোধিদ্রুমের তরু-দেবতার মূল্য নাহি,
ভাবরাজ্যে কি ছায়ালোকে নয়, কাঠ কুটরায় মিশানো চাহি।
হোমের হবি নাহি প্রয়োজন — হবে নাক হোম ভবিষ্যতে
ঘৃত এইবার মলম হইয়া প্রলেপ লাগাক দেহের ক্ষতে।

২

যারা নিষ্কাম, অফলাকাঙ্খী, যাহারা চাহেনা মোক্ষফলও,
শুধু শ্রীহরির প্রীতিকামীগণে বাজে কোন কাজে লাগাবে বল?
সর্বারম্ভ পরিত্যাগীরে কাজ দিতে করে শাস্ত্র মানা -
এ হবে ময়ূরপঙ্খী চালাতে গরুড় পক্ষী টানিয়া আনা।
দধিচী গড়িবে ইস্পাত নাকি? কপিল তৈয়ারী করিবে বোমা ?
ভরতকে দিয়ে ভার বহাইলে - করিবেন নাক' হরি যে ক্ষমা?
ওরা অগস্ত্য, জহ্নু, শৃঙ্গী, দুর্বাসা যার অশেষ খ্যাতি
ওরা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অষ্টাবক্র ভৃগুর জ্ঞাতি।
ও সব বামন ভিখারী হউক - সহসা চাহে যে ত্রিপাদ ভূমি,
গর্ব খর্ব করাই কর্ম - ও'দিকে তুচ্ছ করো না তুমি।

৩

উহারা অকেজো? কেজো তবে কারা ? জাতিকে ঊর্দ্ধে তুলে কে রাখে ?
জীবের জন্য অমৃতভাণ্ড সঞ্চিত করি, কে সবে ডাকে?
কাজ যাহা, তাহা তারাই তো করে - যোগ রাখে ভগবানের সাথে,
তাহারাই শুধু এক করে দেখে জগৎ এবং জগন্নাথে।
করা জপ তপ হোম আরাধনা - পরমানন্দময়ীরে ডাকা,
এ সব কর্ম কর্ম কি নয়? যা বিনা জীবন জগৎ ফাঁকা।
দিবসে রাত্রে হরিনাম করে - নামের লাগিয়া করে না কিছু
তাঁদের প্রভাব বুঝিয়া বুঝিনে - হয়ে আছি সবে এতই নীচু।
অকর্মণ্য ধন্য তাহারা - পুণ্যের পরিবেশন করে,
চুম্বকগিরি - লৌহকণিকা পতিতে উঠায়ে বক্ষে ধরে।

৪

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা চেয়ে তারা আলো দেয় অতন্দ্রিত,
করে অলক্ষ্যে পতনোত্থান জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত।
চিদাকাশে তারা রচে ছায়া পথ, যত অমৃত-যাত্রী লাগি —
ভুবন যখন ঘুমাইয়া থাকে, তারাই তখন রহে যে জাগি।
ভাব গড়িয়াছে, ভাব গড়িতেছে বিপুল প্রেরণা শক্তি ভরা,
অনাগত এক দিব্য ভুবন, কর্ম তাদের তাহাই গড়া।
মানুষের মাঝে অক্ষয় যাহা, সৃষ্টি করিছে তাঁরা যে সবি —
ধর্মরাজ্যে কর্মী তাঁহারা, শিল্পী ভাবুক ভক্ত কবি।
তাঁরা জীবন্ত তীর্থক্ষেত্র, প্রেম বিরাজিছে সর্বঘটে,
যন্ত্র স্রষ্টা না হোন তাঁহারা মন্ত্র দ্রষ্টা স্রষ্টা বটে।

৫

অপার্থিবের তারা কারবারী অকথিত বাণী তারাই কহে,
পঞ্চতপার আদেশ পালিতে পঞ্চভূতেরা দাঁড়ায়ে রহে।
কি করিতে পারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্ববিজয়ী শিল্পপতি ?
একটা অমন অকেজো মানুষ ফিরাইয়া দেয় যুগের গতি।
এটম্ বোমার চেয়ে বহুগুণে পদরেণু তার শক্তিশালী —
সে কোটি প্রাণীকে — প্রেতত্ব নয়, দেবত্ব দিতে পারে যে খালি।
সাধুরাই শুধু এ ভুবন নয় পারে ত্রিভুবনে তৃপ্তি দিতে,
ভূমি জল বায়ু, অন্তরীক্ষ পুণ্যও করিছে অলক্ষিতে।
তাঁদের ভজন তাঁদের সব আচরণ সৃষ্টি ছাড়া,
সব শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে — ডঙ্কামারা ও শঙ্কাহারা।

৬

সাধুর মধ্যে অসাধুও আছে — আগাছাও আছে শালের কাছে,
কুসুমের সাথে কাঁটা রয়ে যায় — ভস্ম বৈশ্বানরের আঁচে।
মন না রাঙায়ে বসন রাঙায়ে, অনুরাগে যারা ভবন ছাড়ে,
তাহারাও দেখি হরি-করুণার আলোকের ফাগ পেতে যে পারে।
ওরা কস্তুরী মৃগের বংশ বুঝিতে পারি নে কেন যে আসে,
সুবাসিত করে দেবমন্দির, প্রসাদী সে মৃগনাভির বাসে
সাধুর সঙ্ঘে সকলেই দাদু কবীর কি উপগুপ্ত নহে —
কিন্তু জান কি? কত বামাক্ষেপা তাঁদের মধ্যে লুকায়ে রহে?
যাঁহার কাষ্ঠপাদুকা বহাও রাজপদ চেয়ে শ্লাঘ্যতর
কি বিরাটত্ব লুকাইয়া থাকে — বোঝ না, বোঝার চেষ্টা কর।

ইতি —

শুভানাধ্যায়ী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

# বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

## পরিচিতি

**কথায়** বলে উঠন্ত বৃক্ষকে যেমন তার পত্রে জানা যায় তেমনি রাধাকুমুদের সম্ভাবনাময় জীবনের সূচনা **প্রথম থেকেই** পরিস্ফুট হয়। তিনি ছিলেন এক অভ্রংলিহ প্রতিভার অধিকারী।

বর্ধমান জেলার আমোদপুর গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮৮১ সালে হলেও তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে। পরবর্তী জীবনে ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি যেমন নানা ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন, ছাত্রজীবনেও তেমনি তিনি ছিলেন রেকর্ড সৃষ্টিকারী। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে সগৌরবে বৃত্তি সহ এন্ট্রান্স পাশ করার পর ১৯০১ সালে ডবল অনার্স সহ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে বি.এ পাশ করেন এবং ঐ সালেই একই সঙ্গে ইতিহাসে প্রথম এম. এ. ডিগ্রী ও অর্থনীতিতে কবডেন পদক লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। তার পরের বছরেই অর্থাৎ ১৯০২ সালে ইংরাজীতে দ্বিতীয়বার এম. এ. ডিগ্রী এবং ১৯০৫ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি সহ মৌয়াট স্বর্ণপদক লাভ — সেটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড। তারপর ১৯১৫ সালে তিনি লাভ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান Doctorate of Philosophy (Ph.D)।

এইবার শুরু হল তাঁর কর্মজীবন। প্রথম রিপন কলেজে কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনার পর ঋষি অরবিন্দ পরিচালিত Bengal National College-এ'হেমচন্দ্র বসু মল্লিক' অধ্যাপক রূপে তিনি যোগ দেন। পরে ক্রমে বেনারস হিন্দু বিদ্যালয়ে (১৯১৬) 'মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী' অধ্যাপক এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯১৭) প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক রূপে কাজ করার পর যোগ দিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২১)। এইখানে এসে অধ্যাপনা এবং গবেষণার বৃহত্তর সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রতিভার পূর্ণতর স্ফূর্তি ঘটে। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং শিক্ষাদানের অপূর্ব পদ্ধতির কথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশে বিদেশে। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ।

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও দেশসেবা এবং সমাজ-সেবার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে তিনি যেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি দেশে যাতে অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটে সেজন্য Co-operative Hindusthan Bank of Calcutta -র পরিচালক হিসাবেও তিনি নানা গঠনমূলক পন্থার দিক্ নির্দেশ করেন। ১৯৩৭-১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি Floud Commission এর সদস্য হিসাবে ভারত সরকারের রাজস্ব নীতিকে বাস্তব এবং কল্যাণপ্রসূ করবার প্রয়াস পান। ১৯৩৭-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় আইন সভার উচ্চতর পরিষদের (Upper House) সদস্য এবং বিরোধী পক্ষের নেতা ছিলেন। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে FAO Preparatory Commission at Washington -এ ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে অংশ গ্রহণ ছাড়াও পরে ভারতীয় লোকসভার রাষ্ট্রপরিষদের (Council of States) অন্যতম সদস্য হিসাবেও তিনি কাজ করেছিলেন। ডঃ রাধাকুমুদেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি এবং শরৎচন্দ্র ও দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সহ সভাপতি করে যে বিখ্যাত Bengal Anti-communal Award Committee গঠিত হয়, বাংলার তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীতুলসী গোস্বামীর সঙ্গে তিনিও ছিলেন সেই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। তাঁর এই জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞের জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন।

১৯২১ সাল হতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল কাজ করার পর তিনি অবসর নিলেও এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক Emeritus Professor হিসাবে বরণ করে নেন এবং সম্মানসূচক D. Litt উপাধিতে ভূষিত করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র এবং অধ্যাপকরা তাঁর অবসর নেওয়ার প্রাক্কালে ৬০ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের রচিত প্রবন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ 'ভারত-কৌমুদী' নামে একখানি জয়ন্তী পুস্তক প্রকাশ করেন। আমি মনে করি এইটিই তাঁর যোগ্য উপাদি। কৌমুদী শব্দের বাচ্যার্থ হল চন্দ্র-কিরণ বা জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাতে যেমন অন্ধকার রাত্রি আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি নিথর অন্ধকারে ঢাকা আমাদের বিস্মৃত অতীত উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে রাধাকুমুদের প্রতিভায়।

'কৌ মোদন্তে জনা যস্যাং নানাভাবৈঃ পরস্পরং।
হৃষ্টাস্তুষ্টাঃ সুখাপন্নাস্তেন সা কৌমুদী মতা॥'

এর ব্যুৎপত্তিগত এবং ভাবগত অর্থ হল, যার দ্বারা জনগণ আনন্দ পায়, গর্ব ও গৌরবে ভরে উঠে, দেশ ও নিজের মহৎ পরিচয় পেয়ে যার দ্বারা চিত্তে সুখ উৎপন্ন হয় তারই নাম - কৌমুদী। রাধাকুমুদ উভয় অর্থেই 'ভারত-কৌমুদী' সন্দেহ নাই। এটি ছিল তাঁদের আচার্য প্রণাম'। আমাদের 'রসেন্দর চিন্তামণি' নামক পুস্তক আচার্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তো, সুতেন্দ্র কর্মগুরবো গুরবস্তু এব॥

অর্থাৎ যাঁরা শিক্ষনীয় বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখাতে পারেন, তাঁরাই প্রকৃত আচার্য। এই রকমই আচার্য ছিলেন রাধাকুমুদ। তিনি ছাত্রদেরকে কিভাবে ইতিহাসের উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়, তার কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, আর কোন্‌টি বর্জনযোগ্য তাতো শেখাতেনই, তাছাড়াও একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস কিভাবে অতীতের সীমারেখা ধরে বর্তমানের পথ বেয়ে ছুটে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে একটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে পরিণতি হতে পরিণতিতে - তাও হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন।

তাই দেখা যায় আচার্যবরের এই অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা তাঁর নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য আবেদন করেন। বলা বাহুল্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একলক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় এবং পরিকল্পনামত অধ্যাপক পদটি সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে, কলিকাতা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, মহীশূর, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আন্নামালাই, বোম্বাই, ওসমানিয়া এবং মাদ্রাজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মহীশূরে অনুষ্ঠিত All India Oriental Conference, লাহোরে অনুষ্ঠিত Indian History Congress (১৯৪২), নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আয়োজিত বিক্রমাদিত্য জয়ন্তী উৎসব এবং Indian History Congress (১৯৫২), এরও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন রাধাকুমুদ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ভারতের গৌরব-গাথা সম্বন্ধে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'গাইকোয়াড় বক্তৃতা' এমনই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে বরোদা সরকার তাঁকে শ্রীসয়াজী রাও গায়কোয়াড় পুরস্কার ছাড়াও 'ইতিহাস-শিরোমণি' নামক সর্বোচ্চ উপাধি দান করেন।

আমরাও রাধাকুমুদ সম্বন্ধে বলতে পারি, তিনি এমন একজন ঐতিহাসিক 'who wrote from inner necessity and to life and chasten, not to please or drug their neighbours.' তিনি ইতিহাস লিখেছিলেন অন্তরের ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, সত্য প্রকাশের তাগিদে — নিজের দেশের পরিচয় আবিষ্কারের আনন্দে। কারও অতিস্তুতি করার জন্য নয়, কোন রাষ্ট্রনেতার অঙ্গুলি নির্দেশে কাউকে খুশী করার জন্যও নয়, কোন পারিতোষিক লাভের আশাতেও নয়, যা সত্য, যা প্রকৃত ঘটনা তার যথার্থ স্বরূপ বর্ণনাই ছিল তাঁর ইতিহাস সাধনার মূল লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি।

A History of Indian Shipping ছাড়া নিম্নলিখিত বইগুলি হল তাঁর সেই ভারত-বোধের জীবন্ত-স্বাক্ষর। যথা - 1. The Fundamental Unity of India. 2. Local Government in Ancient India. 3. Nationalism in Hindu Culture. 4. Men and thought in Ancient India. 5. Harsha. 6. Asoka. 7. Hindu Civilisation. 8. Early Indian Art. 9. Ancient Indian Education. 10. Asokan Inscriptions. 11. Chandra Gupta Mourya and his times. 12. Indian Land System, 13. Gupta Empire. 14. A new approach to the Communal Problem. 15. Akhanda Bharat. 16. The University of Nalanda and Ancient India. 17. Asoka Chakra. 18. Commemoration Volume of Vikramaditya Jayanti.

এই সঙ্গে ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার সঙ্গে The Empire of Chandra Gupta Mourya এবং ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে Data of Indian Economics নামক আরও দুইখানি বই তিনি সম্পাদনা করেছিলেন।

উপরিলিখিত বই-এর তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলেই যে কেউ লক্ষ্য করতে পারবেন যে তাঁর প্রত্যেকটি বই-ই ছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে। ভারতই ছিল তাঁর ধ্যানের ধন। ভারত-মন্ত্রেই ধ্যানস্থ হয়ে এই ঋষি ভারতের অতীত ইতিহাস মন্থন করে তার প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করে গেছেন।

এই মহামনীষীকে নমস্কার।

# শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রম্।

## পুষ্পদন্ত উবাচ

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্তুয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গণন মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥ ১

হে হর, তোমার মহিমার স্বরূপ যারা জানে না, তাদের স্তব যদি তোমার অযোগ্য হয়, তবে তোমার বিষয়ে ব্রহ্মাদির স্তব সমূহও বিফল হয়েছে ; পক্ষান্তরে নিজ বুদ্ধির সামর্থ অনুযায়ী স্তব করে যদি সকলের অনিন্দনীয় হয়, তবে তোমার স্তবের জন্য আগের এই উদ্যোগও নিন্দনীয় নয়।

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌নসয়ো-রতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥ ২

বস্তুতঃ তোমার মহিমা বাক্য ও মনের গম্য সমস্ত বিষয়ের অতীত ; বেদও যে মহিমা সম্বন্ধে শঙ্কিতভাবে তদ্ভিন্ন বস্তুর নিষেধ মুখে (নেতি নেতি বিচার দ্বারা) নির্দেশ করে সেই মহিমা কার দ্বারা স্তুত হবে কেই বা তাঁর গুণের সীমা করবে, কারই বা তা জ্ঞানের বিষয় হবে ? কিন্তু তোমার নিম্নতর অবস্থার (সাকার রূপের) প্রতি কার না মন, কার না বাক্য ধাবিত হয় ?

মধুস্ফীতা বাচঃ পরম-মমৃতং নির্ম্মিতবত-স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন-বুদ্ধির্ব্ব্যবসিতা॥ ৩

হে ব্রাহ্মণ, মাধুর্যপূর্ণ পরম অমৃতস্বরূপ (বেদ) বাক্যের রচয়িতা তোমার নিকট দেবগুরুর বাণীও কি বিস্ময়কর হতে পারে। পরন্তু হে পুরমথন, তোমার গুণ বর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা নিজের এই বাক্যকে পবিত্র করব মনে করেই এই স্তবে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়েছে।

তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষা প্রলয়কৃৎ ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমনীয়ামরমণীং বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ॥ ৪

হে বরদ, গুণের দ্বারা ত্রিধাবিভক্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দেহে ব্যাপ্ত এবং জগতের সৃষ্টি রক্ষা ও প্রলয়ে নিযুক্ত তোমার যে বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বর তাহা নিরাশ করার জন্য এই সংসারে কোন কোন মূঢ় ব্যক্তি উক্ত ঐশ্বর্যবিষয়ে অসাধ্যদের চিত্তহারী কিন্তু বস্তুতঃ অমনোহর নিম্নোক্ত কুতর্কের উত্থাপন করে।

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদানমিতি চ।
অতর্কৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ। কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥ ৫

সেই বিধাতা তাহলে কিরকম চেষ্টা দ্বারা কোন্ শরীর অবলম্বনে, কি উপায়ে, কোন আধারে, কি উপাদানে ত্রিলোক সৃষ্টি করেন ? মূঢ় ব্যক্তির এই রকম কুতর্কও তর্কাতীত ঐশ্বর্যশালী তোমাতে অবকাশ পায় না, কিন্তু উক্ত তর্ক জগতের মোহের জন্য মূঢ় ব্যক্তিকে বাচাল করে থাকে।

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা — মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরো যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে॥ ৬

সাবয়ব হয়েও পৃথিব্যাদি লোক কি উৎপত্তিশূণ্য হতে পারে ? জগতের উৎপত্তি কি জগৎকর্তার অপেক্ষা না করেও সম্ভবপর ? আর সেই কর্তা যদি স্বাধীন না হন তবে জগতের আরম্ভ কি প্রকারে হবে ? (সুতরাং তোমারই কর্তৃত্ব স্বীকার্য হলেও) হে সুরশ্রেষ্ঠ , যারা মন্দমতি তারা তোমার বিষয় সংশয়যুক্ত হয়।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগ্যং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ ৭

বেদত্রয়, সাংখ্য যোগ পশুপতিমত এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ে 'ইহাই শ্রেষ্ঠ ইহাই শুভকর' এইরূপ বুদ্ধি আছে বলেই লোকে নিজ নিজ রুচির বৈচিত্রহেতু সরল ও বক্র নানা পথ অবলম্বন করে, তথাপি নদী সকলের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি তুমিও সকল মানুষের একমাত্র গতি।

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ কপালঞ্চেতীয়ং তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবসন্দ্র-প্রণিহিতাং ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি॥ ৮

হে বরদাতা, তোমার কর্মের সহায় তমাত্র মহাবৃষভ, খট্বাঙ্গ, কুঠার, চর্ম, ভস্ম সর্প এবং নরকপাল। কিন্তু তোমার কটাক্ষে দেবতারা নিজ নিজ সমৃদ্ধিলাভ করেন। (তুমি নিস্পৃহ) কেননা, যিনি নিজ আত্মায় মগ্ন, তাঁকে বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা বিভ্রান্ত করে না।

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেহপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা॥ ৯

কেউ বলেন এ জগৎ সত্য, কেউ বলেন এ সমস্তই মিথ্যা আবার কেউ বা জগতের বিষয়কে গ্রহণ করে তার কোনটাকে সত্য কোনটাকে মিথ্যা বলেন। হে পুরমথন, আমি এই সমস্ত্য বাক্যে চমৎকৃত বলেও আমার স্তুতি করে লজ্জিত হচ্ছি না ; কারণ বাচাল ব্যক্তি সর্বদাই ধৃষ্ট হয়।

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদযদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল-মনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তি শ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি॥ ১০

হে গিরিশ, (অনন্ত জ্যোতির্লিঙ্গরূপ) তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি তোমার ঐশ্বর্যকে সযত্নে পরিমাপ করতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে গমন করেও, যদি অসমর্থ হলেও তাঁরা ভক্তিভরে স্তুতি করতে থাকলে (উক্ত ঐশ্বর্য) তাঁদের নিকট স্বয়ং প্রকটিত হয়েছিল, সুতরাং তোমার সেবা ফলবর্তী না হবে কেন?

অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং দশাস্যো যদ্‌বাহূনভৃত রণকণ্ডূপরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্॥ ১১

হে ত্রিপুরহর, রাবণ যে অনায়াসে ত্রিভুবনকে শত্রুহীন করে তৃপ্ত রণস্পৃহা বিশিষ্ট বিংশতি বাহু ধারণ করেছিল, তা সেই অচলা ভক্তির প্রভাবেই হয়েছিল, যে ভক্তিবশতঃ সে নিজ মস্তকরূপ পদ্ম সমূহের দ্বারা তোমার পাদপদ্মে অঞ্জলি সজ্জিত করেছিল।

অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবলং বলাৎ কৈলাসেহপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেহপ্যলসলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ॥ ১২

তোমারই সেবার ফলে বাহুবল লাভ করে সেই বাহুদ্বারা রাবণ যখন তোমার বাসস্থান কৈলাসে বিক্রম প্রকাশ করতে উদ্যত হন, তখন তুমি হেলায়, নিজ পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ঈষৎ চাপ সৃষ্টি করেছিলে, ফলে পাতালেও তাঁর অবস্থান দুর্ঘট হয়েছিল। খল ব্যক্তি সমৃদ্ধ হলেই কৃতোপকার বিস্মৃত হয়।

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ রবিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-র্ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ॥ ১৩

হে বরদাতা, (বলির পুত্র) বাণ যে ত্রিভুবনকে নিজ ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ করে ইন্দ্রের অতি মহতী সমৃদ্ধিকেও পরাস্ত করেছিল, তা তো তোমার পদযুগলের সেবকের পক্ষে আশ্চর্য নয়! তোমার চরণে মস্তক অবনত করলে কোন্ উন্নতি না হয়?

অকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপা-বিধেয়স্যাসীদ্‌য়স্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো-বিকারোহপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যাসনিনঃ॥ ১৪

হে ত্রিনয়ন, (সমুদ্রমন্থনে বিষ উঠলে) অসময়ে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবার ভয়ে চকিত দেবাসুরদের প্রতি কৃপাবশতঃ তুমি বিষ সংহার পান করেছিলে, সেজন্য তোমার কণ্ঠে যে নীলিমা, তাকে তোমার পক্ষে অপূর্ব শোভা হয় নি? ত্রিভুবনের ভয়বিনাশকারীর (অঙ্গ) বিকারও প্রশংসনীয়।

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
সপশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বধিষু পথ্যং পরিভবঃ॥ ১৫

হে ঈশ, যাঁর নিত্য জয়শালী বাণসমূহ দেব অসুর নরগণের বাসভূমি ত্রিলোকে নিক্ষিপ্ত হলে কখনও ব্যর্থ হয়ে ফিরে না, সেই কামদেব তোমাকে অপর দেবতার ন্যায় মনে করে মনোময় দেহ প্রাপ্ত হন। কেননা জিতেন্দ্রিয় পুরুষের প্রতি অসম্মান কখনও হিতকর হয় না।

মহী পদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্‌ভূজপরিঘ-রুগ্ন-গ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি আনু বামৈব বিভূতা।। ১৬

তুমি জগৎ রক্ষার জন্য নৃত্য করে থাক, কিন্তু তোমার পদাঘাতে মনে হয় বুঝিবা পৃথিবী তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হবে, তোমার ভুজদণ্ডের মুহুর্মুহুঃ আস্ফালনে পীড়িত গ্রহাদিখচিত অন্তরিক্ষ্য (ভূবর্লোক) সংশয়াবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তোমার চঞ্চল জটাজূটের দ্বারা স্বর্গের প্রান্তভাগ তাড়িত হওয়ায় উহাও দূরবস্থা প্রাপ্ত হয়। তোমার অতি বিহ্বলতাই বুঝি বা প্রতিকূল।

বিয়দ্‌ব্যাপী তারাগণগুণিত-ফেনোদ্‌গমরুচিঃ প্রবাহো বারাং যঃ পৃষত-লঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি- ত্যানেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ।। ১৭

আকাশব্যাপী যে জলপ্রবাহের (আনাগোনা) ফেনোদ্‌গম শোভা (তন্মধ্যস্থ) তারাগণের দ্বারা বর্ধিত হয়, সেই জলপ্রবাহ তোমার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। (অথচ) সেই বিন্দু দ্বারাই জগৎ জলধিবেষ্টিত ও সপ্তদ্বীপাকার হয়েছে। এ হতেই অনুমান করা উচিত, তোমার দিব্যবপু কিরূপ মহিমা ধারণ করে।

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণ-পাণিঃ শব ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোহয়ং ত্রিপুর-তৃণমাড়ম্বরবিধি- র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ান্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ।।১৮

ত্রিপুর রূপ একটি তৃণকে দগ্ধ করতে তোমার একি আড়ম্বর বিধান যে তখন তোমার রথ হয়েছিল পৃথিবী, সারথি ব্রহ্মা, সুমেরুপর্বত ধনু, চন্দ্র সূর্য দুই রথচক্র এবং চক্রপানি বিষ্ণু হয়েছিলেন শর। ঈশ্বরের সংকল্প কখনও পরবস্তু সাপেক্ষ নহে। (অতএব মনে হয় যে নিজের) আজ্ঞাধীন দ্রব্যের দ্বারা তিনি ক্রীড়া মাত্র করেন।

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো — র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্র-কমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাম্।। ১৯

হে ত্রিপুর হর, বিষ্ণু তোমার পদযুগলে সমগ্র কমল উপহার দিতে গিয়ে একটি কম হয়েছে দেখে যে নিজের নেত্রকমল উৎপাটন করেছিলেন, সেই ভক্তির আতিশয্যই (বিষ্ণুর সুদর্শন) চক্ররূপে পরিণত হয়েছে এবং সর্বদা ত্রিভূবন রক্ষায় নিযুক্ত আছে।

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রং ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং ক্ক কর্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধাদৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ।। ২০

যজ্ঞ নিদ্রিত (শেষ) হলেও যজ্ঞকারিগণকে ফলপ্রদানের জন্য তুমিই জাগ্রত থাক। ঈশ্বরের আরাধনা না করলে যজ্ঞধ্বংসের পর ফল কোথা হোতে আসবে? অতএব যজ্ঞ ফলদান-বিষয়ে তোমাকেই প্রতিভূ (জামিন্) জেনে লোকে শ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হয় এবং কর্মসমূহে দৃঢ়চেষ্ট হয়।

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-মৃষীণামার্ত্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ।। ২১

হে শরণদ, যে যজ্ঞে জনগণের অধিপতি ও যজ্ঞকার্যে নিপুণ প্রজাপতি দক্ষ যজমান, ঋষিগণ যাজক ও দেবগণ সদস্য — সেই যজ্ঞও যজ্ঞসম্পাদানে সমুৎসুক তোমার দ্বারাই ধ্বংস হয়েছিল, কেননা, ইহা নিশ্চিত যে শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞসমূহ যজ্ঞকর্তার নাশেরই কারণ হয়ে থাকে।

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং গতং রোহিদ্ভূতাং বিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং ত্রসন্তং তেহদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগ-ব্যাধরভসঃ।। ২২

হে নাথ, প্রজাপতি কামবশতঃ স্বীয় কন্যার প্রেমার্থী হয়ে, (ভীতা ও আত্মগোপন জন্য) মৃগরূপ-ধারিণী তার সঙ্গে মৃগরূপ ধারণ করে বলপূর্বক মিলিত হলে, তোমার বাণে ব্যথিত হয়ে তিনি আকাশে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও ধুনষ্পাণি মৃগব্যাধরূপী তোমার প্রতাপ অদ্যাপি তাঁকে ত্যাগ করে নি।

স্বলাবন্যাশংসা-ধৃত-ধনুষমহ্নায় তৃণবৎ পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্টা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরতদেহার্দ্ধ ঘটনা-দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়।। ২৩

হে পুরমথন, হে জিতেন্দ্রিয়, পার্বতীর সৌন্দর্যে ভরসা করে (ঐ সৌন্দর্যে মহাদেবকে মুগ্ধ করব মনে করে) যখন কামদেব ধনু ধারণ করেন তখন দেবী পার্বতী নিজ সম্মুখেই তাকে তৃণবৎ দগ্ধ হতে দেখেও যদি তোমার দেহার্ধধারিণী হবার গর্বে তোমাকে স্ত্রৈণ মনে করে থাকেন, তবে হে বরদ, অহো! যুবতীরা বস্তুতঃই বড় নির্বোধ।

শ্মশানেষ্বাক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং তথাপি স্মর্তৄ ণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি॥ ২৪

হে স্মরহর, শ্মশানে তোমার ক্রীড়া, পিশাচরা তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার অনুলেপ, নরকপাল তোমার মালা — তোমার আচরণ (বাহ্যতঃ) এইরকমই অপবিত্র। কিন্তু হে বরদ, তথাপিও তুমি তোমার স্মরণকারীর প্রতি পরমমঙ্গলস্বরূপ।

মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান॥ ২৫

যমাদিযুক্ত যোগিগণ শাস্ত্রানুযায়ী প্রাণায়াম সহায়ে প্রত্যগাত্মাতে মনকে সমাহিত করে পুলকিত শরীরে ও আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে যে অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় তত্ত্ব দর্শন পূর্বক অমৃতময়হ্রদে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় দিব্য আনন্দ পেয়ে থাকেন, তা অবশ্যই তুমিই।

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমপি পবনস্ত্বং হুতবহ- স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতু গিরং ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি॥ ২৬

'তুমি সূর্য, তুমি চন্দ্র, তুমি পবন, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি আকাশ, তুমিই পৃথিবী এবং তুমিই আত্মা' — পরিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তোমার সম্বন্ধে এই রকম সসীম বাক্য প্রয়োগ করতে থাকুন, আমরা কিন্তু এ জগতে এমন কোন তত্ত্ব জানি না যা তুমি নও।

ত্রয়ী তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-নকারাদ্যৈর্বর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতিঃ।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥ ২৭

হে শরণদ, ওম্ এই পদটি অকারাদি তিন বর্ণের দ্বারা তিন বেদ, তিন অবস্থা, ত্রিভুবন ও তিন দেবতাকে প্রতিপাদন করতঃ সূক্ষ্মধ্বনি দ্বারা তোমার বিকারাতীত তুরীয় অবস্থাকে প্রতিপাদন পূর্বক এক ও বহুরূপে বর্তমান তোমারই স্তুতি করে থাকে।

ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ মহাং স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।
অমুষ্মিন প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে॥ ২৮

হে দেব, ভব শর্ব রুদ্র পশুপতি, উগ্র, মহাদেব ভীম ও ঈশান' এই যে তোমার আটটি নাম এদের প্রত্যেকটির অর্থ প্রকাশের জন্য বেদও সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট। আমি কায়মনোবাক্যে সেই আনন্দরূপা ও অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ তোমাকে নমস্কার জানাই।

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দেব দবিষ্ঠায় চ নমো নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমতি সর্ব্বায় চ নমঃ॥ ২৯

হে প্রিয় দেব, (ভক্তের পক্ষে) নিকটতম তোমাকে নমস্কার, (অভক্তের পক্ষে) দূরতম তোমাকে নমস্কার। হে স্মরহর, (নির্গুণরূপে) সূক্ষতম তোমাকে নমস্কার (সগুণরূপে) স্থূলতম তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিনয়ন, বৃদ্ধতম তোমাকে নমস্কার, তরুণতম তোমাকে নমস্কার। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্বরূপে বর্তমান আবার সর্বাতীতরূপে বর্তমান তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ॥ ৩০

বিশ্বসৃষ্টির জন্য রজোগুণের উৎকর্ষযুক্ত ব্রহ্মারূপী তোমাকে নমস্কার, বিশ্বসংহারের জন্য তমোগুণের উদ্রেকযুক্ত পুররূপী তোমাকে নমস্কার, লোকপালনার্থ সত্ত্বোৎকর্ষযুক্ত বিষ্ণুরূপী তোমাকে নমস্কার, ত্রিগুণাতীত জ্যোতির্ময়পদপ্রদাতা শিবরূপী তোমাকে নমস্কার।

কৃশপরিণতি-চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক্ব চেদং ক্ব চ তব গুণসীমোল্লাঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্ বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্॥ ৩১

হে বরদ, ক্লেশসমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট আমার এই সসীম বুদ্ধিই বা কোথায় আর তোমার অসীম গুণময়ী নিত্যা বিভূতিই বা কোথায়? এই ভাবনায় ভীত আমাকে একমাত্র ভক্তিই নির্ভীক করে তোমার পদযুগলে স্তুতিরূপ পুষ্পোপহার অর্পণ করলো।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জ্বলং সিন্ধুপাত্রং সুর-তরুবর-শাখা লেখনী পত্রমূর্ব্বী।
লিখিত যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ ৩২

নীল পর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসীপাত্র হয়, পারিজাতবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি কলম হয়; পৃথিবী যদি লিখবার পত্র হয় আর এই সমস্ত বস্তু নিয়ে সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে লিখতে থাকেন তথাপি হে ঈশ্বর তোমার গুণসমূহকেও ইয়ত্তা হতে পারে না॥

অসুর-সুর-মুনীন্দ্রৈরর্চ্চিতস্যেন্দুমৌলে-র্গ্রথিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পাদন্তাভিধানো রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার॥ ৩৩

যে চন্দ্রশেখর, সুর অসুর ও মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত, যাঁর গুণমহিমা বেদাদিতে কীর্তিত হয়েছে এবং যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ ঈশ্বর — তাঁরই এই হৃদয়গ্রাহী স্তোত্র পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব দীর্ঘ ছন্দে রচনা করেছেন।

অহরহরনবদ্যং ধূর্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাহত্র প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান কীর্ত্তিমাংশ্চ॥ ৩৪

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে মহাদেবের এই পবিত্র স্তব পরম ভক্তিসহকারে পাঠ করে, সে শিবলোকে রুদ্রতুল্য হয় এবং ইহলোকে প্রচুর ধন, আয়ু ও পুত্র লাভ করে এবং যশস্বী হয়॥

কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ শিশুশশধরমৌলের্দ্দেবদেবস্য দাসঃ।
স গুরুনিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥ ৩৫

মস্তকে চন্দ্রকলাধারী মহাদেবের দাস, পুষ্পদন্ত নামক প্রসিদ্ধ গন্ধর্বরাজ মহাদেবের রোষে নিজ মহিমা হতে বিভ্রষ্ট হয়ে, অতি মনোহর এই মহিম্নঃ স্তুতি রচনা করেছিলেন।

সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্॥ ৩৬

শ্রেষ্ঠদেব ও মুনিগণের পূজিত এবং স্বর্গ ও মুক্তির মুখ্য কারণ এই পুষ্পদন্ত বিরচিত অমোঘস্তব, যে বদ্ধাঞ্জলি ও একাগ্রচিত্ত হয়ে পাঠ করে, সে কিন্নরগণের দ্বারা স্তুত হয়ে শিবসমীপে গমন করে।

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্র নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥ ৩৭

শিব হতে শ্রেষ্ঠ দেবতা, মহিম্নঃ হতে শ্রেষ্ঠ স্তব, অঘোর মন্ত্র হতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং গুরু হতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই।

দীক্ষাদানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যোগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৩৮

মন্ত্রগ্রহণ, দান, তপস্যা, তীর্থসেবা, শাস্ত্রজ্ঞান ও যাগাদিকর্ম মহিম্নঃ স্তব পাঠের ষোড়শাংসের একাংশেরও তুল্য নহে।

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজ, নির্গতেন, স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন, সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্ম্মহেশঃ॥ ৩৯

শ্রীপুষ্পদন্তের মুখপদ্ম হতে নিঃসৃত, পাপবিনাশক, মহাদেবের এই প্রিয় স্তোত্র কণ্ঠস্থ করলে, পাঠ করলে কিংবা গৃহে রাখলে ভূতপতি মহাদেব অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হন॥

ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ।
অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীয়তাং চ সদাশিবঃ॥ ৪০

উপরিউক্ত স্তবরূপ আরাধনা মহাদেবের বাঙ্ময়ী পূজা — ইহা তাঁরই শ্রীচরণে অর্পন করা হল, দেবেশ সদাশিব আমার প্রতি প্রীত হোন।

আসমাপ্তমিদং স্তোত্রং পুণ্যং গন্ধর্ব ভাষিতং
অনৌপম্যং মনোহারি শিবমীশ্বরকনিম্॥ ৪১

গন্ধর্বের উচ্চারিত এই স্তবটি আদ্যন্ত পবিত্র, উপমাবিহীন, মনোরম, মঙ্গলপ্রদ এবং ঈশ্বরের বর্ণনায় পূর্ণ॥

## শ্রীপুষ্পদন্ত-প্রণীতং শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্॥

**পরিক্রমা সমাপন্তে আরো পাঁচ দিন অমরকন্টকে থেকে দেওয়ানাজীর আজ্ঞানুসারে আমি উপরোক্ত স্তোত্রম অনুবাদ করে নর্মদায় বিসর্জন দিই।**
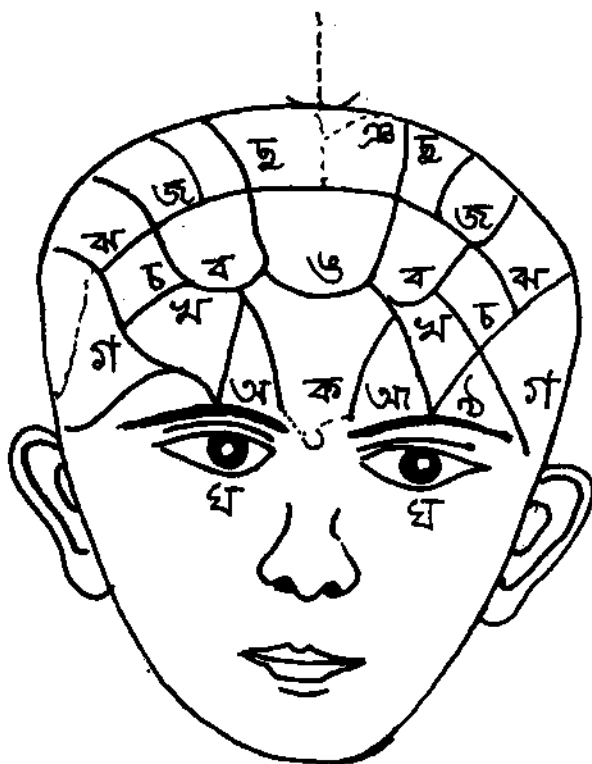
১। মাথার সম্মুখ দৃশ্য

ক — স্মৃতি। বিগত সময়ের কার্যাবলি স্মরণ। ইহারই পেছনে আজ্ঞাচক্র - যোগীর যোগহৃদয়।

অ — আদেশ বা আজ্ঞার কৃত্তিস্থান। নানা প্রকার বিধিব্যবস্থা হিসাব বিবেচনার স্থান।

খ — সময় জ্ঞান। কত বেলা কত রাত্রি ইত্যাদি সমুদয় ভাব-জ্ঞানের কেন্দ্র।

গ — শব্দ ও সুরজ্ঞান। গীতমুদ্রার ক্ষেত্র। ওস্তাদ-শিল্পী এই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গানের সময় কান ও কপালে হাত দেন বা বাদ্যযন্ত্রের ঠেস দেন।

ঘ — মনের পরিস্ফূরণ শক্তি। ভাষা জ্ঞানের স্থান।

ঙ — বুদ্ধির স্বরূপ কেন্দ্র। বিচার-বিশ্লেষণের ও গবেষণার কেন্দ্র। উপস্থিত বুদ্ধি। প্রতিভার স্থান।

চ — হাস্য উদ্দীপনা প্রেরণা রসিকতা।

ছ — অনুকরণ করার শক্তি কেন্দ্র।

জ — অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞান। দৈববাণী ও অনুভূতির সাড়া প্রবণ কেন্দ্র।

ঝ — কল্পনাশক্তি / কবিত্ব / নব নব ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান।

ঞ — সেবা ও সহানুভূতি দয়া প্রেম প্রভৃতি মহৎ বৃত্তির স্থান।
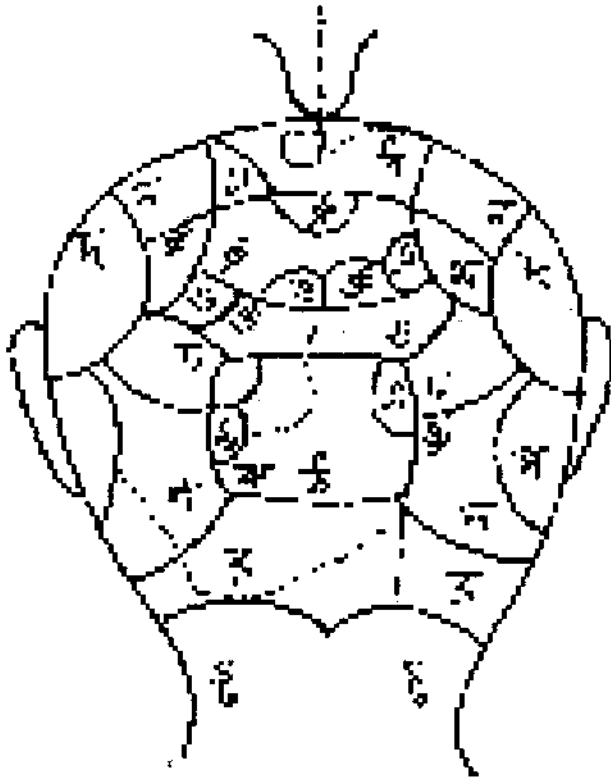
২। মাথার পশ্চাৎ দৃশ্য

ট — কামোৎপত্তির কেন্দ্র। স্ত্রীপুরুষের ভোগানন্দ স্থান।

ঠ — অপত্য স্নেহের মুলকেন্দ্র। এইজন্য স্ত্রীলোকদের এই স্থান প্রায়ই উঁচু হয়। ভরাট নয়।

ড — মনের একাগ্রতার কেন্দ্র।

ঢ — প্রেমপ্রীতি জীবে দয়া ইত্যাদির স্থান।

ণ — 'ঢ' এর বিপরীত বৃত্তিস্থল অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা পরশ্রীকাতরতার centre.

ত — অভিমান ও অহংকারের কেন্দ্র। এইজন্য মদগর্বী ব্যক্তির মাথাও সাধারণতঃ পেছনদিকে কিছুটা হেলানো দেখা যায়।

থ — অভিমতের ভূমি। সকল বিষয়ে পছন্দ অপছন্দের স্থান।

দ — ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং রসালো ভাববিন্যাসের ক্ষেত্র।

ধ — ধর্মস্থান। ধর্মবিশ্বাস নিষ্ঠা ও একাগ্রবৃত্তির ভূমি।

ন — মানসিক বল ও দৃঢ়চিন্তার centre.

প — গুহ্যভাবশীলতা, গোপন ও গহন রহস্যজ্ঞানের বৃত্তিস্থল। ছলনা মিথ্যাচার ও প্রতারণার বৃত্তি এখানেই জন্ম নেয়।

৩। মাথার পার্শ্ব দৃশ্য

ফ — আশা-ভরসার কেন্দ্র।

ব — কারণাত্মক ও সংশয়াত্মক বিবিধ বিষয়ের বুদ্ধিকেন্দ্র।

ভ — বর্ণ বা রং অনুভবের ক্ষেত্র। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শানুভূতির centre.

ম — অসাধারণ ভাব কল্পনাপ্রধান সুকুমার কলা অর্থাৎ চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ক্ষেত্র।

য — প্রাপ্তি ইচ্ছা। লোভ ও দখলের বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র।

র — ধ্বংসস্থল। আমূল সংশোধনের বৃত্তিও এখানে। শাস্ত্র বিদ্যা ও শল্য চিকিৎসায় নৈপুণ্য কেন্দ্র।
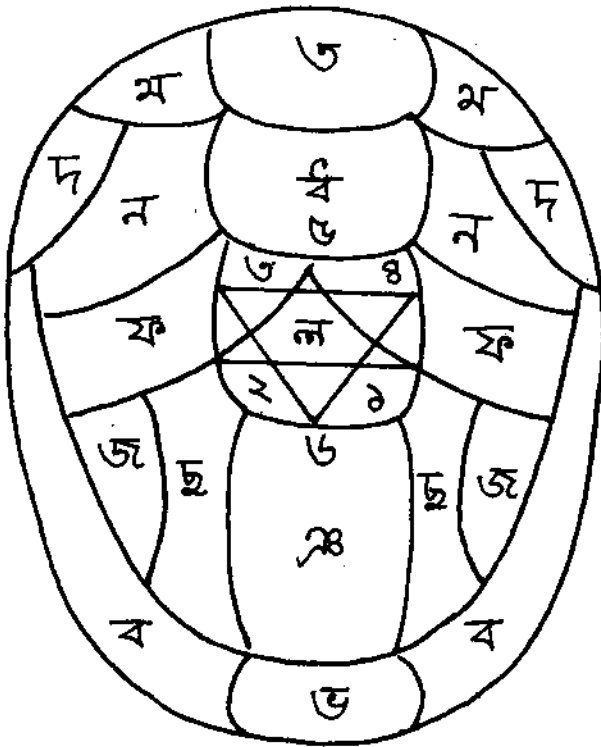
৪। মাথার উপরের দৃশ্য

ল — ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মতালুর অন্তর্গত এই 'ল' চিহ্নিত ভূমি জীবাত্মা ও পরমাত্মার লয় ভূমি (absorption centre of spirit entity & the sound i.e. Lord Himself). ব্রহ্মভাবাত্মক ছত্রাকার সহস্রারের কর্ণিকান্তর্গত ইহাই জ্ঞান-হৃদয় বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাক্ষেত্র।

১ — চিহ্নিত কোণাংশ জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মবিন্দু।

২ — চিহ্নিত কোণাংশ তেজাত্মক ব্রহ্মবিন্দু।

৩ — চিহ্নিত কোণাংশ চিদাত্মক ব্রহ্মবিন্দু।

৪ — চিহ্নিত কোণাংশ সদাত্মক ব্রহ্মবিন্দু।

৫ — চিহ্নিত কোণাংশ আনন্দাত্মক ব্রহ্মবিন্দু (লৌকিক)

৬ — চিহ্নিত কোণাংশ পূর্ণ ও অলৌকিক আনন্দবিন্দু। ইহাই রসস্থান।